সাইয়েদ কুতুব শহীদ

কোরআনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

অনুবাদ সম্পাদনা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

কোরআনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

প্রথম খন্ড ঃ মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহ

দ্বিতীয় খন্ড ঃ মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহ

অনুবাদ সম্পাদনা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

AL-QURAN ACADEMY LONDON

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

www.pathagar.com

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

www.pathagar.com

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহ

সূরা আল ফাতেহা	৭
সূরা আল আনয়াম	৭
সূরা আল আ'রাফ	৪৯
সূরা ইউনুস	৬৭
সূরা হূদ	৭৭
সূরা ইউসুফ	৮৬
সূরা ইবরাহীম	১০৭
সূরা আল হেজর	১১৩
সূরা আন নাহল	১১৬
সূরা বনী ইসরাঈল	১১৮
সূরা আল কাহ্ফ	১২৪
সূরা মারইয়াম	১২৮
সূরা ত্বাহা	১৩০
সূরা আল আম্বিয়া	১৩২
সূরা আল মোমেনুন	১৩৫
সূরা আল ফোরকান	১৩৯
সূরা আশ শোয়ারা	১৪৭
সূরা আন নামল	১৪৮
সূরা আল কাছাছ	১৫১
সূরা আল আনকাবুত	১৫৭
সূরা আর রোম	১৫৯
সূরা লোকমান	১৬২
সূরা আস সাজদা	১৬৮
সূরা সাবা	১৭৩
সূরা ফাতের	১৭৭
সূরা ইয়াসিন	১৭৯
সূরা আছ ছাফফাত	১৮২
সূরা ছোয়াদ	১৮৫
সূরা আঝ ঝুমার	১৮৮
সূরা আল মোমেন	১৯০
সূরা হা-মীম আস সাজদা	১৯৪
সূরা আশ শূ-রা	১৯৭
সূরা আয যোখরুফ	২০১
সূরা আদ দোখান	২০৩
সূরা আল জাছিয়া	২০৫
সূরা আল আহ্কাফ	২০৭
সূরা ক্বাফ	২১০
সূরা আয যারিয়াত	২১১
সূরা আত তূর	২১৩
সূরা আন নাজম	২১৭
সূরা আল ক্বামার	২২০
সূরা আল ওয়াক্বেয়া	২২১
সূরা আল মুলক'	২২৩
সূরা আল ক্বালাম	২২৮
সূরা হাক্বাহ	২৩৬
সূরা আল মায়ারেজ	২৪০
সূরা নূহ	২৪৬
সূরা আল জ্বিন	২৫৫
সূরা আল মোযযাম্মেল	২৫৬
সূরা আল মোদ্দাসসের	২৬২
সূরা ক্বেয়ামাহ	২৬৭
সূরা আদ দাহর	২৭০
সূরা আল মোরসালাত	২৭৩
সূরা আন-নাবা	২৭৫
সূরা আন নাযেয়াত	২৭৬
সূরা আবাসা	২৭৯
সূরা আত্ তাকওয়ীর	২৮১
সূরা আল এনফেতার	২৮৩
সূরা আল মোতাফফেফীন	২৮৪
সূরা আল এনশেকাক্ব	২৮৬
সূরা আল বুরুজ	২৮৮
সূরা আত্ তারেক	২৯০
সূরা আল আ'লা	২৯১
সূরা আল গাশিয়াহ	২৯২
সূরা আল ফজর	২৯৩
সূরা আল বালাদ	২৯৫
সূরা আশ্ শামস	২৯৫
সূরা আল লায়ল	২৯৬
সূরা আদ দোহা	২৯৮
সূরা আল এনশেরাহ	৩০০
সূরা আত্ তীন	৩০০
সূরা আল আলাক্ব	৩০০
সূরা আল ক্বাদর	৩০৭
সূরা আল আ'দিয়াত	৩০৮
সূরা আল ক্বারিয়াহ	৩০৯
সূরা আত্ তাকাসুর	৩০৯
সূরা আল আসর	৩০৯
সূরা আল হুমাযাহ	৩১০
সূরা আল ফীল	৩১০
সূরা কোরায়শ	৩২০
সূরা আল মাউন	৩২১
সূরা আল কাওসার	৩২২
সূরা আল কাফেরূন	৩২৩
সূরা লাহাব	৩২৬
সূরা আল এখলাস	৩২৮
সূরা আল ফালাক্ব	৩২৮
সূরা আন্ নাস	৩৩০

www.pathagar.com

সূরা আল ফাতেহা

সাত আয়াতবিশিষ্ট এই ছোট সূরাটিকে প্রতিটি মুসলমান ব্যক্তি দৈনিক কমপক্ষে ১৭ বার নামাযে তেলাওয়াত করেন। যদি এর সাথে কিছু সুন্নত ও নফল পড়া হয় তাহলে এই সংখ্যা অবশ্য আরো বেশী হবে। এই সূরার গুরুত্ব সম্পর্কে সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে উবাদা বিন সামেতের বর্ণনা রয়েছে, 'সূরা ফাতেহার তেলাওয়াত ছাড়া নামায শুদ্ধ নয়।'

এই সূরায় ইসলামী আকিদা ও ধ্যান ধারণার মৌলিক অংশগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইসলামী আকিদার মাধ্যমে লালিত চিন্তা ও অনুষ্ঠানের রাস্তাসমূহকে পরিস্ফুটিত করা হয়েছে। এ থেকে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই সূরার তেলাওয়াত প্রতিটি রাকায়াতেই জরুরী এবং এই বিষয়ের দিকেও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, এই সূরার তেলাওয়াত ছাড়া নামায কেন শুদ্ধ হয় না।

সূরা আল আনয়াম

এ সূরাটি রসূলুল্লাহ (স.)-এর মক্কী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছিলো। মক্কী জীবনের সময়কাল ছিলো পূর্ণ তেরো বছর। এ সূরাগুলোতে একটি মাত্র বিষয়কেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন আংগিকে পেশ করা হয়েছে। আল কোরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং পদ্ধতি হচ্ছে, কোনো কথা বা বিষয় একাধিকবার পেশ করা হলেও প্রতি বারেই তাকে নতুন এক ভাষা ও ভংগিতে পেশ করা হয়, যার ফলে প্রত্যেক বারই পাঠকের কাছে বিষয়টিকে নতুন মনে হয়।

প্রথম যে বিষয়টির ওপর কোরআনুল কারীমের আলোচনা শুরু হয়েছে তা হচ্ছে এই- 'দ্বীন' এবং এই দ্বীনের জন্যে সব থেকে বড়ো এবং সর্বাধিক মৌলিক বিষয়টি হচ্ছে এর 'আকীদা বিশ্বাস'। এটাকেই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা যায়। কেননা এ বিষয়ের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মানুষের দাসত্ব এবং প্রভু ও তার গোলামের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়।

এ বিষয়ের আলোচনায় গোটা মানবমন্ডলীকে সম্বোধন করা হয়েছে। মানুষ মানুষই- তা সে যে এলাকারই হোক না কেন। আরব দেশে জন্ম গ্রহণ করায় সে আরবী, কিন্তু মানুষ হিসাবে অন্যান্য এলাকার মানুষের সাথে তার একটা মানবীয় সম্পর্ক সব সময়েই অবশিষ্ট থাকবে।

আসল বিষয় হচ্ছে 'মানুষ'- যার কোনো পরিবর্তন নেই। কারণ সৃষ্টির বুকে তার অস্তিত্বই আসল বিষয় এবং এখান থেকে জীবন শেষে চলে যাওয়ার বিষয়টিও এই মানুষেরই বিষয়। সৃষ্টির সব কিছুই মানুষকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং সকল সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার যে সম্পর্ক তাও মানুষকেই কেন্দ্র করে। এ এমন একটি বিষয়, যার কোনো পরিবর্তন নেই। কারণ গোটা সৃষ্টির মূল ব্যাপার-ই হচ্ছে মানুষ।

আল কোরআনের এই মক্কী সূরাটি সেই মানুষকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছে। মানুষের জীবনের ব্যাখ্যা দানই এ সূরার উদ্দেশ্য। সূরাটির মধ্যে প্রধান জিজ্ঞাসা

www.pathagar.com

মানুষকে কেন্দ্র করেই এসেছে। সে জিজ্ঞাসাটি হচ্ছে— মানুষ কে? কোথেকে এসেছে সে? কেমন করে সে এখানে এলো? কেন এলো? এ জীবন শেষে সে কোথায় যাবে? 'না' থেকে কে তাকে অস্তিত্বে নিয়ে এলো? কে তাকে পুনরায় এখান থেকে নিয়ে যাবে এবং কোথায় নিয়ে যাবে? যে ধরণীকে সে অনুভব করছে এবং দেখছে তাই বা কী জিনিস? আল কোরআন তাকে এসব প্রশ্নের খোলামেলা ও বাস্তবসম্মত জবাব বলে দিচ্ছে। তার দৃষ্টির অন্তরালে যা কিছু আছে সে অনুভূতি দিয়ে তা বুঝতে পারে; কিন্তু দেখতে পায় না। তাই বা কী জিনিস? এই রহস্যাবৃত সৃষ্টিকে কে অস্তিত্ব দান করলো? কে এসব কিছুর ব্যবস্থাপনা করছে এবং কেই বা পরিচালনা করছে এসব কিছুকে? আর কিভাবে মানুষের সাথে এ সৃষ্টি জগত ও তার স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ সাধিত হচ্ছে এবং বান্দা তার স্রষ্টার সাথে কিভাবেই বা যোগাযোগ করে চলেছে?

এই সব প্রধান প্রধান বিষয় নিয়েই সত্যিকার অর্থে মানুষের অস্তিত্ব টিকে আছে। আর সর্বকালে সর্বযুগে এগুলোই হচ্ছে প্রধান সেই সব বিষয়, যার ওপর নির্ভর করছে গোটা সৃষ্টি জগত।

তেরোটি বছর ধরে মানুষের অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এসব বড়ো বড়ো সমস্যা পর্যালোচনা এবং সমাধান করার কাজেই এ মহাগ্রন্থ নিয়োজিত থেকেছে। এ কারণেই মানুষের জীবনের ছোট বড় সকল সমস্যাই আল কোরআনের বিবেচ্য বিষয়।

তবে কোরআনুল কারীম মানুষের এসব মৌলিক বিষয়াদির সীমা পেরিয়ে ততোদিন পর্যন্ত তার শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়নি, যতোদিন না এর জন্যে তেমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং গোটা মানবমন্ডলীর মাঝে কোরআনে বিরোধীদের সকল বিদ্বেষের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে এ পাক কালামের আবেদন সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। আল্লাহর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাঁর দেয়া এ জীবনব্যবস্থাকে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা, আর তার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবেই মক্কী জীবনের এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয় যাবতীয় আয়োজন।

এখানে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দানকারী হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম। তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো সেই ব্যবস্থাকে আল্লাহর যমীনে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এ সময়ে বাতিল ব্যবস্থা দীর্ঘ তেরোটি বছর ধরে আল কোরআনের দাওয়াত এবং ইসলামী আকীদাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। এ সময় এ পবিত্র মক্কা নগরীতে মোহাম্মদ (স.) যতোদিন উপস্থিত ছিলেন, ততোদিন তিনি একামতে দ্বীনের বিস্তারিত কোনো বিবরণ দেননি এবং মুসলমানদের জন্যে বিস্তারিত কোনো আইন কানুনও তিনি প্রণয়ন করেননি।

আল্লাহর হেকমতের দাবী ছিলো দাওয়াতের প্রথম ও মূল কথাটির দিকেই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা। তাই রসূলুল্লাহ (স.) সর্ব প্রথম কালেমায়ে তাইয়্যেবা- লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ— এই কথার দিকেই মানুষদের আহবান জানান এবং মানুষকে এ কথার সাক্ষ্য দান করার জন্যে ডাকতে থাকেন যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, আইনদাতা নেই, ক্ষমতার মালিক বলতে কেউ নেই। সুতরাং তাদের কর্তব্য শুধু তাঁরই নিরংকুশ আনুগত্য দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করা, অন্য কারো নয়।

www.pathagar.com

বাহ্যিক ও গভীর চিন্তার দৃষ্টিতে আরবদের কাছে একথা প্রতীয়মান হয়েছে যে, এ দাওয়াত গ্রহণ করা মোটেই কোনো সহজ কাজ নয়। তারা আরবীভাষী হিসাবে আরবী শব্দ ইলাহ-এর অর্থ ঠিকই বুঝেছিলো যে, এর অর্থ হচ্ছে- 'শাসন ক্ষমতার নিরংকুশ কর্তৃত্ব'। তারা এটাও বুঝেছিলো উলুহিয়্যাত এবং পবিত্র আল্লাহ্‌র একত্ব শব্দটির অর্থ হচ্ছে- ধর্মজাযক, গোত্রীয় নেতৃবৃন্দ, দলীয় নেতা ও শাসনকর্তা- যে যেখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে তাদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ও সকল ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে তুলে দেয়াই হচ্ছে আল্লাহ্‌র উলুহিয়্যাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। এ ক্ষমতা বলতে বুঝায় মানুষের বিবেকবুদ্ধির মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতার চেতনা সৃষ্টি করা, তাঁকেই সকল ক্ষমতার মালিক বলে অনুভব করা, জীবনের সমস্ত কার্যকলাপ ও ঘটনাবলী ফয়সালার ব্যাপারে একমাত্র তাঁরই ক্ষমতাকে চূড়ান্ত মনে করা, সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে তাঁরই আইন মানা, তাঁর আইন মতোই বিচার ফয়সালা করা এবং গোটা দেহ ও মনের মধ্যে তাঁরই আধিপত্যকে স্বীকার করে নেয়া। আরবী ভাষাভাষীরা অবশ্যই জানতো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র অর্থ পৃথিবীর সকল ক্ষমতা- যা বিশেষ শ্রেণীর অধিকারীরা কুক্ষিগত করে রেখেছিলো এবং নানা ওজুহাতে তারা এসব ক্ষমতা ব্যবহার করে চলেছিলো, এগুলোর একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তাঁর এই ক্ষমতায় ভাগ বসানোর অধিকার আল্লাহ তায়ালা কাউকেই দেননি। ইলাহ-এর এই সর্বব্যাপী এসব অর্থের কোনোটিই আরবদের চিন্তা চেতনা বাইরে ছিলো না। তাদের ভাষার অর্থ তারাই ভালোভাবে বুঝবে এটাই স্বাভাবিক। তারা ভালোভাবেই বুঝতো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বুঝায় এবং এই কথাটি গ্রহণ করতে আহবান জানানোর উদ্দেশ্যই বা কি। তারা জানতো এই কথা গ্রহণ করলে তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে তাদের সম্পর্ক কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌছবে এবং নেতৃবৃন্দরাও জানতো যে, বিভিন্ন জিনিস ও অঞ্চলের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের ক্ষমতাকে একদিন তাদের থেকে চূড়ান্তভাবে কেড়ে নেয়া হবে। এই সমস্ত অর্থ বুঝতে পেরেই তারা আদাজল খেয়ে এই দাওয়াতের বিরোধিতা করেছে। এই দাওয়াতকে প্রতিহত করার জন্যে যতো প্রকারের অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারতো তার কোনোটাই তারা বাদ রাখে নাই।

ভেবে দেখতে হবে, এই দাওয়াতের সূচনা এই তাওহীদের কথা দিয়ে কেন শুরু করা হলো, আর কেনই বা আল্লাহ তায়ালা চাইলেন এই দাওয়াতী কাজ শুরু করার সাথে সাথে রসূলের এবং তাঁর সাথীদের এমন কষ্ট হোক।

রসূলুল্লাহ (স.) এই মহান দ্বীন নিয়ে যখন প্রেরিত হয়েছিলেন, তখন আরব দেশের বেশীর ভাগ উর্বর এবং ধনী এলাকাগুলো আরবদের হাতে ছিলো না। অপেক্ষকৃত ভালো অঞ্চলগুলো ছিলো অনারবদের হাতে।

উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত সিরিয়ার পুরো অঞ্চলটিই ছিলো রোম সাম্রাজ্যের কতৃত্বাধীনে। রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক আরব আমীর এই অঞ্চলটি শাসন করতো। দক্ষিণে অবস্থিত ইয়ামান ছিলো পারস্যের শাসনাধীন এবং পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে এ অঞ্চলটিকেও চালাতো কিছু সংখ্যক আরব আমীর। আরবদের হাতে

www.pathagar.com

ছিলো মাত্র হেজায, নাজদ এবং অনুর্বর কিছু মরু অঞ্চল, এসব এলাকায় শুধু খেজুরবৃক্ষ এবং বাবলা গাছ উৎপন্ন হতো।

এ সময় মোহাম্মদ (স.)-এর হাতে কী ছিলো তাও ভেবে দেখা দরকার। কা'বা শরীফের পুনর্নির্মাণ কালে হাজরে আসওয়াদটিকে তার নিজ স্থানে রাখার প্রশ্নে তাঁকে 'আল আমীন' বলে ঘোষণা করা ও তাঁর ফায়সালা মেনে নেয়ার জন্যে কোরায়শের সকল নেতৃবৃন্দ একমত হয়েছিলো। উপরন্তু তিনি কোরায়শদের মধ্যে বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতেন। উত্তরাঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী রোমশক্তি ও দক্ষিণের পারস্য শক্তির প্রভাবমুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে দ্বিধা বিভক্তিকে কাজে লাগিয়ে বংশ পরম্পরাক্রমে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ক্ষয়িষ্ণু আরব কাবিলাগুলোকে একত্রিত করে আরবদের শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা ও তাদের গুণাবলীকে ওপরে তুলে ধরার যোগ্যতা তিনি নিসন্দেহে রাখতেন এবং একমাত্র তাঁর পক্ষেই সারা আরবের বুকে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলা সম্ভব ছিলো।

সেদিন যদি রসূল (স.) আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আহবান জানিয়ে সকলকে এক পতাকাতলে সমবেত করতে চাইতেন, তাহলে নিসন্দেহে এবং নির্দ্বিধায় সকল আরববাসী তাঁর ডাকে সাড়া দিতো। দীর্ঘ তেরোটি বছর ধরে আরব উপদ্বীপের ক্ষমতাধরদের সাথে এই কঠিন সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে সহজেই তিনি আরব বিশ্বের নেতৃপদে বরিত হতে পারতেন।

মোহাম্মদ (স.) যদি আরবদেরকে সংগঠিত করে অপরদের ওপর আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েমের লক্ষ্যে নেতৃত্ব দিতেন, তাহলে অবশ্যই তার হাতে সম্মিলিতভাবে সকল ক্ষমতা তুলে দিতো এবং তিনি সবার অবিসংবাদিত নেতা হয়ে যেতেন। তারপর তিনি যদি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে চাইতেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আর কেউ রুখে দাঁড়ানোর সুযোগ পেতো না এবং এইভাবে আল্লাহর নির্দেশিত কাজ সহজেই সকল জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো।

কিন্তু আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁকে এই পদ্ধতিতে কাজ করতে নির্দেশ দেননি। তাঁকে সর্বপ্রথম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রকাশ্য দাওয়াত দান করার জন্যে নির্দেশ দিলেন এবং এর প্রতিক্রিয়ায় যে বাধাবিপত্তি বিপদআপদ ঘাতপ্রতিঘাত আসবে, এই দাওয়াত গ্রহণকারী ছোট দলটিকে তা সহ্য করার জন্যে উৎসাহিত করলেন।

কিন্তু কেন এমন হলো? আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তো কিছুতেই তাঁর রসূল ও তাঁর সংগী সাথীদেরকে কখনো কষ্ট দিতে চান না। আসলে আল্লাহ তায়ালা জানেন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ ওইটি নয়। রোমের তাগুত (আল্লাহদ্রোহী শক্তি) এবং পারস্যের তাগুতী শক্তিকে আরব তাগূতদের দ্বারা তিনি পরাভূত করতে চাননি। কারণ তাগুতরা সবাই একই প্রকার তাগূত!

পৃথিবীর মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এজন্যে এ পৃথিবীকে একমাত্র আল্লাহর জন্যেই মুক্ত করতে হবে। আর আল্লাহর এ বিশ্বকে মুক্ত করতে হলে কালেমায়

www.pathagar.com

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র ঝান্ডাকে বুলন্দ করতে হবে সবার আগে সুতরাং, পথ এটা নয় যে, রোমান তাগুত ও পারসিক তাগুতদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আরব তাগুতদের হাতে তুলে দেয়া হবে। আসল কথা হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- এর পতাকা সমুন্নত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ কিছুতেই এক আল্লাহর বান্দা হতে কিংবা থাকতে পারে না। কালেমায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ আরবী ভাষাভাষীরা এটিই বুঝে নিয়েছে যে, 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ শাসন ক্ষমতার অধিকারী নয় এবং মানুষের জীবনের জন্যে আইন কানুন দেয়ার একচ্ছত্র মালিকও একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। কারণ সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। আর ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে সত্যিকার জাতীয়তা একমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে। ঈমানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ জাতীয়তার দৃষ্টিতে রোম, পারস্য ও আরবের অধিবাসিরা সবাই সমান, আল্লাহর ঝান্ডা তলে সকল শ্রেণী ও রংয়ের মানুষ এক, আর এটিই হচ্ছে সঠিক পথ।

রসূলুল্লাহ (স.) এই জীবনব্যবস্থা নিয়ে যখন প্রেরিত হয়েছিলেন তখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরব সমাজ সম্পদ ও ইনসাফ বিতরণের ক্ষেত্রে এক নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো। অল্প কিছু সংখ্যক লোকের হাতে দেশের সমুদয় সম্পদ ও ব্যবসা কুক্ষিগত ছিলো, যারা সূদের ব্যবসা করে তারা তাদের ব্যবসা ও সম্পদকে বহু বহুগুণে বাড়িয়ে ফেলেছিলো এবং সমাজের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী ছিলো কপর্দকহীন– দু একখানি রুটির কাংগাল। সেক্ষেত্রে তিনি চাইলে এসব কায়েমী স্বার্থবাদী এসব মিথ্যা আভিজাত্যের ধ্বাজাধারীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারতেন এবং জনগণের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওইসব সম্পদশালীর হাত থেকে সম্পদের পাহাড় খসিয়ে নিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের জন্যে মানুষকে ডাক দেয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতাও অবশ্য তাঁর হাতে ছিলো।

সেদিন রসূল (স.) যদি সত্য সত্যই মযলুম জনতাকে এইভাবে ডাক দিতেন, তাহলে আরব সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতো। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই তাঁর ডাকে সাড়া দিতো এবং তারা বিজয়ী হয়ে যেতো। এই ভাগের লোকেরা সম্পদ ও সম্ভ্রমের মোকাবেলায় তো স্বাভাবিকভাবে দ্বীন ইসলামের নতুন এই দাওয়াতের সাথেই থাকতো, কিন্তু 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- র দাওয়াত সবাই সম্মিলিত ভাবে গ্রহণ করতে পারতো না এবং বিচ্ছিন্ন এই গোত্রসমূহের কাছে সামগ্রিকভাবে এ দাওয়াত গ্রহণযোগ্যও হতো না।

আবার এমনও বলা হয়েছে যে, মোহাম্মদ (স.)-এর আচার ব্যবহার এতো সুন্দর ছিলো যে, ওই সমাজের সংখ্যাধিক্য লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর অল্প কিছু সংখ্যক প্রথম দিকে পিছিয়ে থাকলেও ধীরে ধীরে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতো এবং তাঁর নেতৃত্ব সমাজে সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো। এইভাবে তাঁর রব তাঁকে তাওহীদের দাওয়াত দান করার যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা পালন করার সাথে সাথে সমাজে ও রাষ্ট্রে তাঁর আধিপত্যও কায়েম হয়ে যেতো।

www.pathagar.com

কিন্তু মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে এর কোনোভাবে কাজ করার জন্যে পাঠাননি।

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জানেন ইসলামী দাওয়াত দান করার প্রকৃত পথ এটা নয়। কেননা একমাত্র আকীদা বিশ্বাসের কারণেই সমাজে সামাজিক ইনসাফ প্রসার লাভ করতে পারে, সকল কাজ পরিচালনার বিষয়টি আকীদার কারণেই সর্বশেষে আল্লাহর দিকে মোড় নেয়। একবার আকীদা ঠিক হয়ে গেলে সন্তুষ্টি ও আনুগত্যবোধের সাথে মোহাম্মদ (স)-কেই ফয়সালাদাতা মেনে নেয়া হতো এবং বাদী বিবাদী উভয় পক্ষ অবশ্যই স্বীকার করতো যে, তিনি অবশ্যই এমন ফয়সালা দেবেন যাতে আল্লাহ তায়ালা খুশী হয়ে যাবেন। আর তখনই মানুষ আনুগত্যপূর্ণ হৃদয় দিয়ে বুঝতো যে, মোহাম্মদ (স.)-এর আনুগত্যের মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আকীদার বিভ্রান্তি দূর হয়ে যখন মানুষ সার্বিক বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে আসবে, তখনই তার অন্তরগুলো লোভ লালসার হাতছানি ও হিংসা-বিদ্বেষের কুটিলতা পরিহার করতে সক্ষম হবে। আকীদা ঠিক হয়ে গেলে অন্তরগুলো বিভ্রান্তির জালে আবদ্ধ হবে না বা মানুষের আত্মাও সেইভাবে বিষাক্ত হবে না। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র দাওয়াত অস্বীকারকারীদের মন এ কারণেই বরাবর নির্লোভ থেকেছে।

গোটা আরব উপদ্বীপের মানুষের চরিত্র যখন নিম্নতম স্তরে নেমে গিয়েছিলো সেই সময়েই রসূলুল্লাহ (স.) তাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। সমাজের সর্বত্র যুলুম নির্যাতন কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো তা যোহায়ের ইবনে আবি সুলামীর নীচের কবিতাংশ থেকে কিছুটা আন্দায করা যায়।

'যে নিজের পানশালা তরবারি দ্বারা রক্ষা করতে পারে না তা ভেংগে দেয়া হয়,

আর যে মানুষের প্রতি যুলুম করে না তার ওপর প্রতিনিয়ত যুলুম করা হয়।'

এই রকমই আর একটি কথা দ্বারা ওপরের কথার সমর্থন পাওয়া যায়,

'তোমার ভাইকে সাহায্য করো– সে যালেম হোক কিংবা মযলুম হোক।'

সমাজের সর্বত্র সাধারণভাবে মদ ও জুয়ার প্রচলন ছিলো এবং এগুলো দ্বারা আভিজাত্যের প্রদর্শনী করা হতো। এদের চরিত্র সম্পর্কে জাহেলিয়াতের একজন কবি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা তারাফা ইবনুল আবদ-এর নীচের কবিতার সাথে মিল খায়।

'আহ্ যদি পেতাম আমি তিনটি জিনিস, যা একজন যুবকের কাছে সৌন্দর্যের বস্তু। তোমার ভালোবাসা, যা আমি তখন পাইনি যখন চেয়েছি।

সকল আবেগ সহকারে রংগীন মদিরা হাতে।

রোষ-কষায়িত লোচনে তুমি হেরিছো মোর পানে, সাথে অশ্রুভেজা চোখে দিয়েছো এগিয়ে সুরার পেয়ালাটিরে!'

আরবরা নিকৃষ্ট জীবন যাপন করতো। একটি হাদীস থেকে তাদের কদর্য জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে অনেকখানি আন্দায করা যায়। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

(উৎসাহী পাঠকদের যারা হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি বিস্তারিত পাঠ করতে চান তারা অনুগ্রহপূর্বক সূরা আন নেসার তাফসীরে 'জাহেলী যুগের বিয়ে' শিরোনামে পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি দেখে নিন।)

আরব সমাজের চরম নৈতিক অধপতনের পেক্ষাপটে মোহাম্মদ (স.) সমাজ সংস্কারের জন্যে সে বিষয়ের দিকে মানুষদের আহবান জানাতে পারতেন, যার দ্বারা মানুষের চারিত্রিক উন্নতি হতে পারতো। সমাজ পরিচ্ছন্ন হওয়ার পথ খোলাসা হতো, মানুষের মধ্যে পারস্পারিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পেতো এবং সামাজিক মেলামেশার মধ্যে ভারসাম্য পয়দা হতে পারতো।

আর একথা সত্য যে, রসূলুল্লাহ (স.) যখন সে এলাকায় বসবাস করতেন তখন সেখানে এসব সংস্কারমূলক কাজ করতে অবশ্যই সক্ষম হতেন, ঠিক অন্যান্য সংস্কারকরা যেমনটি করে থাকেন। নির্দিষ্ট কোনো এলাকায় তারা অবশ্যই কিছু সংখ্যক ভালো লোক তৈরী করতে সক্ষম হন, তাদের মধ্য থেকে চারিত্রিক দোষ ও কদর্য ব্যবহার দূরীভূত করে বহু মন্দ ও ক্ষতিকর আচরণ থেকে মানুষকে মুক্তও করতে পারতেন।

এমনও কেউ কেউ বলেছেন, যদি রসূল (স.) এভাবে তাঁর সংস্কার অভিযান চালাতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি সফল হতেন এবং বহু লোক শুরুতেই তাঁর ডাকে সাড়া দিতো, আর এর ফলে এই লোকদের পক্ষে ইসলামী আকীদা গ্রহণ করাও সহজ হতো এবং এইভাবে কাজ করলে প্রথম দিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাওয়াত দান করা থেকে অনেক বেশী কাজ হতো!

কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জানেন যে, এটা কোনো সঠিক পথ বা পদ্ধতি নয়। তিনি ভালো করে জানেন যে, সঠিক আকীদার ভীতছাড়া কোনো মযবুত চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না। এই আকীদাই নৈতিকতার আসল মানদন্ড এবং এই আকীদাই জীবনের সঠিক মূল্যবোধ স্থাপন করে, আর এইভাবে এ কালেমা সেই ক্ষমতাকে স্থির করে দেয় যার ওপর এসব মূল্যবোধ এবং নৈতিক মানদন্ড দাঁড়িয়ে থাকে। এইভাবেই এই কালেমার ধারক বাহক এবং এর বিরোধীরা নিজ নিজ কাজের ফল ভোগ করে। এই আকীদা স্থির না হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় মূল্যবোধ এবং চারিত্রিক বুনিয়াদই নড়বড় থাকে। এমতাবস্থায় কোনো শৃংখলাই টেকে না। কোনো ক্ষমতা স্থায়ী হয় না এবং তার থেকে কোনো প্রতিদান প্রাপ্তিরও আশা করা যায় না।

এমনি করে দীর্ঘদিন ধরে রসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবাদের কঠিন চেষ্টা-সাধনার পর মুসলমানদের আকীদা যখন স্থির হয়ে গেলো, তাদের বিশ্বাস যখন মযবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেলো তখনই আল্লাহর বান্দারা তাদের রবকে ঠিকমতো চিনতে সক্ষম হলো এবং একমাত্র তাঁর আনুগত্য করার জন্যে তারা সংকল্পবদ্ধ হলো। এই সময়েই মানুষ-মানুষের গোলামী ও কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে মুক্তি লাভ করলো। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র দাওয়াত সঠিকভাবে অন্তরের মধ্যে যখন প্রবেশ করানো সম্ভব হলো তখনই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পরিকল্পিত দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজটি, তাঁর পছন্দনীয় বান্দাদের দ্বারা সম্ভবপর হলো।

www.pathagar.com

এই সময়ে পৃথিবী রোম ও পারস্যের গোলামী থেকে নাজাত পেলো ঠিকই, কিন্তু সে স্থলে তাদের আরবদের কোনো আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো না; বরং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলো আল্লাহর আধিপত্য।

এ সময়ে সমাজের মানুষরাও সাধারণভাবে সামষ্টিক যুলুম থেকে মুক্তি পেলো এবং সর্বত্র ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো, যা পৃথিবীর বুকে সুবিচার ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা চালু করলো। মানুষ একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর দেয়া সামাজিক বিচার ব্যবস্থা চালু করলো, যার নাম রাখা হলো ইসলামের ঝান্ডা। আসলে এ নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম এর জন্যে প্রযোজ্য নয়। এ ঝান্ডার ওপরই লিখিত হলো কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

এই পবিত্র কালেমা দ্বারা মানুষের মন পবিত্র হলো। চরিত্রের উন্নতি সাধিত হলো এবং তাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে গেলো। এ মহান কালেমা গ্রহণ করায় মানুষের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে এমন আমুল পরিবর্তন এলো যা অন্য কোনোভাবেই আশা সম্ভব ছিলোনা। হয়তো কোনো কোনো জায়গায় এর কিছু ব্যতিক্রম ঘটে থাকতে পারে। কারণ জাহেলি যামানায় গড়ে ওঠা কিছু লোভ লালসা তখনো নবদীক্ষিত মুসলমানদের কারো কারো মনে মাঝে মাঝে উঁকি মারতো। এতদসত্তেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রতিদান পাওয়ার আকাংখা এবং তাঁর ক্রোধ ও শাস্তির ভয় সাধারণভাবে এসব কিছুকে দমিত রেখেছিলো।

এ পবিত্র কালেমা সমাজে এমন মানবতাবোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হলো এবং মানুষের মর্যাদাবোধকে এমনভাবে উন্নীত করলো যে, তাদের জীবনের সর্ব বিভাগে আমুল পরিবর্তন আসলো যা ইতিপূর্বে কখনো সম্ভব হয়নি। ইসলামের ছায়াতলে গড়ে ওঠা মানবতাবোধের এতো উৎকর্ষ সাধিত হলো যা ইসলামী আমল ছাড়া ইতিপূর্বে আর কখনো সম্ভব হয়নি।

সদগুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ এবং পরিপূর্ণতা কেবল ইসলামের এই স্বর্ণযুগেই সম্ভব হয়েছিলো। এই সময়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা কর্তৃক ইসলামী আইন কানুন যথাযথভাবে কায়েম হয়েছিলো। রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করার মাধ্যমেই তৎকালীন নেতৃবৃন্দ দ্বীন ইসলামকে পূর্ণতা-দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন– যা অন্য কোনোভাবেই সম্ভব ছিলোনা। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তা লাভের পূর্বেই রসূলুল্লাহ (স.)-এর শিক্ষা ও পরিচালনায় ইসলামের আকীদা বিশ্বাস মুসলমানদের মন মগযে কায়েম হয়ে গিয়েছিলো এবং তাদের প্রতিটি চিন্তা ও কর্মকান্ডে অবিচল ঈমানের বহিপ্রকাশ ঘটেছিলো। মক্কী যিন্দেগীর তের বছর সময়ের প্রশিক্ষণ কালে তারা ঈমানের যে স্বাদ পেয়েছিলেন তাতে সেই সময় থেকেই তাঁরা সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন যে, যে কোনো মূল্যেই হোক না কেন, তারা পৃথিবীর বুকে ইসলামকে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে চালু করবেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে কারো প্রাধান্য বা কোনো ক্ষমতাকে তারা অন্তরায় হতে দেবেন না। দ্বীনের মর্যাদাকে তারা নিজেরাও ভূলুণ্ঠিত করবেন না। এ ওয়াদা পূরণের পথে কেউ কোনো বাধা সৃষ্টি করতে এলে তারা বলিষ্ঠভাবে তার মোকাবেলা করবেন। তাদের এ ওয়াদা– এ দৃঢ় সংকল্প ছিলো একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি জান্নাত লাভের জন্যেই। আর এ জন্যে তারা যে কোনো ভয়ংকর যুদ্ধের ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। যতো পরীক্ষাই এ পথে এসেছে এবং দাওয়াত দান কালে যতো বাধা

www.pathagar.com

বিপত্তিই এসেছে ঈমানী বলে তা তারা অতিক্রম করেছেন।

তাই দেখা যায়, জাহেলি যামানার ন্যায় অন্য সকল যামানায় এবং সকল দেশে ক্ষমতাশীনদের পক্ষ থেকে এই কালেমারই বিরোধিতা করা হয়েছে বেশী। এ কালেমা আল্লাহর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য কারো শাসন ক্ষমতা মেনে নিতে রাজী হয়নি। দুনিয়ায় যারাই নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়, তারা এই কালেমার দাওয়াতকে কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না।

তারপর যখন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন প্রকার বিপদ আপদের মুখোমুখি করলেন, তখন তারা সবর করলেন এবং সকল কঠিন অবস্থায় তাঁরা দৃঢ়তা অবলম্বন করলেন। এইভাবেই তারা তাদের নফসের চাহিদা মেটানোর তাগিদ থেকে মুক্ত হলেন এবং আল্লাহ তায়ালা জেনে নিলেন যে, তারা দুনিয়ায় কোনো রকম কোনো সুযোগ সুবিধা, নেতৃত্ব কর্তৃত্ব; কিংবা কোনো রকম কোনো প্রতিদান পাওয়ার আশা করে না। এমনকি নিজ দেশে বা অন্য কোথাও যদি তাদের সম্মান না থাকে, না থাকে যদি কোনো মর্যাদা তাদের নিজ পরিবেশে বা নিজ বাড়ীতে তাতেও তাদের কোনো দুঃখ নাই।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা যখন তাদের মনের সকল অবস্থা জেনে নিলেন, তখন তিনি তাদেরকে তাঁর মহান সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার আমানত দান করলেন এবং তাদের মন মগযে, তাদের ব্যবহার ও চেতনায়, তাদের মাল সম্পদে, তাঁদের ঘরে বাইরে সমাজে রাষ্ট্রে সকল স্থানে এবং সকল সময়ে তাদের এই কালেমা প্রতিষ্ঠার জন্যে দায়িত্ব দেয়া হলো। তাদের হাতে যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করা হলো, তখন তাদের হাতে আল্লাহ প্রদত্ত আইন কানুন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও দেয়া হলো। কারণ তারা জানতেন যে, এসব আইন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং তিনিই তাদেরকে এসব কঠিন কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন।

এই পবিত্র জীবনব্যবস্থা এতো সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না যদি প্রথমে কালেমায়ে তাইয়্যবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ঝান্ডাকে ওইভাবে উড্ডীন করা না হতো। বাহ্যিক দিক দিয়ে এ দ্বীনকে কঠিন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা মানুষের জন্যে অত্যন্ত সহজ। তাই যদি না হতো, তাহলে ওই সকল প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলায় এ মহান জীবন ব্যবস্থাকে কায়েম করা কখনোই সম্ভব হতো না।

এই মোবারক জীবনব্যবস্থা একান্তভাবেই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এবং একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ দাওয়াত সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে। এ দাওয়াত গ্রহণকারী পৃথিবীর সকল মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি। এ মুসলমান জাতিকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে, তাদের সামষ্টিক জীবন পরিচালনার জন্যে তাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন সাধনের জন্যেই ছিলো এই সার্বজনীন আহ্বান।

মক্কার বুকে যে কঠিন অবস্থা তখন বিরাজ করছিলো তার মোকাবেলায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর চেতনা মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো রসূলুল্লাহ (স.)-এর সর্বপ্রথম কাজ। এ পথে বাইর থেকে যতো বাধাই আসুক না কেন, সে সব কিছু সহ্য করে এই কালেমাকে গ্রহণ করা এবং অন্য সকল মত ও পথ পরিত্যাগ করে এই পথে মযবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা– এই ছিলো এ পথ গ্রহণকারীদের প্রথম দায়িত্ব।

www.pathagar.com

আল কোরআনের প্রথম কাজ ছিলো আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত কর্মসূচী, আইন কানুন এবং লেনদেন ইত্যাদি সম্পর্কে কথা না বলে সর্ব প্রথম মানুষের মনের মধ্যে কালেমায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া প্রভুত্ব-কর্তৃত্বের মালিক আর কেউ নাই– এই বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করে দেয়া।

দ্বীন ইসলামের প্রকৃতিই হচ্ছে এইভাবে কাজ করা– যার রূপরেখা এখানে পেশ করা হলো। এ দ্বীন একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মূলনীতির ওপর টিকে থাকতে পারে। এখানে যতো প্রকার সংগঠন ও আইন সংস্থা হবে তার সব কিছুর মূলে এই মূলনীতিই কাজ করবে। যখন সুউচ্চ, ছায়াদানকারী ঘন পত্র পল্লবিত এক বিশাল বৃক্ষ চতুর্দিকে শাখা-প্রশাখা দিয়ে মৃদুমন্দভাবে হাওয়ায় দুলতে থাকে, তখন বুঝতে হবে মাটির অনেক গভীরে তার শেকড় অবশ্যই প্রোথিত রয়েছে, নচেত ওই বৃক্ষ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ঠিক এইভাবে দ্বীন-ইসলামের মহা মহীরুহও যখন চতুর্দিকে শাখা বিস্তার করে তার সুশীতল ছায়াতলে নিগৃহীত ও শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলো, তখন তার মূলে কালেমায়ে তাইয়্যেবার মযবুত শেকড় মানুষের হৃদয়-মনের গভীরে অবশ্যই প্রোথিত করার প্রয়োজন ছিলো। সর্বপ্রথম এই শেকড় গাড়ার কাজটিই তাই আগে করা হয়েছিলো, যার ফলে জীবনের সর্বদিকে এবং ছোট-বড় সকল বিষয়ের ওপর এর প্রভাব যথাযথভাবে পড়তে শুরু করেছিলো, আর এইভাবে আখেরাতের জীবনের জন্যেও এই জীবন ব্যবস্থা কল্যাণকর ভূমিকায় কাজ করতে শুরু করে, শুরু করে দৃশ্যমান অদৃশ্য জগতের সব কিছু এবং বস্তুগত জিনিসের সাথে সাথে বস্তুর উর্ধের রহস্যাবৃত জগতের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম তথ্যের ব্যাপারেও। কাজেই এই বিশ্বাস দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের সব কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী মূল শেকড় হিসাবে বর্তমানে যেমন কার্যকর আছে– ভবিষ্যতেও থাকবে।

দ্বীন ইসলামের প্রকৃতি ও রহস্যের এ হচ্ছে একটি অনন্য দিক। এই মহান দ্বীনের প্রশস্ত পথ মোমেনকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে সহায়তা করে, তার আকীদার জন্যে সুদৃঢ় ভীত রচনা করে দেয় এবং এর প্রভাব তখন জীবনের সকল শাখা-প্রশাখার ওপর পড়তে থাকে। এই আকীদার মূল ভিত্তি মানুষের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে সঠিক, অব্যর্থ ও একমাত্র বৃক্ষের দৃশ্যমান বাহ্যিক সকল শাখা প্রশাখার সাথে তার শেকড়ের যেমন একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তেমনি আকীদার সাথে জীবনের যাবতীয় বিষয়ের সম্পর্কও ওইভাবে গভীর এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে গড়ে ওঠে।

কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র প্রতি যখন মানুষের বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং তখন জীবনের সকল বিষয়কে পরিচালনার জন্যে যে মহান ইসলামী জীবনব্যবস্থার আগমন হয়েছে তা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে। আল্লাহর প্রভুত্ব ছাড়া অন্য সকল প্রভুত্ব কার্যত এ সময় উৎখাত হয়ে যায়, আর তখনই ছোটো বড়ো সকল জনপদ ঈমানের দাবী পূরণ করতে গিয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এই আত্মসমর্পণের পরই পর্যায়ক্রমে মানুষ ইসলামের যাবতীয় সাংগঠনিক কার্যক্রম ও আইন কানুনকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে। তখন তার মনের মধ্যে ইসলামের আইন কানুন গ্রহণের ব্যাপারেও আর কোনো আপত্তি থাকে না। এ কারণেই আমরা

www.pathagar.com

দেখতে পাই মদের নেশায় বিভোর হওয়া সত্তেও মদ সম্পর্কিত আয়াত নাযিলের সাথে সাথে তা সম্পূর্ণভাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো সূদ, জুয়া এবং জাহেলিয়াতের আমলে প্রচলিত সকল কুপ্রথাসমূহও। এসব অন্যায় কাজ আল কোরআনের আয়াত অথবা রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিষেধাজ্ঞা জানার সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আর এখনকার অবস্থা হচ্ছে এই যে, বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ, তার আইন কানুন, বিধি বিধান, সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং সকল প্রকার প্রচারযন্ত্র ব্যবহার করেও এসব সমাজ বিধ্বংসী কার্যকলাপ বন্ধ করতে সক্ষম হচ্ছে না। বড়ো জোর এতোটুকু হয়তো যে, এসব আইনের প্রকাশ্য বিরোধিতা বন্ধ থাকছে; কিন্তু সমাজের লোক সাধারণভাবে অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকছেই।১

ইসলামী জীবন পদ্ধতির মধ্যে ইসলামের আর একটি প্রকৃতিও লক্ষ্য করার মতো। এই জীবন ব্যবস্থাই হচ্ছে মানুষের জীবনকে সার্বিকভাবে পরিচালনার জন্যে একমাত্র পূর্ণাংগ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা শুধু দুনিয়ার জীবনের জন্যে নিছক কোনো একটি মতবাদই নয়, বরং মানুষের জীবনের সকল কাজ ও বিষয়কে বাস্তবে পরিচালনা করার জন্যেই এ মতবাদ দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে এবং আল্লাহর হুকুমেই এ ব্যবস্থা সব কিছুকে পরিচালনা করে। এই পরিচালনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা কখনও প্রচলিত পদ্ধতিকে বহাল রেখেছেন, কখনও প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যেই কিছু বিধান জারী করেছেন এবং কখনও বা সব কিছু আমূল পরিবর্তন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক বিধান দিয়েছেন। আসলে গোটা মানবজাতির বাস্তব জীবনের জন্যে যখন যা প্রয়োজন হয়েছে সেই অনুযায়ীই আল্লাহ তায়ালা এ বিধান দিয়েছেন।

আল্লাহর এ বিধান এমন কোনো মতবাদ নয় যা কল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, বরং এ হচ্ছে বাস্তব জীবনকে পরিচালনার এক অমোঘ ব্যবস্থা। সুতরাং যে মুসলিম সমাজ কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র মধ্যেই প্রকাশিত আকীদাকে পুরোপুরিভাবে মেনে নিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য যে কোনো ক্ষমতার দাবীদারকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং তাদের দেয়া যাবতীয় আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতিকেও অস্বীকার করতে হবে।

এইভাবে এই নবগঠিত সমাজ যখন বাস্তবে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারবে, তখনই সে সমাজ জীবন্ত সমাজ বলে পরিচিত হবে। তখন তার প্রয়োজন হবে একটি সমাজ সংগঠনের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার, তার প্রয়োজন হবে নানা প্রকার আইন কানুন, আর এই আইন-কানুন চালু করার জন্যে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার। তবে এসব বিধানের কার্যকরিতা নির্ভর করবে যাদের জন্যে এসব বিধান নাযিল হয়েছে– তাদের এ সকল নিয়ম নীতি অনুযায়ী চলার ব্যাপারে একনিষ্ঠ আগ্রহের ওপর। একথাও জানা দরকার

১. কেমন করে আল্লাহ তায়ালা মদ নিষিদ্ধ করলেন আর কেমন করে মদ বন্ধ করতে গিয়ে আমেরিকা ব্যর্থ হলো জানার জন্যে দেখুন বিখ্যাত গ্রন্থঃ 'মা যা খাসেরাল আলামু বে-এন্হিত্বাতিল মোসলেমীন

www.pathagar.com

যে, মোমেন জনসমষ্টি বা মোমেন সমাজ যদি এই তাওহীদী বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে তাদের হাতে অবশ্যই একটি রাষ্ট্রক্ষমতা থাকতে হবে। কারণ আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া চালু হওয়া সম্ভব নয় এবং আইন চালু না হলে সেখানে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মাধ্যমে সমাজ জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। ক্ষমতা বলে শরীয়তের আইন চালু করতে না পারলে ইসলামী ব্যবস্থার উপযোগিতা ও উপকারিতা পাওয়াও সম্ভব নয়।

মক্কার মুসলমানদের হাতে কোনো রাষ্ট্রক্ষমতা ছিলো না এবং বাস্তবে তারা এমন অবস্থাতে ছিলো না যে, তারা নিজেরা আল্লাহর বিধান মতো চলতে পারে অথবা অপরকে চালাতে পারে, আর এই কারণেই মক্কী যিন্দেগীর তেরো বছর সময়ের মধ্যে নৈতিক বিধান ছাড়া জীবনের কোনো সমস্যা সমাধানের জন্যে নিয়ন্ত্রণমূলক বা শাস্তিমূলক কোনো বিধান নাযিল করা হয়নি। এ সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের নৈতিকতার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সব সূরা ও আয়াত নাযিল হয়েছিলো সেগুলোর প্রভাবে একদল মানুষ সত্যিকার অর্থে সোনার মানুষ হয়ে গড়ে উঠেছিলো। এদের আচরণে এবং স্বভাব চরিত্রে সাধারণভাবে মানুষ ছিলো মুগ্ধ-- একমাত্র কিছু স্বার্থপর ও নেতৃত্বলোভী মানব নামের অযোগ্য কিছু হিংস্র লোকই এর বিরোধিতা করছিলো– যাদের আশংকা ছিলো যে, মোহাম্মদ (স.)-এর গঠিত এই নতুন দলটি অচিরেই তাদের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেবে। এ জন্যে তারা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এই নতুন বিপ্লবকে ঠেকানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। এরপর মুসলমানদের হাতে যখন মদীনার নগর কেন্দ্রিক রাষ্ট্রটি এসে গেলো এবং তারা সেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগ পেলো, এ সময় ধীরে ধীরে তাদের ওপর শরীয়তের হুকুম-আহকাম নাযিল হতে শুরু হলো এবং এই শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলেই আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত আইন কানুন চালু করা সম্ভব হলো এবং সুন্দরভাবে মানুষের যাবতীয় সমস্যারও সমাধান হতে লাগলো।

মক্কী যিন্দেগীর ওই স্তরে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের আইন কানুন ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কোনো বিধান নাযিল করতে চাননি। কেননা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে সে সংক্রান্ত ব্যবস্থা পাঠানো ইসলামের নিয়মের খেলাপ। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই সেখানে আইন কানুনের প্রয়োজন হবে যেহেতু মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানে তখন তা প্রয়োগ করাও সম্ভব হবে। আগেই সে বিধান নাযিল করার অর্থ হতো অনাগত সমস্যাগুলোর আন্দায অনুমান করে সমাধান দেয়া। এই অনুমান করা ইসলামী ব্যবস্থার মেযাজের খেলাফ বরং যখন সমস্যা এসেছে তখনই সমস্যার গুরুত্ব ও গভীরতা বুঝে সেইভাবে তার সমাধান পেশ করা হয়েছে।

আজকের দিনে যারা জীবনের সমস্ত কাজ কারবারকে ইসলামের আইন অনুযায়ী চালাতে চায়, তারা পৃথিবীর কোনো দেশেই এর নযির খুঁজে পায় না, দেখতে পায় না কোথাও এর বাস্তব রূপরেখা ও দৃষ্টান্ত। এমন কোনো দেশ তাদের নযরে পড়ে না যেখানে একমাত্র ইসলামের আইন কানুন দিয়ে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

যদিও বহু দেশে নামধারী মুসলমানদের হাতে শাসন ক্ষমতা বর্তমান রয়েছে এবং ইচ্ছা করলেই তারা আল্লাহ প্রদত্ত সকল আইন কানুন চালু করতে পারে। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষ কি করে ইসলামী শাসনব্যবস্থার মেযাজ ও সুফল বুঝতে পারবে এবং কি করেই বা তারা আল্লাহর ইচ্ছাকে কার্যকর করবে!

আজকের মুসলমানদের দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, তাদের কেউ কেউ আধুনিক জগতের বিভিন্ন চিন্তাধারার সাথে সমন্বয় সাধন করার জন্যে ইসলামী ব্যবস্থার সংস্কার করতে চায়, মনে করে মানবরচিত আইন কানুন বুঝি বেশী দেশ ও জাতির জন্যে উপযোগী। তারা মনে করে মানবরচিত আইনের মাধ্যমেই জীবন সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে, এভাবে চিন্তা করে তারা নিজের অন্তরের কাছেই পরাজয় বরণ করে, পরাজয় বরণ করে সমাজের কাছেও। তারা ভবিষ্যতের অবাস্তব কল্পনায় সময় ক্ষেপণ করে। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা চান যে, তাদের অন্তরে আগে ঈমানের বাতি জ্বলে উঠুক এবং তাদের বিবেকের কাছে আল্লাহর ক্ষমতার ধারনাটুকু জেগে উঠুক, তাহলে তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারও সামনে তাদের মাথা নত করতে হবে না এবং আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনো আইন দ্বারা তাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে না। এইভাবে মানুষ যখন নিজেদের আকীদা বিশ্বাসকে মযবুতির সাথে অন্তরে পোষণ করতে পারবে এবং সমাজের বুকেও এই বিশ্বাসীরা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে তখনই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে ইসলামের আইন কানুন চালু করা সম্ভব হবে। মানুষদের সকল সমস্যার সমাধানও তখন তারা এই আইন দ্বারাই করতে সক্ষম হবে।

ইসলামের দাওয়াত দানকারীদের মনে ইসলামী ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করার গুরুত্ব সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। যখন কোনো জনপদে তারা মানুষদের ইসলামী ব্যবস্থার পুনর্জাগরণের জন্যে আহবান জানাবে, তখন তারা যেন সর্ব প্রথম জনগণের মনে ঈমান-আকীদার ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করার চেষ্টা করে। এ জন্যে তাওহীদের দিকে সরাসরি আহবান জানানোই হবে মুসলমানের প্রধান কর্তব্য। যদি ওই সব ব্যক্তি নিজেদেরকে মুসলমান বলেই দাবী করে তাহলে এটাই তাদের করতে হবে। কারণ জন্মগতভাবে মুসলমান হলেও তারা জেনে বুঝে আল্লাহকে সকল ক্ষমতার মালিক বলে মেনে নেয়নি। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম কালেমা লা-ইলাহ ইল্লালাহ্‌র দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সঠিক চেতনা জাগাতে হবে, তাদের জানাতে হবে যে, বিচার ফয়সালা ও শাসন-কর্তৃত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা– আর কেউ নয়।

ইসলামের দিকে মানুষকে যখনই আহবান জানানো হবে, তখনই আল্লাহর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ও তাঁর নিরংকুশ মালিকানা সম্পর্কে তাদের মধ্যে ঠিক সেইভাবে ধারণা ও চেতনা জন্মাতে হবে– যেমন করে ইসলামের সূচনালগ্নে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো। মক্কী জীবনের দীর্ঘ তেরোটি বছর ধরে আল কোরআন এই মূল্যবান কাজটিই করেছিলো।

কোনো ব্যক্তি যখন এই চেতনা সহকারে দ্বীন ইসলাম কবুল করবে, তখন সে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

করেছে, তাদের সামগ্রিক জীবনকে তারা যেহেতু এই তাওহীদের ভিত্তির ওপরই স্থাপন করেছিলো এবং তারা একথা মেনে নিয়েছিলো যে, তাদের জীবনকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই পরিচালনা করবেন।

যখন মুসলমানরা পৃথিবীর কোথায়ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে, তখন তাদেরকে প্রথমে এই বুনিয়াদের ওপরেই দাঁড়াতে হবে। এটিই হচ্ছে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সঠিক পদ্ধতি।

কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কাছে মনে হবে যে, ইসলামের জীবন ব্যবস্থা মানুষের সামনে পেশ করে দেয়া আর ইসলামী বিধান চালু করা বুঝি একই কথা– যদিও এ লোকগুলো মনের দিক দিয়ে একান্ত নিষ্ঠাবান। আসলে এরা খুব গভীরভাবে দ্বীন ইসলামের প্রকৃতি ও আল্লাহর সুদৃঢ় জীবনব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করেনি। মহাজ্ঞানী ও চির বিজ্ঞানময় আল্লাহ তায়ালা এ মহান দ্বীনের ইমারত কেন যে স্থাপন করলেন তা তারা ভালোভাবে বুঝতেও চেষ্টা করেনি। মানুষের স্বভাব চরিত্র ও তার জীবনের জন্যে কি প্রয়োজন তাও তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। ওরা ভাবে যে, শুধু দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দিলেই দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

মানুষ মেযাজের দিক দিয়ে ব্যস্ততাপ্রিয়। এই জন্যেই তারা মনে করে যে, এতে সহজভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এদের মনের মধ্যে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা থাকলেও এরা হচ্ছে ওই সব কল্পনা বিলাসী মানুষের মতো, যারা মনে করে যে, রসূল (স.) আরব জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্যেই বুঝি মানুষদের ডাক দিয়েছিলেন। অথবা তিনি সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করার বা কিছুটা নৈতিক জীবন যাপন করার জন্যেই মানুষদের সংগঠিত করেছিলেন এবং এইভাবেই এ পথে চলাকে তিনি মানুষের জন্যে সহজ করে দিয়েছিলেন। আজ আমাদের অবশ্যই প্রকৃত অবস্থাটি বুঝতে হবে। মানুষের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা এবং সর্বান্তকরণে ও নিশর্তভাবে একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করার কথা ঘোষণা করা। অন্য সকল ক্ষমতার দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেই একমাত্র আল্লাহ্‌র বিধান কবুল করা যথার্থ বলে গন্য হবে। আর এই মানবরচিত সমাজব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে সেখানে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত না করলে নিজেকে অন্য সকল ক্ষমতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করা কখনোই সম্ভবই নয়।

মানুষের মনে ইসলামের প্রতি আগ্রহ তো তখনই পয়দা হবে, যখন মানুষ একান্তভাবে নিজেকে আল্লাহর গোলাম বলে নেবে। এভাবেই সে সম্পূর্ণভাবে অন্যদের ক্ষমতা অস্বীকার করতে পারবে। এর জন্যে প্রথমেই তার মনে ইসলামের সকল ব্যবস্থার কার্যকারীতা বসিয়ে দিতে হবে এবং এর সব কিছু জেনে বুঝে সে ইসলাম কবুল করবে।

আল্লাহর ব্যবস্থা নিসন্দেহে সর্বোত্তম। যেহেতু এ ব্যবস্থা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন, সুতরাং ভালো না হয়ে এর কোনো উপায় নেই। চাকরের তৈরি করা বিধান কিছুতেই মনিবের তৈরি করা বিধানের মতো হতে পারে না– এটা যে কোনো মানুষই

www.pathagar.com

বুঝবে। তবু এইভাবে কথা বলা ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি নয়। দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত জীবনবিধান মেনে নেয়ার জন্যে সর্বসাধারণকে আহবান জানানো এবং অন্য সবার নিয়ম বিধানকে অস্বীকার করার জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া, চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার মতো কোনো প্রমাণ নাই, অথবা তা পেশ করার কোনো প্রয়োজনও নাই। এইভাবে দাওয়াত পাওয়ার পর যে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে, সে-ই সঠিক অর্থে ইসলাম গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

দীর্ঘ তেরোটি বছর ধরে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলো এই আকীদা গড়ে তোলার ব্যাপারে যেভাবে কাজ করেছে সে আলোকে আমরা দেখতে পাই, মানুষের এই আকীদাকে আল কোরআন কোনো মতবাদ হিসাবে পেশ করেনি- পেশ করেনি প্রচলিত কোনো ধর্মীয় তত্ত্ব হিসাবে। কোনো তর্কশাস্ত্র বা বিতর্কের বিষয়ও মূলত এটা নয়। কোনো বাজে তর্ক-বিতর্কও এটা নয়, বরং এটা হচ্ছে মহান কোরআন মানুষের মধ্যে নিহিত মানবতাবোধকেই তা সম্বোধন করে। তার অস্তিত্ব ও আশপাশে ছড়িয়ে থাকা সৃষ্টি রহস্য ও আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণাদির দিকে তাকাতে তাকে আহবান জানায়। তার বিবেককে জাগিয়ে দেয়া হচ্ছে, যাতে সকল প্রকার জড়তা পরিহার করে সে প্রকৃত সত্যকে প্রত্যক্ষ করে এবং তার মধ্যে মরচে ধরা সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় বিবেক যেন আবার গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে নিজ কর্তব্য সম্পাদনের ডাকে সাড়া দেয়। তার বিবেকের মূল উৎস সুপ্ত জ্ঞান ভান্ডারের বদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে তার সামনে অবারিত করে দেয় সৃষ্টি রহস্যের মাধুর্যকে। স্বতস্ফূর্তভাবেই সে এবার সত্যের ডাকে সাড়া দেয়।

আলোচ্য সূরাটি এই মহান জীবনব্যবস্থার এক পূর্ণাংগ ও অনন্য দৃষ্টান্ত, এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ইনশাআল্লাহ আমরা এখানে আলোচনা করবো।

ঈমানের সাধারণ ও বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরে কোরআনুল করীম অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে এই আলোচনা পেশ করেছে, যাতে করে জাহেলী যুগের বিবেক ও বুঝ-শক্তির ওপর যে জগদ্দল পাথর এতোদিন চেপেছিলো তা অপসারিত হতে পারে। এইভাবে বিবেক জেগে উঠলে, চর্ম-চোখে যা দেখা যায় না তা কোনো না কোনো সময়ে তাদের মানস চোখে মূর্ত হয়ে উঠবেই। তাই দেখা যায় ঈমান-আকীদা গ্রহণের এই দাওয়াত সবসময়ই যিন্দা দিল মানুষের কাছে, সকল দুঃখ-দৈন্য, বাধা বিঘ্ন ও সর্বপ্রকার অন্তরায়ের মোকাবেলায় বিপুল সাড়া জাগিয়েছিলো। জাহেলিয়াতের হিংস্র ধ্বজাধারীরা মুসলমানদের শুধু মৌখিক বাধা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা চরম নিষ্ঠুরভাবে শারীরিক আক্রমণও করেছে। পরবর্তীকালে নানা কূটতর্কের অবতারণাও করা হয়েছে, যার মোকাবেলায় কোরআনুল কারীম দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে এবং ওইসব ভ্রান্ত যুক্তির দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিয়েছে। একইভাবে ধর্মতঃ আর একটি শাস্ত্র তৈরি করে তার মাধ্যমেও মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে অথচ ইসলামে আকীদার তত্ত্ব পেশ করার সাথে তার বাস্তব কর্ম প্রণালীও পেশ করেছে এবং মানুষকে তাত্ত্বিক আলোচনার সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে রাখার পরিবর্তে তাকে জীবনের প্রশস্ত কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলাম মুসলিম জামায়াতের মন মগযের মধ্যে আল্লাহর প্রতি যে বিশ্বাসের ভীত রচনা করেছে, তার ফলে তাদের মধ্যে এক অনমনীয় ঈমানী মনোবল সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলেই তারা একটি সুশৃংখল সমাজ গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। আর এই বাস্তব কর্মপন্থার ঢাল দ্বারা তারা জাহেলিয়াতের অলীক ও অন্ধ আবেগ প্রবণতাকে প্রতিহত করেছে। এমনকি পরবর্তিকালে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরও জাহেলিয়াতের যে সব রসম রেওয়াজ রয়ে গিয়েছিলো ইসলাম সেগুলোরও মোকাবেলা করেছে। মানুষের মন মগয থেকে তার স্বভাব চরিত্র থেকে সে সব কুসংস্কারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে– যা সুদীর্ঘকাল থেকে তাদের মধ্যে শেকড় গেড়েছিলো। এইভাবে সমাজে ইসলামী আকীদার বাস্তবতা ফুটে উঠেছে এবং মানুষ সুস্পষ্টভাবে জেনে নিয়েছে যে, ইসলামী আকীদা কোনো কল্প কুসুম স্বপ্ন নয় অথবা হাওয়ার ওপর নির্মিত কোনো বেওকুফের প্রাসাদও নয়। এ আকীদা হচ্ছে বাস্তব জীবনকে সুন্দর করার এক মৌলিক বিশ্বাস, যার শেকড় রয়েছে মাটির সুদূর গভীরে এবং তার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত রয়েছে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে। সুতরাং এই আকীদা যতো মযবুত হবে, ততোই তার প্রভাবে জীবন আরও সুন্দর, আরও গোছালো, আরও সমৃদ্ধিশালী এবং আরও মধুর হবে!

আজ ইসলামী দাওয়াত দানকারী ব্যক্তিদের এই দ্বীনের প্রকৃতি সম্পর্কে খুব ভালো করে জানতে ও বুঝতে হবে। এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে এবং ওপরে বর্ণিত সকল প্রকার কর্মপ্রণালী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা তাদের থাকতে হবে, যাতে করে তারা বুঝতে পারে, মক্কী জীবনে মুসলমানদের মধ্যে যে আকীদা গড়ে উঠেছিলো পরবর্তী কালে কোনো সময়েই সে বিশ্বাসের ভীত চুল পরিমাণ নড়বড়ে হওয়াও চলবে না। তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এ বিশ্বাস শুধু মনের মধ্যে পুষে রাখলেই চলবে না, বরং এর ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে এক সুন্দর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন, এমন জীবন যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর হবে এবং যা সংবেদনশীল ও পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ ও দরদী এক দল সোনার মানুষ গড়ে তুলবে, যারা পরবর্তী পর্যায়ে গড়ে তুলবে একটি সত্যিকারে সোনালী সমাজ। এরাই হবে বিশ্বে আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সুশৃংখল জামায়াত।

আকীদার এই ভিত্তি গড়ার সময় শুধু তাত্ত্বিকভাবে মানুষকে কিছু শিক্ষা দিলেই চলবে না। বরং এই আকীদার ভিত্তিতে তাদের বাস্তব জীবনে অবশ্যই পরিবর্তন আনতে হবে। ব্যবহারিক জীবনের পরিবর্তন থেকেই বুঝা যাবে যে, তাদের অন্তরের মধ্যে এক নতুন বিশ্বাস কতোটুকু দানা বেঁধে উঠেছে। জাহেলী যামানায় তাদের যে স্বভাব-প্রকৃতি ছিলো এবং যে ভাবে তারা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলো সে জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। এ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই মানবতার বিকাশ ঘটবে, তাদের মধ্যে এমন সব সদগুণাবলী সৃষ্টি হবে, যা হবে গোটা বিশ্বমানবতার জন্যে কল্যাণকর।

www.pathagar.com

কিন্তু পর্যায়ক্রমে মুসলমান সমাজের মধ্যে মারাত্মক যে ভুলটি সংক্রামিত হয়েছে তা হচ্ছে তাওহীদের এ তত্ত্বটি জমাট পাথরের মতো তাদের মনে স্থবির হয়ে রয়ে গেছে। এ বিশ্বাসের বহিপ্রকাশ হিসাবে বাস্তব জীবনে যে পরিবর্তন আসা দরকার ছিলো তা আসেনি। এর ফলে মুসলমান সমাজ নানা প্রকার সমস্যায় ভুগছে, আর এটা অবশ্যই একটি বড় বিপদ।

প্রথম দিকে তাওহীদের আকীদা সম্পর্কে যে কথাগুলো নাযিল করা হয়েছিলো শুধু সেই কথাগুলো শেখানোর জন্যেই যে দীর্ঘ তেরোটি বছর সময় ব্যয় করতে হয়েছে তা নিশ্চয়ই নয়। আসলে আল্লাহ তায়ালা যে কথাগুলো শেখাতে চেয়েছিলেন এবং জীবনের সকল সমস্যার যে সমাধান দিতে চেয়েছিলেন সে সব বিষয় সম্পর্কিত নির্দেশাবলী তো তিনি চাইলে একই সাথে এবং একই সময়ে নাযিল করে দিতে পারতেন, যা হয়তো মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এই দীর্ঘ সময় ধরে পড়তে পারতেন এবং এভাবে তারা ইসলামী চিন্তাধারাকেও ভালোভাবে রপ্ত করতে পারতেন।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা চাননি। আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন ভিন্ন আর একটি জিনিস। তিনি সেই আকীদার ভিত্তিতে প্রথমত একটি দল গড়তে চেয়েছেন, চেয়েছেন একটি আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করতে এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আকীদার সুদৃঢ় ভীত রচনা করতে। রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে আকিদার এমন ইমারত গড়ে তুলতে চেয়েছেন যে ইমারত তাদের জীবনে সকল বিপদ আপদের সামনে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে। কেননা বিশ্বের বুকে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন এমন একটি সংঘবদ্ধ দল, যারা হবে একটি শরীরের অংগ প্রত্যংগের মতো এবং সেই সব অংগ প্রত্যংগের কোনো একটি অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে অপর অংগগুলোও ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠবে, আর আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন, ব্যক্তি ও সমষ্টিকে একত্রে এক দিনে গড়ে তোলা যায় না। মানুষের মধ্যে ঈমান যখন পরিপক্কতা লাভ করে, তখন জামায়াতী জীবনে অবশ্যই তার কার্যকর প্রভাব পড়ে এবং তখনই সে জামায়াত আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। এর জন্যে যেমন প্রয়োজন দলীয় জীবনে সংহতি, তেমনি প্রয়োজন তাদের আকীদা বিশ্বাসের দৃঢ়তা। এর প্রতিটি বিষয়ের নিশ্চয়তা দিতে পারলে অবশ্যই ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হবে।

আল কোরআনের মক্কী সূরাগুলো আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। দ্বীন ইসলামের এই প্রকৃতিকে ভালো করে আমাদের জানতে হবে এবং এর উদ্দেশ্যকে ভালো ভাবে বুঝে নিতে হবে। আর সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা মানবরূপী শয়তানদের ফেরেবে পড়ে বিভিন্ন দার্শনিক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে না পড়ি। কারণ ওই সব মতবাদ আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্যে দিবানিশি নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করে চলেছে এবং আমাদের মন মগযকে নানা প্রকার জটিল প্রশ্নের জালে আবদ্ধ করে ফেলার চেষ্টা করে চলেছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানদের আকীদা নষ্ট করে দিয়ে তাদের গোটা অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দেয়া এবং তাদেরকে তাদের সেই জীবন

www.pathagar.com

লক্ষ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা, যার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন।

এ ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টার মধ্যে যে সব ত্রুটি আছে তাও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে এবং এই ত্রুটির কারণে যে বিপদ আসতে পারে তা বুঝে সে ত্রুটিগুলোকে সংশোধনের জন্যে সচেষ্ট হতে হবে। এভাবে আমাদের আকীদাকে যদি আমরা আবার জীবন্ত রূপ দিতে পারি, এর ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারি একটি সুসংঘবদ্ধ দল, তাহলেই সকল বাতিল মতবাদকে উৎখাত করে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েমের লক্ষ্যে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হবো।

ইসলামী আকীদার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, যখন কারো অন্তরের মধ্যে এ আকীদা স্থান করে নেয়, যায়, তখন তার কাজে, কথায়, ব্যবহারে তার বহিপ্রকাশ অবশ্যই ঘটবে অর্থাৎ তার সব কিছুতেই এই আকীদা জীবন্ত রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে থাকে। সুতরাং আজ যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে মনে করবে, তাদের জীবনের সর্ব বিষয়ে এসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে হবে, ফুটে উঠতে হবে তার সাংগঠনিক তৎপরতায়, সমগ্র সাধনায় এবং সেই সব আন্দোলনধর্মী তৎপরতায় যা বলিষ্ঠভাবে তাকে যে কোনো সংগ্রামে প্রস্তুত করবে। এই কর্মসূচী তার চতুর্দিকের জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তাকে তৈরী করবে। এ সবকিছুই মুসলিম সমাজের মধ্যে আজ বিষফোঁড়ার মতো বিরাজ করছে। এসব জাহেলী রীতি নীতি মানুষের অন্তর ও বুদ্ধিকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করে যে, তারা এর সুদূর প্রসারী গভীর খাদের দিকে নিজেদের অজান্তেই নিজেরা এগিয়ে যায় এবং এইভাবেই তারা একসময় নানা বিভ্রান্তির মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে।

ইসলামী চিন্তাধারা মানুষের মন মগযে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বের চেতনা জাগিয়ে দেয়। তাদের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে, মানুষ ও তার জীবন সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। এ পূর্ণাংগ ধারণা বিশ্বাসের সাথে আবার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তার কর্ম। ইসলামী বিশ্বাসের দাবী হচ্ছে, মানুষ যেন এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার সুপ্ত মানবতাকে জাগিয়ে তোলে, এ মানবতাকে জীবন্ত সংগঠন মাধ্যমে এবং বাস্তব আন্দোলনমুখী তৎপরতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে। এইভাবেই এ আকীদা তার বাস্তব জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাকে সঠিক অবদান রাখতে সাহস ও শক্তি যোগায়।

এর সাথে উন্নত চিন্তাধারা বাতিল ব্যবস্থাকে উৎখাত করে আল্লাহ্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরো বেগবান করে। কারণ একবার এ আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে বাতিলের অগ্রাভিযানকে এগিয়ে নেয়া যা রুখবার জন্যেই আল কোরআনের অবতারণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

'আমি কোরআনকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছি যাতে করে তুমি মানুষকে পড়ে শোনাও থেমে থেমে এবং আমিও এ মহান কেতাবকে ধীরে ধীরে নাযিল করেছি।'

এতে বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ্ তায়ালা চান পৃথক পৃথক করে প্রতিটি শব্দ এমনভাবে যেন পড়া হয়, যাতে করে শ্রোতার তা সঠিকভাবে বুঝতে পারে। আবার তিনি এও চান

www.pathagar.com

যেন প্রতিটি আয়াত থেমে থেমে পড়া হয়, যাতে করে পাঠক ও শ্রোতা উভয়ে ওই কথাগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। একমাত্র এভাবেই যে মত ও পথের সন্ধান আয়াতগুলোতে এসেছে তা মানুষ বুঝতে পারবে এবং সেই অনুসারে তারা কাজ করতে পারবে।

আল্লাহ তায়ালা চান, এই দ্বীনের ধারক ও বাহকরা যেন জানতে পারে যে, এই জীবনব্যবস্থা দানকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং এর মধ্যে যে পথের সন্ধান দেয়া হয়েছে তা আল্লাহরই দেয়া এবং তা মানুষের প্রকৃতির সাথে পুরোপুরিই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ জন্যে মানুষকে বুঝতে হবে যে, আল্লাহপ্রদত্ত এ জীবনব্যবস্থা যেমন মানুষের জীবনকে সুন্দর করতে এসেছে, এসেছে তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে, তেমনি এসেছে মানুষের মধ্যে বিরাজমান নানা প্রকার ভুল চিন্তাধারা থেকে তাকে মুক্ত করতে। আসলে ইসলাম মানুষকে এক নতুন চিন্তাধারা দিয়েছে, যার আলোকে সে এক নতুন জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। এ ব্যবস্থা তার চিন্তাধারার মধ্যে এক অভিনব বিপ্লব এনেছে, যার ফলে সে এক বিশেষ চিন্তার অধিকারী হয়েছে, যা দুনিয়াকেন্দ্রিক মানুষের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নতুন এ চিন্তাধারা যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত, জীবন সঞ্চারী এবং বাস্তবমুখী। কাজেই তার চিন্তাধারা এবং এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জীবনধারা এগুলো কখনই পরস্পর ভিন্নমুখী নয়। বরং এসব কিছু এক রশিতে এমনভাবে গাঁথা যে, একটি বাদ দিলে আর একটির কোনো মূল্য থাকে না। এ ব্যবস্থা যে শুধু প্রথম যুগের মুসলিম সমাজের জন্যেই রচিত হয়েছিলো তা নয়, বরং এ ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে সকল যুগের সকল মানুষের জন্যে এবং যে কোনো মানবগোষ্ঠীর সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে এর থেকে ভালো আর কোনো ব্যবস্থা হতে পারে না।

ইসলামের কাজ মোটেই এটা ছিলো না যে, কিছু লোকের ধর্মীয় বিশ্বাসকে পরিবর্তন করে দিয়ে থেমে যাবে, বরং ইসলাম মানুষের চিন্তা পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে পরিবর্তিত চিন্তার সাথে বাস্তব জীবনের কাজের মিল দেখিয়ে দিতে চেয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে যা প্রয়োজন তা যে একমাত্র ইসলামী চিন্তাধারার মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে তাই প্রমাণ করতে চেয়েছে এবং এ চিন্তাধারা যে মানব রচিত যে কোনো চিন্তাধারা থেকে অধিক বাস্তবমুখী ও ফলপ্রসূ তাও বুঝিয়ে দিয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের পরিকল্পনা যে কী তা বলার ক্ষমতা আমাদের নাই এবং আল্লাহমুখী জীবন যে কী তাও আমরা ভালোভাবে বুঝি না। তবে যে পদ্ধতিতে তিনি আমাদের চিন্তা ও কাজ করতে বলেছেন তা অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য।

কিন্তু আমরা যখন আশা করবো যে, ইসলাম আমাদেরকে নতুন নতুন মতবাদ মেনে চলার স্বাধীনতা দিক তখন আমরা মূলত এর মাধ্যমে আল্লাহর জীবনব্যবস্থার শৃংখলা থেকে বেরিয়ে আসার পর্যায়েই চলে যাবো। এটা অবশ্যই আল্লাহপ্রদত্ত পদ্ধতি বহির্ভূত চিন্তা। এর অর্থ দাঁড়াবে ইসলামকে মানব রচিত মতবাদসমূহের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা। অন্য কথায় এর অর্থ দাঁড়াবে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবে চলার

www.pathagar.com

মতো নয়, এর কার্যক্রম তাবিজ তুমার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। বাস্তব জীবন ব্যবস্থা একমাত্র মানুষরাই দিতে পারে।

ইসলাম সম্পর্কে এই ধরনের চিন্তা করা অবশ্যই মারাত্মক অপরাধ এবং এ হচ্ছে এক বিপজ্জনক কাজ যার পরিণাম ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লাহ প্রদত্ত কর্মপদ্ধতি আমাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তা হচ্ছে আমরা সকলেই ইসলামের দাওয়াতদানকারী। আমাদের কাছে রয়েছে বিশেষ এক চিন্তাধারা। এ চিন্তাধারা বাস্তবায়ন করে আমরা সকলেই পৃথিবীতে প্রচলিত মানবনির্মিত সকল চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হবো। এসব বাতিল চিন্তাধারা আমাদের মন মগযের ওপর অবিরত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে এবং আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি দৈনন্দিন জীবনধারার প্রতিটি বিষয়ের ওপর এর প্রভাব পড়ছে। এমতাবস্থায় যখন সমাজের সর্বত্র বিদ্যমান জাহেলী চিন্তাধারার আলোকে আমরা হীনমন্যতার মনোভাব নিয়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থার যৌক্তিকতা ও প্রয়োগ সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন প্রকৃতপক্ষে, মানবমন্ডলীর কাছে ইসলামী দাওয়াত পৌছে দেয়ার দায়িত্ব থেকে আমরা এমনিই সরে দাঁড়াই এবং আমরা নিজেরাই আমাদের দেশ থেকে এবং আমাদের মন মগয থেকে সেই বাতিল মতবাদকে উৎখাত করার সুযোগ হারাই, যা আজ সর্বত্র তার বিজয় কেতন উড়িয়ে চলেছে।

এই দিক দিয়ে যখন বর্তমান অবস্থার দিকে আমরা তাকাই, তখন আমাদের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হয় এবং এর ক্ষতি যে কত ধ্বংসাত্মক তা চিন্তা করে শেষ করা যায় না।

চিন্তা ও কাজের পদ্ধতি ইসলাম যা দিয়েছে তার মূল্য একজন মুসলমানের কাছে কোনো অংশে কম মনে করার কোনো সুযোগ নেই। তুলনামূলক অধ্যয়নের চিন্তায় যখন ইসলামী ব্যবস্থার পাশাপাশি অন্যান্য মতবাদ অধ্যয়ন করতে চাই, তখন প্রকারান্তরে ধরেই নেই যে, বাস্তব জগতের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ইসলামী ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। আসলে মনের এই কুচিন্তাকে কিছুতেই আমরা একেবারে ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারি না। এমতাবস্থায়, বাস্তবে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে না থাকলে আমাদের মন থেকে এটা কিছুতেই দূর করা সম্ভব নয় যে, 'সকল কাজে ইসলামকে অগ্রাধিকার দেয়া বর্তমান জগতে কিছুতেই উপকারী হতে পারে না।' ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী ইসলামী ব্যবস্থা ও বাতিল ব্যবস্থাকে পাশাপাশি রেখে পড়াশুনা করা। তারা মনে-প্রাণে ইসলামী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী বিধায় এটা তাদের করতেই হবে। বার বার আমি একথার ওপর জোর দিতে চাই যে, ইসলামের মূল বিশ্বাসকে বিজয়ী জীবন ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন যথাশীঘ্র ইসলামী আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করা। কারণ এর মাধ্যমেই ইসলামী আকীদার প্রতি আস্থাবান হওয়ার প্রমাণ পেশ করা যায়।

আমি পুনরায় বলছি, একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাই মানুষের জন্যে তার প্রকৃতি সংগত। এই জীবন পদ্ধতি মানুষের সকল সমস্যা সমাধানে সব থেকে বেশী

www.pathagar.com

কার্যকর এবং মানুষের চিন্তাধারাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার সাথে তার মন মগযে এর সুশীতল পরশ বুলানোর ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা উপযোগী। ইসলামী আন্দোলনে বাস্তবে যোগদান করার পূর্বেই এ মহান 'দ্বীন'-এর আকীদা সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা ও প্রশান্তি লাভ করা খুবই জরুরী। কারণ এই প্রশান্তিই তাকে ধাপে ধাপে কঠিন থেকে কঠিনতর দায়িত্ব পালনে সাহস ও উৎসাহ জোগাবে এবং দ্বীনের তত্ত্বকে বাস্তব রূপ দিতে সাহায্য করবে।

ইসলামী চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এইভাবেই তার মন যখন নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে, তখনই এক দুরন্ত মনের শক্তি পাওয়া যাবে এবং তখনই ইসলামী আইন কানুন চালু করার দিকে তার পা বাড়ানো সহজ হবে। আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোনো কোনো কর্মীর ধমনীতে খুবই চাপ সৃষ্টি করে চলেছে, যার কারণে তারা ইসলামী ব্যবস্থাকে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে দেখার জন্যে প্রচন্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কারণ তাদেরকে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমরা আহবান জানাচ্ছো, তার বিস্তারিত রূপরেখা কী? এ ব্যবস্থা চালু করার জন্যে তোমাদের কাছে কী কী যুক্তি আছে? কী আইন কানুন আছে? আসলে এরা মনের মাঝে নিজেদের আকীদা মযবুত করার পূর্বেই সেই আইনগুলো জানতে চায়। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, মক্কার জীবনে ঈমানের এই স্তরে এসেও তারা আল্লাহ তায়ালার বিধান মানার জন্যে যোগ্য হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন, এই স্তরে তারা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ঈমানকে মযবুত করে নিক এবং তাদের মেযাজের সংগে যখন ঈমান খাপ খেয়ে যাবে, তখনই তাদের জীবনের জন্যে উপযোগী বিভিন্ন আইন কানুন নাযিল করা হবে। কেননা, এই সব আইন কানুনের মধ্যে যে কঠোরতা আছে তখন তাদের পক্ষে তা বরদাস্ত করা সম্ভব হবে।

ইসলামী দাওয়াত দানকারীদের কর্তব্য হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে চাকচিক্যময় কোনো জিনিসের দিকে তারা তাকাবেনা বিভিন্ন কাজ ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা যে জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত নিয়মনীতি পরিত্যাগ করতে পেরেছে, তারা বাস্তবে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। তাদের কর্তব্য হবে সর্বপ্রকার বাধা বিঘ্নের মোকাবেলায় এই দ্বীনের বিধিবিধানের মাধ্যমে তাদের আনুগত্যের প্রমাণ পেশ করা। এই কার্যক্রমই হচ্ছে মুসলমানের শক্তির মূল কথা এবং তা গোটা মুসলিম সমাজেরও শক্তির উৎস।

ইসলামী জীবন বিধানের প্রতিটি জিনিসই হচ্ছে বাস্তব অবস্থার উপযোগী এবং কখনো এ ব্যবস্থার মধ্যে প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করা হয়নি। সত্য এবং ইসলাম এক ও অভিন্ন জিনিস। এই দুই-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। সত্যবিরোধী কোনো নিয়মকেই ইসলাম গ্রহণ করেনি। সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস যেমন অবিচল হতে হবে, তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত সকল আইন কানুনকে চূড়ান্ত ও সুন্দরতম ব্যবস্থা বলে মেনে নেয়াই ঈমানের পরিচায়ক। একইভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হওয়া ও দৃঢ়ভাবে তাতে টিকে থাকাও জরুরী।

www.pathagar.com

ইসলামী আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে এটিই আমার শেষ কথা। এখানে অবশ্য আমি এই কথাটিও বলতে চাই যে, মক্কী যুগে অবতীর্ণ কোরআনুল কারীমের সূরা ও আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহর সত্ত্বা ও অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস, তাঁর ক্ষমতা ও এখতিয়ারের প্রতি বিশ্বাস এবং তিনিই যে সকল ক্ষমতার মালিক একথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা এসে গেছে। অবশ্যই আমি হৃদয় মন দিয়ে একথাটি বুঝতে পেরেছি এবং আমি সর্বান্তকরণে মনে করি যে, যারা ইসলামী দাওয়াতের ধারক ও বাহক তাদের বুঝতে হবে যে, এ পথের রূপরেখা কি, তাদের অবশ্যই এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এটিই সব থেকে সুন্দর পথ এবং এ বিশ্বাসের ওপর তাদের অবিচল হয়ে যেতে হবে। তাদের জানতে হবে যে তাদের কাছে যা আছে তাই ভালো এবং তারাই সবার ওপরে সবদিক দিয়ে মর্যাদাবান। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন, 'নিশ্চয়ই এ কোরআন সেই পথেই পরিচালনা করে, যা সব থেকে মযবুত এবং সব থেকে স্থায়ী।'

এবার আমরা দেখবো সূরাটির মধ্যে পর্যায়ক্রমে আর কী আলোচনা এসেছে।

আসলে এ হচ্ছে একটি বিস্ময়কর সূরা। এ সূরাটি মক্কী যুগে অবতীর্ণ সেই সূরাগুলোর অন্যতম, যা আল কোরআনের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং সেই জীবন পদ্ধতির রূপরেখা তুলে ধরেছে। 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করারও চেষ্টা হয়েছে। কোরআনের সেই বিশেষ স্বাতন্ত্র্যকে এই সূরাটি সংরক্ষণ করেছে, যার বাহ্যিক রূপ প্রতিটি সূরার মধ্যেই বলতে গেলে সমভাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং কোনো ভাবে কারো নযর থেকেই এ বৈশিষ্ট্যটি কখনো বাদ পড়ে না। প্রত্যেক সূরারই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, আর প্রত্যেক সূরার মধ্যে কিছু কিছু সুন্দর দিক এবং এমন কিছু বিষয় আছে যাকে কেন্দ্র করেই সে সূরার অবতারণা করা হয়েছে। তার মধ্যে আলোচনার বিষয়টিকে উপস্থাপনের বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে, রয়েছে এমন কিছু প্রভাবসৃষ্টিকারী ও জীবন্ত চিত্র এবং এমন কিছু ছায়া এমন কিছু পরিবেশ যার জন্যে প্রত্যেকটি সূরাই সমগুরুত্ব সম্পন্ন। এতদসত্তেও কিছু বিষয় এতে বারবার আলোচিত হয় এবং বারবার সেগুলোর উল্লেখ দ্বারা সে বিষয়টিকে মানুষের মন মগযে স্থায়ীভাবে অংকিত করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়কে যখন বারবার তুলে ধরা হয় তখন দেখা যায় সব কিছু মিলে আসলে তা একটিই মাত্র বিষয়, যাকে কেন্দ্র করে আল-কোরআনের অবতারণা, আর তা হচ্ছে মানুষ ও তার জীবন।

এরপরও সূরাটি নিজ স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে একটি মৌলিক বিষয় এখানে তুলে ধরেছে। কোরআনের প্রকৃতিই হচ্ছে নযুলের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পদক্ষেপে এবং প্রত্যেক পরিবেশের মধ্যে যখনই তা নাযিল হয়েছে আপন সুষমায় তা সমৃদ্ধ এক চমৎকার সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। এ সৌন্দর্য মানুষের কোমল অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছে এবং মানুষকেও তা সুন্দর বানিয়েছে। পরিবেশ, পরিবেশের ঘটনাবলী ও মানুষের মন মগযকে সুন্দর করে তুলেছে।

www.pathagar.com

হাঁ, এইই হচ্ছে আসল সত্য। এ মহাসত্যকে আমি আমার অন্তর এবং আমার অনুভূতির মাঝে গভীরভাবে অনুভব করেছি। আমি সূরাটির প্রাসংগিক বিষয়, দৃশ্যসমূহ ও সকল ঘটনা গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করে সেই অনুসারেই আমার আচরণ নির্ধারণ করি। আমি মনে করি পবিত্র এ কালামে আমি যে আনন্দ পাই তা যে কোনো দিলওয়ালা লোকেরাই পাওয়ার কথা। এর রং, রস ও মাধুর্য যে কোনো সজীব প্রাণকেই নাড়া দেয়।

এ সব কিছু এক সাথে মিলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্বের সত্যতা ও সার্বজনীনতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। তাঁর এ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যসহ সকল জীব জন্তুর মধ্যে দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে। তার বিবেকের মধ্যে তারই অস্তিত্ব ফুটে উঠেছে, গোটা দৃশ্য জগতের জানা অজানা রহস্যে তা প্রকাশিত হয়েছে। মহান আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন সৃষ্টির সকল কিছুর মধ্যেই ফুটে রয়েছে, জীব জন্তু ও মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতিতেও তা পরিকল্পিত হচ্ছে। যে বিশাল প্রকৃতি রয়েছে তার প্রতিটি পরতে পরতে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণাদি ছড়িয়ে রয়েছে, এ সব ঘটনাবলী তো প্রতি নিয়ত সংঘটিত হচ্ছে এবং এখানে নিশিদিন তাঁর করুণারাশিও ঝরে পড়ছে অথবা সংঘটিত কোনো বিপর্যয় সেসব কিছুর মধ্যে লুকিয়ে আছে। এইভাবেই মানুষের জীবন ও তার স্থায়িত্ব, তার বাস্তব অবস্থা ও আশা আকাংখা, বিশ্বপালকের কুদরত ও সৃষ্টি নৈপুণ্য সব কিছু মিলে প্রতিনিয়ত তাকে তার প্রভুত্ব ও প্রতিপালন ক্ষমতা সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছে। সবশেষে কেয়ামতের দিন কিভাবে গোটা মানবমন্ডলী তাদের সৃষ্টিকর্তার সামনে উপস্থিত হবে আল কোরআন তাও তুলে ধরছে।

সূরাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতো কিছু আলোচনা হয়েছে তার মূল কথা হচ্ছে মানুষের আকীদা বিশ্বাস। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর যে ক্ষমতা বিরাজ করছে সূরাটি সে বিষয়েও বিশদভাবে আলোচনা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আলো ও অন্ধকার উভয়ের অস্তিত্ব, এই মহা সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান চাঁদ, সূর্য ও তারকারাজি, রয়েছে এর মধ্যে সুউচ্চে স্থাপিত বাগ বাগিচা এবং নিম্ন ভূমিতে বিরাজিত সব্জি বাগান, মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়া ও পৃথিবীর দিকে দিকে তার প্রবাহিত হওয়া, কোনো কোনো এলাকায় এই পানির মজুদ হয়ে থাকা এবং কোনো এলাকা শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হওয়া আল্লাহর নেয়ামত। স্থল ও পানি ভাগের অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকার সব কিছুর আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করা, অনুপস্থিত ও উপস্থিত সব কিছুর রহস্য উদঘাটন মুর্দা থেকে যিন্দার আগমন এবং যিন্দা থেকে মৃত জিনিসের বের হয়ে আসা, মাটির নীচে অন্ধকারের মধ্যে বীজ লুকিয়ে থাকা সবই আল্লাহর নেয়ামত। অন্ধকারাচ্ছন্ন মাতৃজঠরে শুক্রবীজের অবস্থান করা এবং দলে দলে মানুষ, জ্বিন, পক্ষীকুল, জীবজন্তু, প্রথম ও শেষের সব মৃত ও জীবিত এবং রাত ও দিন সদা সর্বদা মানুষের হেফাযত করা সবই মহান আল্লাহর মহান দান।

মানুষের মধ্য থেকে একদল মানুষ আজ প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে এবং এসব কিছু তাদের অনুভূতি রাজ্যে সৃষ্টি করেছে প্রচন্ড এক আন্দোলন। এর

www.pathagar.com

গূঢ় রহস্য বুঝার জন্যে তারা তাদের সমস্ত শক্তি ও মনোযোগ নিয়োগ করে চলেছে। তারপর যে সব প্রাণ মাতানো নতুন জিনিস তাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সেইগুলো হাসিল করার জন্যে তাদের মনের মধ্যে তীব্র আকাংখা ও ব্যাকুলতা পয়দা করা হচ্ছে। এরপর যখন এই সব প্রিয় জিনিস তাদের দুয়ারে হাযির হয় তখন তাদের হৃদয়পটে নব চেতনার উন্মেষ ঘটানো হচ্ছে, তাদের মনে হয় সম্ভবত ধরনের জিনিসের সংস্পর্শে তারা বুঝি এই প্রথম এলো। অন্য মানুষরা ইতিপূর্বে এর সন্ধান কখনও নাকি পায়নি।

তাদের মনের এ অবস্থাকে, তাদের আচরণকে এবং তাদের সার্বিক অবস্থাকে একটি শ্রোতস্বিনী নদীর সাথে তুলনা করা যায় এর উত্তাল তরংগের আঘাতে দুকূল ছাপিয়ে উঠছে। এক তরংগ থেমে যাওয়ার সাথে সাথে সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন আর এক তরংগ। একটির পর আর একটি তরংগ আসছে, আর তা আছড়ে পড়ছে বালিয়াড়ির ওপরে।

এইভাবে উপর্যুপরি আসা এই অশান্ত ঢেউ মনের ওপর অভূতপূর্ব এক উন্মাদনা সৃষ্টি করছে, যার মধ্যে যুগপৎ ভয় ও তীব্র আবেগ রয়েছে। এর সাথে শীঘ্রই আমরা ইনশাআল্লাহ আরও কিছু বিষয় বর্ণনা করবো, যার সাথে এই প্রসংগের গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। ভীতিজনক হলেও সেগুলোতে আরও সৌন্দর্যের বহু নিদর্শন রয়েছে, রয়েছে প্রাণোচ্ছলকারী কিছু সজীবতা এবং রয়েছে ছবির মতো ফুটে ওঠা কিছু ঘটনা, এগুলো আমাদের যে কোনো কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করতে উৎসাহ যোগাবে।

আমরা এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমরা কিছুতেই এ সূরার মধ্যে বর্ণিত আসল কথাগুলোকে কারো অন্তরের মধ্যে বসিয়ে দিতে পারবো না। তবে আমরা সূরাটির প্রাসংগিক আলোচনা যেমন আছে, তেমনিকরেই উপস্থাপন করতে পারি মাত্র, আমরা শুধু এতোটুকু করতে পারি যে, এ মহান কোরআন থেকে যারা দূরে সরে গেছে, তাদের কাছে এ সকল প্রকার যুক্তি তুলে ধরতে পারি, যাতে করে আল্লাহর এ কোরআনকে হৃদয়ংগম করতে পারে এবং সে অনুযায়ী তারা জীবন গড়তে পারে।

আল কোরআনের পরিবেশে জীবন গড়ার অর্থ শুধু কোরআন চর্চা, কোরআন পাঠ এবং অপরকে কোরআন শেখানোই নয়। কোরআনের পরিবেশে বাস করার দ্বারা আমরা শুধু এই কাজটুকু করার কথাই বুঝাতে চাইনি। আমরা চেয়েছি মানুষের জীবন ও জীবনের প্রতিটি বিষয় আল কোরআনের শিক্ষা অনুসারে গড়ে উঠুক। আমরা চেয়েছি, যে পরিবেশে আল কোরআন নাযিল হয়েছিলো, আজ যদি অনুরূপ পরিবেশ বিরাজ করে, তাহলে সেই পরিবেশকে যেনো আল কোরআন সেই ভাবেই ঢেলে সাজাতে পারে যেমন করে অতীতে সাজিয়েছিলো। যেন সেইভাবে মানুষের অন্তর, কাজ ও ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে যেমন করে অতীতে তা সম্পন্ন করেছিলো। সেই সামাজিক সংহতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা আজো প্রতিষ্ঠা করতে পারে যেমনটি করে আল কোরআনের আলোকে অতীতে মানুষ করতে সক্ষম হয়েছিলো। আল কোরআনের আলোকে মানুষ সেইভাবে আধুনিক জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করতে পারে যেমন করে অতীতে মোকাবেলা করেছিলো। আমরা চাই আল কোরআন আর একবার রুখে দাঁড়াক, রুখে দাঁড়াক আধুনিক জাহেলিয়াতের সকল চিন্তাধারার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে, এর সর্বপ্রকার প্রচারনার বিরুদ্ধে। সর্বপ্রকার চাপ প্রয়োগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ওই চাপের বিরুদ্ধে কোরআন যুদ্ধ ঘোষণা করুক। কোরআন চায় রাব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস গড়ে তোলার পর মানুষরা তার পথেই চলবে। আল্লাহর প্রতি পূর্ণাংগভাবে বিশ্বাস স্থাপন করার ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর পথে টিকে থাকার জন্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা, সংগ্রাম ও দৃঢ়তা প্রদর্শনের পর তার পথ ধরেই চলবে এবং অন্যদেরকেও এই পথে আসার জন্যে আহবান জানাবে। এইই হচ্ছে আল কোরআনের সেই পরিবেশ, যেখানে মানুষের পক্ষে সুখে-শান্তিতে বাস করা সম্ভব। এ ধরনের পরিবেশ স্থাপিত হলে সেখানে মানুষ আল কোরআনের স্বাদ অনুভব করবে। এটিই হচ্ছে সেই পরিবেশ, যার মধ্যে আল কোরআন নাযিল হয়েছিলো এবং এই অবস্থার মধ্যেই ইসলাম কাজ করেছে। আজকে যারা এই ধরনের পরিবেশে বাস করে না, তারা প্রকৃতপক্ষে কোরআনুল কারীম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, যতোই তারা কোরআন চর্চা করুক, কোরআন পড়ুক এবং অপরকে কোরআনের জ্ঞান দান করুক না কেন তাতে কোনো কল্যাণ হবেনা।

এ ব্যাপারে যারা আগ্রহী হবে তাদের ও কোরআনের মাঝে প্রকৃত যোগসূত্র ততোদিন পর্যন্ত কায়েম হবে না– যতোদিন ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে তারা বাস্তবে এই চেষ্টাকে কার্যকর না করবে। এইভাবে যখন এ মহান কেতাবকে তারা ব্যবহার করবে, তখনই তারা কেতাবের স্বাদ পাবে এবং তারা সেই বাঞ্ছিত ফল পাবে যা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন।

এ সূরাটি যে মৌলিক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে, তা হচ্ছে প্রভুত্ব ও দাসত্বের বিষয়। আলোচনা করেছে মনিব প্রতিপালকের সাথে বান্দাদের সম্পর্কের নিরূপণ করার বিষয়টি। কে তিনি? এ সৃষ্টির উৎস কি? এ সৃষ্টির উর্ধে কোন অজানা রহস্য রয়েছে? এই বান্দারাই বা কারা? কে তাদের অস্তিত্ব দান করলেন? কোন সেই মহান স্রষ্টা যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? কে তাদের প্রতিনিয়ত খাবার দিচ্ছেন? কে তাদের দেখাশুনা করছেন? কে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করছেন? কে তাদের অন্তর ও চোখগুলো পরিচালনা করছেন? কে তাদের জন্যে রাত ও দিনকে আবর্তিত করছেন? কোন উদ্দেশ্যে তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন? আর কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি তাদের এখানে যিন্দা রাখবেন এবং কবে তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন এগুলোর আলোচনা এসেছে এখানে। এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা সৃষ্টি মল্লিকার বিভিন্ন ফুলগুলোকে, কে সাজিয়ে রেখেছেন? এই যে মুষলধারার বৃষ্টি, এই যে প্রাণ মাতানো ফুলকুঁড়ি, এই যে পরতে পরতে সাজানো খাদ্য শস্য, এই যে অন্ধকারের চাদর ভেদকারী তারকারাজির রশ্মি, এই যে স্নিগ্ধ প্রভাতের শুভাগমন, দীর্ঘ রজনী এবং সন্তরণশীল নৌযানগুলো– এ সব কিছু কার পরিচালনায় চলছে? কার অদৃশ্য হাত ক্রিয়াশীল রয়েছে এ সবের পেছনে? রয়েছে এ সবের পেছনে কোন সে মহা রহস্য? এই যে জাতিসমূহ, এই যে যুগের পর যুগ ধরে মানুষের আনা-গোনা, ধ্বংস ও পুনর্গঠন– কে আছে এ সব কিছুর পেছনে! কে এগুলো ধ্বংস করছেন, আবার কে এগুলো পুনরায় গড়ছেন? একদিন কেনই বা তিনি সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবেন তা ভালো করে ভেবে দেখতে হবে।

www.pathagar.com

মানুষকে এ সব কিছুর পরিচালনার দায়িত্ব দান করা এবং সে সঠিকভাবে তা পরিচালনা করছে কিনা, তার পরীক্ষা নেয়ার পেছনেই বা কোন রহস্য রয়েছে? পরিশেষে ধ্বংস করে দেয়ার পর কী হবে তার শেষ পরিণতি? কেমন হবে তার হিসাব-নিকাশ?

এ সব প্রশ্নের সাথে দিগন্তব্যাপী আরো যতো প্রকার প্রশ্ন হতে পারে সেসব কিছুকে সূরাটি বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঠকের অন্তরে তুলে ধরেছে, তুলে ধরেছে অত্যন্ত গভীরভাবে। এ সব প্রশ্ন মক্কার সেই পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে গভীরভাবে জড়িত, যার প্রেক্ষাপটে আল কোরআন এ আলোচনা করেছে। পেছনের পাতাগুলোতে কিছু কিছু আলোচনা ইতিমধ্যেই এসে গেছে। সেখানে আমরা আল কোরআনের প্রদত্ত রূপরেখা অনুসারে কিছু বক্তব্য রাখতে প্রয়াস পেয়েছি। এখানে কখনও আমি স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিনি বা নিজেদের মনগড়া কোনো আকীদা পেশ করিনি। মন মগযকে পেরেশানীর মধ্যে ফেলতে পারে এমন কোন দার্শনিক তর্কের অবতারণাও করিনি। সদা সর্বদা আমাদের লক্ষ্য থেকেছে মানুষকে তার প্রকৃত মালিকের সাথে পরিচিত করে দেয়া, যাতে করে এই পরিচিতি মানুষকে তার মনিবের গোলামীতে আবদ্ধ করতে পারে, তাদের বিবেক ও আত্মাকে রাব্বুল আলামীনের সামনে নত করে দিতে পারবে।

সূরাটির মধ্যে আলোচনার গতি পুরাপুরিভাবে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকেই ধাবিত হয়েছে। একথাটি অকাট্য সত্য যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই রেযেকদাতা, তিনিই মালিক মনিব, তিনিই সব কিছু করতে সক্ষম, তিনিই যাবতীয় ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই চোখের অন্তরালে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে সে সব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। তিনি সকল হৃদয় ও দৃষ্টিকে তেমনি করে পরিবর্তন করেন যেমনি করে তিনি আবর্তিত করেন দিন ও রাত্রিকে। বান্দার জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিচালক যে তিনিই তা এইভাবেই প্রমাণিত হয়ে যায়। কেউ নেই যে কোনো বিধান অথবা ফয়সালা দিতে পারে, আর কেউ নেই এমন যে কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম করতে পারে। এই সব ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার নামই হচ্ছে উলুহীয়্যাত বা 'সার্বভৌমত্ব'। এই হচ্ছে শব্দটির আসল বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন কেউ নেই যে গোটা মানবমন্ডলীর জীবনে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে, এমন নেই কেউ যে যিন্দা করতে পারে বা মারতে পারে, ক্ষতি বা উপকার সাধন করতে পারে। কিছু দিতে পারে বা বন্ধ করতে পারে, না ইচ্ছামতো দুনিয়া ও আখেরাতে নিজে কোনো কিছুর মালিক হতে পারে, না অপরকে মালিক বানাতে পারে। সূরাটির প্রাসংগিক আলোচনায় যে সব দৃশ্য ও ঘটনাবলীর উল্লেখ হয়েছে, রোজ হাশরের যে চমৎকার বর্ণনা আছে তাতে একাধারে পাঠকের মন চমৎকৃত হয়, তার প্রাণ ভয় ও ভীতিতেও ভরে উঠে। এ জীবন্ত ও প্রাণস্পর্শী দৃশ্য মনকে ভক্তি শ্রদ্ধায় আপ্লুত করে দেয় আর পাঠকের মাথাকে আনুগত্যের অনুভূতিতে ঝুঁকিয়ে দেয় এবং তার মনকে সকল সংকট ও সকল আশা আকাংখার দুয়ার থেকে গুটিয়ে নিয়ে আসে।

www.pathagar.com

সব থেকে বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এ সূরার মধ্যে বিবৃত হয়েছে তা হচ্ছে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য ও মালিকানার বিষয়টি। এ আলোচনা যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি গভীর, তেমনি ব্যাপক এবং তেমনি সুদূর প্রসারী।

তৎকালীন মুসলিম জামায়াতের জীবনে যেসব সমস্যা ছিলো সেগুলোর এমন হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করা হয়েছে যার আলোকে যে কোনো সময়ের সমস্যাসংকুল মানুষরাই তাদের সঠিক পথটি নিরূপণ করতে পারবে, আর তা হচ্ছে জাহেলী যামানায় মানুষের মনগড়া প্রথা অনুসারে কোনো খাদ্য বা যবাই করা পশুকে হালাল বা হারাম করা অথবা কোনো কিছুকে পরিহার করা এবং সেগুলোর মধ্যে মানুষের জন্যে যেগুলো ক্ষতিকর নয় সেই সব জন্তু মানত করার বিষয়, আরো আছে পশু যবাই, সন্তানাদি ও ফল-মূল সম্পর্কিত কথাবার্তা মানত সংক্রান্ত কথাগুলোকে সূরাটির একেবারে শেষের দিকে রাখা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং, খাও সেই সব পশুর গোশত যেগুলোকে আল্লাহর নামে যবাই করা হয়েছে যদি প্রকৃতপক্ষে তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। কি হলো তোমাদের, কেন তোমরা খাচ্ছো না সেই সব পশুর গোশত যেগুলোকে আল্লাহর নাম নিয়ে যবাই করা হয়েছে! যে সব জিনিসকে তিনি তোমাদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন সেগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে তো তিনি বিস্তারিতভাবে জানিয়েই দিয়েছেন। .... আর শয়তানের গোষ্ঠী তো সদা সর্বদা তাদের সংগী সাথীদের প্ররোচিত করেই চলেছে যেন তারা তোমাদের সাথে নানা প্রকার কূটতর্কে লিপ্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায়, তাদের কথামতো যদি তোমরা চলো, তাহলে অবশ্যই তোমরাও মোশরেক (শেরকের গুনাহের মধ্যে লিপ্ত) হয়ে যাবে।...... তিনি নিশ্চয় অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।' (আয়াত ১১৮-১২১ এবং ১৩৬-১৪০)

বর্তমান মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত অবস্থা দেখলে মনে হবে, তারাও এখন প্রাচীন জাহেলিয়াতের মতো আচারণ করে চলেছে। এ ছাড়াও অন্য যে বড়ো সমস্যাটি সর্বত্র বিরাজ করছে, তা হচ্ছে প্রভুত্ব ও দাসত্বের সমস্যা। এ নিয়ে গোটা সূরাটির মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন আলোচনা এসেছে আসলে এই বিষয়টিই মক্কী সূরাগুলোর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এবং মাদানী সূরাগুলোর মধ্যে যেখানে সংগঠন ও আইন কানুনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেও এ বিষয়ের ওপর সঠিকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

মুসলমানদের জামায়াতটি সূরাটির বর্ণনা ও প্রভাবপূর্ণ কথাগুলোকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করার জন্যে আগ্রহ সহকারে এগিয়ে এসেছে, সাথে সাথে তারা জাহেলিয়াতের প্রচলিত নিয়মনীতি ও রীতিপ্রথা বর্জন করেছে তাদের একথাটি জানানো হয়েছে যে, কিভাবে তারা ইসলামী আইন মেনে চলবে এবং ইসলামী আকীদাকে কিভাবে মনের মধ্যে দৃঢ়তার সাথে পোষণ করবে। সে আকীদার মূল কথা হচ্ছে প্রভুত্ব ও দাসত্ব সম্পর্কিত কথাটি। এই বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও চেতনার ওপর নির্ভর করবে লোকটি ঈমানের ওপর টিকে আছে, না কুফরীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে, না জাহেলিয়াতের কুহেলিকার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে এখনো

www.pathagar.com

হাবুডুবু খাচ্ছে। এই মুসলিম জনপদের কাছে আমরা সেই দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরছি যা এই সূরার মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এরপর এ প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা আসছে যাতে করে এই দ্বীনের প্রকৃতি সম্পর্কে অন্তরে স্থির বিশ্বাস জন্মায় এবং দ্বীনের এ অর্থটি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, আর সে বিষয়টি হলো, জীবনের ছোটো খাটো অংশের ব্যাপারেও সরাসরি আল্লাহর কর্তৃত্বের কাছে নিজেকে সোপর্দ করা। এটা না করা হলে শুধু ওই ছোট জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহর শাসন ক্ষমতাকে অমান্য করাই বুঝাবে– তা নয়, বরং সম্পূর্ণ দ্বীন থেকে তার খারিজ হয়ে যাওয়াই বুঝাবে।

এ কথার ওপর মুসলিম উম্মাহকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে– জীবনে সকল বিষয়– বেশী গুরুত্বপূর্ণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ, ছোটো বা বড়ো, সর্ব বিষয়ে দ্বীনের নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে– গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে নিজেদেরকে মূল মালিকের সাথে, যেহেতু সারা পৃথিবীর সর্বত্র তাঁরই নিরংকুশ শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে এই উম্মতের দায়িত্ব, যেমন করে সারা বিশ্বের ওপর তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা অনিরুদ্ধভাবে কার্যকর রয়েছে।

সূরার মধ্যে, পশু, ফসল ও মানত সম্পর্কে জাহেলী যুগের রীতি নীতির সমালোচনা করা হয়েছে। সমালোচনা করা হয়েছে সরাসরিভাবে– যাতে করে এসব রীতি নীতির প্রতি আল্লাহর প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ পায় এবং এগুলোকে চিরদিনের জন্যে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। সর্বোপরি হালাল হারাম বিধান দেয়ার ব্যাপারেও বান্দার যে কোনো এখতিয়ার খাটানোর অধিকার নাই এটা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাদের জানিয়ে দেয়া যে আল্লাহর আনুগত্যই হচ্ছে সরল সঠিক ও মযবুত পথ। এ পথ যে পরিহার করবে সে দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। এর পূর্বের আয়াতগুলোতে ধর্মীয় প্রতীকসমূহ সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে তার পরিপূরক হিসাবে নীচে আরও কিছু বর্ণনা আসছে,

'আর তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্ত্বা যিনি সুউচ্চে অবস্থিত বাগ-বাগিচা গড়ে তুলেছেন আরও গড়ে তুলেছেন এমন বাগিচা যা মাটিতে অনুচ্চ .... তিনি তোমাদেরকে চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছেন যাতে করে তোমরা ভয় করে চলতে পারো। (আয়া ১৪১-১৫৩)

এমনি করে আমরা দেখছি জীব জানোয়ারের গোশতের হারাম বা হালাল হওয়া এবং পশু ও ফলমূল মানত করার ছোট-খাটো বিষয়েও ফয়সালা দেয়া হয়েছে। সন্তানাদি উৎসর্গ করার বিষয়ে পরিষ্কার বিধান দেয়া হয়েছে। কেননা ইতিপূর্বে তারা জাহেলী যামানার অনুসরণে ভুল পথে চলছিলো। আল্লাহ তায়ালা ও শয়তানের পথে চলার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে দেখানো হয়েছে কিসে আল্লাহর রহমত আসে এবং কি কারণে মহান আল্লাহর অসন্তোষ নাযিল হয়। আরো বলা হয়েছে– আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্বের সাক্ষ্য দিতে হবে, তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই বলে বিশ্বাস করতে হবে, তাঁর দেখানো মযবুত ও সোজা পথে চলতে হবে। আরো আলোচনা এসেছে

www.pathagar.com

আল্লাহর অসীম করুণা ভরা পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্যে মানুষের মনে নানা প্রকার ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়ার মানসিকতার ওপর।

একই এলাকায় সমুন্নত স্থানে বাগিচা এবং নিম্নভূমির বাগিচার মধ্যে সৃষ্টি ও যিন্দা করার যে হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা এসেছে– বর্ণনা এসেছে খেজুর ও বিভিন্ন রংয়ের ফসলের, যায়তুন ফলের এবং ডালিমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং সাদৃশ্যবিহীন বিভিন্ন ফলের। আরও দেখতে পাই এ সূরাতে যেমন সাক্ষ্য দান করার মতো কিছু জিনিস রয়েছে তেমনি রয়েছে সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো কিছু বিষয় বস্তুও। আরও রয়েছে মোশরেকদের প্রতি শাস্তির বর্ণনা।

এইভাবে গোটা সূরাটির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে নানান দৃশ্যের বর্ণনা, কিন্তু এর সাথেই দেখা যায় কোনো রকম উদারহণ পেশ না করেই সরাসরি আকীদার বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা। এ সকল বর্ণনার মধ্যে রয়েছে দ্বীন ইসলামের প্রতি মানুষকে এগিয়ে দেয়ার প্রেরণামূলক কথাবার্তা।

আলোচ্য সূরাটিতে আইনকানুন এবং শাসনক্ষমতা কার হতে হবে সেই বিষয়েও কিছু ইংগিত রয়েছে। এ হচ্ছে সেই প্রসংগ, যার সম্পর্কে আমরা বলতে চাই যে, এ সূরাটির বর্ণনা ও আলোচ্য বিষয়ের প্রভাবে বহু লোক দলে দলে ইসলামের দিকে এগিয়ে এসেছে এবং সারা বিশ্বে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের লক্ষ্যে এ চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা এখানে এসেছে। আসলে, আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের বিষয়টিই সারা সূরা জুড়ে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে রয়েছে, সুতরাং বুঝা গেলো যে, দ্বীনের মূল কথাও এইটিই এবং ছোটো-বড়ো সকল জনপদে এবং জীবনের সকল বিষয়ে তারই আইন চালু করাই এর লক্ষ্য।

এখন আমরা সূরাটির মধ্যে আলোচিত বিষয় ও বৈশিষ্ট্যগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পূর্বে সংক্ষেপে আরো কিছু কথা রাখতে চাই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আসমা বিনতে ইয়াযেদ জাবির, আনাস ইবনে মালেক এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে যে রেওয়ায়েতগুলো পাওয়া গেছে তাতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, সূরাটি মক্কী যিন্দেগীতে অবতীর্ণ হয়েছে এবং গোটা সূরাটি এক সাথেই নাযিল হয়েছে।

অবশ্য এসব রেওয়ায়াতে সূরাটি নাযিল হওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখের কথা বলা হয়নি অথবা বর্ণনাধারার মধ্যেও এমন কোনো ইংগিত নাই যাতে করে মক্কী যুগের কোন সময়ে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে। তবে এটা বুঝা যায় যে, এটি সূরায় আল হাজর-এর পর নাযিল হয়েছে এবং সম্ভবত এটির ক্রমিক নম্বর হচ্ছে পঞ্চান্ন। কিন্তু এটাও সত্য যে, সূরায় আল বাকারার অবতীর্ণ কাল সম্পর্কে যেভাবে বলা সম্ভব হয়েছে ওইভাবে অন্যান্য সূরা নাযিলের নির্দিষ্ট তারিখ বা সময় ঠিকমতো বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে কোনো সূরার বর্ণনাক্রম অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা শুরু হওয়ার সময়টিই বলতে পেরেছি, সম্পূর্ণ সূরা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়ে কিছু বলতে পারিনি। এমনও অনেক সময়ে দেখা গেছে লেখার সময়ে

www.pathagar.com

প্রথম দিকে অবতীর্ণ কোনো কোনো অংশকে পরবর্তীতে অবতীর্ণ অন্য কোনো অংশের পরে রাখা হয়েছে, কারণ এটিই ছিলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং অর্থের দিক দিয়ে তাকে বেশী উপযোগী মনে করা হয়েছে। এইভাবে পূর্বে বা পরে নাযিল হওয়ার যে তথ্য আমরা এখানে পেশ করছি তাতে ক্রমধারার বর্ণনার অধিক অন্য কোনো পার্থক্য এ সূরাগুলোর মধ্যে নাই, যেহেতু মক্কী এ সব সূরার লক্ষ্য একই, আর তা হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত দান এবং মোশরেকদের সাথে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হওয়া, এর প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায় তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং রসূল (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার এক হীন প্রয়াস। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটির প্রধান ভূমিকা ছিলো যে হারে বিরোধীরা সত্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছিলো তিনিও ততো জোর দিয়ে ইসলামী আকীদার প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন।

এই প্রসংগে ইবনে আব্বাস এবং কাতাদা থেকে একটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়েছে, গোটা সূরাটিই মক্কায় অবতীর্ণ। মাত্র দুটি আয়াত মাদানী যুগে নাযিল হয়েছে, আর সে দুটি হচ্ছে,

'তারা আল্লাহকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেনি যখন ..... করার জন্যে ছেড়ে দাও।' (আয়াত ৯১)

এই আয়াতটি দু'জন ইহুদী মালেক ইবনে সয়েফ এবং কা'ব ইবনে আশরাফ-এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছিলো। আল্লাহর আর একটি বাণী হচ্ছে—

'তিনিই সেই মহান সত্ত্বা .....পছন্দ করেন না।' (আয়াত ১৪১)

এই আয়াতটি সাবেত ইবনে কায়েস শামস আল আনসারী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, অবশ্য ইবনে যোরায়েয এবং মাওয়ারদী বলেন, আয়াতটি মোয়ায ইবনে জাবাল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

আয়াতটির ব্যাপারে প্রথম রেওয়ায়াত এসেছে সম্ভবত এই জন্যে যে, এর মধ্যে মূসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ কিতাবের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এ কিতাব হচ্ছে মানবমন্ডলীর জন্যে হেদায়াত ও নূর অর্থাৎ এটি হচ্ছে পথপ্রদর্শক এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের আলো। এ আয়াতটিতে ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমরা এ কিতাবকে কিছু কাগজের সমষ্টি বানিয়ে নিয়েছো যা তোমরা প্রকাশ্যভাবে দেখাচ্ছো।' যদি মোজাহেদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর থেকে বর্ণিত রেওয়াতগুলোর দিকে খেয়াল করা হতো, তাহলে ওরা বুঝতে পারতো, 'আল্লাহ তায়ালা কিছুই নাযিল করেননি'। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কার মোশরেকরা। কেননা আয়াতটি পড়া হয়েছে এইভাবে,

'বলো, কে নাযিল করেছে সেই কিতাবটি যা গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে হেদায়াত ও নূর হিসাবে মূসা নিয়ে এসেছে? তারা এ কিতাবকে কিছু কাগজের সমষ্টি বানিয়ে নিয়েছে এবং এর কিছু অংশ তারা প্রকাশ করছে আর অনেকাংশকে গোপন রাখছে।' সুতরাং এ কেরাতে বুঝা যায় যে, আয়াতটি দ্বারা ইহুদীদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের নিজেদের সম্বোধন করা হয়নি। এই কারণেই মনে করা হয় আয়াতটি সম্ভবত মক্কায় অবতীর্ণ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় আয়াতটির প্রসংগ চিন্তা করলে আয়াতটিকে মাদানী মনে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ এ আয়াতটিকে আলাদা রাখলে পূর্বের আয়াতটির অর্থ ও শব্দগুলো মনে হয় বাদ পড়ে যায়। রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে তিনি ওপরে অবস্থিত বাগ বাগিচা ও পশুর মধ্য থেকে আরোহণের বস্তু এবং বিছানো জিনিস (শাকসব্জি) বানিয়েছেন। (আয়াতটির মূল শব্দগুলো দ্রষ্টব্য।) তারপর প্রসংগ এগিয়ে চলেছে 'আনয়াম'সম্পর্কিত কথাটিকে পূর্ণাংগ করার দিকে। 'আনয়াম'(অর্থাৎ গৃহপালিত পশু) কথাটিকে 'ফলমূল'-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কিছু মিলে আসলে বিষয় একটিই দাড়ায় যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। অপরদিকে যারা এই সূরাটিকে মাদানী মনে করেছেন তারা এই আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন,

'খাও এর ফল থেকে যখন এ বৃক্ষ ফল দিতে শুরু করে এবং যে দিন এর ফল পাড়া হবে সেদিন এর হক আদায় করো।'

'হক' দ্বারা তারা বুঝেছেন 'যাকাত'। আর যাকাত মাদানী যিন্দেগীতে ফরয হয়েছিলো এবং তার পরিমাণও ওই সময় নির্ধারিত হয়েছিলো। এই কারণে সূরাটি অবশ্যই মদীনার জীবনে নাযিল হয়েছিলো বলে বুঝা যায়। কিন্তু 'হক' শব্দ দ্বারা একমাত্র এ অর্থটিই এ আয়াতে বুঝতে হবে এটা জরুরী নয়, যেহেতু হাদীসে এর তাফসীর করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটিতে যাকাত নয়; বরং সদকার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফল পাড়ার সময় যারা সেখানে হাযির হবে বা ওই পথ দিয়ে যাবে অথবা আত্মীয়-স্বজন যারা আশেপাশে থাকবে, তাদেরকে ওই ফসল বা ফল থেকে খেতে দিতে হবে। এরপর যাকাতের সীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, ফল বা ফসলের এক-দশমাংশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে দিতে হবে। সুতরাং, সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে আয়াতটি মক্কী যেহেতু কোনো পরিমাণের কথা এখানে বলা হয়নি।

সা'লাবী বলেন, ছয়টি আয়াত ব্যতীত সূরায়ে আনআমের বাকি সব অংশই মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ ছয়টি আয়াতের মধ্যে 'তারা আল্লাহ তায়ালাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ণ করতে পারেনি'– থেকে তিনটি আয়াত এবং 'তোমাদের মালিক তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন– তা আমি পড়ে শোনাই'– থেকে তিনটি আয়াত।

প্রথম আয়াতগুলোকে আমরা মক্কী বলেছি, অথচ এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতগুলোকে যতোটা মক্কী মনে হয় প্রথম আয়াতটিকে ততোটা মনে হয় না।

দ্বিতীয় আয়াতগুলো সম্পর্কে যতোটা জানা যায়, কোনো সাহাবা বা তাবেঈ একে মাদানী বলেননি এবং এগুলোর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেও এমন কিছু নাই যার কারণে এগুলোকে মাদানী বলা যায়। আয়াতগুলোতে পশু যবাই, মানত ও হালাল হারাম সংক্রান্ত জাহেলী যুগে প্রচলিত কিছু চিন্তাধারা সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আমরা এ আয়াতগুলোকেও মক্কী বলেই বুঝেছি।

দু'জন খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সম্পাদিত কোরআনের কপিগুলোতে নিম্নলিখিত আয়াতগুলোকে মাদানী বলা হয়েছে, ২০, ২৩, ৯১, ৯২, ১১৪, ১৪১,

www.pathagar.com

১৫১, ১৫২, ১৫৩। আবার ৯১, ৯২, ১৪১ এবং ১৫১–১৫৩ আয়াতগুলোকেও মাদানী বলা হয়েছে। আর ২০, ২৩, ১১৪ আয়াতগুলোর কারণে ধারণা করা হয় যে, সূরাটি হয়তো মক্কী। তবে আহ্লে কিতাবদের কথা আসাতে আবার মাদানী বলেও মনে হয়। কিন্তু এটাও সত্য, অনেক মক্কী সূরা এবং আয়াতের আহলে কিতাবদের কথা পাওয়া যায়।

এ সব কিছুকে সামনে রেখেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, গোটা সূরাটি একই রাতে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আসমা বিন্‌তে ইয়াযীদ, আর একটি রেওয়ায়েতে শুধু আসমা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, একই সময়ে সূরায়ে আনয়াম নবী (স.)-এর ওপর নাযিল হয়, আর সে সময় আমি তার উঁটের লাগাম ধরে (দাঁড়িয়ে) ছিলাম এবং তখন আমার মনে হচ্ছিলো ওহীর চাপে উটের হাড়গুলো ভেংগে যাচ্ছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীসটি তাবারানী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, সূরায় আনআম মক্কা শরীফে এক রাতে একই সময়ে সম্পূর্ণ নাযিল হয়। এ সময়ে এই শহরের চতুর্দিকে সত্তর হাজার ফেরেশতা জোরে জোরে তাসবীহ পড়ছিলেন।

ওপরের হাদীস দুটি ওই হাদীস থেকে বেশী জোরদার– যার দ্বারা এ সূরার কোনো কোনো আয়াতকে মদানী বলা হয়। এর কারণ হচ্ছে, এর মধ্যে ওই সব জিনিস হালাল হওয়া সম্পর্কে কথা রয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ ওপরে দেয়া হয়েছে।

বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, সূরাটির বর্ণনাধারাতে গ্রহণ ও বর্জনের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাতে অন্তরের মধ্যে এক প্রেরণা সৃষ্টি হয়, অথবা মনে হয় এ যেন এক স্রোতস্বিনী ছোট্ট নদী, যার গতি পথে কোন বাধা নাই। সূরাটিতে আয়াতগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এতো ঘনিষ্ঠ মনে হয় যে, প্রতিটি আয়াতের কথাগুলো অপর আয়াতের কথা দ্বারা আরও মযবুতভাবে প্রমাণিত হয়।

সূরাটির আলোচ্য মূল বিষয়বস্তু ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সূচনাতে কিছু ইংগিত দিলাম। এ বিষয়ে বিস্তারিত আরও কিছু কথা বলা জরুরী বোধ করছি।

আবূ বকর ইবনে মারদুওয়ায় আনাস ইবনে মালেকের বরাত দিয়ে একটি হাদীস পেশ করেছেন। এতে রসূল (স.) বলেছেন, সূরায় আনয়াম নাযিল হওয়ার সময় পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত প্লাবিত করে ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর তাসবীহ গাইতে গাইতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে নেমে এলেন, তখন তাদের তাসবীহর গুরণে পৃথিবী মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হচ্ছিলো। রসূল (স.)-ও এ সময়ে বারবার পড়ছিলেন, সোবহানাল্লাহিল আযীম, সোবহানাল্লাহিল আযীম।

ফেরেশতাদের সারিবদ্ধভাবে এই আগমনের বার্তা যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সূরাটির প্রতিটি আয়াতে। এ মহান দৃশ্য, প্রাণ মাতানো এ ঘটনা এবং আশ্চর্য এ অবস্থাটি এতোই সুন্দর– যার সাথে কোন কিছুর তুলনা করা মুশকিল। যেমন আমরা ইতিপূর্বে

www.pathagar.com

বলেছি যে, প্রাণ উজ্জীবনকারী এ অবস্থা ও এ দৃশ্যকে একমাত্র তুলনা করা যায় এক স্রোতস্বিনী নদীর সাথে যা বয়ে যায় দিবা-নিশি, আর তা ভক্তের হৃদয়কে সুরময় এক জগতে নিয়ে যায়। এ নদীতে জোয়ারের সময় প্রচন্ড ঢেউ সৃষ্টি হয়, যা উপর্যুপরিভাবে অবিরাম গতিতে বালিয়াড়ির ওপরে আছড়ে পড়তে থাকে। এক ঢেউ শেষ হতে না হতে আবার আর এক ঢেউ উঠে আসে। এইভাবে এক ঢেউয়ের পানি অপর ঢেউ-এর সাথে মিলিত হতে হতে অপর ঢেউটি বিলীন হয়ে যায়।

মূল যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সূরাটির আলোচনার ধারা এগিয়ে চলছে তা এমন শক্তিশালী যে যতো কথা বা পার্শ্ব বিষয় এর মধ্যে এসেছে তার সবগুলোই এই মূল ধারার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। এ জন্যে কোনো বিষয়কে মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার এখানে সুযোগ নেই। এটা হচ্ছে এমন এক ঢেউ যা এসে কিনারায় আছড়ে পড়ার সাথে সাথেই উঠে আসে আর এক ঢেউ এবং আগের ঢেউ পরের ঢেউয়ের সাথে মিশে আপন অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। এইভাবে সকল ঢেউ মিলে একে অপরকে পূর্ণাংরূপ দান করে চলেছে। এই জন্যেই আমরা সূরার মধ্যে আলোচিত বিষয়গুলোকে পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা না করে এর সকল অংশকে এক সাগরের বিভিন্ন ঢেউয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে তুলনা করে বুঝতে চেয়েছি।

সুরাটি শুরু হয়েছে সেই মোশরেকদেরকে সম্বোধন করার মাধ্যমে, যারা আল্লাহর সাথে আরও অনেককে প্রভুত্ব কর্তৃত্বের মালিক হিসাবে গ্রহণ করেছিলো। এজন্যে ওদেরকে সম্বোধন করে সর্ব প্রথম আল্লাহর একত্ব, সার্বভৌমত্ব, একচ্ছত্র আধিপত্য ও সকল ক্ষমতার নিরংকুশ মালিকানা যে একমাত্র তাঁরই সে বিষয়ে ওদের বিবেককে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার জন্যে প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের আশ্রয় নেয়া হয়েছে, এমন কি তাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যে যে একই নিয়মের সুর ধ্বনিত হচ্ছে তাও তাদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে তাদেরকে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। তিনটি আয়াতের মাধ্যমে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা হয়েছে– যা আকাশ, বাতাস, পৃথিবীতে ও নভোমন্ডলের সবকিছুর সাথে জড়িত। এসব জিনিসের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনটি প্রধান জিনিসের ওপর আলোচনা করা হয়েছে যা এই মহাসৃষ্টির সব কিছুকে ঘিরে রেখেছে।

'সকল প্রশংসা ও কৃতিত্ব মহান আল্লাহর, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং বানিয়েছেন অন্ধকার ও আলো। এতদসত্তেও কাফেররা তাদের মালিকের সাথে অন্য জিনিসকে সমান বানাতে চায়। তিনিই তো তোমাদের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তারপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন তোমাদের জীবন কালের সময়টিকে.....। '(আয়াত ১-৩)

ওপরের তিনটি আয়াতের মাধ্যমে সৃষ্টি জগতের সাথে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাহদের তাঁর গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা জানাচ্ছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতটিতে গোটা সৃষ্টির সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। এর পর তৃতীয় আয়াতটিতে দেখানো হয়েছে যে, মহান আকাশ ও পৃথিবীর সবখানে আল্লাহর

www.pathagar.com

প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব ছড়িয়ে রয়েছে। এই আয়াত তিনটির মধ্যে কী চমৎকার, কী সুন্দর, কী সামগ্রিক এবং কী ব্যাপক কথা প্রকাশ করা হয়েছে তা ভেবে দেখার মতো।

একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সামনেই রয়েছে গোটা সৃষ্টিজগত, সেই সৃষ্টিজগতের সামনে দাঁড়িয়ে বাঁচার তাগিদে মানুষ নানা প্রকার চেষ্টা তদ্বীর করে চলেছে। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তারা রুজি রোজগারের চেষ্টায় রত– যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সম্রাট, যার হাতে সকল প্রভুত্ব কর্তৃত্ব নিবদ্ধ। যার হাতে রয়েছে গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু এবং যাবতীয় রুজি রোজগারের চাবিকাঠি। সেই মহান সত্ত্বার সামনেই মোশরেকদের শেরক স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থাপনার মধ্যে সেই ব্যক্তির কোনে মর্যাদা নাই, যে আল্লাহর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে, তার নিজের কাছেও তার কোনো সম্মান নাই এবং বিবেকের কাছেও সে এর কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না।

এখানে অস্বীকারকারীদের জন্যে নিম্নলিখিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর চরম শাস্তি ও তাদের ভীষণ কদর্য অবস্থার কথা জানানো হয়েছে। বান্দার এ ধরণের ভূমিকার কারণে তার প্রতি সব দিক থেকে শুধু ধিক্কার আর ধিক্কার নেমে আসে। এক সময় সে নিজেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়, কিন্তু মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতা ও মহিমা সমুজ্জ্বল হয়েই অক্ষুণ্ন থাকে। তার এই কুফরী মনোভাব সত্য অস্বীকারকারীদেরকে সত্যের সামনে শ্রান্ত-ক্লান্ত ও হতাশগ্রস্ত হতে বাধ্য করে এবং তার কাছে ও এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সে কোনো যুক্তি বা দলীল-প্রমাণ দ্বারা সে তার অবস্থানকে মযবুত বানাতে পারেনি, বরং নিছক তার খোশ খেয়ালের বশবর্তী হয়ে সে সত্যের বিরোধী হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের রব প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্যের পক্ষে যে কোনো নিদর্শন এসেছে, তাকে তারা অস্বীকার করেছে, সত্য সমাগত হওয়ার পরেও তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। সুতরাং সত্যের সাথে যে ঠাট্টা মস্কারি তারা করেছে তার ফল ভোগ করার খবর শীঘ্রই আসছে .... পৃথিবীতে একটু ভ্রমণ করে দেখো, সত্যদের কী করুণ পরিণতি হয়েছে অতীতে। (৪-১১) আয়াতগুলোর তর্জমা দেখুন।

এখানে প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের মূল তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সেই তৃতীয় বিবৃতিটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে যা হৃদয়ের মধ্যে এক প্রচন্ড তুফান সৃষ্টি করে, অন্তর-মনকে আলোকিত করে তোলে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছুর ওপর আল্লাহ পাকের মালিকানার তীব্র অনুভূতি তাকে বিমোহিত করে তোলে। সে যেন দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পায় মহান রেযেকদাতাকে, গভীরভাবে সে অনুভব করে যে একমাত্র তিনিই তাকে তার সকল প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করেন। একমাত্র তিনিই হচ্ছেন তার দরদী অভিভাবক। তিনি ছাড়া আর কেউ নাই, একমাত্র তাঁর কাছেই বান্দা আত্মসমর্পণ করতে পারে এবং শুধু তাঁর কাছেই নিজেকে সে সঁপে দিয়ে শান্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারে। তাই সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর কাছেই নিজেকে বিলিয়ে দেয়া বান্দার একমাত্র কর্তব্য। নাফরমানদেরকে পরকালে অবশ্যই তিনি সমুচিত শাস্তি দেবেন। তিনিই ভালো মন্দ সব কিছুর মালিক, তিনিই সব কিছু করতে সক্ষম এবং তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনিই বিজ্ঞানময়– তিনিই খবর রাখনেওয়ালা।

www.pathagar.com

রসূল (স.) দাওয়াতের সূচনা করার পর থেকে মোশরেকদের যে বিরোধিতা ও হঠকারিতা চলে আসছিলো তা এতোদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিলো যে, আত্মীয়তা ও প্রতিবেশির যে নৈকট্য ছিলো তাও সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। রসূল (স.) একাধারে তাদেরকে তাদের হঠকারিতার জন্যে সতর্ক করে যাচ্ছিলেন। জানাচ্ছিলেন যে, তিনি শেরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং ঐকান্তিকতা ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা দ্বারা আল্লাহর একত্বের (তাওহীদ) ঘোষণাও তিনি করে চলেছিলেন। এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে এগুলো কার? বলে দাও, এগুলো আল্লাহ্‌র .... তোমরা যে সব শেরক করে চলেছ এগুলো থেকে আমি সম্পূর্ণ সম্পর্কমুক্ত।' (আয়াত ১২-১৯)

এরপর শুরু হচ্ছে ওই মোশরেকদের হঠকারিতার চতুর্থ পর্যায়। এই পর্যায়ে এসে তারা এই নতুন কিতাব সম্পর্কে আহলে কিতাবদের মন্তব্য তুলে ধরে এ কিতাবটিকে মিথ্যা বলে দাবী করছিলো। এই জন্যেই তাদের এই শেরককে সব থেকে বড় অন্ধকার বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, রোজ হাশরে সেই ভয়ংকর সমাবেশে মোশরেকদেরকে হাযির করা হবে এবং তাদেরকে তাদের সেই কল্পিত দেবতাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যাদেরকে তারা আল্লাহর ক্ষমতায় অংশীদার মনে করতো। তখন তারা শেরক করেছিলো বলে অস্বীকার করবে এবং তখন তারা বুঝতে পারবে তাদের মিথ্যা বলার পরিণতি কতো কঠিন। সেদিন তাদেরকে ঈমান আনার কথা বলাও হবে না এবং তারা ঈমান আনতেও পারবে না। তাদের অন্তরের ওপর পর্দা পড়ে থাকবে। কারণ দুনিয়াতে তারা কোরআন সম্পর্কে বলছে যে, এতো প্রাচীন কালের কাহিনী মাত্র, আর তুমি তাদের সম্পর্কে বেদনাহত হৃদয়ে বলেছো, হায়! এই কথা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে। তারা নিজেরা তো ঈমান আনবেই না, অপরকেও তারা ঈমান আনতে এবং হেদায়াতের পথে চলতে নিষেধ করছে। এরই ফল স্বরূপ তাদেরকে দোযখের আগুনের কিনারায় হাযির করা হবে। তাদের এই অবস্থাটি কতো ভয়াবহ হবে তা একবার চিন্তা করে দেখুন। তখন তারা বলবে, হায় আফসোস! আমাদেরকে যদি একবার দুনিয়ার জীবনে ফিরিয়ে দেয়া হতো তাহলে অবশ্যই আমরা সেখানে ফিরে গিয়ে আমাদের রবের আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত না করে আমরা মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম! আসলে দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে যদি ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে একই ভাবে পুনরুত্থান ও আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার বিষয়টিকে আবারও তারা অস্বীকার করতো। তারপর একইভাবে পুনরায় তাদেরকে দোযখের কিনারায় দাঁড় করানো হতো এবং তাদের ওই অবস্থাটিরই পুনরাবৃত্তিই হতো। এইভাবে তাদের হঠকারিতার ফলে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত কালে তাদেরকে যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তার বর্ণনা এখানে শেষ হচ্ছে। শেষ হচ্ছে এ বর্ণনাও যে আল্লাহভীরু লোকদের জন্যে দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় হবে সম্পূর্ণ বেমজাদার; এরশাদ হচ্ছে,

'যাদেরকে, আমি এই কেতাবটি দিয়েছে তারা অবশ্যই এ কেতাবকে সেইভাবে চেনে যেমন করে তাদের ছেলেদেরকে তারা চেনে ....আর, দুনিয়ার এই জীবন

www.pathagar.com

খেল-তামাশা ছাড়া তো আর কিছুই নয় এবং অবশ্যই আখেরাতের উত্তম ঘর তাদের জন্যে, যারা আল্লাহ ভয় করে চলে। তোমরা কি বুঝছো না?' (২০-৩২ পর্যন্ত ও তরজমা দেখুন)।

এরপর আসছে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরবর্তী তরংগের বর্ণনা। এই তরংগের মধ্যে রসূল (স.)-এর কর্ম প্রণালীর দিকে বিশেষ নযর দেয়া হয়েছে। এ সময়ে কাফেরদের অত্যাচার চরম রূপ নেয়ায় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং তাঁকে ও তাঁর কাছে অবতীর্ণ আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা প্রমাণের জন্যে যে অপচেষ্টা চালানো হচ্ছিলো তার কারণে রসূলুল্লাহ (স.)-এর দুঃখ ভরা মনের ভারকে লাঘব করার জন্যে আলোচ্য আয়াতগুলোর অবতারণা করা হয়েছে। এসব আয়াতে জানানো হচ্ছে যে, আল্লাহর নিয়ম অমোঘ এবং অপরিবর্তনীয়। তাদের অস্বীকৃতির কারণে রসূলুল্লাহ (স.) যদি সবর করতে না পারেন, তাহলে মানুষের চেষ্টার মতো তিনিও অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর চেষ্টা করুন! আল্লাহ তায়ালা চাইলে মানুষদের হেদায়াতের পথে একত্রিত করে দেবেন। এর জন্যে তো সৃষ্টির বুকে তাঁরই ইচ্ছার প্রধান্য ও বিজয় প্রয়োজন। কারণ একমাত্র তিনিই কোনো পরিবর্তন আনার জন্যে হুকুম বা ফায়সালা দান করতে পারেন। একবার তাঁর ইচ্ছা বা মর্জি হয়ে গেলে সব বিরোধিতা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন তারা হয়তো হিসাব করবে যে তাদের কোনো প্রচেষ্টাই তাদেরকে মৃত্যু ও আল্লাহর মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবেনা, আর মরণের পর হেদায়াতের পথ গ্রহণ করায় কোনো কাজও হবে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি জানি যে কথাগুলো ওরা বলে চলেছে .....এরপর তাদেরকে (আল্লাহর কাছে) ফিরিয়ে নেয়া হবে। (আয়াত ৩৩ -৩৬)

এইভাবেই সূরাটির আলোচ্য বিষয়গুলো এগিয়ে চলেছে মহাসাগরের ঢেউয়ের মতো। প্রাণে দোলা দেয়ার মতো বাক্যগুলো একটির পর আর একটি এগিয়ে আসছে। এইভাবে সূরাটির বক্তব্য আমাদের মনে বারবার দোলা দিয়ে যাচ্ছে। এসব কথা আমাদের মনকে আন্দোলিত করছে, যার ফলে অনেক সময় বহু কঠিন ঝুঁকি নিতেও আমাদের মন প্রস্তুত হয়ে যায় এবং বড়ো থেকে বড়ো দুর্ঘটনাও সহ্য করাও আমাদের কাছে সহজ হয়ে যায়। কিন্তু সুরাটির প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন আরবের যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এটি অবতরণকালে শ্রোতাদের মাঝে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছে তার সব কিছু স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয় বিধায় আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের দিকে ইংগিত দিয়ে যাচ্ছি মাত্র।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য সূরাটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক পদ্ধতিতে তার মৌলিক বিষয়টিগুলোকে তুলে ধরেছে। সেখানে ইসলামী দাওয়াতের কঠিন দুঃসময়ের প্রতিটি মুহূর্তগুলো দেখানো হয়েছে। এখানে প্রতিটি বিষয় এবং প্রতিটি দৃশ্যই ছিলো এমন চরম অবস্থার বহিপ্রকাশ যা মনকে শক্তি যোগায়, অনুভূতিকে সযত্নে জাগিয়ে তোলে। সূরার বিষয়বস্তু, দৃশ্যসমূহ ও ঘটনাগুলো যখন সামনে আসে, তখন অবশ্যই প্রাণ উদ্দীপিত হয়।

www.pathagar.com

এবারে আমরা সূরার মধ্যে যেসব যুক্তিপূর্ণ কথা রয়েছে সেগুলোকে একটির পর একটি পেশ করছি, এগুলো আল কোরআনের চমৎকার বর্ণনাভংগির সাক্ষ্য বহন করছে, আর তা হচ্ছে ঈমানী শক্তির হৃদয়স্পর্শী গুণ যা মানুষের মনে এমনভাবে দাগ কাটে যার কোনো তুলনা নেই।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের পক্ষে তাদের মনীবকে জানা ও তাঁর আনুগত্য করা– এইগুলো হচ্ছে সুরাটির মূল বক্তব্য বিষয়। সুতরাং এই সব বিষয় সূরাটির বিভিন্ন স্থানে কিভাবে আলোচনা করা হয়েছে, আসুন তা দেখা যাক।

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দান করা এবং যারা এ কথার বিরোধী তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা এ কাজ যারা করতে পারবে– তাদের অন্তরে পুরোপুরি ঈমান প্রবেশ করেছে বলে মনে করতে হবে। এই বলিষ্ঠ ঈমানের দ্বারাই মোমেনরা বিরোধীদের মোকাবেলা করে এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তারা এর দাওয়াত দেয়। আল্লাহর বাণী;

'বলো, আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে আমার অলী বা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবো? .... বলো, একমাত্র তিনিই সর্বময় ক্ষমতার মালিক, আর আমি সম্পর্ক-মুক্ত ওই সব জিনিস থেকে, যেগুলোকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করো।' (আয়াত ১৪-১৯)

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে এই সূরার মধ্যে বেশ কয়েক স্থানে আল্লাহর ধমক রয়েছে। ওই সব ধমক থেকে বান্দাদের ওপর সার্বিকভাবে আল্লাহর ক্ষমতার কথা প্রকাশ পেয়েছে, তাদের সামনে বিশ্বপ্রকৃতি উন্মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে অজ্ঞানতার যে অন্ধকার তাদের মনে পুঞ্জীভূত ছিলো তা দূরীভূত হয়ে যায়। তারা তাদের প্রকৃত মালিক যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি রুজু হয় এবং তাদের অন্তরও আল্লাহমুখী হয়ে যায়, তাতে যতো বিপদ আসুক না কেন এবং মিথ্যাবাদীরা যতোই তাদের বিরোধিতা করুক না কেন, তাতে তাদের কোনোই পরওয়া থাকে না। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, যদি তোমাদের ওপর হঠাৎ করে আল্লাহর আযাব এসে যায় অথবা কেয়ামতই যদি সংঘটিত হয়ে যায়, সে অবস্থায় তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে (সাহায্যের জন্যে) ডাকবে কি? বলো, জওয়াব দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো?....... বলো, তোমরা কি চিন্তা করেছো.......?' (আয়াত ৪০-৪৭)

সূরাটির তৃতীয় দৃশ্য হচ্ছে আল্লাহর ক্ষমতার বর্ণনা। তিনি গায়বের খবর ও গোপন সকল তথ্য সম্পর্কে জানেন। সকল মানুষের সকল অবস্থা একমাত্র তিনিই ওয়াকেফহাল। তিনি শক্তি প্রয়োগ করে সব কিছু করার অধিকার রাখেন এবং জলস্থলের সব কিছুর ওপর তাঁরই ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত। রাত-দিন, জীবন মৃত্যু সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

www.pathagar.com

'আর তাঁর কাছেই রয়েছে গায়বের চাবিকাঠি, যার খবর তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না ...... শোনো, হুকুম দেয়ার মালিক একমাত্র তিনিই... ।' *(আয়াত ৫৯-৬২)*

সূরাটির চতুর্থ দৃশ্য হচ্ছে প্রকৃতির বিষয়াবলী দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করা এবং এ জিনিসগুলো আল্লাহর দিকে মানুষকে পথ দেখায়। তাদের সামনে তা স্পষ্ট করে সঠিক পথের দিশা তুলে ধরে এবং সৃষ্টির সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর কথা তাদের জানিয়ে দেয়। এসব নিদর্শন সৃষ্টির গোপন রহস্যের গভীরে প্রবেশ করার জন্যে যেন আহ্বান জানায়,

'স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বললো, আপনি কি মূর্তিগুলোকে মা'বুদ বানিয়েছেন? .... যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি। তাদের জন্যেই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। (আয়াত ৭৪-৮২)

সূরাটির পঞ্চম ভূমিকা হচ্ছে, দুনিয়ার বুকে পৃথক পৃথকভাবে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন প্রকার রহস্য ভরা জিনিস সম্পর্কে আলোচনা করা যা মানুষের হৃদয়ে প্রচন্ড কম্পন জাগায়। প্রকৃত পক্ষে এসব দৃশ্যের মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রভাত বেলার মৃদু সমীরণ ও গোধূলি বেলার স্নিগ্ধতা সৃষ্টিকর্তার স্নেহের পরশ বয়ে আনে, সুদূর নীল আকাশে তারকারাজির লুকোচুরি খেলা এবং লুকিয়ে থাকা গোপন রহস্য, মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে পর্যাপ্ত পানির সরবরাহ এবং সেখানে মুষলধারে বৃষ্টিসিঞ্চিত ফসলের সমারোহ, গাছ-গাছালি ও পাকা পাকা ফলের দৃশ্য- এসব কিছুই লা শরীক আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দেয়। সাথে সাথে, আল্লাহর ক্ষমতায় যারা অন্য কাউকে শরীক বানাতে চায়, বানাতে চায় তার পুত্র পরিজন, তাদের দাবীর অসারতা প্রকাশ করে দেয় বুদ্ধি ও বিবেক ধিক্কারের সাথে প্রত্যাখ্যান করে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকারী দানা ও আঁঠিযুক্ত ফসল ও ফলমূলের....... কোনো চোখ তাঁকে দেখতে পায় না, অবশ্য তিনি চোখগুলোকে দেখেন।' (আয়াত ৯৫-১০৩)

সূরাটির সর্বশেষে বলা হয়েছে, এখানে পরিবেশিত এসব দৃশ্যের ছবি বিদগ্ধ হৃদয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা ও নম্রতা জাগায়, আর সব কিছু থেকে মুক্ত করে তার মনকে লা-শরীক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় এবং এভাবেই সে নিজেকে নামাযের মধ্যে সঁপে দেয়। সে বলে, 'আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সবই তোমার জন্যে হে আমার মালিক'। এ সময়ে তার হৃদয়ে অন্য কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ করতে প্রচন্ড ঘৃণা জন্মে, সে জানে একমাত্র তিনিই সকল কিছুর প্রতিপালক। এরপর তার মনে বিশ্বাস জন্মায় যে দুনিয়ায় তার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন ও তৎসংশ্লিষ্ট পরীক্ষা এবং আখেরাতে হিসাব গ্রহণ ও প্রতিদানপ্রাপ্তির বিষয়গুলো সব কিছুই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে পেশ করা হবে। এই ভাবে সূরাটির উপসংহারে নিবেদিত চিত্তের

www.pathagar.com

একাগ্রতা ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং চূড়ান্ত বিনয় ও নম্রতার এক প্রশান্ত ছবি ভেসে ওঠে। এরশাদ হচ্ছে,

'(হে রসূল) বলো, অবশ্যই আমার রব তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন সরল সঠিক ও মযবুত পথ, সে পথ হচ্ছে পরম নিষ্ঠাবান ইবরাহীমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় জীবন ব্যবস্থা, আর কিছুতেই সে মোশরেক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো না .... নিশ্চয়ই তোমার রব দ্রুত শাস্তি-দানকারী, আবার তিনিই মাফ করনেওয়ালা– মেহেরবান। (আয়াত ১৬১-১৬৫)

উপরে আমরা যে ছয়টি উদাহরনের দিকে ইংগিত করেছি এগুলো সবই সূরাটির মধ্যে বর্ণিত প্রসংগের চমৎকার এবং অত্যাশ্চর্য কিছু দৃশ্য, যার প্রতিটি উপস্থাপনা, প্রতিটি ঘটনা এবং প্রতিটি সঞ্জীবনী কথা মনকে আকৃষ্ট করে।

এইভাবেই শেষ হচ্ছে সেই সব প্রাণবন্ত কথাগুলো, যা আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটির মধ্যে বলতে চেয়েছিলেন। আলোচনায় আমরা ওয়াদা করেছিলাম যে, 'আল-কোরআনের বর্ণনাভংগি সর্বত্র 'গোছালো ভাব' রয়েছে– এর দ্বারা আমরা কি বুঝেছি সে বিষয়ে কয়েকটি কথা পেশ করা,

এ পর্যায়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করার পর আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই, যাতে করে কোরআন থেকেই একথাগুলোকে বিস্তারিতভাবে বুঝে নেয়া যায়। তিনটি বিষয় আমরা এখানে আনতে চাই যা সূরাটির আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল,

সূরাটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনাধারা রয়েছে, কিন্তু তার সবগুলোরই লক্ষ্য হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যকে জোরালো ভাবে পেশ করা। তাই প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সূরায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে ব্যক্ত কথাগুলোকে যে কোনো শ্রোতার কাছে মনে হবে ওই কথাগুলো যেন তাকেই সম্বোধন করে উচ্চারিত হচ্ছে। যেন পর্দার আড়াল থেকে কেউ তাকেই অনুপ্রাণিত করছে।

আয়াতগুলো পাঠ করার সাথে সাথে মনে হয় যেন কেয়ামত ও হাশরের ময়দানে হাযির হওয়ার দৃশ্যগুলো পাঠকের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তুমি যদি সেই সময়ের অবস্থা দেখতে পেতে যখন দোযখের আগুনের সামনে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে, তখন তারা বলতে থাকবে, হায় আফসোস, আমাদেরকে যদি আর একবার ফেরত পাঠানো হতো....... ।'

'আর যদি তোমরা সেই অবস্থা দেখতে পেতে.......তোমরা দুনিয়ার বুকে করে এসেছো।' (আয়াত ২৭)

'আর যদি তুমি যালেমদের মৃত্যুর বিভীষিকার দৃশ্যটা দেখতে পেতে .... ।' (আয়াত ৯৩)

'আর সেই দিনের কথা একবার ভেবে দেখো যখন মহান আল্লাহ তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং তারপর মোশরেকদেরকে বলবেন, কোথায় তোমাদের সেই

www.pathagar.com

শরীকরা যাদেরকে তোমরা আল্লাহর ক্ষমতায় অংশীদার মনে করতে। এই পরীক্ষার জবাবে তখন তারা বলবে, আল্লাহর কসম, হে আমাদের রব, না, আমরা কিছুতেই মোশরেক ছিলাম না। দেখো, তারা কেমন করে নিজেদের বিরুদ্ধেই মিথ্যা কথা বলবে.........।'

আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার কথা অস্বীকার করার কারণে তিনি কতো কঠিনভাবে ধমক দিচ্ছেন তাও লক্ষ্য করার মতো। তার শাস্তির সামনে তাদেরকে এমনভাবে দাঁড় করানো হবে যে, তাদের কাছে মনে হবে, তারা পরস্পরকে কিছুটা সাহায্য করার একটা সুযোগ পেয়ে গেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, ... যদি আল্লাহর আযাব তোমাদের ওপর এসে যায় তখন কি আল্লাহ ছাড়া তোমরা আর কাউকে সাহায্যের জন্যে ডাকবে, বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো ....।'

'বলো, তোমরা কি একবার ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের শোনার শক্তি ও দেখার ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরের ওপর যদি সীল মেরে দিয়ে তোমাদের বুঝার ক্ষমতাও শেষ করে দেন, সে অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কে আছে এমন যে এসব ক্ষমতা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবে ....?'

হেদায়াত পাওয়ার পর আবার গোমরাহীতে ফিরে যাওয়ার উদাহরণ দিতে গিয়ে এমন কিছু দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে যার সামনে দাঁড়িয়ে যে কোনো শ্রোতা অবশ্যই ক্রোধে নিজেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবে, যদিও এসব দৃশ্যের সামনে দাঁড়ানোর জন্যে কাউকে সরাসরি হুকুম দেয়া হয়নি, অথবা তাদের কাউকে সেখানে থামতে ইশারাও করা হয় নাই। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, আমরা কি আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে (সাহায্যের জন্যে) ডাকবো ....এসো আমাদের কাছে।' (আয়াত ৭১)

এমনি করে সূরাটির বর্ণনাধারার মধ্যে সুন্দর করে যে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, সে সব দৃশ্যের সামনে যখন কেউ দাঁড়ায়, তখন তার সামনে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের ভান্ডারের বর্ণনা এক প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে সে ব্যক্তি তখন জান্নাতের রং-বেরং-এর ফলের মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করতে থাকে। এরশাদ হচ্ছে, 'আর তিনিই বর্ষণ করেছেন আকাশ থেকে (বৃষ্টির) পানি........ সেই জাতির জন্যে যারা ঈমান আনে। (আয়াত ৯৯)

এইভাবে সূরাটির সকল দৃশ্য ও বক্তব্য পর্যায়ক্রমে ফুটে উঠেছে। বিরোধীরাও তাদের কাজের মাধ্যমে এগুলোর প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করেছে।

সূরাটির মধ্যে বর্ণিত কেয়ামতের দৃশ্যগুলোকে এমন কঠিনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, মোশরেক ও মিথ্যা দাবীকারীদের ওপর ওই কঠিন শাস্তিগুলো যে অবশ্যই আসবে তার মধ্যে আর কোনোই সন্দেহ থাকে না। ইতিপূর্বে এর কিছু উদাহরণও পেশ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে– 'আর তুমি যদি দেখতে:'

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি উদাহরণের মধ্যে আকীদা বিশ্বাসকে মযবুত বানানোর জন্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং শরীয়তের আইনের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। গুরুত্বের দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে এ দু'টি বিষয় আসলে একই।

সূরাটির শুরুতে আকীদা সম্পর্কে কথা বলার সময়ে এ বিষয়টি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 'বলো, সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে এর থেকে বড় জিনিস আর কি হতে পারে? বলো, আমার ও তোমার মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী। আর আমার কাছে একথাগুলো এই জন্যে নাযিল হয়েছে যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ বাণী পৌঁছুবে, তাদের সবাইকে যথাযথভাবে সতর্ক করে দিতে পারি। আল্লাহর সাথে প্রভুত্ব-কর্তৃত্বের মালিক হওয়ার ব্যাপারে আরও কেউ ক্ষমতাধর আছে বলে কি তোমরা দেখতে পাচ্ছো? বলে দাও, না, আমি এমন কাউকে দেখছি না। বলো, একমাত্র তিনিই সকল ক্ষমতার মালিক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী .... ।' (আয়াত ১৯)

সূরাটির মধ্যে হালাল হারামের বিধানকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করার পর অন্য আর একটি প্রমাণ পেশ করা হলো, আর আহ্বান জানানো হলো এই বিশেষ বিষয়ের সাক্ষ্যের প্রতি, যাতে করে মূল আলোচ্য বিষয়ের দিকে এর ধারা ফিরিয়ে দেয়া যায় এবং কোরআনুল করীমের সাধারণ ব্যাখ্যার সাথে তা পুরো সামঞ্জস্যশীল হয়,[১]

'বলো, নিয়ে এসো তোমাদের সেই সাক্ষীদেরকে, যারা এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা এগুলো হারাম করেছেন।...... আর যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছে..... তুমি তাদের সাথে মিলে তাদের ওই খামখেয়ালীপনার অনুসরণ করো না।'

এসব বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে তৃতীয় যে চমক লাগানো কথাটি পাওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে, এর প্রাসংগিক যে ব্যাখ্যা এসেছে তা আয়াতের মূল বক্তব্য বিষয়ের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। আর এই বক্তব্যগুলোর বারবার উল্লেখ করার মাধ্যমে এ কথাটিই দৃষ্টান্ত হিসাবে ফুটে উঠেছে যে, একটি মাত্র সত্যকেই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আয়াতে পেশ করা হয়েছে।

কাফেরদের সম্পর্কে সূরার শুরুতে এভাবে বর্ণনা এসেছে যে, তারা অন্যদের আল্লাহর সমান বানাতে চায়। এখানেও বর্ণনাটি সেইভাবেই এসেছে। তারপর, সুরাটির শেষের দিকেও এসেছে এই রকমই আর এক ব্যাখ্যা– তা এসেছে সেই সব লোকের জন্যে যারা নিজেরাই নিজেদের জন্যে আইন তৈরী করে এবং এইভাবে আইন তৈরীর কাজে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাতে চায়। নিম্ন-বর্ণিত আয়াতটিতে এই কথাটিই বলা হয়েছে,

'আল্লাহরই সমস্ত কৃতিত্ব ও প্রশংসা, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন.... এরপরও যারা কুফরী করে তারা অন্য কাউকে তার সমান বানাতে চায়।'......

১. দেখুনঃ আত্তাসবীরুল ফান্নিউ ফিল কুরআন– আত্তানাসুক্ক–অধ্যায়

www.pathagar.com

প্রথম আয়াতে দেখা গেছে যে, তারা তাদের রবের সাথে অন্য কিছুকে সমান বানায়, যেহেতু তারা আল্লাহর ক্ষমতায় ওদেরকে শরীক মনে করে। আর দ্বিতীয় আয়াতে তাদের রবের সমকক্ষ অন্য কাউকে বানানোর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, এমনি আরও অনেককে তারা তাঁর সাথে শরীক করে। এই শেরকের ধরন হচ্ছে, আইন কানুন তৈরী করার ব্যাপারে তাদের শাসকদের পুরোপুরি অধিকার আছে বলে তারা মনে করে।

এইভাবে আল্লাহ তায়ালা জীবনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলোর বর্ণনা করতে গিয়ে সামগ্রিকভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকেই তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। আর এইভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন কানুন রচনার গুরুত্বও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন,

'অতপর যাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করতে চাইবেন ইসলামী জীবনব্যবস্থা বুঝার ও গ্রহণের জন্যে তার বুককে তিনি খুলে দেবেন, আর যাকে তিনি গোমরাহ করতে চাইবেন তার বুককে তিনি এমনভাবে সঙ্কুচিত ও সংকীর্ণ করে দেবেন যে, ইসলামকে বুঝা ও মানা তার কাছে আকাশে চড়ার মতো কঠিন হয়ে যাবে।'.....

এরপর আসছে গৃহপালিত পশু ও ফসলাদির বর্ণনা। শেষের দিকে আরও আসছে হালাল হারাম সম্পর্কিত আরো কিছু কথা– যার ইংগিত সূরাটির সূচনাতেই দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর এই হচ্ছে আমার সরল সঠিক মযবুত পথ; অতএব তোমরা তা অনুসরণ করো; আর বিভিন্ন পথের দিকে যেয়ো না, তাহলে তোমরা তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ......

ওপরে বর্ণিত সকল কথার আলোকে এ সূরাটির মূল বক্তব্য বিষয় হচ্ছে মানুষের 'আকীদা' অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ও অন্যান্য বিশ্বাসগত বিষয়গুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করে মনে প্রাণে তা গ্রহণ করা। আসলে দৃঢ়তার সাথে এ পথে জীবনভর টিকে থাকার অর্থই হচ্ছে সেরাতুল মোসতাকীমের ওপর চলা। আর এই পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর নামই হচ্ছে সঠিক পথ থেকে বেরিয়ে আসা। এটিই হচ্ছে ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য, যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা ওপরে দিয়েছি।

এখানে আমরা এ সূরার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করতে চাই। সর্বশেষে কথা হচ্ছে, এই সূরায় একটি পাঠ শেষে আর একটি পাঠ শুরু করার মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করা হয়নি যেমন মাদানী সূরার বর্ণনাতে সাধারণত দেখা যায়। এইভাবে বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে সূরার মধ্যে উত্থাপিত বিষয়াবলীর প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলোকে এমনভাবে পেশ করা যাতে পাঠকের মনে তা কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর মধ্যেও প্রাসংগিক কথাগুলোকে পর্যায়ক্রমে পেশ ধরার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যথাযথভাবে এই খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

www.pathagar.com

সূরা আল আ'রাফ

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত, ঠিক সূরায়ে আনয়াম-এর মতোই। তাই অন্যান্য মক্কী সূরার মতোই এর আলোচ্য বিষয়ও মানুষের অন্তরের গভীরে প্রোথিত আকীদা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই একই বিষয়ের ওপর দুটি সূরার মধ্যে আলোচন্য কতো বৈচিত্র্যময় তা লক্ষণীয়। আসলে আকীদা বিশ্বাসের বিষয়টি সব সময়ই অত্যন্ত ব্যাপক আলোচনার দাবী রাখে।

আল কোরআনের প্রত্যেকটি সূরাই স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রত্যেকটিরই রয়েছে নিজের কিছু এমন বিশেষত্ব যা অপর সূরা থেকে তাকে আলাদা করে রাখে। প্রত্যেক সূরারই রয়েছে নিজের পৃথক বর্ণনাভংগি। এই একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন দিক দিয়ে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সামনে রেখে দু'টি সূরায়ই আলোচনা করা হয়েছে, কেননা এই বিষয়টি অতি বড়ো, অতি মহান।

এসত্তেও প্রত্যেকটি সূরার নিজস্ব কিছু স্বতন্ত্র দৃষ্টিভংগি রয়েছে, রয়েছে আকর্ষণীয় পৃথক পৃথক বর্ণনাভংগি ও পদ্ধতি। ক্ষেত্র ভেদে এ বিষয়টির ওপর বহু ধরণের আলোচনা হতে পারে। এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যেই বিভিন্ন সূরাতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

আল কোরআনের মর্যাদা বুঝতে হলে আমাদের একবার সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষের মর্যাদার দিকে তাকাতে হবে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টিজগতের মধ্যে কি ধরনের আদর্শ করে বানিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাও দেখতে হবে । বিশ্ব-চরাচরে যতো আদম সন্তানকে আমরা দেখছি সবাই তো মানুষ। প্রত্যেকের মধ্যেই মানুষের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার প্রত্যেকটি অংগ-প্রত্যংগ ও গঠন প্রণালীতে ও কর্মকান্ডে পরিদৃশ্যমান হয়ে রয়েছে মানবীয় সকল আকার-আকৃতি। এসত্তেও এদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন রূপের মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন। একজনের সাথে অন্য জনের কিছু বৈচিত্র্যময় সাদৃশ্য বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বহু বিষয়ে তাদের মধ্যে রয়েছে নানা রকমের বৈসাদৃশ্য, যা মানুষ নামের পরিচয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তাদের একত্রিত করতে সক্ষম নয়।

এভাবেই আমি মহাগ্রন্থ এই পবিত্র কালামের সূরাগুলোকে গণনার মধ্যে নিয়ে এসেছি এইভাবেই আমি তাকে অনুভব করেছি এবং আল কোরআনের ছায়াতলে বসে দীর্ঘকাল থেকে আমি এইভাবে বাস্তব জীবনে আল্লাহর এই পবিত্র গ্রন্থকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছি। দীর্ঘ দিন ধরে এই পাক কালামকে আমি ভালোবেসেছি এবং এর প্রত্যেকটি কথা ও নির্দেশকে প্রকৃতি সংগত ও আমার জীবনের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে প্রতিটি মুহূর্তেই একটি প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসাবে পেয়েছি।

আমি আল কোরআনের মধ্যে বহু প্রকার মানুষের নমুনা দেখতে পেয়েছি। দেখেছি বিভিন্ন প্রকারের মানুষকে, যারা কোরআনের ছায়াতলে এসে নিজেদের চেষ্টা বলে আল্লাহর অনুগ্রহে নিজেদের যোগ্যতা ও মান সম্ভ্রমকে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে।

www.pathagar.com

এই সকল মানুষ যারা ভালো হওয়ার চেষ্টা করেছে, তারা পরস্পরকে একজনকে আরেকজনের বন্ধু হিসাবে পেয়েছে, তারা প্রত্যেকেই হচ্ছেন সত্যপ্রিয় এবং একে অপরের সঠিক বন্ধু। প্রত্যেকেই হচ্ছেন সত্যিকারের আল্লাহ প্রেমিক, তাদের অন্তর তাঁর মোহব্বতে ভরা। এ মানব-প্রেমিক বন্ধুদেরকে আমি দেখতে পেয়েছি সচ্ছল, তাদেরকে আমি বিভিন্ন দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী, সুন্দর ও পরোপকারী বন্ধু হিসেবে পেয়েছি।

এই সৎচিন্তাশীল, সৎকর্মশীল ও দানশীল ব্যক্তিদেরকে আমি মানুষের ভালোবাসার পাত্র হিসাবে পেয়েছি। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন প্রবাহ এগিয়ে চলেছে এবং তাদের জীবনে মানুষের অজান্তেই ওই সৎ ব্যক্তিদের প্রভাব তারা গ্রহণ করেছে। সকল সংকটাবর্তে তারা নিজেদের জন্যে সমাজে একটি বিশেষ স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

সূরাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সাবলীলতা লক্ষ্য করা যায়। সব নিদর্শন ও দৃশ্যাবলী, যেসব চিন্তা উদ্রেককারী তত্ত্ব ও তথ্য প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি জিনিসের মধ্যে ফুটে উঠেছে, তা আমার প্রাণকে উজ্জীবিত করেছে ও অন্তরের গভীরে তা বিপুল পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছে। সৃষ্টির সব কিছুকে আমার নযরে যেন আরো সুষমামন্ডিত করে তুলেছে।

সূরায়ে আনয়ামের আলোচ্য বিষয় যেমন ছিলো মানুষের আকীদা-বিশ্বাস তেমনই সূরায়ে আরাফের মধ্যে আলোচিত বিষয়বস্তুও ওই একটাই। কিন্তু দেখা যায় সূরায়ে আনয়ামে শুধু আকীদা সম্পর্কেই বর্ণনা এসেছে, কিন্তু সূরা আ'রাফে আলোচনা শুধু আকীদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং আকীদার বিষয়বস্তু ও এর তাৎপর্য সম্পর্কে আরো বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়ের আরব জাহেলিয়াতের চেহারা প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে যে, সকল যুগের সকল জাহেলিয়াতই প্রকৃতির দিক দিয়ে এক প্রকার। এই অর্থে অতীতে আরবদের মধ্যে যেমন হঠকারিতা ও ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে হীনতা প্রদর্শন করা হতো, আধুনিক বিশ্বেও এই একই প্রকার সংকীর্ণমনা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিয়ত সত্যের বিরোধিতাই শুধু নয়, বরং সত্যের বাতিকে চিরতরে নিভিয়ে দেয়ার জন্যে কাজ যাচ্ছে। যে বিষয়ে কখনও সংক্ষেপে এবং কখনও বিস্তারিতভাবে আমরা ইতিপূর্বের সূরাগুলোতে আলোচনা করেছি।

আমরা সূরায়ে আ'রাফে পূর্ববর্তী সূরার অনুরূপ আলোচনাই মুখ্যতর দেখেছি। দেখেছি এই সূরার মধ্যে আলোচিত বিষয়টি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে এবং তা আলোচিত হয়েছে গোটা পৃথিবীর মানুষের ইতিহাসকে সামনে রেখে। পৃথিবীর এ জীবন নিশ্চিন্ত এবং স্থায়ী বসবাসের ক্ষেত্র নয়; বরং এ হচ্ছে চলমান এক ভ্রমণক্ষেত্র মাত্র। সত্যিকার অর্থে এর যাত্রা শুরু হবে জান্নাতে পৌঁছানোর পর। এই দুনিয়ার জীবনের শেষ যেখানে– সেখান থেকেই এর শুরু হবে। বস্তুত সে যাত্রার কোনো শেষ নেই, মহাকাল ধরে চলবে সেখানে এ অনন্ত জীবন। এই সুদীর্ঘ সময়ে ঈমানের প্রতিফল পাওয়া যাবে। বরং বলা যায় মহা-সমারোহে ঈমানের উৎসব বসবে সেখানে, যার কোনো শেষ হবে না। এ সৌভাগ্যের মেলার পরিচালক হবেন আদম (আ.) থেকে

www.pathagar.com

নিয়ে মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সকল নবী রসূলের কাফেলা। এ মহান জামায়াতের সবার মধ্যে বিরাজ করেছে এই একই আকীদা। ইতিহাসের সর্বত্র মূর্ত হয়ে রয়েছে সেই একই কাফেলা এবং যুগ যুগ ধরে এই আকীদার ভিত্তিতে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়টিই এই সূরার মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে কেমন করে বিভিন্ন যুগের মানবগোষ্ঠিকে এই নবীরা সম্বোধন করেছেন, আর তারা কিভাবেই বা তার জবাব দিয়েছেন! কি ভাবে এইসব জনগোষ্ঠী নবীদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্যে ওঁৎ পেতে থেকেছে। এভাবে নবী রসূলদের কষ্ট দিয়ে কি জঘন্য অপরাধ না তারা করেছে! যারা আল্লাহর দ্বীনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে আদা-পানি খেয়ে লেগেছিলো তাদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা এসেছে ! ইতিহাসের এই বর্ণনাধারা এবং সত্যের সাথে সদ্ব্যবহার ও দুর্ব্যবহারের এ ইতিহাস অনেক দীর্ঘ; কিন্তু পর্যায়ক্রমে এ সুদীর্ঘ যাত্রাপথের বাধা অতিক্রম করে এ সূরাটিতে প্রত্যেকটি বিষয়ের বিশদ বর্ণনা এসেছে। বংশের পর বংশ ধরে এবং যুগের পর যুগ ধরে এ সূরার আবেদন মানবমন্ডলীকে সম্বোধন করে এই বিশ্বাস গ্রহণ করার কথাই বলে এসেছে। এরপর সূরাটির বর্ণনাভংগি আরো বলছে, দাওয়াতে দ্বীন নিয়ে যারা মানুষের কাছে গেছে, তাদের সাথে মানুষ কি ব্যবহার করেছে! 'দায়ী ইলাল্লাহ' (সত্যের দিকে আহ্বানকারী) ব্যক্তিরা কিভাবে সত্য-বিরোধীদের রক্ত চক্ষু এড়িয়ে তাদের পাতানো ফাঁদ পার হয়ে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর কাজটি অবিরাম চালিয়ে গেছে। এরপর ইহকাল এবং পরকালে এইসব সত্যবিরোধী ও সত্যাশ্রয়ী লোকদের কি কি পরিণতি হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণও সূরাটির মধ্যে পাওয়া যায়।

উভয় দলের এ সফর অনেক অনেক লম্বা; কিন্তু সূরাটি তার মন মাতানো গতিময় ছন্দের সাথে ক্রমে ক্রমে এক একটি ধাপ এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে চিহ্নিত পথে বিশ্বব্যাপৃত সত্যের চিহ্নগুলোর প্রতি অংগুলি সংকেত করে। আল্লাহর শক্তি ক্ষমতা প্রকাশকারী এসব চিহ্ন এতো স্পষ্ট যে, যে কেউ খেয়াল করলে এগুলো থেকে সহজেই শিক্ষা নিতে পারে। এসব চিহ্ন সদা-বিরাজমান। এগুলো কোনো ছোট খাটো বা তুচ্ছ চিহ্ন নয়, বরং সাধারণ দৃষ্টিতেই এগুলো ধরা পড়ে। সামগ্রিকভাবে উত্থান, পতন, এই নিয়মেই মানুষের জীবন এগিয়ে চলেছে। অবশেষে তাকে তার সেই বেহেশতেরই দিকে যেতে হবে, যেখান থেকে সে একদিন এই মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছিলো।

মূলগতভাবে মানুষ এক বিশেষ স্থান থেকে তার জীবনযাত্রা শুরু করেছে। বাবা আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী মা হাওয়া (আ.)– এই দুইজন মানুষ থেকেই মানুষের এই মহা পরিবারের যাত্রা শুরু হয়েছে। একই সময়ে এদের সাথে এবং এদেরকে ও এদের সন্তানদেরকে পথভ্রষ্ট করার অনুমতিপ্রাপ্ত শয়তানও তার যাত্রা শুরু করেছে। অপরদিকে বাবা আদম ও মা হাওয়াও আল্লাহর সাথে একমাত্র তাঁরই আনুগত্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। তাঁদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কিছুটা স্বাধীনতা দেয়া হলো। এই স্বাধীনতা দেয়া হলো যে, তারা চাইলে আল্লাহ তায়ালারই হুকুম মতো জীবন যাপন করবে, অথবা শয়তানের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে পড়লে তার দিকেও তারা

ঝুঁকে পড়তে পারবে। আল্লাহ্ তায়ালা প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন যে, শয়তান তোমাদের জাতশত্রু, সে তোমাদেরকে ক্ষতি ও বিপথগামী করার জন্যে সর্বপ্রকার সুযোগ ব্যবহার করবে, অতএব তার থেকে সাবধান থেকো। এসব সতর্কবাণী সত্তেও তার দেয়া লোভ ও লোভনীয় বস্তুর আকর্ষণ থেকে মানুষ মুক্ত থাকতে পারে কিনা সে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্যেই ছিলো আল্লাহর এ ব্যবস্থাপনা। আর এই পরীক্ষার প্রয়োজনেই তাদের আদি পিতামাতা এবং তাঁদের বংশধরদেরকে এ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। মানুষের পরীক্ষার মধ্যে এটাও ছিলো যে, ডান ও বাম দিক থেকে শয়তান এসে তাকে ভুলপথে নেয়ার চেষ্টা করবে। যার প্ররোচনায় দুঃখ কষ্টের স্থান এ দুনিয়াতে তাদের আসা, তার ও তার উপস্থাপিত লোভনীয় জিনিস থেকে সতর্ক করার জন্যে নবী-রসূলরা আসবেন, তখন শয়তানও সুন্দর করে তার সামনে উপস্থিত লাভ ও লোভের জিনিসকে তুলে ধরবে। এ অবস্থায় তখন সে কোন্‌টা গ্রহণ করবে?

পবিত্র ও মহান আল্লাহর কাছ থেকে পৃথিবীর দিকে মানুষের যাত্রা শুরু হয়েছে। এখানে সে চতুর্মূখী অবস্থার সম্মুখিন, অন্যায় কাজও করছে, ভালো কাজও করছে। গড়ছে কখনও, ভাংছে কখনও। প্রতিযোগিতা ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, আবার মারামারি কাটাকাটিতেও লিপ্ত হয়ে পড়ছে। একটু ভালো থাকা ও খাওয়া পরার জন্যে সকলেই নিরন্তন চেষ্টা সাধনা করে চলছে। পৃথিবীর এই দীর্ঘ সফর কালে যা কিছু সে উপার্জন করেছে তাই সাথে করে নিয়ে যাবে। যা কিছু কামাই করেছে এ জীবন পরিক্রমায়, ফুল ও কাঁটা, দামী ও সস্তা, বড়ো ও তুচ্ছ জিনিস, ভালো ও মন্দ, কল্যাণকর এবং অকল্যাণকর সব কিছুই সে তার সাথে নিয়ে যাবে। যা কিছু আজকে সে আনবে তারই সে মালিক হবে– তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে।

অতএব এটা স্পষ্ট যে, তার যাত্রা সেই দিকে যেখান থেকে সে রওয়ানা হয়েছিলো এবং সেখানেই একদিন সে পৌছে যাবে। সূরাটি অধ্যয়ন কালে এই কথাগুলোই আমরা বার বার জানতে পারছি! এখানে এই সূরার বর্ণনার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারাটা পৃথিবী ভর্তি হয়ে আছে নানা প্রকার জিনিসে ও মানুষে। আগে কোথায় ছিলো এসব বস্তু ? বিশেষ করে এই মানুষগুলো কোথায় ছিলো! এসব মানুষই তার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে, তাদের একদিন যাত্রা বিরতি ঘটবে। অবশেষে তাদের রওয়ানা হওয়ার সেই প্রথম স্থানে যখন তারা পৌছে যাবে, তখন প্রত্যেকের আমল তার দাঁড়িপাল্লার সামনে রাখা হবে, তখন সে ভীতসন্ত্রস্ত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবে। কেউ কাউকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসবে না! প্রত্যেকের হিসাব পৃথক পৃথকভাবে গ্রহণ করা হবে এবং যার প্রতিদান সেই পেয়ে যাবে।

সূরাটির মধ্যে আর এক শ্রেণীর মানুষের সংবাদ দেয়া হয়েছে– এরা জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবে, কিন্তু কাছাকাছি পৌছুতেই, জান্নাতের দরজা এদের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হবে– এরা আসলে পৃথিবীর বুকেও ছিলো এমনি। এদের সম্পর্কে কালামে পাকে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

'ওরা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু ও অভিভাবক বলে গ্রহণ করছিলো, অথচ তারা মনে করছিলো যে, তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।'

এখানে প্রতিনিয়ত সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিলের মধ্যে সংগ্রাম চালু রয়েছে, এ সংগ্রাম অব্যাহত আছে হেদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে, এ সংগ্রাম নবী-রসূলের দল এবং সম্মানিত মোমেন দলের সাথে অহংকারীর দল ও সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞানকারীদের সংগ্রাম। এ দ্বন্দ্ব একবার হয়েই শেষ হয়ে যায় না, বরং বরাবর এ সংঘাত সংঘর্ষ চলে এসেছে এবং চলতে থাকবে। এসব যুদ্ধের ফলাফলও একই রকমের। এসব সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই ঈমানের পাতা শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আর কুশ্রী কদাকার হয়ে ওঠে মিথ্যার পাতা। এ বিষয়টিকে আলোচ্য প্রসংগ তুলে ধরেছে যেন এর থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং অন্যায়কারী ও অহংকারী না-ফরমানের দল সতর্ক হতে পারে। পবিত্র এসব স্মৃতি সূরার মধ্যে এক বিশেষ ধারায় পেশ করা হয়েছে। তারপর একটি স্তর পার হওয়ার পর দেখা যায় নতুন আর এক সংঘর্ষ এগিয়ে আসে। সেখানেও অবশেষে সত্যেরই বিজয় হয়। সমগ্র সূরা জুড়ে এইভাবেই চলতে থাকে এসব বিবরণধারা।

মানবজীবনের আগমন ও প্রত্যাবর্তনের কাহিনী একটি নির্দিষ্ট ধারায় এ সূরার মধ্যে পেশ করা হয়েছে। যার মধ্যে মানব ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আল্লাহ যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কথা ফুটে উঠেছে। তারপর এও দেখানো হয়েছে যে, কেমন করে সেই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই হচ্ছে এ সূরার মধ্যে বর্ণিত আর একটি দিক যা সূরায়ে আন্য়ামে বর্ণিত হয়নি। যদিও দেখা যায় মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত দল এবং মিথ্যা ব্যবস্থাকে বিজয়ী করার জন্যে চেষ্টারত দলের চেহারা তুলে ধরা এবং কেয়ামত ও সৃষ্টিকুলের গতি-প্রকৃতির বর্ণনা করার ব্যাপারে দুটি সূরা একই প্রকারের ভূমিকা পালন করেছে। দুটি সূরার বর্ণনাভংগি এতোটা ভিন্ন যে, পাশাপাশি পাঠ করলে এ পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দুটি সূরার কথাগুলোকে পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করলেও এই পার্থক্য ধরা পড়ে। প্রত্যেকটি সূরার মধ্যে আলোচিত বিষয়ের সাথে সংগতি রেখেই তার ব্যাখ্যা আসে। প্রসংগক্রমে এখানে বলা দরকার যে, সূরায়ে আনয়ামে আকীদা বিশ্বাসের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে দফায় দফায়, যেমন করে একটি ঢেউ শেষ হতে না হতে আর একটি ঢেউ বালিয়াড়ির ওপরে আছড়ে পড়ে। আর এ সময়ে দৃশ্যপটে যে ছবিগুলো ভেসে ওঠে তা থাকে কম্পমান, সমুজ্জ্বল এবং হৃদয় আকর্ষণকারী। কিন্তু আ'রাফের বর্ণনা এইভাবে আবেগ সৃষ্টি করার পরিবর্তে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে। ঘটনাগুলো পেশ করে সহজভাবে তাকে বাস্তব কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করার আহব্বান জানায়। এ যেন বিশাল এক কাফেলার সুদীর্ঘ সফরের শিহরণ জাগানো অভিজ্ঞতা, যদিও তা প্রতি মনযিলে নব নব রূপে সামনে এসে হাযির হয় এবং সফরের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এ বৈচিত্র নিত্য নতুন আকারে আসতেই থাকে। তবে মানবজাতিকে যে সব পথে চললে এবং যে সব কাজ করলে শাস্তির ভয় দেখানো

www.pathagar.com

হয়েছে, সে বিষয়ে সতর্ক না হলে তাদের ভাগ্যে দারুণ বিপর্যয় নেমে আসে যা তাদেরকে ওলট-পালট করে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণ মুছে দেয়। অহংকারী ও না-ফরমান যাত্রীদের কপালে এমন ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। সূরা দুটির মধ্যে বড়ো ও উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য হচ্ছে– সূরা দুটির উভয়ই মক্কায় অবতীর্ণ।

সম্ভবত এ পর্যায়ে সূরাটির বাস্তব কর্মসূচী ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করে নিলে সূরাটির মধ্যে আলোচিত আকিদার বিষয়বস্তু বুঝা সহজ হবে, আর এ মহান আকিদা মানুষের ইতিহাসের স্রোতধারায় কি পরিবর্তন এনেছে তাও হৃদয়ংগম করা সহজ হবে।

অবশ্য এটা ঠিক যে, মানবজাতির ইতিহাসে এই আকিদার কাহিনীটি কি কি পরিবর্তন সাধন করেছে, প্রধানত সূরাটি সে কথা পেশ করেনি এবং সৃষ্টির সূচনা থেকে নিয়ে এর পরিসমাপ্তি পর্যন্ত মানুষকে কি কি পর্যায় অতিক্রম করতে হবে সে বিষয়েও তেমন কোনো কিছু জানায়নি। শুধু জানিয়েছে পর্যায়ক্রমে সংঘটিত কিছু ঘটনাবলী, তাও অনেকটা কেসসা বর্ণনার পদ্ধতিতে। জাহেলিয়াতের সাথে সংঘর্ষের কথা এই সূরা দৃঢ়তার সাথে জানিয়েছে। এরপর সূরাটির বিভিন্ন দৃশ্য ও গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এই সমস্ত দৃশ্য ও পদক্ষেপের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে ওই সব মানুষের কাছে যারা সরাসরি আল কোরআনের আহ্বান পাচ্ছিলো। কোরআনুল করীম তাদের সামনে অতীতের ওইসব কাহিনীই তুলে ধরছে– যার বর্ণনা মনের গভীর রেখাপাত করে। তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছে যে, তারা যে মত ও পথের ওপর রয়েছে তা পরিত্যাগ না করলে তাদের সাথে রসূল ও তাঁর সংগী-সাথীদের সংঘর্ষ অনিবার্য এবং এ সংঘর্ষ শেষে তাদের ওপর ভয়ানক শাস্তি নেমে আসবে। জানানো হচ্ছে যে, এ শাস্তির মধ্যে অবশ্যই তাদেরকে একদিন পড়তে হবে যাদেরকে আল কোরআন সত্যের দিকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে এবং যারা এ আহ্বানকে জেনে বুঝে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তাদের সত্যবিরোধিতার কারণে মানবজীবন শেষে সীমাহীন পরকালীন জীবনে এ শাস্তি তাদের ওপর নেমে আসবে। তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীর উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই ঘটনার মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতির মোকাবেলা করা। সত্য প্রতিষ্ঠার অর্থই হচ্ছে কোনো মিথ্যাকে দূরীভূত করা। সুখী-সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়ার কাজের জন্যেই ইসলামের এই আন্দোলন। শুধু দর্শন ও চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটানোর জন্যেই ইসলামের আন্দোলন সৃষ্টি হয়নি, অথবা কোনো ঘটনা বর্ণনা করা কিংবা শুধু শুধু গল্প বলার উদ্দেশ্যেই তা করা হয়নি বা কোনো সাহিত্য সৃষ্টির জন্যেও তা বলা হয়নি!

অতীতের না-ফরমান জাতিসমূহের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব গযব নেমে এসেছিলো আল কোরআনে তার বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো সন্ধিৎসুদের উপদেশ দান এবং হঠকারী জাহেল ও ক্ষমতাগর্বী ইসলাম দুশমনদের সতর্ক করা। এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আল কোরআনের এসব ঘটনাবলীর অবতারণা করা হয়েছে। ঘটনার

www.pathagar.com

আলোকে আন্দোলনের সূচনা-বিন্দুকে কেন্দ্র করে যেমন কথা বলা হয়েছে তেমনি কথা বলা হয়েছে পরিসমাপ্তি বা পরিণতিকে কেন্দ্র করে। ইতিহাসের এসব পাতা জুড়ে রয়েছে নূহ-জাতি, হূদ জাতি, সালেহ জাতি, লূত জাতি ও শোয়ায়ব জাতির কেসসাসমূহ। এসব জাতির মধ্যে মূসা (আ.)-এর জাতির ঘটনাটি এসেছে সবচেয়ে বিষদভাবে।

শুরুতেই আমরা এমন কিছু উদাহরণ পেশ করতে চাই যেগুলোকে কেন্দ্র করে মহা গ্রন্থ আল কোরআন নাযিল হয়েছে। দেখুন কেমন করে সূরাটি শুরু হচ্ছে,

'আলিফ লা-ম মী-ম সোয়াদ। এ হচ্ছে একটি কেতাব যা তোমার কাছে নাযিল করা হলো, অতএব এর প্রচারের ব্যাপারে তোমার মনের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা যেন না থাকে। .....আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের অনুসরণ করো না। আসলে তোমরা খুব কমই তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকো।' (আয়াত ১-৩)

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমেই সম্বোধন করা হয়েছে রসূলুল্লাহ (স.)-কে এবং তাঁর সেই সাথীদেরকে যারা অন্যদের বিরুদ্ধে এই কোরআনের সাহায্যেই জেহাদ করে চলেছেন। এরপর এখানে মহাকাল ধরে মানুষের সফরের বর্ণনা এসেছে, এসেছে সুনির্দিষ্ট এই সফর শেষে তার প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা। সৃষ্টির বুকে বিরাজমান দৃশ্য এবং কেয়ামতের দিনে যে অবস্থা হবে তাও তাকে জানানো হয়েছে। এসব কিছুর সম্বোধন কখনও কখনও নবী (স.)-কে পরোক্ষভাবে আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। সূরাটির এই ছোট্ট শুরুর আয়াতটিতে যেমনটি দেখা গেছে রসূলুল্লাহ (স.)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহর ঘোষণা। 'এ হচ্ছে একটি কিতাব– যা তোমার কাছে নাযেল করা হলো, সুতরাং এর প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে তোমার মনের মধ্যে যেন কোনো সংকীর্ণতা না থাকে।'

এ ছোট্ট আয়াতাংশে আল্লাহ তায়ালা এমন একটি অবস্থার ছবি এঁকেছেন যা আজকের সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝা খুবই মুশকিল। তবে সে ঠিকই বুঝতে পারবে, যে অনুরূপ কোনো জাহেলী সমাজে বসবাস করছে এবং সে ওই জাহেলী সমাজের মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে। একমাত্র তখনই সে বুঝতে পারবে যে, কতো বড়ো কঠিন ও ভয়ানক কথা সে উচ্চারণ করছে এবং যে কঠিন কাজ তার সামনে রয়েছে তা কি।

তার লক্ষ্য হচ্ছে, ওদের মধ্যে এক মহান বিশ্বাসের ইমারত গড়ে তোলা। তাদের জন্যে জীবনের নতুন মূল্যবোধ ও মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করা, তাদের সমাজ সভ্যতার আমূল পরিবর্তন করে এক নতুন জীবনের সূচনা করা, সাথে সাথে তাদের অন্তরে বিরাজমান জাহেলিয়াতের অবশিষ্ট ভাবধারাকে সমূলে ঝেঁটিয়ে বের করে দেয়া, তাদের জীবনে জাহেলিয়াতের যে মূল্যবোধ বাসা বেঁধে রয়েছে তাকে সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে মুছে ফেলা। তাদের অংগ প্রত্যংগ ও ধমনী থেকে জাহেলিয়াতের সকল প্রভাব দূর করে দিয়ে সর্বত্র ইসলামের ভাবধারা চালু করাই ছিলো মূলত সকল নবী রসূলের লক্ষ্য। তৎকালীন সমাজ যেহেতু এক বিশেষ ভাব ধারায় গড়ে উঠেছিলো তাই প্রথম প্রথম

www.pathagar.com

তাদের কাছে নতুন এ জীবনধারা কঠিন মনে হচ্ছিলো। বাপ দাদার আমল থেকে চলে আসা নিয়মনীতি পরিত্যাগ করা তাদের কাছে খুবই কঠিন লাগছিলো। অপরদিকে নবী রসূলদের আনীত ব্যবস্থা সমাজের আংশিক সংস্কার সাধন করেই তৃপ্ত ছিলো না। তাদের কাজ ছিলো মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা। তাই আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশ অনুসরণ করে সর্বকালে নবী রসূলরা সামগ্রিক বিপ্লব সাধন করতে চেয়েছেন এবং জীবনের সর্বত্র আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্যে তারা আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সবখানে চেয়েছেন তারা আল্লাহর বিধান চালু করতে, যেন সাধারণ মানুষ ইনসাফ পায় এবং দুর্বলরা সবলের দ্বারা শোষিত না হয়। মানব রচিত আইন কানুন যেহেতু কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত থাকে তাই সবার স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই তাঁর বান্দাদের সেসব স্বার্থপর শ্রেণীর হাতে নিষ্পেষিত হতে দিতে পারেন না, আর এই কারণেই নবী রসূলরা আল্লাহর বিধান চালু করার উদ্দেশ্যে আমরণ আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। এ ব্যাপারে কারো অনীহা, অসহযোগিতা, বিরোধিতা বা আক্রমণাত্মক ভূমিকার কোনো পরওয়াই তাঁরা করেননি। এমনকি বাস্তব যুদ্ধ করতেও তাঁরা পিছপা হননি।

যেহেতু প্রতি যুগেই আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থাকে কায়েমী স্বার্থবাদীরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করার জন্যে রুখে দাঁড়িয়েছে, মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে এ আকীদা বিশ্বাসের ধারক বাহকদেরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে– এজন্যে সত্যের পতাকাবাহী নবী ও তাঁর সংগীসাথীরা, সংখ্যা ও সরঞ্জামে অসম প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে সীসা-ঢালা প্রাচীরের মতো একতাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন এবং একমাত্র আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্যের ওপর নির্ভর করে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আর এই সাক্ষাত সমরের শেষ পরিণতিতে চূড়ান্ত বিজয় হয়েছে সর্বকালে সত্যের পতাকাবাহীদেরই। আল্লাহর রহমতে তারাই হয়েছেন বিজয়ী। এই সকল তথ্যের ধারা বিবরণী পর্যায়ক্রমে ফুটে উঠেছে আলোচ্য সূরার মধ্যে। দেখুন, কী চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে অতীতের ঘটনাপঞ্জীকে–

'কতো জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি .... ওরাই হচ্ছে তারা, যারা আমার আয়াতগুলোর সাথে যুলুম করার কারণে নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।' (আয়াত ৪-৯)

এই ভূমিকার পর মূল কাহিনী শুরু হচ্ছে–

এতে বলা হয়েছে পৃথিবীর বুকে মানবজাতির বসবাস কেমন করে সম্ভব হলো? এটা সম্ভব হয়েছিলো এইভাবে যে, মানবজাতির বসবাসের উপযোগী করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন গোটা পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন সকল দ্রব্য-সামগ্রী, উপায়-উপকরণ, প্রয়োজনীয় খাদ্য খাবার। পৃথিবীর গোটা পরিবেশ ও আবহাওয়াকে তাদের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী বানিয়ে দিয়েছেন। মানব-প্রকৃতির মধ্যে দান করেছেন সেই সব জ্ঞান ও উপাদান, যার দ্বারা সে বুঝে নিতে পারে পৃথিবীর সব কিছু থেকে কোন্টাকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, কি কি খাদ্য সে গ্রহণ করবে

www.pathagar.com

এবং কিভাবেই বা তা উৎপাদন করবে– এসব জ্ঞান আল্লাহ তায়ালাই তাকে দিয়ে দিয়েছেন। এজন্যে তাকে আল্লাহ তায়ালা প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থও দিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন–

'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করেছি এবং তোমাদের জন্যে সেখানে জীবিকা উপার্জনের বিভিন্ন উপায় বানিয়ে দিয়েছি, তোমরা খুব কমই শোকর করো।'

একথাগুলো মূল আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ 'প্রথম সৃষ্টির বিষয়'টি বর্ণনার পূর্বে শুধুমাত্র ভূমিকা স্বরূপই পেশ করা হয়েছে। আর মানুষের জীবনযাত্রার সূচনা যে বিন্দু থেকে সুপরিকল্পিতভাবে শুরু হলো, বর্তমান এই সূরার মধ্যে সেই প্রসংগেই মূলত বর্ণনাকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে এবং সৃষ্টির ঘটনাকেই পেশ করা হয়েছে। এ ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা এবং তাকে সঠিক পথে চলার জন্যে উপদেশ দান করা।

তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পর তোমাদেরকে সুন্দর আকৃতি দান করেছি, ... । এখানেই তোমরা বেঁচে থাকবে, মৃত্যুও বরণ করবে এখানে, আর এর থেকেই তোমাদেরকে (রোজ হাশরে) বের করা হবে।' (আয়াত ১১-২৫)

এখানে মানবজাতির পথপরিক্রমার বিবরণের মধ্যে যে সব দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে এ দীর্ঘ যাত্রার চমৎকারিত্ব এবং সর্বপ্রকার বৈচিত্র ফুটে উঠেছে। আর এ বর্ণনাতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তাকে বরাবরই এক মহা সংঘর্ষের মোকাবেলা করেই জীবন সাগর পাড়ি দিতে হবে ... জীবনের দীর্ঘ এ সফরের কোনো পর্যায়েই এ সংঘর্ষ স্তিমিত হবে না। সকল আদম সন্তানকেই শয়তানের সাথে বরাবর সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে।

এই আলোচনা প্রসংগে মানুষের শাস্তির যে পর্যায়ক্রমিক দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তাতে দেখানো হয়েছে যে, প্রতিবারে গযব নাযিল হওয়ার পূর্বে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, পরকালে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে এবং যথাযথভাবে সতর্ক করা হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে সেই মরদূদ জেদী শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচার জন্যে।

এরপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করা হয়েছে। এই জেদী ও অহংকারী শয়তান কিভাবে মানবমন্ডলীর আদি পিতামাতা আদম ও হাওয়া (আ.)-কে বিভ্রান্ত করেছিলো তার বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। আর বর্ণনার মধ্যে দেখা যায় মানবজাতির আদি পিতামাতার সাথে শয়তান কেমনভাবে মুখোমুখি হয়েছে। আর এ মোকাবেলার ফলেই মানুষ সৃষ্টির প্রথম লক্ষ্য অর্জিত হলো। তাই আদমসন্তানকে ভীতিপ্রদর্শন ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে তাদেরকে অবশেষে সেখানেই ফিরে যেতে হবে, যেখান থেকে তারা এসেছে। 'হে আদম সন্তানেরা, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে এমন পোশাক পাঠিয়েছি, যা...... (আয়াত ২৬-২৭, ৩৫-৩৬)

www.pathagar.com

আমাদেরকে অবশ্যই একটু খেয়াল করে ওই ঘটনার দিকে তাকাতে হবে যখন আমাদের পিতা মাতা নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর বিবস্ত্র হয়ে গেলেন এবং তারা নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্যে লতা-পাতা ব্যবহার করতে লাগলেন। তারপর তাদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে নেমে এলো ভয়ানক এক তিরস্কারবাণী। স্মরণ করানো হলো তাদেরকে পোশাক রূপী আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে, যা তাঁদের লজ্জাস্থান ঢাকার সাথে সাথে সৌন্দর্যবর্ধক হিসাবেও দেয়া হয়েছিলো। আরো খেয়াল করতে হবে শয়তানের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার হুঁশিয়ারীর কথা, যা তৎকালীন মক্কাবাসীদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদেরও লজ্জা ঢাকার পোশাক ও সৌন্দর্যের জিনিসগুলো মরদূদ শয়তান তেমনি করে খুলে দিয়ে তাদেরকে লজ্জা ও বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেবে– যেমন করে তাদের বাপ মায়ের সাথে তারা করেছিলো। এখানে আর একটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে। আমাদের দেখা দরকার যে, আদম-হাওয়ার এই ঘটনাটিকে তৎকালীন জাহেল আরবের মোশরেক সমাজের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তারা প্রাচীন কালের আচার অনুষ্ঠান ও নিয়ম নীতি অন্ধভাবে মানতে গিয়ে উলংগ হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করতো। হজ্জের সময় তারা বেশ কিছু খাদ্য খাবার ও বিভিন্ন ধরনের পোশাক নিজেদের জন্যে নিজেরাই হারাম করে নিয়েছিলো এবং তারা বিশ্বাসও করতো যে, এগুলো আল্লাহরই নির্ধারিত ব্যবস্থা। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানবসৃষ্টির সূচনালগ্নে বিবস্ত্র হওয়ায় তাদের মধ্যে যে লজ্জা ও অপ্রস্তুত হওয়ার অনুভূতি জেগেছিলো এবং মানবতার স্বাভাবিক দাবী হিসাবে তাদের মধ্যে নিজেদেরকে আবৃত করার যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিলো, তাকে সামনে রেখে জাহেল আরব সমাজ তথা গোটা মানবমন্ডলীকে জানানো হচ্ছে, লজ্জাস্থান ঢাকা ও সৌন্দর্যের জন্যে পোশাক ব্যবহার মানুষের প্রকৃতির ধর্ম। কাজেই প্রকৃতির এ স্বাভাবিক প্রবণতাকে উপেক্ষা করাটাই জাহেলিয়াত তথা মূর্খতা নয়? এবং উলংগতা ও শরীর খোলা রাখার অর্থই কি লজ্জাহীনতা এবং আল্লাহভীতির অভাব নয়? আর এই ঘটনাটি আল কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন দিকের মধ্য থেকে একটি দিককে চিন্তা করার জন্যে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে যে, আল কোরআনের মধ্যে যতো উদাহরণ পেশ করা হয়েছে এবং যতো ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওই ঘটনার আলোকে মানুষ যেন বাস্তব জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাযথ শিক্ষা নিতে পারে। যতোবারই এ ঘটনার উল্লেখ এসেছে ততোবারই নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপটে এর উল্লেখ এসেছে।

এই বিষয় সম্পর্কে সূরায়ে আনয়ামের ৭ম রুকুর তাফসীরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে খুবই গুরুত্বের সাথে যে মূলনীতিটি পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে, কোরআনুল করীমে এমন কোনো কথা বলা হয়নি যার বাস্তব প্রয়োগ নাই। নিছক জ্ঞান গরিমার ঘর অথবা তথ্যের ভান্ডার হয়ে থাকাই আল কোরআনের কাজ প্রকৃতি নয়।

www.pathagar.com

মানবজাতির কাফেলা তার যাত্রাপথে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আদম (আ.) ও তার স্ত্রী তাদের দুইজনের প্রথম ভুল কাজ করার যে অবস্থা সৃষ্টি করেছিলো তা পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। আবার এখন পেছনের ঘটনাগুলো সামনে টেনে আনলে শেষ বিচারের দিনের ছবির দৃশ্য দ্রুতগতিতে সামনে ভেসে ওঠে। মহা এ সফর শেষে আগত শেষ বিচারের যে ভয়ংকর দৃশ্যের সম্মুখীন আমাদেরকে হতে হবে তার কঠিন ছবি আমাদেরকে বিচলিত করে। পবিত্র কোরআনে বিধৃত এ বর্ণনা একাধারে দুনিয়ার জীবনের এ পরীক্ষা গৃহের খবর দেয় এবং এ জীবনের খেলা শেষে প্রতিদান ও প্রতিফল দিবসের কথাও জানায়। কালামে পাকের মধ্যে এমন চমৎকারভাবে এ দুটি জীবনের মেয়াদের বর্ণনা পাশাপাশি পেশ করা হয়েছে যে, গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে যে কোনো ব্যক্তির মনে হবে এ দুটি জীবন একটি অপরটির সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত এবং দুটি জীবন মিলে গঠিত হয়েছে অবিচ্ছেদ্য এক মহা জীবন।

এই পর্যায়ে এসে আমরা কেয়ামতের দৃশ্যসমূহের মধ্যে সব থেকে কঠিন দৃশ্য দেখতে পাই। সেখানকার নানা দৃশ্য মনের পর্দায় জাগিয়ে তোলে বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। সূরাটির মধ্যে আদম (আ.)-এর কাহিনী এবং শয়তানের ধোকায় পড়ে বিভ্রান্ত হওয়া ও জান্নাত থেকে তার ও তার স্ত্রীর বেরিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরকে আরো জানানো হয়েছে যে, ওই ভয়ানক শয়তান তাদেরকে সেইভাবেই ধোকা দিতে থাকবে যেমন করে জান্নাত থেকে তাদের বাপ মাকে সে ধোকা দিয়ে বের করে নিয়ে এসেছিলো। আরো জানানো হয়েছে যে, দুনিয়াতে তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রসূলরা আল্লাহর বাণী নিয়ে আসবেন। এ ক্ষেত্রে এটাও জানানো হয়েছে যে, মানুষ শয়তানের ধোকায় পড়ে গিয়ে তেমনি বিভ্রান্ত হতে থাকবে যেমন করে তাদের বাপ মা বিভ্রান্ত হয়েছিলো। এইভাবে তারা প্রমাণ করবে যে, তারা লোভের বশবর্তী হয়ে ধোকা খাওয়া বাপ মায়েরই সন্তান, অতএব তাদের বিভ্রান্তিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। এখন যারা জেনে বুঝে শয়তানের আনুগত্য করবে, তারা নিজেরাই তাদের জান্নাতে ফিরে যাওয়াকে নিজেদের জন্যে অসম্ভব করে তুলবে। আদি পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে আনার পর তাদের সন্তানরা পুনরায় সেখানে প্রবেশ করুক তা শয়তান কখনও চায় না– চাইতে পারে না। তবে যারা শয়তানের সকল কারসাজির বিরোধিতা করবে এবং সকল কাজে, কথায় ও ব্যবহারে একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করবে, তারা পুনরায় জান্নাতে প্রবেশ করবে কেননা এটাই তো তাদের আদি নিবাস। তাই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর এই অনুগত বান্দাদেরকে ডাক দিয়ে বলছেন, 'তোমরা যে সব (ভালো) কাজ করতে থেকেছ, তারই পুরস্কার স্বরূপ তোমাদেরকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হবে।'

যে প্রসংগে এসব দৃশ্যের বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে, মানুষকে তার অনন্ত জীবনের সুমহান আনন্দ লাভের সুযোগ দান করা। সুদীর্ঘ এক পথ পরিক্রমার পর মানুষ এ সুযোগ পাবে। এ পথে চলার সময় তাকে বেশ কিছু কষ্ট করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে

www.pathagar.com

এবং বেশ কিছু ত্যাগও স্বীকার করতে হবে। এসব কিছুর বিনিময়েই সে আশা করতে পারে অনন্ত জীবনের শান্তি, আর উপস্থিত এ সব দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করতে যে রাযি নয়, বরং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যে নগদ পেতে চায়, অনন্ত জীবনের শান্তি পাওয়ার অধিকার তার নেই। এই সব বিষয়ে তাকে জানানো হচ্ছে যে, চিরস্থায়ী জীবনের সুখ শান্তির আকাংখী যে নয়, তার জন্যে চিরস্থায়ী দুঃখ ও শাস্তি অপেক্ষা করছে। এরাই হচ্ছে ওই সম্প্রদায়ের লোক, যারা মহাগ্রন্থ আল কোরআনের কথাগুলোকে মিথ্যা বলে দাবী করে আর এ কেতাবের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে তারা অলৌকিক কিছু ক্ষমতা বা ঘটনা দেখানোর দাবী করে। এ ধরনের হঠকারী ব্যক্তিরা কোরআনের ভাষা ও বক্তব্য যে মানবীয় রচনার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় বরং তা উর্দ্ধজগত থেকেই আগত তা বুঝা সত্তেও নিছক ব্যক্তি স্বার্থের কারণে ও নেতৃত্বের লোভে তারা জেনে বুঝে সত্যের বিরোধিতা করে চলেছে। অতএব, এ কদর্য ব্যবহারের পরিণতি ভীষণ শাস্তি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি তাদের কাছে যে কিতাব পাঠিয়েছি, তাকে আমি বিস্তারিত জ্ঞানের ভান্ডার হিসাবেই তাদের সামনে পেশ করেছি.........আর যে সব মনগড়া কথা তারা বানিয়ে বানিয়ে বলছে, সেসব কথা অবশ্যই একদিন ভুল প্রমাণিত হবে।' (আয়াত ৫২-৫৩)

আর এই দীর্ঘ সফর অর্থাৎ, সৃষ্টির সূচনা থেকে তার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যে সফর, সেই সফরের পর রয়েছে তার সুনির্দিষ্ট পরবর্তী অবস্থা। এখানেই উলুহিয়্যাতের তাৎপর্য বুঝা যায় এবং সৃষ্টির সকল দৃশ্যাবলীর মধ্যে বিরাজমান রবুবিয়্যাতেরও প্রকৃত অর্থ এখানে ফুটে ওঠে। আল কোরআনের নিয়মানুযায়ী এ সব সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সৃষ্টির সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী চিন্তাশীল হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং তার জ্ঞানের চোখ খুলে দেয়। সৃষ্টির বুকে ছড়িয়ে থাকা রহস্যময় বস্তুগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরানোর আহবানের উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলোর মাধ্যমে মহান স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা আনা। বস্তুতপক্ষে যারাই সৃষ্টির রহস্যের দিকে খেয়াল করে তাকায় এবং চিন্তা করে, তাদের মধ্যে এসব কিছুর স্রষ্টার প্রতি এমনিই আনুগত্যবোধ জাগে। তার মন বলে ওঠে, নিরংকুশ দাসত্ব ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। এমন দ্বিধাহীন দাসত্ব ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী আর কেউই হতে পারেনা। তিনিই সবার প্রতিপালক এবং তিনিই আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার একক ক্ষমতাধারী। তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর ইচ্ছা ও কথাই আইন। তাই বিশ্বের কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জোটের কথা বা মত আইনের মর্যাদা পেতে পারে না। সৃষ্টি যার, আইন তাঁর। আর তিনিই সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক, মনিব ও বাদশাহ। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই তোমাদের রব আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন ....সেই জনপদের জন্যে, যারা শোকরগুজারি করে। *(আয়াত ৫৪-৫৮)*

www.pathagar.com

আবারও আলোচনার ধারা এগিয়ে চলেছে এবং বিশেষ এক কাহিনীর বর্ণনাও এখানে পেশ করা হচ্ছে। এরই মধ্যে মহান ঈমানের জয়গান প্রকাশিত হচ্ছে। ভুল পথে চালিত মানবমন্ডলীর পরিণতির কথা তাদের পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাদেরকে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দেয়া হচ্ছে এবং তাদের নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনের জায়গা সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে তাদের ভয় দেখানো হচ্ছে। অপরদিকে পথভ্রষ্ট মানুষ অহংকারের কারণে কল্যাণের আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর তারা সত্যের প্রতি দাওয়াত দানকারীর ওপর যুলুম করে। তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে এবং মিথ্যাবাদী জ্ঞানে তাদেরকে প্রতিরোধ করে। এরপর আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত পাকড়াও এবং সীমাহীন দুঃখ কষ্ট। আকিদার ভ্রান্তির কারণে তাদের জাতির সাধারণ লোকেরা তাদেরকে নিজেদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এমতাবস্থায় সত্যাশ্রয়ীরা একমাত্র আল্লাহকেই গ্রহণ করে ও তাঁর কাছেই সব কিছুর জন্যে প্রার্থনা করে।

এরপর নূহ (আ.)-এর কাহিনীর প্রসংগ আসছে, আসছে একের পর এক হূদ, সালেহ, লূত ও শোয়ায়ব (আ.)-এর ঘটনাবলী। সংগে সংগে তাদের প্রত্যেকের জাতির ভূমিকাসমূহও পেশ করা হচ্ছে। সকল নবী রসূল একই দাওয়াত ও কর্মধারা নিয়ে এসেছেন, যার কোনো পরিবর্তন নেই। তাদের দাওয়াতকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে আল কোরআন জানাচ্ছে,

'হে আমার জাতি, দ্বিধাহীন চিত্তে তোমরা সবাই আল্লাহর আনুগত্য করো। তিনি ছাড়া সর্বময় মালিক, মনিব ও শাসনকর্তা আর কেউ নেই।'

তাদের জাতি একটি কথাতেই তাদের বিরোধিতা করেছে আর তা হচ্ছে, 'প্রভুত্ব, একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এবং সর্বময় মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। মানুষের ওপর মানুষের হুকুম চালানোর কোনো অধিকার নেই'– এটা কি করে মেনে নেয়া যায়? একইভাবে, রেসালাত মানুষের মধ্যে কোনো এক ব্যক্তির ওপর আসবে এতেও ছিলো তাদের ঘোরতর আপত্তি। তাদের মধ্যে এ বিষয়েও অনেকের আপত্তি ছিলো যে, দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহরই বিধান মানতে হবে। তারা মনে করতো পার্থিব কাজ কর্ম পরিচালনার এখতিয়ার তাদের নিজেদের, যেভাবে ইচ্ছা ব্যবসা বাণিজ্য চালাবে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে– এসব বিষয়ে সৃষ্টিকর্তার হাত থাকা– এতো সব কি করে মেনে নেয়া যায়! বিংশ শতাব্দির আধুনিক জাহেলী যুগের বহু মানুষও ওই একইভাবে চিন্তা করতে শুরু করছে এবং প্রাচীনকালের এই মূর্খতাপূর্ণ দাবীকে আজকের সমাজে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। ওরা সব কিছুর ওপর আল্লাহর নিরংকুশ মালিকানার বিশ্বাসকে বলে সেকেলে মনোভাব।

এরপর প্রত্যেক নবীর ইতিবৃত্তের বর্ণনা শেষে তাদের আগমনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সূরাটির মধ্যে বর্ণিত প্রত্যেক নবীর কাহিনীতেই দেখা যায়, একই কথা এবং একই আহবান,

'হে আমার জাতি, একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করো, তোমাদের জন্যে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তিনি ছাড়া আর কেউ নেই।'

www.pathagar.com

প্রত্যেক নবীই তাদের কাছে সেই সত্যকে পেশ করেছেন, যা তাদের রব পেশ করতে বলেছেন। সকল নবী তাদের সময়কার জনগণের দুর্ব্যবহার ও সত্য জীবনব্যবস্থা থেকে গাফেল থাকার পরিণতি দেখতে পাচ্ছিলেন, যার জন্যে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জাতির জন্যে গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু আফসোস, ওই সকল অপরিণামদর্শী জাতি তাদের কাজ ও ব্যবহারের পরিণতি সম্পর্কে কোনো চিন্তাই করতো না। আর আল্লাহর রসূল যে হৃদয়াবেগ নিয়ে তাদের কাছে আল্লাহর বার্তা পৌছাচ্ছিলেন, তা কিছুতেই তারা বুঝার চেষ্টা করছিলো না। তাদের কাছে চিরস্থায়ী জীবনের সুখ শান্তির চেয়ে এই ক্ষুদ্র জীবনের নগদ সুবিধাদির গুরুত্ব ছিলো অনেক বেশী। তারা সেই চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে কোনো কিছু বুঝতেও চায়নি।

নূহ (আ.)-এর কাহিনীই হচ্ছে এ পর্যায়ের প্রথম কাহিনী। এটা উপরোক্ত কথার প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। আল কোরআনের মধ্যে বর্ণিত কাহিনীগুলোর মধ্যে শোয়ায়েব (আ.)-এর ঘটনাকে এ প্রসংগে শেষ শিক্ষণীয় ঘটনা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি নূহকে পাঠিয়েছি তার জাতির কাছে.........আর আমি অথৈ পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি তাদেরকে, যারা আমার আয়াতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।' (আয়াত ৫৯-৬৪)

'(আরো পাঠিয়েছি) মাদইয়ানবাসীর কাছে তাদের ভাই শোয়ায়বকে। সে বললো, হে আমার জাতি, আনুগত্য করো একমাত্র আল্লাহর, তোমাদের জন্যে অন্য কোনো প্রভু নেই, মনিব ও বাদশাহ একমাত্র তিনি ছাড়া......অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে আমার রবের বার্তাসমূহ পৌছে দিয়েছি.......... সুতরাং (সত্যকে) অস্বীকারকারী জাতির জন্যে কেমন করে আমি আফসোস করবো?' (আয়াত-৮৫-৯২)

এই দুটি জাতির উদাহরণ দ্বারা সূরার মধ্যে বিবৃত বাকী কাহিনীর দৃষ্টান্তগুলো বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য কাহিনীগুলো এই দৃষ্টান্তমূলক দুটি কাহিনীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনা কখনও এসেছে একমাত্র সেই মৌলিক আকিদার যথার্থতা পেশ করার জন্যে যা আল্লাহ তায়ালা বনী আদমের প্রত্যেক জাতির জন্যে তাঁর বার্তা বহনকারী হিসাবে তাঁর রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন, অথবা চেয়েছেন এর দ্বারা দুনিয়ার অহংকারী নেতৃবৃন্দের সাথে নানা প্রকার দুর্বলতার মধ্যে ঘেরাও হয়ে থাকা এই সত্যের অনুসারীদের মধ্যে সাক্ষাত ও সংযোগ স্থাপিত হোক, অথবা তিনি চেয়েছেন এই আকীদাকে রসূলরা বা তাদের অনুসারীদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিতে, অথবা তিনি চেয়েছেন যেন তাদের নিজ নিজ জাতির লোকদেরকে হেদায়াত করার জন্যে তারা যথাযথ সদুপদেশ দিক ও উৎসাহ দান করুক। এরপর আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন, তাদের সত্য বিরোধিতা ও অন্যায়ের ওপর যেদ করে টিকে থাকার মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকদের সাথে মুসলমানদের সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক এবং পরিশেষে তাদেরকে পাকড়াও করা হোক। মূলত এই ছিলো তাদেরকে সতর্ক করা ও উপদেশ দেয়ার চূড়ান্ত ও শেষ পর্যায়। মিথ্যার ওপর যেদ ধরে টিকে থাকার এটিই হচ্ছে যথার্থ

www.pathagar.com

পরিণতি। এরপর এখানে আলোচনার প্রসংগকে একটি ভিন্ন মোড় দেয়ার জন্যে একটু বিরতি দেয়া হচ্ছে, যাতে করে এ বিরতিতে ওদের প্রতি প্রদত্ত শাস্তির দৃশ্যটি ওরা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এইভাবে মানুষের সাথে তাঁর নির্ধারিত কার্যাবলী পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় নিয়ম জানিয়ে দিচ্ছেন। যখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে তখন প্রথমে তিনি তাদেরকে নানা প্রকার রোগ ব্যাধি, আপদ বিপদ, দুঃখ দৈন্য ও মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত করে দেন, যাতে এসব প্রতিকূল অবস্থা তাদের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয় এবং তারা সত্যের ডাকে সাড়া দিতে পারে। কিন্তু এসব দুঃখ দৈন্য যখন তাদের মনে কোনো প্রকার সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় না, তখন তাদেরকে তিনি ঢিল দিয়ে দেন। এটা যে কোনো বিপদাপদ থেকে আরো বড়ো পরীক্ষা। অতপর তাদের ওপর আল্লাহর বিধান অনুসারে আরো ব্যাপক কষ্ট নেমে আসে । কিন্তু এতেও যখন তারা সাবধান হয় না, তখন হঠাৎ করে একদিন তাদের প্রতি সর্বাত্মক আযাব এমন ভাবে নেমে আসে যে, তারা বুঝতে পারে না কিসে কী হচ্ছে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি বিধানের এ নিয়ম বর্ণনা করার পর সেই ভীষণ বিপদের বর্ণনা তাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে, যা তাদেরকে গাফলতির ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। সুতরাং এখন তাদেরকে কে বুঝাবে যে, আল্লাহর শাস্তি, তাঁর চিরন্তন নিয়মানুযায়ী তাদের ওপর নাযিল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে? সর্বাত্মক ধ্বংস কি তাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, যখন তারা ঘুমিয়ে আছে? দেখুন এ বিষয়ে আল্লাহর ভাষ্য–

'আমি যখন কোনো অঞ্চলে কোনো নবী পাঠিয়েছি ..... আমি তো ওদের অধিকাংশকেই মহা-অপরাধী হিসেবে পেয়েছি।' (আয়াত ৯৪-১০২)

এরপর আসছে মূসা (আ.)-এর সাথে ফেরাউন ও তার সভাসদদের তর্ক বিতর্কের বিবরণী, তাঁর সাথে ছিলো বনী ইসরাঈল জাতি। এ কাহিনী আল কোরআনের অনেক সূরার মধ্যেই আলোচিত হয়েছে এবং কোরআনের সব থেকে বেশী স্থান জুড়ে রয়েছে। এখানে তার প্রধান কয়েকটা দিক তুলে ধরা হচ্ছে। কয়েকটি দিকের মধ্যে ওদের শাস্তির বর্ণনা এসেছে, যেমন সূরার শেষের দিকে দীর্ঘ একটি স্থান জুড়ে তাদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বর্ণনা দেখা যায়।

সূরা আল মোযযাম্মেল, আল ফাজর, ক্বাফ, আল কামার ইত্যাদি সূরাগুলোর মধ্যে পর্যায়ক্রমে মূসা (আ.) ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর বর্ণনা এসেছে। ওই সমস্ত স্থানের বিবরণগুলো সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট ইংগিত দানকারী। এসব বর্ণনার পর এটিই প্রথম সূরা, যার মধ্যে দীর্ঘ স্থান জুড়ে মূসা (আ.)-এর ঘটনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

এর পর দেখা যায়, এসব বর্ণনার মধ্যে ফেরাউনের যে প্রসংগ এসেছে তাতে তার আকিদা বিশ্বাসের মৌলিক অবস্থাটা তুলে ধরা হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে তার ও তার জাদুকরদের সীমাবদ্ধতাকে। এ দুটি বিষয় অন্যান্য আরো বহু সূরাতেও উল্লেখিত হয়েছে। ফেরাউনের বংশের লোকদের ওপর উপর্যুপরি কয়েক বছর ধরে দুর্ভিক্ষ ও

www.pathagar.com

বিপদাপদ নেমে আসে, নেমে আসে ঝড় তুফান, পংগপাল, উঁকুন, ব্যাঙ ও রক্তের আযাব। এসব আযাবের বিস্তারিত বিবরণ এই সূরা ছাড়া অন্য কোনো সূরাতে আসেনি। বর্ণনা এসেছে এই সূরার মধ্যে ফেরাউন ও তার সভাসদসহ তার জাতির লোকদের সম্পর্কে।

এরপর বনী ইসরাঈল জাতির কার্যকলাপের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে মূসা (আ.)-এর কাছে তাদের জন্যে মূর্তি বানিয়ে দেয়ার দাবীর কথা, আর তাদের পক্ষ থেকে এ দাবী উত্থাপিত হয় তখন, যখন তারা ফেরাউনের আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়ে। নীল নদ পার হয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতে শুরু করেছিলো। এ সূরাতে ওই অধ্যায়ের বর্ণনাও এসেছে যার মধ্যে আল্লাহ পাকের সাথে মূসা (আ.)-এর সরাসরি বাক্যালাপের একটি সুবর্ণ সুযোগ আসে এবং মূসা (আ.) আল্লাহকে নিজ চোখে দেখার জন্যে আব্দার করে বসেন। অতপর পর্বত বিস্ফোরিত হওয়ার ঘটনা ঘটে, মূসা বেহুশ হয়ে পড়ে যান এবং সম্বিত ফিরে পেলে তাঁর কাছে অবতরণ করা হয় আল্লাহর নির্দেশাবলী সম্বলিত ফলকসমূহ।

সূরাটিতে আরো যে বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে, মূসার অনুপস্থিতিতে তাঁর জাতির বাছুর পূজা করার ঘটনা। মূসা (আ.) জাতির মধ্য থেকে বাছাই করা সত্তর জনের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ এবং এবং তাদের আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখার দাবী ও তাদের ওপর বজ্রধ্বনি নেমে আসার ঘটনা। বনী ইসরাঈল জাতিকে নিকটবর্তী এক এলাকায় প্রবেশ করতে বলা হলে তাদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, শনিবারে মাছ শিকার সম্পর্কিত ঘটনা এবং তাদের মাথার ওপর পাহাড় তুলে ধরার ঘটনা। এ সূরার মধ্যেই এসব ঘটনার বিস্তারিত এবং পূর্ণাংগ বিবরণ পেশ করা হয়েছে যা অন্য কোনো সূরাতে তেমন পাওয়া যায় না।

এ সূরার মধ্যে যতোগুলো ঘটনার বিবরণ এসেছে সেগুলো সবই শেষ নবী (স.)-এর রেসালাত সম্পর্কে ইংগিত বহন করে। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রকৃতি কেমন হবে এবং কী হবে তার শিক্ষা সে সব কিছুই ওই ঘটনাবলীর বিবরণে ফুটে উঠেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আমার বেঁধে দেয়া নির্দিষ্ট সময়ে হাযির হওয়ার জন্যে মূসা সত্তর জন লোককে বাছাই করলো...... তারাই সফলকাম।' (আয়াত ১৫৫-১৫৭)

আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এই সত্যও মহাগুরুত্বপূর্ণ খবরের ভিত্তিতে এবং নিরক্ষর নবীর সাথে করা সাবেক ওয়াদার কারণে আল্লাহ তায়ালা নবী (স.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি রেসালাতের কথা প্রকাশ্য ঘোষণা দান করেন, জানিয়ে দেন মানুষকে তাঁর দাওয়াতের মূল কথাগুলো। তাঁর প্রকৃত রব সম্পর্কে জানিয়ে দেন, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন। যেন বলিষ্ঠভাবে সবাইকে বলে দেন সেই তাওহীদ সম্পর্কে যা নিয়ে এর পূর্বে অন্যান্য সকল নবী-রসূলের আগমন ঘটেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো (হে রসূল), হে মানবমন্ডলী, অবশ্যই আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহর রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাদশাহ।.......

www.pathagar.com

তোমরা নিরক্ষর নবীর ওপর, যিনি (নিজে) আল্লাহ্ ও তাঁর সকল নিদর্শনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাঁর অনুসরণ করো, হয়তো তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।'

তারপর একটু বিরতি দেয়ার পর কাহিনী নিজ গতিতে আবার চলতে শুরু করলো। এই সময় আল্লাহ তায়ালা আবার বান্দার সাথে প্রদত্ত তাঁর ওয়াদার দিকে পুনরায় ফিরে এলেন। ফিরে এলেন সেই পাহাড়ের বুকে প্রচন্ড বেগে আন্দোলিত হওয়ার ঘটনা এবং তাঁর ওয়াদা গ্রহণের দিকে। বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে তাঁর প্রদত্ত ওয়াদার কারণে আল্লাহ তায়ালা গোটা মানবমন্ডলীর স্বভাবপ্রকৃতির কাছে সে কথা স্মরণ করাচ্ছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমার রব আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন ..... তুমি কি আমাদেরকে বাতিলপন্থীরা যে অন্যায় করেছে তাদের সেই দোষের কারণে ধ্বংস করে দেবে?' (আয়াত ১৭২-১৭৩)

এরপর নাফরমানদের প্রতি কী কী শাস্তি নেমে এসেছিলো তার ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে- সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে তাদের কাছে সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর নিদর্শনাবলী এসেছিলো, তারপর তা আসা বন্ধ হয়ে যায়, যেমন বনী ইসরাঈল এবং অন্যান্য যে সব জাতির কাছে এসব নিদর্শন আসার পর বন্ধ হয়ে গেছে। এমনিভাবে সূরা আনয়ামে এসব দৃশ্য তৎকালীন সমাজের কার্যকলাপসহ বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ এসেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর ওদেরকে সেই মহা খবরটি পড়ে শোনাও যা আমি মহান আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছি, সে খবর হচ্ছে আমার নিদর্শনাবলী প্রেরণের খবর .... ওরা তো চতুষ্পদ জীব জানোয়ারেরই মতো বরং সেগুলো থেকেও বেশী জ্ঞানবিবর্জিত- ওরাই হচ্ছে উদাসী।' (আয়াত ১৭৫-১৭৯)

এরপর আকিদা বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রাসংগিক আলোচনা এগিয়ে চলেছে, আর এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে থাকা বিশেষকরে অন্তরের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করে এমন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর কঠিন আযাব ও তার পাকড়াও সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হয়েছে এবং অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষায় মানুষকে রসূলের মর্যাদা সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং তাঁর সাথে যথাযথ ব্যবহার করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

'সুন্দর সুন্দর সকল নাম তো আল্লাহরই; অতএব, ওই নামগুলো ধরেই তাঁকে ডাকো .... আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করেন তার জন্যে পথপ্রদর্শক আর কেউ নাই, ... দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দিয়ে থাকেন। (আয়াত ১৮০-১৮৬)

তারপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি ওদেরকে রেসালাতের প্রকৃতি এবং তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানিয়ে দেন। আসলে এ কথাটা

www.pathagar.com

তাদের প্রশ্নের জওয়াবেই বলা হচ্ছে। যেহেতু তাদেরকে তিনি কেয়ামতের ভয় দেখাচ্ছিলেন। তা কখন সংঘটিত হবে একথাটা জিজ্ঞাসা করার কারণেই তিনি তাঁর নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানাচ্ছিলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে, কখন সংঘটিত হবে সেই কেয়ামত? .... বলে দাও, আমি তো শুধু একজন সতর্ককারী এবং .... সুসংবাদদানকারী মাত্র !' (আয়াত ১৮৭-১৮৮)

এরপর, আদি পুরুষ আদম মানুষদের আল্লাহর আনুগত্যের যে ওয়াদা করেছিলেন– যে আনুগত্যবোধ তাঁর প্রকৃতিতে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে এবং শেরক করা তাঁর প্রকৃতির কাছে অপ্রিয়, তার থেকে আজকে মানুষ কেমন করে ফিরে যাচ্ছে তার চমৎকার এক চিত্র এখানে আঁকা হচ্ছে। আর আল্লাহ তায়ালা এই বাক্যটির শেষের দিকে তাঁর রসূল (স.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে তাদের অক্ষম দেব দেবীদেরকে পরিত্যাগ করার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, ডাকো তোমাদের সেই শরীকদেরকে...... আর তুমি দেখছো তাদেরকে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, অথচ আসলে ওরা কিছুই দেখছে না'। (আয়াত ১৯৫-১৯৮)

এখান থেকে সূরাটির শেষ অবধি রসূল (স.)-কে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে, কেমন করে মানুষ পরস্পর লেন দেন করে কেমন করে দ্বীনের এ দাওয়াতকে তারা পাশ কাটিয়ে চলে যায়? কেমন করে তারা ক্লান্তিকর এ জীবন পথে মানুষের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়? কেমন করে সে ক্রোধকে সংবরণ করে। অথচ তারই কাছে মানুষের অনিষ্টতা ও ষড়যন্ত্রের জাল থেকে বাঁচার জন্যে সাহায্য চাওয়া হয়ে থাকে? কেমন করে এই মানুষ ও তার পাশাপাশি মোমেনরা খেয়াল করে শোনে আল কোরআনের মধু-মাখা কথাগুলো? সে কথা বলা হয়েছে। কেমন করে সে তার রবকে স্মরণ করে এবং তাঁর সাথে সদা সর্বদা সম্পর্ক বজায় রাখে তাও বলা হয়েছে? এইভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বোচ্চ দরবারে মানুষকে স্মরণ করবেন বলেও জানানো হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'ক্ষমাশীলতার গুণ গ্রহণ করো এবং নির্দেশ দাও এবং হঠকারী জাহেলদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও .... অবশ্যই যারা তোমার রবের কাছে রয়েছে, তারা তাঁর আনুগত্য থেকে কখনোই অহংকার ভরে মুখ ফেরায়না। তারা তাঁর প্রশংসা গেয়ে চলেছে সদা সর্বদা এবং তাঁর সামনেই তারা সেজদাবনত হয়।'

এইভাবে সকল জরুরী কথাগুলো সংক্ষিপ্তভাবে এই সূরাটির মধ্যে একত্রিত করা হয়েছে এবং জীবনের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরার উদ্দেশ্য সম্ভবত ওই বিশেষ মুহূর্তগুলোর দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যার বর্ণনা অনুরূপভাবে সূরা আল আনয়ামের মধ্যেও পেশ করা হয়েছে। আর এইভাবে কথাগুলো পেশ করতে গিয়েই আল্লাহর প্রতি আকীদার বিষয়টিকে আরো জোরদারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

সূরা ইউনুস

কোরআনের প্রতিটি সূরার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এই সাধারণ বৈশিষ্টের দিক দিয়ে তার মক্কী ও মাদানী অংশ উভয়ই সমান। অনুরূপভাবে অন্যান্য মানবরচিত বাণীর সাথে আল্লাহর কালামের যে পার্থক্য, সে দিক দিয়েও মক্কী ও মাদানী অংশ সমান। এতদসত্তেও কোরআনের মক্কী অংশের কিছু অসাধারণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, রয়েছে তার বিশেষ পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট এবং বিশেষ স্বাদও, যা তার আলোচ্য বিষয় দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মক্কী অংশের বিশেষ বাচনভংগির কারণেও তাতে একটা বিশেষ আবেদন অনুভূত হয়ে থাকে। এই বাচনভংগি অত্যন্ত তাৎপর্যময় ও গভীর প্রভাব বিস্তারকারী। শব্দ চয়ন থেকে বিষয়গত চমৎকারিত্ব পর্যন্ত যাবতীয় ভাষাগত বৈচিত্র্য এই প্রভাব সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। এ বিষয়ে আমরা সূরা আনয়ামেও আলোচনা করে এসেছি। এবার এখানেও ইনশাআল্লাহ কিছুটা আলোচনা করবো।

ইতিপূর্বে পরপর দুটো মক্কী সূরা আনয়াম ও আরাফ রয়েছে। ওই সূরা দুটো ধারাবাহিকভাবে নাযিল না হলেও কোরআনে ধারাবাহিকভাবে স্থান পেয়েছে। তারপর এসেছে মাদানী সূরা আনফাল ও তাওবা। উভয়ের রয়েছে মদীনার সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়, প্রেক্ষাপট ও প্রকৃতি। এবার আমরা যে দুটো মক্কী সূরায় ফিরে যাচ্ছি, তা হচ্ছে সূরা ইউনুস ও হূদ। এ দুটো যেরূপ ধারাবাহিকভাবে নাযিল হয়েছে, সেরূপ ধারাবাহিকভাবেই কোরআনে স্থান পেয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সূরা আনয়াম ও আরাফের সাথে এই দুটো সূরার আলোচ্য বিষয় ও বাচনভংগি উভয় দিক দিয়েই চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে। সূরা আনয়ামে ইসলামের আকিদা বিশ্বাস আলোচিত হয়েছে। সেই সাথে আলোচিত হয়েছে এ আকিদার প্রতি অজ্ঞতা ও বিরোধিতার বিষয়টিও। অতপর এই অজ্ঞতা তথা জাহেলিয়াতকে বিশ্বাসে, চেতনায়, এবাদাতে ও কর্মে সর্বক্ষেত্রেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সূরা আরাফের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পৃথিবীতে ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের গতি ও পরিণতি এবং এ আকিদা কিভাবে সমগ্র ইতিহাস জুড়ে জাহেলিয়াতের মুখোমুখি হয়েছে তাও। সূরা ইউনুস ও হূদেও আমরা আলোচ্য বিষয় ও বাচনভংগি উভয় দিক দিয়েই যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করি। তবে সূরা আনয়াম সূরা ইউনুস থেকে খানিকটা ভিন্ন প্রকৃতির। সূরা আনয়ামের বাচনভংগি মনমগযের ওপর অনেক বেশী প্রভাব বিস্তারকারী, অনেক দ্রুত ও জোরদার আবেগ সৃষ্টিকারী এবং গতিশীলতায় ও দৃশ্য অংকনে অনেক বেশী তেজস্বী ও নিপুণ। আর সূরা ইউনুস অপেক্ষাকৃত ধীর, ঠান্ডা, কোমল ও প্রাঞ্জল বাচনভংগির অধিকারী। পক্ষান্তরে সূরা হূদ বিষয়বস্তু, বাচনভংগি এবং আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সূরা আরাফের সাথে অত্যধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, এ সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র সত্তেও সামগ্রিকভাবে প্রত্যেক সূরারই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও পৃথক সত্তা রয়েছে।

কোরআনের মক্কী অংশের সামগ্রিক আলোচ্য বিষয় যা, সূরা ইউনুসের মূল আলোচ্য বিষয়ও হুবহু তাই এবং সেটা আমরা একটু আগেই বর্ণনা করেছি। এ সূরা

www.pathagar.com

তার নিজস্ব ভংগিতেই তার আলোচ্য বিষয়কে তুলে ধরে। তার এ বর্ণনাভংগি দ্বারা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। সূরার এ ভূমিকায় আমি ওই আলোচ্য বিষয়গুলোকে একে একে সংক্ষেপে তুলে ধরবো।

সূরাটির শুরুতেই রসূল (স.)-এর কাছে ওহীর আগমন সম্পর্কে ও সেই সাথে প্রাসংগিকভাবে কোরআন সম্পর্কে মক্কার মোশরেকদের দৃষ্টিভংগির পর্যালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, একজন মানুষের কাছে ওহী নাযিল হওয়া তেমন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। আর এ কোরআন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো রচিত গ্রন্থও নয়। আয়াত ১, ২, ১৫, ১৬, ৩৭ ও ৩৮ দ্রষ্টব্য।

মক্কার মোশরেকরা রসূল (স.)-এর কাছে কোরআন ছাড়া অন্য একটা বস্তুগত অলৌকিক নিদর্শনের দাবী জানাতো এবং শাস্তি আযাবের যে সব হুমকি ও হুশিয়ারী তাদেরকে দেয়া হতো, সেটা তারা তাড়াতাড়ি পেতে চাইতো। এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন, কোরআনই হলো ইসলামের নিদর্শন। এর যে অলৌকিক ভাষাগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেটা এর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ এবং কাফেরদের প্রতি এক উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ। নিদর্শন দেখানো না দেখানো নিরংকুশভাবে আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। আর তাদেরকে কখন তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করাবেন, সেটাও তিনিই স্থির করবেন। নবী ও রসূল আল্লাহর বান্দা মাত্র। তাদের এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনোই ক্ষমতা নেই। এভাবে প্রকারান্তরে তাদের কাছে আল্লাহর ক্ষমতা ও বান্দার ক্ষমতার পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে। আয়াত ১৩, ১৪, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১ ও ২০ দ্রষ্টব্য।

আল্লাহর পরিচয় ও আল্লাহর সৃষ্টির পরিচয় নিয়ে তাদের মনে যে বিভ্রান্তি রয়েছে, রসূল (স.) সেই বিভ্রান্তি দূর করার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। কিন্তু তারা ওহীকে অস্বীকার করে ও তাতে সন্দেহ পোষণ করে। তারা এমন কোনো নিদর্শন চায়, যা কোরআনের বিশুদ্ধতার প্রতীক। অথচ আদৌ কারো কোনো লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না এমন সব বস্তুর তারা পূজা করে থাকে। কারণ তাদের ধারণা ওইসব পূজনীয় বস্তু বা মূর্তি তাদের মুক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশত এবং একেবারেই যুক্তিপ্রমাণ ছাড়া আল্লাহর সন্তানাদি আছে বলেও দাবী করে থাকে। এর জবাবে এ সূরা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে প্রকৃত ইলাহ তার গুণাবলী ও তাদের চার পাশের প্রকৃতিতে তাঁর সীমাহীন ক্ষমতার যে আলামত বিরাজ করছে, তা কী কী। তাদেরকে আরো জানিয়ে দিয়েছে প্রকৃত প্রভুর কী কী নিদর্শন স্বয়ং তাদের নিজ সত্ত্বার ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে এবং বিপদের সময় তাদের বিবেক তাদের কাছে প্রভুর কি পরিচয় তুলে ধরে। এ সর্বশেষ বিষয়টা এ সূরার বহু জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। এ বিষয়টি সূরার ৪, ৫, ৬, ১৮, ২২, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬১, ৭০, ৫৫ আয়াতসমূহে দ্রষ্টব্য।

সূরার কিছু কিছু অংশে মানুষকে এই মর্মে সচেতন করা হয়েছে যে, মানুষ যে কাজই করুক অথবা মনে মনে যে কোনো ইচ্ছাই পোষণ করুক, তা করার সময় আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকেন। এই বিষয়টি তার চেতনা ও স্নায়ুমন্ডলে

www.pathagar.com

ভয়ভীতি, সতর্কতা ও জাগরণ এনে দেয়। ফলে সে স্বেচ্ছাচারী ও বেপরোয়া হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ ৬১ নং আয়াতটি লক্ষ্য করুন। 'তুমি যে অবস্থাতেই থাকো না কেন, আমি সেখানে উপস্থিত থাকি ......।'

অনুরূপভাবে, এ সূরার কিছু আয়াত মানুষের মনে আল্লাহর আযাবের ভীতি সদা-জাগ্রত রাখে যাতে করে প্রাচুর্য ও সচ্ছলতাজনিত উদাসীনতা থেকে তারা মুক্ত হতে পারে এবং চারদিকে সমৃদ্ধির জৌলুস দেখে প্রতারিত ও আল্লাহর সম্ভাব্য আকস্মিক আযাব সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে না যায়। যেমন ২৪, ৫০ ও ৫১ নং আয়াতে লক্ষণীয়।

দুনিয়াবী জীবনের সুখ শান্তি পেয়েই কাফেরদের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি, আখেরাতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহতা এবং আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহীর অনিবার্যতা সম্পর্কেও এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। তারপর এই বিভ্রান্তিকর পরিতৃপ্তি এবং এই তৃপ্তিদায়ক হীন কারবারের ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। তারপর জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন নিছক পরীক্ষা। কর্মফল শুধু আখেরাতেই পাওয়া যাবে। অতপর কেয়ামতের দৃশ্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত, দুনিয়াতে যাদেরকে মোশরেকরা আল্লাহর শরীক বানাতো, কেয়ামতের দিন সেই শরীকরা কর্তৃক তাদের উপাসকদেরকে অস্বীকার ও অগ্রহ্য করার দৃশ্য, তাদেরকে আল্লাহর হাতে সোর্পদ করে নিজেদেরকে নিরপরাধ বলে দাবী করার দৃশ্য এবং যতো বড় আকারেই জরিমানা সাধা হোক, তা প্রত্যাখ্যাত হবার দৃশ্য। এটা সূরার যে আয়াতগুলোতে পাওয়া যায়, তা হলো ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৪৫, ও ৫৪ আয়াত)

এরপর প্রভুত্ব সম্পর্কে কাফেরদের ভ্রান্ত ধারণা, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন ও আখেরাতকে অস্বীকার করা এবং ওহী ও তার সতর্কবাণীকে প্রত্যাখ্যানের ফলে তাদের ভেতরে জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন নিজেই রচনা করার যে প্রবণতা জন্মে সে সম্পর্কেও এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে তাদের পারস্পরিক লেনদেন ও হালাল হারাম নির্ণয়ে স্বেচ্ছাচারমূলক মনোভাব পোষণ এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্য বাতিল ও ভুয়া প্রভুদের প্ররোচনা অনুসারে এরূপ মনোভাব পোষণের বিষয়েও। বিশ্বাস সংক্রান্ত সমস্যার সাথে জড়িত ও তা থেকে সৃষ্ট সমস্যাবলীর মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। (আয়াত ৫৯-৬০)

সূরার উল্লেখিত আলোচিত বিষয়গুলোকে শ্রোতাদের অন্তরে গভীরভাবে ও দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করা এবং সে জন্য মন ও বিবেককে উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে সূরায় আরো কিছু প্রভাব বিস্তারকারী ও তাৎপর্যবহ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যা সূরার সামগ্রিক ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ধরনের কয়েকটি বিষয়কে এখানে সংক্ষেপে নমুনা স্বরূপ তুলে ধরা হচ্ছে।

সূরাটিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হয়েছে এ সব দৃশ্য ও বৈশিষ্ট্য মানুষের মনমগযে আল্লাহর প্রভুত্ব, বিশ্বজগতের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় তাঁর প্রাজ্ঞ কর্মকান্ড, তৎপরতা, জগতে জীবন ও জীবের জন্ম ও অবস্থানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, বিশেষত মানবজাতির উপযোগী পরিবেশ ও

www.pathagar.com

সামগ্রী সৃষ্টি এবং তার সমস্ত জৈবিক প্রয়োজন পূরণে আল্লাহর নৈপুণ্য প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্ববিধাতার বিদ্যমানতার বিষয়টিকেও কোরআন এরূপ জীবন্ত ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে তুলে ধরে, কোনো দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক বিতর্ক হিসাবে তুলে ধরে না। মহাবিশ্বের ও মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন যে, মানুষের স্বভাব প্রকৃতি এবং মহাবিশ্বের দৃশ্য ও রহস্যের মাঝে একটা বোধগম্য ভাষার যোগসূত্র রয়েছে, রয়েছে নিরুত্তাপ মনস্তাত্ত্বিক যুক্তিতর্কের চেয়েও গভীর ও ঘনিষ্ঠ বন্ধন। আল্লাহর এও জানা আছে যে, মানুষের জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতিকে কেবলমাত্র প্রকৃতির দৃশ্যাবলী ও রহস্যাবলীর প্রতি কৌতূহলী বানিয়ে দেয়াই তাঁর সঠিক পথের সন্ধান লাভের জন্যে যথেষ্ট। তাকে শুধু এতোটুকু উদ্দীপিত করাই যথেষ্ট, যাতে তার সহজাত বোধশক্তি জেগে ওঠে। এ জন্যই কোরআনে মানুষের ফিতরাত তথা জন্মগত স্বভাব প্রকৃতি ও সহজাত যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে সম্বোধন করে অনেক কথা বলা হয়েছে। এ প্রসংগে ৩, ৪, ৩১, ৩২, ৬৭ ও ১০১ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

কাফেররা যে সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা স্বচক্ষে দেখে থাকে এবং তারা যে সব ঘটনার প্রতিনিয়ত ভুক্তভোগী, অথচ সেগুলোর শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না, সে জাতীয় ঘটনা ও অভিজ্ঞতায় সূরাটা পরিপূর্ণ; শুধু তাই নয়, এই সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে তারা কিভাবে গ্রহণ করে তারও কিছু দৃশ্য এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি যে সকল ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিসত্ত্বা সম্পর্কেও উদাসীন ও অচেতন, তাদের সামনেও আয়না রেখে তাদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরে। সূরার ১২, ২১, ২২, ২৩ নং আয়াতসমূহে এর নমুনা লক্ষণীয়।

আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করার পরিণামে যারা আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়েছে, তাদের বহু ঘটনা এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের সামনে তাদের ধ্বংসের দৃশ্য তুলে ধরে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে যে, এ ধরনের পরিণতি তাদেরও হতে পারে। কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তাদেরকে প্রতারিত না করে। কেননা দুনিয়ার জীবন পরীক্ষার একটা ক্ষুদ্র সময় মাত্র। এরপর তাদেরকে চিরস্থায়ী শক্তি অথবা আযাবের স্থানে চলে যেতে হবে। এ বিষয়টি উপলব্ধির জন্যে ১৩, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৯২ ও ১০২ নং দ্রষ্টব্য।

সূরাটিতে কেয়ামতের বহু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। কাফের ও মোমেনদের পরিণামকে অত্যন্ত জীবন্ত ও প্রভাবশালী ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। পার্থিব জীবনে কাফেরদের ধ্বংস ও মোমেনদের নিস্তার লাভের দৃশ্যের পাশাপাশি আখেরাতেও উভয়ের পরিণামের দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াত ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ ও ৫৪ দ্রষ্টব্য।

সূরার কিছু সংখ্যক আয়াতে ওহী অস্বীকারকারী মোশরেকদেরকে কোরআনের মতো কোনো একটি আয়াত তৈরী করে নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। দাওয়াত ও চ্যালেঞ্জ দেয়ার পর রসূল (স.)-কে তাদের নিয়ে চিন্তা না করা ও তাদেরকে তাদের কর্মফলের হাতে সোপর্দ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কেননা কাফের ও যালেমদের

www.pathagar.com

এটাই চিরন্তন পরিণতি। তাদের প্রতি দাওয়াত পৌছানোর কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করার পর তাদের নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে নিজের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ প্রদান ও কাফেরদের সংস্রব ত্যাগের ঘোষণাই তাদের মনে কম্পন সৃষ্টি করে, তাদের হঠকারিতাকে নড়বড়ে করে দেয় এবং এ ধারণা সৃষ্টি করে যে, এ নবী তার আনীত সত্যের প্রতি অবিচল বিশ্বাস পোষণ করে এবং তার প্রভুর সাথে তার সম্পর্ক অটুট। নিম্নের আয়াতগুলোকে এ এ বক্তব্য এসেছে। আয়াত ৩৭, ৩৮, ৩৯, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮ ও ১০৯।

এই চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণার মধ্য দিয়েই সূরাটা শেষ হয়েছে। এই সাথে শেষ হলো এ সূরার আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এ সূরাটি সূরা বনী ইসরাঈলের পরে নাযিল হয়েছে। এ সময়ে কোরআন ও ওহীর ব্যাপারে মোশরেকদের আপত্তি ও অস্বীকৃতি এবং মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাস নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ তুংগে উঠেছিলো। তাই এ সূরায় কাফেরদের জাহেলী কৃষ্টি ও আকীদা বিশ্বাসের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের আকীদাবিশ্বাসে যে সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা রয়েছে, তাও ফাঁস করে দেয়া হয়েছে। কেননা একদিকে তারা বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, জীবিকাদাতা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী– অপরদিকে ফেরেশতাদেরকে তারা আল্লাহর মেয়ে বলে বিশ্বাস করতো। তারা আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে সুপারিশ করে আযাব থেকে মুক্ত করতে পারবে বলে ধারণা করতো। এ জন্য তাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করতো। আর এরূপ ধারণা বিশ্বাস থেকে তাদের বাস্তব জীবনে যে ভ্রান্ত আচার আচরণ প্রকাশ পেতো, যেমন বিশেষ বিশেষ ফলমূল ও জীবজন্তুকে হালাল বা হারাম বলে তাদের পুরোহিতরা ঘোষণা করতো এবং তার একাংশ আল্লাহর জন্যে ও একাংশ তাদের কল্পিত দেব দেবীর জন্যে নির্ধারণ করতো।

তারা কোরআনের অনুসারীদের সাথে তাদের পরস্পর বিরোধী আকীদা নিয়ে তর্কবিতর্কে লিপ্ত হতো। একদিকে তার রসূল (স.)-এর রেসালাত ও তাঁর কাছে ওহী আসার কথা অবিশ্বাস করতো এবং তাঁকে জাদুকর বলে আখ্যায়িত করতো। অপরদিকে তাকেই তারা এমন কোনো অলৌকিক প্রমাণ দেখাতে বলতো, যা দ্বারা বুঝা যাবে যে, তিনি যথার্থই নবী এবং তাঁর কাছে ওহী আসে। অতপর তারা সেই সব উদ্ভট দাবী তুলতো, যার কথা সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৯ থেকে ৯৩নং আয়াত পর্যন্ত এবং সূরা ইউনুছের ২০নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে তারা রসূল (স.)-এর কাছে এমন একটা বিকল্প কোরআন উপস্থাপনের দাবী তুলতো, যাতে তাদের আকিদা বিশ্বাস, দেব দেবী ও জাহেলী রীতিনীতির কোনো নিন্দা সমালোচনা করা হবে না। সে রকম কোরআন আনা হলে তার ওপর তারা ঈমান আনবে। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে সূরা ইউনুসের আয়াত ১৫, ১৬ ও ১৭ তে বলেন,

www.pathagar.com

'যখন তাদের কাছে আমার আয়াত পড়ে শোনানো হতো, তখন আমার সাথে সাক্ষাতে যারা বিশ্বাস করে না, তারা বলতো, এই কোরআনের পরিবর্তে অন্য একটা কোরআন নিয়ে এসো অথবা এটাকে বদলে দাও......।'

এই হচ্ছে সূরার পটভূমি। সূরাটা আগাগোড়া পড়লে মনে হয়, এটা একটা অখন্ড সূরা এবং একটা নিকটবর্তী ঘটনাই তার লক্ষ্যবস্তু। ফলে তাকে বিভিন্ন পর্বে সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত করা কঠিন। পক্ষান্তরে অপর একটা মহল এ সূরার ৪০, ৯৪, ৯৫ ও ৯৬ নং আয়াতকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে মনে করে। কেননা এ আয়াতগুলো সূরার মূল সুরের বিপরিত ধারার। আবার এর কোনো কোনো আয়াতকে বাদ দিলে গোটা সূরাই অন্য রকম লাগে।

সূরার সকল অংশের মধ্যে সংযোগ নিবিড় হওয়ার কারণে তার প্রথমাংশ ও শেষাংশের বক্তব্যে গভীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রথমাংশে বলা হয়েছে, 'আলিফ-লাম-রা, এ হচ্ছে বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াতসমূহ। মানুষের কাছে এটা কি বিস্ময়কর যে, আমি তাদেরই একজনের কাছে ওহী পাঠিয়েছি এবং একটি বলেছি যে, মানুষকে সতর্ক করো ও যারা ঈমান আনে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্যে সত্য মর্যাদা রয়েছে।......' আর শেষ আয়াতে বলা হচ্ছে, 'তোমার কাছে ওহী যোগে যা পাঠানো হয়, তার অনুসরণ করো এবং আল্লাহর সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো। ....' অর্থাৎ সূরার প্রারম্ভিক ও সমাপনী উভয় বক্তব্যই ওহী বিষয়ক। শুধু এই প্রারম্ভ ও সমাপনীর মাঝখানে যা কিছু আলোচনা এসেছে, তাও ওহীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েই আবর্তিত।

অনুরূপভাবে সূরার বিভিন্ন ভীতিপ্রদ বক্তব্যের মধ্যেও গভীর সংযোগ পরিলক্ষিত হয়। আযাবের হুমকিকে দ্রুত কার্যকর করার জন্যে কাফেররা যে দাবী জানাচ্ছিলো, তার জবাবকে আমরা এর উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করতে পারি। জবাবে বলা হয়েছে যে, আযাব এমন আকস্মিকভাবে আসবে যে, তখন তারা ঈমান আনলে বা তাওবা করলেও তা কোনো কাজে লাগবে না। এরপর সূরায় এমন কয়েকটা কিসসা কাহিনীও বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অতীতের অবিশ্বাসীদের ধ্বংসের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

তাদের জবাব দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে কবে এ হুমকি কার্যকরী হবে? .... প্রত্যেক জাতির জন্যেই একটা সময় নির্ধারিত আছে। যখন তাদের নির্ধারিত সময় আসবে, তখন তা এক মুহূর্ত আগেও আসবে না, এক মুহূর্ত পরেও আসবে না।'....... (আয়াত ৪৭-৫২)

সূরার যে জায়গায় মূসা (আ.)-এর কাহিনী শেষ হয়েছে, সেখানে এ দৃশ্যটা এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যেন তা ওই হুমকিরই বাস্তব রূপ।

'আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। ফেরাউন ও তার বাহিনী তৎক্ষণাত পিছু ধাওয়া করলো। ..... (আয়াত ৯০, ৯১, ৯২) এরপর সূরার বিভিন্ন পর্যায়ে ওই জবাব ও এই ঘটনার মাঝখানে আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ কিভাবে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করে থাকেন, তার দৃশ্যাবলী একে একে বর্ণনা করা

www.pathagar.com

হয়। এ পাকড়াও এতোই আকস্মিক যে, কেউ তা আগে থেকে কল্পনাও করতে পারে না এবং জানেও না। এভাবে সূরা একই অখন্ড পরিবেশের চিত্র তুলে ধরে, যার দৃশ্যে, বক্তব্যে ও ভূমিকায় পরিপূর্ণ সমন্বয় বিরাজ করে।

অনুরূপভাবে সূরার শুরুতে রসূল (স.) সম্পর্কে কাফেরদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে যে, 'কাফেররা বললো, এতো নিশ্চয়ই প্রকাশ্য জাদুকর।' আর ফেরাউন ও তার দল বলের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে যে, 'মূসা যখন তাদের কাছে সত্য নিয়ে এলো, তখন তারা বললো, এতো নিশ্চয়ই প্রকাশ্য জাদুকর। উভয় বক্তব্যে কী অপূর্ব সাদৃশ্য!

সূরায় হযরত ইউনুসের ঘটনা খুব সামান্যই এসেছে। তবু নাম রাখা হয়েছে সূরা ইউনুস। হযরত ইউনুসের ঘটনার উল্লেখ শুধু এতোটুকু,

'এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই যে, কোনো জাতি আযাব দেখার পর ঈমান এনেছে, অতপর তার সে ঈমান তার জন্যে ফলদায়ক হয়েছে। কেবল ইউনুসের জাতি ছাড়া। তারা যখন ঈমান আনলো, তখন আমি তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে অপমানজনক শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছিলাম।'

তবে এতদসত্তেও হযরত ইউনুসের ঘটনা এক শ্রেণীর মানুষের জন্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। যারা আযাব এসে যাওয়ার আগে আত্মশুদ্ধি করে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাদের জন্যে অবশ্যই এটা একটা দৃষ্টান্ত। সময় থাকতে আত্মশুদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করার এ এক চমৎকার উদাহরণ। ইউনুসের জাতিই ইতিহাসে একমাত্র জাতি, যারা সামষ্টিকভাবে নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে, ফলে নবীর প্রত্যক্ষ দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের যে পরিণামে হযরত ইউনুস তাদের জন্য আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কিন্তু তারা পুনরায় সামষ্টিকভাবে আত্মশুদ্ধি করে ঈমান আনে। ফলে আল্লাহ তাদের আযাব থেকে মুক্তি দেন। এভাবে সূরাটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন অখন্ড সমন্বয় ও সংযোগ দেখতে পাই যে, সূরাটাকে একটা অখন্ড ও সুসংবদ্ধ একক না মেনে উপায় থাকে না।

এ ভূমিকায় উদ্ধৃত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রভুত্ব ও দাসত্ব, উভয়ের প্রকৃত পরিচয় এবং তার স্বাভাবিক ফল স্বরূপ মানবজীবনে যে পরিবর্তন আসা আবশ্যক, সেটাই এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ ছাড়া ওহী, আখেরাত ও পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনাবলীসহ অন্য যে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা আলোচিত হয়েছে মূলত ওই প্রধান আলোচ্য বিষয়টির বিশ্লেষণের প্রয়োজনে, তার গভীরতা ও ব্যাপকতা বোঝানোর উদ্দেশ্যে এবং মানুষের জীবনে, বিশ্বাসে ও কাজ কর্মে তা যে পরিবর্তন কামনা করে, সেটা বুঝানোর লক্ষ্যে।

বস্তুত প্রভুত্ব ও দাসত্বের বিষয়টি শুধু এ সূরার নয়, বরং সমগ্র কোরআনের এবং বিশেষত কোরআনের মক্কী অংশের মূল আলোচ্য বিষয়। কোরআনের প্রধান আলোচিত বিষয় এই যে, বিশ্বজগতের ইলাহ তথা প্রভু, প্রতিপালক, মনিব, বিধাতা ও সর্বময় অধিপতি কে, তাঁর সার্বভৌমত্ব, নিরংকুশ প্রভুত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্ব, দাসত্ব ও তার সীমানা-চৌহদ্দী, যা অতিক্রম করা যায় না। মানুষকে কিভাবে তার প্রকৃত প্রভু ও

www.pathagar.com

মনিবের দাসে পরিণত করা যায় এবং কিভাবে সেই একমাত্র প্রভু ও মনিবের সর্বময় প্রভুত্ব, নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতি মানুষের স্বীকৃতি আদায় করা যায়। এ ছাড়া আর যা কিছু আলোচিত হয়েছে, তা মানবজীবনে এ সত্যের দাবী কী কী ও কতো সুদূর প্রসারী, তা বোঝানোর জন্যেই আলোচিত হয়েছে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, এ মহা সত্যের ব্যাপারে কোরআনের এতো বিশদ আলোচনা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। কেননা এটা কোরআনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এর জন্যে সকল নবীর প্রেরণ ও সমস্ত আসমানী কেতাব নাযিল করা সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি যখনই কোনো রসূল পাঠাই, তার কাছে ওহী নাযিল করি যে, আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।' মানুষের পার্থিব জীবন সুষ্ঠু ও সুন্দর হতে পারে কেবল তখনই, যখন তাদের আকীদা বিশ্বাসে ও বাস্তব জীবনে এ মহাসত্যের নির্ভুল প্রতিফলন ঘটে।

জীবনে এ মহাসত্যের সার্বিক প্রতিফলন না ঘটলে প্রথমত এ বিশ্ব প্রকৃতির সাথে তার দ্রব্যসমূহ ও প্রাণীদের সাথে আচরণ সঠিক হতে পারে না। কেননা বিশ্বজগতের ও নিজের সর্বময় মনিব ও প্রভু কে, সে কার বা দাস, আর দাস হিসাবে তার করণীয় কী, এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিস ও বিভিন্ন প্রাণী এমনকি বিভিন্ন কল্পিত সত্ত্বা ও ছায়ামূর্তিকে পর্যন্ত উপাস্য বা প্রভুতে পরিণত করে থাকে, আর নিজেকে অত্যন্ত হাস্যকরভাবে তার দাসানুদাসে পরিণত করে এবং ওইসব প্রভু বা মনিবকে নিজের জীবিকার একাংশ দিয়ে দেয়, এমনকি কখনো কখনো এ জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। অথচ ওই জিনিস বা প্রাণীর কোনোই ক্ষমতা নেই। কারো লাভ বা ক্ষতি ঘটানোর কোনো সামর্থ তাদের নেই। এ সব বস্তু ও প্রাণীর মাঝে ঝুলন্ত থাকার কারণে ও তাদের দাসত্ব করার কারণে মোশরেকদের গোটা জীবনই তছনছ ও বিশৃংখলার শিকার হয়ে যায়।

সম্পদ ও সন্তানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের দাসত্ব করার কী পরিণাম দাঁড়ায়, এ হচ্ছে তার কিছু দৃষ্টান্ত। আল্লাহর পরিবর্তে তার সৃষ্টির জন্যে কোনো সম্পদ নির্দিষ্ট করলে তার ফল এ রকমই হয়ে থাকে। কেননা ওই সব বস্তু বা প্রাণীকে উপাস্য মানা ও সম্পদের অংশ দেয়ার সপক্ষে আল্লাহর কোনো নির্দেশ নেই।

অনুরূপভাবে, মানুষের পরস্পরের সাথে সহাবস্থানও সুখকর হয় না– যদি তাদের আকীদা বিশ্বাস, এবাদাতে ও কর্মজীবনে দাসত্ব ও প্রভুত্ব সংক্রান্ত ধারণা স্পষ্ট না থাকে। যে আকীদায়, আদর্শে ও সমাজ ব্যবস্থায় আল্লাহর একক প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও শাসন স্বীকৃত হয় না, দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের জীবনের ওপর আল্লাহর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে না এবং মানব জীবনের গোপন বা প্রকাশ্য সকল ব্যাপারে আইন রচনা, হুকুম জারী ও আদেশ দানের অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট থাকে না, সেই আকীদা ও আদর্শে এবং সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষের মনুষ্যত্ব, মর্যাদা ও প্রকৃত পূর্ণাংগ স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হতে পারে না।

www.pathagar.com

ইতিহাসের বাস্তবতা এ মহা সত্যের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। আকিদা বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে যখনই মানুষ আল্লাহর আনুগত্য পরিত্যাগ করে মানুষের আনুগত্য করে, তার অনিবার্য ফল দেখা দেয় এই যে, তারা তাদের মানবতা, মর্যাদা ও স্বাধীনতা সবই হারায়।

ইসলাম ইতিহাসের যে বিশ্লেষণ দেয়, তদনুসারে মানব সমাজের ওপর আল্লাহদ্রোহী শাসকদের দৌরাত্ম্য দেখা দেয়ার একমাত্র কারণ হলো আল্লাহর বিধানের আনুগত্য পরিত্যাগ করা। এ বিধান আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বা প্রভু বলে ঘোষণা করে এ অর্থে যে, প্রভুত্ব, আধিপত্য, কর্তৃত্ব, রাজত্ব, শাসন ও সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিকার আল্লাহর– আর কারো নয়। আল্লাহ তায়ালা সূরা যোখরুফে বলেন, 'ফেরাউন তার জনগণকে জিজ্ঞাসা করলো যে, মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? এ নদনদীগুলো তো আমার হুকুমেই চলে ....।' (আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪)

এখানে সর্বশেষ আয়াতে স্পষ্টই জনগণের ওপর তাদের আল্লাহর অবাধ্য হওয়াকে ফেরাউনের স্বৈরাচারী শাসন চালাতে পারার একমাত্র কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত যে জাতি এক আল্লাহর অনুগত ও বিশ্বাসী এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো সার্বভৌমত্ব ও শাসনাধিকার মানে না, কোনো স্বৈরাচারী শাসক তাদেরকে নিজের গোলাম বানাতে পারে না।

যারা এককভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে এবং তাদের কিছু লোককে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মনগড়া বিধান অনুসারে তাদের ওপর শাসন চালাতে সুযোগ দিয়েছে, তারা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর গোলামদের গোলামীতে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে। আর এ গোলামী তাদের মনুষ্যত্ব, তাদের মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে কুরে কুরে খেয়ে সাবাড় করে দেয়।

বিকৃত খৃষ্টধর্মের নামে ফ্যাসিবাদী গীর্জার যুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে ইউরোপ আল্লাহর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বসেছিলো। এ গীর্জা চরম স্বেচ্ছাচারী আচরণের মাধ্যমে সকল মানবিক মূল্যবোধকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলো। এরপর জনগণ মনে করলো যে, গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ভিত্তিক নতুন সমাজব্যবস্থায় তাদের মানবতা, স্বাধীনতা ও সম্মান সংরক্ষিত হয়েছে। মানব রচিত সংবিধান, সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনগত ও বিচার বিভাগীয় রক্ষা ব্যবস্থা, নির্বাচিত সংখ্যাগুরুর শাসন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত হবে বলে তারা আশা পোষণ করলো। কিন্তু শেষ ফল কী দাঁড়ালো! শেষ ফল দাঁড়িয়েছে পুঁজিবাদী স্বৈরতন্ত্র, যা সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিছক কল্পনা বা সাইনবোর্ড সর্বস্ব বানিয়ে ছেড়েছে। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সংখ্যালঘুর স্বৈরাচারী শাসনে শোচনীয় গোলামীর জীবন যাপন করছে। কেননা এ সংখ্যালঘুর হাতে দেশের বেশীর ভাগ সম্পদ পুঞ্জীভূত। আর এরই বলে তারা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। সংবিধান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং অন্য যে সব রক্ষা কবচের ওপর জনগণ নিজেদের মানবতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদার রক্ষক হিসাবে আস্থা স্থাপন করেছিলো, তা কোনো কাজে লাগেনি।

www.pathagar.com

এরপর সেখানে একটি দল পুঁজিবাদী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শ্রেণীহীন দলীয় শাসন কায়েম করলো। এতেই বা কী লাভ হলো? আগে ছিলো তারা পুঁজিবাদী শ্রেণীর গোলাম। এবার হলো সর্বহারা শ্রেণীর গোলাম। পুঁজিবাদী শ্রেণীর গোলামী রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের গোলামীতে রূপান্তরিত হলো। আর এটা হয়ে দাঁড়ালো পুঁজিবাদের চেয়েও মারাত্মক।১

মোট কথা প্রত্যেক ব্যবস্থায় মানুষের ওপর মানুষের গোলামী অব্যাহত রইলো। বিপুল অর্থ ও প্রাণের বিনিময়ে প্রতিবার মানুষের এক শ্রেণীর হাত থেকে আর এক শ্রেণীর হাতে প্রভুত্ব হস্তান্তরিত হতে লাগলো।

বস্তুত গোলামী, দাসত্ব বা আনুগত্য ছাড়া উপায় নেই। সেটা যদি আল্লাহর গোলামী না হয়, তবে মানুষের হবেই। একমাত্র আল্লাহর গোলামী মেনে নিলে মানবজাতির মর্যাদা ব্যক্তি-স্বাধীনতা সবই বহাল হয়। পক্ষান্তরে মানুষের ওপর মানুষের গোলামী তার স্বাধীনতা ও সম্মান সমূলে বিনষ্ট করে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তার যাবতীয় বস্তুগত স্বার্থও ধ্বংস করে।

এ কারণে আল্লাহর সকল কিতাবে ও সকল নবীর দাওয়াতে প্রভুত্ব ও দাসত্বের বিষয়টা সর্বোচ্চ গুরুত্বের অধিকারী। এ সূরায়ও তার কিছু নমুনা প্রতিফলিত হয়েছে। এটা শুধু প্রাচীন জাহেলী সমাজের পৌত্তলিকদের ব্যাপারে নয়, বরং সর্বকালে ও সর্বস্থানে প্রত্যেক মানুষের সাথেই এর সম্পর্ক রয়েছে। এর সম্পর্ক রয়েছে প্রত্যেক জাহেলিয়াতের সাথে, চাই তা ইতিহাস পূর্ব কালের জাহেলিয়াত হোক বা ঐতিহাসিক যুগের জাহেলিয়াত হোক, কিংবা বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত হোক কিংবা মানুষের ওপর মানুষের গোলামী চাপিয়ে দেয় এমন যে কোনো জাহেলিয়াতই হোক না কেন।২

এ কারণে প্রত্যেক রেসালাত ও প্রত্যেক আসমানী কেতাবের মূল কথা ছিলো মানুষের ওপর আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা। সূরার সর্বশেষ বিষয়টি ছিলো এই,

'বলো, হে মানবজাতি! তোমরা যদি আমার পাঠানো বিধান সম্পর্কে সন্দেহে লিপ্ত হয়ে থাকো, তবে আমি তোমরা যার উপাসনা করো, কিন্তু একমাত্র সেই আল্লাহর এবাদাত করবো যিনি আমাদের সকলকে মৃত্যু দিয়ে থাকেন ......।' (আয়াত ১০৪-১০৯)

---

১. পশ্চিমী গণতন্ত্রে কোনোদিনই যে দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মতামতের প্রতিফলন ঘটেনা তা তথাকথিত গণতন্ত্রের ভূখন্ডসমূহের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি। ইউরোপ আমেরিকার বিধগ্ধ চিন্তা নায়করাও আজ অকপটে তা স্বীকার করছেন যে এই পদ্ধতিতে হামেশাই সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের ওপর শাসন শোষণ করে। ওদিকে সুদীর্ঘ ৭০ বসর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন করে সে ব্যবস্থার দাড় করানো হলো তা তার ব্যর্থতার কলংক মাথায় নিয়ে পুনরায় ঘৃনীত পুজিবাদের দিকেই ফিরে গেলো। - সম্পাদক

২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রচিত 'ইসলাম ও জাহেলিয়াত' এবং মোহাম্মদ কুতুব রচিত 'বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত' দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সূরা হূদ

এ সূরাটি পুরোপুরিই মক্কায় অবতীর্ণ। তবে কারো কারো মতে এর ১২, ১৭ ও ১১৪ নং আয়াতগুলো মদীনায় অবতীর্ণ। এ তিনটি আয়াতকে সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে পড়লে মনে হয়, আয়াত তিনটি সূরার যথাস্থানেই আছে এবং ওখান থেকে ওগুলোকে সরিয়ে নেয়া হলে শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে হয়। তাছাড়া এর আলোচ্য বিষয়গুলো মৌলিক আকিদা বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট মক্কী বিষয়। এই আকিদা বিশ্বাসের ব্যাপারে কোরায়শ বংশীয় মোশরেকদের দৃষ্টিভংগি, তাদের এই দৃষ্টিভংগির কারণে রসূল (স.) ও তার সাথী মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলমানের মনে সৃষ্ট উদ্বেগ ও অস্থিরতা এবং এই অস্থিরতা নিরসনে কোরআনের ভূমিকাও এ সূরায় আলোচিত হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ ১২নং আয়াতের কথাই ধরা যাক। এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে ধন সম্পদ নেমে আসুক তো দেখি কিংবা তার সাথে কোনো একজন ফেরেশতা আসুক তো দেখি'– এ কথা কাফেররা বলার কারণে হয়তো তুমি তোমার কাছে ওহীযোগে প্রেরিত বিধানের কিছু অংশ ছেড়েই দেবে এবং এর দরুন তোমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে আসছে......' এ কথা বলাই বাহুল্য যে, কোরায়শের পক্ষ থেকে এ ধরণের হঠকারী বক্তব্য প্রদানের কারণে রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়া ও তাকে ওহীর বিধানের ওপর অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করা জরুরী হয়ে পড়ে, এটা মক্কাতেই ঘটেছিলো বিশেষত হযরত খাদিজা ও আবু তালিবের মৃত্যু, মেরাজের ঘটনা, স্বয়ং রসূল (স.)-এর ওপর মোশরেকদের হামলা করার উদ্যোগ গ্রহণের পরে। এটা ছিলো মক্কায় ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে কঠিন ও নৈরাশ্যজনক সময়।

আর ১৭ নং আয়াতের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সূরাটা কোরআনের মক্কী অংশেরই অন্তর্ভুক্ত এবং কোরায়শকে লক্ষ্য করেই তা নাযিল হয়েছে। কেননা কোরআন নিজেই রসূল (স.)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাঁর কাছে নাযিল হয়। তাছাড়া পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং বিশেষত মূসার কিতাবও এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিছু সংখ্যক আহলে কেতাবও এ মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছিলো। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আহলে কেতাবের কিছু লোক মক্কায়ও বাস করতো। এই সাথে মোশরেকদের নীতি ও দৃষ্টিভংগির নিন্দা, তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে কুফরী করার জন্যে দোযখের আযাবের হুমকি দান, রসূল (স.)-কে এ বলে প্রবোধ দান যে, তিনি সত্যের ওপরেই আছেন, কাজেই তাঁর বিচলিত হওয়া ও দাওয়াত বন্ধ করার প্রয়োজন নেই– এ সব বক্তব্য দান থেকে বুঝা যায় যে, এ আয়াতটাও আসলে মক্কী। মূসার কিতাবের উল্লেখ দ্বারা কারো কারো সন্দেহ হয়ে থাকতে পারে যে, আয়াতটা মদীনায় অবতীর্ণ। কিন্তু এটা আসলে বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে বলাও হয়নি কিংবা তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জও নয়, যা মাদানী কোরআনে সুপরিচিত। আসলে মূসার কিতাবের উল্লেখ এসেছে আহলে কিতাবের কিছু কিছু লোকের স্বীকৃতির পক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে এবং মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে নাযিল করা ওহীর প্রতি মূসার কিতাবের সমর্থনের জন্যে।

www.pathagar.com

সূরাটা নাযিল হবার সময় মক্কায় যে কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো এবং সেই পরিস্থিতির যা সুস্পষ্ট দাবী ছিলো, তার সাথে এই ব্যাখ্যা অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১১৪ নং আয়াতটার পূর্বে রসূল (স.)-কে প্রবোধ দেয়া হয়েছে। কারণ হযরত মূসা (আ.)-এর কিতাবের ওপর ইতিপূর্বে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো বলে তিনি নিজের ব্যাপারেও শংকিত ছিলেন। এ আয়াতের পূর্বে রসূল (স.) ও তাঁর সাথে তাওবাকারীদেরকে সত্যের ওপর অবিচল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মোশরেকদের পক্ষ নিতে নিষেধ করা হয়েছে। আর নামায ও ধৈর্যের সাহায্য নিতে বলা হয়েছে, যাতে সেই কঠিন সময়টার মোকাবেলা করা যায়। এ সব বক্তব্য ধারাবাহিকভাবে ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪ ও ১১৫ নং আয়াতগুলো পড়ে দেখলে স্পষ্টতই মনে হবে যে, ১১৪নং আয়াত মক্কী আয়াত।

সমগ্র সূরাটা সূরা ইউনুসের পরে নাযিল হয়েছে। আর সূরা ইউনুস নাযিল হয়েছে সূরা বনী ইসরাঈলের পর। এর ফলে সূরাটা ঠিক কোন সময়ে নাযিল হয়েছে, তার কিছু লক্ষণ নির্দিষ্টভাবে জানা যায়। মক্কায় ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাস প্রসংগে আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, ওই সময়টা ছিলো সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টকর সময়। কেননা তখন চাচা আবু তালিব ও হযরত খাদিজা (রা.) ইন্তিকাল করেছেন। আবু তালিব বেঁচে থাকতে মোশরেকরা রসূল (স.)-এর সাথে যে সব আচরণ করতে সাহস পায়নি, এ সময় সেই ধরনের আচরণও করতে শুরু করে দিয়েছিলো। বিশেষত বিস্ময়কর মেরাজের ঘটনার পর তারা তার সাথে ব্যংগবিদ্রূপ করতে থাকে এবং কিছু কিছু মুসলমান মুরতাদ পর্যন্ত হয়ে যায়। এ সাথে রসূল (স.) হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালে দুঃসহ একাকীত্ব অনুভব করতে থাকেন। এ সময় রসূল (স.)-এর আন্দোলনের বিরুদ্ধে মোশরেকদের ঘোষিত যুদ্ধ নিষ্ঠুরতম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায় এবং মক্কা ও তার আশেপাশে আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো না। এর অব্যবহিত পরই আল্লাহ প্রথম আকাবা ও দ্বিতীয় আকাবার বায়াতের মাধ্যমে রসূল (স.) ও মুসলমানদের বিজয়ের দ্বারোদঘাটন করেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়ায়লিদ ও আবু তালিব একই বছর মারা গেলে রসূল (স.)-এর ওপর বিপদ মুসীবতের পাহাড় নেমে আসে। খাদিজা ছিলেন ইসলামের ব্যাপারে তাঁর একনিষ্ঠ উপদেষ্টা। আর আবু তালেব ছিলেন তাঁর কাজের সহায়ক, শক্তির যোগানদাতা এবং তাঁর গোত্রের লোকদের অত্যাচার থেকে তাঁকে রক্ষাকারী। এই উভয় ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে রসূল (স.) বিপদাপদের মুখোমুখি হতে থাকেন। এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে রসূল (স.)-এর মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পূর্বে। আবু তালিবের জীবদ্দশায় মোশরেকরা রসূল (স.)-কে এমনভাবে নির্যাতন করার সাহস করেনি, যেমনটি তার তিরোধানের পর করেছিলো। এমনকি কোরায়শের একজন নগণ্য ব্যক্তিও তাঁর সামনে এসে তাঁর মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে।......... এরপর রসূল (স.) মাথায় মাটি নিয়ে যখন বাড়ীতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর এক মেয়ে তাঁর কাছে

www.pathagar.com

আসেন। তিনি তাঁর মাথার মাটি ধুয়ে সাফ করতে ও কাঁদতে থাকেন। রসূল (স.) তাঁকে বলেন, কেঁদোনা মা, আল্লাহ তায়ালা তোমার আব্বাকে রক্ষা করবেন। তিনি আরো বলেন, আবু তালেবের মৃত্যুর আগে কোরায়শরা আমার সাথে এমন অবাঞ্ছিত আচরণ কখনো করেনি।'

মিকরীনী 'ইমতাউল আসমা' গ্রন্থে বলেন, উভয়ের মৃত্যুর ফলে রসূল (স.)-এর ওপর আরো কঠিন মুসিবত নেমে আসে। তাই তিনি ওই বছরটাকে 'দুঃখের বছর' নাম দেন। তিনি বলতেন, 'আবু তালেব বেচে থাকতে কেউ আমার সাথে খারাপ আচরণ করেনি।' বস্তুত তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আবু তালেব ছাড়া আর কেউ এমন ছিলো না, যে তাকে সাহায্য করতে পারে।

এ সময়েই সূরা হূদ নাযিল হয়। এর অব্যবহিত পূর্বে নাযিল হয় সূরা ইউনুস। আর এ উভয় সূরার আগে নাযিল হয় সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা আল ফোরকান। এ সময়কার পরিস্থিতি কেমন ছিলো তার আলামত এই সূরাগুলোতে পাওয়া যায়। বিশেষত সূরা হূদের পটভূমি ও আলোচ্য বিষয়েও এবং বিশেষত রসূল (স.) ও তার সংগীদের মনোবল বৃদ্ধি করা ও প্রবোধ দেয়া সংক্রান্ত আয়াতগুলোতে এর আলামতগুলো সুস্পষ্ট। এ সময়টার প্রকৃতি ও তার দাবী এ সূরায় যতোটুকু প্রকাশ পেয়েছে, তার কিছু কিছু তুলে ধরছি,

এ সূরায় সমগ্র মানব ইতিহাসে ইসলামী আকিদা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে হযরত নূহ (আ.) থেকে শুরু করে মোহাম্মদ (স.)-এর যুগ পর্যন্ত। বলা হয়েছে যে, এ আন্দোলন একই মৌলিক তত্ত্ব ও নীতিমালার ভিত্তিতে চলেছে। সেই মৌলিক তত্ত্ব হলো, একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে এবং এতে কাউকে শরীক করা যাবে না। একমাত্র তারই গোলামী বা দাসত্ব করা যাবে, আর কারো নয়। এই সাথে এ বিশ্বাসও রাখতে হবে যে, দুনিয়ার জীবন ফলাফল ভোগ করার জীবন নয় বরং পরীক্ষার জীবন। আখেরাতেই ফলাফল প্রাপ্তির জীবন। হেদায়াত ও গোমরাহী এই দুটোর যে কোনো একটার পথ বেছে নেয়ার জন্যে আল্লাহ মানুষকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেটাই এ পরীক্ষার মূল বিষয়।

হযরত মোহাম্মদ (স.) 'এমন এক কিতাব নিয়ে এসেছিলেন, যার আয়াতগুলো সুরক্ষিত ও বিস্তারিত। (আয়াত-১) আর এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় হলো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর আরো এবাদাত করো না........(আয়াত ২,৩ ও ৪) অর্থাৎ তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত।

কিন্তু এই দাওয়াত নতুন নয়। ইতিপূর্বে নূহ, হূদ সালেহ, শোয়ায়ব, মূসা প্রমূখ নবীও এ দাওয়াত দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম...........' (আয়াত ২৬ ও ২৭) 'আদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই হূদকে। ....' (আয়াত ৫১, ৫২ ও ৫৩) সামুদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালেহকে।........ (আয়াত ৬২) 'মাদায়েনের কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই শোয়ায়বকে।..........' (আয়াত ৮৫, ৮৬ ও ৮৭) এভাবে

www.pathagar.com

দেখা যায় যে, প্রত্যেক নবী একই কথা বলেছেন এবং একই শাশ্বত দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহর নবীদের নীতি ও অবস্থান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। একদিকে তাঁরা তাদের জাতির পক্ষ থেকে ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান, ব্যংগ বিদ্রুপ, উপহাস, হুমকি ও নির্যাতন ভোগ করেছেন। অপরদিকে তাঁদেরকে এর মোকাবেলায় ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস বহাল রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত নূহের ঘটনায় আমরা নিম্নরূপ দৃশ্য দেখতে পাই,

'কাফেরদের নেতারা বললো, তোমাকে তো আমরা আমাদের মতোই মানুষ দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে যারা একেবারেই নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ, তারা ছাড়া আর কেউ তোমার অনুসারী হচ্ছে এমন তো দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক আছে, তুমি যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে এসো। (আয়াত ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪)

হযরত হূদের কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই নিম্নরূপ দৃশ্য,

'তারা বললো, ওহে হূদ, তুমি আমাদের কাছে কোনো অকাট্য প্রমাণ আনতে পারেনি। তোমার কথায় আমরা আমাদের দেবতাদের ছেড়ে ঈমান আনতে প্রস্তুত নই।

অতপর যখন আমার ফয়সালা এলো, আমি হূদ ও তার মোমেন সাথীদেরকে কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করলাম......... আ'দ জাতিকে এই দুনিয়ায় ও কেয়ামতের দিন অভিশাপ দেয়া হলো। ...... সাবধান, হূদের জাতি আদের ওপর অভিসম্পাত।'......(আয়াত ৫৪-৬১)

সালেহ (আ.)-এর ঘটনায় আমরা নিম্নরূপ দৃশ্য দেখতে পাই,

'সামুদ জাতি বললো, ওহে সালেহ, তুমি আমাদের অনেক আশা ভরসার পাত্র ছিলে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যার পূজা করে গেছে তার পূজা করতে কি তুমি আমাদের নিষেধ করছো ?........যখন আমার আযাব এলো, তখন আমি সালেহ ও তার মোমেন সাথীদেরকে রক্ষা করলাম........ ফলে তারা তাদের ঘরেই পড়ে রইলো।........(আয়াত নং ৬৩, ৬৪ এবং ৬৭ ও ৬৮)

শোয়ায়ব (আ.)-এর ঘটনায় আমরা নিম্নরূপ দৃশ্য দেখতে পাই,

'তারা বললো, ওহে শোয়ায়ব, তোমার নামায কি তোমাকে আদেশ দেয়, যেন আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের উপাসিত দেবদেবীর পূজা করবো না?........ অতপর যখন আমার আযাব এলো, আমি শোয়ায়ব ও তার মোমেন সাথীদেরকে অব্যহতি দিলাম, আর যালেমদেরকে বিকট শব্দ আক্রমণ করলো। ফলে তারা তাদের ঘরেই উপুড় হয়ে পড়ে রইলো। যেন তারা কোনো দিন সেখানে বাস করেনি ......!' (আয়াত নং ৮৮ থেকে ৯৬ পর্যন্ত)

এই কিসসা কাহিনীর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন এ থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন, তার সম্মানিত সাথীদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে, সে ব্যাপারে তাকে প্রবোধ দেয়া হয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা যে সাহায্য নাযিল করেছেন, তার উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্যান্য নবীর মতো

www.pathagar.com

তাকেও প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলা হয়েছে। কেননা তাঁর ওহী ও রেসালাত সংক্রান্ত দাবী সম্পূর্ণ সত্য।

নূহ (আ.)-এর ঘটনার শেষে আমরা নিম্নরূপ মন্তব্য দেখতে পাই,

'এ হচ্ছে অদৃশ্য জগতের কিছু খবর, যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে অবহিত করি। তুমি বা তোমার জাতি এগুলো ইতিপূর্বে জানতে না। অতএব, ধৈর্য ধারণ করো। সর্বশেষ সাফল্য সংযমশীল লোকদের জন্যে।'

এ সূরার সব কটা ঘটনার শেষে সূরার শেষ পর্যন্ত আমরা নিম্নরূপ দীর্ঘ মন্তব্য দেখতে পাই,

'এ হচ্ছে জনপদসমূহের অধিবাসীদের কিছু কাহিনী, যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি।.......... আমি কিন্তু তাদের ওপর যুলুম করিনি, বরং তারাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।.......... তোমার প্রভু যখন কোনো যালেম জনপদকে পাকড়াও করেন, তখন এভাবেই করেন। তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক........ (আয়াত ১০১ থেকে ১১৭ পর্যন্ত)

এভাবেই কোরআনের নির্দেশাবলীতে আন্দোলনের দিকটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা দেখতে পাই, কোরআন দাওয়াত ও আন্দোলনকে প্রত্যেক পর্যায়ে উপযুক্ত নির্দেশাবলী দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে। এভাবেই আমরা দেখতে পাই, কোরআনের কিসসা কাহিনী আন্দোলনের দাবী এবং জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দাবীকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে ও জীবন্তভাবে তুলে ধরে। এ কিসসা কাহিনী সূরার অন্যান্য অংশের বক্তব্যের সাথে পুরোপুরিভাবে সংগতিশীল, চাই তা আইন ও বিধানের আকারে হোক বা সাধারণ নীতিমালা ও উপদেশমালার আকারে হোক।

সূরা ইউনুসে হযরত নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের সংক্ষিপ্ত কাহিনী, হযরত মূসার অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত কাহিনী এবং হযরত ইউনুসের অতীব সংক্ষিপ্ত কিসসা আলোচিত হয়েছে। তবে এ সূরায় কিসসা কাহিনী যা কিছুই আলোচিত হয়েছে, তা সূরার কাংখিত আকিদা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর উদাহরণ ও সাক্ষ্য হিসাবেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সূরা হূদে কেসসা কাহিনী হয়ে উঠেছে সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়। যদিও এ সূরায়ও কেসসা কাহিনী তার আলোচিত আকিদা বিষয়ক তথ্যাবলীর উদাহরণ ও সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবেই এসেছে, কিন্তু উপস্থাপনের ধরন দেখে মনে হয় যে, মানবেতিহাসে ইসলামী আকীদা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের গতি ও পরিণতি পর্যালোচনা করাই এর প্রধান ও সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। এ জন্যেই এ সূরাকে আমরা আলোচ্য বিষয়ের দিক দিয়ে তিনভাবে বিভক্ত দেখতে পাই,

প্রথম ভাগে আকিদা বিষয়ক তথ্যসমূহ, যা সূরার শুরুতে একটু সীমিত পরিসরে বিদ্যমানসমূহ।

দ্বিতীয় ভাগে এই আকিদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে এবং এটাই এ সূরার বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় ভাগে রয়েছে এ আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য এবং তা খুবই সীমিত পরিসরে।

এটাও সুস্পষ্ট যে, মৌলিক আকীদা বিষয়ক যে তথ্যের আলোচনা এ সূরার প্রধান লক্ষ্য, সেই বিষয়সংক্রান্ত আলোচনার সাথে এ সূরার সব কটা অংশের পরিপূর্ণ সমন্বয় ও সাযুজ্য রয়েছে। প্রত্যেকটি অংশেই ওই অংশের স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও বর্ণনাভংগি অনুসারে আকীদা বিষয়ক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই বর্ণনাভংগি কেসসা কাহিনী, নির্দেশাবলী ও সাধারণ আলোচনা থেকে অনেকাংশে পৃথক।

যে মৌলিক আকিদাগত তথ্যগুলো আলোচনা করা এ সূরার সার্বিক লক্ষ্য, তা নিম্নরূপ,

রসূল (স.) যে মৌল তত্ত্ব নিয়ে এসেছেন এবং পূর্বেকার নবীরা যে মৌল তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন। এ মৌল তত্ত্বের সারকথা হলো, এক আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, এ আনুগত্যের পন্থা ও পদ্ধতি আল্লাহর রসূলদের কাছ থেকে শিখতে হবে এবং এ তত্ত্বের ভিত্তিতেই মানবজাতি একদিন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে।

রসূল (স.)-এর দাওয়াতের মৌল তত্ত্ব সম্পর্কে সূরার প্রথম ভাগে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে,

‘আলিফ লাম রা, এটা এমন কিতাব, যার আয়াতগুলোকে মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংহত করা ও তার পর বিস্তৃত করা হয়েছে। তুমি বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না, আমি তোমাদের জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।’ (আয়াত ১ ও ২)

‘তারা কি বলে যে, এ কোরআন তার মনগড়া? বলো, তাহলে তোমরা এ ধরনের দশটা আয়াত নিয়ে এসো........’। (আয়াত ১৩ ও ১৪)

নবীদের কাহিনী বর্ণনা করার সময়ও তাদের দাওয়াতের মূল বিষয় এবং ওই আকিদার ভিত্তিতে তাঁদের জাতি ও আপনজনদের সাথে তাদের বিচ্ছেদের কথা ঘোষিত হয়েছে। যথা,

‘আমি নূহকে তাঁর জাতির কাছে পাঠালাম যেন সে তাদেরকে বলে তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না।...... (আয়াত ২৫, ২৮, ৪৫ ও ৪৬)

‘আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না........। (আয়াত ৫০)

‘সামুদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালেহ (আ.)-কে। সে বলেছিলো, ‘হে আমার জাতি। তোমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো.......।’ (আয়াত ৬১ ও ৬৩)

‘আর মাদায়েনে পাঠিয়েছিলাম শোয়ায়বকে। সে বলেছিলো যে, তোমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।’ (আয়াত ৮৩ এবং ৮৮)

www.pathagar.com

সূরার উপসংহারে দাওয়াতের মূলতত্ত্ব ও মূলতত্ত্বের ভিত্তিতে জনগণের সাথে রসূলদের বিচ্ছেদের বিষয়টা নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

'যালেমদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না। তাহলে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। .....।' (১১৩)

'আল্লাহর হাতেই রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত অজানা তথ্য।' (আয়াত ১২৩)

এভাবে সূরার তিনটি অংশেই আকীদা বিষয়ক আলোচনা রয়েছে।

মানুষ যাতে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের অনুগত হয়, সেজন্যে সূরাটা আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরে বলেছে যে, সমগ্র মানবজাতি পৃথিবীতে আল্লাহর মুঠোর মধ্যে রয়েছে এবং কেয়ামতের দিন তারা আবার আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে। তখন তিনি তাদেরকে চূড়ান্ত কর্মফল দেবেন। এ বিষয়টাও এ সূরার তিনটি অংশেই আলোচিত হয়েছে। যেমন প্রথমাংশে বলা হয়েছে,

'সাবধান, তারা তারা কাছ থেকে নিজেদেরকে লুকানোর জন্যে তাদের বুককে সংকুচিত করে থাকে। সাবধান, তারা যখন তাদের পোশাকে আবৃত হয়, তখন আল্লাহ জানেন তারা কী কী লুকাচ্ছে এবং কী কী প্রকাশ করছে। ....' (আয়াত ৫-৮)

'যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার সুখ সৌন্দর্যের জন্যে লালায়িত, তাকে আমি তার সৎকর্মের প্রতিফল দুনিয়াতেই পুরো মাত্রায় দিয়ে দেবো। ... (আয়াত ১৫ ও ১৬)

নবীদের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে নিম্নরূপ আয়াতসমূহ এসেছে,

'আমি আমার ও তোমাদের প্রভু আল্লাহর ওপর নির্ভর করেছি। এমন কোনো প্রাণী নেই, যার জীবন আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ নয়.........।' (আয়াত ৫৬ ও ৫৭)

'সামুদের কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম.......।' (আয়াত ৬১)

আর উপসংহারে বলা হয়েছে, 'তোমার প্রভু যখন অপরাধী জনপদগুলোকে পাকড়াও করেন, তখন এ রকমই করেন.....।' (আয়াত ১০২, ১১১, ১১৭, ১১৮,১১৯)

এভাবে তিনটে অংশেই আল্লাহর ও আখেরাতের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে,

এ সূরার লক্ষ্য আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করা নয়, বরং একমাত্র আল্লাহই যে পালনকর্তা তথা আইনদাতা, হুকুমদাতা ও মানবজীবনের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী, সেটা প্রমাণ করাই এর লক্ষ্য। বস্তুত আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে কখনো মতভেদ হয়নি। মতভেদ হয়েছে শুধু আল্লাহই একমাত্র আইনদাতা ও হুকুমদাতা মনিব কিনা– তা নিয়ে। সকল নবীকে এ বিষয়টা প্রতিষ্ঠিত করতেই সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং সর্বশেষ নবীকেও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তার আইনগত কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যেই সংগ্রাম করতে হয়েছে। একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান কেবল আল্লাহর আইন ও বিধান অনুসারে করার অপরিহার্যতা এ সূরার প্রতিটি অংশেই আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

উল্লেখিত আকীদাগত বিষয়গুলো মন মগযে বদ্ধমূল করা, সমগ্র অন্তরাত্মায় তার চেতনা সঞ্চারিত করা, সমগ্র মানবসত্ত্বার শিরায় শিরায় তাকে সঞ্চালিত করা, সমগ্র মেরুমজ্জায় তাকে চলন্ত ও জীবনীশক্তির আকারে এমনভাবে প্রবাহিত করা যেন তা একটা ইতিবাচক, প্রেরণাদায়ক 'এবং মানুষের ভাবাবেগ, চিন্তাধারা, কাজ ও গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিতে পরিণত হয়'– এ সূরার অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আর উল্লেখিত আকীদাগত বিষয়গুলোকে এরূপ একটা কার্যকর শক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে সূরাটাতে বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপনাময় বক্তব্যের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, যা মানব সত্ত্বাকে প্রবলভাবে আন্দোলিত ও আলোড়িত করে।

প্রথমত এমন বহু আয়াত এ সূরায় সন্নিবেশিত হয়েছে, যাতে যুগপৎ ভীতি প্রদর্শন করা ও আশ্বাস দেয়া হয়। একদিকে কাউকে শরীক না করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের দাওয়াতকে যে ব্যক্তি মনে প্রাণে গ্রহণ করে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ লাভের জন্যে এবং মানবজাতির কল্যাণ, সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্যে আগ্রহী করে তোলে। অপরদিকে যারা এই দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করে এবং আল্লাহদ্রোহীদের পথ অনুসরণ করে, তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আযাব ভোগ করার ভীতি প্রদর্শন করে। নিম্নে এই ভীতি প্রদর্শন ও আশ্বাস দানের কিছু নমুনা দেয়া গেলো,

'তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না। আমি তোমাদের জন্যে তার পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা......।' (আয়াত ২-৩)

'যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য সুষমা কামনা করে, তাদের কাজের প্রতিদান আমি দুনিয়াতেই পুরোপুরি দিয়ে দেবো......।' আখেরাতে তাদের জন্যে আগুন ছাড়া আর কিছু নেই........।' *(আয়াত ১৫ ও ১৬)*

'আচ্ছা, যে ব্যক্তি তার প্রভুর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, ... সে তো তার ওপর ঈমান রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতি কুফরী করে, আগুনই তার প্রতিশ্রুত কর্মফল.......।' *(আয়াত ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪)*

'আর হে আমার জাতি, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও, অতপর তাওবা করো, তাহলে তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন.........।' *(আয়াত ৫২)*

'আর যদি এ কথা অমান্য করো, তাহলে আমি কিন্তু তোমাদের কাছে আমার আনীত বার্তা পৌছিয়ে দিয়েছি.........।' *(আয়াত ৫৭)*

'আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে পাঠিয়েছি ফেরাউন ও তার দলবলের কাছে...... দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের ওপর অভিসম্পাত......।' *(আয়াত ৯৬-৯৯)*

এ সতর্কবাণী ও আশ্বাসবাণী যে দীর্ঘ কিসসা কাহিনীর মধ্য দিয়ে সত্য প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামী আন্দোলনের গোটা ইতিহাস জুড়ে অবিশ্বাসীদের ধ্বংস ও বিশ্বাসীদের মুক্তির মধ্য দিয়ে, বিশেষত বন্যার ঘটনার মধ্য দিয়ে যা প্রমাণিত হয়েছে, তাও এ

www.pathagar.com

সূরায় সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, 'নুহকে ওহীযোগে জানানো হলো যে, তোমার জাতির মধ্য থেকে যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া কেউ কখনো ঈমান আনবে না.....।' তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার ওহীর নির্দেশের সাহায্যে জাহাজ তৈরী করো......।' *(আয়াত ৩৬-৪৪)*

সুখসমৃদ্ধি ও দুঃখকষ্ট দ্বারা চলমান ঘটনাবলীর মোকাবেলা করার সময় মানবমনে যে প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে তারও কিছু কিছু প্রতিচ্ছবি এ সূরায় অংকন করা হয়েছে। যারা রসূলের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আযাব তাড়াতাড়ি আসুক বলে নবী রসূলদের চ্যালেঞ্জ দেয়ার ধৃষ্টতা দেখায়, তাদের সামনে তাদের সেই সময়কার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যখন তারা সত্য সত্যই আযাবের কবলে পড়বে। পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে ও সুখ সমৃদ্ধি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে যে শোচনীয় দুর্দশার কবলে পড়বে, তাও মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পুনরায় সংকট ঘুচে গেলে ও সুখ সমৃদ্ধির মুখ দেখলে মানুষ নতুন করে যে দাম্ভিকতায় লিপ্ত হয়, তাও চিত্রিত করা হয়েছে। যেমন,

'আর আমি যদি আযাবকে কিছুদিনের জন্যে বিলম্বিত করি, তাহলে তারা বলে যে, আযাবকে থামিয়ে রাখলো কে? সাবধান, আযাব যেদিন আসবে, সেদিন তা কেউ প্রতিহত করতে পারবে না......।' *(আয়াত ৮, ৯, ১০ ও ১১)*

কোনো কোনো স্থানে কেয়ামতের কিছু দৃশ্য, সেদিন কাফেরদের শোচনীয় দুর্দশা, আল্লাহর রসূলদেরকে অমান্য করার পর তাঁর সামনে তাদের উপস্থিতি, অপমান এবং দেব দেবী ও সুপারিশকারীদের সুপারিশ না পাওয়ার দৃশ্য তুলে ধারা হয়েছে। যেমন, 'সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে?' *(আয়াত ১৮-২৩, ১০৩-১০৮)*

মানুষের কাছে আল্লাহ সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকেন এবং তার মনের কোণে লুকানো কথাবার্তা পর্যন্ত তিনি জানেন– এ সত্য মানুষের মনে ত্রাস সঞ্চার করতে সক্ষম। বিশেষত যে কাফেররা আল্লাহর উপস্থিতিকে মানে না, তার সর্বব্যাপী জ্ঞানের ধারণা রাখে না তাদের জন্যে এ উক্তি অত্যন্ত ভীতিসঞ্চারক। বস্তুত তারা যতই অস্বীকার করুক, তারা নিজেরাই অন্যান্য সৃষ্টির মতো আল্লাহর মুঠোর মধ্যে অবস্থিত।

'আল্লাহর কাছেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে ......।' *(আয়াত ৪, ৫,৬ ও ৫৬)*

সূরার আরেকটা প্রেরণাদায়ক উপাদান হলো, যুগে যুগে নবীদের নেতৃত্বে যে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন সত্যের বাণীর সাহায্যে জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করেছে, তাদের কাহিনী বর্ণনা। সত্যের এ কাফেলাগুলোর ছিলো অবিচল ঈমান ও অটুট প্রত্যয়। এ কথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, নবীদের অভিন্ন ভূমিকা ও অভিন্ন মূলনীতি, সর্বকালে তারা যে সত্য দ্বারা জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করেছেন, সেই সত্যের অভিন্নতা, এমনকি তাদের বক্তব্যের পর্যন্ত অভিন্নতা ইসলামী আন্দোলনের জন্যে চিরস্থায়ী শক্তি ও প্রেরণার উৎস।

www.pathagar.com

সূরা ইউসুফ

এটা একটা মক্কী সূরা। এটা সূরা হূদের পরে নাযিল হয়েছে। সূরা ইউনুস ও সূরা হূদের ভূমিকায় যে চরম সংকটজনক পরিস্থিতির কথা আলোচনা করেছি, এই সূরাও সেই একই পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছে। রসূল (স.)-এর দুই প্রধান সহায় আবু তালেব ও খাদিজার ইন্তেকালের বছরটি রসূল (স.)-এর জীবনের বিষাদময় বছর হিসাবে চিহ্নিত। সেই বছর থেকে নিয়ে আকাবার প্রথম বায়য়াত ও দ্বিতীয় বায়য়াত পর্যন্ত সময়টাকে বলা যায় এই চরম সংকটকাল পরিস্থিতি, যাকে উপলক্ষ করে সূরা ইউনুস, হূদ ও ইউসুফ নাযিল হয়েছিলো। আকাবার বায়াতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.) ও তার সাথী সাহাবীদের জন্যে মদীনায় হিজরতের ও মক্কার অত্যাচার থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ সুগম করে দেন। সুতরাং সূরা ইউসুফ হচ্ছে ওই চরম সংকটকালে নাযিল হওয়া সূরাগুলোর অন্যতম। গোটা সূরা ইউসুফই মক্কায় নাযিল হয়েছে। তবে কারো কারো মতে ১, ২, ৩, ৪ ও ৭ নং আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রথম চার আয়াতসহ গোটা সূরা এক সাথে নাযিল হয়েছে এ কথা বলার যৌক্তিকতা প্রথম তিন আয়াতের বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। 'আলিফ লাম রা, এ হচ্ছে সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াতসমূহ, আমি এ গ্রন্থকে আরবী কোরআন হিসাবে নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। আমি তোমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর কাহিনী বর্ণনা করছি তোমার কাছে এই কোরআন ওহী করার মাধ্যমে। ইতিপূর্বে তুমি এ সম্পর্কে কিছুই জানতে না।' এ তিনটি আয়াত পরবর্তী আয়াতে ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা শুরু করার স্বাভাবিক ভূমিকা। সেই আয়াতটা (৪ নং) হলো, যখন ইউসুফ তার পিতাকে বললো, হে পিতা, আমি এগারোটা নক্ষত্র এবং চাঁদ ও সূর্যকে আমার সামনে সাজদারত দেখেছি।' তারপর সূরা শেষ পর্যন্ত এভাবে অব্যাহত থেকেছে।

সুতরাং 'আমি তোমার কাছে সুন্দরতম কাহিনী বর্ণনা করছি,' .... আল্লাহর এই উক্তি কেসসা নাযিল হবার স্বাভাবিক ভূমিকা বলেই প্রতীয়মান হয়।

এ ছাড়া 'আলিফ লাম-রা' এই বিচ্ছিন্ন আয়াতগুলো, এই অক্ষরগুলো আল্লাহর কেতাবের প্রতীক বলে আখ্যায়িত করা এবং আল্লাহ তায়ালা এই কেতাবকে আরবী কোরআনরূপে নাযিল করেছেন- এ কথা বলাও এ সূরার মক্কী সূরা হওয়ার লক্ষণ। মক্কার মোশরেকরা প্রচার করতো যে, একজন অনারব লোক এসে মোহাম্মদ (স.)-কে কোরআন শিখিয়ে যায়। তাদের এ দাবীর জবাবেই বলা হয়েছে যে, এ কোরআন তো আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। এটা একজন অনারবের শেখানো কেতাব হলে তা তো আরবী ভাষায় হতে পারে না। উপরন্তু তা এমন সব বিষয়বস্তু নিয়ে এসেছে, যা তাঁর একেবারেই অজানা ছিলো।

আরো একটা লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, সূরার এই ভূমিকা এর শেষে বর্ণিত উপসংহারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সূরার শেষাংশে একটা আয়াতে বলা হয়েছে যে,

www.pathagar.com

'এগুলো অদৃশ্য জগতের তথ্যসমূহ, যা আমি তোমার কাছে পাঠাই ....' (আয়াত ১০২)

কাহিনীর ভূমিকা ও উপসংহারের এই গভীর সংযোগ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভূমিকা ও উপসংহার উভয়ই কেসসার সাথে নাযিল হয়েছে।

সপ্তম আয়াত ছাড়া সূরার বক্তব্য আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। এটা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য কথা নয় যে, সূরাটা মক্কায় নাযিল হয়েছে। অথচ সপ্তম আয়াত মক্কায় নাযিল হয়নি, আবার মদীনায় গিয়ে ওটাকে নাযিল করে এই সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। কারণ অষ্টম আয়াতের 'কালু' (অর্থাৎ তারা বললো) শব্দটিতে একটা সর্বনাম রয়েছে, (তারা) যা দ্বারা ইউসুফের ভাইদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, সপ্তম ও অষ্টম উভয় আয়াত এক সাথে নাযিল হয়েছে এবং তা সূরার একই পর্বের অংশ।

সমগ্র সূরা ইউসুফের বিষয়বস্তু, পটভূমি, বক্তব্য, শিক্ষা সব কিছুই সাক্ষ্য দেয় যে, সূরাটা একটা অখন্ড ও একক সূরা এবং এতে মক্কী সূরার যাবতীয় লক্ষণ সুস্পষ্ট। উপরন্তু এতে রসূল (স.)-এর জীবনের এই চরম সংকটময় পরিস্থিতির লক্ষণই বিশেষভাবে পরিস্ফুট। কোরায়শদের জাহেলী সমাজে রসূল (স.) যখন আবু তালেব ও খাদিজার মৃত্যুজনিত 'বিষাদময় বছর থেকে শুরু করে চরম নির্যাতন ভোগ করতে থাকেন এবং তাঁর সাথে তাঁর সহচর মুসলমানরাও নির্যাতন ভোগ করতে থাকেন, ঠিক সেই সময়ই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে তাঁর মহান ভাই হযরত ইউসুফের কাহিনী শুনান। রসূল (স.) ও মুসলমানরা কোরায়শদের পক্ষ থেকে যেসব নির্যাতন ভোগ করেন, তার মধ্যে দৈহিক নির্যাতন, নির্বাসন এবং সামাজিক অবরোধও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। হযরত ইবরাহীমের প্রপৌত্র, হযরত ইসহাকের পৌত্র ও হযরত ইয়াকুবের পুত্র হযরত ইউসুফও তাঁর ভাইদের পক্ষ থেকে রকমারি যুলুম নির্যাতন ভোগ করেন। ভাইয়েরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, কুয়ায় নিক্ষেপের মাধ্যমে তাঁকে ভীত সন্ত্রস্ত করার অপচেষ্টা চালায়, নিজের অনিচ্ছা সত্তেও ক্রীতদাস হয়ে একটা পণ্যদ্রব্যের মতো এক হাত থেকে আর এক হাতে হস্তান্তরিত হতে থাকেন, তাঁর পিতামাতা বা পরিবার পরিজনের কাছ থেকে সাহায্য ও সংরক্ষণ থেকে বঞ্চিত থাকেন, মিসরের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী এবং অন্য নারীদের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রথমে অশ্লীলতা ও যৌনতার প্ররোচনা দেয়া হয়, পরে ষড়যন্ত্রের জালে ফাঁসানো হয়, কারাযন্ত্রণা ভোগ করানো হয়, তারপর তিনি প্রাচুর্য ও ক্ষমতা হাতে পেয়ে জনগণের খাদ্য ও ভোগ্য দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালনের কষ্টকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অবশেষে তিনি মানবিক ভাবাবেগের অগ্নিপরীক্ষায় জর্জরিত হন এবং তাঁর সেই ভাইদেরই মুখোমুখি হন, যারা তাঁকে শুধু কুয়ায় ফেলে দিয়েছিলো তা নয়; বরং তাঁর যাবতীয় দুঃখ দুর্দশার কারণও ছিলো। এসব দুঃখ কষ্ট ও যুলুম নির্যাতনে হযরত ইউসুফ (আ.) শুধু ধৈর্য ধারণই করেননি; বরং এ সবের মধ্য দিয়ে তিনি ইসলামের দাওয়াতের কাজও চালিয়ে গেছেন। এভাবে এসব কঠিন পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে জীবনের চরম সাফল্যের স্তরে

www.pathagar.com

উপনীত হন। এ স্তরটি ছিলো তাঁর পিতামাতার সাক্ষাত–যা ছিলো তাঁর সূর্য চন্দ্র ও এগারোটা নক্ষত্র কর্তৃক তাঁকে সাজদা করার স্বপ্নের বাস্তব রূপ। এ স্তরে পৌঁছে তিনি আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠভাবে আত্মসমর্পণ করেন। এই সর্বশেষ স্তর ও আল্লাহর প্রতি তাঁর এই আত্মসমর্পণের ঘটনা চিত্রিত হয়েছে সূরার ৯৯, ১০০ ও ১০১ নং আয়াতে।

'অতপর যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলো, তখন ইউসুফ তাঁর পিতামাতাকে নিজের কাছে পুনর্বাসিত করলেন.....' ক্ষমতা ও প্রাচর্যের মধ্যেও তাঁর সর্বশেষ দোয়া ছিলো, 'আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দেন এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন।' এতো দীর্ঘ দুঃখকষ্ট ভোগ, এমন জাঁকজমকপূর্ণ সাফল্য লাভের পরও এই ছিলো তার একমাত্র দাবী।

সুতরাং হযরত ইউসুফের এই কাহিনী এবং এর উপসংহার বর্ণনার মাধ্যমে এ সূরা যদি রসূল (স.) ও মুসলমানদের তাদের অমানুষিক যুলুমের স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে সান্ত্বনা হিসাবে নাযিল হয়ে থাকে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

বরঞ্চ আমার তো মনে হয়, এ সূরা দ্বারা রসূল (স.)-কে এরূপ একটা আভাসও দেয়া হয়েছে যে, তাঁকে মক্কা থেকে বের করে নিয়ে এমন একটা নতুন জায়গায় পুনর্বাসিত করা হবে, যেখানে বিজয় তার নিত্যসংগী হবে, যেমন হযরত ইউসুফকে মা বাবার কোল থেকে নিয়ে বিস্তর দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিজয় ও সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করানো হয়। মাতৃভূমি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এই পর্বটা ভীতি ও শংকার মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়ে থাকলেও পরিণামের দিক দিয়ে তা ছিলো সাফল্যের সূচনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'এভাবেই আমি ইউসুফকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় আসীন করেছি.....' (আয়াত ২১)

হযরত ইউসুফ যে মুহূর্তে মিসরের প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদে পদার্পণ করেন, এমনকি যখন তিনি দাস হিসাবে বিক্রি হবার মতো একজন তরুণ মাত্র, তখন থেকেই তার ক্ষমতা লাভের পালা শুরু হয়েছে। সূরার সর্বশেষ তিনটি আয়াতে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা আমাকে এতো অভিভূত করেছে যা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না, শুধু সামান্য আভাস দিতে পারি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি তোমার পূর্বে জনপদবাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোককেই শুধু ওহী পাঠাতাম....... রসূলরা যখনই হতাশ হয়ে যেতো এবং ভাবতো যে, তাদের মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখনই তাদের কাছে আমার সাহায্য আসতো...... '

এ আয়াত তিনটায় আল্লাহর নবীরা হযরত ইউসুফের মতো হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে পড়লে আল্লাহ তায়ালা কোন রীতি অবলম্বন করেন তার বর্ণনা রয়েছে। সেই সাথে এই মর্মে ইংগিতও দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের কঠিন অগ্নিপরীক্ষার পর প্রত্যাশিত সাফল্য দান করেন। এ ধরনের সংকটজনক পরিস্থিতিতে নিপতিত মোমেন বান্দারা এ পর্যায়ক্রমিক সাফল্য যথাযথভাবেই উপলব্ধি করে থাকেন।

www.pathagar.com

এই সূরার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে হযরত ইউসুফের কাহিনীটা পূর্ণাংগভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইউসুফের কাহিনী ছাড়া কোরআনে অন্য যতো কাহিনী রয়েছে, তা সাধারণত এক একটা সূরায় আংশিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। ওই সূরার মূল বক্তব্যের সাথে মিল রেখেই কাহিনীর অংশটা নির্বাচন করা হয়েছে। কোনো সূরায় একটা কাহিনী পুরোপুরিভাবে বর্ণনা করা হলেও তা অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন হযরত হূদ, সালেহ, লূত ও শোয়ায়বের কাহিনী। একমাত্র হযরত ইউসুফের কাহিনীই একই সূরায় পরিপূর্ণভাবে ও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ দিক থেকে সূরা ইউসুফ কোরআনের অন্য সব সূরার তুলনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

এই বিশিষ্টতা কাহিনীর প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল এবং সেই প্রকৃতিকে তা পূর্ণভাবে তুলে ধরেছে। সূরার সূচনা হয়েছে ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন দেখার মধ্য দিয়ে এবং সমাপ্তি হয়েছে ওই স্বপ্নের বাস্তব রূপ লাভের মধ্য দিয়ে। এর অংশবিশেষ এই সূরায় এবং অপর অংশ অন্য সূরায় থাকলে তা মানানসই হতো না। সূরার এই বৈশিষ্ট্য তাকে একটা পরিপূর্ণ বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার সুযোগ করে দিয়েছে। কাহিনী বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য সফল হওয়া ও তার উপসংহারে যে শিক্ষা ও মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, সেটা এ সূরার অতিরিক্ত অবদান।

এবার আমি এই সূরায় কোরআনের যে বিশিষ্ট বর্ণনাভংগির সাক্ষাত পাওয়া যায়, তাতে কাহিনী বর্ণনার যে নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়া হয়েছে তা একটু বিশদভাবে আলোচনা করবো।

সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফের কাহিনী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে গল্প বলার ইসলামী রীতি কী, তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। সূরা ইউসুফ এ ক্ষেত্রে একটা অনুকরণীয় আদর্শ, যা মনস্তাত্ত্বিক, আকীদাগত ও আন্দোলনগত– সর্বদিক দিয়েই একটা পূর্ণাংগ মডেল। যদিও বিষয়বস্তু ও প্রকাশভংগিতে কোরআন সর্বত্রই এক অভিন্ন, তথাপি সূরা ইউসুফকে দেখে মনে হয়, এটা যেন শৈল্পিক প্রকাশ নৈপুণ্যের দিক দিয়ে বিশেষভাবে নির্ধারিত একটা প্রদর্শনী সূরা।

এই কাহিনীতে হযরত ইউসুফের ব্যক্তিত্ব প্রদর্শিত হয়েছে। তিনিই সূরায় আলোচিত প্রধান ব্যক্তিত্ব। এ ব্যক্তিত্বের জীবনের সকল দিক ও কর্মক্ষেত্র, সকল কর্মক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত নীতি ও আচরণ, এই ব্যক্তিত্ব যেসব অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, যথা অভাব ও দৈন্যের পরীক্ষা, প্রাচুর্যের পরীক্ষা, অশ্লীলতা ও যৌনতার প্ররোচনার পরীক্ষা, ক্ষমতাসীন হওয়ার পরীক্ষা এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও নীতির ব্যাপারে মানবীয় ভাবাবেগের পরীক্ষা– এই সব পরীক্ষায় এ পুণ্যময় ব্যক্তিত্বের সফল উত্তরণ এবং তাঁর একনিষ্ঠ আল্লাহভক্তি ও আল্লাহভীতির নিখুঁত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

প্রধান ব্যক্তিত্ব ছাড়াও এ সূরায় আরো কিছু ভিন্ন মানের ও ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে মানবীয় মনস্তত্ত্বের বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হযরত ইয়াকুবের পুত্রস্নেহ ও নবীসুলভ সংযমের নমুনা, হিংসুটে, ঈর্ষাকাতর ও কূচক্রী ভাইদের অপরাধ প্রকাশ হয়ে পড়ার পর তাদের বিব্রতবোধ ও

www.pathagar.com

ঘাবড়ে যাওয়ার নমুনা, তাদের মধ্যকার একজনের স্বতন্ত্র আচরণের নমুনা, তৎকালীন মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর উৎকট যৌনাবেগ ও পরকীয়া প্রেমের নমুনা, তৎকালীন মিসরীয় পরিবেশে তার এ প্রেমকে বৈধ করার অপপ্রয়াসের এবং সেই রাজকীয় ও উচ্চ শ্রেণীর নারী সমাজের নমুনা পেশ করা হয়েছে। নমুনা পেশ করা হয়েছে তৎকালীন নোংরা সামাজিক পরিবেশের এবং সেকালের মিসরীয় নারীদের অদ্ভুত যুক্তিরও। প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ও তার যুবক-ভৃত্য সম্পর্কে ওই নারীদের বক্তব্য, তাদের পক্ষ থেকে হযরত ইউসুফকে প্ররোচনাদান ও প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর পক্ষ থেকে তাকে হুমকি প্রদান থেকে ওই অদ্ভুত যুক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়া হযরত ইউসুফের কারাবাস থেকেও বুঝা যায়, রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে কি ধরনের চক্রান্তের জাল বোনা হয়ে থাকে। এখানে মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর চরিত্রের নমুনাও প্রকাশ পেয়েছে, যিনি স্বীয় সমাজের অভিজাত শ্রেণীর অপরাধপ্রবণতা দেখেও না দেখার ভান করেন। কেননা তিনি তাঁর শ্রেণী ও পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত নন। প্রকাশ পেয়েছে স্বয়ং সম্রাটের নৈতিকতার নমুনাও, যিনি ক্ষণেকের জন্যে মহানুভবতার চমক দেখিয়েই অন্তর্হিত হয়ে যান যেমনটি হন আযীয অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী। এভাবে সূরায় বহুসংখ্যক ব্যক্তিত্ব ও বহু সংখ্যক পরিবেশ; বহু সংখ্যক দৃশ্য, তৎপরতা এবং আবেগ অনুভূতিকে পরিপূর্ণ বাস্তবতা ও মানবিকতার পটভূমিতে তুলে ধরা হয়েছে।

কাহিনীটা বাস্তবতার মাপকাঠিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ বলে তার শৈল্পিক উপস্থাপনায় ইসলামী রীতি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কাহিনীর উপস্থাপনা যে যথার্থই সত্যনিষ্ঠ, মনোমুগ্ধকর ও নিখুঁত তা সন্দেহাতীত। একদিকে এতে মানবচরিত্রের কোনো বাস্তব দিকই উপেক্ষিত হয়নি আবার অপরদিকে বাস্তবতার নামে পাশ্চাত্যের নোংরা এবং অশ্লীল চিত্রও তুলে ধরা হয়নি।

কাহিনীতে নানা মানবিক দুর্বলতা, এমনকি যৌন আবেগের মুহূর্তটাকেও নিখুঁতভাবে চিত্রিত করা হয়েছে বটে। এ ক্ষেত্রে কোন বাস্তব অবস্থা মোটেই বিকৃত করা হয়নি, কিন্তু সুস্থ ও স্বাভাবিক নৈতিক পরিমন্ডল বিষিয়ে তুলতে পারে এমন অশ্লীল বিবরণ দেয়া হয়নি, যাকে বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াতের দৃষ্টিতে 'বাস্তবতা', 'স্বাভাবিকতা' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

সত্যের কতো গভীরতা ও কতো শালীন বাস্তবতা থাকলে কেসসা কাহিনী এতো চমকপ্রদ হতে পারে, তা এই সূরায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিত্ব ও পরিস্থিতির বিভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটা পূর্ণাংগ অথচ চমকপ্রদ, পরিচ্ছন্ন ও শালীন কাহিনী উপহার দিয়েছে সূরা ইউসুফ।

প্রথমে দেখা যাক হযরত ইউসুফের ভাইদের পরিচিতি কিভাবে এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তারা এতো বেশী হিংসুটে ছিলো যে, ভ্রাতৃহত্যা যে একটা ও ঘৃণ্য অপরাধ, সে ধারণাই তাদের বিবেক থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিলো। উপরন্তু এমন একটা 'আইনগত ছুতো'ও তারা পেয়ে গিয়েছিলো যা তাদের ওই অপরাধ থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। আল্লাহর বিশিষ্ট নবী হযরত ইয়াকুবের ছেলে, হযরত

www.pathagar.com

ইসহাকের পৌত্র ও হযরত ইবরাহীমের প্রপৌত্র হওয়ার কারণে তাদের চিন্তায়, আবেগে ও ঐতিহ্যে ধর্মীয় পরিবেশের যে ছাপ ছিলো, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ হত্যাকান্ডটা যাতে যুক্তিসংগত প্রমাণিত হয় এবং এর বীভৎসতা যাতে হালকা হয়, সে জন্যে তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে একটা যুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলো। তাদের এ পরিচিতি সূরার আয়াত নং ৭ থেকে আয়াত নং ১৮ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে।

এরপর কাহিনীর প্রতিটি পর্যায়ে আমরা তাদের মধ্যে এই একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পুরোমাত্রায় বহাল দেখতে পাই। অনুরূপভাবে তাদের মধ্যকার বিশিষ্ট একজনের আচরণও কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম দেখতে পাই। তিনি তাদের ইউসুফের ভাইকে সাথে করে আনার নির্দেশ দেয়ার পর তারা যখন তাকে নিয়ে এলো, তখন তারা তাঁকে চিনতেই পারলো না। তারা ভাবলো, এ তো হচ্ছেন মিসরের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কাছে তারা কেনান থেকে এসেছে দুর্ভিক্ষের সময় গম কিনতে। এই সময় আল্লাহ্ হযরত ইউসুফের জন্যে কৌশল তৈরী করলেন তার ভাইকে তাদের কাছ থেকে রেখে দেয়ার। তার পণ্যসম্ভারের মধ্যে রাজার পানপাত্র পাওয়া গেছে এ অজুহাতে তাকে রেখে দেয়া হলো। এই কৌশল দেখে এবং এর পশ্চাতের রহস্য বুঝতে না পেরে তাদের মনে ইউসুফ বিরোধী পুরনো বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তারা বলে উঠলো,

'ও যদি চুরি করে থাকে তবে তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে? ইতিপূর্বে ওর ভাই ইউসুফও তো চুরি করেছিলো।.......' (আয়াত ৭৭)

অনুরূপভাবে তারা যখন তাদের পিতা হযরত ইয়াকুবের মনে বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় আঘাত দিলো, তখনও তাদের একই চরিত্র বহাল দেখা গেলো। তারা যখন দেখলো, তাদের পিতা আবারো ইউসুফের জন্যে অধীর হয়ে উঠেছেন, তখন বৃদ্ধ বয়সে তাঁর মনোকষ্টের কথা বিবেচনায় আনা তো দূরের কথা, তাদের মনে আগের সেই হিংসা পুনরায় জেগে উঠলো।

ইয়াকুব (আ.) তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেলো এবং বললো, 'হায় আফসোস ইউসুফের জন্যে। তাঁর চোখ দুটো মর্মযাতনায় সাদা হয়ে গেলো....।' তারা বললো, 'আল্লাহর কসম, অমনি ইউসুফের কথা স্মরণ করতে করতে মরণাপন্ন হয়ে..... যাবেন।' (আয়াত ৮৪ ও ৮৫)

শেষ পর্যায়ে যখন ইউসুফ (আ.) পিতার কাছে নিজের জামা পাঠিয়ে দিলেন এবং সে সময়েও যখন তারা দেখলো, তাদের পিতা ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছেন, তখন ইউসুফের প্রতি পিতার এ গভীর মমত্ববোধ তাদের গাত্রদাহ সৃষ্টি করে এবং তারা পিতাকে এ জন্যে ভর্ৎসনা না করে ছাড়েনি।

'ইয়াকুব বললো, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি ....' (আয়াত ৯৪-৯৫)

এরপর আসে মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর প্রসংগ। এ মহিলা ইউসুফের প্রেমে এতো বেশী উতলা হয়ে ওঠে যে, নারীসুলভ লজ্জা, ব্যক্তিগত মর্যাদা, শীর্ষস্থানীয় সামাজিক অবস্থান কিংবা পারিবারিক কেলেংকারি কোনো কিছুরই তোয়াক্কা না করে সব রকমের

www.pathagar.com

নারীসুলভ ফন্দি ফিকির ও ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে, যাতে নিজেরও মতলব সিদ্ধ হয় এবং নিজের নির্লজ্জতা সম্পর্কে সমাজের প্রচারণার জবাবও দেয়া যায়। যে ইউসুফ তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তাকে সে এমন শাস্তি দেয় যা প্রাণঘাতী হয় না এবং তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী মহিলাদের দাওয়াত দিয়ে ডেকে এনে তাদের সামনে নির্লজ্জের মতো নিজের প্রেমের সাফাই গায়। যা তখনকার মিসরের অভিজাত নারী সমাজে মোটেই দূষণীয় ছিলো না। এই বিশেষ শ্রেণীর মানুষের আচরণ ও এই বিশেষ মুহূর্তের স্বাভাবিক তৎপরতার নিখুঁত এবং বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ দেয়ার পাশাপাশি কোরআন তার স্বভাবজাত পরিচ্ছন্নতা ও শালীনতা বজায় রেখেছে। কোরআনের এই বর্ণনাভংগি নিসন্দেহে ইসলামী বর্ণনাভংগির শ্রেষ্ঠতম নমুনা। এমনকি সর্বাত্মক উন্মত্ততা ও পাশবিকতা নিয়ে যে মুহূর্তে মানসিক এবং দৈহিক কামনা বাসনার নগ্ন বহিপ্রকাশ ঘটে, সে মুহূর্তটির বর্ণনা দিতে গিয়েও কোরআন শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায় না। শৈল্পিক নৈপুণ্যের নামে দুর্ভাগা আধুনিক সভ্যতা 'স্বাভাবিক বর্ণনা' ও 'বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার' মোড়কে সাহিত্যের যে নোংরা আঁস্তাকুড় রচনা করে, কোরআন তার ধারে কাছেও যায় না। সূরার ২১ নং থেকে ৩৩ নং আয়াত পর্যন্ত লক্ষ্য করুন।

আমরা পুনরায় এই মহিলার সাক্ষাত পাই, যখন ইউসুফ এই মহিলা ও তার বান্ধবীদের ষড়যন্ত্রের ফলে জেলে ঢুকেছেন। জেলে থাকাকালে রাজা একটা স্বপ্ন দেখলেন, ইউসুফের সাথে জেলে অবস্থানকারী তরুণটি স্মরণ করলো, একমাত্র ইউসুফই স্বপ্নের তাবীর জানে, রাজা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ইউসুফ তার ওপর কলংক লেপনকারী অভিযোগের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আসতে অস্বীকার করলেন।' রাজা এ মহিলা ও তার বান্ধবীদের ডাকলেন। মহিলা এলে দেখা গেলো, সময়, বয়স ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে তার ভেতরেও পরিবর্তন এসেছে এবং দীর্ঘ এক তরফা প্রেম নিবেদনকালে ইউসুফের যে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় সে পেয়েছিলো, তার কারণে তার হৃদয়ে ঈমানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

'রাজা বললো, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো....... ' (আয়াত ৫০-৫৩)

এবার এ সূরায় আলোচিত প্রধান ব্যক্তিত্ব হযরত ইউসুফের প্রসংগে আসা যাক। আল্লাহর এক সৎ ও পুণ্যময় বান্দা ইউসুফ (আ.)। তবে তিনি একজন মানুষও বটে। কোরআন তাঁর মানবীয়তা সম্পর্কে এক মুহূর্তের জন্যেও অতিরঞ্জিত কিছু বলেনি। তিনি যদিও এক নবী পরিবারে জন্মেছেন, লালিত পালিত হয়েছেন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করেছেন, তথাপি একজন মানুষের যতো দুর্বলতা থাকতে পারে, সেসব সহকারেই তিনি এ গুরুতর ঝুঁকিপূর্ণ বিপদের মোকাবিলা করেছেন। মহিলাটি যখন তাঁর দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, তখন এক পর্যায়ে তিনিও মানবিক দুর্বলতাবশত তার প্রতি ঝুঁকেছেন, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অধপতন থেকে রক্ষা করেন। তিনি নিজেও টের পেয়েছিলেন যে, নারীদের ফন্দি ফিকির, ইসলামবিরোধী পরিবেশ, প্রাসাদ পরিবেশ ও প্রাসাদবাসী নারী সমাজের মোকাবেলা করায় তার দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু তিনি দৃঢ় ও অবিচল ভূমিকা অবলম্বন করলেন। ব্যক্তিত্বের স্বভাব

www.pathagar.com

ও বাস্তবতা সম্পর্কে একটা কথাও বিকৃত করা হয়নি। অথচ এই বর্ণনায় জাহেলী নোংরামিকেও বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। কেননা এটাই একমাত্র নিখুঁত সঠিক বাস্তবতা।

এখন আসুন 'আযীয' অর্থাৎ মিসরের প্রধানমন্ত্রী প্রসংগে। তাঁর নেতৃত্ব ও পদের দম্ভ, সামাজিক পদমর্যাদা, সমাজের চোখে নিন্দনীয় দোষগুলো লুকানো ও সংরক্ষণের প্রবণতা– এ সবই তার মধ্যে বিদ্যমান। ২৮ ও ২৯ নং আয়াতে তার এ বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষণীয়।

এবারে দেখা যাক ওই সময়কার মিসরীয় নারী সমাজের অবস্থা কি রূপ ছিলো সেদিকে। এ সমাজেরই একজন বিশিষ্ট রমণী হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী। তিনি তার ক্রীতদাস ইউসুফের প্রেমে পড়েন এবং তাকে কু-কর্মের প্ররোচনা দেন। সাধারণ নারীরা প্রথমে তার নিন্দায় সোচ্চার হয়, কিন্তু সে নিন্দার আসল কারণ ওই অপকর্মের প্রতি ঘৃণা নয়; বরং মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষা। এরপর আকস্মিকভাবে তারা ইউসুফকে দেখতে পায়। দেখামাত্রই তারা ওই মহিলার প্রেমের প্রতি সমর্থন দিয়ে বসে, যাকে ইতিপূর্বে তারা নিন্দা করতো। এরপর প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী যখন অনুভব করলো, তার নিন্দুকিনীরা সবাই তার পূর্ণ সমর্থক হয়ে গেছে, তখন সে নিজেকে একেবারেই নিরাপদ মনে করে বল্গাহীন হয়ে উঠলো। কেননা তারা সবাই ওই মহিলার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসেছিলো। উপরন্তু ইউসুফকে সবাই মিলে বিপথগামী করতে সচেষ্ট হচ্ছিলো। অথচ একটু আগেই তারা তার নৈতিক পবিত্রতার প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিয়ে তাকে 'মানুষ নয়; বরং সম্মানিত ফেরেশতা' বলে আখ্যায়িত করেছিলো। তারা যে তাকে সম্মিলিতভাবে বিপথগামী করতে চেয়েছিলো তা বুঝা যায় হযরত ইউসুফের এই কথা দ্বারা! 'হে আমার প্রতিপালক, ওরা যে দিকে আমাকে ডাকছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার জন্যে ভালো। তুমি যদি ওদের চক্রান্ত নস্যাত করে আমাকে রক্ষা না করো, তবে আমি ......অজ্ঞ লোকদের দলভুক্ত হয়ে যাবো।' (আয়াত-৩৩)

বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী একাই নয়; বরং গোটা নারী সমাজই ইউসুফের প্রেমে পড়েছিলো।

পরবর্তী যে বিষয়টা এই সূরায় লক্ষণীয় তা হলো মিসরের সার্বিক পরিবেশ। ওপরে যে বিষয়গুলো আলোচিত হলো তার মধ্য দিয়ে এবং ইউসুফের নির্দোষিতা প্রমাণিত হওয়ার পরও তাকে কারাদন্ড দেয়ার মধ্য দিয়ে বুঝা যায়, সেখানকার সার্বিক পরিবেশ সৎলোকদের নয় বরং অসৎ লোকদের অনুকূল ছিলো। হযরত ইউসুফকে কারাদন্ড দেয়ার উদ্দেশ্য ছিলো এক অভিজাত নারীর কেলেংকারি এবং তার আলামত ধামাচাপা দেয়া, তাতে ইউসুফের মতো একজন নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করে তো করুক! (আয়াত ৩৪)

আমরা যখন ইউসুফের ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনা করি, তখন কাহিনীর কোনো একটি পর্যায়েও তার ব্যক্তিগত চারিত্রিক মহত্বের একটি বৈশিষ্ট্যও অনুপস্থিত থাকতে দেখি না। সমস্ত মানবীয় বৈশিষ্ট্য সহকারে এক সৎ বান্দা ও নবী পরিবারের একজন সদস্য

www.pathagar.com

হিসেবে তাঁর মধ্যে যে উচ্চতর নৈতিক এবং ধর্মীয় গুণবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকার কথা তা সর্বাবস্থায় বহাল থাকতে দেখা যায়। এমনকি কারাগারের যাতনাময় অন্ধকার কুঠুরীতে বসেও তিনি প্রখর বুদ্ধিমত্তা সহকারে কারাসংগীদের ইসলামের দাওয়াত দিতে ভোলেন না, বিরাজমান পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে হৃদয় জয় করার নিখুঁত কৌশল অবলম্বন করে দৃঢ় ও অনমনীয়ভাবে দাওয়াত দিতে থাকেন। সেই সাথে তিনি নিজের ব্যক্তিগত সততা এবং দ্বীনদারীকেও দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরেন।

'তাঁর সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করলো। তাদের একজন বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন মদ তৈরী করছি।..........' (আয়াত ৩৫-৪১)

এসব সত্তেও তিনি মানুষ। তাঁর ভেতরে মানবীয় দুর্বলতা কিছু না কিছু ছিলো। যেমন তিনি রাজাকে নিজের খবরাখবর জানিয়ে জেল থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা চালান। এ দ্বারা তিনি আশা করেন, রাজা হয়তো সেই কুটিল ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করবেন, যার কারণে তিনি জেলে ঢুকতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'ইউসুফ মুক্তি পাবার আশায় আশান্বিত লোকটাকে বললো, তোমার মনিবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করো, কিন্তু শয়তান তাকে ..... ভুলিয়ে দিলো....।' (আয়াত-৪২)

এর কয়েক বছর পর আমরা হযরত ইউসুফের ভূমিকা দেখতে পাই। তখন রাজা এক স্বপ্ন দেখেন এবং জ্যোতিষীরা ও ধর্মীয় পুরোহিতরা তার ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়। ঠিক তখনই জেলখানার সংগীর ইউসুফের কথা মনে পড়ে যায়। ইতিমধ্যে আল্লাহ তার এই পুণ্যময় বান্দাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এতোটা উৎকর্ষ দান করেন যে, আল্লাহ তাঁর জন্যে যে পরিণতি নির্ধারণ করে রেখেছেন, তিনি তাতেই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকতে প্রস্তুত হয়ে যান। এমনকি তিনি রাজার স্বপ্নের যথার্থ ব্যাখ্যা দেয়ার পর রাজা যখন তাঁকে মুক্তি দিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন, তখন তিনি সেই মুক্তির সুযোগও গ্রহণ করতে রাযি হলেন না। তিনি মুক্তির জন্যে শর্ত দিলেন, আগে তাঁর নামে আরোপিত অভিযোগের তদন্ত করে তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণ করতে হবে।

'রাজা বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি, সাতটা মোটা মোটা গাভীকে সাতটা চিকন চিকন গাভী গিলে খেয়ে ফেলছে ....' (আয়াত ৪৩-৫৫)

এই সময় আমরা দেখতে পাই হযরত ইউসুফের ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণভাবে বিকশিত, পরিপক্ব শান্ত, শিষ্ট ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। আর এই পর্যায়েই আমরা দেখতে পাই, তিনি মিসরের সকল ঘটনার একক নায়ক ও মধ্যমণি হয়ে উঠলেন, আর রাজা, প্রধানমন্ত্রী (আযীয), নারী সমাজ ও বিরাজমান প্রতিকূল পরিবেশ কোথায় যেন ক্রমান্বয়ে উধাও হয়ে যেতে লাগলো। কাহিনীর এ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পটভূমি সম্পর্কেই কোরআন বলেছে,

'এইভাবে আমি দেশে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম, যার ফলে সে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছিলো,........' (আয়াত ৫৬-৫৭)

www.pathagar.com

আর এই সময় থেকেই দেখতে পাই, হযরত ইউসুফ নতুন বিচিত্র কিছু পরীক্ষার সম্মুখীন হন এবং তিনি পূর্ণ দক্ষতা ও পরিপক্বতা, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে সেসব পরীক্ষার মুখোমুখি হন।

আমরা দেখতে পাই, কুয়ায় নিক্ষেপের পর প্রথম বারের মতো হযরত ইউসুফ তাঁর ভাইদের মুখোমুখি হয়েছেন। এ সময় তিনি তাদের তুলনায় সর্বদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ ও ক্ষমতাবান, কিন্তু তাঁর গৃহীত পদক্ষেপসমূহে ধৈর্য, সহনশীলতা ও সংযমের লক্ষণ সুস্পষ্ট। (আয়াত ৫৮-৬১)

আরো দেখতে পাই, আল্লাহর শিখানো কৌশল অবলম্বন করে কিভাবে তিনি নিজের ছোট ভাইকে কাছে রেখে দিলেন। এখানেই আমরা দেখতে পাই তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিপক্বতা, বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, গাম্ভীর্য, সংযম ও ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা। (আয়াত ৬৯-৭৯)

এরপর আমরা সেই অবস্থার সাক্ষাত পাই, যখন হযরত ইয়াকুবের সকল দুঃখকষ্টের অবসান ঘটে, আল্লাহ তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকল পরীক্ষার সফল পরিসমাপ্তি ঘটান। হযরত ইউসুফ পিতামাতা ও পরিবারের সাথে মিলিত হন। তাঁর দুর্দশাগ্রস্ত ভাইদের প্রতি সহানুভূতিশীল হন, তাদের কাছে নিজের পরিচয় মৃদু তিরস্কার সহকারে তুলে ধরেন এবং তাদের ক্ষমা করেন। এই পর্যায়ে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের কাছে এ ধরণের আচরণই কাংখিত। (আয়াত ৮৮-৯৩)

সর্বশেষে সেই মহান ও চমকপ্রদ পর্যায়টা ঘনিয়ে আসে, যখন হযরত ইউসুফ তার পিতামাতা ও সকল ভাইয়ের সাথে মিলিত হন এবং তার স্বপ্ন সফল হয়। অথচ তিনি এই গৌরবময় সাফল্যকে উপেক্ষা করে আল্লাহর সাথে একান্ত সংলাপে নিরত হন, 'হে আমার প্রতিপালক,...... আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং সৎলোকদের সাথে যুক্ত করো।' (আয়াত ১০১) এভাবে হযরত ইউসুফের ব্যক্তিত্বকে একটা পূর্ণাংগ একক ও বাস্তববাদী ব্যক্তিত্ব হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য সূরায়।

এরপর হযরত ইয়াকুবের প্রসংগ। একজন অত্যন্ত স্নেহময় ও পুত্রবৎসল পিতা এবং আল্লাহর এক প্রিয় নবী হিসাবে তাঁর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। ইউসুফের স্বপ্নের বিবরণ শুনে তিনি একাধারে আশা ও আতংকে দুলতে থাকেন। তিনি এ স্বপ্নের মধ্যে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পূর্বাভাস যেমন পান, তেমনি শয়তান তাঁর ছেলেদের মনে কোনোরকম কু-প্ররোচনা ঢুকিয়ে দিয়ে কোন অঘটন ঘটায় কিনা, সেই ভাবনায়ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। (আয়াত ৪-৬)

অতপর আমরা দেখতে পাই, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কাছ থেকে তাঁর ছেলেরা অনেক অনুনয় বিনয় করে ইউসুফকে নিয়ে গেলো এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে ফিরে এসে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনালো।

এ সময় তিনি মানবসুলভ ও নবীসুলভ বাস্তব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। (আয়াত ১১-১৮)

আমরা পুনরায় এ ব্যক্তিত্বকে তাঁর যাবতীয় বাস্তব ও স্বাভাবিক গুণবৈশিষ্ট্য সহকারে দেখতে পাই। এ সময় ছেলেরা পুনরায় তাঁর কাছে আবদার তোলে তাঁর

www.pathagar.com

কলিজার আরেক টুকরো অর্থাৎ ইউসুফের সহোদর ছোট ভাইকে তাদের সাথে পাঠানোর জন্যে। কেননা মিসরের প্রধানমন্ত্রী হযরত ইউসুফ তাকে নিয়ে যেতে বলেছেন আরো এক ভাগ বাড়তি গম আনার জন্যে, যা দুর্ভিক্ষের সময় অত্যন্ত জরুরী। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মিসরের এ নয়া প্রধানমন্ত্রী যে তাদেরই ভাই ইউসুফ, তা তারা চিনতেই পারেনি।

'তাদের পিতার কাছে তারা বললো, আব্বা, আমাদের গমের একটা অংশ দেয়া হয়নি। কাজেই আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে পাঠিয়ে দিন।' ....(আয়াত ৬৩-৬৮)

এরপর হযরত ইয়াকুব যখন তাঁর দ্বিতীয় মর্মবিদারী ঘটনার সম্মুখীন হন, তখনো তাঁকে দেখতে পাই একজন স্নেহশীল পিতা ও একজন আল্লাহ প্রিয় নবী হিসাবে। হযরত ইউসুফ যখন তার ভাইকে রেখে দিলেন, তখন হযরত ইয়াকুবের এক ছেলে তাদের সাথে আর বাড়ী ফিরে যায়নি। এ ছেলে তাদের মধ্যে বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলো। সে ভয় পাচ্ছিলো, পিতার সাথে এক কঠোর অংগীকার করে আসার পর এখন তাঁর সাথে কিভাবে দেখা করবো? হাঁ, পিতা অনুমতি দিলে বা আল্লাহ কোনো ফয়সালা করলে সেটা আলাদা কথা।

'যখন তারা ছোটো ভাই সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেলো, তখন তাদের বড়োজন বললো, তোমরা কি জানোনা যে আব্বা আমাদের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছেন ....?' (আয়াত ৮০-৮৭)

এই প্রবীণ ব্যক্তিত্বের দীর্ঘ মর্মন্তুদ জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে দেখতে পাই এক অলৌকিক ঘটনা! তিনি ইউসুফের জামায় ইউসুফের ঘ্রাণ পান। এতে ছেলেরা তাঁকে তিরস্কার করলেও তিনি তাতে অবিচল থাকেন এবং তাঁর প্রতিপালকের প্রতি সুধারণায় কিছুমাত্র সন্দেহ সংশয় পোষণ করেন না। (আয়াত ৯৪-৯৮)

বস্তুত এ ছিলো এক অসাধারণ নবীর ব্যক্তিত্ব, যার মধ্যে আবেগ, বাস্তবানুগতা, পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাকার যাবতীয় অত্যাবশকীয় বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিলো। কোনো বিকৃতি ও ঘাটতি এতে স্থান পায়নি।

সত্যনিষ্ঠ, পরিচ্ছন্ন ও ন্যায়নিষ্ঠ বাস্তবানুগতা শুধু মানুষের ব্যক্তিত্বেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরঞ্চ তা ঘটনা, বর্ণনা, স্থান, পরিবেশ, তার সত্যতা ও স্বাভাবিকতার মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়। এর ফলে প্রতিটা কাজ, কথা ও চিন্তা উপযুক্ত সময়ে এবং প্রত্যাশিতরূপেই সংঘটিত হয়। তার গুরুত্ব, ভূমিকা ও জীবন প্রবাহের প্রকৃতি অনুসারে তা নির্ধারিত হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও যে এ জিনিসগুলো যথাযথভাবে গণ্য হয়ে থাকে, সে কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

এমনকি এ সূরার কাহিনীতে যৌন আবেগের মুহূর্তগুলো ও তার বিভিন্ন পর্যায় সংক্রান্ত আলোচনাও যথেষ্ট পরিমাণে স্থান পেয়েছে, কিন্তু তা পরিচ্ছন্নতা ও শালীনতার সীমার মধ্যেই থেকেছে এবং 'মানুষে'র জন্যে যতোটা প্রয়োজন ততোটা শালীনতার মধ্যেই থেকেছে। মানবীয় বাস্তবতার ব্যাপক সত্যানুগ ও সম্পূরক রূপকে এতে

www.pathagar.com

কিছুমাত্র বিকৃত ও ম্লান করা হয়নি, কিন্তু অন্যান্য ঘটনা ও ভূমিকার সাথে যথাযথ সমন্বয় ঘটিয়ে ওই মুহূর্তগুলো তুলে ধরার অর্থ এ নয় যে, যৌনতাকে মানুষের সমগ্র বাস্তবতা, তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ও জীবনের মূল লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য বিংশ শতাব্দির জাহেলিয়াত আমাদের এটাই বুঝাতে চায়।

জাহেলিয়াত শৈল্পিক বস্তুনিষ্ঠতার নামে। মানুষের সাময়িক যৌন আবেগকে সে এমনভাবে তুলে ধরে যেন ওটাই মানবজীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। এভাবে সে একটা বিরাট ও সুগভীর আঁস্তাকুড় তৈরী করে এবং সেই সাথে তাকে শয়তানী ফুল দিয়ে সুসজ্জিত ও আকর্ষণীয় করে।

জাহেলিয়াত এ কাজটা এ জন্যে করে না যে, সে এটাকেই বাস্তব ও সত্য মনে করে এবং এ জন্যেও করে না যে, সে এই বাস্তবতার চিত্র অংকনে নিষ্ঠ। সে এ কাজটা করে শুধু এ জন্যে যে, ইহুদীবাদী সংস্থাগুলো তার কাছ থেকে এটা প্রত্যাশা করে। মানুষকে তারা মনুষ্যত্বহীন নিছক একটা পশু বানিয়ে ফেলতে চায়। যাতে বিশ্ববাসীর সামনে একমাত্র ইহুদীরাই মানবীয় মূল্যবোধ বিবর্জিত জাতি হিসাবে চিহ্নিত না হয়। তারা চায় সমগ্র মানবজাতিই পাশবিকতার আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হোক এবং ওই আঁস্তাকুড়েই সমস্ত শক্তি নিশেষিত হোক। মানবজাতিকে ধ্বংস করার সবচেয়ে নিশ্চিত অব্যর্থ পন্থা এটাই। এভাবে মানবজাতিকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করার পর তাকে অভিশপ্ত সম্ভাব্য ইহুদী সাম্রাজ্যের সামনে নতজানু করা যাবে বলে তারা আশা করে। এর পাশাপাশি তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদসমূহ প্রচার করে ওই একই উদ্দেশ্যে। এসব বৈজ্ঞানিক মতবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ডারউইন তত্ত্ব', 'ফ্রয়েড তত্ত্ব', 'মার্কসবাদ' ও 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'। এই সব ক'টা মতবাদই ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সমভাবে কার্যকর রয়েছে।

হযরত ইউসুফের কাহিনী নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এর ঐতিহাসিক অবস্থানকাল চিহ্নিত করে দিয়েছে। সেই ঐতিহাসিক সময়টা চিহ্নিত করার জন্যে কয়েকটা প্রতীকী বক্তব্যের উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি।

ওই সময়টাতে মিসর ফেরাউন নামে সুপরিচিত মিসরীয় রাজপরিবার দ্বারা শাসিত হচ্ছিলো না; বরং এক শ্রেণীর 'পশুপালক' দ্বারা শাসিত হতো এবং হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব তাদেরই কাছাকাছি সময়ে জীবন যাপন করে গেছেন। আল্লাহর এই নবীদের কাছ থেকে এই শাসকরা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে কিছুটা শিক্ষা লাভ করেছিলো। এই শাসকরা যে ফেরাউন ছিলো না তার প্রমাণ হলো, কোরআনে এই শাসকদের ফেরাউনের পরিবর্তে 'মালিক' তথা রাজা বলে অভিহিত করা হয়েছে, অথচ হযরত মূসার আমলের রাজাকে ফেরাউন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ থেকে মিসরে হযরত ইউসুফের আগমনের সঠিক সময়কাল কোনটা তা বুঝা যায়। এটা ছিলো ত্রয়োদশ ও সপ্তদশ রাজপরিবারের মধ্যবর্তী সময়। এ পরিবারগুলো ছিলো রাখাল পরিবার। মিসরীয়রা এদের ঘৃণাবশত 'হাকসুম' বলে আখ্যায়িত করতো।

www.pathagar.com

প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় হাকসুম অর্থ হলো 'শূকর' বা 'শূকরের রাখাল।' এ সময়টা প্রায় দেড় শতাব্দীকাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।

এ সময়টাই ছিলো হযরত ইউসুফের নবুওতের সময়। তিনি ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজ কারাগারে বন্দী থাকাকালেই শুরু করে দিয়েছিলেন। আর এ দ্বীনকে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ও তাঁর পিতা-পিতাম হযরত ইবরাহীম, এসহাক ও ইয়াকুবের দ্বীন বলে আখ্যায়িত করেন।

সূরা ইউসুফের ৩৬ থেকে ৪০ নং পর্যন্ত আয়াত ক'টায় তাঁর এ বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।

এ হচ্ছে ইসলামের সুস্পষ্ট, পূর্ণাংগ, নিখুঁত ও সর্বাত্মক রূপ। আল্লাহর নবী রসূলদের সবাই এই ইসলাম নিয়েই এসেছেন। এর মৌলিক আকীদা বিশ্বাস হলো আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি ঈমান, একমাত্র আল্লাহর এবাদাত আনুগত্য করা, তাঁর সাথে আর কাউকে মোটেই শরীক না করা। আল্লাহর গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁকে চিনতে হবে। তিনি হচ্ছেন এক, একক ও মহা প্রতাপশালী। এ আয়াত ক'টাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কোনো শাসন ক্ষমতাই নেই। সকল শক্তি ও শাসন ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ ও প্রভুত্ব করা মানুষকে গোলাম বানানোর শামিল, যা এক আল্লাহর এবাদাতের সুস্পষ্ট লংঘন। এবাদাতের অর্থ নিরূপণ করা হয়েছে কারো শাসন ক্ষমতার আনুগত্য করা ও কারো প্রভুত্ব মেনে নেয়া। এখানে আল্লাহর দ্বীনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এই যে, একমাত্র আল্লাহর হুকুম মানা ও একমাত্র তাঁর এবাদাত করা। বস্তুত হুকুম মানা ও এবাদাত করা সমার্থক। 'আল্লাহ ছাড়া আর কারো আদেশ দেয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা যেন তাঁর ছাড়া আর কারো এবাদাত না করো। এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক দ্বীন।' বস্তুত এটাই হলো ইসলামের সবচেয়ে স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, পূর্ণাংগ ব্যাপক ও সর্বাত্মক রূপ।

এটা সুস্পষ্ট যে, হযরত ইউসুফ (আ.) যখন মিসরের ক্ষমতার মসনদে আসীন হলেন, তখন তিনি এরূপ ব্যাপক ও সর্বাত্মকভাবে ইসলামের দাওয়াত অব্যাহত রাখলেন। বস্তুত মিসরে তাঁর হাতেই ইসলামের বিস্তার ঘটে। এ সময় তিনি শধু ক্ষমতার আসনেই অধিষ্ঠিত ছিলেন না; বরং মানুষের জীবন জীবিকা ও দন্ডমুন্ডের কর্তাও ছিলেন। তাঁর অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার ফলে সঞ্চিত খাদ্যভান্ডার থেকে খাদ্য খরিদ করার জন্যে যেসব প্রতিবেশী দেশ থেকে প্রতিনিধি দল আসতো, সেসব দেশেও ক্রমান্বয়ে ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমরা দেখেছি, অন্যান্য দেশের ন্যায় জর্ডানের কেনান থেকে হযরত ইউসুফের ভাইয়েরাও মিসর থেকে খাদ্য কিনতে এসেছিলো। এ থেকে বুঝা যায় যে, সে সময় সমগ্র এলাকা জুড়ে কী সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো!

কাহিনীতে এ মর্মেও ইংগিত পাওয়া যায় যে, মেষপালক গোষ্ঠীভুক্ত শাসকরা ইসলামী আকীদা বিশ্বাস দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত ছিলো এবং হযরত ইউসুফের

www.pathagar.com

দাওয়াতের পর এই আকীদা বিশ্বাস ব্যাপকতা লাভের কারণেই সেটা সম্ভব হয়েছিলো। অন্তত দু'টো জায়গায় আমরা শাসকগোষ্ঠীর ওপর ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের প্রভাবের লক্ষণ দেখতে পাই।

প্রথমটা হলো, হযরত ইউসুফ যখন মহিলাদের সামনে বেরিয়ে এলেন তখন তাদের মুখে আল্লাহ ও ফেরেশতার উল্লেখসহ স্বতস্ফূর্ত বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ঘটে। তারা বললো

'হায় আল্লাহ, এ তো মানুষ নয়! এ তো সম্মানিত এক ফেরেশতা!' (আয়াত-৩১)

অনুরূপভাবে মিসরীয় প্রধানমন্ত্রী স্বীয় স্ত্রীকে সম্বোধন করে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তাতেও এই প্রভাবের লক্ষণ পরিস্ফুট। যেমন,

'ইউসুফ, তুমি এই ব্যাপারটা এড়িয়ে যাও। আর হে বেগম, তুমি তোমার পাপের জন্যে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তুমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছো।' (আয়াত- ২৯)

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সুস্পষ্ট ইংগিতটা প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর কথা থেকেই বেরিয়ে এসেছে। তার এ কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, সে ইউসুফের আকীদাবিশ্বাস গ্রহণ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামও গ্রহণ করেছে। কোরআনে তার যে বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে তা হলো,

'আযীযের (প্রধানমন্ত্রীর) স্ত্রী বললো, এখন সত্য বেরিয়ে পড়েছে। আমিই ওঁকে প্ররোচিত করেছিলাম এবং ওঁ অবশ্যই সত্যবাদী।' .... (আয়াত ৫২-৫৩)

যখন জানা গেলো, তাওহীদবাদী আকীদাবিশ্বাস মিসরের ক্ষমতায় হযরত ইউসুফের আরোহণের আগেই এতটা ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেছিলো, তখন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহই থাকে না যে, তাঁর ক্ষমতায় আরোহণের পর ইসলাম আরো ব্যাপক ও স্থিতিশীল হয়েছিলো। এরপর রাখাল রাজাদের আমলেও ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছিলো। পরে অষ্টাদশ রাজপরিবারের শাসনামলে যখন ফেরাউনরা পুনরায় ক্ষমতা দখল করলো, তখন তারা তাওহীদী ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিরোধ শুরু করলো। কেননা ফেরাউনদের ক্ষমতার ভিত্তিই ছিলো পৌত্তলিকতা। ওদিকে হযরত ইয়াকুবের বংশধররা (যাদের অপর নাম বনী ইসরাঈল) ততোদিনে মিসরে এক বিরাট জনশক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং তারাই ছিলো একমাত্র ইসলামী জনগোষ্ঠী।

এ থেকে আমরা জানতে পারি, ফেরাউনী শাসনামলে বনী ইসরাঈল অর্থাৎ হযরত ইয়াকুবের বংশধরদের ওপর নির্যাতনের রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও অন্য কারণ কী ছিলো?

রাজনৈতিক কারণটা হলো এই যে, হযরত ইয়াকুবের বংশধররা রাখাল রাজাদের আমলে কেনান থেকে মিসরে এসে বসতি স্থাপন করে এবং ক্রমান্বয়ে ক্ষমতাসীন হয়। এরপর যখন মিসরীয়রা রাখাল রাজাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে, তখন তাদের সহযোগী বনী ইসরাঈলকেও বিতাড়িত করে। এর আসল কারণ হলো আকীদা বিশ্বাসের বৈপরীত্য। কেননা একমাত্র আকীদাগত বৈপরীত্যই অতো বড় পৈশাচিক নির্যাতনের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাখ্যা হতে পারে। কারণ সঠিক তাওহীদী আকীদার

www.pathagar.com

বিস্তার ফেরাউনদের রাজত্বের ভিত্তিই ধসিয়ে দিতে সক্ষম। তাওহীদী আকীদাই স্বৈরাচারী আল্লাহদ্রোহী শাসকদের শাসন ও তাদের প্রভুত্বের আসল শত্রু।

সূরা মোমেনের এক জায়গায় এই মর্মে ইংগিত পাওয়া যায় যে, ফেরাউন এক পর্যায়ে যখন মূসা (আ.)-কে হত্যা করে তাওহীদী আকীদার মূলোৎপাটন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলো, তখন ফেরাউনের বংশধরের মধ্যকার এক ব্যক্তি, যিনি গোপনে ঈমান এনেছিলেন, তিনি হযরত মূসার পক্ষ নিয়ে ফেরাউনের সাথে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। ওই সূরায় বলা হয়েছে,

'ফেরাউন বললো, আমি মূসাকে হত্যা করবোই। সে তার খোদাকে ডাকুক। ......ফেরাউনের বংশধরের মধ্যকার এক ব্যক্তি নিজের ঈমান লুকিয়ে রেখেছিলো। সে বললো, এক ব্যক্তি 'আল্লাহ আমার প্রতিপালক' এই কথাটা বলেছে– 'এ দোষেই কি তোমরা তাকে হত্যা করবে?' .... (সূরা মোমেন ২৬-৩৫)

বস্তুত আসল দ্বন্দ্ব সংঘাতই ছিলো তাওহীদ ও পৌত্তলিকতার মধ্যে। কেননা তাওহীদ এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব স্বীকার করে না এবং আর কারো সার্বভৌমত্ব মানে না। পক্ষান্তরে পৌত্তলিকতা ছাড়া ফেরাউনী স্বৈরাচার টিকেই থাকতে পারে না।

হযরত ইউসুফ মিসরে যে তাওহীদের মর্মবাণী প্রচার করেছিলেন, সম্ভবত তারই কিছু অসম্পূর্ণ ও বিকৃত রূপের সাথে হযরত মূসার আমলের মিসরীয় সম্রাট ফেরাউন আখনাতুনের পরিচয় ঘটেছিলো। বিশেষত এ কথা যদি সত্য হয় যে, আখনাতুনের মাতা ফেরাউনের বংশোদ্ভূত ছিলো না; বরং এশীয় ছিলো।

যা হোক, হযরত মূসা (আ.)-এর আমল সংক্রান্ত এ আনুষংগিক আলোচনাটুকুর পর আমরা পুনরায় হযরত ইউসুফের কাহিনীতে ফিরে যাচ্ছি। ইতিহাসের যে স্তরটাতে এ ঘটনা ঘটেছিলো সেই স্তরটার প্রকৃতি নির্দেশক আলোচনায় আবার ফিরে যাচ্ছি। এই আলোচনায় ফিরে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ ঘটনা শুধু মিসরে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং মিসরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনা সমগ্র যুগের চরিত্রটাই তুলে ধরেছে। স্বপ্ন ও ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা এই যুগটা সুস্পষ্টভাবেই চিহ্নিত। অথচ এগুলো কোনো একটা নির্দিষ্ট দেশে বা জাতিতে সীমিত থাকে না। আমরা দেখতে পাই, হযরত ইউসুফের স্বপ্ন ও তার তাবীরে এ বৈশিষ্ট্যটা সুস্পষ্ট। এ বৈশিষ্ট্যটা হযরত ইউসুফের দুই কারাসংগী এবং স্বয়ং রাজার স্বপ্নেও উপস্থিত। স্বপ্নের দর্শক ও শ্রোতা উভয়েই এ বৈশিষ্ট্যটা গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করে, যা গোটা যুগের সামগ্রিক চরিত্র নির্দেশক।

সংক্ষেপে এ কথাটাও বলা দরকার যে, এ কাহিনীতে রয়েছে পর্যাপ্ত শৈল্পিক, মানবীয় এবং আবেগের উপাদান। সূরার বর্ণনাভংগির মধ্য দিয়ে এ উপাদানগুলো প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তদুপরি কোরআনের স্বভাবগত প্রভাবশালী ও তাৎপর্যবহ প্রকাশভংগির বৈশিষ্ট্য তো রয়েছেই, যা প্রত্যেক স্থানেই আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে সুরেলা মূর্ছনার সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

এ কাহিনীতে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন গুণগত মানে পিতৃস্নেহের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ইউসুফ ও তাঁর সহোদরসহ, তাঁর অন্য ছেলেদের প্রতি হযরত ইয়াকুবের স্নেহের মধ্য দিয়ে এবং সমগ্র কাহিনী জুড়ে ইউসুফের সাথে জড়িত ঘটনাবলীতে তাঁর নানা প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পিতৃস্নেহের আকৃতিগত তারতম্য ও পার্থক্য দেখে বৈমাত্রেয় ভাইদের মধ্যে নানা বিরোধ বিদ্বেষ ও আত্মমর্যাদাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। স্বয়ং ভাইদের মনে আত্মমর্যাদাবোধ ও বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়ায়ও কতো পার্থক্য ঘটে, তা এখানে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই পার্থক্যটা এরূপ যে, কেউ কেউ ইউসুফকে গোপনে হত্যা করার প্ররোচনা দেয়, আবার অন্যরা ইউসুফকে শুধু কুয়ায় ফেলে দেয়া যথেষ্ট মনে করে। কোনো বিদেশী কাফেলা তাকে কুড়িয়ে নেয় তো নিক। এভাবে অন্তত খুনের অপরাধ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। এ কাহিনীতে ধোঁকাবাজির উপাদানটাও লক্ষণীয়। ইউসুফের সাথে তাঁর ভাইদের এবং নিজের স্বামী ও মহিলাদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর ধোঁকাবাজি এর আওতাভুক্ত। যৌন আবেগের তাড়না, এই তাড়নার শিকার হয়ে অন্যের রূপে মুগ্ধ হওয়া ও মিলনাকাংখা পোষণ করা এবং অন্য জনের এই তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করা এ কাহিনীর আরেকটা উপাদান। তা ছাড়া অনুতাপ, ক্ষমা ও বিচ্ছিন্ন স্বজনদের পুনর্মিলনজনিত আনন্দও এ কাহিনীর অন্যতম উপাদান। জাহেলী সমাজ ও সমাজের শাসক মহলের অবস্থাভেদে এই উপাদানগুলো দৃশ্যমান।

কাহিনীটার সূচনা হয়েছে পিতার কাছে ইউসুফের নিজের দেখা স্বপ্ন বর্ণনার মধ্য দিয়ে। পিতা হযরত ইয়াকুব সাবধান করে দিলেন যেন তিনি তাঁর ভাইদের এ স্বপ্নের কথা না জানান। তিনি ইউসুফকে জানালেন, তাঁর বিপুল মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটবে। এ স্বপ্নের কথা তাঁর ভাইরা জানলে তাদের মধ্যে হিংসার সৃষ্টি হতে পারে এবং তারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে বলে তিনি সতর্ক করে দেন। এরপর কাহিনীর ধারা এমনভাবে চলতে থাকে যে, তা স্বপ্নের তাবীর এবং হযরত ইয়াকুবের প্রত্যাশার বাস্তবায়ন বলেই মনে হতে থাকে। অবশেষে যখন স্বপ্নের তাবীর শেষ হলো, অমনি হযরত ইউসুফের কিসসার সমাপ্তি ঘটলো, 'প্রাচীন পুস্তকে'র লেখকদের ন্যায় কোরআন আর এ কাহিনী বর্ণনা অব্যাহত রাখেনি। কেননা তার আসল ধর্মীয় উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে সফল হয়েছে।

কাহিনীর স্বভাবজাত শৈল্পিক উপাদান এ কাহিনীতে বিদ্যমান। স্বপ্ন দিয়ে কাহিনীর শুরু হয়েছে। তারপর এর ব্যাখ্যা অজানা থেকে যায়। একটু একটু করে ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় এবং উপসংহারে কোনো কৃত্রিমতার আশ্রয় না নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই কাহিনী শেষ করে দেয়া হয়।

কাহিনীটা কয়েকটা পর্বে বিভক্ত। প্রত্যেক পর্বে কিছু দৃশ্য রয়েছে। তবে এক দৃশ্য ও অপর দৃশ্যের মাঝে কিছু শূন্যতা রয়েছে, যা পাঠক আপন চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে পূরণ করতে পারে।

www.pathagar.com

হযরত ইউসুফের কাহিনীর শৈল্পিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর্যায়ে এ পর্যন্ত যেটুকু নিবেদন করেছি, আমরা সেটুকুতেই ক্ষ্যান্ত থাকতে চাই। এর বর্ণনায় ইসলামী ও কোরআনী ভাবধারার যেটুকু স্ফুরণ ঘটেছে, আমরা আপাতত তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চাই। কেননা প্রকৃত শালীন ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে যেটুকু উপাদান প্রয়োজন তা এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে।

যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, তা হলো ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে এ কাহিনীর শিক্ষা ও তাৎপর্য। এ পর্যায়ে আমরা সংক্ষেপে নিম্নোক্ত শিক্ষাগুলো তুলে ধরতে চাই।

এই ভূমিকার শুরুতে আমরা ইংগিত দিয়েছি যে, এ সূরা নাযিল হবার সময়ে মক্কায় ইসলামী আন্দোলন যে কঠিন নির্যাতনের শিকার ছিলো, তার সাথে ইউসুফের কাহিনীর যথেষ্ট মিল রয়েছে। রসূল (স.)-এর একজন আদর্শিক ভাই হযরত ইউসুফ যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলেন, তা তাঁর মতো একজন সম্মানিত নবীর কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত তাৎপর্যমন্ডিত। পরিণামে হযরত ইউসুফের মতোই রসূল (স.)-এর ক্ষমতায় অধিষ্ঠান এবং পরাক্রমলাভও খুবই শিক্ষাপ্রদ।

কাহিনীর বিশ্লেষণ প্রসংগে ইসলামের সেই স্পষ্ট, পূর্ণাংগ, সর্বাত্মক ও সূক্ষ্ম রূপটি আমরা তুলে ধরেছি, যা হযরত ইউসুফ তুলে ধরেছিলেন। এ বিষয়টি নিয়ে একটু বিশ্লেষণে যাওয়া আবশ্যক।

ইসলামই সকল নবীর একমাত্র আকীদা ও একমাত্র ধর্ম– একথা সূরার সূচনা থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ইসলামের মৌলিক নীতিমালা সকল রসূলের জন্যে ছিলো একই। সকল নবীরই বক্তব্য ছিলো পূর্ণাংগ তাওহীদের সপক্ষে। সবাই একবাক্যে বলেছেন, আল্লাহই মানব জাতির একমাত্র প্রভু, মালিক, মনিব ও আইনদাতা এবং মানুষ একমাত্র আল্লাহরই গোলাম বা দাস। যারা 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে'র নামে বলে যে, মানবজাতি প্রথমে একাধিক ইলাহতে বিশ্বাস করতো এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার ন্যায় তাওহীদের জ্ঞানও তারা পর্যায়ক্রমে অর্জন করেছে– তাদের এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। এ সব ধ্যান ধারণার মোদ্দাকথা দাঁড়ায়, জ্ঞান বিজ্ঞানের ন্যায় ধর্মও মানুষের তৈরী।

এ কাহিনী থেকে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, তাওহীদবাদী ধর্মের প্রকৃতিও সকল নবীর আমলে একই রকম ছিলো। অর্থাৎ কোনো নবী এ কথা বলেননি যে, সৃষ্টিকর্তা তো এক, কিন্তু মানুষের জন্যে আইনদাতা ও সার্বভৌম প্রভু এক নয়; বরঞ্চ মানুষের এক, তার আইনদাতাও এক অভিন্ন। মানুষের জীবনের সকল ব্যাপারে হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর, আর কারো নয়। এ কথা স্বয়ং আল্লাহর আদেশক্রমেই স্থির হয়েছে। তিনিই বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত করা তথা হুকুম পালন করা যাবে না। কোরআন এ ক্ষেত্রে এবাদাতের সঠিক মর্ম নির্ধারণ করে দিয়েছে। এবাদাত হলো এক কথা, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুমদান আর মানুষের পক্ষ থেকে একমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন।' এটাই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা। সুতরাং মানুষ যতোক্ষণ একমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন না করবে

www.pathagar.com

ততোক্ষণ তাকে আল্লাহর দাস বা গোলাম বলা যাবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জীবনের কোনো কোনো ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম মানে এবং কোনো কোনো ব্যাপারে মানে না, তাকেও আল্লাহর এবাদাতকারী বলা যাবে না। আল্লাহকে একমাত্র প্রভু মানলে তাকে একমাত্র মাবুদও মানতেই হবে। আর এর অর্থ হলো, একমাত্র আল্লাহই হুকুমদাতা ও আইনদাতা এবং একমাত্র আল্লাহরই এবাদাত তথা হুকুম ও আইন পালন করতে হবে। বস্তুত এই শব্দ দু'টো অর্থাৎ এবাদাত ও রবুবিয়াত সমার্থক। যে এবাদাত করলে মানুষ মুসলমান এবং না করলে অমুসলমান হয়ে যায়, তা হলো একমাত্র আল্লাহর হুকুমের অনুগত হওয়া এবং আর কারো অনুগত না হওয়া। যে কোনো যুগে যে কোনো স্থানে মানুষের মুসলমান হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটায় কোরআনের এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা। ইসলাম সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের ন্যূনতম পক্ষে এ জ্ঞানটুকু থাকা উচিত, যে ব্যক্তি নিজের জীবনের যে কোন ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো হুকুম পালন করে সে মুসলমান নয় এবং ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করে না, সে মুসলমান এবং ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। এর বাইরে অন্য কোনো বক্তব্য দেয়া ভন্ডামি ছাড়া আর কিছু নয় এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে যে বিতর্ক তোলে সে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধেই বিতর্ক তোলে।

এ কাহিনীর আর একটা শিক্ষা এই যে, ঈমান একটা নির্ভেজাল বিশ্বাসের নাম, যা আল্লাহর দুই নিষ্ঠাবান বান্দা ইয়াকুব ও ইউসুফের মনে বদ্ধমূল হয়েছিলো।

হযরত ইউসুফ কেমন একনিষ্ঠ মোমেন ছিলেন, তা তাঁর এ দোয়া থেকে জানা যায়–

'হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে রাজত্ব দান করেছো এবং আমাকে বিভিন্ন কথার ব্যাখ্যা শিখিয়েছো। হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দিও এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত করো।' (আয়াত ১০১)

তবে শুধু এ সর্বশেষ অবস্থানই যে তাঁর একমাত্র অবস্থান তা নয়। আসলে এ সূরায় তাঁকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই রকম অবস্থানে দেখা যায়। যেমন এক যুবতী নারীর নগ্ন বিপথগামিতার আহ্বানে তিনি জবাব দেন, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই, তিনি আমার মনিব, আমাকে উত্তম স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। যালেমরা কখনো সুপথ প্রাপ্ত হয় না।'

অপর এক পর্যায়ে তিনি নিজের দুর্বলতা ও বিপথগামিতার আশংকা অনুভব করে বলেন........।' (আয়াত-৩৩)

ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দেয়ার সময় তিনি বলেন,

'আমি ইউসুফ এবং এ আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের ওপর করুণা বর্ষণ করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহভীতি ও ধৈর্য অবলম্বন করে, আল্লাহ সেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।'

www.pathagar.com

এ সবই এমন ভূমিকা ও অবস্থান, যার প্রয়োজনীয়তা শুধু মক্কার ইসলামী আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়; বরং সর্বকালের ইসলামী আন্দোলনেরই এর আবশ্যকতা রয়েছে।

পক্ষান্তরে ইয়াকুব (আ.)-এর অন্তরেও আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় সদাজাগ্রত। যখনই তাঁর বিপদ মসিবত তীব্র আকার ধারণ করে তখনই তার মনে তাঁর প্রভুর সেই পরিচয় স্বচ্ছ হয়ে ওঠে এবং সেই অনুপাতেই তাঁর মন বিনয়ী হয়। শুরুতেই যখন ইউসুফ তাঁর কাছে নিজের স্বপ্নের বিবরণ দেন তখন তিনি বলেন,

'এভাবেই তোমার প্রভু তোমাকে গ্রহণ করবেন। তোমাকে কথার ব্যাখ্যা শেখাবেন, তোমার ওপর ও ইয়াকুবের বংশধরের ওপর নিজের অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করবেন, যেমন ইতিপূর্বে তোমার দুই পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের ওপর পূর্ণ করেছেন।' (আয়াত ৬)

ইউসুফের ব্যাপারে প্রথম আঘাত খেয়েই তিনি আল্লাহর সাহায্য চেয়ে বলেন,

'বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্যে কোনো চক্রান্ত তৈরী করেছে। অতএব ধৈর্যই সুন্দর। তোমরা যা কিছু বলছো, সে ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্যই কাম্য।' (আয়াত ১৮)

নিজের ছেলেদের যখন তিনি সতর্কতার শিক্ষা দেন এবং একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন, তখনো তিনি ভুলে যান না যে, এই সতর্কতা আল্লাহর যে কোনো পদক্ষেপ থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারে না; বরং আল্লাহর সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়ে থাকে। এটা হলো কেবল মনের একটা বাসনা, যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর ফয়সালা থেকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম নয়।

'ইয়াকুব বললো, হে আমার ছেলেরা, তোমরা একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো।' (আয়াত ৬৮)

চরম বার্ধক্য, দুর্বলতা, দুশ্চিন্তার মধ্যে যখন ছেলের ব্যাপারে দ্বিতীয় আঘাত প্রাপ্ত হন তখনো এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর অন্তরে আল্লাহর রহমত থেকে হতাশার সৃষ্টি হয়নি! তিনি বলেন,

'বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্যে একটা চক্রান্ত প্রস্তুত করেছে। অতএব ধৈর্যই সুন্দর। আশা করি আল্লাহ তাদের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন ......' (আয়াত-৮৩)

এরপর আল্লাহর পরিচিতি তাঁর অন্তরে আরো স্পষ্ট রূপ ধারণ করে। ছেলেরা তাঁকে ইউসুফকে নিয়ে অতিমাত্রায় দুর্ভাবনা, কান্নাকাটি ও কাঁদতে কাঁদতে চোখ সাদা করে ফেলতে দেখে তিরস্কার করা সত্তেও তিনি তাদের জানান, তিনি নিজের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যে উপলব্ধি অর্জন করেছেন, তা তারা করেনি এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তিনি যা জানেন তা তারা জানে না। এ কারণে তিনি শুধু আল্লাহর কাছেই নিজের মনের দুঃখ জানান এবং তাঁর রহমতের আশা করেন।

'ইয়াকুব তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেলো এবং বললো, হায় আফসোস, ইউসুফের ওপর! ......' (আয়াত ৮৪-৮৭) এরপর যখন তিনি ইউসুফের ঘ্রাণ পাওয়ার

www.pathagar.com

কথা জানালেন, তখনও ছেলেরা তাঁর সাথে তর্ক করতে লাগলো। তিনি আবারো তাদের বললেন, তিনি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যা জানেন তা তারা জানে না। 'যখন কাফেলা রওনা হয়ে গেলো তখন তাদের পিতা বললো, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি ...' (আয়াত ৯৪-৯৬)

বস্তুত এ হচ্ছে আল্লাহর পরিচয়ের স্বচ্ছতম স্তর, যা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় বান্দারা ছাড়া আর কেউই অনুভব করতে পারে না। এতে মক্কার মুসলিম সংগঠনের দুঃখ কষ্ট ও যুলুম নির্যাতনের সময়; করং সর্বকালের ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্যে চিরস্থায়ী শিক্ষা রয়েছে।

সর্বশেষে সুদীর্ঘ কাহিনীর যেখানে সমাপ্তি ঘটেছে, সেখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন মন্তব্য করা হয়েছে।

প্রথম মন্তব্যটাতে সরাসরি রসূল (স.)-এর কাছে নাযিল হওয়া ওহীর প্রতি কোরায়শদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানের জবাব দেয়া হয়েছে। এই জবাব দেয়া হয়েছে ওই কাহিনীরই বিভিন্ন দিকের প্রতি ইংগিত দিয়ে, যা সংঘটিত হওয়ার সময় রসূল (স.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

'এ হচ্ছে সেই অদৃশ্য ঘটনাবলীরই অন্যতম, যা আমি তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমেই নাযিল করছি। ইউসুফের ভাইরা যখন ষড়যন্ত্র চক্রান্ত আঁটছিলো, তখন তুমি তাদের কাছে উপস্থিত ছিলে না।' (আয়াত-১০২) সূরার ভূমিকায় ৩ নং আয়াতে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তার সাথে এ মন্তব্যের গভীর মিল রয়েছে। ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

'আমি এই কোরআন তোমার কাছে ওহী করার মাধ্যমে তোমাকে সর্বোত্তম কাহিনী শুনাচ্ছি। ইতিপূর্বে তুমি এ কাহিনী জানতে না।'

বস্তুত সূরার ভূমিকায় ও উপসংহারে করা মন্তব্যগুলো এ সূরার বক্তব্যকে অধিকতর শক্তিশালী ও প্রভাবশালী করেছে, এর তত্ত্ব ও তথ্যকে প্রাণবন্ত করেছে এবং অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানের দাঁতভাংগা জবাব দিতে সাহায্য করেছে।

এতে রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে প্রত্যাখ্যানকারীদের উপেক্ষা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের গোয়ার্তুমি, একগুঁয়েমি ও বিশ্বপ্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিদর্শনাবলীর প্রতি তাদের অবজ্ঞা যে সীমাহীন; তাও ব্যক্ত করা হয়েছে। অথচ ঈমান আনার জন্যে প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীই যে কোনো সুস্থ বিবেকের পক্ষে যথেষ্ট।

'তুমি প্রত্যাশা করলেও অধিকাংশ লোক মোমেন হবে না। ......' (আয়াত ১০৩-১০৭)

মানুষ যখন আল্লাহর সঠিক দ্বীনের অনুসরণ করে না তখন তার স্বভাব প্রকৃতি সংক্রান্ত নিগূঢ় তত্ত্বের ওপর আনুপাতিক হারেই এগুলো প্রভাবশালী হয়। বিশেষত আল্লাহর এই উক্তিতে মানুষের এ স্বভাবের নিখুঁত চিত্র অংকিত হয়েছে, 'তাদের

www.pathagar.com

অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি শেরেক মিশ্রিত ঈমান ছাড়া ঈমান আনে না।' (আয়াত ১০৬)

বস্তুত এ হচ্ছে শেরেক মিশ্রিত ঈমানের অধিকারী অনেকেরই সঠিক চিত্র। তারা তাওহীদের পক্ষে চূড়ান্তভাবে মত স্থির করে না। এরপর আসছে রসূল (স.)-কে অত্যন্ত গভীর ও প্রভাবশালী ভংগিতে দেয়া সত্য এবং ন্যায়ের পথ অবলম্বনের আপসহীন সুস্পষ্ট নির্দেশ।

'বলো, এ হচ্ছে আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে ডাকি। ...... নিখুঁত প্রজ্ঞার ওপর আছি। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (আয়াত-১০৮)

এরপর সূরার সর্ব শেষাংশে সমগ্র কোরআনের কেসসা কাহিনীর অভিন্ন শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। এ শিক্ষা এ সূরা ও অন্যান্য সূরায় সমভাবে বিদ্যমান। প্রাথমিকভাবে এ শিক্ষা রসূল (স.) ও তাঁর সাথী মুষ্টিমেয় সংখ্যক মোমেনকে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে দেয়া হয়েছে সান্ত্বনা, সুসংবাদ ধৈর্য ধারণের উপদেশ ও সতর্কবাণী। ওহী ও রেসালাতের সত্যতাও এতে তুলে ধরা হয়েছে। আর সত্যকে করা হয়েছে সব রকমের কু-সংস্কার ও অলীক কল্পনা থেকে মুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি তোমার পূর্বে তো এমন সব ব্যক্তিকেই রসূল করে পাঠিয়েছি যারা জনপদবাসীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলো।.........' (আয়াত ১০৯-১১১)

বস্তুত এ হচ্ছে এ সূরার সর্বশেষ এবং সর্ববৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য।

এবার আরেকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে চাই। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফের কাহিনীর সাথে বেশ কিছু সূক্ষ্ম ইংগিতপূর্ণ সমন্বিত কোরআনী বর্ণনাভংগি অনেক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ জিনিসগুলোর কিছু বিশ্লেষণ পেশ করা সমীচীন মনে হচ্ছে।

কোরআনের অন্যান্য সূরার মতো এ সূরাতেও এমন কয়েকটা বক্তব্য বার বার তুলে ধরা হয়েছে যা সূরার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এলেম বা জ্ঞান এবং অজ্ঞতা বা জ্ঞানের স্বল্পতার কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে বেশ কতকগুলো আয়াতে। যেমন,

৬, ২১, ২২, ৪৩, ৩৭, ৪০, ৪৪, ৪৬, ৫০, ৫২, ৫৫, ৬৮, ৭৩, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৬, ৮৯, ৯৬ ও ১০১ নং আয়াতগুলো লক্ষণীয়। এ আয়াতগুলো মহাগ্রন্থ কোরআনের কয়েকটা রহস্যপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয়ত এ সূরায় আল্লাহর কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো সার্বভৌমত্ব। এটা কখনো বা হযরত ইউসুফের মুখ দিয়ে 'আল্লাহর প্রতি তাঁর বান্দাদের ইচ্ছাকৃত আনুগত্য' অর্থে, আবার কখনো বা হযরত ইয়াকুবের মুখ দিয়ে 'অনিচ্ছা সত্তেও আল্লাহর প্রতি বান্দার আনুগত্য' অর্থে উচ্চারিত

www.pathagar.com

হয়েছে। এভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা নেহাত কাকতালীয়ভাবে নয় বরং সুপরিকল্পিতভাবেই উচ্চারিত হয়েছে।

মিসরের শাসকদের প্রভুত্ব যে অযৌক্তিক ও আল্লাহর একত্বের পরিপন্থী, সে কথা বুঝিয়ে বলার উদ্দেশ্যেই ইউসুফ (আ.) বলেন,

'হে আমার কারাসংগীদ্বয়। নানা প্রভু ভালো, না মহাপ্রতাপান্বিত এক আল্লাহই ভালো? .... সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর, তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না। এটাই হলো, অটল ও অকাট্য দ্বীন।' (আয়াত ২৯ ও ৩০)

পক্ষান্তরে আল্লাহর ফয়সালা অপ্রতিরোধ্য, এই মর্মে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হযরত ইয়াকুব বলেন, 'হে আমার ছেলেরা, তোমরা একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। তবে এ আদেশ দ্বারা আমি তোমাদের আল্লাহর কোনো ফয়সালা থেকে রক্ষা করছি না। সর্বময় শাসনক্ষমতা কেবল আল্লাহর। আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করছি এবং তাঁর ওপরই সকলের নির্ভর করা উচিত।' (আয়াত-৬৭)

বস্তুত সার্বভৌমত্ব তথা সর্বময় শাসন ক্ষমতার অর্থের এ পূর্ণতা থেকে বুঝা যায় যে, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় ক্ষেত্রেই একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য না করলে 'দ্বীন' পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। উভয় প্রকারের আনুগত্যই ইসলামী আকীদার অবিচ্ছেদ্য অংগ। শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক ও অনিচ্ছাকৃত ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্য করাই ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং শরীয়তের ইচ্ছাকৃত অংশেও আল্লাহর আনুগত্য করা ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত।

এ সূরার চমকপ্রদ বর্ণনাভংগির আরো একটা আকর্ষণীয় দিক এই যে, হযরত ইউসুফ সূক্ষ্মদর্শিতাকে আল্লাহর একটা গুণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং তা এমন এক জায়গায় করেছেন যেখানে সূক্ষ্মদর্শিতাই যথার্থ মানানসই। যেমন ১০০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, '....... নিশ্চয় আমার প্রভু যে বিষয়ে ইচ্ছা করেন সূক্ষ্মদর্শী। নিশ্চয়ই তিনি মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।'

সূরার আরেকটা চমকপ্রদ দিক ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এটি হলো সূরার ভূমিকা ও উপসংহারের বক্তব্যের অপূর্ব মিল এবং উপসংহারে দীর্ঘ শিক্ষামূলক বক্তব্য প্রদান। আর এসব মন্তব্যেরই মূল বক্তব্য প্রায় একই। সূরার শুরু ও শেষে একই বিষয়ে আলোচনা।

সূরা ইবরাহীম

সূরা ইবরাহীম একটা মক্কী সূরা এবং এর মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিশ্বাস যথা ওহী, রেসালাত, তাওহীদ, মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হওয়া, হিসাব গ্রহণ ও কর্মফল দান ইত্যাদি, যা সাধারণত মক্কী সূরাগুলোতে আলোচিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

তবে এই সূরায় এ বিষয়গুলো ও তার মূল তথ্যসমূহ তুলে ধরতে গিয়ে একটা বিশেষ ধরনের বাচনভংগি অবলম্বন করা হয়েছে। কোরআনের প্রত্যেকটা সূরারই বিশেষ ধরনের বাচনভংগি থাকে, যা দ্বারা তাকে অন্যান্য সূরা থেকে পৃথক করা ও চেনা যায়। সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট, দৃষ্টিভংগি, যে প্রেক্ষাপটে তার প্রধান প্রধান তথ্য আলোচিত হয় এবং এসব তথ্যের ধরন, যা সাধারণত অনুরূপ অন্যান্য সূরায় বিষয়গতভাবে পৃথক নয়, কিন্তু একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তা আলোচিত হয়— এগুলো দ্বারাও সেই বিশেষ সূরাটিকে চেনা যায়। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার কারণে ওসব আয়াতের তাৎপর্যও বিশেষ ধরনের হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সূরার আকার আকৃতিও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। ফলে তার কোনো দিক বিস্তৃত ও কোনো দিক সংকুচিত হয়ে যায়। এভাবে সূরায় 'শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য' আসার কারণে পাঠকের কাছে সূরাকে নতুন মনে হয়। 'শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য' পরিভাষাটা প্রয়োগ করছি এজন্যে যে, এটা কোরআনের বাচনভংগিতে মোজেযা বা অলৌকিক রূপবৈচিত্র্যের স্ফুরণ ঘটায়।

মনে হয়, এ সূরার নাম সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে অধিকতর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। হযরত ইবরাহীম, যিনি নবীদের পিতা, পরম কল্যাণের প্রতীক, পরম কৃতজ্ঞ, আল্লাহর অনুগত, অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণ, তাঁর নামে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আর যেসব পেক্ষাপট এই গুণাবলীর উপস্থিতির দিক থেকে বাঞ্ছিতও। সেগুলোও সূরার সামগ্রিক পরিবেশের অংগীভূত। এতে আলোচিত তথ্যসমূহ এবং বাচনভংগিও সূরার সার্বিক পরিবেশনার আওতাভুক্ত।

সূরাটায় একাধিক ইসলামী আকীদা বিশ্বাস আলোচিত হয়েছে। তবে এগুলোর মধ্য থেকে দুটো প্রধান বিষয় সূরার সমগ্র আলোচনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিষয় দুটো সূরার মধ্যে আলোচিত হযরত ইবরাহীমের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ। বিষয় দুটো হলো, সকল যুগের নবী ও রসূলদের সমমতাবলম্বী হওয়া, তথা তাদের সকলের দাওয়াতের ঐক্য এবং স্থান কাল নির্বিশেষে আল্লাহর দ্বীনকে প্রত্যাখ্যানকারী জাহেলিয়াতের বিরোধিতায় তাঁদের সকলের ঐক্যবদ্ধতা, মানুষের ওপর আল্লাহর অজস্র নেয়ামত দান ও শোকরের মাধ্যমে তার বৃদ্ধি এবং অধিকাংশ মানুষ কর্তৃক নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা। এই দুটো প্রধান বিষয় বা শিক্ষা ছাড়াও আরো অনেক বিষয় এ সূরায় আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এই দুটো বিষয় অন্য সমস্ত বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করেছে। সূরার ভূমিকায় এই বিষয়টার দিকেই আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আল্লাহর রসূল ও রসূলকে প্রদত্ত কেতাবের ভূমিকা তথা উদ্দেশ্য লক্ষ্য বর্ণনার মধ্য দিয়েই সূরার সূচনা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমে মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসা। (আয়াত ১)

এই একই বক্তব্য দিয়ে অর্থাৎ তাওহীদতত্ত্ব সংক্রান্ত বক্তব্য দিয়েই সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে। (সর্বশেষ আয়াত)

www.pathagar.com

আর এরই মাঝে স্মরণ করানো হয়েছে যে, মূসা (আ.)-কেও মোহাম্মদ (স.)-এর মতো একই ওহী ও কেতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছিলো,

'আমি মূসাকে আমার আয়াতগুলো দিয়ে পাঠিয়েছিলাম .... ।' (আয়াত ৫)

আরো স্মরণ করানো হয়েছে যে, সকল রসূলেরই কাজ ছিলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা।

'আমি প্রত্যেক রসূলকেই পাঠিয়েছি তাঁর জাতির ভাষায়, যাতে সে তাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে ...... ।' (আয়াত ৪)

রসূলের কাজ, তার পাশাপাশি চরিত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনাও এ সূরার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত রসূল যে মানুষ, সেই বাস্তবতাই তার কাজ নির্ধারণ করে। তিনি প্রচারক, ভীতি প্রদর্শক, উপদেশদাতা ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী বটে, কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তিনি কোনো অলৌকিক কিছু ঘটাতে পারেন না। তিনি বা তার জাতি যখন চান তখন নয়, স্বয়ং আল্লাহ যখন চান তখনই তিনি অলৌকিক কিছু দেখাতে পারেন। অনুরূপভাবে রসূল তাঁর জাতিকে সুপথে চালিত করবেন না বিপথে চালিত করবেন, সেটাও তাঁর আয়ত্তাধীন থাকে না। আল্লাহর বানানো যে প্রাকৃতিক নিয়ম আল্লাহর অবাধ ইচ্ছা অনুযায়ী চলে, মানুষের সুপথ ও কুপথে চালিত হওয়া সে নিয়মের সাথেই যুক্ত।

সকল জাতি নিজ নিজ জাহেলী যুগে অর্থাৎ তাদের কাছে নবী আসার আগে যুগে এই বিষয়েই আপত্তি তুলতো যে, মানুষ কেন রসূল হয়ে আসে। ১০ নং আয়াতে তাদের এই আপত্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর জবাবে নবী রসূলরা যে জবাব দিতেন, তাও উদ্ধৃত হয়েছে। (আয়াত ১১

সূরায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার কাজটা শুধুমাত্র 'আল্লাহর ইচ্ছাতেই' সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক রসূল তাঁর জাতির কাছে দ্বীনের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেন। তারপর 'আল্লাহই যাকে চান হেদায়াত করেন, যাকে চান গোমরাহ করেন।'

এ সব বিবরণ দ্বারা রসূলের প্রকৃত পরিচয় স্বচ্ছভাবে ফুটে ওঠে। আর এই পরিচয় দ্বারাই জানা যায় রসূলের কাজ কী। নবীদের মানবীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর কোনো কিছুর সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এভাবে আল্লাহর একত্ব থেকে যায় সব রকমের সাদৃশ্য থেকে মুক্ত, নির্ভেজাল ও খালেস।

অনুরূপভাবে সূরায় এই সত্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রসূলদের সাথে ও তাঁর প্রতি সত্যিকারভাবে ঈমান আনয়নকারী মোমেনদের সাথে করা ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত করেন। পৃথিবীতে আল্লাহর সাহায্য ও খেলাফাতের দায়িত্ব দানের মাধ্যমে এবং আখেরাতে আল্লাহর অবাধ্যদের আযাব ও মোমেনদের সুখশান্তি প্রদানের মাধ্যমে এই ওয়াদা বাস্তবায়িত করা হয়। সূরায় এই মহাসত্যটি রসূল ও তার জাতির মধ্যে সংঘটিত-সংঘাতের চূড়ান্ত পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়। (আয়াত ১৩, ১৪ ও ১৫)

www.pathagar.com

কেয়ামতের দৃশ্যাগুলোর বিবরণ সম্বলিত ২৩ নং এবং ৪৯ ও ৫০ নং আয়াতে এ মহাসত্য তুলে ধরা হয়েছে। অনুরূপভাবে ১৮, ২৪, ২৫ ও ২৬ নং আয়াতেও উদাহরণের মাধ্যমে এটি তুলে ধরা হয়েছে।

পক্ষান্তরে যে দুটি বিষয় সমগ্র সূরায় প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে এবং যা পরম অনুগত, মহা কৃতজ্ঞ ও নবীদের সুমহান পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীমের সাথে সুসমন্বিত, সেই বিষয় দুটোর প্রথমটা হলো, সকল রসূলের মতের ঐক্য, দাওয়াতের ঐক্য এবং জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান। আর দ্বিতীয়টা হলো, সকল মানুষের ওপর আল্লাহর সাধারণ অনুগ্রহ এবং আল্লাহর প্রিয় মানুষদের ওপর বিশেষ অনুগ্রহ। এই দুটো বিষয় আমরা আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করবো।

প্রথম বিষয়টাকে সূরায় অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবে ও চমকপ্রদ ভংগিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী কোনো কোনো সূরায় এ বিষয়টা পৃথক পৃথকভাবে এক একজন নবীর দাওয়াতের ঐক্যের আকারে তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেক রসূল তার জাতির কাছে নিজের বক্তব্য দেন এবং আপন কর্তব্য সমাধা করেন। তারপর আরো একজন রসূল এবং তারপর আরো একজন রসূল আসেন। প্রত্যেকে একই বক্তব্য দেন, জাতির কাছ থেকে একই জবাব পান, তাতে প্রত্যাখ্যানকারীরা অন্যদের মত পার্থিব শাস্তি পায়, আবার কোনো কোনো জাতি পৃথিবীতে কিছু সময় পায়, কেউ বা কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ পায়, কিন্তু শুরু থেকে প্রত্যেক রসূলকে চলন্ত ক্যাসেটের ন্যায় দেখতে পাওয়া যায়। এর নিকটতম উদাহরণ হচ্ছে সূরা আল আরাফ ও সূরা হূদ।

পক্ষান্তরে সূরা ইবরাহীম সকল নবীকে এক কাতারে এবং জাহেলিয়াতের অনুসারীদের আর এক কাতারে রেখে আলোচনা করেছে। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত ঘটে, অতপর তা এখানেই শেষ হয়ে যায় না; বরং কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আমরা দেখতে পাই যে, স্থান কালের ব্যবধান সত্ত্বেও নবীদের অনুসারীরা ও জাহেলিয়াতের অনুসারীরা যেন একই ময়দানে সমবেত। স্থান ও কাল দুটো অস্থায়ী ও নশ্বর জিনিস। মহাবিশ্বে সবচেয়ে বড় সত্য হলো ঈমান ও কুফরী এবং তা স্থান কালের চেয়ে বড় দর্শনীয়। এ বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে ৯ থেকে ১৭ নং আয়াতে।

এখানে হযরত নূহ থেকে শুরু করে সকল প্রজন্ম ও সকল নবী একত্রিত হন, স্থান ও কালের ব্যবধান ঘুচে যায় এবং সবচেয়ে বড় সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়। সেটি এই যে, নবী ও রসূলরা সবাই একই বাণী বহন করে এনেছেন, তাদের কাছে অজ্ঞ লোকেরা সব সময় একই আপত্তি তুলে ধরে, মোমেনদের আল্লাহ সাহায্য করেন। সৎ লোকদের তিনি পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন এবং অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করেন, স্বৈরাচারী বলদর্পীদের ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনা এবং তাদের আযাব ভোগ করা অবধারিত। এখানে রসূল (স.)-এর সাথে সূরার ১ নং আয়াতে উদ্ধৃত উক্তি এবং হযরত মূসার সাথে আল্লাহর ৫ নং আয়াতে উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে একটা অপূর্ব সাদৃশ্য দেখা যায়।

www.pathagar.com

ঈমান ও কুফরীর মধ্যকার সংঘাত দুনিয়াতেই শেষ হয় না; বরং আখেরাত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যেমন ২১ থেকে ২৩ নং আয়াত। ৪২ ও ৪৩ নং আয়াত এবং ৪৬ থেকে ৫০ নং আয়াতে এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। এই সমস্ত আয়াত ইংগিত দিচ্ছে যে, ঈমান ও কুফরীর মধ্যকার সংঘাত একই সংঘাত, যা দুনিয়া থেকে শুরু হয় ও আখেরাতে গিয়ে শেষ হয়। এর একটা অপরটার পরে আসে।

অনুরূপভাবে যে সকল উদাহরণ দুনিয়াতে শুরু হয় ও আখেরাতে শেষ হয়, তা উভয় পক্ষের মধ্যকার সংঘাতের আলামতগুলো ও তার ফলাফল পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করে। কালেমায়ে তাইয়েবা তথা উত্তম বাক্য উত্তম বৃক্ষের মতো। আর এই উত্তম বৃক্ষ হলো নবুয়তের বৃক্ষ, ঈমানের বৃক্ষ ও কল্যাণের বৃক্ষ। পক্ষান্তরে খারাপ কথা হলো খারাপ গাছের মতো। আর খারাপ গাছ জাহেলিয়াতের গাছ, বাতিলের গাছ, মিথ্যা অন্যায় ও আগ্রাসনের গাছ।

দ্বিতীয় সত্যটা হলো আল্লাহর নেয়ামত, তার শোকর ও নাশোকরী সংক্রান্ত। এটাও সমগ্র সূরার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে এবং সূরার সর্বত্র এর ছাপ ও রেশ ছড়িয়ে রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানব জাতিকে দুনিয়ার জীবনে যে নেয়ামতসমূহ দিয়েছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। মানুষ মোমেন হোক বা কাফের হোক, সৎ হোক বা অসৎ, পাপী হোক বা পুণ্যবান অনুগত হোক বা অবাধ্য– সবার জন্যেই আল্লাহ অসংখ্য নেয়ামত বরাদ্দ করেছেন। এটা আল্লাহর বিরাট দয়া, করুণা ও উদারতা যে, তাঁর মোমেন, পুণ্যবান ও অনুগত বান্দাদের ন্যায় কাফের ফাসেক এবং অবাধ্য লোকদেরও পৃথিবীতে বহু নেয়ামত বিতরণ করেছেন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই সমস্ত নেয়ামতকে তিনি আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল ও সুপ্রশস্ত প্রান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং মহাবিশ্বের বিভিন্ন দৃশ্যের অভ্যন্তরেও বিস্তৃত করেছেন। এসব নেয়ামতের বিবরণ ৩২, ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াতে রয়েছে। এ ছাড়া সূরার প্রথম আয়াতে মানুষের হেদায়াতের জন্যে রসূল ও কেতাব প্রেরণকেও একটি নেয়ামত হিসেবে তুলে ধরেছেন, যা অন্যান্য বস্তুগত নেয়ামতের সমান অথবা তার চেয়ে বড়। বস্তুত নূর বা আলো মহাবিশ্বে আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। এখানে নূর বলতে সেই বৃহত্তর আলো বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা মানব সত্ত্বা বিশেষত তার হৃদয় মন ও অন্তর্নিহিত সত্ত্বা আলোকিত হয়। আর এটাই ছিলো হযরত মূসা ও অন্য সকল নবীর কাজ।

নবীরা যে মানুষকে তাদের গুনাহ মাফ করানোর জন্যে ডাকেন, এটাও নূরের মতোই একটা নেয়ামত।

নেয়ামত সংক্রান্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটেই হযরত মূসা তার জাতিকে তাদের নেয়ামতগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। (৬ নং আয়াত) এই পটভূমিতে আল্লাহ রসূলদের কাছে প্রদত্ত নিজের সেই ওয়াদার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন, যা ১৩ ও ১৪ নং আয়াতে তাদের ভবিষ্যত বিজয় ও সাফল্যের আভাস দেয়।

এটাও আল্লাহর এক বিরাট ও বিশাল নেয়ামত।

www.pathagar.com

শোকর দ্বারা নেয়ামত বৃদ্ধির তথ্যও বর্ণিত হয়েছে ৭ নং আয়াতে। সেই সাথে ৮ নং আয়াতে জানানো হয়েছে যে, মানুষ শোকর না করলেও আল্লাহর কিছু আসে যায় না এবং তিনি তাদের শোকরের মুখাপেক্ষী নন। আরো বলা হয়েছে যে, মানুষের সাধারণত আল্লাহর নেয়ামতের যেমন শোকর করা উচিত তেমন করে না। (আয়াত ৩৪ দেখুন।)

কিন্তু যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং তার ফলে তাদের হৃদয়ের চোখ খুলে যায়। তারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে ও আল্লাহর নেয়ামতের শোকর করে। এগুলোতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দার জন্যে শিক্ষা রয়েছে।

এ ধৈর্য ও শোকরের সর্বোত্তম উদাহরণ হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। আল্লাহর পবিত্র কাবা ঘরের সামনে বসে তিনি বিনীতভাবে যে দোয়া করছিলেন তা এ সবর ও শোকরের শ্রেষ্ঠ নমুনা। ৩৫ থেকে ৪১ নং আয়াতগুলো লক্ষ্য করুন।

আর যেহেতু আল্লাহর নেয়ামত, নেয়ামতের শোকর ও না-শোকরীর বিবরণ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়, তাই এর বিভিন্ন ছোটখাট বক্তব্যও এই সার্বিক পটভূমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন,

'তাদের বিভিন্ন ফলমূল দান করো। হয়তো তারা শোকর করবে।'

'এগুলোতে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।'

'যারা আল্লাহর নেয়ামতকে অকৃতজ্ঞতার রূপ দিয়েছে তাদের কি দেখনি?'

'তোমাদের ওপর আল্লাহর যে নেয়ামত এসেছিলো তা স্মরণ করো।'

'সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি বার্ধক্যে আমাকে দিয়েছেন ইসমাঈল ও ইসহাক।'

নবীদের মানুষ হওয়ার ওপর কাফেরদের আপত্তির জবাবে নবীরা বলেছেন,

'কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের যাকে চান অনুগৃহীত করেন।'

সুতরাং সূরার সামগ্রিক পটভূমি হলো নিয়মিত শোকর ও না-শোকরী। আর উপরোক্ত জবাব এই পটভূমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূরাটা সামগ্রিকভাবে দু'টো পর্বে বিভক্ত।

প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে রসূল ও রেসালাতের তাৎপর্য, রসূলের অনুসারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে দুনিয়া আখেরাতের দ্বন্দ্ব এবং পবিত্র কালেমা ও অপবিত্র কলেমার উদাহরণ। আর দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে মানুষের ওপর আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামত, যারা আল্লাহর নেয়ামতের না-শোকরী ও অহংকার করেছে তাদের পরিণাম, যারা ঈমান এনেছে ও শোকর করেছে তাদের পুরস্কার, তাদের প্রথম ও প্রধান নমুনা হযরত ইবরাহীম, যালেম ও অকৃতজ্ঞদের ওপর কেয়ামতের দিন কঠোর শাস্তি এবং এভাবে সূরার সমাপ্তি।

'এ হচ্ছে মানব জাতির উপকারার্থে প্রচার যাতে তাদের সতর্ক করা হয়, যাতে তারা জেনে নেয় যে, আল্লাহই একমাত্র প্রভু এবং যাতে বুদ্ধিমান লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করে।'

www.pathagar.com

সূরা আল হেজর

এ সূরার প্রথম মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, কাফের ও মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে অপেক্ষমান ভয়ানক পরিণতির বিস্তারিত বিবরণ। এই মূল বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রয়েছে আনুষংগিক বিভিন্ন বিষয়ে কিছু আলোচনা, যা না-ফরমানদের ভয়াবহ কঠিন পরিণতির চিত্রটি আরো শানিত করে তাদের বিবেককে আঘাত করতে পারে। এ জীবন শেষে চিরস্থায়ী আর এক জীবনের দিকে তাদেরকে যেতে হবে, যেখানে অতীত জীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, কেয়ামতের সেই ভয়ানক দিনে তাদের সকল কাজ কর্মের চুল চেরা হিসাব নেয়া হবে এবং সেই বিচার অনুযায়ী কাউকে শাস্তি দেয়া হবে এবং কাউকে পুরস্কৃত করা হবে, এসব বিষয়ের বিশদ বিবরণ এখানে পেশ করা হয়েছে। সৃষ্টির দৃশ্যসমূহ ও কেয়ামতের সেই বিভীষিকার চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে এ আলোচনার মধ্যে।

ইতিমধ্যে সূরায়ে রা'দের আলোচনায় তার প্রেক্ষাপটের সাথে যেমন করে সূরায়ে আনয়ামের মিল দেখা গেছে, তেমনি করে সূরায়ে হেজরের প্রেক্ষাপটের সাথে সূরায়ে আ'রাফের প্রেক্ষাপটও খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়। সূরাটির আলোচনা শুরু হয়েছে কেয়ামত এর ভীতি প্রদর্শন করে সে ব্যাপারে সতর্ক করার মাধ্যমে, আর এটা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে সামান্য কিছু শাব্দিক রদবদল থাকলেও সতর্কীকরণই হচ্ছে মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

সূরায়ে আ'রাফের শুরুতে ভীতিপ্রদর্শন সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন, 'এ হচ্ছে তোমার কাছে অবতীর্ণ এক গ্রন্থ, সুতরাং এর দ্বারা ভীতিপ্রদর্শন করার ব্যাপারে তোমার অন্তরে কোনো দ্বিধা সংকোচ যেন না আসে, আর এ কেতাব মোমেনদের জন্যে এক অতি মূল্যবান উপদেশ।' আর চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আমি, আল্লাহ তায়ালা কতো দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি অতপর আযাব এসেছে রাতের বেলায় অথবা দুপুরের খাবার খেয়ে যখন তারা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন থেকেছে– তখন। তারপর এ সূরাতে আদম (আ.) ও ইবলিসের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। এমনি করে প্রসংগক্রমে আরো অনেক বিষয়ের ওপর আলোচনা এসেছে। অবশেষে জানানো হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে যাবে এবং সবাইকে তাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে এবং সেখানে তারা সতর্কীকরণের বাস্তবতাকে তারা প্রত্যক্ষ করবে.... বর্তমানের আলোচনায় সৃষ্টিজগতের কিছু দৃশ্যের বর্ণনা স্থান পেয়েছে, যেমন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী, রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র, তাঁর নির্দেশে পরিচালিত তারকারাজি, বাতাস-মেঘ-পানি ও নানাবিধ ফলমূল.... আরো আমরা এখানে দেখতে পাবো–নূহ, হূদ, সালেহ, লূত শোয়ায়ব ও মূসা (আ.)-এর ঘটনা। আলোচ্য সূরার কাহিনী সত্যিই মহান সতর্ককারী নবী মোহাম্মদ (স.)-এর সত্যতার পক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানেও সূরায়ে হেজরের শুরুতে একইভাবে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু এমন ভাষা ও ভংগীতে কথাগুলো পেশ করা হয়েছে যে পাঠকের হৃদয় অজানা এক ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, যার কারণে– 'কাফেররা অনেক সময় মনে করে, হায় যদি তারা

www.pathagar.com

মোসলমান হয়ে যেতে পারতো। (কিন্তু পার্থিব স্বার্থ প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা মুসলমান হতে পারে না।) তাই ছেড়ে দাও তাদেরকে, তারা ভোগবিলাসের মেতে থাকুক, সুখ সম্পদের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিক এবং তাদের আশা আকাংখা তাদেরকে কর্তব্যচ্যুত করে রাখুক, শীঘ্রই তারা তাদের পরিণতি জানতে পারবে, আর আমি, যে সব এলাকাকে ধ্বংস করেছি, তা তাৎক্ষণিক কোনো ঘটনা ছিলো না বরং তার সিদ্ধান্ত পূর্বেই জানা এক গ্রন্থের মধ্যে লিখিত ছিলো। ওই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোনো জাতির ধ্বংস নেমে আসবে না বা ওই সময়ের পরেও ধ্বংস আসবে না'।.... তারপর এখানে প্রসংগক্রমে সৃষ্টিলোকের কিছু দৃশ্য পেশ করা হচ্ছে, এই যে সুউচ্চ আকাশ এবং এর মধ্যে অবস্থিত কেল্লাসম সুরক্ষিত স্তরসমূহ, সুবিস্তৃত পৃথিবী এবং এর গভীরে প্রোথিত পাহাড়-পর্বত, পরিপূর্ণ ভারসাম্যের সাথে উৎপাদিত বৃক্ষ-তরুলতা গুল্ম, পানি ভর্তি ভারী বাতাস, যা জমাট বেঁধে মেঘ সৃষ্টি হয় এবং পানি আকারে নেমে আসে, এর দ্বারা সিঞ্চিত হয় শুকনা মৃতপ্রায় যমীন এবং এর মধ্যে মৃতপ্রায় প্রাণ বৃষ্টির ফল্গুধারায়, পুনরায় ফিরে পায় নতুন জীবন, আবার সব কিছুর পরিসমাপ্তিতে আসবে মৃত্যু ও পুনরুত্থান.... এসব কিছু আদম ও ইবলিসের করুণ কাহিনীর সূত্র ধরে একের পর এক এসেছে বলে জানা যায়। পরিশেষে আসছে আদম (আ.)-এর অনুসারী মোমেনদের পরিণতি.... এসব ঘটনার মধ্যে বিশেষভাবে নযরে পড়ে ইবরাহীম, লূত শোয়ায়েব ও সালেহ (আ.)-এর ঘটনা এবং তাদের কঠিন পরিণতি সম্পর্কেও জানা যায় যারা এ মহান নবীদেরকে শুধু অস্বীকারই করেনি, বরং তাদেরকে মিথ্যাবাদীও বানিয়েছিলো।

যাই হোক, সূরা দুটির মূল আলোচ্য বিষয় এক ও অভিন্ন। এতদসত্ত্বেও সূরা দুটির মধ্যে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অবস্থার মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তবে, ওই সব অবস্থার মধ্যে পারস্পরিক কিছু মিল থাকলেও একটি আর একটির মতো পুরোপুরি এক নয়। মহাগ্রন্থ আল কোরআনের নিয়ম অনুযায়ী এসব অবস্থাকে বিভিন্ন কায়দায় ও বিভিন্ন চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে, যার ফলে এগুলোর মধ্যে একাধারে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়টি সুসামঞ্জস্য রূপে দেখা যায়। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোনো একটি বিষয়কে যে বারবার বলা হচ্ছে তাও নয় এবং একটা যে আর একটার সাথে পুরোপুরি মিল খাচ্ছে তাও নয়।

সূরাটিকে চার অথবা পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। এসব অধ্যায়ের প্রত্যেকটিতে এক একটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রেসালাত, এর ওপর ঈমান এবং ঈমানকে অস্বীকার করার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহর যে অমোঘ নিয়ম সে সম্পর্কে যার মধ্যে কোনো দিন কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ আলোচনার শুরুতে এমন ভাষা ও ভংগীতে সতর্ক করা হয়েছে যা শোনার সাথে সাথে মনের ওপর এক অভূতপূর্ব আতংক ছেয়ে যায়। দেখুন, প্রথম আয়াতটির দিকে, অনেক সময় কাফেররা চায়, হায় যদি তারা মুসলমান হয়ে যেতে পারতো (তাহলে ওই ভয়াবহ আযাব থেকে তারা বেঁচে যেতো, তবে পার্থিব স্বার্থ অথবা সাময়িক সামাজিক মান মর্যাদা তাদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখছিলো অতএব), তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা পরম

www.pathagar.com

পরিতৃপ্তির সাথে (দুনিয়ার জীবনে) সর্বপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য খাবার খেয়ে দেখে নিক এবং প্রাণ ভরে ভোগ করে নিক দুনিয়ার মাল মাত্তা, আর তাদের আশা আকাংখা তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালন করা থেকে গাফেল করে রাখুক, শীঘ্রই তারা (তাদের পরিণতি) জানতে পারবে।' অর্থাৎ, এ কথার সমাপ্তি টানা হয়েছে এই বলে যে মিথ্যা আরোপকারীরা অন্য কোনো কারণে নয়, শুধু হিংসা ও বিদ্বেষের কারণেই সত্যকে অস্বীকার করে, ঈমান আনালে ক্ষতি হবে মনে করে নয়, তাই বলা হচ্ছে,

'আর আমি, আল্লাহ তায়ালা, যদি তাদের সামনে আকাশ থেকে নেমে আসা কোনো দরজা খুলে দিতাম এবং সেই দরজা দিয়ে তারা ওপরের দিকে উঠে যেতে থাকতো, তবুও বলতো না, না, আমরা ওপরে উঠে যাচ্ছি, প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়– বরং আমাদেরকে নযরবন্দী করে ফেলা হয়েছে অথবা আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে বলেই আমরা এ রকম দেখছি।'.... আর ওদের সবাই এই একই মনোভাব রাখে, তারা নবীকে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না ও ঈমান আনবে না,

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায়, সৃষ্টির কিছু নিদর্শনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে, এখানে আকাশ, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানের কিছু দৃশ্যের দিকে তাকাতে বলা হয়েছে, এসব কিছু তো মহা বিজ্ঞানময় বিধাতা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, সুনিপুণ এক কৌশলে পয়দা করেছেন, আর সব কিছুকে এক নির্দিষ্ট পরিমাপ মতোই সৃষ্টি করেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'যা কিছু রয়েছে (এ বিশাল সৃষ্টির বুকে) তার মূল ভান্ডার রয়েছে আমার কাছে, আর আমি সব কিছুকে এক নির্দিষ্ট পরিমাপ মতো পাঠাই।'

আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে সকল কিছুর প্রত্যাবর্তনস্থল এবং প্রত্যেকেই দুনিয়ায় বেঁচে আছে এক নির্দিষ্ট ও সুপরিচিত ও সুবিদিত (পূর্ব নির্ধারিত) সময় পর্যন্ত। এরশাদ হচ্ছে,

'আর আমি আল্লাহ তায়ালা, জীবন দেই, মৃত্যু দেই এবং সবশেষে আমিই হবো সবকিছুর মালিক, আর অবশ্যই আমি জানি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং জানি পরবর্তীদেরকেও আর নিশ্চয়ই তোমার মালিক ওদের সবাইকে একত্রিত করবেন নিশ্চয়ই তিনি মহা বিজ্ঞানময় মহা জ্ঞানবান।'

তৃতীয় অধ্যায়ে মানব জাতির ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তাদেরকে সত্যের মূল উৎস সম্পর্কে, তাদের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানানো হয়েছে। আরো জানানো হয়েছে সত্যের উৎস মূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া মানুষ এবং অনুসারীদের পরিণতির কথা। এ আলোচনায় জানানো হয়েছে যে, আদম (আ.)-কে তৈরী করা হয়েছিলো পচা মাটিকে শুকিয়ে শক্ত ঠনঠনে বানানোর পর সেই মাটি দিয়ে, তারপর সেই কঠিন মাটির মধ্যে আল্লাহর তৈরী আত্মাগুলোর একটিকে ফুঁক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এরপর দেখানো হয়েছে ইবলিস কিভাবে তাকে ধোঁকা দিলো, নিজ অহংকারী হওয়ার কারণে কেমন করে পথভ্রষ্টদেরকে পরিচালনা করে তার পথে, নিয়ে গেলো কিন্তু পারলো না আল্লাহর মোখলেস বান্দাদের সাথে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে অতীত জাতির সত্যবিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে, বিশেষ করে লূত, শোয়ায়ব ও সালেহ (আ.)-এর জাতিরা যে অহংকার প্রদর্শন করেছিলো তার পরিণতিতে তাদের যে দুরাবস্থা হয়েছিলো সে সম্পর্কে। এসব বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা কথাটি দিয়ে শুরু করেছেন। 'আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও যে আমিই মাফ-করনেওয়ালা মেহেরবান এবং আমার আযাবও বড়ো বেদনাদায়ক।' তারপর দেখুন বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা এগিয়ে চলেছে, যার মধ্য দিয়ে ইবরাহীম ও লূত (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর রহমতের কথা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে, পাশাপাশি প্রকাশ পেয়েছে লূত, শোয়ায়ব ও সালেহ (আ.)-এর জাতির প্রতি আল্লাহর গযবের কথাও।

পঞ্চম ও শেষ অধ্যায়ের বর্ণনায় প্রকাশিত হয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব লুকিয়ে থাকার কথা। এরই মধ্যে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ইংগীতও পাওয়া যায়, তারপর একথাও জানা যায় যে, যে কোনো ভালো কাজের প্রতিদান এবং মন্দ কাজের শাস্তিও অবশ্যম্ভাবী, রসূল (স.)-এর দাওয়াতেও একথাগুলো ছিলো মূখ্য। আর সকল সৃষ্টির শুরু ও শেষের মধ্যে এটাই হচ্ছে সকল সত্যের বড় সত্য।

সূরা আন নাহল

এ সূরাটার সূর, তাল ও লয় শান্ত ও স্বাভাবিক। তবে এর আলোচিত বিষয়বস্তু অনেক ও রকমারি। এর প্রেক্ষাপট ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত। এর ঝংকার প্রভাবশালী ও বহু সংখ্যক এবং এর ভেতরে উৎসারিত প্রেরণা ও অত্যন্ত গভীর।

রসূল (স.)-এর মক্কী জীবনে নাযিল হওয়া অন্যান্য সূরার মতো এ সূরাটাও আল্লাহর গুণ বৈশিষ্ট্য, ওহী ও পরকাল-এই তিনটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। তবে এই প্রধান বিষয় কয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু আনুষংগিক বিষয়ও আলোচ্য সূচীর আওতাভুক্ত। যেমন এতে ইবরাহীম (আ.). ও মোহাম্মদ (স.)-এর আনীত আল্লাহর বিধানের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনাকারী তাওহীদ এবং ঈমান, কুফুরী, হেদায়াত ও গোমরাহী সংক্রান্ত মানবীয় ইচ্ছা ও আল্লাহর ফয়সালার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে আলোচিত হয়েছে রসূলের দায়িত্ব, রসূলকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি, হালালকে হারাম করা, হারামকে হালাল করা ও এ বিষয়ে পৌত্তলিকদের ধ্যান ধারণা, আল্লাহর পথে হিজরত, মুসলমানদেরকে নির্যাতনের মাধ্যমে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করা, ঈমানের পর পুনরায় কুফুরী করা আল্লাহর কাছে এ সবের জন্যে নির্ধারিত শাস্তি, পারস্পরিক লেনদেন, ন্যায়-বিচার, পরোপকার, আল্লাহর পথে দান এবং ওয়াদা পালন ইত্যাদিও, যা ওই প্রধান আকীদাভিত্তিক আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। মোটকথা বহু সংখ্যক আলোচ্য বিষয়ে সুরাটা পরিপূর্ণ।

কিন্তু যে পটভূমিতে এ বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে এবং যে ময়দানে এ ঘটনাগুলো ঘটেছে, তা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত। এই পটভূমি ও ময়দানের অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

রয়েছে আকাশ ও পৃথিবী, আকাশ থেকে নামা বৃষ্টি, ক্রমবর্ধনশীল বৃক্ষ, রাত দিন, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র, সাগর, পাহাড় পর্বত, নদ নদী ও রাস্তাঘাট। এক কথায় বলা যায়, গোটা মানব জীবন, তার ঘটনাবলী ও পরিণাম, গোটা পরকালীন জীবন, তার মূল্যবোধ ও দৃশ্যতার এবং সমগ্র অদৃশ্য জগত, তার বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য, মানব সত্ত্বা ও প্রকৃতির ওপর তার সুগভীর প্রভাব– এ সবকিছু নিয়ে এ সূরার আলোচনা ও পটভূমি গঠিত।

এ বিস্তীর্ণ ময়দানে এসে সূরাটা তার বক্তব্য পেশ করে। এ বক্তব্য যেন পথনির্দেশ দান, মনমগযকে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিবেক বুদ্ধিকে অনুপ্রেরণা জোগানোর একটা বিরাট উদ্যোগ ও অভিযান। এ অভিযান খুবই শান্ত ও ধীর লয়ে পরিচালিত। তবে সেখানেও বৈচিত্র্য রয়েছে। রয়েছে একাধিক সুরের ব্যঞ্জনা। তাতে যদিও বজ্রের তুর্যনিনাদ নেই কিংবা সংগীতের মিহি সুর নেই, কিন্তু তা তার সমস্ত মৃদুমন্দতা সত্তেও মানব সত্ত্বার প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী ও প্রতিটি প্রত্যংগকে সম্বোধন করে এবং তার বিবেক-বুদ্ধি ও ভাবাবেগকে একই সাথে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করে। সে তার চোখকে দেখতে, কানকে শুনতে, স্নায়ুকে অনুভূতিশীল হতে, আবেগকে সচেতন হতে এবং বিবেক বুদ্ধিকে চিন্তা গবেষণা করতে বলে। সে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিকে তথা আকাশ ও পৃথিবীকে, সূর্য ও চন্দ্রকে, রাত ও দিনকে, পাহাড় ও সাগরকে, নদ নদী ও উপত্যকাকে, ছায়া ও আশ্রয়স্থলকে, উদ্ভিদ ও ফলমূলকে এবং পশু ও পাখীকে একই সমতলে সমবেত করে। একই সমতলে সমবেত করে দুনিয়া ও আখেরাতকে এবং দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছুকে। এ সবই মানুষের অংগ প্রত্যংগে, স্নায়ুতন্ত্রীতে এবং হৃদয় ও বিবেকে অপ্রতিরোধ্য প্রভাব সৃষ্টির হাতিয়ার। একমাত্র নিষ্ক্রীয় বিবেক, মৃত হৃদয় ও বিকৃত চেতনা ছাড়া আর কোনো কিছুই এ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না।

এই সূরা মানুষকে একদিকে যেমন প্রকৃতিতে বিরাজমান আল্লাহর নিদর্শন ও মানুষকে দেয়া আল্লাহর নেয়ামতগুলোর প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করে, তেমনি কেয়ামতের দৃশ্য, মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার দৃশ্য এবং অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর ধ্বংসযজ্ঞের চিত্রও তার সামনে তুলে ধরে। সেই সাথে মানুষের সেই সব ভাবাবেগকেও জাগিয়ে তোলে, যা মানব হৃদয়ের সুপ্ত চিন্তা চেতনার সন্ধান দেয়। সন্ধান দেয় মাতৃগর্ভে থাকাকালে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে, বার্ধক্যে, দুর্বল ও শক্তিমান অবস্থায়, স্বচ্ছল ও দারিদ্র অবস্থায় মানুষ কিভাবে জীবন ধারণ করে, তারও। অনুরূপভাবে উদাহরণা ও সহজ সরল ঘটনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যাও পেশ করে।

সূরার সবচেয়ে গভীর তাৎপর্যময় অংশ হলো প্রকৃতি সংক্রান্ত আয়াতগুলো যা সৃষ্টির মাহাত্ম্য, সম্পদের বিশালতা এবং জ্ঞান ও কুশলতার বিরাটত্বকে ফুটিয়ে তোলে। এগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পরস্পরের সাথে যুক্ত। এই বিশাল ও বিস্ময়কর সৃষ্টি জগত, যা মহান স্রষ্টার সীমাহীন জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এমনভাবে সৃজিত ও পরিচালিত, যাতে তা মানুষের সুখ শান্তির উপকরণ হয় এবং তাদের শুধু অপরিহার্য প্রয়োজনই পূরণ করে না, বরং তাদের বিভিন্ন শখও পূরণ করে। একদিকে তা প্রয়োজনও পূরণ করে, অপরদিকে তাকে সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ

www.pathagar.com

হিসাবেও গ্রহণ করা হয়, তা দ্বারা দেহ ও মনের আনন্দ ও পরিতৃপ্তিও সাধিত হয়। মানুষ যাতে আল্লাহর কৃতজ্ঞ হয়, সে জন্যেই এতো সব নেয়ামতের ব্যবস্থা।

এ কারণেই এ সূরায় নেয়ামত ও তার শোকরের বিষয় আলোচিত হয়েছে, এ সবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এ সব বিষয়ে সূরার বিভিন্ন অংশে মন্তব্য করা হয়েছে, বিভিন্ন উদাহরণ এবং বিভিন্ন নমুনাও পেশ করা হয়েছে। নেয়ামতের শোকর আদায়ের শ্রেষ্ঠতম নমুনা পেশ করেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। বলা হয়েছে, তিনি (হযরত ইবরাহীম) আল্লাহর নেয়ামতের শোকর গোযার ছিলেন। তাই আল্লাহ তায়ালা তাকে নির্বাচন করেছিলেন এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলেন।

এ সব আলোচনাই সম্পন্ন হয়েছে পরিপূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে। সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলোচিত দৃশ্য, বক্তব্যসমূহ ও আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে।

প্রথমে সূরার প্রথম এ অধ্যায়টার আলোচ্য বিষয় হলো তাওহীদ। এ তাওহীদের মাধ্যম হলো সৃষ্টি জগতে বিরাজিত আল্লাহর নিদর্শন, আল্লাহর নেয়ামতসমূহ, গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ এবং দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে তাঁর সর্বাত্মক জ্ঞান।

সূরা বনী ইসরাঈল

এ সূরাটা মক্কী। সূরাটা আল্লাহর তাসবীহ দিয়ে শুরু ও হাম্দ দিয়ে শেষ হয়েছে। এতে একাধিক বিষয় আলোচিত হয়েছে, যার অধিকাংশই আকীদা সংক্রান্ত। কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের বিধি ও নিয়ম আলোচিত হয়েছে, যা ওই আকীদা থেকেই উৎসারিত। বনী ইসরাঈলের কিছু ইতিহাসও আলোচিত হয়েছে, যা মাসজিদুল আকসার সাথে সংশ্লিষ্ট। এই মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত রসূল (স.)-এর 'ইসরা' তথা নৈশভ্রমণ সংঘটিত হয়েছিলো যা মেরাজের একটা অংশ। সেই সাথে এ সূরায় হযরত আদম ও ইবলীসের কাহিনীর একাংশ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে সম্মানিত করার বিষয়টাও আলোচিত হয়েছে।

তবে সূরার প্রধান ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্ব, তাঁর সাথে কোরায়শদের আচরণ, তাঁর আনীত কোরআনের বৈশিষ্ট্য কোরআন মানুষকে কোন্ পথে চালিত করে এবং আরববাসী তার প্রতি কী প্রতিক্রিয়া দেখায়–তা আনুষংগিকভাবে আরো আলোচিত হয়েছে রসূল ও রেসালাতের প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়-এমন ধরনের অলৌকিক ঘটনা, মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতের বৈশিষ্ট্য, এর ফলে প্রকাশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত রেসালাতকে অস্বীকার করলে যে সর্বব্যাপী অনিবার্য ধ্বংসের কবলে পড়তে হয় তা থেকে মোহাম্মদ (স.)-এর সমকালীন ও পরবর্তী লোকদের অব্যাহতি লাভ। আকীদা বিশ্বাসের পর্যায়ে সুপথপ্রাপ্তি বা পথভ্রষ্টতার পরিণামের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকা এবং সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে সঠিক ও ভ্রান্ত পথ অনুসরণের কুফল সামাজিক পর্যায়ে বিস্তৃত হওয়া সংক্রান্ত আল্লাহর নীতি সংক্রান্ত কথাবার্তা। এ সবের আগে আল্লাহ তায়ালা মানুষের কাছে রসূল পাঠানোর মাধ্যমে সুসংবাদ, সতর্কবাণী ও বিস্তারিত জীবন বিধান দিয়ে তাদের

www.pathagar.com

প্রয়োজন এমনভাবে পূর্ণ করেছেন যে, তারা আর কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে না পারে।

সূরায় একাধিকবার আল্লাহকে যাবতীয় অলীক ও অসংগত ধারণা থেকে পবিত্র ঘোষণা, তাঁর গুণকীর্তন ও তাঁর নেয়ামতের শোকর আদায় করা হয়েছে। শুরুতেই বলা হয়েছে,

'পবিত্র সেই সত্ত্বা, যিনি তাঁর বান্দাকে এক রাত্রে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায় ভ্রমণ করিয়েছেন।'

অন্যত্র বনী ইসরাঈলকে এক আল্লাহর এবাদাত করার নির্দেশ দেয়ার পাশাপাশি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে আযাব থেকে মুক্তি লাভকরা মোমেনদেরই বংশধর।

'আর নূহ তো ছিলো একজন কৃতজ্ঞ বান্দা।'

মোশরেকরা তাদের দেব-দেবী সম্পর্কে যে সব গালভরা দাবি উচ্চারণ করতো, তার উল্লেখ প্রসংগে মন্তব্য করা হয়েছে,

'তারা যেসব কথা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং অনেক উর্দ্ধে, তাঁর জন্যে সাত আকাশ তাসবীহ পড়ে ....।'

কোরআন পাঠ শুনে কিছু সংখ্যক আহলে কেতাবের উচ্চারিত বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

'আর তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।' সূরার শেষ আয়াতেও আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে।

'আর তুমি বলো, আল্লাহর জন্যেই যাবতীয় প্রশংসা ....'

যে প্রধান আলোচ্য বিষয়ের কথা আমরা বলে এসেছি, তাকে ঘিরে আলোচিত অন্যান্য বিষয়গুলোই এই সূরায় পর্যায়ক্রমে স্থান পেয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে এই আয়াত দ্বারা। 'পবিত্র সেই সত্ত্বা, যিনি তার বান্দাকে এক রাত্রে ভ্রমণ করিয়েছেন' সেই সাথে এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, 'যাতে আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাই।' মাসজিদুল আকসা প্রসংগে মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত কিতাব ও ওই কিতাবে বনী ইসরাঈলের দু'বার ধ্বংসযজ্ঞ ও দেশ ত্যাগের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে তাদেরই অবাধ্যতা ও অপরাধের কারণে তৃতীয় ও চতুর্থবার সতর্ক করা সত্তেও। 'আর যদি তোমরা পুনরায় নিষিদ্ধ কাজ করো, তাহলে আমিও পুনরায় তোমাদেরকে শাস্তি দেবো।' এরপর বলা হয়েছে যে, 'শেষ কিতাব কোরআন সবচেয়ে স্থীতিশীল ব্যবস্থার দিকে নির্দেশ করে।' অথচ মানুষ দ্রুততা প্রবণ ও আবেগ প্রবণ হওয়ার কারণে নিজের ঝোঁক ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। সেই সাথে বলা হয়েছে যে, হেদায়াত ও গোমরাহীর কৃতিত্ব ও দায়-দায়িত্ব ব্যক্তির নিজস্ব এবং সামাজিক আচরণের দায় দায়িত্ব সমাজের ওপর অর্পিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে তাওহীদের নীতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে। সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক আচার ব্যবহারকে সে তাওহীদের ওপরই প্রতিষ্ঠিত করতে চায়

www.pathagar.com

এবং এগুলোকে এই মূলনীতির সাথে সমন্বিত করে- যে মূলনীতি ছাড়া জীবন গড়ে উঠতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে জাহেলী ও পৌত্তলিক সমাজে প্রচলিত ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে, যা আল্লাহর সাথে শরীক করা ও ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করার উদ্ভট ও অলীক খেয়ালের সাথে সম্পৃক্ত। এই অধ্যায়ে আরো আলোচনা করা হয়েছে আখেরাতের কথা এবং আরবদের পক্ষ থেকে তাকে একটা অসম্ভব ব্যাপার মনে করার বিষয়টি। আলোচিত হয়েছে কোরআন সম্পর্কে তাদের ধারণা ও বক্তব্য, রসূল (স.) সম্পর্কে তাদের আজে বাজে কথা এবং মোমেনদেরকে ভালোভাবে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে কী কারণে মোহাম্মদ (স.)-কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো অলৌকিক ঘটনাবলী দিয়ে পাঠানো হয়নি। এগুলোকে প্রাচীনকালের লোকেরা অস্বীকার করেছিলো এবং এর ফলে আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। অনুরূপভাবে এতে উল্লেখ করা হয়েছে মোশরেকদের পক্ষ থেকে রসূল (স.)-এর স্বপ্নের ঘটনা অস্বীকার করা এবং এ জন্যে তাদের প্রতি আল্লাহর হুশিয়ারী। এই প্রসংগে ইবলীসের ঘটনার একটা অংশ এবং তার এ ঘোষণাও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, সে অচিরেই আদমের বংশধরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। ইবলীসের ঘটনার এ অংশটা মোশরেকদের গোমরাহীর কারণ উদঘাটনের উদ্দেশ্যেই তুলে ধরা হয়েছে। এর উপসংহার টানা হয়েছে আল্লাহর আযাব থেকে মানুষকে সতর্ক করা, তাকে সম্মানিত করার আকারে যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহর অনুগত ও অবাধ্যদের জন্যে যে পরিণাম অপেক্ষা করছে তার বিবরণ দেয়ার মাধ্যমে। বলা হয়েছে, 'যে দিন আমি প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীকে তাদের নেতাসহ আহ্বান করবো, সেদিন যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তারা তাদের আমলনামা পড়বে এবং তাদের ওপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অন্ধ, সে আখেরাতেও অন্ধ ও অধিকতর বিপথগামী হবে।'

সূরার শেষ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে মোশরেকদের ষড়যন্ত্র, তাঁর ওপর যে ওহী নাযিল হয়েছে তার কিছু অংশ থেকে তাকে বিপথগামী করা এবং তাকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করার জন্যে মোশরেকদের অপচেষ্টা। বলা হয়েছে যে, তারা যদি তাকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করতো এবং তিনি আল্লাহর নির্দেশে নিজেই হিজরত না করতেন, তাহলে পূর্বেকার কাফের জাতিগুলো তাদের রসূলদেরকে হত্যা বা বহিষ্কার করার কারণে যেভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, সেভাবে তারাও ধ্বংস হয়ে যেতো। এই সাথে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি তাঁর নামায, কোরআন পাঠ, আল্লাহর কাছে নিজের প্রবেশ ও নির্গমনের জন্যে উত্তম স্থান প্রার্থনা করা এবং সত্যের আগমন ও বাতিলের বিনাশ সাধনের ঘোষণা দান অব্যাহত রাখেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা এই মর্মে মন্তব্য করছেন যে, যে কোরআনের অংশবিশেষ থেকে তারা রসূল (স.)-কে বিপথগামী করার চেষ্টা করেছিলো তাতে

www.pathagar.com

মোমেনদের জন্যে হেদায়াত ও রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা রয়েছে, অথচ মানুষ স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় তা জানে না।

এরপর কোরআনের অলৌকিকত্ব নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। মোশরেকরা চাইতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগত কোনো অলৌকিক ঘটনা। তারা চাইতো, রসূল (স.)-এর সাথে ফেরেশতা নেমে আসুক, তাঁর অসাধারণ কারুকার্য খচিত প্রাসাদ থাকুক, আংগুর ও খেজুরের এমন বাগান থাকুক, যার মাঝখান দিয়ে ঝর্ণা বা খাল প্রবাহিত হবে অথবা তিনি আকাশে আরোহন করে একখানা পুস্তক নিয়ে আসবেন, যা তারা নিজেরা পড়ে দেখবে। এ ধরনের আরো বহু প্রস্তাব তারা দিতো, যার উদ্দেশ্য ছিলো নিজেদের ধৃষ্ঠতা ও ঊদ্ধত্য প্রকাশ করা-হেদায়াত বা বুঝ লাভ করা নয়। এসব প্রস্তাবের জবাবে বলা হয়েছে যে, এসব রসূল (স.)-এর দায়িত্ব ও ক্ষমতার বহির্ভূত জিনিস এবং সম্পূর্ণরূপে তা আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। এই সাথে যারা এ সব প্রস্তাব তুলেছে, তাদের সমালোচনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহর অনুগ্রহের সমস্ত ভান্ডার তাদের হাতে থাকতো-যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই-তাহলে তারা খরচ করার ভয়ে তা আটকে রাখতো। সমগ্র সৃষ্টি জগত যে আল্লাহর গুণগান ও তাসবীহ করে এটা উপলব্ধি করাই তাদের ঈমান আনার জন্যে যথেষ্ট ছিলো, বস্তুগত মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন ছিলো না, আর তাতে কোনো লাভও হতো না। কেননা এ ধরনের মোজেযা নিয়ে হযরত মূসা (আ.) এসেছিলেন। কিন্তু তার হঠকারী জাতি তার ওপর ঈমান আনেনি। এর ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর আযাব নাযিল করেন।

কোরআন ও তার ভেতরে বিদ্যমান প্রকৃত সত্যের আলোচনার মধ্য দিয়ে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই কোরআন সত্য ও মিথ্যাকে আলাদা আলাদা করে দেখিয়ে দেয়। এই কোরআনকে রসূল (স.) প্রয়োজন অনুসারে নিজে জাতির কাছে একটু একটু করে পেশ করতে থাকবেন, যাতে তারা তা দ্বারা প্রভাবিত হয় ও কার্যকরভাবে তা গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে যারা ওহীর জ্ঞান লাভ করেছে, তাদের অনেকে এ কোরআনকে শুনে এতো প্রভাবিত হয় যে, তারা কাঁদে ও সাজদা করে। সর্বশেষে সেই আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে, যার কোনো সন্তান নেই। বিশ্ব পরিচালনায় যার কোনো শরীক নেই এবং যাকে হীনতা থেকে রক্ষা করার কোনো অভিভাবক নেই। সূরাটার সূচনায় আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসাসূচক বাক্য রয়েছে।

সূরার শুরুতে রয়েছে ইসরা ও মেরাজের যুগান্তকারী ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। ইসরা ও মেরাজ দুটোই একই রাত্রে ঘটেছিলো। মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল মাকদেসের মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত তিনি যে নৈশ ভ্রমণ করেন তাকে ইসরা বলা হয়। আর বাইতুল মাকদেস থেকে উর্ধ্ব আকাশে, সেদরাতুল মোনতাহায় এবং আমাদের অজানা ও অদৃশ্য জগতে তিনি যে ভ্রমণ করেন, তাকে বলা হয় মেরাজ। এই ঘটনা সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে এবং এ ঘটনা নিয়ে কাফের মোশরেকরা প্রচুর বিতর্কও সৃষ্টি করেছে।

www.pathagar.com

কোন্ জায়গা থেকে তিনি এই নৈশ ভ্রমণ শুরু করেন, তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। যারা বলেন, মাসজিদুল হারাম থেকে তাদেরটাই অধিক প্রচলিত মত। কেননা তিনি বলেছেন, 'আমি মাসজিদুল হারামে হাজরে আসওয়াদের কাছে কাবা শরীফের কাছে যখন ঘুমন্ত ও জাগ্রত এ দুই -এর মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম-তখন জিবরাইল বোরাক নিয়ে আমার কাছে এলেন।'

আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি তাঁর চাচাতো বোন আবু তালেব কন্যা উম্মে হানীর ঘর থেকে যাত্রা করেন। এখানে মাসজিদুল হারাম দ্বারা হারাম শরীফ বুঝানো হয়েছে, যা মাসজিদকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সমগ্র হারাম শরীফই মাসজিদ।

বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত উম্মে হানীর ঘরে এশার নামাযের পর ঘুমিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মাসজিদুল আকসায়। তারপর একই রাত্রে ফিরে আসেন এবং উম্মে হানীর কাছে পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার কাছে নবীদেরকে উপস্থিত করা হয়েছিলো এবং তাদেরকে নিয়ে আমি নামায পড়েছি। এরপর তিনি মাসজিদুল হারামের দিকে পা বাড়াতেই উম্মে হানী তার কাপড় টেনে ধরেন। রসূল (স.) বলেন, কী ব্যাপার? উম্মে হানী বলেন, তুমি তোমার জাতিকে এ ঘটনা জানালে তারা তোমাকে মিথ্যুক বলবে বলে আমার আশংকা হয়। তিনি বললেন, আমাকে তারা মিথ্যুক সাব্যস্ত করলে করুক। তবুও আমার বলতে হবে। অতপর তিনি বেরিয়ে গেলেন। আবু জাহল তার কাছে এসে বসলো। রসূল (স.) তাকে রাতের ভ্রমণের ঘটনা জানালেন। আবু জাহল কোরায়শের সবাইকে ডেকে জড়ো করলো। অতপর সে তাদের সবাইকে ঘটনাটা জানালো। এতে কেউ বা হাতে তালি দিলো, কেউ মাথায় হাত রেখে বিস্ময় ও অবিশ্বাস প্রকাশ করলো। ইতিপূর্বে রসূল (স.)-এর প্রতি যারা ঈমান এনেছে, তাদের কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করে বসলো। কিছু লোক হযরত আবু বকরের কাছে ছুটে গেলো এবং তাকে ঘটনার কথাটা জানালো। আবু বকর বললেন, এটা কি মোহাম্মদ (স.) বলেছেন? তারা বললো, হাঁ। আবু বকর (রা.) বললেন, তিনি যদি বলে থাকেন, তবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি সত্যই বলেছেন। তারা বললো, একই রাত্রে তাঁর সিরিয়া যাওয়া এবং সকাল হওয়ার আগে মক্কায় ফিরে আসার কথা তুমি বিশ্বাস করো? তিনি বললেন, হাঁ, আমি তাঁর আরো দূরের কথাও বিশ্বাস করি। তিনি আকাশের খবর জানান। তাও আমি বিশ্বাস করি।' এ কারণেই তাকে সিদ্দীক নাম দেয়া হয়। কোরায়শ গোত্রে বাইতুল মাকদেস ভ্রমণ করেছে এমন অনেকেই ছিলো। তারা রসূল (স.)-কে মাসজিদের বিবরণ দিতে বললো। তখন গায়বীভাবে মাসজিদকে তার সামনে হাযির করা হলো, তিনি তার দিকে তাকিয়ে মাসজিদের পূর্ণ বিবরণ দিলেন। তখন সবাই বললো, তাই তো, বিবরণ তো ঠিকই দিয়েছে। তারা বললো, 'হে মোহাম্মদ, আমাদের একটা কাফেলা সিরিয়ার পথে রয়েছে। তার বিবরণ দাও।'

রসূল (স.) ওই কাফেলার উটের সংখ্যা ও অবস্থা জানালেন। তিনি বললেন, কফেলাটা অমুক দিন সূর্যোদয়ের সময় আসবে এবং তার সর্বাগ্রে থাকবে একটা সবুজ

www.pathagar.com

উট। নির্দিষ্ট দিনটাতে লোকেরা মক্কার প্রবেশদ্বারের দিকে ছুটে গেলো কাফেলার অগ্রভাগ দেখার জন্যে। যথার্থই একটা কাফেলা দেখা গেলো। জনৈক দর্শক বললো, আল্লাহর কসম, এখন সূর্য উঠছে। আর একজন বললো, হাঁ, আল্লাহর কসম, ওই তো কাফেলা এসেছে, ওর অগ্রভাগে সবুজ উটও রয়েছে, ঠিক যেমনটি মোহাম্মদ বলেছে। কিন্তু এরপরও তারা ঈমান আনলো না।.... একই রাতে রসূল (স.) বাইতুল মাকদেস থেকে উর্ধ আকাশে আরোহণ করেন।

রসূল (স.)-এর এই নৈশ সফর বা 'ইসরা' তার জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিলো না স্বপ্নে-এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'আল্লাহর কসম, রসূলের দেহ বিছানা থেকে অদৃশ্য হয়নি, কেবল তার আত্মা সফরে গিয়েছিলো।' হযরত হাসান (রা.) বলেছেন, 'তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন, দেখেছিলেন।' অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, দেহ ও আত্মা-উভয়ই এই সফরে গিয়েছিলো এবং রসূল (স.)-এর ফিরে আসা পর্যন্ত তাঁর বিছানাও গরম ছিলো।

এ সংক্রান্ত সব কটা হাদীসের সমন্বয়ে যে দৃশ্যটা ভেসে ওঠে তা হচ্ছে, রসূল (স.) উম্মে হানীর বাড়ীতে শুয়েছিলেন, সেখান থেকে মাসজিদুল হারামে যান, কাবা শরীফের কাছে হাজরে আসওয়াদে অবস্থানকালে তিনি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হন, ঠিক তখনই তাকে ইসরা ও মেরাজের সফরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তিনি তার বিছানা ঠান্ডা হওয়ার আগেই ফিরে আসেন।'

রসূল (স.)-এর জীবনে এই ঘটনা যে ঘটেছিলো, তা সুনিশ্চিত। তবে এর ধরন ও প্রকৃতি নিয়ে আগেও বিতর্ক ছিলো, আজও আছে। আমি সেই বিতর্কে না গিয়েও বলতে পারি যে, ইসরা ও মেরাজের ঘটনা সশরীরেই ঘটুক বা শুধু আত্মা সহকারেই ঘটুক এবং এটা স্বপ্নেই ঘটুক বা জাগ্রত অবস্থায়ই ঘটুক, উভয়ের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। মূলত ঘটনার প্রকৃতি এই যে, এর মাধ্যমে রসূল (স.)-কে বহু দূরবর্তী জগত ও দূরবর্তী স্থানগুলোকে এক নিমিষেই দেখানো হয়েছে। এটা স্বপ্নেই ঘটুক বা জাগ্রত অবস্থায় ঘটুক, কিংবা সশরীরে ঘটুক বা শুধু আত্মা সহকারে ঘটুক-কিছুই এসে যায় না। যারা আল্লাহর শক্তি ও নবুওতের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত, তারা এ ঘটনায় অবাক হবার মতো কিছু দেখতে পাবেন না। যে সমস্ত কাজ মানুষ নিজের দৃষ্টিতে তার নিজের ক্ষমতা ও কল্পনাশক্তি অনুসারে এবং তার নিজস্ব অভ্যাস ও দৃষ্টিভংগীর বিচারে কঠিন বা সহজ মনে করে, আল্লাহর শক্তির সামনে তা সবই সমান। মানুষ নিজ ভুবনে যা কিছু দেখতে অভ্যস্ত, সেই অনুসারে আল্লাহর ক্ষমতাবলে সম্পাদিত বিষয়গুলোর মূল্যায়ন করা তার পক্ষে বেমানান। তাছাড়া নবুওতের প্রকৃতিও সাধারণ মানবীয় দৃষ্টিতে বিচার করার মতো বিষয় নয় নবুওতের প্রকৃতিই হলো উর্ধ্ব জগতের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ, যা সাধারণ মানুষের আন্দায অনুমান ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। দূরবর্তী স্থান ও দূরবর্তী জগত পরিদর্শন ও পরিচিত বা অপরিচিত কোনো বাহন দ্বারা সেখানে পৌঁছার এই কাজটা উর্ধ্ব জগতের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগের চেয়ে বেশী বিস্ময়কর কিছু নয়। হযরত আবু বকর (রা.) যথার্থই বলেছেন যে, আমি

www.pathagar.com

তো তাঁর সম্পর্কে এর চেয়েও দূরের ব্যাপার বিশ্বাস করি। তিনি সুদূর আকাশ থেকে যে খবর এনে দেন তাও বিশ্বাস করি, বায়তুল মাকদেস তো পৃথিবীরই আওতাভুক্ত। রসূল (স.) কর্তৃক কাফেলার নির্ভুল বিবরণ দেয়ার মাধ্যমে এই ঘটনার সত্যতা মোশরেকদের কাংখিত বস্তুগত প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পর যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো এই ঘটনা অতিমাত্রায় বিস্ময়কর বিধায় লোকেরা বিশ্বাস করবে না-এই মর্মে উম্মে হানী ভীতি প্রদর্শন করা সত্তেও রসূল (স.) তাতে কর্ণপাত করেননি। কেননা রসূল (স.) যে সত্য বহন করে এনেছেন এবং যে সত্য ঘটনা তাঁর ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে, তাতে তাঁর বিশ্বাস এতো দৃঢ় ছিলো যে, সে সম্পর্কে জনগণের মতামত কী হবে, তা ভেবে দেখেননি, বরং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। এ ঘটনা শুনে কোনো কোনো মুসলমান মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো এবং অনেকে এটাকে ব্যংগ-বিদ্রূপের ও সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছেন, সে কথা সত্য। কিন্তু তাই বলে তিনি এটা প্রচার না করে চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। যারা ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের কাজে নিয়োজিত, তাদের জন্যে এ ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তাদেরও কর্তব্য সত্যকে নির্ভয়ে ও নিসংকোচে প্রচার করে যাওয়া এবং কে কি ভাববে, কে খুশী বা নাখোশ হবে তার কোনো তোয়াক্কা না করা।

আরো লক্ষণীয় যে, জনগণ প্রকাশ্য ও বস্তুগত অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটানোর জন্যে অনেক পিড়াপিড়ি করা সত্তেও এবং অন্তত রসূলের বাইতুল মাকদাস সফরের সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও রসূল (স.) এ ঘটনাকে নিজের রেসালাতের সত্যতা প্রমাণের জন্যে একটা অলৌকিক ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করেননি। কারণ ইসলামের দাওয়াত অলৌকিক ঘটনাবলীর ওপর নির্ভরশীল থাকতে পারে না। এটা শুধু ইসলামী জীবন বিধানের স্বভাবানুগতা ও সুস্থ বিবেকের কাছে তার স্বতস্ফূর্ত গ্রহণযোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং রসূল (স.) এই ঘটনাটা প্রকাশ করার জন্যে যেরূপ আপোষহীন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেটা এ জন্যে নয় যে, তিনি তার রেসালাতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্যে এর ওপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল ছিলেন, বরং এর প্রকৃত কারণ ছিলো এই যে, তিনি সত্যকে অকাট্যভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন।

সূরা আল কাহ্ফ

কিসসা কাহিনীই হচ্ছে এই সূরার প্রধান উপাদান। এর শুরুতেই রয়েছে 'আসহাবুল কাহাফের' ঘটনা। এরপর দুটো বাগিচার কিসসা। তারপর ইবলীস ও হযরত আদমের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, মাঝখানে হযরত মূসা (আ.) ও আল্লাহর জনৈক সৎ বান্দার ঘটনা এবং সবার শেষে যুল কারনায়নের ঘটনা। এই সূরার অধিকাংশ ঘটনাগুলোই বিস্তৃত। সূরার মোট একশো দশ আয়াতের মধ্য থেকে ৭১ আয়াত জুড়েই রয়েছে এসব কাহিনী। বাদ-বাকী আয়াতগুলোরও বেশীর ভাগ এসব কাহিনীসংক্রান্ত মন্তব্যে পরিপূর্ণ। এই কিসসা কাহিনীর পাশাপাশি কেয়ামতের কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, আরো রয়েছে জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ কিছু দৃশ্য।

www.pathagar.com

তবে সূরার যে কেন্দ্রীয় বিষয়টির সাথে তার আলোচ্য বিষয়গুলো সম্পৃক্ত এবং তার গোটা আলোচনা যে বিষয়টির ওপর কেন্দ্রীভূত, তা হলো মানুষের আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা ও দৃষ্টিভংগির সংশোধন এবং এই আকীদা বিশ্বাসের নিরীখে মূল্যবোধগুলোর সংশোধন। আকীদা বিশ্বাসের সংশোধনমূলক বক্তব্য সূরার শুরুতেও রয়েছে, শেষেও রয়েছে। শুরুতে রয়েছে, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি তার বান্দার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন ...।' (আয়াত ১-৫) আবার সূরার শেষে রয়েছে, 'বলো, আমি তোমাদের মতোই মানুষ, আমার কাছে ওহী আসে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ।........'

এভাবে আল্লাহর একত্ব প্রমাণে, শেরেক বাতিল করণে, ওহীর সত্যতা প্রতিষ্ঠায় এবং আল্লাহর অবিনশ্বর সত্ত্বা ও তাবত সৃষ্টির নশ্বর সত্ত্বার মধ্যে চূড়ান্ত বৈপরীত্য প্রমাণে এ সূরার প্রথম ও শেষ আয়াতগুলোর সমতান অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন। সূরার একাধিক জায়গায় এ বিষয়টা বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। 'আসহাবুল কাহফের' ঘটনায় আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী যুবকদের এ বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে, 'আমাদের প্রভু হচ্ছেন আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু। আমরা কখনো তাকে ছাড়া অন্য কোনো সত্ত্বাকে মাবুদ মানবো না। তখন যা বলেছি, ভুল বলেছি।'

এরপর এই কিসসার উপসংহারে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের আর কোনো অভিভাবক নেই। তার শাসনে আর কারো অংশীদার হবার অধিকার নেই।'

দুটো বাগিচা সংক্রান্ত ঘটনায় ঈমানদার ব্যক্তিটি তার সংগীর সাথে কথা বলার সময় বলেছিলো, 'যিনি তোমাকে প্রথমে মাটি থেকে এবং পরে এক ফোঁটা পঁচা পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর একজন পূর্ণাংগ ব্যক্তিতে পরিণত করেছেন। তাঁকে তুমি অস্বীকার করলে?'

আর এই ঘটনার উপসংহারে মন্তব্য করা হয়েছে, ... অভিভাবকত্ব একমাত্র আল্লাহর–যিনি পরম সত্য। তিনি উত্তম প্রতিদান দাতা ও উত্তম শাস্তিদাতা।'

কেয়ামতের একটা দৃশ্য তুলে ধরে এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'যেদিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমার সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক বানিয়েছিলে, তাদেরকে ডাকো। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা ডাক শুনবে না, আর আমি তাদের মাঝে রেখে দেবো একটা ধ্বংসকূপ।'

অন্য একটা দৃশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'তবে কি কাফেররা ভেবেছে যে, আমাকে বাদ দিয়ে তারা আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক মেনে নেবে? আমি জাহান্নামকে কাফেরদের আপ্যায়নের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি।'

এরপর আসে চিন্তা পদ্ধতি ও দৃষ্টিভংগি সংশোধনের প্রসংগ। এ বিষয়টা মোশরেকদের প্রমাণহীন ও অজ্ঞতাপ্রসূত বক্তব্য প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে এবং অজানা বিষয় আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করার নির্দেশ দানের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন সূরার শুরুতে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

'এবং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করবে, যারা বলেছে যে, আল্লাহ তায়ালা একজন পুত্র গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদেরও কোনো জ্ঞান নেই, তাদের বাপদাদারও নেই।'

আর গুহাবাসী (আসহাবুল কাহফ) তরুণরা বলেছে, 'এই হচ্ছে আমাদের স্বজাতির অবস্থা। তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্যকে উপাস্য মেনে নিয়েছে। সেই উপাস্যদের পক্ষে ওরা কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসে না কেন?' তারা নিজেদের অবস্থানকাল নিয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় এ সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে। 'তারা বললো, তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন তোমরা কতোদিন অবস্থান করেছ।'

ঘটনার বিবরণ দান প্রসংগে এক জায়গায় যারা তাদের সংখ্যা বিষয়ে অনুমান নির্ভর কথা বলে, তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, 'কেউ কেউ বলবে, তারা ছিলো তিন জন, তাদের চতুর্থটা তাদের কুকুর। কেউ কেউ বলবে, তারা ছিলো পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটা তাদের কুকুর.... (আয়াত ২২) আর আল্লাহর সৎ বান্দার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনায় রয়েছে যে, তার যে সব কার্যকলাপে মূসা (আ.) অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, তার আসল রহস্য উদঘাটন করে বললেন, 'তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ এটা করা হয়েছে। আমি এগুলো নিজ উদ্যোগে করিনি।' (আয়াত ৮২) এখানেও বিষয়টাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আকীদা বিশ্বাসের আলোকে মূল্যবোধের পরিশুদ্ধির বিষয়টাও বিভিন্ন আয়াতে আলোচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ঈমান ও সৎকাজকে। এছাড়া অন্য যেসব জড়বাদী মূল্যবোধ রয়েছে, তাকে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে যতো ভোগবিলাসের সামগ্রী রয়েছে তা নিছক পরীক্ষার জন্যে। সেগুলোর শেষ পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়, 'আমি পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল জিনিসকে পৃথিবীর সৌন্দর্যবর্ধক বানিয়েছি, যেন পরীক্ষা করতে পারি মানবজাতির মধ্যে কে অধিকতর সৎ কর্মশীল তারপর মৃত্তিকায় পরিণত করবো।' (আয়াত ৭-৮)

এই পর্যায়ে আরো বলা হয়েছে যে, মানুষ যতো কঠিন ও সংকীর্ণ পর্বতগুহায় আশ্রয় নিক না কেন, আল্লাহর আশ্রয়টাই অধিকতর প্রশস্ত। গুহাবাসী মোমেন যুবকরা তাদের স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে বলেছিলো, 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যেসব উপাস্যকে ওরা পূজা করে তাদের যখন তোমরা ত্যাগ করেছো, তখন চলো, পর্বতগুহায় আশ্রয় নাও। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর রহম করবেন এবং তোমাদের কাজকে ফলপ্রসূ করবেন।' (আয়াত ১৬)

রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যেন তিনি মোমেনদের সাথে ধৈর্য সহকারে অবস্থান করেন এবং দুনিয়া-পুজারীদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেন। (আয়াত ২৮-২৯)

www.pathagar.com

দুটো বাগান সংক্রান্ত ঘটনায় দেখানো হয়েছে, কিভাবে একজন মোমেন অর্থসম্পদ ছাড়াই কেবল ঈমানী সম্পদ দ্বারা সম্মানিত হয়ে থাকে, কিভাবে সে দর্পিত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির মোকাবেলা করে এবং আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার জন্যে তাকে ভর্ৎসনা করে। (আয়াত ৩৭-৪১)

পার্থিব জীবন এবং তার সমৃদ্ধির পর ত্বরিত ধ্বংস প্রাপ্তির উদাহরণ দিয়ে এই কেসসার ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। (আয়াত ৪৫) অনুরূপভাবে ধ্বংসশীল মূল্যবোধ ও চিরঞ্জীব মূল্যবোধের বিবরণও দেয়া হয়েছে এই ঘটনার উপসংহারে। (আয়াত ৪৬)

একজন সম্রাট বলে নয়, বরং একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি হিসাবে আলোচিত হয়েছেন যুল কারনায়ন। দুটো বাঁধের মাঝখানে বসবাসকারী একটা জাতি যখন তাকে ইয়াজুজ ও মাজুজের কবল থেকে তাদেরকে রক্ষার নিমিত্তে একটা বাঁধ নির্মাণের অনুরোধ জানালো এবং সেজন্যে তারা তাকে টাকা পয়সা দিতে রাযী হলো, তখন তিনি টাকা পয়সা নিতে অস্বীকার করে জানালেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে যা দিয়েছেন, তা অনেক উত্তম। (আয়াত ৯৫)

যখন বাঁধ নির্মাণ শেষ হলো, তখন ওই কাজের জন্যে নিজের মানবীয় ক্ষমতার কৃতিত্ব যাহির করলেন না, বরং এটা আল্লাহর রহমতের অবদান বলে ঘোষণা করলেন। (আয়াত ৯৮)

সূরার শেষে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তারাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহর কোনো হুকুম অগ্রাহ্য করেছে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনিবার্যতাকে অস্বীকার করেছে। বলা হয়েছে যে, এ জাতীয় লোকেরা নিজেদের অন্যান্য কাজ কর্মকে যতোই ভালো মনে করুক, আসলে তার কোনো গুরুত্ব বা মূল্য নেই। (আয়াত ১০৩-১০৫)

এভাবে আমরা দেখতে পাই, এ সূরাটার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো আকীদাবিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগির সংশোধন এবং আকীদাবিশ্বাসের আলোকে মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণার পরিশুদ্ধি।

কয়েকটা অধ্যায়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে এই সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।

সূরাটা শুরুই হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা, যিনি মোমেনদেরকে সুসংবাদ দান এবং আল্লাহর পুত্র আছে-এই মিথ্যা উক্তিকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। এরপরই শুরু হয়েছে আসহাবুল কাহাফের ঘটনার বিবরণ। এ কেসসা আসলে পার্থিব সম্পদের ওপর ঈমানকে অগ্রাধিকার দানের এবং ঈমান বাঁচানোর জন্যে গুহায় আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর রহমত কামনারও দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়টা শুরু হয়েছে রসুল (স.)-কে ধৈর্য সহকারে মোমেনদের সাথে অবস্থান করার আদেশ দানের মধ্য দিয়ে। এরপর এসেছে দুই বাগানের মালিকদের ঘটনা, এ ঘটনার মাধ্যমে আসল ও চিরস্থায়ী মূল্যবোধ সংক্রান্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সূরার এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে কেয়ামত সংক্রান্ত কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। তবে এর মাঝখানে রয়েছে আদম ও ইবলীসের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শেষে এসেছে

www.pathagar.com

যালেমদেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে আল্লাহর অনুসৃত নীতির বর্ণনা। সেখানে এ কথাও জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা পাপীদের ওপরও যথেষ্ট দয়ালু এবং তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়টা পুরোপুরিই ব্যয়িত হয়েছে হযরত মূসা (আ.) ও জনৈক সৎ বান্দার ঘটনা বর্ণনায়। পঞ্চম অধ্যায় যুল কারনাইনের কিসসার বিবরণ দানে। উপসংহারে আলোচিত হয়েছে সূরার সূচনা পর্বের বিষয়গুলো। যথা মোমেনদেরকে সুসংবাদ দান, কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন, ওহীর সত্যতা প্রমাণ এবং আল্লাহকে শেরেক থেকে পবিত্র ঘোষণা।

সূরা মারইয়াম

অধিকাংশ মক্কী সূরার ন্যায় এই সূরাটিতেও তাওহীদ, পুনরুত্থান এবং লা-শরীফ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে।

আলোচ্য সূরার প্রধান উপাদান হচ্ছে অতীতের ঘটনাবলীর বিবরণ। এতে গোড়ার দিকে যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, মারইয়াম, ঈসা এবং ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে ইসহাক, ইয়াকুব, মূসা, হারুন, ইসমাঈল, ইদ্রিস এবং আদম ও নূহ (আ.) প্রমূখ নবী রসূলদের আংশিক আলোচনাও এসেছে। সূরার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জুড়েই এসব ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে। এর মাধ্যমে যে বিষয়গুলো প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে তা হলো, আল্লাহর একত্ববাদ, পুনরুত্থান, আল্লাহ তায়ালা সন্তানহীন ও শরীকহীন, সত্য পথের অনুসারীদের জীবনাদর্শ এবং সর্বোপরি ভ্রান্ত পথের অনুসারীদের জীবনাদর্শের স্বরূপ।

এর পর আলোচনায় স্থান পেয়েছে কেয়ামতের কিছু চিত্র এবং পরকালে অবিশ্বাসী লোকদের সাথে কিছু তর্ক বিতর্ক।

শেরককে বর্জন করা, আল্লাহর সন্তান হওয়া দাবীকে অস্বীকার করা, ইহকালে ও পরকালে কাফের মোশরেকদের করুণ পরিণতির বিষয়টি উপস্থাপন করা, এসব কিছুই এসেছে সূরায় মূল বিষয়টির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। ফলে এসব আলোচনা সূরার মুল প্রতিপাদ্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

সূরায় প্রাসঙ্গিক আলোচনায় একটা তীব্র আবেগ ও অনুভূতির উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই আবেগ অনুভূতি মানব হৃদয়ে যেমন পরিলক্ষিত, তেমনি পরিলক্ষিত হচ্ছে পারিপার্শ্বিক জগতে। এই সে বিশাল জগত যা আমাদের কাছে এক অনুভূতিহীন জড় পদার্থ বলে মনে হয়, সেই জগতই আলোচ্য সূরার বর্ণনায় একটা অনুভূতিশীল ও সংবেদনশীল জীবন্ত অস্তিত্ব রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে আমরা আকাশকে চরম ক্রোধে বিদীর্ণ হতে দেখতে পাই, প্রচন্ড আক্রোশে পাহাড়কে দিখন্ডিত হতে দেখতে পাই। অর্থাৎ জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় এসব জড় পদার্থও যে প্রভাবিত হয় তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। (এই আশংকার কারণ হচ্ছে এটাই) যে, এরা দয়াময় আল্লাহর জন্যে .... হিসেবে উপস্থিত হবে না। (আয়াত ৯০-৯২)

www.pathagar.com

অপরদিকে মানবীয় আবেগ অনুভূতির বিষয়টির বর্ণনা এসেছে সূরার গোড়ার দিকে এবং শেষের দিকে। সূরায় বর্ণিত মূল ঘটনা জুড়ে রয়েছে এসব আবেগ অনুভূতির আলোচনা, বিশেষ করে মারইয়াম (আ.) এবং ঈসা (আ.)-এর জন্ম সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মানবীয় আবেগ অনুভূতির আধিক্য ও প্রাধান্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

সূরার অন্তর্নিহিত ভাব ও ভঙ্গির মাঝে দয়া, করুণা, সন্তুষ্টি ও আল্লাহর সাথে বান্দার গভীর যোগসূত্রের চিত্রটি সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে। সূরার গোড়ার দিকেই যাকারিয়া (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণার প্রসঙ্গ এসেছে। অপরদিকে যাকারিয়া (আ.) স্বীয় প্রভু ও মালিকের সাথে যে একাকী ও নিভৃতে নিজের মনের বাসনা ও আরযিটুকু সকাতর ভাষায় তুলে ধরছেন– সে প্রসংগও এসেছে। সূরার একাধিক স্থানে 'রহমত' শব্দ বা এর সমার্থক শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। সাথে সাথে 'পরম করুণাময়' শব্দের অধিক ব্যবহারও এখানে লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, পরকালে মোমেনরা যে সব নেয়ামত ভোগ করবেন সেগুলোকে 'ভালোবাসা' রূপে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

অপরদিকে ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছে সেটাকে 'স্নেহ বা মমতা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তদ্রুপ ঈসা (আ.)-কে যে মাতৃভক্তি ও মাতৃ প্রীতির গুণ দান করা হয়েছে সেটাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'নম্রতা' ও 'কোমলতা' বলে।

মোটকথা, প্রতিটি শব্দে ও প্রতিটি বাক্যের পরতে পরতে আপনি দয়া, মায়া ও মমতার কোমল স্পর্শ অনুভব করবেন। অপরদিকে যেখানে 'শেরক' এর প্রসংগ এসেছে সেখানে আপনি গোটা সৃষ্টি জগতের মাঝে এক প্রচন্ড দ্রোহ ও ক্ষোভ অনুভব করবেন। মনে হবে যেন আকাশ পাতাল ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে। কারণ, একমাত্র আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা মহাপাপ। এই পাপের কথা শুনে আকাশ পাতাল ও প্রচন্ড ক্ষোভে ফেটে পড়তে উপক্রম হয়।

বর্ণনাভংগির মাঝেও এক বিচিত্র ছন্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। এখানে রয়েছে ছোট ছোট ও ছন্দময় বাক্য। প্রতিটি বাক্যের সমাপ্তি ঘটেছে একটি সুষম মাত্রা ও তালের মাধ্যমে। কোথাও লঘু আবার কোথাও গুরু। ক্ষোভ, আক্রোশ ও দ্রোহ যেখানে বর্ণিত হয়েছে সেখানে শব্দের শেষের অক্ষরটি দ্বিত্ব রূপে এসেছে। ফলে ছন্দ ও তালের মাঝে দৃঢ়তা গাম্ভীর্য ও রুক্ষতার সৃষ্টি হয়েছে যেমন, মাদ্দা, দিদ্দা, এদ্দা, হাদ্দা, এয্যা ও আয্যা ইত্যাদি। অর্থাৎ বক্তব্যের বৈচিত্র্যের সাথে তাল মিলিয়ে ছন্দ ও মাত্রার মাঝেও বৈচিত্র্য এসেছে এই সূরার প্রতিটি জায়গায়।

বিবৃতি বা কাহিনী ধর্মী বক্তব্যে ছন্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারি। পক্ষান্তরে যেখানে মন্তব্য বা বিশ্লেষণ ধর্মী বক্তব্য এসেছে সেখানে বর্ণনা ভংগি সরল ও গদ্যময়। এই ভাবে বক্তব্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্ণনা ভংগির মাঝেও পরিবর্তন এসেছে সূরার একাধিক স্থানে।

www.pathagar.com

আলোচ্য সূরার বিষয়বস্তু তিনটি পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এসেছে যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, মারিয়াম ও ঈসা (আ.)-এর ঘটনা। ঘটনা বর্ণনা শেষে মন্তব্যের পালা এসেছে। এখানে ঈসা (আ.)-এর জন্মকে কেন্দ্র করে ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মাঝে যে বিতর্ক চলে আসছে তার পরিসমাপ্তি ঘটানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত বক্তব্য এসেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা এসেছে। এই ঘটনার বর্ণনায় তার পিতাসাথে ও তার সম্প্রদায়ের সাথে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাবলীর প্রসংগ এসেছে। শেরকবাদী সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে সৎ ও ন্যায় পরায়ন সন্তান-সন্ততির আকারে যে নেয়ামত দান করা হয়েছে তারও বর্ণনা এসেছে। এর পর নবী রসূলদের প্রসংগ এসেছে। সঠিক পথের অনুসারীদের শুভ পরিণতির বক্তব্যও এসেছে। সাথে সাথে ভ্রান্ত পথের অনুসারীদের অশুভ পরিণতির প্রসংগও উল্লেখিত হয়েছে। এই পর্যায়ে সব শেষে লা-শরীক আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতা, অধিকার ও আনুগত্যের বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, (কিছু সংখ্যক মূর্খ) মানুষ বলে, (একবার) আমার ....পুনরুত্থিত হবো? (আয়াত ৬৫)

তৃতীয় ও সর্বশেষ পর্যায়ে পুনরুত্থান সম্পর্কিত বিতর্কের বিষয়টি এসেছে। এ প্রসংগে কেয়ামতের কিছু খন্ড চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে শেরক ও খোদাদ্রোহীতার প্রতি গোটা সৃষ্টি জগতের প্রচন্ড ক্ষোভ ও আক্রোশের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশেষে যুগে যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত আল্লাহদ্রোহী জাতিগুলোর করুণ দৃশ্যের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে, (এই মূর্খ) লোকেরা বলে, করুণাময় আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন। (আয়াত ৮৭)

সূরা ত্বাহা

এই সূরার শুরু ও সমাপ্তি দুটোই হয়েছে রসূল (স.)-কে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। বলা হয়েছে যে, তার ওপর কোনো দুর্ভাগ্যও চাপিয়ে দেয়া হয়নি, তাঁকে কোনো শাস্তিও দেয়া হয়নি। তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে দাওয়াত দেয়া ও স্মরণ করানো, সুসংবাদদান ও ভীতি প্রদর্শন, তারপর সমগ্র মানব জাতিকে একমাত্র সেই আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি সৃষ্টিজগতের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুর ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী, যিনি অন্তর্যামী, সমগ্র সৃষ্টি যার বশীভূত এবং অবাধ্য ও অনুগত নির্বিশেষে সকল মানুষ যার কাছে ফিরে যেতে বাধ্য। রসূল (স.) এ দায়িত্ব পালন করার পরও যারা আল্লাহর অবাধ্য থাকবে এবং রসূল (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে, তাদের জন্যে তিনি দায়ী থাকবে না এবং তাদের মিথ্যা আরোপ ও অবাধ্যতার কারণে কোনো ভাগ্য বিপর্যয়ও ঘটবে না।

উক্ত সূচনা ও সমাপ্তির মাঝখানে কয়েকটা বিষয় আলোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ ও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী, তাঁর

www.pathagar.com

নবুওতলাভ থেকে শুরু করে বনী ইসরাঈলের মিসর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বাছুর পূজায় লিপ্ত হওয়া, বিশেষত আল্লাহ তায়ালা ও মূসা (আ.)-এর মাঝে কথোপকথন, মূসা ও ফেরাউনের বিতর্ক এবং মূসা ও যাদুকরদের মাঝে যাদুর প্রতিযোগিতার বিবরণ। এই কাহিনীর বিবরণের মধ্য দিয়ে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন তোমাকে আমি নিজ তত্ত্বাবধানে লালন পালন করিয়েছি এবং নিজের জন্যেই করিয়েছি। তারপর তাকে ও তার ভাইকে বলেছেন, 'তোমরা দু'জন ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের সাথেই আছি, সব কিছুই দেখছি ও শুনছি।'

এ সূরায় হযরত আদমের কাহিনীও আলোচিত হয়েছে সংক্ষেপে ও ক্ষুদ্র আকারে। সেখানে দেখানো হয়েছে একটা ভুল কাজ করেও কিভাবে হযরত আদম আল্লাহর অনুগ্রহ ও হেদায়াত লাভ করলেন। সেই সাথে এ কথাও জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা আদমের বংশধরকে সদুপদেশ দান ও ভীতি প্রদর্শনের পর হেদায়াত ও গোমরাহী– এই দুটোর যেটাই গ্রহণ করতে চাইবে, করার স্বাধীনতা দেবেন।

পুরো কাহিনীটা কেয়ামতের দৃশ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। এটা হযরত আদমের বেহেশতে থাকাকালীন কাহিনীর প্রাথমিক অংশের পরিশিষ্ট স্বরূপ। আল্লাহর অনুগত বান্দারা সে বেহেশতে প্রত্যাবর্তন করবে এবং অবাধ্যরা যাবে দোযখে। হযরত আদম যখন সেই অবাঞ্ছিত ঘটনার পর পৃথিবীতে নেমে আসেন, তখন তাকে এটা জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

এ জন্যে সূরাটা দুই অংশে বিভক্ত। রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে যে কথা সূরার শুরুতেই বলা হয়েছে সেটা রয়েছে প্রথম অংশে, সে কথাটা হলো, 'আমি তোমার কাছে এ জন্যে কোরআন নাযিল করিনি যে, 'তুমি দুর্ভোগ পোহাবে; বরং আল্লাহভীরুদের উপদেশ দেয়ার জন্যে নাযিল করেছি।' এর অব্যবহিত পরই মূসা (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যাদের তার দ্বীনের দাওয়াতের জন্যে নির্বাচিত করেন, তারা তার তত্ত্বাবধানেই থাকে। তাই তার তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় তারা দুর্ভোগ পোহায় না।

আর দ্বিতীয় অংশে কেয়ামতের দৃশ্যাবলী ও হযরত আদম (আ.)-এর কাহিনী সূরার প্রথমাংশ ও হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অবস্থান করছে। এরপর রয়েছে সূরার সমাপনী বক্তব্য, যা সূরার প্রারম্ভিক বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও সূরার পটভূমির সাথে সুসমন্বিত।

সূরার একটা বিশেষ তাৎপর্যময় প্রভাব রয়েছে। সে প্রভাব গোটা প্রেক্ষাপটক বেষ্টন করে রেখেছে। অতি উচ্চস্তরের এই প্রভাবের কাছে সকলের মনমস্তিষ্ক নতিস্বীকার করে রয়েছে। এই প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে পবিত্র তুয়া ময়দানে নিস্তব্ধ নিশীথে একাকী হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর সুদীর্ঘ একান্ত সংলাপে। কেয়ামতের মাঠেও মহান আল্লাহর অলৌকিক আবির্ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই প্রভাব। 'দয়াময় আল্লাহর সামনে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং তুমি ক্ষীণ পায়ের

www.pathagar.com

আওয়ায ছাড়া আর কিছু শুনতে পাবে না। .... সেদিন সব মুখমন্ডলই সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী আল্লাহর সামনে অবনমিত থাকবে।' (আয়াত ১০৮-১১১)

সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক আয়াতের শেষে 'আলিফ মাকসূরা' বিশিষ্ট শব্দের অবস্থানে এক সুমধুর ছন্দময় ঐকতান সৃষ্টি হয়েছে।

সূরা আল আম্বিয়া

এ সূরাটা মক্কী। অন্যান্য মক্কী সূরার মতোই এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত তথা তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত।

এই আকীদাগত বিষয়গুলো এ সূরায় প্রাকৃতিক জগতের বড়ো বড়ো নিয়ম ও উপাদানের বিবরণ দানের মাধ্যমে এবং আকীদা বিশ্বাসকে তার সাথে সংযুক্ত করণের মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে। বস্তুত আকীদা বিশ্বাস মহাবিশ্বের সৃষ্টিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা তার প্রধান প্রধান নিয়ম ও উপাদানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। এইসব নিয়ম ও উপাদান সেই মহাসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার ওপর আকাশ ও পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, যার ভিত্তিতে আকাশ ও পৃথিবী পরিচালিত। এইসব প্রাকৃতিক নিয়ম ও উপাদান এবং এই মহাবিশ্ব মোটেই উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষ্যহীন নয়, নয় তা নেহাত লীলাখেলা। যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরা দোখানে বলেছেন, 'আমি আকাশ ও পৃথিবীকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।'

এ জন্যে সূরাটা মানুষের হৃদয়, দৃষ্টি ও চিন্তাধারাকে মহাবিশ্বের কয়েকটা জোড়া জোড়া অংশ যথা আকাশ ও পৃথিবী, পাহাড় ও সমতল, দিন ও রাত এবং সূর্য ও চন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এইসব সৃষ্টিকে পরিচালনা ও শাসনকারী প্রাকৃতিক বিধানের একত্বের দিকে। এই প্রাকৃতিক বিধানের একত্ব দ্বারা যে প্রাকৃতিক জগত তথা সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতির একত্বই প্রমাণিত হয় সে বিষয়ের দিকেও তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এ কথাও উপলব্ধি করার আবেদন জানানো হয়েছে যে, মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে যেমন অন্য কেউ আল্লাহর সাথে শরীক ছিলো না, তেমনি তার মালিকানায়, আধিপত্যে ও কর্তৃত্বেও কেউ তার অংশীদার নেই। বলা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবীতে যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য প্রভুও থাকতো, তাহলে সে দুটোই ধ্বংস হয়ে যেতো।'

এরপর মানুষের বিবেককে এ কথা উপলব্ধি করার আহ্বান জানানো হয়েছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্রাণীজগত একই প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত ও শাসিত এবং সমুদয় প্রাণীর জীবন একই উৎস থেকে উৎসারিত। বলা হয়েছে, 'প্রত্যেকটি প্রাণীকে আমি পানি থেকে তৈরী করেছি।' এমনকি সমুদয় প্রাণীর জীবনের পরিসমাপ্তিও ঘটে একইভাবে, 'প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবেই' এবং মৃত্যুর পরে সবাই একই গন্তব্যের দিকে ফিরে যাবে। 'অতপর তোমরা আমার দিকেই ফিরে আসবে।'

তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত সংক্রান্ত মৌল আকীদা সেসব প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক উপাদান ও নিয়মের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে। এই আকীদাও চিরদিন এক ও অভিন্ন, যদিও যুগে যুগে বহু নবী ও রসূল দুনিয়ায় এসেছেন,

www.pathagar.com

'আমি তোমার পূর্বে যাকেই রসূল করে পাঠিয়েছি, তার কাছে এই ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাই তোমরা একমাত্র আমারই এবাদাত করো।'

রসূলরা সবাই মানুষের মধ্য থেকেই জন্ম নিক, এটাই আল্লাহর শাশ্বত ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমার পূর্বে আমি শুধু কিছু মানুষকেই রসূল হিসেবে পাঠিয়েছি।'

ইসলামী আকীদা বিশ্বাস যেমন মহাবিশ্বের বড়ো বড়ো নিয়ম কানুন ও উপাদানের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে, এই আকীদা বিশ্বাসের পার্থিব বৈশিষ্ট্যগুলোও তেমনি। তাই বিশ্ব প্রকৃতির চিরন্তন রীতি হলো, চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ্বে সত্যই বিজয়ী এবং বাতিল পরাজিত হবে। সত্য হচ্ছে মহাবিশ্বের অন্যতম স্তম্ভ এবং তার বিজয় আল্লাহর শাশ্বত নীতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বরং আমি সত্যকে বাতিলের ওপর নিক্ষেপ করি, ফলে তা বাতিলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়ে যায়।'

অনুরূপ, অত্যাচারী ও মিথ্যা আরোপকারীদের ধ্বংস এবং রসূল ও মোমেনদের মুক্তি লাভও আল্লাহর এক চিরন্তন নীতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অতপর আমি তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছি, তাদেরকে ও অন্য যাদেরকে ইচ্ছা করেছি, মুক্তি দিয়েছি এবং সীমালংঘনকারীদের ধ্বংস করেছি।'

পৃথিবীটা আল্লাহর সৎ লোকদের অধিকারভুক্ত থাকুক এটাও আল্লাহর অন্যতম নীতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎ বান্দারাই পৃথিবীর মালিক হবে।'

এ জন্যে এই সূরায় সকল রসূলের উম্মাতদেরকে একই উম্মাত গণ্য করে তাদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং সে আলোচনা সূরার বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে অবস্থান করছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) সংক্রান্ত আলোচনা কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে। কিন্তু হযরত দাউদ, সোলায়মান, নূহ, মূসা, হারুন, লূত, ইসমাঈল, ইদ্রীস, যুলকিফল, যুন্নুন, যাকারিয়া ও ইয়াহিয়া (আ.) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অত্যন্ত সংক্ষেপে।

এ আলোচনার মধ্য দিয়ে সূরার শুরুতে আলোচিত তত্ত্বসমূহকে বাস্তব ঘটনার আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেখানে যা সাধারণ নীতিমালা ও আদর্শের আকারে বিবৃত হয়েছে, পরবর্তীতে তা নবীদের জীবন ও আন্দোলনের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে বাস্তবতার রূপ নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সূরায় কেয়ামতের কিছু দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। এসব দৃশ্যের মধ্য দিয়েও সে সব তত্ত্ব ও নীতিমালা কেয়ামতের বাস্তবতার আকারে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এভাবে সূরার বিভিন্ন দৃশ্য একই লক্ষ্যের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সেই লক্ষ্য হলো মানুষের মনকে সেই মহাসত্য উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করা, যা শেষনবী (স.) এর আনীত আকীদা ও আদর্শে প্রতিফলিত হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জিত হলে মানুষ সেই মহাসত্য সম্পর্কে উদাসীন ও বিমুখ থাকতে পারবে না। এই মহাসত্য সম্পর্কে তাদের

www.pathagar.com

উদাসীনতা ও বিমুখতার বিষয়টি সূরার প্রথম তিন আয়াত জুড়ে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'মানুষের হিসেব গ্রহণের সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ তারা তা থেকে উদাসীন ও বিমুখ রয়েছে।'....... (১-৩)

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর এই সৃষ্টিজগত যেমন সত্য ও গুরুগম্ভীর বাস্তবতা, নবী ও রসূলদের আনীত বাণী ও দাওয়াতও তেমনি সত্য ও গুরুগম্ভীর বাস্তবতা। কাজেই তা ঠাট্টা ও উপহাস করে যেমন উড়িয়ে দেয়া চলে না। তেমনি তার সমর্থনে অলৌকিক ঘটনাবলী দেখতে চাওয়াও সমীচীন নয়। গোটা বিশ্ব নিখিলে বিদ্যমান আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মাবলী যখন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই সমুদয় সৃষ্টির তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, একমাত্র সর্বশক্তিমান সত্ত্বা এবং নবীর আনীত বাণী ও বার্তা সেই অসীম শক্তিধর একক স্রষ্টার কাছ থেকেই এসেছে, তখন এর প্রমাণ হিসেবে আর কোনো অলৌকিক ঘটনার দাবী সংগত নয়।

শব্দ ও সুরের দিক দিয়ে এ সূরার সার্বিক কাঠামো প্রতিবেদনমূলক এবং তার আলোচ্য বিষয় ও পূর্বাপর পটভূমির সাথে তার পূর্ণ সমন্বয় বিদ্যমান। সূরা মারইয়াম ও সূরা ত্বা-হার সাথে এ সূরার তুলনা করলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়। সে দুটো সূরার সুর অত্যন্ত উদার ও বিনীত এবং সূরা দুটোর সার্বিক পটভূমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এ সূরার সুর গম্ভীর, স্থিতিশীল এবং সূরার আলোচ্য বিষয়ও পটভূমির সাথে সংগতিশীল।

এই পার্থক্যটা তখন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন সূরা মারিয়ামে ও আলোচ্য সূরায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনীর বর্ণনাধারার তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়। সূরা মারইয়ামের হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তার পিতার মধ্যে উদার ও বিনীত কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ সূরায় যে কথোপকথন হয়েছে, তা মূর্তিভাংগা ও ইবরাহীম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপের মতো চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এভাবে উভয় জায়গাতেই সূরার বর্ণনাভংগী শাব্দিক কাঠামো, পটভূমি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

সূরা আম্বিয়ায় চারটি পর্ব বা অধ্যায় দেখা যায়ঃ প্রথম পর্বটা শুরু হয়েছে বিবেককে জোরদার আঘাত করে জাগিয়ে তোলা ও মন মগযকে প্রচন্ড ধাক্কা ও ঝাঁকুনী দিয়ে ভুলে যাওয়া আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচকিত করার মধ্য দিয়ে। এর প্রথম আয়াত হলো

'মানুষের হিসেব গ্রহণের সময় ঘনিয়ে আসছে, অথচ তারা উদাসীন ও বিমুখ.........।'

অতপর অতীতের জাতিগুলোর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দৃশ্য বর্ণনাপূর্বক আরো একটা ধাক্কা দেয়া হয়েছে, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন এবং বিভ্রান্তি ও অপরাধে নিমজ্জিত ছিলো।

'কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা যুলুম অত্যাচারে ডুবেছিলো, ...'। (আয়াত ১১-১৫)

www.pathagar.com

এরপর দাওয়াত ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে আদর্শ ও বাস্তবতার মাঝে এবং প্রাকৃতিক বিধি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আদর্শ ও বাস্তবতার মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। আরো যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে তাওহীদী আকীদা ও প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে, বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও বিধাতার একত্ব এবং সকল নবী ও রসূলের প্রচারিত আকীদা ও বিধানের অভিন্নতার মধ্যে, জীবনের আরম্ভ ও অবসান এবং উৎস ও পরিণতির অভিন্নতার মধ্যে।

দ্বিতীয় পর্বটায় রসূল (স.)-এর সাথে ব্যাংগ বিদ্রূপকারী কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, এমন অকাট্য সত্য ও গুরুতর বাস্তবতাকে উপহাস করা তোমাদের উচিত নয়। তাদের চারদিকে বিরাজমান গোটা পরিবেশ যখন সচেতন ও সচকিত হবার আহ্বান জানাচ্ছে তখন তা নিয়ে তামাশা করা এবং আযাব যখন আসন্ন, তখন আযাব পাঠানোর জন্যে তাড়াহুড়ো করা খুবই অন্যায় ও অসংগত। এখানে কেয়ামতের একটা দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। অতীতে যারা নবীদেরকে ব্যংগ বিদ্রূপ করতো, তাদের পরিণতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে এমন কেউ কোথাও নেই। মহান আল্লাহর অসীম শক্তিশালী হাত কিভাবে পৃথিবীকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছে, সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যাতে তাদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিজনিত উদাসীনতা থেকে সতর্ক ও সচেতন করা যায়।

এ পর্বের সমাপ্তি ঘটেছে রসূল (স.)-কে তাঁর আসল কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক করার মধ্য দিয়ে। যথা, 'বলো, আমি তো শুধু ওহী দ্বারা তোমাদেরকে সতর্ক করছি।' তাদের উদাসীনতার অশুভ পরিমাণ সম্পর্কে হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে এই বলে, 'বধিররা কোনো সতর্কবাণী শুনতে পায় না।' আরো বলা হয়েছে যে, তারা উদাসীন থাকতে থাকতে একদিন কেয়ামত এসে পড়বে এবং দাঁড়িপাল্লা স্থাপিত হয়ে যাবে।

তৃতীয় পর্বে রয়েছে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের পর্যালোচনা। এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে যে তায়ালা, সকল নবীর একই দাওয়াত, একই আকীদা বিশ্বাস ও একই ধর্ম ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তার সৎ বান্দাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন, তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করেন এবং কাফেরদেরকে পাকড়াও করেন।

চতুর্থ ও সর্বশেষ পর্বে আলোচিত হয়েছে আখেরাত ও কেয়ামত প্রসংগ। সূরার শেষের কথাগুলো প্রথম দিককার কথাগুলোর মতো জোরদার সতর্কীকরণমূলক।

সূরা আল মোমেনুন

আলোচ্য সূরাটি হচ্ছে সূরা 'আল মোমেনূন'। সূরাটির এই বিশেষ নামই এর মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে তার দিকে ইংগিত করছে। সূরাটি শুরু হচ্ছে মোমেনদের গুণাবলীর কথা দিয়ে। এরপরই আলোচনার গতি ফিরে যাচ্ছে মানুষের নিজেদের মধ্যে ও প্রকৃতির সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ঈমানের প্রমাণগুলো পেশ করার দিকে, তারপর সেইভাবে ঈমানের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য পেশ করা হয়েছে যেমন করে নূহ (আ.)

www.pathagar.com

থেকে নিয়ে শেষ নবী মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সকল রসূল পেশ করেছেন। আলোচ্য সূরার মধ্যে সেসব সন্দেহ সংশয় এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দেয়া হয়েছে যা ঈমানের তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে উত্থাপন করা হয়ে থাকে। অতীতে অনেক সময় রসূলরা সেসব হঠকারী ব্যক্তির অযৌক্তিক প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করা ও মোমেনদের সাহায্য করার জন্যে দোয়াও করেছেন। তারপর আলোচনার গতি ফিরে গেছে রসূলদের ইন্তেকালের পর, ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন কেউ নয়–এই প্রশ্নে মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা নানা প্রকার মতপার্থক্যের দিকে। এখান থেকে আবার প্রিয় নবী মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে মোশরেকদের আপত্তিকর মন্তব্যসমূহের দিকে আলোচনার মোড় ফিরেছে এবং সূরাটি সমাপ্ত করা হয়েছে কেয়ামতকে অস্বীকারকারী কাফেরদের শাস্তির দৃশ্যের একটি স্বার্থক চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, সে কঠিন অবস্থার দৃশ্যের বর্ণনা দ্বারা সন্দেহবাদীদের অন্তরকে চিন্তান্বিত করতে চাওয়া হয়েছে, বরং পরোক্ষভাবে তাদেরকে সে আযাব এসে পাকড়াও করবে বলে ধমক দেয়া হয়েছে। যাতে করে তারা আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতার কথা স্বীকার করে ও সময় থাকতেই শুধরে যায়।

এই হচ্ছে সূরা 'আল মোমেনূন' অথবা সূরাতুল ঈমান, যেখানে মোমেননদের সকল প্রকার গুণাবলী ও ঈমানের অকাট্য প্রমাণাদির কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং এই গুণাবলী বর্ণনা করাই সূরাটির লক্ষ্য ও মূল আলোচ্য বিষয়। সূরাটিকে প্রধানত চারটি অংশে ভাগ করে ঈমানদারদের চারটি অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, প্রথম পর্যায়ে, মোমেনদের কৃতকার্য হওয়ার জন্যে জরুরী শর্তগুলোর উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'অবশ্যই মোমেনরা কৃতকার্য হবে....... ।'

একথা ঘোষণা দেয়ার পর পরই তাদের মধ্যে যে সব গুণাবলী থাকা দরকার সেগুলোর প্রসংগে, বলা হয়েছে এসব গুণ থাকলে অবশ্যই তারা কৃতকার্য হবে। তাদের জন্যে কৃতকার্য হওয়াকে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। এ কথাগুলো বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, মানুষের নিজেদের মধ্যে এবং গোটা পরিবেশে ঈমানের এসব প্রমাণ থাকতে হবে। এরপর মানবজীবনের সূচনা তথা ভ্রূণ থেকে নিয়ে পূর্ণাংগ মানুষ সৃষ্টির যেসব পর্যায় এসেছে এসব অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে, আরো যে সব স্তর মানুষকে সাধারণভাবে অতিক্রম করতে হয় সেগুলোরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। তারপর কেয়ামত দিবসে পুনরায় মানুষ যখন যিন্দা হয়ে উঠবে সেই সময় পর্যন্ত মানুষের পর্যায়ক্রমিক অবস্থারও একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এরপর কথার গতি পরিবর্তন হয়ে এগিয়ে গেছে মানবজীবন থেকে বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত প্রমাণাদির দিকে। আকাশ সৃষ্টি, বৃষ্টির পানি বর্ষণ, ফল ফসল, বৃক্ষ ও তরুলতাদি উৎপন্ন হওয়া এবং জীবজন্তু সব কিছুকে মানুষের খেদমতে নিয়োজিত করার দিকে, আর সে সব নৌযান এবং ভারবাহী পশুগুলোর দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যা মানুষ ও পণ্য বহন করে সাগরের উত্তাল তরংগ ও মরু মরীচিকার বুক চিরে চিরে দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি জমায়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা এসেছে মানবপ্রকৃতি থেকে নিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা রহস্যরাজি ও সেই ঈমানের তাৎপর্য সম্পর্কে, যা মানবমনে মহান সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে চেতনা জাগিয়ে তোলে এবং একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই যে রসূলরা মানবতার মুক্তিদূত হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন সে সম্পর্কে বিদগ্ধ হৃদয়ে প্রতীতি জন্মায়। আল্লাহর আয়াতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, 'হে আমার জাতি, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্যে কোনো মাবুদ নেই।'

একথা যেমন নূহ (আ.) উচ্চারণ করেছিলেন, তেমনি পরবর্তীতে আগত সকল নবী রসূলরা এই একই কথার দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, যার ধারা এসে সমাপ্ত হয়েছে শেষ নবী ও রসূল মোহাম্মদ-(স.)-এ এসে। কিন্তু আফসোস কোরায়শ জাতির জন্যে, তাদের মধ্যেই লালিত-পালিত এবং তাদের পরম প্রিয়জন ও আস্থাভাজন এমন মধুর মানুষটিকে একথা বলে তারা উপেক্ষা করেছে যে, 'আরে, এতো তোমাদের মধ্যে বাস করে, এতো একজন সাধারণ মানুষ! এর কাছে কি করে আল্লাহর বার্তা আসবে! 'এ কাজের জন্যে চাইলে তো আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকেই নাযিল করতে পারতেন!' ....একইভাবে পুনরুত্থান সম্পর্কে রসূলের কথাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলতো 'এ ব্যক্তি কি তোমাদের কাছে এ ওয়াদাও করছে যে, তোমরা মরে যাবে এবং সবাই মাটিতে পরিণত হওয়ার পর আবার তোমাদের জীবিত করা হবে?' আর সকল রসূলদের একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে যে সবাই আল্লাহরই কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়েছেন এবং কামনা করেছেন যে আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের দোয়া কবুল করেন। অতপর তিনি যেন সকল প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ধ্বংস করে দেন ......আর এই পর্যায়টি সকল রসূলের প্রতি নির্দেশের সাথে শেষ হচ্ছে যে,

'হে রসূলরা খাও ....এবং আমিই তোমাদের রব, অতএব একমাত্র আমাকে ভয় করো।'

এরপর আসছে তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা রসূলদের অবর্তমানে মানুষের মধ্যে এই বিভেদ-অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে। এক আল্লাহ তায়ালাই সর্বময় শক্তি ক্ষমতার মালিক প্রশ্নে যেহেতু সবাই এক এবং এই একই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন প্রত্যেক রসূল, 'অতপর, তারা এই মৌলিক বিষয়টি...... তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ মত ও পথ নিয়ে খুশী।' (আয়াত ৫৩)

আসলে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে যে সব নেয়ামত দিয়েছেন তার শোকরগোযারী না করে তারা ভুলে গেছে যে, পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সময়টি মোটেই চিরদিনের নয় এবং খাওয়া পান করা ও বিলাসিতার করার জন্যে নয়। এ জীবন যে অবশ্যই একটি পরীক্ষা, এ কথাটা একেবারেই তারা বে-মালুম ভুলে বসে আছে। আর ভাবছে, আজকে যেমন আছে এমনই চিরদিন চলবে। অবশ্য, মানুষের মধ্যে আল্লাহর কৃপাধন্য আত্মসমপর্ণকারী আর একটি দলও রয়েছে , তারা আল্লাহকে ভয় করে, যাবতীয় কাজকর্ম, কথাবার্তা ও চালচলনে সদা-সর্বদা সাবধানে থাকে, পাছে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন এ চিন্তা তাদেরকে কোনো ব্যাপারেই বে-পরওয়া হতে দেয় না।

www.pathagar.com

তারা বিনা শর্তে ও দ্বিধাহীন চিত্তে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করে, তাঁর অস্তিত্বে, তাঁর ক্ষমতায় ও তাঁর গুণাবলীতে অন্য কাউকে তারা শরীক করে না, কিছুতেই তারা মেনে নেয় না যে, শক্তি-ক্ষমতা বা অন্য কোনো গুণাবলীতে অন্য কারো এতটুকু অংশ আছে। তবুও সার্বক্ষণিক এ ভয় তাদের লেগে থাকে, কিছু বিচ্যুতি হয়ে যাচ্ছে না তো! আল্লাহ তায়ালা তাদের এ অনুভূতিতে খুশী হয়ে তাদের কথা গর্বভরে তাঁর পাক পবিত্র কালামে বর্ণনা করছেন,

'তাদের অন্তরগুলো ভীত সন্ত্রস্ত, কারণ তাঁর কাছেই তাদের ফিরে যেতে হবে।'

আর পাশাপাশি তাদের চিত্র আঁকা হচ্ছে যারা অপরিণামদর্শী, যারা আজকের এ নগদ নিয়ে বড়ই খুশী, এদেরকে হঠাৎ করে যখন অকল্পনীয় আযাবে পেয়ে বসবে, তখন তারা চরমভাবে অস্থির হয়ে যাবে, কিন্তু তখন কোনো উপায়ই থাকবে না। এজন্যে এখনই তাদেরকে আযাবের ভয় দেখিয়ে সাবধান হতে বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, অবশ্যই আমার বিধিনিষেধ তোমাদের কাছে এসেছিলো, কিন্তু তোমরা সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে অহংকারী হয়ে চলতে। রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে তাদের ব্যবহারটা বড়োই অদ্ভুত, তাঁকে তারা চির সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও সত্যপন্থী বলে জানতো, চিনতো, তাঁর কোনো কাজে তারা অসন্তুষ্ট ছিলো না এবং তাঁকে কোনো সময়ই তারা বিমুখ করেনি, অথচ যখন তিনি তাদের কাছে সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এলেন, তখন তারা তাঁর আনীত সত্যকে অস্বীকার করছিলো? অথচ তারা আল্লাহকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে বিরাজমান সব কিছুর মালিক বলে জানতো ও মানতো, আসমান যমীনের রব বা কর্তা হিসাবেও তাঁকে তারা মানতো, আর এটাও মানতো যে বিশ্বের সব কিছুর ওপর তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতা ছড়িয়ে রয়েছে, এতদসত্ত্বেও তারা 'মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে উঠতে হবে' কথাটাকেই মানতে চাইতো না। তারা মনে করতো আল্লাহর সন্তান আছে, নাউযুবিল্লাহ!– তিনি মানবীয় এসব ধারণা কল্পনা ও দুর্বলতার সম্পূর্ণ উর্ধে! তারা আল্লাহর সাথে অন্য অনেক কিছুকেই শরীক করতো 'অতপর (তাদের জন্যে ঘোষণা) যেসব জিনিসকে (তাঁর সাথে তারা শরীক বানাচ্ছে সেসব কিছুর দুর্বলতা) থেকে তিনি প্রশ্নাতীতভাবে পবিত্র।'

আর এ সূরার শেষ পর্যায়ে এসে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের শরীকদেরকে পরিত্যাগ করতে ঘোষণা দিচ্ছেন এবং তাদের ধ্যান-ধারণাকে বাতিল বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। তারপর রসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করে বলছেন তিনি যেন তাদের সকল মন্দ ব্যবহারের জবাব সর্বোত্তম ব্যবহার দ্বারা দেন এবং তিনি যেন শয়তানদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি যেন রাগ না করেন, আর ওরা যা কিছু অন্যায় বলছে তার জন্যে হৃদয়কে যেন তিনি কখনো সংকীর্ণ না করেন, আর এসব কথার পাশপাশি কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দৃশ্য ছবির মতো তিনি তাঁর সামনে ফুটিয়ে তুলছেন, যার ব্যবস্থা তিনি তাদের জন্যে করছেন– সে দৃশ্য হচ্ছে তাদের নিরন্তর অপমান ও সদা-সর্বদা ভীতি প্রদর্শনের দৃশ্য। তারপর সূরাটি সমাপ্ত করা হচ্ছে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার সাথে। এরশাদ হচ্ছে,

www.pathagar.com

'মহা মহীয়ান আল্লাহ, যিনি বিশ্ব জাহানের প্রকৃত সম্রাট। তিনি ছাড়া এমন কেউ সর্বশক্তিমান নেই (যার সামনে মাথা নত করা যায়), তিনি মহান আরশের মালিক।'

এখানে আরো দেখা যায়, সূরাটির প্রথমাংশে কৃতকার্যতার শর্তগুলো বর্ণনা করার সাথে সাথে কাফেরদের ব্যর্থতার কথাও পেশ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে 'ইলাহ' হিসেবে ডাকে ...... অবশ্যই তার রব তার হিসাব নিবেন। নিশ্চয়ই কাফেররা সফল হবে না।' (আয়াত ১১৭)

এ আয়াতে মানুষের মনযোগকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তাঁর রহমত ও ক্ষমার দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়া হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে, 'আরো বলো, হে আমার রব, ক্ষমা কারো এবং রহম কারো অবশ্যই তুমি সর্বোত্তম রহমকারী।'

সূরা আল ফোরকান

পরম বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাদের কাছে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী আল কোরআন নাযিল করেছেন......? আর তোমার রব তো সব কিছুই দেখছেন।'

আলোচ্য সূরাটি সম্পূর্ণভাবে মক্কী। এ সূরাটি রসূল (স.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে এক আনন্দ, খুশী ও প্রশান্তির প্রতীক হিসাবে। এমন সময় এ সূরাটি রসূল (স.)-কে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে যখন তিনি কোরায়শ জাতির মধ্যে মোশরেক গোষ্ঠীর মোকাবেলা করছিলেন, মোকাবেলা করছিলেন তাঁর প্রতি তাদের দীর্ঘদিনের হিংসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষের। নবুওতপ্রাপ্তির পর থেকেই অবিরতভাবে তারা রসূলুল্লাহ (স.)-কে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে আসছিলো, নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক করছিলো এবং সত্যের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে সর্বোতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো।

এমনই এক কঠিন সময়ে এ সূরাটি তাঁর কাছে এক অনাগত দিনের সুসংবাদ বয়ে আনলো এবং তাঁর ব্যথিত হৃদয়ে মধুর পরশ বুলিয়ে দিলো। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে তাঁর প্রিয়তম বান্দার জন্যে সুসংবাদের এমন ফল্গুধারা নেমে এলো, যা তাঁর সেই ব্যথা বেদনা ও ক্লান্তির ওপর প্রলেপ হিসাবে কাজ করলো। যখন সত্যবিরোধীদের ঘৃণা-বিদ্বেষ তাঁর অন্তরকে ভেংগে দিচ্ছিলো, সেই কঠিন সময়ে সূরাটি তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করলো, আর তাঁর মনে এ নিশ্চয়তা জাগালো যে পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পরিচালনা করছেন।

আবার পরক্ষণেই দেখা যায়, সূরাটি সত্যকে অস্বীকারকারী, সত্যবিরোধী ও অবাধ্য জনগণের সাথে অবশ্যম্ভাবী এক চূড়ান্ত সংগ্রামের পূর্বাভাসও দান করেছে। এরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের এবং সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলছিলো। তারা যুক্তিহীনভাবে সত্য থেকে দূরে সরে থাকছিলো, তাদের শত্রুতা দীর্ঘায়িত হচ্ছিলো। আসলে এই বিদ্বেষ পোষণ করে তারা নিজেরাই কষ্ট পাচ্ছিলো, কারণ যে সত্য তাদেরকে চোখে আংগুল দিয়ে সাফল্যের পথ দেখাচ্ছিলো তার থেকেই তারা দূরে সরে যাওয়ার জন্যে বদ্ধপরিকর ছিলো।

www.pathagar.com

মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে সে পাষাণ হৃদয় জনগণ মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকেই ফিরে যাচ্ছিলো, এরশাদ হচ্ছে,

'(ওরা বলছিলো), 'এটা মনগড়া এক মিথ্যা বৈ আর কিছু নয়, আর তাকে এ কাজে অন্যরাও সাহায্য করে থাকে'...... অথবা ওরা বলে প্রাচীন লোকদের কাহিনী লিখে নেয়া হয়েছে, যা সকাল সন্ধ্যা তাকে পড়ে শোনানো হয়।' কোরায়শদের কাফেররা সম্মানিত রসূল (স.) সম্পর্কে এ কথাগুলোই বলে থাকে। তারা আরও বলে, 'তোমরা যাদুর স্পর্শে জ্ঞানহারা এক ব্যক্তির অনুসরণই তো করছো'.....অথবা ওরা মস্কারি করে বলে, 'হায়, এই নাকি সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?'...... এমনই এক হতভাগা জাতি ওরা যে, এতো সব বাজে কথা বলেও ওরা ক্ষান্ত হয়নি, বরং আরো অগ্রসর হয়ে স্বয়ং মহান আল্লাহর দোষ ধরতেও দ্বিধাবোধ করেনি, 'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, সাজদা করো মহা দয়াময় আল্লাহকে, তখন ওরা বলে, দয়াময় (রহমান) আবার কে? আমরা কি সাজদা করবো তাকে যাকে তুমি সাজদা করতে বলবে? এভাবে, তারা আরও দূরে সরে যাবে, তাদের থেকে বেশী কিছু ফায়দা হবে না।' (আয়াত ৬০)

আর আল্লাহর আয়াত নাযিল হতে দেখে অনেক সময়ে ওরা কষ্ট পায় এবং বলে, 'আমাদের ওপর কেন ফেরেশতা দল নাযিল হয় না অথবা কেন আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাই না?' আর এটাই হচ্ছে সত্য বিরোধীদের চিরাচরিত নিয়ম। প্রাচীন কাল থেকে এরা এইভাবেই বলে এসেছে। নূহ (আ.)-এর সময় থেকে নিয়ে শেষ রসূল পর্যন্ত বরাবর একই নিয়ম দেখা যাচ্ছে।

এখানে দেখা যাচ্ছে সে যালেম জাতির আপত্তি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা একজন মানুষকে কেন রসূল বানাবেন, অর্থাৎ রসূলের দায়িত্ব পালন ও মর্যাদা লাভের জন্যে মানুষ হওয়াটাই তাদের কাছে আপত্তিকর। এজন্যে তারা বলতো, 'এ আবার কেমন রসূল, যে খায়-দায় এবং বাজার ঘাটে হেঁটে বেড়ায়? তার কাছে একজন ফেরেশতা কেন নাযিল হয় না যে তার সাথে সতর্ককারী হিসেবে কাজ করতে পারতো!' এরপর তারা মোহাম্মদ (স.)-এর অর্থনৈতিক যোগ্যতা বা সম্পদশালী হওয়া না হওয়ার ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন তুললো। ওরা বললো, 'অথবা তার ওপর যদি প্রচুর ধন সম্পদ বর্ষিত হতো অথবা যদি তার মালিকানায় এক সুবিশাল বাগিচা থাকতো, যার থেকে সে (ফলমূল) ভক্ষণ করতো।'

আবার আল কোরআনের অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি নিয়েও তারা প্রশ্ন তুলতো, বলতো, 'কেন (এক কোরআন) একবারেই সবটুকু নাযিল হয় না?'

এসব প্রশ্নের মধ্যে যেসব বে-আদবী নিহিত ছিলো তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ (.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও উপহাস বিদ্রূপ করা। আর এটা তার প্রতি মিথ্যারোপ করা থেকেও ছিলো গুরুতর। এর অর্থ দাঁড়ায় স্বয়ং আল্লাহর প্রতি দোষারোপ করা। তাঁর ক্ষমতার প্রতি এটা এক চ্যালেঞ্জও বটে!

www.pathagar.com

রসূল (স.) ধীরস্থিরভাবে ও পরম দৃঢ়তার সাথে, এসব দুঃসহ পরিস্থিতির মোকাবেলা করে চলেছিলেন যদিও তিনি একা, সহায়-সম্পদহীন, একমাত্র তাঁর রবের ওপরই তিনি নির্ভরশীল, যার কারণে শত্রু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত এসব হৃদয়বিদারক শেল তাকে আহত করলেও তাঁকে কখনো ধরাশায়ী করতে পারেনি বা ভিন্ন কোনো পথেও তাকে চালিত করতে পারেনি! দেখুন, সে অবস্থায় তিনি তাঁর রবের করুণা প্রার্থী হয়ে তাঁর কাছে কাতর কণ্ঠে দোয়া করছেন, 'হে আমার রব, তোমার গযব থেকে যদি আমি বেঁচে যেতে পারি, তাই আমার জন্যে যথেষ্ট, এতে যতো কিছু দুঃখ কষ্ট সইতে হয়– সবই সইবো। এতে আমার যতো কষ্টই হোক না কেন, তাতে আমার কোনো পরওয়া নেই, একমাত্র তোমার করুণা আমি ভিক্ষা চাই, চাই শুধু তোমার সন্তুষ্টি!'

অতপর, দেখা যাচ্ছে এই সূরাটির মধ্যে তাঁর রব তাঁকে নিজের কাছে আশ্রয় দিচ্ছেন, তাঁকে নিজ রহমতের ছায়াতলে টেনে নিচ্ছেন আর তাঁর ক্লান্তি ও ব্যথা বেদনাকে মুছে দিচ্ছেন, তিনি তাঁকে এই চরম দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং শত্রুদের সে ঘৃণ্য আচরণ থেকে তাঁর নযরকে সরিয়ে নিচ্ছেন। তাঁর জাতি তাঁর ও তাঁর সংগী সাথীদের ওপর দিনের পর দিন ধরে যেসব যুলুম করে যাচ্ছিলো সেগুলোকে সহজভাবে গ্রহণ করার জন্যে তাঁর মনকে তিনি প্রস্তুত করে দিচ্ছেন। অতি সহজভাবে তিনি এই কথাটাই গ্রহণ করছেন যে, যে হতভাগারা আপন সৃষ্টিকর্তা ও রেযেকদাতাকেই মানে না, তখন তারা এসব দুর্ব্যবহার করবে– এটা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার! এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা অন্যদের দাসত্ব করে যারা তাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না.....'আর ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আরো এমন অনেককে তাদের এবাদাত পাওয়ার যোগ্য হিসাবে গ্রহণ করে যারা ওদেরকে মৃত্যু দেয়ার মালিক নয় বাঁচিয়ে রাখার মালিকও নয় এবং পুনরায় কবর থেকে তুলতেও তারা পারবে না।.......আর যখন তাদেরকে বলা হয়, সাজদা কর রহমানকে ওরা বলে, রহমান আবার কে?'

মোহাম্মাদুর রসূল (স.) কোনো নবাগত বা অপরিচিত ব্যক্তি নন, তিনি তো তাদেরই মধ্যে লালিত পালিত। তাঁর স্বভাব চরিত্র ও মান সম্মান সবার জানা। এমন মহান ব্যক্তিকে তারা এমন হৃদয়হীনভাবে লাঞ্ছিত করছে, উপহাস-বিদ্রূপ করছে এবং তাঁর সাথে এতো হিংস্র ব্যবহার করছে, যার প্রতিক্রিয়া তাদের নিজেদের মধ্যেও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। সে কঠিন অবস্থার চিত্র যখন সামনে আসে তখন বুঝা যায় যে কী ধ্বংসাত্মক অবস্থার মধ্যে তারা হাবুডুবু খাচ্ছিলো–গড়াগড়ি দিচ্ছিলো তারা কী ঘৃণা পংকিলতার মধ্যে! এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি কি চিন্তা করে দেখেছো, যে ব্যক্তি তার কু-প্রবৃত্তিকে তার মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তার অভিভাবক হয়ে যাবে? ......।' (আয়াত ৪৩-৪৪)

এ হঠকারী ও র্তকে নিয়োজিত কাফেরদের যুক্তিহীন ব্যবহারের এক পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন বলে ওয়াদা করছেন, তিনি তাকে জানাচ্ছেন,

www.pathagar.com

'ওরা তোমার সাথে তর্ক করতে গিয়ে যতো উদাহরণই পেশ করুক না কেন আমি সত্য বিষয়টিকে অতি সুন্দর ব্যাখ্যাসহ অবশ্যই তুলে ধরবো।' (আয়াত ৩৩)

এসব ঝগড়া ও তর্কের কথাগুলো জানানোর পর অতীতের হঠকারী অনুরূপ-যুক্তিহীন বচসাকে পেশ করা হচ্ছে, এরা বিভিন্ন যুগে একইভাবে নবীদের সাথে ঝগড়া করেছে। এরা বাস করত মূসা, নূহ, আদ, সামুদ ও কূপবাসী এবং ওদের মধ্যবর্তী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে।

এরপর একের পর এক, তাদের সামনে কেয়ামতের দৃশ্যাবলী তুলে ধরে তাদের ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স.)-কে অবহিত করা হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'(ওরা হচ্ছে সেসব মানুষ) যাদেরকে মুখের ওপর টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে। এদের সেই বাসস্থানটা হবে বড়োই নিকৃষ্ট ....।'

'সেদিন (প্রত্যেক) যালেম ব্যক্তি নিজের হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় আফসোস, আমি যদি রসূলের পথ ধরতাম! হায়রে দুর্ভাগ্য আমার! যদি গ্রহণ না করতাম অমুক ব্যক্তিকে আমার বন্ধুরূপে তাহলে কতোই না ভালো হতো!......।' (আয়াত ২৭-২৮)

এ পর্যায়ে এসে আল্লাহ রব্বুল আলামীন রসূলে করীম (স.)-কে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলছেন,

'আর তোমার পূর্বে আমি যতো রসূলকে পাঠিয়েছি তারা (সবাই) খাদ্য খাবার খেতো এবং বাজার-ঘাটে চলাফেরা করতো'.....। 'আর এমনি করেই আমি অপরাধী লোকদের মধ্য থেকে প্রত্যেক নবীর জন্যে কোনো না কোনো শত্রু বানিয়ে দিয়েছি, তোমার জন্যে তোমার রবই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিনি দৃঢ়তার সাথে সবর করেন এবং অপরকেও সবর করার জন্যে উৎসাহিত করেন এবং তাঁর কাছে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের যে জ্ঞান-ভান্ডার রয়েছে তা দিয়েই যেন তিনি কাফেরদের মোকাবেলা করেন, কেননা এ পাক কালাম যথেষ্ট পরিমাণ মযবুত যুক্তি-প্রমাণ সহ সত্যের পক্ষে কথা বলেছে, যা হৃদয়ের অভ্যন্তরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব, কাফেরদের অনুসরণ করো না এবং তাদের সাথে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হও।'

এখানে বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে যে, ৬৮-৭০নং আয়াত ছাড়া সূরাটির বাকী অংশ অবতীর্ণ হয়েছে যখন মুসলমানদের হাতে কোনো বস্তুগত আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো উপকরণ ছিলো না। এতদসত্তেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তিনি যেন তাঁর মালিক পরওয়ারদেগারের ওপর ভরসা করে সত্যের ওপর টিকে থাকেন এবং অপরকেও সত্যের দিকে আহ্বান জানানোর জন্যে চরম প্রচেষ্টা চালিয়ে যান এবং তাঁর দায়িত্ব পালনে কোনো সময়ে যেন তিনি বিরত না হন, বরং

www.pathagar.com

অবিরাম গতিতে তাঁর মিশনকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা জারি রাখেন। এর প্রতিক্রিয়ার কোনো পরওয়া না করে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করেই যেন তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হতে থাকেন। একবার যে কদম সামনে বেড়েছে তা যেন আর কখনো পিছিয়ে না যায়। দেখুন, কী বলিষ্ঠ আল্লাহর নির্দেশ,

'ভরসা করো সেই চিরঞ্জীব সত্ত্বার ওপর, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না এবং তাঁর প্রশংসা ও কৃতিত্ব বর্ণনার সাথে সাথে ঘোষণা করো যে তিনি সকল প্রকার দোষ-ক্রটি ও দুর্বলতার উর্ধে, তিনি অবশ্যই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে খবর রাখার জন্যে যথেষ্ট।'

এভাবে সূরাটির বর্ণনা এগিয়ে চলেছে। এ বর্ণনা ধারাতে কোনো সময়ে দেখা যাচ্ছে রসূল (স.)-এর প্রতি তাঁর মহব্বত ও স্নেহের ঝর্ণাধারা বিগলিত ধারায় ঝরছে, কখনো তাঁকে আনন্দ দান করা হচ্ছে, কখনো তাঁর প্রতি দয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করা হচ্ছে, আবার কখনো বা দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাঁর শক্তি-ক্ষমতা প্রদর্শন করে তাঁর রসূলের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করছেন। আবার কোনো কোনো আয়াতে দেখা যাচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নিজ শক্তি ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর মিশনকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে উৎসাহিত করছেন। বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে কাফের-মোশরেকদের পক্ষ থেকে আসা সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট আরো কিছু দিন সয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁকে উজ্জীবিত করছেন। সাথে সাথে সুস্পষ্টভাবে তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সত্যবিরোধী চক্রের ধ্বংস অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে সকল শক্তি ক্ষমতার লাগাম। এ লাগামকে তিনি এ জন্যেই একটু ঢিল দিয়ে রেখেছেন যাতে শত্রুপক্ষ দৌরাত্মের চরম সীমায় পৌছে যায়, তারপরই যখন তাদের তিনি পাকড়াও করবেন তখন সেই পাকড়াও থেকে বাঁচার আর কোনো উপায়ই আর তাদের থাকবে না, পাশাপাশি মেহেরবান মালিক তাদের অন্তরে তাঁর আদব মহব্বতের মধুর পরশ বুলিয়ে দিচ্ছেন যারা তাঁর দয়ার ভিখারী হয়ে তাঁরই হুকুম মেনে চলেছে। সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালা প্রেমের সুরভিত বায়ুর খুশবুতে মাতোয়ারা হয়ে গেছে, যারা চিরন্তন সুন্দর জীবনের সুসংবাদে সকল দুঃখ জ্বালা ভুলে গেছে, যাদের অন্তর জান্নাতের সুনিশ্চিত আশ্বাসে নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে, যারা দুঃসহ নির্যাতনের মাঝেও সত্য পথকে আঁকড়ে ধরে থাকার পরম প্রশান্তি লাভ করেছে........এই কথাটাই অনুরণিত হচ্ছে আল্লাহর উচ্চারিত আদরের ভাষায়, 'এবাদুর রহমান' মহা দয়াময়, যাঁর রহমতের বারি ধারা সকল মানবকুলের ওপর ঝরে পড়ে– সেই প্রেমময়ের একান্ত ভক্ত অনুগত তারা'– তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,

'তারা পৃথিবীর বুকে বিনয়াবনতভাবে চলাফেরা করে। আর যখন তাদেরকে হঠকারী জাহেল ব্যক্তিরা যুক্তিহীন কথা বলে সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম' .....।'

www.pathagar.com

একথা দ্বারা সে সব পাষাণ হৃদয় মূর্খ নাদানের দলের সাথে সংঘর্ষ বাধানোকে এড়িয়ে চলা বুঝানো হয়েছে, যারা জেনে-বুঝেই ভুল পথ গ্রহণ করে নিজেদের জন্যে কঠিন শাস্তিদায়ক স্থান জাহান্নামকে অবধারিত করে নিয়েছে।

সূরাটি শেষ হচ্ছে সে সুন্দর মনোরম মানবগোষ্ঠীর ছবি তুলে ধরে, যারা আল্লাহর সামনে বিনম্র-ভদ্র, বিনয়াবনত সর্বপ্রকার অহংকার বর্জিত। কেন মোমেনদের হৃদয়গুলো তাঁর কাছে কাতর প্রার্থনা করবে না, কেন ডাকবে না তারা তাঁকে বিনয়ের সাথে! তারা যে আল্লাহর মহব্বতের পরশ পেয়ে গেছে! এদের বাইরে যারা অহংকারী হঠকারী গোষ্ঠী রয়েছে তাদের জন্যে উচ্চারিত হচ্ছে (হে রাসূল), 'বলে দাও আমার রব এতোটুকু পরওয়া করবেন না তোমাদের, যদি তোমরা তাঁকে না ডাকো। তোমরা সত্যকে অস্বীকার করেছো এবং (মহান নবীকে) মিথ্যাবাদী সাজিয়েছ সুতরাং তোমাদের জন্যে আশু আযাব অনিবার্য হয়ে গেছে।'

ওপরে আলোচিত কথাগুলোই হচ্ছে এ সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সূরাটির বাকি কথাগুলো ও অন্যান্য কিছু বিষয় আবর্তিত হয়েছে। আলোচিত বিষয়গুলো একটি আর একটির সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত, যেগুলোর একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা বেশ কঠিন, তবে বিষয়গুলোকে মোট চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম অধ্যায়টি শুরু হচ্ছে এ কথার সাথে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর পরম প্রিয় বান্দার কাছে এই পাক কালাম আল কোরআনকে নাযিল করেছেন যাতে করে এই গ্রন্থ নিয়ে তিনি সারাবিশ্বের জন্যে সতর্ককারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, আর নেয়ামত লাভের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি যেন আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করেন ও আজীবন তাঁর কৃতিত্ব বর্ণনা করতে থাকেন। তাঁকে আরো জানানো হচ্ছে যে, তাঁর মূল দায়িত্ব হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা, সবাইকে এ বিষয়ে অবহিত করা যে তিনিই সব কিছুর তাঁর মালিক, নিজস্ব প্রজ্ঞা ও শক্তি ক্ষমতা বলে তিনি সব কিছু পরিচালনা করছেন ও সব কিছুর ব্যবস্থাপনা আনজাম দিচ্ছেন।

তারপর উল্লেখ করা হচ্ছে যে এতদসত্তেও মোশরেকরা এমন আরো অনেককে মাবুদ বানায়, যারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট জীব। রসূল (স.) আল্লাহর কাছ থেকে যে বাণী বহন করে এনেছেন সে কথা তো ওরা অস্বীকার করেই, উপরন্তু ওরা আরো দাবী করে যে, তিনি নিজে এসব মনগড়া কথা নিজ থেকে তৈরী করে বলেন, আরো বলে যে এগুলো হচ্ছে সব প্রাচীনকালের কাহিনী, যা তিনি নিজে লিখিয়ে নিয়েছেন। তারা এসব কথাও দাবী করে বলে যে তিনি সাধারণ একজন মানুষ হয়ে রসূল হন কেমন করে? তিনি তো সাধারণ মানুষেরই মতো খানা পিনা করেন, বাজার ঘাটে চলাফেরা করেন। তারা আল্লাহর সমালোচনা করে একথাও বলে যে, আল্লাহ তায়ালা রসূলই যদি পাঠাবেন, তাহলে কোনো ফেরেশতাকে কেন রসূল বানিয়ে পাঠালেন না? আর মানুষকেই যদি রসূল বানানো প্রয়োজন হয়েছিলো তাহলে তাকে প্রচুর ধন সম্পদ দিয়ে সবার ওপর তাকে প্রভাবশালী কেন বানালেন না!

www.pathagar.com

এরপর দেখুন, তাঁর কুসুম কোমল নির্মল চরিত্রের পর দোষারোপ করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে, তিনি যাদুগ্রস্থ এক ব্যক্তি.......আসলে এ কথার দ্বারা আল্লাহর ক্ষমতাকেই অস্বীকার করা হচ্ছে, আর এই কারণে রসূল (স.)-কেও অপমান করা হচ্ছে......এভাবে তারা সঠিক পথ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে এবং অন্যদিকে আখেরাতকেও অস্বীকার করা হচ্ছে, অতপর এসব কিছুর পরিণতিতে আল্লাহ তায়ালা তাদের জাহান্নামের আগুনে হাত পা বেধে নিক্ষেপ করবেন বলে ওয়াদা করছেন– সে স্থানটা হবে অত্যন্ত সংকীর্ণ।

এর পাশাপাশি চিত্র আঁকা হচ্ছে জান্নাতবাসী মোমেনদের

'সেখানে তাদের জন্যে রয়েছে তাই যা তাদের অন্তর চাইবে, চিরন্তন হবে সে জীবন।'

হাশরের দিনের সেই দৃশ্য সদা-সর্বদা মোমেনদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে এবং অতীতে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য যাদের বন্দেগী তারা করতো তাদের করুণ অবস্থাও যেন তাদের চোখের সামনে তারা দেখতে থাকে। অন্যদিকে আল্লাহর সাথে অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে মোশরেকরা যে শেরক করে আর এ কারণে তারা রসূল (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে.......এ পর্যায়ে রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে, সকল রসূলের অবস্থা একই ছিলো, তারাও খাওয়া দাওয়া করতো ও বাজারে চলাফেরা করতো, তাদের এই একই প্রকার দুর্ব্যবহার করা হতো। অতপর রসূল (স.)-কে এসব কথা বলে সান্ত্বনা দান শেষে এ অধ্যায়টি শেষ করা হচ্ছে।

এরপর শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়, যার মধ্যে বর্ণনা এসেছে সে সব ব্যক্তির, যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রশ্নে রসূল (স.)-এর কথাকে প্রত্যাখ্যান করতো। তাদের কথাকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে তারা বলতো, 'কেন নাযিল করা হয় না আমাদের ওপর ফেরেশতা অথবা কেন আমরা আমাদের রবকে দেখি না?' অর্থাৎ, যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখতে থাকবে সেই দিনের দৃশ্য তাদের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আর সে দিনটা কাফেরদের জন্যে বড়োই কঠিন হবে....সেদিন প্রত্যেক যালেম ব্যক্তি (দুখের চোটে) নিজ নিজ হাত কামড়াতে থাকবে, বলবে, হায় আফসোস, যদি আমি রসূলের সাথে পথ ধরতাম তাহলে কতোই না ভালো হতো! আর সেদিন, তাদের এই সত্যবিরোধিতার কারণে রসূল (স.) তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে নালিশ দায়ের করবেন।

দেখুন, তাদের ধৃষ্ঠতা কতো দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিলো যে, তারা কোরআন নাযিলের পদ্ধতি সম্পর্কেও আল্লাহর ওপর প্রশ্ন তুলছিলো এবং বলছিলো, 'কেন তার ওপর সমগ্র কোরআন একযোগে নাযিল হয়নি?' তাদের এই বেয়াদবীপূর্ণ প্রশ্ন তোলার কারণে কেয়ামতের দিন তাদেরকে এই শাস্তি দেয়া হবে যে, তাদেরকে মুখের ওপর টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, অথচ আজকে তারা সেই রোয কেয়ামতকেই অস্বীকার করছে। উপরন্তু, তাদের সামনে তাদের পূর্বেকার জাতি নূহ, আদ, সামূদ কূপবাসী এবং আরো বহু জাতির ভীষণ শাস্তির দৃশ্য ছবির মতো তুলে ধরা

www.pathagar.com

হচ্ছে। একথাও কি সত্য নয় যে তারা গযবপ্রাপ্ত লূত জাতির ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে যখন অতিক্রম করে তখন তারা নিজেরাই বিস্ময় প্রকাশ করে, কিন্তু তবুও তারা শিক্ষা নেয় না। কিন্তু রসূল (স.)-এর ওপর তারা যে বাড়াবাড়ি করছিলো তার জন্যে তারা নিজেদের অজান্তেই নিজেদের কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছিলো। আবারও দেখুন, আল্লাহর কাজের ওপর তারা বিস্ময় প্রকাশ করছে বলছে, এই ব্যক্তিটাকেই কি আল্লাহ তায়ালা রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন? তারপর তাদের এই বিদ্রূপাত্মক ব্যবহারের কারণে তারা কতো হীন অবস্থাপ্রাপ্ত হয় তা জানাতে গিয়ে এবং আল কোরআন এর ভাষায় তাদের চিত্র আঁকতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'ওরা অবিকল পশুরই মতো, বরং ভুল পথে চলার দিক দিয়ে তারা পশু থেকেও খারাপ।'

এরপর আসছে তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা, গোটা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতার বিবরণ দিতে গিয়ে এ আলোচনা এগিয়ে চলেছে। তারপরই পাঠকের দৃষ্টি ফেরানো হচ্ছে পর্যায়ক্রমে রাত দিনের আনাগোনার দিকে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে প্রাণ সঞ্চারকারী পানিবাহী সুশীতল নির্মল বায়ুর সুসংবাদের দিকে, চিন্তা করতে বলা হচ্ছে যে এই তুচ্ছ পানি থেকেই তো মানুষের সৃষ্টি....... আর এতদসত্তেও তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব কিছু বন্দেগী করছে, যা তাদের কোনো উপকার করতে পারে না– বা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। আর এরপর তারা তাদের রব ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ওপর তাদের প্রাধান্য বিস্তারের প্রগলভতাও দেখাচ্ছে, আর যখন তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদাত করার জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে, তখন তারা নানা প্রকার ওযর আপত্তি দেখাচ্ছে.....এরশাদ হচ্ছে, 'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, সাজদা করো রহমানকে, তখন তারা বলে, রহমান আবার কে?'...... 'আর তিনিই তো সেই সত্ত্বা, যিনি আকাশের মধ্যে নিরাপত্তাপূর্ণ স্তরসমূহ বানিয়েছেন এবং তার মধ্যে বাতি ও উজ্জ্বল চাঁদ বানিয়েছেন। তিনিই তো রাত ও দিনকে বানিয়েছেন..... যে চাইবে শোকরগোযারি করতে অবশ্যই সে এর থেকে সর্ব প্রকার শিক্ষা পাবে।'......

কিন্তু হায়, দুঃখ তাদের জন্যে, তারা এর থেকে কোনো প্রকার শিক্ষা না নেয়, না তারা কোনো শোকরগোযারি করে।

এরপর আসছে তৃতীয় অধ্যায়টি, যার মধ্যে 'দয়াময় আল্লাহর বান্দাদের চিত্র আঁকা হয়েছে, যারা তাকে সেজদা করে এবং একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করে এবং তারা তাদের সেই অবস্থানগুলো নির্ণয় করে যা তারা তাদের মহৎ গুণাবলী দ্বারা অর্জন করেছে, তিনি সেসব লোকের জন্যে তাওবার দরজা খুলে দিয়েছেন যারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং পরম করুণাময় আল্লাহর পথে চলতে শুরু করে, আর পাশাপাশি সেই নেককার ব্যক্তিদের পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছেন যারা ঈমান আকীদার ওপর মযবুতভাবে টিকে থাকার জন্যে সংকল্প গ্রহণ করে এবং সর্বাবস্থায় চরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়। এদের সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে,

www.pathagar.com

'এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যাদের সবর এখতিয়ার করার কারণে তাদেরকে জান্নাতের সুসজ্জিত কক্ষ দান করা হবে এবং সেখানে তাদের অভিভাদন জানানো হবে।'

এই কথা দ্বারা সূরাটির সমাপ্তি টানা হচ্ছে যে, যে যাই হোক না কেন, আল্লাহর সামনে মানুষ অতি তুচ্ছ ও অতি ছোট, অতএব তাঁর সামনে সদা-সর্বদা মানুষের বিনয়াবনত থাকা উচিত। মানুষের অন্তর যদি অনুগত না হয়, আল্লাহর ডাকে সাড়া না দেয় এবং আল্লাহকে যদি সে না চেনে তাহলে এসব অস্বীকারকারী মানুষ জীব জানোয়ারের মতোই জীবনের কঠিন পথে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবে এবং নিজেকে সে চরম অধপতনের দিকে নামিয়ে দেবে।

আল্লাহর পথ থেকে সরে যাওয়ার কারণে মানুষ কতো নীচে নামতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় রসূল (স.)-এর সাথে তাদের ব্যবহারে। এতো নিষ্ঠুর ব্যবহার তারা কিভাবে করতে পারে তার কিছু কারণ এ সূরাটির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় কি লক্ষ্যই বা কি তা জানানো হয়েছে এবং এ আলোচনার ধারা এমনই মনোজ্ঞ ও চমকপ্রদ যা আমাদেরকে আল কোরআনের এক অনবদ্য বর্ণনা ভংগি সম্পর্কে অবহিত করবে।

সূরা আশ শোয়ারা

তা-সীন-মীম, এগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী আয়াতসমূহ ....আর অবশ্যই তোমার রব বড়ই শক্তিমান মেহেরবান।

এই মৌলিক সূরাটির আলোচ্য বিষয় সবটুকুই হচ্ছে মক্কী যিন্দেগী কেন্দ্রিক, অর্থাৎ সূরাটিতে আকীদা সম্পর্কেই আলোচনা এসেছে। আকীদা বা অন্তরের মধ্যে আগত মৌলিক গভীর বিশ্বাসের প্রধান কথা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা একা এবং একাই তিনি সকল ক্ষমতার মালিক, 'অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শক্তি ক্ষমতার মালিক (ইলাহ) রূপে ডেকো না, তাহলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন হয়ে যাবে।' (আয়াত ২১৩) ....

এরপর আলোচনা এসেছে আখেরাতের ভয় সম্পর্কে,

'হে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন আমাকে অপমান করো না, যেদিন সম্পদ সন্তানাদি কোনো কিছুই কোনো কাজে লাগবে না, তবে সেই ব্যক্তিই নাজাত পাবে যে সেদিন শেরক মুক্ত মন নিয়ে আসবে।

আকীদার অন্তর্গত তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে, মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর যে ওহী নাযিল হয়েছে একথাকে বিশ্বাস করা, এরশাদ হচ্ছে,

'এ পবিত্র ওহী নাযিল হয়েছে রব্বুল আলামীনের কাছ থেকে। এ পাক পবিত্র বাণী নিয়ে রুহুল আমীন (বিশ্বস্ত ঐশী দূত) জিবরাঈল (আ.) নাযিল হয়েছেন।'

আকীদার মধ্যে চতুর্থ বিষয় হচ্ছে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা, কেননা সত্য বিরোধীরা হয় দুনিয়াতে আযাবে পতিত হয়ে ধ্বংস

www.pathagar.com

প্রাপ্ত হবে, নতুবা আখেরাতের আযাবে পতিত হবে, যা তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করলো, অতপর ওরা সত্য সম্পর্কে যেসব উপহাস বিদ্রূপ করলো, সে পরিণতির সংবাদ শীঘ্রই তাদের কাছে পৌঁছে যাবে।'

সূরা আন নামল

এই সূরাটি একটি মক্কী। সূরা শোয়ারার পরই এটা নাযিল হয়। এর বর্ণনাভংগিও. সূরা শোয়ারার মতোই। সূরার আলোচ্য বিষয় একইভাবে ভূমিকা ও উপসংহারে স্থান পেয়েছে। একইভাবে ভূমিকা ও উপসংহারের মাঝখানে কেসসা-কাহিনী দ্বারা আলোচ্য বিষয়কে অধিকতর স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এসব কেসসা-কাহিনীতে মক্কার মোশরেক গোষ্ঠী ও পূর্ববর্তী বিবিধ জাতির চরিত্রের সাদৃশ্য স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যাতে করে আল্লাহর শাশ্বত নীতি এবং ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের চিরন্তন রীতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা সম্ভব হয়।

অন্যান্য সকল মক্কী সূরার মতোই এই সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় আকীদা বিশ্বাস তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও একমাত্র তাঁরই এবাদাত করা, আখেরাত এবং তাঁর শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস করা, ওহীর প্রতি বিশ্বাস করা, অদৃশ্য বিষয় যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন এবং তিনি ছাড়া কেউ জানে না– একথা বিশ্বাস করা, আল্লাহ তায়ালাই যে একমাত্র স্রষ্টা, জীবিকাদাতা, সম্পদের একমাত্র দাতা, তা বিশ্বাস করা, মানুষের ওপর আল্লাহর নেয়ামতসমূহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ, আল্লাহ তায়ালাই যে সকল শক্তির উৎস ও মালিক এবং তিনি ছাড়া কোনো আইনদাতা নেই, একথা মেনে নেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ।

এই সমস্ত বিষয়কে সমর্থন করা, যারা এগুলোতে বিশ্বাস করে তাদের পুরস্কার এবং যারা বিশ্বাস করে না তাদের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার জন্যেই স্থানে স্থানে ঘটনা আলোচিত হয়েছে।

সূরার ভূমিকার অংশের পর পরই হযরত মূসা (স.)-এর কাহিনীর একাংশ আলোচিত হয়েছে। কাহিনীর এ অংশের বর্ণনা দেয়ার জন্যেই কেসসাটি আলোচিত হয়েছে।

সূরায় ভূমিকায় কাহিনীর এই অংশে রয়েছে হযরত মূসার আগুন দর্শন ও আগুনের কাছে গমন, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সম্বোধন ও ফেরাউনের কাছে তাকে নবী হিসেবে যাওয়ার আদেশদান। অতপর অতিদ্রুত গতিতে ফেরাউন ও তার দলবলের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করার বিষয়টা জানানো হয়েছে। অথচ তারা সবাই নিশ্চিতভাবে জানতো যে, হযরত মূসা সত্যিই নবী। এই সত্য অস্বীকার করার শাস্তি কী, তাও তারা জানতো। 'তারা নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করলো, অথচ তাদের মন তার প্রতি বিশ্বাসী ছিলো। তারা এটা করলো নিছক যুলুম ও ঔদ্ধত্য সহকারে। অতএব, দেখে নাও নৈরাজ্যবাদীদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো।'

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর ব্যাপারেও মক্কার মোশরেকরা অনুরূপ ভূমিকা নিয়েছিলো।

হযরত মূসার কাহিনীর পর পরই এসেছে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-কে দেয়া আল্লাহর অসাধারণ নেয়ামতের কথা, তারপর রয়েছে পিঁপড়ে, হুদহুদ পাখি, সাবা জাতি ও তার রাণীর সাথে হযরত সোলায়মানের কাহিনী। এ সূরার মধ্যেই রয়েছে হযরত দাউদ ও সোলায়মানের পাওয়া আল্লাহর নেয়ামত ও তার জন্যে তাঁর শোকরের বিবরণ। তাঁর প্রাপ্ত নেয়ামতসমূহের মধ্যে রয়েছে গভীর জ্ঞান, রাজত্ব, নবুওত এবং জ্বিন ও পাখির তাঁর অনুগত হওয়া। এই সাথে এর ভেতর প্রকাশ করা হয়েছে সেই মৌলিক আকীদা ও আদর্শ, যার প্রতি প্রত্যেক নবী আহ্বান জানাতেন। বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে সাবা জাতি ও তার রাণী কর্তৃক হযরত সোলায়মানের চিঠির প্রতি জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনার কথা– যদিও তিনি আল্লাহর বান্দাদেরই একজন। পরিশেষে কোরায়শ কর্তৃক আল্লাহর কেতাবের বিরূপ অভ্যর্থনার কথা। কোরায়শরা নবীকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছিলো। আর সাবা ও তার রাণী ঈমান এনেছিলো ও বশ্যতা স্বীকার করেছিলো। হযরত সোলায়মানকে যা কিছু দেয়া হয়েছিলো, আল্লাহ তায়ালাই তা দিয়েছিলেন, যা কিছু তার অনুগত করা হয়েছিলো আল্লাহ তায়ালাই করেছিলেন, আল্লাহ তায়ালাই সব কিছুর মালিক, তিনিই সব কিছু জানেন। হযরত সোলায়মানের রাজত্ব ও জ্ঞান আল্লাহর এই সীমাহীন রাজত্ব ও জ্ঞানের সমুদ্রেরই একটা বিন্দু মাত্র ছিলো।

এরপর এসেছে সামুদ জাতির সাথে হযরত সালেহ (আ.)-এর কাহিনী। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে উচ্ছৃংখল ও নৈরাজ্যবাদীদের পক্ষ থেকে হযরত সালেহ ও তার পরিবারকে হত্যার ষড়যন্ত্র। তারপর দেখানো হয়েছে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা সে জাতির বিরুদ্ধে পাল্টা কৌশল অবলম্বন করেছেন, সামুদ জাতি ও তার কুচক্রীদের ধ্বংস করেছেন এবং হযরত সালেহ ও তাঁর ওপর ঈমান আনয়নকারীদের রক্ষা করেছেন। .... কোরায়শও রসূল (স.)-কে হত্যা ও নির্যাতন করার জন্যে চক্রান্ত আঁটতো, যেমনটি আঁটা হতো হযরত সালেহ ও তার সাথী মোমেনদের বিরুদ্ধে।

সূরার কাহিনী অধ্যায় শেষ হয়েছে হযরত লূত ও তাঁর জাতির কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে। তারা হযরত লূতকে 'পবিত্র মানুষ' হওয়ার অপরাধে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলো। হযরত লূত যখন তাদের ত্যাগ করে চলে গেলেন, তারপর তাদের কী পরিণতি হয়েছিলো, সেটা ছিলো এ সূরার সর্বশেষ কাহিনী।....... কোরায়শও তাঁর হিজরতের সামান্য আগে রসূল (স.)-কে মক্কা থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করেছিলো।

কেসসা-কাহিনী শেষ হয়ে গেলে শুরু হয়েছে উপসংহার। 'বলো, আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা এবং তাঁর মনোনীত বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তায়ালা ভালো, না যাদর তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে তারা?' ...... অতপর প্রাকৃতিক দৃশ্য

www.pathagar.com

ও মানব সত্ত্বার ভেতরকার দৃশ্যসমূহ দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে বিশ্ব বিধাতা, বিশ্বস্রষ্টা, জীবিকা সরবরাহকারী এবং অদৃশ্য বিষয়ে অবগত একমাত্র সত্তা মহান আল্লাহর কুশলী হাতের কৃতিত্ব। বলা হয়েছে যে, সবাইকে একদিন তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। অতপর তাদের কাছে কেয়ামতের একটা আলামত, কেয়ামতের কিছু কিছু দৃশ্য এবং সেদিন কাফেরদের জন্যে যে আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে তার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

সূরা এমন এক বক্তব্য দিয়ে শেষ করা হয়েছে, যা তার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। বক্তব্যটা হলো, 'আমাকে তো কেবল এই নগরীর প্রতিপালকের এবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাকে তিনি সংরক্ষিত ও সম্মানিত করেছেন, তাঁরই জন্যে সব কিছু, আর আমাকে আত্মসমর্পণকারী হবার আদেশ দেয়া হয়েছে।........ আর তোমার প্রভু তোমাদের কাজ সম্পর্কে উদাসীন নন।'

এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো এলেম বা জ্ঞান। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যাবতীয় জিনিস, বিশেষত অদৃশ্য বিষয় ও মানুষের কাছে প্রকাশিত প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান, হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-কে প্রদত্ত জ্ঞান, হযরত সোলায়মান (আ.)-কে পাখির ভাষার জ্ঞানদান এবং এ দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করার বিষয়টি এর আওতাভুক্ত। এ জন্যে সূরার ভূমিকায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাকে কোরআন শেখানো হচ্ছে মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানীর পক্ষ থেকে।' আর উপসংহারে বলা হয়েছে, 'তুমি বলো, আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে তা তারা জানে না, বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে। ....' 'তোমার প্রভু যা তারা গোপন করে ও প্রকাশ করে তা জানেন।' .... সবার শেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করবেন, তখন তোমরা তা জানবে।' হযরত সোলায়মানের কাহিনীতে বলা হয়েছে, 'দাউদ ও সোলায়মানকে আমি জ্ঞান দান করেছি.......' হযরত সোলায়মানের উক্তি! 'হে মানবসকল, আমাদের পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে।' অনুরূপভাবে হুদহুদের উক্তিতে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বলা হয়েছে, ' যিনি আসমান ও যমীনের সকল গোপন বস্তু বের করে আনেন এবং তোমরা যা গোপন করো ও যা প্রকাশ করো তা জানেন।' আর যখন হযরত সোলায়মান সাবার রাণীর সিংহাসন হাযির করতে চান, তখন একটি জ্বিন জাতীয় দানব সে সিংহাসনকে চোখের পলকে হাযির করতে পারলো না, 'বরং আল্লাহ তায়ালা কেতাব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে' এমন একজন জ্বিনই ওটা চোখের পলকে হাযির করতে পারলো।

এভাবে সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা প্রসংগে জ্ঞানেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং সমগ্র সূরা এই আবহের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছে। আর এটা অগ্রসর হয়েছে আমাদের ইতিপূর্বে প্রদত্ত ধারাক্রম অনুসারেই।

www.pathagar.com

সূরা আল কাছাছ

আলোচ্য সূরাটি মক্কা মোয়াযযামায় অবতীর্ণ। এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো অত্যন্ত নগণ্য এবং নানা প্রকার দুর্বলতাও তাদের ঘিরে রেখেছিলো। অপরদিকে মোশরেকেরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পেশীশক্তি ... সব দিক থেকেই শক্তিশালী ছিলো। ঠিক এই সময়ে সূরাটি নাযিল হয় এবং এর মাধ্যমে তাদের শক্তি ও মূল্যবোধকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলার জন্যে আহ্বান জানানো হয়। আল্লাহর এ আয়াতগুলো এই কথাটাই প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলো যে, এই সৃষ্টিজগতের সবখানে একটি শক্তিই কাজ করে যাচ্ছে, আর তা হচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শক্তি; সমগ্র বিশ্বের একটি জিনিসেরই স্থায়ী মূল্য আছে, আর তা হচ্ছে 'ঈমান'। সুতরাং এটা মানতেই হবে, যাদের সাথে আল্লাহর শক্তি রয়েছে তাদের কোনো ভয় নেই, যদিও শক্তি প্রকাশের যতো প্রকার মাধ্যম আছে বাস্তবে তখনো তার কোনোটাই তাদের হাতে আছে বলে দেখা যায় না; যাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর শক্তি মারমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের না আছে নিরাপত্তা, না আছে শান্তি, এমনকি তাদের অবস্থানকে সমর্থন দেয়ার মতো নানা প্রকার যুক্তি প্রমাণ হাযির করা সত্তেও তাদের মনের মধ্যে সদা সর্বদা প্রচন্ড এক দুর্বলতা বিরাজ করতে থাকে। যার কাছে ঈমানের সঠিক মূল্য আছে সে সবচেয়ে বেশী কল্যাণের অধিকারী, আর এই মূল্যবোধটা যে হারিয়ে ফেলে সে মূলত কোনো জায়গা থেকেই কোনো কল্যাণ পেতে পারে না।

সূরাটির শুরুতে মূসা (আ.) ও ফেরাউনের কাহিনী পেশ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সূরাটির মূল বক্তব্য ফুটে উঠেছে, ফুটে উঠেছে কারুন তার জাতির সাথে যে ব্যবহার করেছিলো তার মধ্য দিয়েও। অবশেষে মূসা (আ.)-এর জাতি সম্পর্কে বহু শিক্ষামূলক কথাও এখানে এসেছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সূরাটি সর্বপ্রথম যে কাহিনী পেশ করেছে তা হচ্ছে মিসরের তৎকালীন শাসন কর্তৃপক্ষের শক্তি প্রদর্শনের কথা। এ প্রসংগে অহংকারী, বিদ্রোহী ও অত্যাচারী ফেরাউনের শক্তি প্রদর্শন ও মানুষের মধ্যে তার পক্ষ থেকে প্রচন্ড আতংক সৃষ্টি করে রাখার কথা বলা হয়েছে, এর মোকাবেলায় বর্ণিত হয়েছে মূসা (আ.)-এর কথা, যিনি ছিলেন তারই ঘরে লালিত পালিত এক দুগ্ধপোষ্য শিশু (সম), তার না ছিলো কোনো শক্তি, না ছিলো কোনো আশ্রয়, আর না ছিলো তার জন্যে কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা। অথচ ফেরাউন ছিলো তৎকালীন পৃথিবীতে সর্বাধিক ক্ষমতাধর বাদশাহ। সে তার প্রজাদের তার জন্যে নিবেদিতপ্রাণ ভক্ত বানিয়ে রেখেছিলো এবং বনী ইসরাঈল জাতিকে সকল দিক থেকে দুর্বলতার মধ্যে ঘেরাও অবস্থায় ফেলে রেখেছিলো, তাদের ছেলেদের সে হত্যা করতো এবং মেয়েদের রাখতো। এই ভাবে সে গোটা বনী ইসরাঈল জাতিকে তার কব্জার মধ্যে রেখে আতংকগ্রস্ত করে রেখেছিলো, কিন্তু যখন নবুওতের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মূসা (আ.) নির্ভীক চিত্তে এই যালেম শাসকের দরবারে হাযির হলেন, তখন ফেরাউনের দর্প,

www.pathagar.com

শক্তি-সাহস, ঔদ্ধত্য ও আত্মসম্মানবোধ সবই এমনভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলো যে, বাস্তবে তার মনোবল, জনবল, শক্তি সরঞ্জাম সবই যেন ভোঁতা হয়ে গেলো।

কি মহা আশ্চর্যের ব্যাপার, নিজেকে যে ব্যক্তি সর্বশক্তিমান বলে দাবী করে এসেছে, যে নিজের শক্তি ক্ষমতা নিষ্কন্টক রাখার জন্যে এতো লোককে হত্যা করে এসেছে, আজ সে তারই ঘরে লালিত পালিত সে দিনকার এক শিশুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে যাচ্ছে, কেমন যেন এক অজানা অদেখা ভয় তার হৃদয়কে গ্রাস করে ফেলেছে। এমন এক আতংক তাকে পেয়ে বসেছে যে, মূসা (আ.)-এর ওপর কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া তো দূরের কথা, তার সামনে থেকে যেন সরতে পারলেই সে বেঁচে যায়। কেন এমন হচ্ছে? কার ইচ্ছা এখানে কাজ করছে, মূসা (আ.)-এর ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে কার শক্তি-ক্ষমতার বহিপ্রকাশ ঘটছে? আসলে বাহ্যিক দিক দিয়ে মূসা (আ.) শক্তিহীন, সাথীহীন ও নিরস্ত্র হলেও তিনি যে অদেখা সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রত্যক্ষ খবরদারিতে রয়েছেন, যাঁর শক্তির বেষ্টনী এমনভাবে তাকে ঘিরে রেখেছে যে তার দিকে রক্ত চক্ষু তুলে তাকায় এমন সাহস কারও নেই! বরং মূসা (আ.)-এর এক একটি কথা তার বুকের মধ্যে শেলের মতো বিঁধছে, প্রবল এক ভয় তার কলিজার মধ্যে এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে, সে কি করবে আর কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। দিশেহারা হয়ে সে বলছে, 'আমাকে ছেড়ে দাও তো! আমি মূসাকে কতল করে ফেলি, সে তার রবকে ডাকুক। আমার ভয় হচ্ছে যে, সে তোমাদের ধর্ম-কর্ম সব বদলে ফেলবে, অথবা সারা রাজ্যে সে এক প্রচন্ড বিশৃংখলা ছড়িয়ে দেবে। (আয়াত ৪০, ২৬)

এই আয়াতটিতে ফেরাউনের কি অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে! তাকে কে ধরে রেখেছিলো যে, ছাড়তে হবে? সে না সর্বশক্তিমান? তাহলে কেন সে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারছে না যে তার গোটা রাজ্যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে দেবে বলে সে আশংকা করছে? আসলে, এ কথা বলে সে পিঠটান দিতে চায়। মহাশক্তিমান সিংহ সে, কিন্তু এখন ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিজ গর্তে ফিরে যেতে পথ পাচ্ছে না। কাপুরুষের মতোই তার অন্তর কাঁপতে শুরু করেছে। তাই মূসা (আ.)-এর কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। তার অন্তরের মধ্যে সে ভয়ে কিভাবে চুপসে গেছে তা একমাত্র সে-ই বুঝতে পারছে।

দ্বিতীয় যে শিক্ষাটি এ সূরার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে সম্পদের সঠিক মূল্যায়ন করা। বিশেষ করে, যার সাথে জ্ঞানের যোগ রয়েছে। এ মহামূল্য সম্পদ যেমন মানুষের উপকার করে, তেমনি মানুষকে হিংস্র পশুর স্তরেও নামিয়ে দেয়। এই সম্পদই মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার জন্ম দেয়। তাই দেখা যায়, কারুন তার জাতির মধ্যে এই সম্পদ নিয়ে চরম জাঁকজমকপূর্ণভাবে আবির্ভূত হয়েছে। এমনভাবে সে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিলো যে মানুষের মধ্যে এ কথাটা সাধারণভাবে জানাজানি

www.pathagar.com

হয়ে গিয়েছিলো, তার অর্থভান্ডারের চাবিগুলো বহন করতে গিয়ে শক্তিশালী একদল[১] লোক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এখন 'দল' বলতে যদি দশ জনও হয় তাহলে দশ জন শক্তিশালী লোক কমপক্ষে দশ মণ বোঝা বইতে পারে। কমপক্ষে দশ মণ যদি চাবির বোঝা হয়, আর সে চাবিগুলো যদি কামরার বা বাক্স সিন্দুকের হয়, তাহলে কতোগুলো বাক্স ভর্তি স্বর্ণ-রৌপ্য হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আবার জ্ঞানের কারণেও কারুন অহংকার করতো এবং সে মনে করতো, এই যে বিপুল পরিমাণে অর্থ-সম্পদের মালিক সে হয়েছে- এটা তার জ্ঞান ও জ্ঞানগত যোগ্যতারই ফল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কওমের মধ্যে যারা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী, তারা সম্পদ কম হলেও কারুনের তুলনায় নিজেদের কখনো ছোট মনে করতো না, বা কারূনের জাঁকজমক ও জৌলুস দেখে হীনমন্যতায় ভুগতো না; বরং সাধনা করা ও সঠিক পথে থেকে জীবন যাপন করা এবং অপরকে সাহায্য করার বিনিময়ে তারা আল্লাহর কাছেই প্রতিদান আশা করতো। তারা জানতো যে আল্লাহ তায়ালাই উত্তম এবং তিনিই চিরস্থায়ী।

তারপর যখন কারুনের অহংকার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো, তখন মহান আল্লাহ তায়ালা তাতে হস্তক্ষেপ করলেন এবং তাকে তার সহায় সম্পদসহ মাটির মধ্যে ধসিয়ে দিলেন। সে সময়ে তার ধন সম্পদ ও জ্ঞান তাকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারলো না।

অবশ্যই বনি ইসরাঈল জাতির ওপর ফেরাউন চরম যুলুম করেছিলো। একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে এবং স্বেচ্ছাচারী শাসন ক্ষমতা চালিয়ে গোটা দেশে এক চরম নৈরাজ্য ও চরম অশান্তি সৃষ্টি করে রেখেছিলো। একভাবে কারুনও তার অর্থ সম্পদ ও জ্ঞানের দাপট দেখিয়ে মানুষকে বশীভূত করে রেখেছিলো। ফলে তার সেই একই পরিণতি হয়েছিলো, যা হয়েছিলো ফেরাউনের। তাকে তার ধনদৌলত ও বাড়ীঘর দুয়ারসহ পৃথিবীর বুকে ধসিয়ে দেয়া হয়েছিলো। অপরদিকে সীমা-লংঘনকারী, বলদর্পী আল্লাহর সে দুশমন ফেরাউন ও তার দোসরদের দিকে লক্ষ্য করুন। কেমন করে গভীর সাগরের উত্তাল তরংগাভিঘাতে হাবুডুবু খেয়ে তারা মরছে, কতো অসহায়ভাবে তারা বাঁচার জন্যে হাত পা ছুঁড়ছে, কিন্তু হায়, এ যে আল্লাহর শাস্তি নেমে এসেছে! ভূধরে, সাগরে, অন্তরীক্ষে এমন কেউ নেই যে তাঁর হুকুম রদ করতে পারে। আল্লাহর যমীনে বাস করে যারা তাঁর না-ফরমানী করবে, তাঁর ক্ষমতাকে উপেক্ষা করার দৌরাত্ম্য দেখাবে, তার নিজের শক্তি ক্ষমতা কায়েম করতে চাইবে তাদের অবস্থাও হবে এমনি। বিদ্রোহী, ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদের ওপর যখন আল্লাহর গযব নেমে আসবে তখন কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। আলোচ্য সূরার এ বর্ণনাটি আমাদের এ শিক্ষাই দিচ্ছে। সুস্পষ্টভাবে এ সূরাটি আমাদের জানাচ্ছে যে, মানুষের জীবন যখন এ ধরনের অহংকারী বিদ্রোহী শাসকের নিষ্পেষণে দুর্বিষহ হয়ে পড়ে, তখনই সত্যাশ্রয়ীদের জন্যে গায়বী মদদ এবং বিদ্রোহীদের জন্যে চূড়ান্ত ও অলংঘনীয় শাস্তি নেমে আসে।

১. দল বলতে বুঝায় দশ বা দশের ওপরের কোনো সংখ্যা। যেমন সূরা ইউসুফে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা বলেছিল, আমরা তো একটি দল। তারা সংখ্যায় ছিলো এগার জন। আর একটি পরিভাষা 'বিদউন-অর্থাৎ তিন থেকে নয়, সুতরাং দল (উসবাতুন) বলতে বিদউনের ওপরের যে কোনো সংখ্যাই হবে।

www.pathagar.com

এ কাহিনী থেকে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যখন কোনো এলাকায় অবিচার, দুর্নীতি ও পাপাচার সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়ে, ন্যায়নীতি কোণঠাসা হয়ে যায়, ন্যায়ের পক্ষে কথা বলার মতো কেউ থাকে না এবং হকপন্থীরা সম্পূর্ণভাবে অসহায় হয়ে পড়ে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার কুদরতী হাত প্রকাশ্যভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সকল উদ্ধত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসে। তখন কোনো সৃষ্টি জীবের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রকাশ্য সাহায্য মানুষের সামনে ভেসে ওঠে। অসত্যকে দমন এবং সত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে আল্লাহর গায়বী মদদ এ জন্যে নেমে আসে যে, তিনি সকল অন্যায় অবিচার নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সকল প্রকার সীমালংঘন করা থামিয়ে দেন।১

ফেরাউন ও কারূন এই দুই ব্যক্তির কাহিনীর মধ্যে মোশরেকদের সাথে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো তাতে সত্যের পক্ষে যথেষ্ট দলীল-প্রমাণ হাযির করা হয়েছে। এ প্রমাণপত্র এতোই উজ্জ্বল যে, কোনো ব্যক্তি বুঝতে চাইলে অতি সহজেই সত্যকে বুঝতে পারবে। যদি একবার অতীতের জাতিসমূহের কর্মকান্ড ও তাদের পরিণতির দিকে তাকায়, আর একবার যদি কেয়ামত সম্পর্কে চিন্তা করে, তাহলে তারা দেখতে পাবে কাহিনী দুটোর মধ্যে বর্ণিত প্রত্যেক ঘটনাই তাদের জন্যে উপকারী বলে প্রমাণিত হচ্ছে। সে দুই ব্যক্তির সাথে সংঘটিত ঘটনা তাদের আস্তে আস্তে সত্য পথের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, তাদের সামনে আল্লাহর অমোঘ নিয়মসমূহ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে।

---

১. সূরা 'তা-হা'-র মধ্যে এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা এসেছে। এমন এক সময় ছিলো যখন গোটা বনী ইসরাঈল জাতিকে যালেম ফেরাউনের হাতে তাদের হীনতা-দীনতার চরম মূল্য দিতে হয়েছে। সে বনী ইসরাঈল কওমের ছেলেদের এই অপরাধের কারণে হত্যা করছিলো যে, কোনো এক জ্যোতির্বিদ বলেছিলো, বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে এক ছেলে ভূমিষ্ঠ হবে যে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। ফেরাউন তাদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকছিলো এ জন্য যে, তাদের কেউ ক্ষমতার অন্তরায় হবে না, কিন্তু কুদরতের হাত কে রুখতে পারে? যার মাধ্যমে তিনি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন এবং শাস্তি দেবেন, তাকে তিনি ঠিকই বাঁচিয়ে রাখলেন। বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করার অপরাধে তাদের এই জরিমানা দিতে হচ্ছিলো। তাদের হীনতা-দীনতা ও চরম অপমানের যিন্দেগী কাটাতে হচ্ছিলো, সদা-সর্বদা এই ভয়-ভীতি তাদের লেগে থাকতো যে, আবার কোনো নতুন শাস্তি তাদের জন্য বরাদ্দ হয়ে যায় কিনা! এই দুঃসময়ে যারা মূসা (আ.)-এর সাথে থেকে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো এবং তাদের অন্তর ঈমানের আলোতে আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো– এই অপরাধের কারণে(?) যারা শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো, তারা সে অবস্থায়ও দমে যায়নি; বরং মাথা উঁচু করে তারা ফেরাউনের মুখের ওপর ঈমানের কথা উচ্চারণ করেছিলো। তখন তারা একটুও থতমত খায়নি, প্রকম্পিত হয়নি, কোনো দুশ্চিন্তাও করেনি, শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য কোনো নমনীয় ভাবও প্রদর্শন করেনি। আসলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা এ সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্যে তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন এবং তাদের অন্তর-প্রাণের মধ্যে তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বাণী প্রবিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সে অবস্থাটাই এখানে পাওয়া যাচ্ছে এবং সেটাই যথার্থ। এ সূরার প্রাসংগিক আলোচনাও এ কথার সাক্ষ্য বহন করে। সূরা ত্বা-হা-তেও কিছু শাব্দিক পার্থক্যসহ এই একই কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তির হাত যে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্যে তাদের সাহস যোগাচ্ছিলো, কিন্তু এ চরম অত্যাচারী অহংকারী যালেম বাদশাহর মুখের ওপর ঈমানের প্রকাশ্য ঘোষণা এবং হক কথা উচ্চারণ করার পরই আল্লাহর সর্বশেষ সাহায্য নেমে এলো।

www.pathagar.com

কি যুক্তিহীনভাবে মোশরেকেরা রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলছে, '(আপনার আনীত) হেদায়াতের পথ গ্রহণ করলে আমাদেরকে আমাদের যমীন থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে।' এসব কথা বলে আসলে তারা সত্য থেকে দূরে থাকতে চাইতো। সত্য গ্রহণ না করার জন্যে তারা নানা প্রকার খোঁড়া ওযর পেশ করতো। বলতো যে, দেশ থেকে উৎখাৎ হয়ে যাওয়ার ভয়েই তারা সত্য গ্রহণ করছে না। কারণ বাপ-দাদার আমল থেকে তারা যেসব পূজা পার্বণ করে আসছিলো, এখন সমাজপতি সমাজ নেতাদের কথা অমান্য করে সেগুলো বাদ দিলে এসব সমাজপতি ও নেতৃবৃন্দ তাদের মান সম্মান ভুলুণ্ঠিত করে অপমানজনকভাবে দেশ থেকে বের করে দেবে।

এ জন্যে এ সূরার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনাটি পেশ করেছেন, তাদের দেখিয়েছেন, নিরাপত্তা এবং ভয় কোত্থেকে আসে। তিনি উক্ত ঘটনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে মানুষকে এ কথা জানাচ্ছেন যে, যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর কাছে থেকেই নিরাপত্তা লাভ করা যেতে পারে। যখন মানুষ দেখে কোনোভাবেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না তখনই আল্লাহনির্ভর ব্যক্তিদের জন্যে অভাবনীয়ভাবে তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেমে আসে এবং তখন মানুষ মনের মধ্যে এক বেহেশতী নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তা অনুভব করে। একথা বুঝানোর জন্যেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন কারূনের ঘটনাটা তুলে ধরেছেন।

তাদের সম্পর্কে এসব তথ্য পরিবেশন করার পর বলা হচ্ছে, আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ কি তাদের জন্যে এই নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ শহরটি প্রতিষ্ঠিত করিনি আমার পক্ষ থেকে যাবতীয় জীবন ধারণ সামগ্রীর সমাবেশ ঘটানো হবে, কিন্তু (তবুও তাদের) অধিকাংশ মানুষ জানে না। এখানে তাদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যে মহান সত্ত্বা তাদের যাবতীয় ভয় ভীতি থেকে নিরাপদ রেখেছেন, তিনিই এই শহরটিকে মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ বানিয়েছেন, তিনিই তাদের জন্যে এই নিরাপত্তাকে চিরস্থায়ী করবেন, অথবা (তাদের নাফরমানীর কারণে) তিনি নিজেই তাদের এই নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করবেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা অহংকার ও নাশোকরীর পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আরো কতো কতো এলাকাবাসী তাদের প্রাচুর্য অহংকার করেছে, কিন্তু সে সকল এলাকায় পরে আর কেউই বসবাস করেনি- ......

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদের সকল আচরণের পরিণতি সম্পর্কে তাদের ভয় দেখাচ্ছেন এবং তাদের মধ্যে একজন রসূল পাঠিয়ে তাদের সতর্ক করছেন। ইতিপূর্বে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিয়ম অতীত হয়ে গেছে, সতর্ককারী কোনো নবী আসার পর যখন তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে তখন সেসব প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'...... আমি কোনো এলাকাকে ধ্বংস করি না যতোক্ষণ পর্যন্ত তার অধিবাসীরা যালেম না হয়ে যায়।'

www.pathagar.com

এরপর তাদের কাছে কেয়ামতের দিনের দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে, স্মরণ করানো হচ্ছে, যখন তাদের সে শরীকরা সব দূরে সরে যাবে এবং সেসব শেরেকের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক না থাকার কথা ঘোষণা করবে। অতপর দুনিয়ার আযাব সম্পর্কে সতর্ক করার পর তাদের আখেরাতের আযাবের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে, এর আগে তাদের জানানো হয়েছে, কখন কোন কারণে ভয়ভীতি আসবে, আর কখনই বা তাদের নিরাপত্তা দান করা হবে।

এরপর সূরাটির সমাপ্তি টানা হচ্ছে রসূলে করীম (স.)-এর সাথে আল্লাহর ওয়াদার কথা উল্লেখ করে। যখন মক্কাবাসী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে রসূল (স.) দেশ ছেড়ে চলে যাবেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি আবার তাকে তার দেশে ফিরিয়ে আনবেন, তখন তিনি তাকে শেরেকের বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে এবং তাঁর দেশবাসীর ওপর বিজয় লাভ করার ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করবেন। অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে রেসালাতের এ মহান দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন, যদিও ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে তিনি কোনো অনুমানই করতে পারেননি। মক্কাবাসীরা তাঁর দেশত্যাগ সম্পর্কে আঁচ করতে পেরে যখন তাঁর ও তাঁর সাথীদের ওপর অত্যাচার চরমভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, সে সময়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজেই তাঁকে সাহায্য করবেন বলে ওয়াদা দিচ্ছেন, শীঘ্রই তাকে তাঁর জন্মভূমিতে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে এবং সফলতা ও সাহায্যপ্রাপ্ত অবস্থায় আবার ফিরে আসবেন। আলোচ্য সূরার মধ্যে বর্ণিত কেসসাগুলোতে এ কথাগুলোর প্রতি অত্যন্ত জোরালোভাবে আভাস দেয়া হয়েছে। যেহেতু মূসা (আ.)ও এভাবে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বিতাড়িত হয়ে দেশ ত্যাগ করার পর সেই দেশে আবার এক নির্দিষ্ট সময়ের পর ফিরে এসেছিলেন। তিনি ফিরে এসে বনী ইসরাঈল জাতিকে দেশ থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের যুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্ত করেছিলেন, ফেরাউন ও তার লোকলশকর মূসা এবং তার নাজাতপ্রাপ্ত জাতির সামনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। জানানো হচ্ছে যে, এ ওয়াদা পূর্ণ হতে চলেছে, এবার শেষ ঘটনাটির কথা উল্লেখ করে সূরাটি সমাপ্ত করা হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে সর্বময় ক্ষমতার মালিক হিসেবে তোমরা ডেকো না। নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া। সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র তাঁর অস্তিত্ব ছাড়া। হুকুম দেয়ার মালিক একমাত্র তিনি, তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরাটির বাহ্যিক চেহারার দিকে তাকালে এবং এর আলোচ্য বিষয়গুলো সামনে রাখলে বুঝা যাবে, ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলোই হচ্ছে সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয়। সুতরাং এ সূরটির ওপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা রাখতে গিয়ে আমরা চারটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। মূসা (আ.)-এর কেসসা, পরবর্তীতে কি হলো সে বিষয়ে অনুসন্ধান, কারুনের কেসসা এবং মূল জায়গায় ফিরিয়ে নেয়ার এই শেষ প্রতিশ্রুতি ....।

www.pathagar.com

সূরা আল আনকাবুত

সূরা আনকাবুত মক্কী সূরা। কোনো কোনো বর্ণনায় প্রথম এগারো আয়াতকে মাদানী বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, এই এগারো আয়াতে 'জেহাদ' ও মোনাফেকীন' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। তবে এতদসত্ত্বেও আমাদের মতে এই সূরার মক্কী হওয়াই অগ্রগণ্য। ৮ম আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ওটা হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের ইসলাম গ্রহণ উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। পরবর্তীতে এ ঘটনার বিবরণ আসছে। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের ইসলাম গ্রহণ যে মক্কাতেই সংঘটিত হয়েছিলো, সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। আর এ আয়াতটা মতান্তরে মাদানী বলে কথিত এগারো আয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে পুরো সূরাটাই মক্কী মনে করা আমার কাছে অগ্রগণ্য। তবে এই আয়াতগুলোতে 'জেহাদে'র উল্লেখের কারণ সহজেই বুঝা যায়। কেননা জেহাদের উল্লেখ করা হয়েছে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রসংগে। অর্থাৎ মন দিয়ে জেহাদ করতে বলা হয়েছে, যাতে মোমেনরা ধৈর্য ধারণ করে এবং নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমান ত্যাগ না করে বসে। পূর্বাপর আয়াতগুলোর বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার। নেফাকের উল্লেখের ব্যাখ্যাও এভাবেই করা যায়। ঈমানের দাবীদারদের একটা শ্রেণীর অবস্থা তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য।

সূরাটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই ধরনের বর্ণনাভংগি পরিলক্ষিত হয়। প্রারম্ভিক বর্ণমালা 'আলিফ-লা-ম-মীম।' এরপর ঈমান ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বক্তব্য দিয়েই সূরার শুরু। অন্তরের অন্তস্তলে বদ্ধমূল যথার্থ ঈমানের পরিচয় ও দায়দায়িত্ব কী, সেটা দিয়েই সূরার সূচনা হয়েছে। বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ঈমান শুধু মুখ দিয়ে দাবী করার জিনিস নয়। ঈমান হচ্ছে কষ্টকর ও অপ্রীতিকর অবস্থার সামনে ধৈর্যের সাথে টিকে থাকাই এবং এর দায়দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করার নাম। কেননা ঈমানের পথ দায়দায়িত্বপূর্ণ ও কাঁটা বিছানো।

দুঃখ কষ্ট ও যুলুম নির্যাতন সহ্য করে ঈমানের পরীক্ষা দেয়া যে প্রত্যেক মোমেনের জন্যে অবধারিত, এ বিষয়টাই সম্ভবত এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। কেননা সূচনায় এ বিষয়ে বক্তব্য রাখার পর সমগ্র সূরা জুড়েই হযরত নূহ, ইবরাহীম, লূত, শোয়ায়ব, আদ, সামূদ, কারূন, ফেরাউন ও হামানের কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এসব আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় এটাই যে, ঈমানের দিকে দাওয়াত দেয়ার পরিণামে বিভিন্ন রকমের বাধাবিঘ্ন ও যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া সকল যুগে সকল প্রজন্মেই অনিবার্য।

এরপর এসব কাহিনীর ওপর পর্যালোচনা চালানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সত্য প্রকাশ ও হেদায়াতের বাণী প্রচারের পথে কিছু লোক ও কিছু শক্তি বাধার সৃষ্টি করে থাকে। এ সব শক্তির দাপট দেখে ঘাবড়ানো উচিত নয়। কেননা এদের প্রত্যেককেই শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা পাকড়াও করেছেন ও ধ্বংস করেছেন। বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

'প্রত্যেককেই আমি তার করা অপরাধের দায়ে পাকড়াও করেছি ...' (আয়াত ৪০)

আর এসব শক্তির উদাহরণ এমনভাবে দেয়া হয়েছে যে, এতে তাদের দুর্বলতা ও নগণ্যতা স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন – 'যারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের উদাহরণ মাকড়সার মতো। ......' (আয়াত ৪১)

এরপর যে সত্যের দিকে আল্লাহর নবীরা দাওয়াত দিয়েছেন আর আল্লাহর সৃষ্টিজগতে যে সত্য নিহিত রয়েছে, সেই উভয় সত্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে, আর সকল নবীর দাওয়াত ও মোহাম্মদ (স.)-এর দাওয়াতকে এক অভিন্ন দাওয়াত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা সবই আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। সবই আল্লাহর অনুগত হবার দাওয়াত। এ জন্যে সর্বশেষ কেতাব কোরআন সম্পর্কেও বক্তব্য এসেছে। মোশরেকরা এই বক্তব্য কিভাবে গ্রহণ করেছে তাও জানানো হয়েছে। মোশরেকরা শুধু এই কেতাবে সন্তুষ্ট হয়নি, এই কেতাবে বিশ্বাসীদের জন্যে যে উপদেশ, শিক্ষা ও অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে, তা তাদের কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি; বরং তারা অলৌকিক ঘটনাবলী দেখতে চেয়েছে এবং আল্লাহর আযাব তাড়াতাড়ি আসুক বলে দাবী জানিয়েছে, অথচ জাহান্নাম তো কাফেরদের ঘেরাও করেই রেখেছে।

তারা তাদের যুক্তিতে সব সময় স্ববিরোধী। একদিকে আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিয়ে মৃত পৃথিবীকে কে পুনরুজ্জীবিত করেছে, জিজ্ঞেস করলে তারা জবাব দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা করেছেন, আর জাহাজে চড়লে তারা কায়মনে আল্লাহকেই ডাকে। অথচ এ সব সত্তেও তারা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক মানে এবং মোমেনদের নির্যাতন করে।

মোশরেক ও মোমেনদের মধ্যে সংঘটিত এই তর্ক-বিতর্ক প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের তাদের জীবনাদর্শের নিরাপত্তার খাতিরে বিদেশে হিজরত করার আহ্বান জানিয়েছেন (আয়াত ৫৬) এবং এ ব্যাপারে মৃত্যু ও ক্ষুধার ভয় সম্পর্কে নির্ভীক থাকতে বলেছেন। কেননা, 'প্রত্যেক প্রাণীর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করা অনিবার্য'...... (আয়াত ৫৭) এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ও সকল প্রাণীর জীবিকা দিয়ে থাকেন।' .... (আয়াত ৬০)

সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের প্রশংসা এবং তাদের সৎপথে অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করে বলা হয়েছে।

'যারা আমার পথে জেহাদ করে, তাদের আমি অবশ্য অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ তায়ালা এসব সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন।' (আয়াত ৬৯)

এভাবে সূরার সূচনায় ও সমাপ্তিতে অপূর্ব মিল দেখতে পাওয়া যায়, সূরার পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর সূরার সূচনা ও সমাপ্তির মাঝে যে বিভিন্ন পর্ব রয়েছে, এর মধ্যে চমৎকার এককেন্দ্রিকতা এবং বিষয়গত সমন্বয় ও একাত্মতা পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

সমগ্র সূরায় আলোচ্য বিষয় কেন্দ্রীভূত হলেও সূরাটা তিন পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে ঈমানের প্রকৃত তাৎপর্য ও পরিচয়। নানা রকমের বিপদ মসিবতের আকারে ঈমানের পরীক্ষা আল্লাহর নীতি। মোমেন, কাফের ও মোনাফেকদের পরিণাম এবং অন্যদের বিপথগামী করার দরুন পাপের বোঝা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কেয়ামতের দিন প্রত্যেকের নিজ নিজ পাপের জন্যে নিজেকেই জবাবদিহি করার অপরিহার্যতা।

দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে ওপরে যেসব কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো। এসব কাহিনী থেকে ইসলামের দাওয়াতের পথে বিপদ ও বাধা-বিঘ্নের অনিবার্যতা সম্পর্কে প্রাপ্ত শিক্ষা এবং আল্লাহর শক্তির সামনে সেসব বাধা-বিঘ্ন আরোপকারীদের শক্তির নগণ্যতা সংক্রান্ত বক্তব্য। এই সাথে নবীদের দাওয়াত ও মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে যে একই মহাসত্য নিহিত রয়েছে, তাও তুলে ধরা হয়েছে। কেননা উভয়টাই আল্লাহর কাছ থেকে আগত।

তৃতীয় পর্বে কেতাবধারীদের মধ্যে যারা যালেম, তারা ছাড়া অন্য সবার সাথে কেবলমাত্র ভদ্রজনোচিত ও মার্জিত ভাষায় বিতর্ক করতে আদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের ধর্ম ও মোহাম্মদ (স.) আনীত ধর্ম যে এক ও অভিন্ন, সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে এবং সর্বশেষে আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জানানো হয়েছে নানা ধরনের পুরস্কার বিনিময়ের কথা।

সূরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বহু স্থানে ঈমানের তাৎপর্য সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা পাঠকের অনুভূতিতে শিহরণ জাগায় এবং তাকে ঈমানের দাবী অনুযায়ী কাজ করার অদম্য প্রেরণা যোগায়। ফলে সে হয় ঈমানের দাবী পূরণে সক্রিয় হয়ে ওঠে, নতুবা তা থেকে পিছু হটে যায় অন্যথায় মোনাফেকীর নীতি অবলম্বন করে, যা আল্লাহ তায়ালা শেষ পর্যন্ত ফাঁস করে দেন এবং তাকে অপমানিত করেন।

এ আলোচনায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করা হয়েছে তা এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো ছাড়া আর কোনো কিছু দ্বারা ফুটিয়ে তোলা যেতো না। তাই এখানে সে সম্পর্কে শুধু কিছু আভাস দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি।

সূরা আর রোম

এ সূরার প্রথম আয়াতগুলো একটা বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। ঘটনাটা ছিলো এই যে, আরব উপদ্বীপে রোম সাম্রাজ্যের যে অংশটুকু ছিলো, সেই অংশটি। রোম সাম্রাজের হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং তার ওপর পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়ী হয়। এ ঘটনাটা ঘটে তখন, যখন হিজরতের পূর্বে মক্কার মুসলমান ও মোশরেকদের মধ্যে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে বিতর্ক তুংগে উঠেছিলো। রোম সাম্রাজ্য ছিলো খৃষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত। খৃষ্টান সম্প্রদায় যে আল্লাহর কেতাব ইনজীল ও আল্লাহর

www.pathagar.com

নবী হযরত ঈসার অনুসারী, সে কথা সুবিদিত। পক্ষান্তরে পারসিকরা মোশরেক এবং অগ্নি উপাসক। তাই এই ঘটনায় মক্কার মোশরেকরা খুব খুশী হয়। তারা পারস্যের অগ্নি উপাসকদের বিজয়কে তওহীদের ওপর পৌত্তলিকতার বিজয়ের সমার্থক এবং মোমেনদের ওপর কাফেরদের বিজয়ের সংকেত হিসেবে গ্রহণ করে।

এ কারণে এই সূরার প্রথম আয়াত ক'টাতে ভবিষদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছরের মধ্যেই রোমকরা পুনরায় বিজয় ছিনিয়ে আনবে এবং তখন মুসলমানরা আনন্দিত হবে। কেননা মুসলমানরা মোশরেকদের ওপর আহলে কেতাবের বিজয় হোক এটাই পছন্দ করে।

কিন্তু কোরআন শুধু এই ওয়াদা ও এই ঘটনাতেই নিজের আলোচনা সীমিত রাখেনি। বরং সে নির্দিষ্ট ঘটনা থেকে শুরু করে ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী বক্তব্য পেশ করেছে। এ ক্ষেত্রে এটা ছিলো একটা উপলক্ষ মাত্র। এই উপলক্ষকে সামনে রেখে কোরআন মানব জাতিকে সমগ্র সৃষ্টির সাথে একীভূত করে, আল্লাহর নাযিল করা বিধানকে বিজয়ী করার ব্যাপারে আল্লাহর যে চিরন্তন ঐতিহ্য ও নীতি রয়েছে, তার সাথে সেই মহা সত্যের সংযোগ সাধন করে যার ওপর আকাশ ও পৃথিবীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, আর সংযোগ সাধন করে মানব জাতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝেও। তারপর ইহকালীন জীবনের পর পরকালীন জীবনের বিষয়েও আলোচনা করে। তাদেরকে প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করায়। আরো পর্যবেক্ষণ করায় মানব সত্তার আভ্যন্তরীণ ও সামগ্রিক অবস্থা এবং সৃষ্ট জগতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ। এই পর্যবেক্ষণের ফলে তারা এমন সব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, যা তাদের জীবনকে উন্নত করে, মুক্ত করে, উদার ও প্রশস্ত করে, তাদেরকে স্থান কাল ও পরিস্থিতির সংকীর্ণতা থেকে উদ্ধার করে। অতপর তাকে টেনে নিয়ে যায় সৃষ্টি জগতের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুপ্রশস্ত বিশালতা এবং প্রকৃতির নিয়মনীতি ও যোগসূত্রসমূহের দিকে।

এ জন্যে এই মহাবিশ্বে যাবতীয় সংযোগ ও সম্পর্কের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ে তাদের ক্ষমতার মান উন্নত হয়। তারা বুঝতে পারে যে, মহাবিশ্বকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী এবং মানব স্বভাব নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকারী বিধানসমূহ কতো বড়ো। তারা আরো বুঝতে পারে মানব জীবন ও তার ঘটনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকারী এবং জয় পরাজয়ের স্থান নির্ণয়কারী, আল্লাহর বিধিসমূহ কত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত। তারা আরো উপলব্ধি করতে পারে বিশ্ববাসীর কর্মকান্ডের ফলাফল ও মান নির্ণয়কারী, তাদের পার্থিব তৎপরতার মূল্যায়নকারী ও তার ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাতের কর্মফল নির্ধারণকারী দাঁড়িপাল্লা কেমন সূক্ষ্ম ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে।

এই উন্নততর, ব্যাপকতর ও প্রশস্ততর চিন্তা ও উপলব্ধির আলোকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামের এ দাওয়াত আসলে একটা বিশ্বজনীন দাওয়াত এবং তা সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত, যদিও এ দাওয়াত এক সময় মক্কায় আবির্ভূত হয়েছিলো এবং তার পাহাড় পর্বত ও উপত্যকাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। এ দাওয়াতের ক্ষেত্র এতো ব্যাপক বিস্তৃত যে, তা শুধু এই পৃথিবীর সাথেই যুক্ত নয়, বরং

www.pathagar.com

তা সমগ্র সৃষ্টি জগত ও তার প্রধান নিয়ম নীতির সাথে, মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সাথে এবং মানব জাতির অতীত ও ভবিষ্যতের সাথেও যুক্ত। এটা শুধু দৃশ্যমান এই পৃথিবী জুড়েই বিস্তৃত নয়, বরং আখেরাত পর্যন্তও বিস্তৃত।

অনুরূপভাবে এর সাথে প্রত্যেক মুসলমানের মনও জড়িত। এর ভিত্তিতে জীবন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে তার অনুভূতি ও ধ্যান ধারণাও গঠিত। এরই আলোকে তার দৃষ্টি পরিচালিত হয় আকাশ ও আখেরাতের দিকে, তার চার পাশের বিস্ময়কর ও রহস্যময় জগতের দিকে এবং তার সামনে ও পেছনে সংঘটিত ঘটনাবলী ও তার ফলাফলের দিকে। এরই আলোকে সে তার ও তার জাতির অবস্থা উপলব্ধি করে এবং মানুষের বিবেচনায় ও আল্লাহর বিবেচনায় নিজের ও নিজের আকীদা বিশ্বাসের মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন করে। অতপর সে সচেতনভাবে নিজের ভূমিকা পালন করে এবং পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করে।

সূরাটা সে সব সম্পর্ক ও সম্বন্ধের ওপর আলোকপাত করে এবং বিশ্ব প্রকৃতিতে ও মানব মনে তার নিদর্শনসমূহকে চিহ্নিত করে। সূরাটা দুটো পর্বে বিভক্ত, প্রথম পর্বে মুসলমানদের বিজয় এবং আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্টি যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর যে সত্যের সাথে ইহকাল ও পরকালের সমগ্র ব্যবস্থা জড়িত সেই সত্যের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। আর মানুষের মনকে পূর্ববর্তী মানুষদের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পরকালীন জীবনটাও যে অবিকল তদ্রূপ, সে কথাও জানানো হয়েছে। এ কারণে তাদের সামনে কেয়ামতের একটা দৃশ্য এবং কাফের ও মোমেনরা সেখানে কেমন কর্মফল পাবে তা দেখানো হয়েছে। পুনরায় প্রাকৃতিক দৃশ্য, নিদর্শন ও তার শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। অতপর মানুষের নিজের ও তার দাসদাসীর উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, শেরেক কতো নিকৃষ্ট ধরনের মতবাদ এবং কোনো সত্যের ওপর বা নির্ভুল জ্ঞানের ওপর তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নয়। এই পর্বের সমাপ্তি টানা হয়েছে রসূল (স.)-কে সত্যের তথা আল্লাহ তায়ালা যে স্বাভাবিক অবস্থার ওপর (ফেতরাত) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সেই পথ ও সেই অবস্থার অনুসরণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে। এই পথ কখনো পরিবর্তিত হয় না এবং তা কখনো কারো খেয়ালখুশীর অনুসারী হয় না। তাই এই পথের অনুসারীরা কখনো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না এখানে তেমন কিছু ঘটেনা প্রবৃত্তির অনুসারীরা।

দ্বিতীয় পর্বে দেখানো হয়েছে যে, পরিবর্তন ও স্থিতিহীনতা মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। কাজেই মানুষ যতোক্ষণ কোনো অটল ও অপরিবর্তনীয় বিধানের অনুসারী না হবে, ততোক্ষণ তার ওপর ভিত্তি করে কোনো জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। এই পর্বে সুখে দুঃখে, অভাবে ও প্রাচুর্যে মানুষের কী অবস্থা হয়, তাও দেখানো হয়েছে। এই প্রসংগে সম্পদের ব্যয় বন্টন ও উন্নয়নের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। অতপর পুনরায় শেরেক ও যাদেরকে শরীক মানা হয় তারা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করতে বা দিতেও পারে না, কাউকে বাঁচাতেও পারে না, মারতেও পারে না। জলে ও স্থলে দুর্যোগ ও বিপর্যয় সংঘটিত হওয়ার জন্যে মানুষের অপকর্মকে দায়ী করা হয়েছে এবং মানুষকে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে মোশরেকদের কী পরিণতি হয়েছে তা দেখতে বলা হয়েছে। এ

www.pathagar.com

জন্যে রসূল (স.)-কে কেয়ামত আসার আগেই স্বভাব ধর্ম ইসলামকে অবিচলভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতপর বিশ্ব প্রকৃতিতে বিরাজমান আল্লাহর নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করানো হয়েছে প্রথম পর্বের মতোই। এরপর এই বলে মন্তব্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যে পথ নির্দেশিকা দেন, সেটাই প্রকৃত পথ নির্দেশিকা। আর রসূল (স.)-এর কাজ প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। যারা আল্লাহর নিদর্শন চোখ দিয়ে দেখতে ও আল্লাহর বিধান কান দিয়ে শুনতে চায় না, সেই সব সেচ্ছাকৃত অন্ধ ও বধিরদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করেন না। এরপর মানুষের নিজের জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করে দেখানো হয়েছে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে শৈশবের দুর্বলতম মুহূর্ত থেকে মৃত্যু, পুনরুজ্জীবন ও কেয়ামত পর্যন্ত ধাপে ধাপে অগ্রসর করেন। অতপর কেয়ামতের একটা দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। এই সাথেই এই পর্ব শেষ ও সূরার সমাপ্তি হয়েছে। সমাপ্তির সময় রসূল (স.)-কে নিজের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ধৈর্য অবলম্বন করা, মানুষের নির্যাতন ও দুর্ব্যবহার সহ্য করা। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকর হবে-একথা বিশ্বাস করা এবং কোনোভাবেই যেন তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হন ও অবিশ্বাসীরা যেন তাকে হীনমন্যতায় আক্রান্ত করতে না পারে-সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সুরার সার্বিক পটভূমি ও ভাষা একত্রে মিলিত হয়ে এর প্রধান আলোচ্য বিষয়কে চিহ্নিত ও চিত্রিত করতে সহায়তা করেছে। সেই কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের বিভিন্ন অবস্থা, জীবনের বিভিন্ন ঘটনা মানব জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এবং প্রাকৃতিক জগতের উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন সংক্রান্ত আল্লাহর বিধানের মাঝে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক উদঘাটন। এই সম্পর্ক উদঘাটন করতে গিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, এ বিশ্ব জগতের প্রতিটি স্পন্দন ও প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ঘটনা ও প্রতিটি অবস্থা, প্রতিটি সূচনা ও প্রতিটি সমাপ্তি, প্রতিটি জয় ও প্রতিটি পরাজয়– পরস্পর একটা অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে ও অটুট বন্ধনে আবদ্ধ এবং প্রত্যেকটা একটা সূক্ষ্ম ও নিখুঁত আইন দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত। এর সব কিছুরই আদি অন্ত আল্লাহর হাতে। 'প্রথম ও শেষে সব কিছুই আল্লাহর হাতে।' এই বিষয়টার ওপরই সমগ্র কোরআনে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং একেই ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের মূল তত্ত্ব রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা এই মূলতত্ত্ব থেকেই যাবতীয় ইসলামের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, মূল্যায়ন ও মতাদর্শ আহরিত হয়েছে। এবং এই মূলতত্ত্ব ছাড়া কোন চিন্তাধারা ও কোনো মতাদর্শই নির্ভুল হতে পারে না।

সূরা লোকমান

পবিত্র কোরআন মানুষের সাথে তার বোধগম্য ভাষায় কথা বলার জন্য নাযিল হয়েছে। কেননা এই কোরআনকে তিনিই নাযিল করেছেন, যিনি মানুষের স্বভাব প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি জানেন তার স্বভাব-প্রকৃতির জন্য কোন কোন জিনিস উপযুক্ত এবং কোন্ কোন্ জিনিস তার স্বভাব প্রকৃতিকে বিশুদ্ধ রাখবে ও বিশুদ্ধ করবে,

www.pathagar.com

যিনি জানেন কোন উপায়ে তার অন্তরে কথা প্রবেশ করানো যাবে। মানুষের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতিতে ও সত্ত্বায় যে সত্য আগে থেকেই সুপ্ত ছিল এবং যে সত্যকে তার জন্মগত সত্ত্বা কোরআনের বক্তব্য শোনার আগে থেকেই জানে, সেই সত্যকেই তার সামনে তুলে ধরার জন্য কোরআন নাযিল হয়েছে। কেননা মানবসত্ত্বা ও মানবপ্রকৃতি তার প্রথম সৃষ্টিকালে মূলত এই সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সেই সত্যটা হলো আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও একত্বের স্বীকৃতি প্রদান এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণগানে মুখর সমুদয় সৃষ্টিজগতের সাথে একাত্ম হয়ে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও এবাদাত করা কিন্তু পরবর্তীকালে উল্লেখিত সত্যের ওপর তার স্বভাব প্রকৃতির প্রতিষ্ঠিত থাকা নানা কারণে কষ্টকর ও অনিশ্চিত হযে পড়ে। যে পৃথিবীর মাটিতে সে বাস করে। সেই মাটি থেকে উঠে আসা বাষ্প তার স্বভাব প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন ও নিস্ক্রিয় করে দেয়। তার রক্ত ও মাংস থেকে সৃষ্ট উত্তেজনা এবং তার প্রবৃত্তিজাত আবেগ উচ্ছাস ও কামনা-বাসনা তাকে বিপথগামী করে দেয়। আর এই বিপথগামিতা থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে আবির্ভূত হয় কোরআন। সে তার বোধগম্য ভাষা ও যুক্তি প্রয়োগ করে। যে সত্যকে সে ভুলে গেছে, সেই সত্যকে তার সামনে তুলে ধরে এবং সেই সত্যের ভিত্তিতে তার গোটা জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে। আর ইসলামী আকীদা ও আদর্শের প্রতি তার আনুগত্যকে, জন্মগত স্বভাব প্রকৃতির সাথে তার একাত্মতা ও সংহতিকে এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহর পথে তার যাত্রাকে মযবুত, অবিচল ও অভ্রান্ত করে।

কোরআন মানুষের সাথে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় কথা বলার যে চমকপ্রদ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে, আলোচ্য সূরাটা তার একটা নমুনা। উপরোক্ত সত্য থেকে ভ্রষ্ট মোশরেক জনগোষ্ঠীর মনমগজে আকীদা-বিশ্বাসের যে ভ্রান্তি ছিল, এ সূরা সে ভ্রান্তি দূর করে। সকল মক্কী সূরাই এই ভ্রান্তি দূর করতে নানাভাবে চেষ্টা চালায় এবং মানুষের সুপ্ত স্বভাব প্রকৃতিকে জাগ্রত করে। মানুষের মন-মগজকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার জন্য এ সূরা সর্বদিক থেকে অভিযান চালায়।

এই আকীদাগত বিভ্রান্তি দূর করে মহান সৃষ্টিকর্তার একত্ব, একক এবাদাত ও আনুগত্য নেয়ামতসমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা, আখেরাতে বিশ্বাস এবং আল্লাহর নাযিল করা বিধানের অনুসরণ এবং তা ছাড়া অন্য সমস্ত আকীদা বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান বর্জনের শিক্ষা দেয়া হয়।

সূরাটা এই শিক্ষাগুলো এমন ভংগিতে তুলে ধরে যে, তা উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট চিন্তা-গবেষণা করার প্রয়োজন। চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন মানবীয় মন-মগযকে উদ্বুদ্ধ করার কোরআনী ভংগি আয়ত্ত করার জন্য। আল্লাহ তায়ালার এবাদাত ও আনুগত্যের পথে মানুষকে আহ্বান করে-এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই ভংগি আয়ত্ত করা অত্যন্ত জরুরী।

সূরা লোকমানে আকীদাবিশ্বাস সংক্রান্ত এই শিক্ষাকে উপস্থাপন করা হয় কোরআনের চির পরিচিতি প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ এই বিশাল বিশ্বজগতের প্রেক্ষাপটে– যার ভেতরে রয়েছে আকাশ– পৃথিবী, চন্দ্র সূর্য, নক্ষত্র, রাত, দিন, সাগর মহাসাগর,

www.pathagar.com

মহাশূন্য, তরংগমালা, বৃষ্টি, গাছপালা ও তরুলতা ইত্যাদি। এই সৃষ্টিগুলো কোরআনে বারবার আলোচিত হয়ে থাকে। কেননা গোটা সৃষ্টিজগতের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের সত্যতা প্রমাণকারী নিদর্শনসমূহ। এসব নিদর্শন মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছে দেয় তাওহীদের মর্মবাণী। তার অন্তর্জগতকে আলোড়িত ও উজ্জীবিত করে এবং তার সামনে তার চলার পথ তুলে ধরে।

যদিও মূল শিক্ষা একই এবং উপস্থাপনের প্রেক্ষাপটও অভিন্ন, তথাপি এটা এ সূরায় চারবার চার পর্বে আলোচিত হয়েছে। প্রতিবারই তা সেই সুপ্রশস্ত অংগনে মানব হৃদয়কে আলোড়িত করে, প্রতিবারই তার সাথে থাকে মন-মগযকে প্রভাবিত করার নতুন উপাদান এবং প্রতিবারই তা নতুন নতুন প্রকাশভংগীতে উপস্থাপিত হয়। এই চারটা পর্ব বিশেষ যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করা উচিত। কেননা প্রত্যেকটা পর্বের সূচনা ও সমাপ্তি ঘটেছে এমন আশ্চর্যজনক পন্থায় যে, তাতে রয়েছে হৃদয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার মতো প্রচুর দরকারী উপাদান।

আরবী বর্ণমালার কয়েকটা অক্ষর দিয়ে সূরাটার উদ্বোধন হবার পর শুরু হয়েছে এর প্রথম পর্ব বা অধ্যায়। বর্ণমালার এ অক্ষরগুলোর তাৎপর্য হলো, এ ধরনের বর্ণমালা দিয়েই এই সূরাটা এবং এই বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াতসমূহ রচিত হয়েছে। এই আয়াতগুলো হচ্ছে হেদায়াতের উৎস এবং সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহর রহমত লাভের পথনির্দেশক। আর এই সৎকর্মশীল তারাই, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে। এভাবে আখেরাতে বিশ্বাস ও আল্লাহর এবাদাতের বিষয়ে বিতর্কের অবসান ঘটানো হয়েছে। এই সাথে একটা প্রেরণাদায়ক বক্তব্যও দেয়া হয়েছে। সেটা হলো, 'ওরাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সঠিক পথনির্দেশনার ওপর আছে এবং ওরাই সফলকাম।'

সফলকাম হতে চায় না এমন কে আছে? অবশ্য একটা মানবগোষ্ঠী রয়েছে, যারা নানা রকমের মনভোলানো কথাবার্তা কিনে আনে, যাতে মানুষকে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বিপথগামী করতে পারে এবং আল্লাহর আয়াতগুলোকে উপহাসের সামগ্রী হিসাবে গ্রহণ করে। আর এই মানবগোষ্ঠীর জন্যও উচ্চারিত হয়েছে আল্লাহর আয়াতগুলোর সাথে তাদের উপহাসের সাথে সংগতিশীল এক ভয়ংকর আতংকজনক হুমকি। সেটা হলো, 'তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।' অতপর এই গোষ্ঠীর অপতৎপরতার বিবরণ দেয়া হয়েছে এভাবে,

'যখন আমার আয়াতগুলো তার সামনে পড়া হয়, তখন সে অহংকারের সাথে পেছন ফিরে চলে যায় এবং এমন ভাব প্রকাশ করে যেন সে তা শুনতেই পায়নি।' এই বিবরণের সাথেও রয়েছে এমন একটা মনোজ্ঞ মন্তব্য, যা এই গোষ্ঠীটার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে। সেই মন্তব্যটা হচ্ছে, 'যেন তার দু'কানের মধ্যে বধিরতা রয়েছে।' এরপর আরো একটা হুমকি, 'তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ জানাও।' এখানে 'সুসংবাদ' কথাটার মধ্যে কী সাংঘাতিক কটাক্ষ রয়েছে লক্ষ্য করুন। অতপর পুনরায় মোমেনদের প্রসংগ তুলে তাদের সফলতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর আখেরাতে তারা

www.pathagar.com

কী প্রতিফল পাবে সেটাও এই সাথেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যেমন জানিয়ে দেয়া হয়েছে অহংকারী ও উপহাসকারীদের শাস্তির কথা। 'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে ভরপুর জান্নাত।' (আয়াত-৮ ও ৯)

অতপর এখানে মহাবিশ্বকে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রমাণ হিসাবে। এই প্রমাণ মানুষের স্বভাবগত সত্ত্বা এবং তার জন্মগত বিবেকবুদ্ধি ও মনমগযকে সর্বদিক থেকে ঘিরে ধরে। তাকে জোরদার ভাষায় সম্বোধন করে এবং যে সত্যকে জনগণ দেখেও অবহেলা করে সেই সত্যকে তার সামনে তুলে ধরে। যেমন– 'তিনি আকাশকে সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ছাড়া .... ' (আয়াত -১০)

আর এই প্রাকৃতিক প্রমাণগুলো উপস্থাপন করে চেতনাকে জাগ্রত করা ও অনুভূতিকে শাণিত করার পর আল্লাহ তায়ালার অনবদ্য সৃষ্টিকে দেখেও যারা শেরেকে লিপ্ত রয়েছে তাদের বিবেকে কষাঘাত করা হচ্ছে, 'এই হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি। এখন আমাকে দেখাওতো দেখি, অন্যেরা কী কী সৃষ্টি করেছে ....।' (আয়াত-১১)

এই সুগভীর, শাণিত ও অকাট্য প্রাকৃতিক যুক্তিটা পেশ করার মধ্য দিয়েই শেষ হচ্ছে সূরা লোকমানের প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়টা শুরু হয়েছে কতিপয় ব্যক্তির উক্তির মাধ্যমে। তবে আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার প্রেক্ষাপট এখানে অভিন্নই থাকছে। কেবল বর্ণনাভংগি ও উদ্বুদ্ধকর বক্তব্যের নতুনত্বই এখানে লক্ষণীয়।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, আমি 'লোকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম।' আর এই জ্ঞানের সারকথা হলো, 'আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করো।' এটাও জ্ঞান এবং এটাই বিজ্ঞজনোচিত পথ। পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে লোকমান কর্তৃক তাঁর ছেলেকে উপদেশ দান। এ হচ্ছে একজন জ্ঞানী লোক কর্তৃক নিজের ছেলেকে প্রদত্ত উপদেশ। এ উপদেশ দোষমুক্ত। উপদেশদাতাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। এ উপদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার অবকাশ নেই। কেননা কোনো পিতা তার সন্তানকে যে উপদেশ দেয়, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আরোপ করা যায় না। প্রথম পর্বে যেমন তাওহীদ ও আখেরাতের বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়েছে, এ উপদেশেও তেমনি। সেই সাথে রয়েছে অন্তরে উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী নতুন নতুন বক্তব্য।

'লোকমান যখন তার ছেলেকে উপদেশ ছলে বললো, 'হে বৎস, আল্লাহর সাথে শেরেক করো না। নিশ্চয় শেরেক একটা বড়ো মাপের যুলুম।' এরপর এই উপদেশকে জোরদার করা হচ্ছে আরো একটা উদ্দীপনাময় বক্তব্য দিয়ে যার মধ্যে দিয়ে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সম্পর্ককে এমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যে, স্নেহ ও মমতাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। 'আমি মানুষকে তার পিতামাতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছি। .... ' (আয়াত-১৪)

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহর শোকরকে পিতামাতার শোকরের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। 'আমার ও তোমার পিতামাতার শোকর করো।' অতপর আকীদা ও আদর্শের ক্ষেত্রে যে সর্বোচ্চ মূলনীতির উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, আদর্শিক সম্পর্ক বংশীয় ও

www.pathagar.com

রক্তীয় সম্পর্কের চেয়ে অগ্রগণ্য। বংশীয় ও রক্তের সম্পর্কে যতোই দৃঢ়তা ও স্নেহমমতা থাকুক না কেন, আকীদার সম্পর্কের পরেই তার স্থান। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'আর যদি তারা উভয়ে তোমাকে আমার সাথে কাউকে শরীক করতে চাপ দেয়। তা হলে তাদের আনুগত্য করো না। .... এর পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের মহত্ব, সুক্ষ্ণতা ও ব্যাপকতার এমন বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তা মানবীয় আবেগ-অনুভূতিতে শিহরণ জাগায়। ব্যাপকতর প্রাকৃতিক অংগনে লোকমান এ দৃশ্যটা তুলে ধরেছেন। (আয়াত-১৬)

এরপর লোকমান তার ছেলেকে আরো উপদেশ দেন ইসলামী আদর্শের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা সম্পর্কে এবং এই সমস্ত কাজ করতে গিয়ে ইসলামের অনুসারীকে যেসব দুঃখকষ্ট ও বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হতে হয় তার ওপর ধৈর্য ধারণ করা সম্পর্কে।(আয়াত ১৭)

এরপর ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সৎ কাজের আদেশ দান, অসৎ কাজের প্রতিরোধ এবং বিপদ মুসিবতে ধৈর্য ধারণের পাশাপাশি ইসলামের দাওয়াতদাতার আরো একটা জরুরী কর্তব্য হলো, মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার না করা। কেননা দুর্ব্যবহারের অর্থ দাঁড়াবে, নিছক মুখের কথা দ্বারা সমাজে যেটুকু সংস্কারের কাজ করার সুযোগ ছিলো তা নিজের আচরণ দ্বারা নষ্ট করলো। ১৯ ও ২০ নং আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে মুখমন্ডলকে বিকৃত করা, ভেংচি দেয়া, ভ্রুকুটি করা ইত্যাদির কঠোর নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। এ অধ্যায়ে আকীদার বিষয়টা সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ নতুন ভংগিতে ও নতুন আবেশে তুলে ধরা হয়েছে।

এরপর শুরু হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়। তাওহীদ ও আখেরাতের আকীদাটাকে আকাশ ও পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। সেই সাথে আকাশ ও পৃথিবীর সাথে এবং এ দুটোতে বিদ্যমান নেয়ামতগুলোর সাথে মানুষের সম্পর্কও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী ভাষায় আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই সব নেয়ামতকে মানুষের আয়ত্তাধীন করেছেন, অথচ তারা এর শোকর আদায় করে না। (আয়াত-২০)

এরই প্রেক্ষাপটে আয়াতের শেষভাগে আল্লাহ তায়ালাকে নিয়ে যে কোনরকম বিতর্কে লিপ্ত হওয়াকে প্রকৃতি বিরোধী ও ঘৃণ্য ব্যাপার বলে নিন্দা করা হয়েছে। বিকারমুক্ত ও কলুষমুক্ত বিবেক এ ধরনের আচরণকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। অতপর এ কুফরির আচরণের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ অব্যাহত রাখা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। (২১ নং আয়াত)

এটাকে বিকারগ্রস্ত ও নির্বোধসুলভ আচরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ বলে হুশিয়ারী জ্ঞাপন করা হয়েছে। আর এ কারণেই ২২ ও ২৩ নং আয়াতে আখেরাতের কর্মফল ও সেই কর্মফলের সাথে ঈমান ও কুফরের সম্পৃক্ততা দেখানো হয়েছে। এরপর ২৪ নং আয়াতে ভয়ংকর আযাবের হুশিয়ারী

www.pathagar.com

উচ্চারণ করা হয়েছে। অতপর অধ্যায়টা শেষ করার আগে মোশরেকদেরকে সৃষ্টি জগতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে এর স্রষ্টা কে তা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যার জবাবে মহান আল্লাহকে স্রষ্টা হিসাবে স্বীকার না করে তাদের উপায়ন্তর থাকে না। অবশেষে অধ্যায়ের শেষ আয়াত দুটোতে ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে এমন একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন জ্ঞান, সার্বভৌম শক্তি এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতকে ধ্বংস করে তা পুনরায় সৃষ্টি করতঃ আখেরাত প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়টা শুরু হয়েছে একটা বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনার মাধ্যমে। এ দৃশ্য মানুষের মনের ওপর একটা বিশেষ ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। এ দৃশ্যে রয়েছে রাত, যা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দিনের দেহের ভেতরে প্রবেশ করে ও বিলীন হয়ে যায়। আর রয়েছে দিন যা একইভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে রাতের দেহের ভেতরে ঢুকে যায় ও বিলীন হয়ে যায়। এ দৃশ্যে আরো রয়েছে চাঁদ ও সূর্য, যারা মহাশূন্যে নিজ নিজ কক্ষপথে নিতান্ত অনুগত হয়ে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রদক্ষিণ করে। সেই সময়সীমা কী, তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন, যিনি সূর্য চন্দ্র, আকাশ পৃথিবী, মানুষ ও মানুষের যাবতীয় কাজ-সম্বন্ধে সম্যক অবগত। (আয়াত, ২৮-২৯)

এরপর মানুষকে দেয়া আল্লাহ তায়ালার অন্য একটা নেয়ামতের কথাও স্মরণ করানো হয়েছে। এ নেয়ামত হলো সাগরে চলাচলকারী নৌকা বা জাহাজ। (আয়াত-৩০) অতপর ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যে সময়ে তারা সাগরের ভয়াবহ তরংগমালার সম্মুখীন হয়, ক্ষমতার দর্প চূর্ণ হয় এবং বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞান বিজ্ঞান তাদেরকে আল্লাহদ্রোহী বানিয়েছে, সেই বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে তাদের আর কোনো অহংকার থাকে না, সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এ যুক্তি খুবই ধারালো ও যুৎসই। এ যুক্তি দ্বারা তাওহীদের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। (আয়াত নং ৩২ দেখুন)

সমুদ্রের ভয়ংকর তরংগমালার সাথে সামঞ্জস্য থাকার সুবাদে ৩৩ নং আয়াতে তাদের কেয়ামত ও আখেরাতের অধিকতর ভয়াল অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে এ আয়াত আখেরাতের সত্যতা প্রমাণ করে। বস্তুত আখেরাত এমন আতংকজনক জায়গা, যা সবচেয়ে ঘনিষ্ট ও অবিচ্ছেদ্য রক্ত সম্পর্কীয় বন্ধনগুলোকে পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

অতপর যে আয়াত দ্বারা সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে, তাতে কেয়ামতের সময়, বৃষ্টি বর্ষণ, মাতৃগর্ভের ভ্রুণের ভবিষ্যত অবস্থা তথা তার জ্ঞান বুদ্ধি জানা, মানুষের আগামী দিনের উপার্জন এবং তার মৃত্যুর স্থান-এই কটা বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।

এই চারটে অধ্যায় এগুলোর নিজস্ব বর্ণনাভংগি, উদ্দীপক বক্তব্যসমূহ, যুক্তিপ্রমাণ ও নিদর্শনাবলীসহ, মানব হৃদয়কে উদ্বুদ্ধকরণে কোরআনের গৃহীত কৌশলের প্রকৃষ্ট নমুনা। যিনি হৃদয়গুলোর স্রষ্টা, যিনি হৃদয়গুলোর উপযুক্ত কৌশল ও ভাষা সম্পর্কে অবগত, তিনিই এই কৌশল নির্ধারণ করেছেন।

www.pathagar.com

এবার আমরা এই চারটি অধ্যায়কে দুটো অধ্যায়ে ভাগ করে এর আয়াতগুলোর তাফসীরে মনোনিবেশ করবো। কেননা এর প্রত্যেক দুটো অধ্যায়ের মধ্যে গভীর সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

সূরা আস সাজদা

মানব প্রকৃতির মধ্যে যে সঠিক আকীদা ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলার জন্যে আল কোরআনের মধ্যে ইতিপূর্বে মর্মস্পর্শী আহ্বানের যে সব আদর্শ নমুনা পেশ করা হয়েছে আলোচ্য সূরার মধ্যে সেই রকমেরই আর একটি নমুনা পেশ করা হলো, যা হৃদয়ের মধ্যে পুরোপুরিই গেঁথে যায়; আর তা হচ্ছে, একমাত্র এক ও নিরংকুশ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার কথা, যিনি মানবজাতিসহ গোটা বিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তাঁর সামনে আনুগত্যের মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়া। একথা মেনে নেয়া যে তিনিই গোটা সৃষ্টিজগতের সব কিছুর পরিচালক এবং এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর রেসালাত অবশ্যই সত্য; আর এ কথাও মেনে নেয়া যে মানবমন্ডলীকে আল্লাহ তায়ালার দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তাঁকে পথ প্রদর্শক হিসাবে পাঠানো হয়েছে। এটা বিশ্বাস করা যে পুনরুত্থান দিবস আছে, একদিন কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, হিসাব-নিকাশ হবে এবং যার যা পাওনা তা পুরোপুরিই তাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে।

আলোচ্য সূরার মধ্যে এসব আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে, আর মক্কায় অবতীর্ণ সকল সূরাতেই বিশেষভাবে অদৃশ্য এসব আকীদা গ্রহণ করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। মূল কথাটির প্রতি সকল মানব-হৃদয়কে আকৃষ্ট করা হয়েছে তা হচ্ছে সবাইকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, এ কথাগুলো সেই মহান সত্ত্বার কাছ থেকে নাযিল হয়েছে যিনি সর্বজ্ঞ এবং সব কিছুই যাঁর জ্ঞান ভান্ডারের মধ্যে রয়েছে। সারাবিশ্বের সকল মানুষের অন্তরের মধ্যে যে চিন্তাস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সে সবের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ যাবতীয় অবস্থার খবর একমাত্র তিনিই রাখেন। তিনিই জানেন সে চিন্তাধারার বাঁকে বাঁকে কতো জটিলতা রয়েছে এবং সেসব চিন্তাস্রোত জীবনের গিরি সংকট ও নানাবিধ বন্ধুর পথ অতিক্রম করার সময় কতো প্রকার বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়, তিনিই জানেন কোন বলিষ্ঠ যুক্তি এসব বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে প্রভাবিত করে ও এককেন্দ্রিক করে এবং অনুকূল ও প্রতিকূল সকল পরিস্থিতির মধ্যে কোন মহামূল্যবান কথা এসব চিন্তাবিদদের হৃদয়ে সাড়া জাগায়।

সূরা আস সাজদা আকীদার বিষয়গুলোকে এমন কিছু নতুন এবং অভিনব পদ্ধতিতে পেশ করেছে যা এর পূর্বে অবতীর্ণ সূরা লোকমান পেশ করেনি। এ বিষয়ক কথাগুলোকে প্রথম দিককার আয়াতগুলোর মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে, পরে এসব কথাকে ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ ভাষা ও পদ্ধতিতে মানবহৃদয়ের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যেন অমিয় এ সুধা গাফলতির ঘুমে নিদ্রিত কলবগুলোকে জাগিয়ে তোলে, সত্যের প্রদীপ্ত প্রভায় আত্মাগুলোকে আলোকিত করে, সংসার জীবনের

www.pathagar.com

ঘূর্ণাবর্তে পতিত পেরেশান এবং নগদ প্রাপ্তিতে মুগ্ধ হৃদয়গুলোকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য করে। ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলে, যেমন করে পূর্বে অবতীর্ণ অন্যান্য বহু সূরার মধ্যে সৃষ্টি বৈচিত্রের এসব বিষয়ের ওপর বহু যুক্তি ও প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। মানবসৃষ্টির সূচনা ও পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; আলোচনা এসেছে আখেরাতের সেই দৃশ্য সম্পর্কে, যার মধ্যে জীবন ও জীবনের স্পন্দন থাকবে, আলোচনা করা হয়েছে অতীতের সেই স্বার্থ সন্ধানী ক্ষমতাধর ও বলদর্পীদের করুণ পরিণতি সম্পর্কে, যার বিবরণ মানুষের অন্তিম অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য করে।

ওপরে বর্ণিত সূরাটির ভূমিকার সাথে সাথে আরও যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, সূরাটি পাঠকালে অন্তরের মধ্যে প্রচন্ড এক ভীতির সঞ্চার হয় এবং নিজের অজান্তেই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে মাথা নুয়ে পড়ে, সকল অহংকার ও আত্মম্ভরিতা দুর হয়ে যায়। অপর দিকে সত্যকে অস্বীকারকারী অন্তর, ওপরের বর্ণনার সংস্পর্শে এসে আরও বিদ্বেষী, আরও কঠিন এবং আরও জিদ্দী হয়ে যায়; এই জন্য এ উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের পরিণতি সম্পর্কে এমনভাবে জানানো হয়েছে যেন ভালো ও মন্দ সকল ব্যক্তির শেষ পরিণতির ছবিগুলো তাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে ভাসতে থাকে।

আলোচ্য সূরার মধ্যে পেশ করা প্রত্যেকটি বর্ণনা ও দৃশ্যই এমন কিছু বিষয়ের দিকে মানব হৃদয়কে আকৃষ্ট করে যা তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষকে চাংগা করতে থাকে এবং নিদ্রায় ঢলে পড়া মানুষকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলে ও চিন্তা-ভাবনা করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করে।

আলোচনা প্রসংগে দেখা যাচ্ছে যে, গোটা সূরাটিকে চার বা পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, যার প্রত্যেকটি পাশাপাশি অবস্থিত এবং একটি শেকলের মাধ্যমে তা পরস্পরের সাথে জড়িত। সূরাটি শুরু হচ্ছে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অক্ষর; 'আলিফ লাম ও মীম' দিয়ে। এর দ্বারা আল কোরআন জানাতে চায় যে এই অক্ষরগুলোর শ্রেণী থেকেই আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং এগুলো দ্বারাই আল্লাহর কাছ থেকে আল কোরআনের অবতরণ ও ওহী স্বরূপ আসা নিয়ে সকল সন্দেহের অপনোদন হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত সবই রসূলের শিক্ষা এবং তাঁর রব-এর পক্ষ থেকে আগত বাণী সবই এক, যেন এর দ্বারাও রসূল তাঁর জাতিকে সতর্ক করতে পারেন এরশাদ হচ্ছে, 'যেন তারা হেদায়াত পায়'

আর এইটিই হচ্ছে আকীদার বিষয়গুলোর মধ্যে প্রথম বিষয়, অর্থাৎ ওহীর আগমন এবং বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলামীন সম্পর্কে মানুষকে জানানোর জন্য রসূলুল্লাহ (স.)-এর বার্তাবাহক হওয়ার সত্যতা।

এরপর পেশ করা হচ্ছে সারা জাহানের মালিক, সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং জীবন-মৃত্যুর একমাত্র ফায়সালা দাতা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এবং অস্তিত্বের বুকে তাঁর শক্তি ক্ষমতা ও যাবতীয় গুণাবলী ছড়িয়ে থাকার বিষয়, যা আকাশমন্ডলী পৃথিবী

www.pathagar.com

এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু বর্তমান রয়েছে সে সবকে বাস্তবে অস্তিত্ব দান করার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টির বুকে বিদ্যমান এ সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালার শক্তির বহিপ্রকাশ ঘটেছে। পরিশেষে এগুলো সব কিছু যে তাঁর কাছে ফিরে যাবে ও অবশেষে তাঁর কাছেই সবাইকে চলে যেতে হবে, আলোচ্য সূরাতে এ কথাগুলোকে হৃদয়ংগম করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ....এরপর আরও বেশী দৃষ্টি আকর্ষণীয় যে বিষয়টি পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে; মানবসৃষ্টির সূচনা ও দুনিয়ার বুকে তার বিস্তার দান এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলছে এবং তাকে কান, চোখ ও বুঝ শক্তি দেয়া হয়েছে যেন সেগুলোর দিকে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আর এসব সত্ত্বেও মানুষ খুব কমই আল্লাহ তায়ালার শোকরগোযারি করে

এবারে এখানে দ্বিতীয় বিষয়টিকে পেশ করা হচ্ছে; আর তা হচ্ছে জীবন মৃত্যুর মালিক ও সকল ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর গুণবৈশিষ্ট সম্পর্কে জানানোর কাজ। এই 'উলুহিয়্যাৎ' শব্দটির মধ্যে যে গুণগুলো লুকিয়ে রয়েছে তা হচ্ছে; সৃজনী ক্ষমতা, পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষমতা, এহসান করার ক্ষমতা, পুরস্কার দানের ক্ষমতা, সকল জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার গুণ, দয়ামায়া মমতা ইত্যাদি আর এসব বিষয়ই ইতিপূর্বে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি ও পালন সম্পর্কিত আলোচনার প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর আসছে পুনরুত্থানের বিষয়টি; অর্থাৎ এ পার্থিব জীবন শেষে অবশ্যই মৃত্যু আসবে, তারপর এক নির্দিষ্ট সময় পর আল্লাহ তায়ালার হুকুমে সবাইকে আবার যিন্দা হয়ে উঠতে হবে। এই বিষয়টির ওপরই সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে সন্দেহ জাগে যে, পচে গলে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার পর আবার শরীরের অণু-পরমাণুগুলো কিভাবে একত্রিত হবে? এটা এক অসম্ভব ব্যাপার ছাড়া আর কি? এ জন্য তাদের কথা উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে আল কোরআন বলছে,

'ওরা বলল, আমরা এ ধরার বুকে হারিয়ে যাওয়ার পর আবার কি নতুন এক সৃষ্টিতে পরিণত হবো?' এখানে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তাপূর্ণ কথা দিয়ে তাদের এ কথার জবাব দেয়া হয়েছে।

এবার আসছে তৃতীয় বিষয়টি। আর তা হচ্ছে কবর থেকে উঠে এসে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া আর এখানে এসে দেখা যায়, কেয়ামতের দৃশ্যসমূহের মধ্য থেকে একটি দৃশ্যকে পেশ করা হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে, 'স্মরণ করে দেখো সেই সময়ের কথা যখন অপরাধীরা তাদের রব এর কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে'—

এ সময়ে তারা আখেরাত সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করতে থাকবে এবং বলবে যে, তাদের কাছে সত্যের যে দাওয়াত পৌঁছানো হয়েছিলো তা অবশ্যই সত্য, তখন তারা এমন এমন আরও কিছু কথা বলতে থাকবে, যদি তারা দুনিয়ার জীবনে সে সব কথা বলতো তাহলে তাদের জন্য অবশ্যই জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হতো! কিন্তু এমন সময় তারা এ কথাগুলো বলবে যখন এতে তাদের

www.pathagar.com

কোনোই ফায়দা হবে না। তখন হয়ত তারা সে ভয়ানক দৃশ্য বাস্তবে দেখার পরেই এসব কথা বলবে। যেহেতু তখন এ দৃশ্যই তাদেরকে অলসতার নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলবে। কিন্তু হায়! সংশোধনের সকল সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পরই তাদের চেতনার উদয় হবে এবং তারা নিষ্ফল আক্ষেপের কথা বলবে। বলবে সেই মুহূর্তে যে মুহূর্তের খবর নবীর মাধ্যমে তাদেরকে পূর্বাহ্নে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তখন তারা নবীকে মিথ্যাবাদী বানিয়েছে এবং চরম হঠকারিতার সাথে তাঁর আনীত সত্যকে অস্বীকার করেছে।

এ প্রসংগে অনাগত সে কঠিন ও দুঃখ ভরা দিনের পূর্বাভাস দানের পাশাপাশি পৃথিবীর বুকে থাকাকালীন মোমেনদের জীবন কেমন ছিল তারও একটি উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরা হচ্ছে, এরশাদ হচ্ছে, 'প্রকৃতপক্ষে তারাই আমার আয়াতগুলোকে বিশ্বাস করে ....।'

এ হচ্ছে এক প্রাণ উদ্দীপক অবস্থার ছবি যা তাদের অন্তরের মধ্যে বিরাজমান মহত্ত্বের সাক্ষ্য বহন করে। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এসব পবিত্র দিল, আল্লাহভীরু ও আখেরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের জন্যে সে রোজ হাশরের কঠিন দিনে কি কি বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করে রেখেছেন সেই কথাটাকেই এখানে চমৎকারভাবে পেশ করছেন। পেশ করছেন তাদের কথা যারা শেষ রাতের অতি গভীর ও আরামের ঘুম ত্যাগ করে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালারই মোহব্বতে শয্যা ত্যাগ করে এবং তাঁকে ডাকতে থাকে ভয় ও বুকভরা আশা-আকাংখা নিয়ে। অতএব, সেসব নেক বান্দার জন্যে কেয়ামতের সেই ভয়ানক দিনে যে আনন্দঘন ও সুখময় পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া হবে, তা হবে আজকের এই ক্ষণস্থায়ী মানবমন্ডলীর ধারণা-কল্পনা থেকে বহু বহু উর্ধের বস্তু। এ অবস্থাটি জানাতে গিয়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে জানানো হচ্ছে, 'না, না কেউ জানে না, কোন ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে না, তাদের চোখ জুড়ানোর মতো কতো অসংখ্য মর্যাদার জিনিস সেখানে তাদের জন্য সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এসবই হবে তাদের অতীতের নেক কাজগুলোর প্রতিদান।'

এরপর খুব দ্রুতগতিতে আর একটি দৃশ্য সামনে আসছে যার মধ্যে পর্যায়ক্রমে মোমেনদের জন্য আমোদ প্রমোদে ভরা জান্নাত এবং মোনাফেকদের জন্যে আগুনে ভরা দোযখের কথা তুলে ধরা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অপরাধী চক্রের জন্যে আর একটি প্রচন্ড ধমকি প্রদান করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, তারা সে বেদনাদায়ক পরিণামের সম্মুখীন হওয়ার আগেই তাদেরকে পৃথিবীর বুকে অবশ্যই কিছু না কিছু শাস্তির মধ্যে ফেলা হবে।

এরপর মূসা (আ.)-এর দিকে কথার মোড় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে, জানানো হচ্ছে যে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.) ও মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে মানব মন্ডলীর মুক্তির জন্য সময়ান্তরে একই পয়গাম এসেছে। আলোচনা এসেছে মূসা (আ.)-এর কওমের ব্যাপারে, তাদের যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রচুর প্রশংসা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা অবশ্যই সঠিক পথে ছিলো এবং আল্লাহর বাণী নিয়ে তারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিলো।

www.pathagar.com

এ কাজ করতে গিয়ে তারা খুবই দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখিয়েছিলো, যার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের সারা বিশ্বের নেতা বানিয়ে দিয়েছিলেন। মূসা (আ.) ও তার কওমের এ বিবরণ পেশ করতে গিয়ে মোমেনদেরকে ইংগীতে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, সত্যের শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও মোহাম্মাদ (স.)-কে ও তাঁর আনীত দাওয়াতকে প্রতিহত করার হীন উদ্দেশ্যে তারা খোদ নবী (স.)-কে যেভাবে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছে, সেই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলায় মোমেনদেরকে পাহাড়ের মতো দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে, সকল অবস্থায় তাদেরকে অনেক অনেক সবর করতে হবে এবং বিরামহীনভাবে দিকে দিকে আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে হবে।

এখানে এই সাথে আর যে কাজটি করার জন্য ইংগীত করা হয়েছে, তা হচ্ছে; সারা জাহানের ইসলাম-দুশমনরা সত্যের বাতিকে নিভিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে জেনে বুঝে ইসলামের সাথে দুশমনি করছে এবং সকল যামানাতেই, নিছক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোনো শ্রেণীর সাথে ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার হীন চক্রান্তে তারা মেতে রয়েছে; অথচ এহেন সংগীন অবস্থায় তথাকথিত মুসলমানরা তাদের বাড়ীতে গাফেল হয়ে বসে থাকতে চায়, ইসলামী দাওয়াতকে অপরের নিকট পৌছে দেয়ার কোনো দায়িত্বই তারা অনুভব করে না। চিন্তা করে না যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জীব-জানোয়োর মতো শুধু খাওয়া পরা ও ফূর্তি করার জন্যই পয়দা করেননি, বরং তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার। এরপরও তাদের নিশিদিনের ব্যস্ততা চলছে শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী এ জীবনকে কেন্দ্র করেই। এ জন্যে তাদেরকে একবার পৃথিবীর যে কোনো এক ভূমির দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে দেখতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, 'তাকিয়ে দেখো হে মানবজাতি, গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো! কে এ মৃত যমীনকে (একবার মুর্দা বানিয়ে দেয়ার পর) পুনরায় যিন্দা করলো, কে এখানে প্রতিনিয়ত তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করে চলেছে! এইভাবে প্রাকৃতিক বিভিন্ন দৃশ্য ও অতীতের পাপিষ্ঠ জাতির ধ্বংসের দৃশ্যাবলী দেখে আশা করা যায়, মানুষ বুঝবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত দৃশ্য ও জীবন্ত দৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।

অতপর সূরাটি ওদের একটি কথার উদ্ধৃতি পেশ করার সাথে সমাপ্ত হচ্ছে,

'কখন আসবে এ বিজয়?' অর্থাৎ, ওরা সেই বিজয় দিবস সম্পর্কে সন্দিগ্ধ মন নিয়ে এ প্রশ্ন করে যে দিনে তাদের প্রতি শাস্তির ধমকিকে কার্যকর করা হবে এবং মোমেনরা বিজয় লাভে ধন্য হবে! ওদের এসব সন্দেহের জবাবে এবং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার সাথে বলা হচ্ছে যে, অবশ্যই মোমেনদের সফলতা এবং সত্যবিরোধীদের ওপর তাদের বিজয় আসবেই। রসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, তিনি যেন ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাদেরকে তাদের চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে ছেড়ে দেন।

www.pathagar.com

সূরা সাবা

ইসলামের প্রধান ও মৌলিক আকীদা আল্লাহর একত্ব, ওহীর সত্যতায় বিশ্বাস ও পরকালে বিশ্বাসই এই মক্কী-সূরাটার আলোচ্য বিষয়। এর পাশাপাশি এতে উক্ত প্রধান আকীদাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কতিপয় মৌলিক তত্ত্বের সত্যায়ন করা হয়েছে। সেই সাথে বলা হয়েছে যে, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি নয়, বরং ঈমান ও সৎকর্মই আল্লাহর কাছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রতিফল দানের ব্যাপারে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আর আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কোন শক্তি কোথাও নেই এবং আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর কাছে সুপারিশও করতে পারে না।

এ সূরায় যে বিষয়টার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে তা হলো পরকাল, কর্মফল এবং আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের সর্বব্যাপকতা, নির্ভুলতা ও সূক্ষ্মতা। এই দুটো পরস্পর সংশ্লিষ্ট বিষয়কে এ সূরায় বারবার বিভিন্ন ভংগীতে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরার ওপর তার প্রভাব পড়েছে।

যেমন পরকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'কাফেররা বলে আমাদের কাছে কেয়ামত আসবে না। তুমি বলো, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম, কেয়ামত তোমাদের কাছে অবশ্যই আসবে।'

কর্মফল সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের য়াতে তিনি কর্মফল প্রদান করতে পারেন .....'

এর কাছাকাছি অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, যারা কুফরি করেছে, তারা বলে, তোমাদের কি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেবো, যে তোমাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, তোমরা সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আবার নাকি তোমাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? ....'

এ ছাড়া কেয়ামতের বিভিন্ন দৃশ্য। কেয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রতি তিরস্কার, যে আযাবকে তারা মিথ্যা মনে করতো বা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতো, তার বিভিন্ন রূপও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন একটি দৃশ্য হলো, 'যদি তুমি দেখতে, যখন অত্যাচারীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, তখন দুর্বলেরা অহংকারীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মোমেন হতাম।' (আয়াত ৩১-৩৩)

এ সব দৃশ্য এ সূরার বিভিন্ন জায়গায় তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং এ দিয়ে সূরায় সমাপ্তিও ঘটেছে, যেমন 'যদি তুমি দেখতে, যখন তারা আতংকিত হবে ...' (আয়াত ৫১-৫৪)

আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপী জ্ঞান সম্পর্কে সূরার শুরুতেই বলা হয়েছে, 'যা কিছু ভূগর্ভে প্রবেশ করে, ভূ-গর্ভ থেকে বের হয়, আকাশ থেকে নামে ও আকাশে ওঠে, সবই তিনি জানেন।'

www.pathagar.com

কেয়ামতকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের জবাবে বলা হয়েছে, 'তুমি বলো, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ, কেয়ামত তোমাদের কাছে অবশ্যই আসবে ......' (আয়াত-৩)

আর সূরার শেষ ভাগে বলা হয়েছে, 'বলো, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সত্যকে নিক্ষেপ করেন তিনি অদৃশ্য জান্তা।' (আয়াত-৪৮)

তাওহীদ বিষয়ে সূরার শুরু করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা দিয়ে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সে সব কিছুর মালিক ....'

আর মোশরেকদেরকে একাধিকবার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে, 'বল, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যাদের প্রভুত্বের দাবী করো, তারা আকাশ ও পৃথিবীতে কনামাত্র জিনিসেরও মালিক নয়! ....'

এ আয়াতগুলোতে মোশরেকদের পক্ষ থেকে ফেরেশতা ও জ্বিনদের পূজা করার উল্লেখ রয়েছে এবং সেটা করা হয়েছে কেয়ামতের একটা দৃশ্য বর্ণনা প্রসংগে। যেমন, 'যেদিন মহান আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন অতপর ফেরেশতাদের বলবেন, এরা কি তোমাদের উপাসনা করতো? ....' (আয়াত ৪০-৪১) তারা ধারণা করতো যে, ফেরেশতারা তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে সুপারিশ করবে। এ ধারণা খন্ডন করা হয়েছে ২৩ নং আয়াতে।

যেহেতু তারা শয়তানের পূজা করতো, তাই সেই প্রসংগে হযরত সোলায়মানের ঘটনা এবং তার প্রতি জ্বিনজাতির অনুগত হওয়া তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কাহিনী ১৪ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। ওহী ও রেসালাত সম্পর্কে ৩১, ৪৩, ২৮ ও ৬ নং আয়াতে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

আর মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য এসেছে ৩৪ থেকে ৩৮ নং আয়াতে। এ সম্পর্কে ইতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে হযরত দাউদ (আ.)-এর কৃতজ্ঞ বংশধরের কাহিনী, সাবার দাম্ভিক ও কৃতঘ্নদের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। এতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদত্ত সৎকর্মের পুরস্কার ও অসৎ কর্মের শাস্তির প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছে।

অধিকাংশ মক্কী সূরাগুলোতে এই বিষয়গুলোই বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেক সূরায় মহাজাগতিক পরিবেশের বিবরণ দেয়ার মাধ্যমে এবং সেই সাথে বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য দ্বারা এ বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। সূরা সাবাতেও একই পন্থায় মহাজাগতিক পরিবেশের বিবরণ দেয়ার মাধ্যমে আকীদাগত সত্যগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। এই পরিবেশের মধ্যে রয়েছে সুবিশাল আকাশ ও পৃথিবী, অজানা ও অদৃশ্য ভয়াল জগত, ত্রাস সৃষ্টিকারী কেয়ামতের ময়দান, হৃদয়ের গভীরতম ও সূক্ষ্ম জগত, ইতিহাসের জানা ও অজানা অধ্যায় এবং ইতিহাসের বিরল ও বিস্ময়কর দৃশ্যসমূহ। এর প্রত্যেকটা জিনিসই মানবমনকে প্রভাবিত ও উজ্জীবিত করে, তাকে সচেতন করে ও সক্রিয় করতে সাহায্য করে।

www.pathagar.com

সূরার সূচনা থেকেই বিশাল মহাবিশ্বের, তাতে বিরাজমান আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলীর ও তাঁর সূক্ষ্ম ও সুপ্রশস্ত জ্ঞানের কথা আলোচিত হয়েছে। (আয়াত ২-৩)

যারা আখেরাত অস্বীকার করে, তাদের এ সূরায় বিভিন্ন গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের হুমকি দেয়া হয়েছে। ৯ নং আয়াত দেখুন।

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ফেরেশতাদের বা জ্বিনদের উপাসনা করে, তাদেরকে উচ্চতর ফেরেশতা জগতে অদৃশ্য সত্যের মুখোমুখী দাঁড় করানো হয়েছে। যেমন 'আল্লাহ তায়ালার কাছে তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সুপারিশ সফল হবে না ....।' (আয়াত ২৩)

আবার অন্যত্র কেয়ামতের মাঠে তাদেরকে ফেরেশতাদের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে, যেখানে কোনো ঝগড়া বা বিতর্কে লিপ্ত হবার অবকাশ থাকবে না। (আয়াত ৪০)

যারা রসূল (স.)-কে অস্বীকার করতো তাঁকে মনগড়া ওহী তৈরী করার দায়ে অভিযুক্ত করতো কিংবা বলতো যে, তাঁর সাথে একটি জ্বিন থাকে। তাদেরকে দাঁড় করা হয়েছে তাদেরই মন ও বিবেকের সম্মুখে। যাবতীয় কৃত্রিম আড়াল ছিন্ন করে ও মনের ওপর কৃত্রিম প্রভাব সৃষ্টিকারী কথাবার্তা বাদ দিয়েই এটা করা হয়েছে। (৪৭ নং আয়াতটি লক্ষ্য করুন।)

এভাবেই এ সূরাটা মানুষের উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোর চারপাশে কেন্দ্রীভূত রাখে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে কেয়ামতের একটা ভয়াবহ দৃশ্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়।

সূরাটার ও ব্যাখ্যাকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে তাকে পাঁচটা অধ্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। তবে প্রকৃতপক্ষে এ অধ্যায়গুলোর মাঝে কোন সুক্ষ্ম পার্থক্য নেই। এটাই এই সূরার বৈশিষ্ট।

সূরাটা শুরু হয়েছে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা দিয়ে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মালিক। যিনি চির প্রশংসিত এবং যিনি মহাজ্ঞানী ও পরম কুশলী। তারপর আল্লাহ তায়ালার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও প্রশস্ততম জ্ঞানের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে, যা কিছু যমীনে থেকে বের হয়, যা কিছু আকাশ থেকে নামে ও আকাশে উঠে যায়, সব কিছু সম্পর্কেই তিনি জানেন। এরপর বলা হয়েছে যে, তাঁর জ্ঞান এতো সূক্ষ্ম ও নির্ভুল যে, আকাশ ও পৃথিবীতে একটা ক্ষুদ্র কণা এবং তার চেয়ে ছোটো বা বড়ো কোনো জিনিসই তাঁর অজানা নয়। তাঁর জ্ঞান এতো সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি মোমেনদের ও আল্লাহ তায়ালার আয়াতগুলো নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্তদের যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে সক্ষম। সূরার অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, যারা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী, তারা নবীর প্রতি নাযিল হওয়া ওহীকে সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। আর যারা পরকালকে অস্বীকার করে তাদের নির্বুদ্ধিতায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাদেরকে চরম বিপথগামী ও আযাবের উপযুক্ত বলে মন্তব্য করা হয়েছে। উপরন্ত তাদেরকে এই মর্মে হুমকি দেয়া হয়েছে যে, তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি ধসিয়ে

www.pathagar.com

দিয়ে অথবা আকাশের ভাংগা টুকরো তাদের মাথায় ফেলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হতে পারে।

এভাবে প্রথম অধ্যায়টা শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে হযরত দাউদ (আ.)-এর সেই সব বংশধরের কথা, যারা আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতের জন্য আল্লাহ তায়ালার যথাযথ শোকর আদায় করে থাকে। পৃথিবীর বহু জিনিসকে হযরত দাউদ ও সোলায়মানের অনুগত ও বশীভূত করে দেয়া আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের অন্যতম নিদর্শন। এমন দুর্লভ নেয়ামত পেয়েও তারা কখনও দাম্ভিক বা অহংকারী হননি। এই সব অনুগত ও বশীভূত শক্তির মধ্যে জ্বিনও অন্তর্ভুক্ত। মোশরেকদের কেউ কেউ জ্বিনদের উপাসনা পর্যন্ত করে এবং তাদের কাছে অজানা ও অদৃশ্য খবর জানতে চায়। অথচ জ্বিনেরা অদৃশ্যের কোনো খবরই জানে না। হযরত সোলায়মানের ইন্তেকালের পরও তারা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ও লাঞ্ছনাকর কাজ করেছে। কেননা তিনি যে মারা গেছেন, সে কথা তারা জানতেই পারেনি। কৃতজ্ঞতাগুলো ছিলো দৃষ্টান্ত। যেমন সাবা সাম্রাজ্য ও তার রাণীর কাহিনী। আল্লাহ তায়ালার বিপুল নেয়ামত ও অনুগ্রহ ভোগ করেও তারা তার শোকর আদায় করেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'এর ফলে আমি তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি।' কেননা তারা শয়তানের আনুগত্য করেছিল। শয়তান তাদের ওপর কোনো জোর খাটায়নি; বরং তারা স্বেচ্ছায় তাকে নিজেদের নেতা ও পথপ্রদর্শক বানিয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সূচনা হয়েছে মোশরেকদেরকে এই মর্মে চ্যালেঞ্জ দেয়ার মাধ্যমে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যাদের তারা নিজেদের উপাস্য মনে করে, তাদের ডেকে আনুক ও তারা তাদের কতোখানি সাহায্য করতে পারে দেখুক। 'আসলে তারা আকাশ ও পৃথিবীতে একটা কণার সমানও শক্তি রাখে না এবং আকাশ ও পৃথিবীতে কোথাও তাদের বিন্দুমাত্রও অংশীদারিত্ব নেই......।' এই সব উপাস্য আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের জন্য একটু সুপারিশ করার ক্ষমতাও রাখে না, এমনকি তারা ফেরেশতা হলেও নয়। ফেরেশতারা সব সময় আল্লাহ তায়ালার আদেশের অনুগত এবং তারা তাঁর সামনে টু শব্দটিও করার সাহস রাখে না। এ অধ্যায়ের এক জায়গায় প্রশ্ন করা হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবী থেকে তাদের জীবিকা সরবরাহ করে কে? তারপর তার জবাব দেয়া হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জীবিকা সরবরাহ করেন এবং তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক। অতপর তাদের যাবতীয় বিরোধ আল্লাহ তায়ালার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং তিনিই তাদের সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন। এই অধ্যায়ের শুরুর মতো শেষেও আবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছে যে, যাদের তারা আল্লাহর শরীক বানায় তাদের দেখিয়ে দেয়া হোক। তারপর বলা হয়েছে, 'কখনো দেখাতে পারবে না।' বরং একমাত্র মা'বুদ হলেন আল্লাহ তায়ালা, যিনি মহাপরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞানী।

www.pathagar.com

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় একই সাথে ওহী ও রেসালাত, ওহী ও রেসালাতের সাথে কাফেরদের আচরণ, প্রত্যেক ইসলামী আন্দোলনের সাথে ইসলামের শত্রুদের আচরণ এবং তাদের জনশক্তি ও অর্থশক্তির গর্ব ও বড়াই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে, হিসাব নিকাশ ও কর্মফল প্রকৃতপক্ষে যে জিনিসগুলোর ওপর নির্ভরশীল, তা হচ্ছে ঈমান ও সৎকাজ, জনবল ও ধনবল নয়। সেই সাথে কেয়ামতের একাধিক দৃশ্যে ঈমানদার ও বেঈমানদের পরিণাম তুলে ধরে দেখানো হয়েছে কিভাবে বিভিন্ন দলমতের অনুসারীরা তাদের নেতৃবৃন্দকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। এই সব দৃশ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাদের আহ্বান জানানো হয়েছে যে, তারা যেন তাদের আসল স্বভাব ও প্রকৃতিকে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে পরিশুদ্ধ করে এবং রসূলকে প্রত্যাখ্যান না করে। যে রসূল তাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক চান না এবং যিনি মিথ্যুক নন, পাগলও নন, তাকে যেন অস্বীকার না করে। উভয় অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা হয়েছে কেয়ামতের একটা দৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে। আর সর্বশেষে সূরার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে কয়েকটা গুরুগম্ভীর বক্তব্যের মাধ্যমে, 'তুমি বলো, আমার প্রভু সত্য নিক্ষেপ করেন, তিনি যাবতীয় অদৃশ্য তত্ত্ব জানেন। বলো, সত্য এসে পড়েছে। অসত্য নতুন কিছু সৃষ্টিও করতে পারে না, পুনসৃষ্টিও করতে পারে না। বলো, যদি আমি পথভ্রষ্ট হই, তবে তো আমি পথভ্রষ্ট হয়ে নিজেরই ক্ষতি সাধন করবো, আর যদি আমি সৎপথের ওপর থাকি, তবে তা এ জন্য যে, আমার প্রভু আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। তিনি তো সব শোনেন এবং অতি নিকটে অবস্থান করেন।' অতপর কেয়ামতের একটা ভয়াল ও ক্ষুদ্র দৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

সূরা ফাতের

এই মক্কী সূরাটির ভাষায় ও বিষয়বস্তুতে যে বিশেষ ধরনের বিন্যাস রয়েছে, তার সাথে সূরা 'রাদ'-এর বিন্যাসের একটা নিকটতম সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। সূরাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের মনকে প্রভাবিত করে, ঝাঁকি দেয় এবং উদাসীনতা ও শৈথিল্য থেকে তাকে জাগিয়ে তোলে, যাতে সে সৃষ্টি জগতের বিশালতা ও চমৎকারিত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে, সমগ্র প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে ভাবতে পারে, তাঁর নেয়ামতসমূহ স্মরণ রাখে, তাঁর দয়া ও করুণাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করে, অতীতের কাফেরদের ইহকালীন ধ্বংস ও বিপর্যয় এবং পরকালীন শোচনীয় পরিণতিকে উপলব্ধি করে, মহান আল্লাহর অতুলনীয় বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলো, সৃষ্টি জগত, মানব জীবন, ইতিহাসের ঘটনাবলী ও মানবাত্মার গভীরতম প্রকোষ্ঠে মহান আল্লাহর সৃজনী হাতের নিদর্শনাবলী লক্ষ্য করার সময় তাঁর সামনে বিনয়াবনত হয় এবং এই অতুলনীয় বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলো ও তাঁর এসব নিদর্শনের মধ্য দিয়ে সে সৃষ্টিজগতে কার্যকর প্রাকৃতিক নিয়মাবলী, রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে প্রেরিত

www.pathagar.com

সত্য বিধান এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সুদক্ষ সুনিপুণ সৃজনী হাতের অখন্ড একত্ব দেখে তা অনুভব করতে পারে। আর এই সব কিছুই যেন এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায় সম্পন্ন হয়, যাতে কোনো অনুভূতিশীল হৃদয়ই সত্যের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত না হয়। সূরাটা এমন অখন্ড ও ঘনিষ্ঠ, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একক যে, একে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বিভক্ত করা কঠিন। কেননা পুরো সূরাটা জুড়ে একই বিষয় আলোচিত, মানব হৃদয়ের ওপর একই ঐকতান ঝংকৃত এবং প্রকৃতি, মানবাত্মা, জীবন, ইতিহাস ও পরকালের উৎস থেকে উদ্ভূত এই সত্য এর সর্বত্র উচ্চারিত, তাই এ সূরা মানব হৃদয়কে সর্বদিক থেকে ঈমান, প্রত্যয় ও বিনয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এ সূরার আয়াতগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলো একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহকেই সকল তৎপরতার শক্তির উৎস নির্ধারণ করে, তাঁর হাতকেই সকল তৎপরতার মূল শক্তিদাতা ও প্রেরণাদাতা হিসাবে চিহ্নিত করে এবং ঘোষণা করে যে, সব কিছুর সুতো তাঁর হাতেই নিবদ্ধ, তিনিই এই সুতো ছাড়েন বা টানেন, ঢিল দেন বা সংকুচিত করেন। কেউ এ ক্ষেত্রে তাঁকে বাধা দিতে পারে না, তাঁর সাথে শরীক হতে পারে না বা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না।

সূরার শুরু থেকেই এই বৈশিষ্ট্যটা আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই এবং শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। আমরা দেখতে পাই, এক মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী শক্তি এই মহাবিশ্বকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি করে,

'আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা'........ (আয়াত-১)

স্রষ্টা হওয়ার সুবাদে সৃষ্টির ওপর তাঁর এই জোরদার নিয়ন্ত্রণ আবার তাঁর দয়ালু হওয়ার কারণে শিথিলও হয়। তখন আল্লাহর দয়া করুণা মুষলধারে বর্ষিত হয়। পুনরায় সেই করুণার ধারাও নিয়ন্ত্রিত এবং বন্ধ হয়। এর কোনোটাতেই এখানে অন্য কারো কিছু করণীয়ও থাকে না।

'আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যে করুণাধারা উন্মুক্ত করেন, তা কেউ বন্ধ করতে পারে না, আর যা তিনি বন্ধ করেন তা কেউ পুনরায় চালু করতেও পারে না।......'(আয়াত-২)

হেদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহর এই করুণাধারা উন্মুক্ত করা অথবা বন্ধ করার ফল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন বিপথগামী করেন, যাকে ইচ্ছা করেন হেদায়াত করেন।'..... 'আল্লাহ তায়ালা যাকে চান শোনান। যারা কবরে আছে, তাদের তুমি শোনাতে পারবে না। তুমি তো সতর্ককারী মাত্র।' মহান আল্লাহর এই হাতই পার্থিব জীবন সৃষ্টি করে এবং পরকালে মৃতদেহকে পুনরুজ্জীবিত করে।

'আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্ত্বা, যিনি বাতাস প্রেরণ করেন, অতপর মেঘমালা চালু করেন....'(আয়াত-৯) এরপর ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সব সম্মান মর্যাদা কেবলমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য এবং এর একমাত্র উৎসও তিনি।

www.pathagar.com

'যে ব্যক্তি সম্মান চায় তার জানা উচিত যে, সকল সম্মান একমাত্র আল্লাহর।'......

১১ নং আয়াতের বক্তব্য এই যে, বিশ্বজগতের যাবতীয় সৃষ্টির নির্মাণ, বংশ বৃদ্ধি ও আয়ুষ্কাল নির্ধারণ সব কিছুরই সুতো আল্লাহর হাতে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে........ ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহর হাতেই রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর চাবিকাঠি এবং গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি আর আল্লাহর হাতই যে তার সুনির্দিষ্ট পন্থায় সমগ্র সৃষ্টিজগতে সক্রিয় রয়েছে এবং জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, মানুষ ও জীবজন্তুকে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করে, সে কথা বলা হয়েছে ২৭ ও ২৮ নং আয়াতে।

আর এই হাতই মানবজাতির বংশ বিস্তার ঘটায় এবং এক প্রজন্মকে আর এক প্রজন্মের উত্তরাধিকারী বানায়, এ কথা রয়েছে ৩২ ও ৩৯ নং আয়াতে। এই হাতই আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে, ৪১ নং আয়াতে এ কথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁর এই হাতই সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং আকাশ ও পৃথিবীর কেউ তাঁর এ কাজে বাধা দিতে পারে না।

মহান আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সূরার কয়েকটা বক্তব্য লক্ষণীয়; 'তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান' ...... 'তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়', 'সব জিনিসই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।' 'তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত', 'রাজত্ব কেবল তাঁরই', 'আল্লাহর কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তন', 'তিনি প্রতাপশালী ও ক্ষমাশীল', গুণগ্রাহী, 'তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী, সর্বোত্তম', তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সকল অদৃশ্য বিষয় জানেন', 'তিনি অন্তর্যামী' 'তিনি ধৈর্যশীল', 'তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান এবং তাঁর বান্দাদের তত্ত্বাবধায়ক।'

এসব বক্তব্য এবং এই সব আয়াত নিয়েই সূরাটা গঠিত, আর এগুলো দ্বারাই বুঝা যায় সূরার বৈশিষ্ট্য কি এবং মনের ওপর তা সাধারণভাবে কি প্রভাব বিস্তার করে।

সূরার এই সব বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমি একে ভালোভাবে বিশ্লেষণ ও হৃদয়ংগম করার সুবিধার্থে ছয়টা অংশে ভাগ করেছি। তবে প্রত্যেকটা অংশের বক্তব্য এতো সাদৃশ্যপূর্ণ যে, পুরো সূরাটা আসলে একটা অধ্যায় বলেই প্রতীয়মান হয়।

সূরা ইয়াসিন

এই মক্কী সূরাটা ঘন ঘন বিরতির সাথে ঝংকারপূর্ণ ছন্দময় ছোট ছোট আয়াতে পরিপূর্ণ। এজন্যে পঁয়তাল্লিশ আয়াত বিশিষ্ট পরবর্তী সূরা ফাতেরের চেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও এ সূরার আয়াত সংখ্যা তিরাশি। ঘন ও ঝংকারপূর্ণ ছন্দময় ছোট ছোট আয়াতের কারণে সূরাটা বৈশিষ্ট্যময় হয়ে আছে। এ কারণে সূরাটা স্নায়ুমন্ডলীর ওপর ক্রমাগত ধাক্কা ও ঝাঁকুনি দিতে থাকে। সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখানে ক্রমাগত যে দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, তা এর আয়াতগুলোর প্রভাব বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে সার্বিকভাবে পাঠকের মনে সূরার যে ছাপ পড়ে, তা অত্যন্ত গভীর, নিবিড় ও বিচিত্র।

www.pathagar.com

সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় অন্যান্য মক্কী সূরার মতোই। আকীদার ভিত্তি গড়া-ই এর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। শুরু থেকেই এতে আলোচিত হয়েছে ওহীর প্রকৃতি ও রেসালাতের সত্যতা, ইয়াসীন, বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম, তুমি অবশ্যই রসূলদের অন্যতম। তুমি নির্ভুল পথের ওপরে আছো। এ কেতাব মহাপরাক্রমশালী দয়াময়ের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে ....।' কিছুক্ষণ পরেই আসছে গ্রামবাসীর কাছে রসূলদের আগমনের ঘটনা। এ ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হলো ওহী ও রসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা। ঘটনায় এই পরিণামটা দেখানো হয়েছে কোরআনের নির্ধারিত রীতি অনুসারে।

নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ঘটনাবলীর সাহায্য নেয়ার ক্ষেত্রে কোরআন সব সময় এই রীতি অনুসরণ করে থাকে। সূরার সমাপ্তির কাছাকাছি গিয়ে সে এই বিষয়টার পুনরাবৃত্তি করে– 'আমি তাকে কবিতা শেখাইনি এবং সেটা তার জন্যে শোভনীয়ও নয়। এটা তো কেবল স্মরণিকা এবং সুস্পষ্ট কোরআন, যাতে সে সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতে পারে, যার ভেতরে এখনো উজ্জীবনী শক্তি রয়েছে, আর যাতে কাফেরদের ওপর আল্লাহর বাণী কার্যকর হয়।'

অনুরূপভাবে এ সূরায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং একত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এতে শেরেকের প্রতি ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে এমন এক মোমেন ব্যক্তির মুখ দিয়ে, যে রসূলদের ব্যাপারে নিজ জাতির সাথে তর্ক জুড়ে দিয়েছিলো। সে বলছিলো, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁর এবাদাত করবো না কী কারণে? অথচ তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।...... সূরার শেষভাগে এই বিষয় নিয়ে আবারো আলোচনা করা হয়েছে। তারা আল্লাহকে বদ দিয়ে কতকগুলো মাবুদকে গ্রহণ করেছে আর ভেবেছে যে, তাদেরকে সাহায্য করা হবে। অথচ তারা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়...........।'

যে বিষয়টার ওপর এ সূরায় সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে, তা হলো আখেরাত ও কেয়ামত। এ বিষয়টা সূরার একাধিক জায়গায় আলোচিত হয়েছে। যেমন সূরার প্রথম ভাগে রয়েছে, আমিই তো মৃতদের জীবন দেই, এবং তারা যা কিছু সৎকাজ করে তা ও তার ফলাফল আমি লিখে রাখি।...........'

গ্রামবাসীর ঘটনায় মোমেন ব্যক্তিটার ওপর যে শোচনীয় বিপর্যয় নেমে এসেছিলো, আয়াতে তার তাৎক্ষণিক প্রতিফল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে তার বেহেশতে প্রবেশকে, 'তাকে বলা হলো, বেহেশতে প্রবেশ করো। সে বললো, হায়, আমার জাতি যদি জানতো যে, আমাকে আমার প্রভু ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন'– সূরার মাঝখানে আবার আলোচিত হয়েছে। যেমন তারা বলে, 'এই প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে, যদি তুমি সত্যবাদী হও? তারা একটা চিৎকার ছাড়া আর কিছুরই প্রতীক্ষা করছে না ....' এরপর কেয়ামতের একটা পূর্ণাংগ দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। সূরার শেষভাগে এ বিষয়টা একটা সংলাপের আকারে বিবৃত হয়েছে, 'সে আমার কাছে একটা নমুনা

www.pathagar.com

তুলে ধরেছে আর নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে গেছে। সে বলেছে, হাড়গুলো মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর কে ওগুলো জীবিত করবে! বলে দাও, যিনি ওগুলো প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই এখন জীবিত করবেন। তিনি তো প্রত্যেকবারের সৃষ্টি সম্পর্কে অভিজ্ঞ।'

আকীদাকে তার ভিত্তিমূল থেকে গড়ে তোলার সাথে সংশ্লিষ্ট এসব যুক্তিতর্ক মক্কী সূরায় বার বার উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। তবে তা প্রত্যেকবার একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়। প্রতিবার তার পটভূমি ও বর্ণনাভংগিও হয় ভিন্ন রকমের এবং তার প্রভাবও পড়ে ভিন্ন ধরনের।

আলোচ্য সূরার এই সাড়া জাগানো বক্তব্যগুলো বিশেষভাবে কেয়ামতের দৃশ্যগুলো থেকে সংগৃহীত। তা ছাড়া এতে বর্ণিত কাহিনীটার বিভিন্ন দৃশ্য, তার সংলাপ ও বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা, যুগে যুগে যারা আল্লাহদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছে তদের ধ্বংসযজ্ঞ, রকমারি তাৎপর্যবহ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, যেমন উর্বর মাটিতে উর্বরতা ও জীবনীশক্তি সঞ্চারের দৃশ্য, দিনের আলো নিভে যাওয়ার পর রাতের অন্ধকার নেমে আসার দৃশ্য, সূর্যের নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণের দৃশ্য, চাঁদের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে পুরনো খেজুরের ডালের মত আকৃতি গ্রহণের দৃশ্য, অতীতের মানুষদের বংশধরকে বহনকারী জাহাজের দৃশ্য, মানুষের অনুগত পশুদের দৃশ্য সবই আলোচনায় এসেছে। সামান্য এক ফোঁটা বীর্য থেকে প্রবল প্রতাপান্বিত বাকপটু মানুষের জন্ম লাভের দৃশ্য এবং সবুজ গাছ থেকে আগুন জ্বলার দৃশ্য থেকে এগুলো সংগৃহীত।

এ সব দৃশ্যের পাশাপাশি আরো কিছু সাড়া জাগানো চিত্র রয়েছে, যা মানুষের চেতনাকে স্পর্শ করে ও জাগ্রত করে। তন্মধ্যে সেসব কাফেরের চিত্র অন্যতম, যারা ইসলামের দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি তাদের ঘাড়ের ওপর শেকল লাগিয়েছি, যা থুতনি পর্যন্ত চলে গেছে। ফলে তারা উর্ধমুখী হয়ে গেছে.......তারা দেখতে পায় না।' এর মধ্যে তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সত্ত্বার চিত্রও রয়েছে, যা আল্লাহর জ্ঞানের সামনে সমভাবেই উন্মোচিত। এর মধ্যে তাদের সৃষ্টি পদ্ধতির বিবরণও রয়েছে, যা একটা মাত্র শব্দের মধ্যেই সীমিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তিনি যখন কিছু চান তখন তার একমাত্র আদেশ হয়ে থাকে এই যে, তিনি বলেন, 'হও', আর তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।' এ সবই মানব হৃদয় স্পর্শকারী প্রভাবশালী উপকরণ। প্রকৃতির অংগনেও এগুলোর বাস্তব অস্তিত্ব মানুষ স্বচক্ষে দেখতে পায়। সূরার মূল ভাষ্যে এর বিষয়গুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করে পেশ করা হয়েছে।

প্রথম ভাগটা শুরু হয়েছে দুটো অক্ষর সহযোগে অর্থাৎ 'ইয়াসীন' এই নামে শপথ করার মধ্য দিয়ে। সেই সাথে শপথ করা হয়েছে যে, মোহাম্মদ (স.) অবশ্যই রসূল এবং তিনি অবশ্যই সঠিক পথের ওপর বহাল আছেন। সঠিক পথের ওপর বহাল থেকে তিনি দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী উদাসীন লোকদের সেই ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিচ্ছেন। সেই ভয়াবহ পরিণতি হলো যে, তারা আর কখনো হেদায়াতের পথ পাবে না এবং এ কথাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, ওহীর সতর্কবাণী শুধুমাত্র তাদের

www.pathagar.com

জন্যেই লাভজনক হয়ে থাকে যারা ওহীর স্মরণিকা অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখেও ভয় করে। ফলে তাদের হৃদয় হেদায়াতের যুক্তি প্রমাণগুলো ও ঈমানের আহ্বান গ্রহণ করার যোগ্য হয়ে ওঠে। এরপর রসূল (স.)-কে গ্রামবাসীর ঘটনা বর্ণনা করতে আদেশ দেয়া হচ্ছে, যাতে আল্লাহর নবীর দাওয়াত অস্বীকার করার পরিণাম কী হয়ে থাকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এর পাশাপাশি মোমেনের হৃদয়ে ঈমানের প্রকৃতি কিরূপ এবং ঈমানের সুফল কী হয়ে থাকে তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

এ জন্যে দ্বিতীয় অংশটা শুরু হচ্ছে সেই বান্দাদের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশের মধ্য দিয়ে, যারা অনবরতই রসূলদের প্রত্যাখ্যান করতে অভ্যস্ত, যারা প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংসের ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করে না এবং সৃষ্টি জগতে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর বিপুলসংখ্যক নিদর্শন দেখেও যাদের বিবেক জাগ্রত হয় না। সূরার ভূমিকায় বর্ণিত সেসব প্রাকৃতিক নিদর্শন এবং কেয়ামতের বিস্তারিত বিবরণও এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

তৃতীয় অংশে সূরার সব কটা আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হয়েছে। শুরুতেই বলা হয়েছে যে, মোহাম্মদ (স.) যে কোরআন নিয়ে এসেছেন তা কোনো কবিতা তো নয়ই, এমনকি কবিতার সাথে তাঁর কোনো সম্পর্কও নেই। এরপর আল্লাহর একত্বের কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। অতপর পৌত্তলিকতাকে ধিক্কার দিয়ে বলা হচ্ছে যে, যে সমস্ত মূর্তি তারা স্বয়ং সংরক্ষণ করে, তাদের তারা কিভাবে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের কাছে সাহায্য চায়? এ অংশে কেয়ামত ও আখেরাতের বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে। মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, প্রথম বার তাদের জন্ম হয়েছে বীর্য থেকে। এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এ জন্যে যেন তারা বুঝতে পারে, মাটিতে মিশে যাওয়া হাড়গোড় পুনরায় জীবিত করা প্রথম বারের জন্মের মতোই। এতে অবাক হবার কিছুই নেই।

এরপর শেষ কথাটা বলা হয়েছে এই যে, 'তিনি যখন কোন কিছু ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন 'হও', অমনি তা হয়ে যায়। অতএব সেই সত্ত্বার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, যাঁর হাতে যাবতীয় জিনিসের সর্বময় ক্ষমতা ও মালিকানা নিহিত এবং তাঁর কাছেই তোমরা সবাই ফিরে যাবে।'

সূরা আছ ছাফফাত

পূর্ববর্তী সূরার মতোই এই মক্কী সূরাটা ছোট ছোট আয়াত সম্বলিত, প্রভাব বিস্তারকারী, বিচিত্র দৃশ্য চিত্রণকারী, প্রচন্ডভাবে আঘাতকারী ও তীব্র আবেগ সৃষ্টিকারী বর্ণনার সমষ্টি।

অন্য সমস্ত মক্কী সূরার মতো এটাও অন্তরে ঈমানের আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে চায়, সব ধরনের শেরেকের কলুষতা থেকে অন্তরাত্মাকে মুক্ত ও পবিত্র করতে চায়। তবে আরবে প্রাচীনকাল থেকে বিরাজমান এক বিশেষ ধরনের শেরেকের

www.pathagar.com

মূলোৎপাটন-এর বিশেষ লক্ষ্য। এই বিশেষ ধরনের শেরেক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে তার উচ্ছেদ সাধনে নানাভাবে চেষ্টা চালানো হয়েছে। শেরেকের এই বিশেষ ধরনটা আরবের জাহেলী যুগে খুবই সমাদৃত হতো। ধারণাটা ছিলো এ রকম যে, মহান আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। তিনি জ্বিনদের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন এবং সেই স্ত্রীর পেটে ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান হিসেবে জন্ম নিয়েছিলো, আর এই ফেরেশতারা সবাই আল্লাহর মেয়ে। (নাউযু বিল্লাহ!)

এই ভিত্তিহীন কল্পকাহিনীর ওপর এই সূরায় প্রচন্ড আক্রমণ চালানো হয়েছে। এতে এই ধারণার প্রতি প্রচন্ড ধিক্কার দেয়া হয়েছে এবং একে অত্যন্ত জঘন্য ও একেবারেই ভুয়া অভিমত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর যেহেতু এ সূরার এটা একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়, তাই ফেরেশতাদের বিভিন্ন দলের উল্লেখ করেই সূরার সূচনা করা হয়েছে। 'শপথ তাদের, যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অতপর যারা ধমক দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করে, অতপর যারা মুখস্থ আবৃত্তি করে......... ' এর অল্প পরেই রয়েছে বিদ্রোহী শয়তানদের প্রসংগ, যাদের উর্ধ্বজগতের কাছে যাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্যে উল্কা নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হয়। উল্কা নিক্ষেপের ফলে তারা উর্ধ্বজগতে যা কিছু আলোচিত হয় শুনতে পায় না। জাহেলী সমাজে ভূত-প্রেত শয়তানদের যতোটা শক্তিশালী ও মর্যাদাশালী মনে করা হতো, তা যদি সত্য হতো, তাহলে এভাবে উল্কার ধাওয়া খেয়ে তাদের পালাতে হতো না। অনুরূপভাবে জাহান্নামে যে যাক্কুম গাছের ফল দিয়ে অত্যাচারীদের শাস্তি দেয়া হবে, তার আকৃতি শয়তানের মাথার মতো বলে শয়তানকে ধিকৃত ও নিন্দিত করা হয়েছে। সূরার শেষভাগে আবার সেই কল্পিত তত্ত্বের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালানো হয়েছে এভাবে, 'অতএব তাদের জিজ্ঞেস করো, তোমার প্রতিপালকেরই কি সমস্ত কন্যা সন্তান, আর ওদের সমস্ত পুত্র সন্তান? আমি কি তাদের চোখের সামনেই ফেরেশতাদের কন্যা হিসেবে সৃষ্টি করেছি? (আয়াত ১৪৯-১৫৮)

জাহেলী যুগের বিভিন্ন রকমের শেরেকের মধ্য থেকে এই বিশেষ ধরনের শেরেকটার সমালোচনা ছাড়া এ সূরায় সাধারণ মক্কী সূরাগুলোর ন্যায় অন্যান্য আকীদার বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্য দ্বারা তাওহিদী মতাদর্শের যথার্থতা প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমাদের মাবুদ একজন। তিনি আকাশ পৃথিবী, উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তার এবং পূর্ব দিকের প্রতিপালক।' (আয়াত ৪-৫)

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এখানে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন এই শেরেকই হবে আযাব ভোগ করার কারণ। 'তারা সেদিন একই সাথে কঠোর আযাব ভোগ করবে........।'

অনুরূপভাবে এ সূরায় পুনরুত্থান ও কেয়ামতের হিসাব নিকাশের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। যেমন 'তারা বলে, এতো সুস্পষ্ট যাদু। আমরা মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর আবার পুনরুজ্জীবিত হবো নাকি? .... ' এরপর এ প্রসংগে কেয়ামতের এক সুদীর্ঘ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

ওহী ও রেসালাতের বিষয়ে তাদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, 'আমরা একজন পাগল কবির জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো নাকি? অতপর এর জবাবে বলা হয়েছে, 'বরং সে সত্য নিয়ে এসেছে এবং রসূলদের সত্য প্রতিপন্ন করেছে।'

তাদের বিপথগামিতা ও প্রত্যাখ্যান প্রসংগে বেশ কয়েকজন নবীর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, তার পুত্ররা, মূসা, হারুন, ইলিয়াস, লূত ও ইউনুসের কাহিনী উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সব কাহিনীতে দেখানো হয়েছে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যানকারীদের আযাব দিয়ে পাকড়াও করে থাকেন। যেমন 'তাদের পূর্বে পূর্ববর্তীদের অধিকাংশই বিপথগামী হয়েছে। আমি তাদের কাছে সতর্ককারীদের পাঠিয়েছি। দেখো, তাদের কেমন পরিণতি হয়েছিলো। তবে আমার একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।'

এ সব কাহিনীর মধ্যে বিশিষ্টতার দাবী রাখে পুত্র ইসমাঈলের সাথে হযরত ইবরাহীমের কাহিনী। এ কাহিনীতে আছে হযরত ইসমাঈলকে যবাই করার চেষ্টা ও তার পবিবর্তে দুম্বা কোরবানী হওয়ার কথা। এতে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর কাছে আত্মসর্পণের সবচেয়ে বিস্ময়কর সবচেয়ে মহৎ দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এ আনুগত্য এতো উঁচুস্তরে পৌঁছেছে, যে একনিষ্ঠ ঈমান ছাড়া আর কোনোভাবে সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়।

সূরার আলোচিত বিষয়গুলো উপস্থাপনের সাথে সাথে যে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নের আয়াতগুলোতে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। প্রথমত আকাশ, গ্রহ নক্ষত্র, উল্কা ও উল্কা দিয়ে বিতাড়নের দৃশ্যে। যেমন, 'নিশ্চয় আমি সর্বনিম্ন আকাশকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি গ্রহ নক্ষত্র দিয়ে। প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে...........?

দ্বিতীয়ত কেয়ামতের দৃশ্যসমূহে, কেয়ামতের লোমহর্ষক ঘটনায়, তার নযিরবিহীন আকস্মিকতা এবং তার তীব্র প্রভাবের বর্ণনায় এ সূরায় যে দৃশ্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে, তা যথার্থই নযিরবিহীন। তৃতীয়ত বিভিন্ন কাহিনী ও তার শিক্ষা সংক্রান্ত মন্তব্যে, বিশেষত হযরত ইবরাহীম ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈলকে যবাই করার চেষ্টার ঘটনা হৃদয়ের মর্মমূলে প্রচন্ডভাবে ধাক্কা দেয়। এ ছাড়া ছন্দোবদ্ধ সূরের মূর্ছনা এ সূরার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা সূরায় বর্ণিত ঘটনাবলী, দৃশ্যাবলী, শিক্ষা ও নীতিমালার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূরাটি তার আলোচ্য বিষয়গুলো মোটামুটি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে পেশ করেছে।

প্রথম অংশটায় রয়েছে শপথের মাধ্যমে সূরার সূচনা। এই শপথ করা হয়েছে ইতিপূর্বে বর্ণিত কয়েক শ্রেণীর ফেরেশতার নামে। এই শ্রেণীগুলো হচ্ছে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, ধমক দিয়ে ভীতি সঞ্চারকারী ও আবৃত্তিকারী ফেরেশতারা। শপথ করা হয়েছে এই মর্মে যে, উদয়াচলসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।

www.pathagar.com

তিনি আকাশকে নক্ষত্রমন্ডলী দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। এরপর রয়েছে শয়তানের প্রসংগ, উর্ধ্বজগতের ফয়সালাগুলো তাদের আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা এবং তাদের উজ্জ্বল উল্কা দিয়ে বিতাড়িত করার বিবরণ। তারপর মানবজাতির কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে, সৃষ্টির দিক দিয়ে তাদের সৃষ্টিই কি জটিলতর, না আমার অন্যান্য সৃষ্টি? অর্থাৎ ফেরেশতা, আকাশ, গ্রহ নক্ষত্র, শয়তান ও উল্কা। এ প্রশ্ন দ্বারা তারা যা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব মনে করে তার বাস্তবতা প্রমাণ করা হয়েছে। এ জন্যে আখেরাতে পুনরুত্থান, হিসাব, বেহেশতের নেয়ামত ও দোযখের শাস্তির দীর্ঘ বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ বিবরণ যথার্থই নযিরবিহীন।

দ্বিতীয় অংশের শুরু হয়েছে যে বক্তব্যের মাধ্যমে তা হলো, এসব বিপথগামী লোকের (মক্কার মোশরেকদের) সাদৃশ্য অতীতের কিছু লোকের মধ্যে পাওয়া যায়। তাদের কাছেও নবী ও রসূলরা সতর্কবাণী নিয়ে আসতেন। তথাপি তাদের অধিকাংশই বিপথগামী থেকে যায়। এ ধরনের লোকদের মধ্যে রয়েছে হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা, হারুন, ইলিয়াস, লূত ও ইউনুস (আ.)-এর জাতিসমূহ। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের পরিণাম কেমন ছিলো এবং যারা ঈমান আনেনি তাদের পরিণাম বা কেমন হয়েছে, তা স্মরণ করতে ও চিন্তা করতে বলা হয়েছে।

তৃতীয় অংশে রয়েছে সেই ভিত্তিহীন কল্পকাহিনীর বিবরণ, অর্থাৎ জ্বিন ও ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর আত্মীয়তার কাহিনী। এতে আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতিরও উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি তাঁর রসূলদের বিজয়ী করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্যে ইতিপূর্বে আমার প্রতিশ্রুতি ছিলো যে, তাদের অবশ্যই সাহায্য করা হবে এবং আমার বাহিনীগুলো অবশ্যই বিজয়ী হবে।' এ অংশটা সূরার সমাপ্তি পর্যন্ত চলেছে, যেখানে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাঁর রসূলদের ওপর সালাম প্রেরণ করে মহান আল্লাহর দ্বারা বিশ্বজগতের প্রভুত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, এই হচ্ছে সূরার মূল আলোচ্য বিষয়।

সূরা ছোয়াদ

এই সূরাটা মক্কী। মক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত যেসব বিষয় আলোচিত হয়ে থাকে, এ সূরায়ও প্রধানত সেগুলোই আলোচিত হয়েছে। যেমন, তাওহীদ, মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে প্রেরিত ওহী এবং আখেরাতের হিসাব নিকাশ। এই তিনটি বিষয় সূরার প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বক্তব্যের ওপরে যে ১৬টা আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে, এগুলো নিয়েই সূরার প্রথম অধ্যায়। মক্কার নেতৃস্থানীয় মোশরেকদের যখন রসূল (স.) আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন, তাঁর কাছে ওহী নাযিল হয় বলে তাদেরকে জানাতেন এবং তাঁকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রসূলরূপে মনোনীত করার কথা অবহিত করতেন, তখন তারা যে বিস্ময় প্রকাশ করতো, সেটাই এ আয়াতগুলোর মূল আলোচ্য বিষয়। (আয়াত ৪-৮)

অনুরূপভাবে তারা এ দাওয়াত অস্বীকার করলে তাদের শাস্তি দেয়া হবে বলে যে হুমকি দেয়া হয়েছে, সেই হুমকির প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে। যেমন (আয়াত-১৬ বলা

www.pathagar.com

হয়েছে) 'তারা বললো! হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রাপ্য অংক হিসাবের দিনের আগেই দিয়ে দাও।'

আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওহী নাযিল করার জন্যে তাদের ভেতর থেকেই একজনকে বিশেষত আবদুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ (স.)-কে মনোনীত করতে পারেন এটা তাদের কাছে কল্পনাতীত ব্যাপার ছিলো। কেননা ইতিপূর্বে তিনি সমাজের কোনো পর্যায়ে কোনো নেতৃত্ব দেননি। এ জন্যে সূরার শুরুতে তাদের এই বিস্ময় প্রকাশের ওপর এবং তাদের 'আমাদের সবার মধ্য থেকে শুধু ওর ওপরই স্মরণিকা নাযিল হলো নাকি?' এই উক্তির ওপর মন্তব্য প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা পাল্টা প্রশ্ন রেখেছেন; 'তোমার পরম দাতা, মহাপরাক্রমশালী প্রভুর সমস্ত রহমতের ভান্ডার কি ওদের কাছে? অথবা আকাশ, পৃথিবীর রাজত্ব কি ওদের? তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে ওরা রশি ঝুলিয়ে আকাশে উঠে যাক।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নিজের দয়াবশত যখন তাঁর কোন মনোনীত ব্যক্তিকে কিছু দিতে চান তখন তা থেকে কেউ তাকে বিরত রাখতে পারে না। তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় কোনো মানুষেরই কোনো হাত নেই। তিনি তাঁর অনুগ্রহ ও জীবিকার যতোটুকু যাকে দিতে চান দেন। এই প্রসংগে হযরত দাউদ ও সোলায়মানের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে কি বিপুল অনুগ্রহে ধন্য করেছেন, নবুওত ও রাজত্ব দান করেছেন, পাহাড় ও পাখিদের তার হুকুমের অনুগত করে দিয়েছেন, জ্বিন ও বাতাসকে তার তাবেদার বানিয়েছেন, এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, দ্রব্যসামগ্রী ও পৃথিবীর অগাধ ধন সম্পদ তো ছিলোই।

এসব সত্তেও তারা উভয়ে নিছক মানুষ। মানুষ হিসাবে তারা স্বভাবসুলভ দুর্বলতা ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নন। কেবল আল্লাহর মেহেরবানী ও পৃষ্ঠপোষকতা তাদের দুর্বলতা অক্ষমতা দূর করে দেয়, তাদের তওবা ও আনুগত্য গ্রহণ করে এবং তাদের আল্লাহর পথে বহাল রাখে।

এই কাহিনী দুটোর সাথে সাথে রসূল (স.)-কে কাফেরদের পক্ষ থেকে আগত অত্যাচার ও নিপীড়নে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। উপদেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য কামনা করার। হযরত দাউদ ও সোলায়মানের কাহিনীতে এই শিক্ষাটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অনুরূপভাবে হযরত আইয়ুবের কাহিনীতেও আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাদের কিভাবে কঠিন বিপদ ও রোগব্যাধি দিয়ে পরীক্ষা করেন তার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। হযরত আইয়ুবের ধৈর্য অতি উচ্চাংগের ধৈর্যের নমুনা। এ কাহিনীতে দেখানো হয়েছে, ধৈর্যের ফলে হযরত আইয়ুব শেষ পর্যন্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পান, আল্লাহর রহমত লাভ করেন এবং আল্লাহ তায়ালা স্বীয় স্নেহময় হাতের পরশ দিয়ে তাকে রোগমুক্ত করেন। এ কাহিনী বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে রসূল (স.) ও মোমেনদের ওপর মক্কায় অবস্থানকালে আপতিত নির্যাতনের ব্যাপারে সান্ত্বনা দেয়া হয়। এতে বলা হয় যে, এই পরীক্ষার পেছনে আল্লাহর অফুরন্ত রহমত রয়েছে এবং আল্লাহর ভান্ডার থেকে সেই রহমত যখন তিনি ইচ্ছা করেন বিপুল পরিমাণে বিতরণ করেন।

www.pathagar.com

ভূমিকার পরে এই কাহিনীগুলো সূরার অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিরাজ করছে। সূরার দ্বিতীয় অধ্যায় এগুলোরই সমষ্টি।

অনুরূপভাবে সূরাটায় কাফেরদের পক্ষ থেকে আল্লাহর আযাব তাড়াতাড়ি নাযেল করার আবদারের জবাব দেয়া হয়েছে। 'তারা বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের আযাবের প্রাপ্য অংশ বিচারের দিনের আগেই দিয়ে দাও।' এর জবাবে কাহিনীগুলোর পর কেয়ামতের দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এই দৃশ্যে আল্লাহভীরু সৎলোকদের জন্যে যে নেয়ামত সঞ্চিত এবং কাফেরদের জন্যে যে জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে তার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়াতে যারা ক্ষমতাশালী ও অহংকারী ছিলো, আখেরাতে তারা নিজেদের পরিণামও দেখবে, আর সেসব দরিদ্র ও দুর্বল লোকদের দেখবে, যাদের সাথে তারা দুনিয়ায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। তারা কোনো মান্যগণ্য প্রভাবশালী লোক না হয়েও আল্লাহর কৃপা করুণা লাভ করতে পারবে, এটা ছিলো তাদের কল্পনারও অতীত। সেখানে মোত্তাকীদের জন্যে থাকবে পরম শান্তিময় নিবাস। (আয়াত ৫০-৫২)

আর আল্লাহদ্রোহীদের জন্যে থাকবে জঘন্যতম আশ্রয়স্থল। (আয়াত ৫৫, ৫৬ ও ৫৭) তারা জাহান্নামে পরস্পরকে অভিসম্পাত দেবে, ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত থাকবে এবং মোমেনদের সাথে কিভাবে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো তা স্মরণ করবে। 'তারা বলবে ব্যাপার কি, যে লোকগুলোকে আমরা দুষ্কৃতকারী বলে গণ্য করতাম, এখানে তাদের দেখি না কেন?' (আয়াত ৬২, ৬৩ ও ৬৪)

বস্তুত তাদেরকে তারা জাহান্নামে কোথাও খুঁজে পাবে না। তখন তারা জানতে পারবে যে, তারা জান্নাতে অবস্থান করছে। এভাবেই তাদের তাড়াতাড়ি আযাব নাযেল করার আবদারের জবাব দেয়া হয়েছে। আখেরাতের এ দৃশ্যটা নিয়ে সূরার তৃতীয় অধ্যায় গঠিত হয়েছে।

এরপর চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, রসূল (স.)-এর ওপর ওহী নাযেল হওয়ার বিষয়টা কাফেররা অস্বীকার করতো। এ অধ্যায়ে তার জবাব দিতে গিয়ে হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনাকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যে উর্ধ্বজগতে ঘটনাটা ঘটেছিলো, সেখানে তো রসূল (স.) উপস্থিত ছিলেন না। স্বয়ং আদম (আ.) ব্যতীত আর কোনো মানুষই তা দেখেনি। তাহলে মোহাম্মদ (স.) সে ঘটনা কিভাবে জানলেন? একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ওহীর মাধ্যমে এটা জানিয়েছেন। এই কাহিনীর মাধ্যমে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইবলীস হযরত আদমকে দেয়া অগ্রাধিকার মেনে নেয়নি বলেই মহান আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হয়েছে। মক্কার কোরায়শরাও ঠিক তেমনিভাবে তাদের আর সবাইকে বাদ দিয়ে মোহাম্মদ (স.)-কে ওহী নাযেলের জন্যে মনোনীত করায় তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছে। তাদের এ ভূমিকা ও আচরণ ইবলীসের আচরণের সাথে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রাখে।

এই চতুর্থ ও সর্বশেষ অধ্যায়ের মধ্য দিয়েই সূরাটা শেষ হয়েছে। এর শেষ বক্তব্যে রসূল (স.)-কে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে, তিনি যেন তাদের জানিয়ে দেন যে,

www.pathagar.com

তিনি যে দাওয়াত দেন তাতে তার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নেই, এ জন্যে তিনি পারিশ্রমিক চান না এবং এ দাওয়াত কতো গুরুত্বপূর্ণ তা তারা অচিরেই জানতে পারবে। (আয়াত ৮৬, ৮৭ ও ৮৮)

সূরার আলোচ্য বিষয়গুলো এই চারটি অধ্যায়ে এভাবে আলোচিত হয়েছে। এর ভেতর দিয়ে এক পর্যায়ে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যে যারা রসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেদের বড়াই জাহির করে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত, পরাভূত ও বিধ্বস্ত হয়েছে, তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। (আয়াত ১১, ১২, ১৩ ও ১৪)

আল্লাহর রসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের পরাজয় ও ধ্বংসের বিবরণ সম্বলিত মানবেতিহাসের এই মর্মান্তিক ও দৃষ্টান্তমূলক অধ্যায়টাকে মানুষের চিত্তপটে আরো একবার তুলে ধরা হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রিয় ও মনোনীত বান্দাদের কিভাবে সম্মানিত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং সাহায্য ও করুণায় ভূষিত করেছেন তার বিবরণ দিয়েছেন হযরত দাউদ, সোলায়মান ও আইয়ুব (আ.)-এর কাহিনীতে।

উক্ত উভয় প্রকারের পরিণতি এই ইহকালীন জগতেই ঘটেছে। এরপর মানুষকে দেখানো হয়েছে কেয়ামতের দৃশ্য, কেয়ামত পরবর্তী বেহেশতের নেয়ামত, সম্পদ, সন্তোষ এবং ভালো ও মন্দ কর্মফল। আখেরাতের অবিনশ্বর জগতের উক্ত কর্মফল হলো তা থেকে ভিন্ন ধরনের।

সর্বশেষ অধ্যায়টাতে মানবজাতির প্রথম প্রজন্মের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। মানবজাতি তার প্রথম শত্রুর পক্ষ থেকে হিংসার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এ কাহিনীতে। এই শত্রু চিরদিন তাকে বিপথগামী করে থাকে, অথচ মানুষ সব কিছু জেনেও তার সম্পর্কে উদাসীন থাকে।

কেসসা কাহিনীর এক পর্যায়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে নিহিত এক মহাসত্যের প্রতি মানবজাতির মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এই মহাসত্যটাই নবী রসূল প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরে এক মহাসত্য বদ্ধমূল করতে চান। সে সত্যটা এই যে, আমি আকাশ ও পৃথিবী নিরর্থক সৃষ্টি করিনি। এ ধরনের মনোযোগ আকর্ষণী বক্তব্যের বহু দৃষ্টান্ত কোরআনে রয়েছে। মক্কী কোরআনের মৌলিক আকীদাগত বিষয়ের মধ্যে এটা একটা বহুল আলোচিত বিষয়।

সূরা আঝ ঝুমার

এই সূরাটা বলতে গেলে পুরোপুরিই তাওহীদের আলোচনায় পরিপূর্ণ। সমগ্র সূরা জুড়েই বার বার এ বিষয়টিকেই মানুষের মনে বদ্ধমূল করা হয়েছে। তাই বলা যায়, সূরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটাই আলোচ্য বিষয়। যেটুকু বিভিন্নতা, তা কেবল বর্ণনাভংগিতে, বিষয়বস্তুতে নয়।

www.pathagar.com

সূরার শুরু থেকেই এই একই বিষয় গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে! বলা হয়েছে, 'এটা মহাবিজ্ঞানী মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব। আমি তোমার কাছে ন্যায়সংগতভাবেই কিতাবখানা নাযেল করেছি। তাই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদাত করো। '

এ ধরনের বক্তব্য সূরার বিভিন্ন আয়াতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উচ্চারিত হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে যেমন, 'তুমি বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদাত করি......।' (আয়াত ১১-১৫) অথবা, 'বলো, ওহে অজ্ঞ লোকেরা, তোমরা কি আমাকে ছাড়া আর কারো এবাদাত করার আদেশ দিচ্ছো?' (আয়াত ৬৪-৬৬) আর পরোক্ষভাবে যেমন 'আল্লাহ তায়ালা এক ব্যক্তির উদাহরণ দিয়েছেন........।' (আয়াত ২৯) অথবা, 'আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন?' ...(আয়াত ৩৬) তাওহীদের বিষয়টা ছাড়াও এ সূরায় আমরা মহান আল্লাহর এমন কিছু বাণীও পাই, যা মানুষের মনমগযে চেতনা ও জাগরণের সঞ্চার করতে চায়, তার উদ্দীপনা ও প্রেরণা বৃদ্ধি করতে চায় এবং ঐশী আদেশ গ্রহণের যোগ্যতা ও ক্ষমতা তীব্রতর করতে চায়। যেমন (আয়াত ১৭, ১৮, ২৩ ও ৮)। এ সূরার আরো একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আখেরাতের আলোচনায় পরিপূর্ণ। পাঠকের বেশীর ভাগ সময় আখেরাতের স্মরণেই কেটে যায়। এ বিষয়টা এ সূরায় বার বার আলোচিত হয়েছে। স্পষ্টভাবে হোক অথবা আভাসে ইংগিতে হোক, খুব ঘন ঘন কেয়ামতের দৃশ্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। কয়েক জায়গায় কেয়ামত ও আখেরাতের বিশদ বিবরণ এসেছে। তাছাড়া নিম্নের আয়াতগুলোতে সংক্ষিপ্ত বিবরণও লক্ষণীয় (আয়াত ৯, ১৩, ১৯, ২৩, ২৬, ৩২, ৪৭, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ ও ৫৮)।

অন্যান্য মক্কী সূরায় প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী করার প্রচেষ্টা নানা ভংগিতে ও বিপুল পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এ সূরায় তার উপস্থিতি খুবই কম।

সূরার প্রথম দিকে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে (আয়াত ৫০)। অন্যান্য আয়াতে আর একটা দৃশ্য তুলে ধরে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন ইংগিত করা হয়েছে। এ ছাড়া এ সূরায় মানবজীবনের বিভিন্ন বাস্তব দিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের বক্তব্য রাখা হয়েছে।

সূরার শুরুতে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে ৬ নং আয়াতে বক্তব্য রাখা হয়েছে। ৮ নং আয়াতে সুখে দুঃখে মানুষের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয় তা বর্ণানা করা হয়েছে। ৪৯ নং আয়াতেও এ বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ৪১ নং আয়াতে জানানো হয়েছে যে, নিদ্রিত অথবা জাগ্রত উভয় অবস্থায় মানুষের প্রাণ আল্লাহর মুঠোর মধ্যে থাকে। আখেরাত সংক্রান্ত বক্তব্যও বিস্তৃত রয়েছে সমগ্র সূরা জুড়েই। এমনকি সূরার শেষ আয়তটাতেও কেয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরে বলা হয়েছে; 'তুমি ফেরেশতাদের দেখবে আরশ বেষ্টন করে রেখেছে..........।'

www.pathagar.com

সূরার সামগ্রিক পরিবেশ ও এর বিভিন্ন মর্মস্পর্শী আলোচনার সাথে এ দৃশ্যটার মিল রয়েছে। কেননা সূরার সামগ্রিক পরিবেশটায় আখেরাত সংক্রান্ত ভীতি ও আতংক ছড়িয়ে রয়েছে। সমগ্র সূরায় আমরা এমন সব দৃশ্যের সাক্ষাত পাই যা মানুষের মনকে ভীত সন্ত্রস্ত ও আতংকিত করে। যেমন এক আয়াতে এমন একজন এবাদাতকারীর দৃশ্য অংকন করা হয়েছে যে, আখেরাতের ভয়ে এবং আল্লাহর রহমতের আশায় দাঁড়িয়ে ও সাজদা করে রাত কাটিয়ে দেয়। আর এক আয়াতে আল্লাহর সেই সব বান্দার দৃশ্য অংকন করা হয়েছে যাদের চামড়া কোরআন শুনে শিউরে ওঠে, আবার তা নরম হয়ে যায় এবং তাদের মন আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত হয়। কয়েকটা আয়াতে বিশেষভাবে আল্লাহর ভয় ও তাঁর আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে, যেমন (আয়াত ১০, ১৩ ও ১৬)। কেয়ামত ও তার ভয়ভীতি এবং বিনয় ও আনুগত্যের দৃশ্যও দেখানো হয়েছে বিভিন্ন আয়াতে।

সূরাটা ছোট ছোট বিভিন্ন অংশে বিভক্ত এবং সবগুলো অংশের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাওহীদ ও আখেরাত। প্রায় প্রতিটা অংশই কেয়ামতের কোনো না কোনো দৃশ্যের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। শীঘ্রই এই অংশগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা ধারাবাহিকভাবে দেয়ার চেষ্টা করবো। কেননা এ সূরাকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করা কঠিন। এর আয়াতগুলোর প্রত্যেকটা ক্ষুদ্রাকার। সমষ্টির বক্তব্য যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। তবে সামগ্রিকভাবে সমগ্র সূরার আলোচ্য বিষয় হলো তাওহীদ।

সূরা আল মোমেন

এ সূরাটায় প্রধানত হক ও বাতিল, ঈমান ও কুফর, দাওয়াত ও তা প্রত্যাখ্যান করার বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং সর্বশেষে পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে একনায়কত্ব ও জবরদস্তি প্রয়োগ এবং একনায়ক ও জবরদস্তি প্রয়োগকারীদের ওপর আল্লাহর শাস্তির বিষয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ও হেদায়াতপ্রাপ্ত ও অনুগত মোমেনদের ভূমিকা ও তাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য, তাদের জন্যে ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের দোয়া কবুল করা এবং আখেরাতে তাদের জন্যে প্রতিশ্রুতি পুরস্কারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এ কারণেই সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বলে প্রতীয়মান হয়। এ যুদ্ধ হক ও বাতিলের যুদ্ধ, ঈমান ও আল্লাহদ্রোহিতার যুদ্ধ এবং পৃথিবীতে একনায়কত্ব ও স্বৈরাচারদের সাথে আল্লাহর সেই ভয়াবহ আযাবের যুদ্ধ, যা তাদেরকে পদে পদে বিধ্বস্ত ও লাঞ্ছিত করে। আর এর মাঝে যখন মোমেনদের প্রসংগ আসে, তখন আল্লাহর করুণা ও সন্তোষের সুবাতাস বয়ে যায়।

সূরার প্রেক্ষাপটে অতীত জাতিগুলোর ধ্বংসের কাহিনী এবং কেয়ামতের দৃশ্যাবলীও তুলে ধরা হয়েছে। আর এই দুটো বিষয় সূরার আয়াতগুলোতে খুবই লক্ষণীয়ভাবে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এগুলোকে সূরার সঠিক প্রেক্ষাপটের সাথে মিল রেখে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ আকারে তুলে ধরা হয়েছে। এভাবে সূরার প্রেক্ষাপটে

www.pathagar.com

যে কঠোরতা রয়েছে, আলোচ্য বিষয়গুলোতেও তা রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্য সূরার উদ্বোধনী অংশেও পরিলক্ষিত হয়। একটা বিশেষ ছন্দময় সূরেলা ঝংকারের সাথে বলা হয়েছে, 'তিনি গুনাহ মাফকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তিদানকারী এবং মহাশক্তিধর....।' (আয়াত ৩)

এ আয়াতের শব্দগুলো যেন হাতুড়ি দিয়ে তাল মিলিয়ে পিটিয়ে ঘন্টা বাজানোর ধ্বনি। এর আঘাতের প্রভাব যেন স্থায়ী। এর প্রত্যেকটা শব্দ যেন স্বতন্ত্র এক। এর প্রত্যেকটা শব্দের অর্থও এর ঝংকৃত সুরের সমর্থক ও শক্তি যোগানদাতা। বা'স, বা'সুল্লাহ ও বা'সুনা (আযাব, আল্লাহর আযাব ও আমার আযাব) শব্দটাকেও বারবার সূরার বিভিন্ন জায়গায় পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া এর কাছাকাছি অর্থের আরো বহু শব্দ রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে দেখলে, সমগ্র সূরাটা মানুষের মনের ওপর তীব্র প্রভাব সৃষ্টি করা ও গভীর দাগ কাটার মতো বহু উপাদানে সমৃদ্ধ। অতীতের ধ্বংস হওয়া জাতিগুলোর কাহিনী এবং কেয়ামতের দৃশ্যাবলী এ প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। কোনো কোনো জায়গায় আবার হৃদয়ের ওপর কোমল পরশ বুলানো কথাবার্তাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন আরশবহনকারী ও আরশের চারপাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর মোমেন বান্দাদের জন্যে দোয়া করা, প্রাকৃতিক জগতের নিদর্শন ও মানুষের নিজ সত্ত্বার ভেতরে বিরাজমান নিদর্শনাবলীর উল্লেখ ইত্যাদি। নিম্নে সূরার এইসব বিষয় ও পটভূমি নির্দেশকারী কয়েকটা আয়াত উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করছি,

অতীতের জাতিগুলোর ধ্বংসের কাহিনী ৫, ২১, ২২, নং আয়াতসমূহ। কেয়ামতের দৃশ্যাবলী, ১৮, ৭০, ৭১ ও ৭২ নং আয়াতসমূহ। আর কোমল পরশ বুলানো আয়াত ৭, ৮, ৯ নং আয়াত লক্ষ্য করুণ। প্রকৃতিতে ও মানবসত্ত্বায় বিরাজিত নিদর্শনাবলীর উল্লেখ, ৬৭, ৬৮, ৬৪, ৬৫, ৬১ নং আয়াত লক্ষ্য করুন।

এসব আয়াত থেকে সূরার সামগ্রিক পটভূমি ও আলোচ্য বিষয় জানা যায়। আর এগুলো দ্বারা এর বিষয়বস্তুর সাথে এর প্রকৃতির সমন্বয় ঘটানো যায়। সূরাটা মোটামুটিভাবে চারটি অংশে বিভক্ত এবং এর প্রত্যেকটা অংশ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী,

প্রথম অংশটায় রয়েছে সূরার উদ্বোধনী পর্ব, যা বর্ণমালার দুটো অক্ষর দ্বারা শুরু হয়েছে। যেমন, 'হা-মীম, এটা মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কেতাব।' (আয়াত ১ ও ২) এরপর রয়েছে সেই অপূর্ব ছন্দময় সুরে ঝংকৃত আয়াত, গুনাহ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী ....।' (আয়াত ৩)

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত। মানুষের ভেতর থেকে কিছু কাফের ছাড়া বিশ্বজগতের কোনো সৃষ্টিই আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে তর্ক করে না। তর্ককারী এই অকৃতজ্ঞ মানুষগুলো সমগ্র সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই ধন সম্পদের দিক দিয়ে তাদের অবস্থা যতোই পাল্টে যাক রসূল (স.)-এর কাছে তাদের কোনোই গুরুত্ব নেই। কেননা পূর্ববর্তী কাফেরদের মতোই তাদের পরিণাম

www.pathagar.com

হবে শোচনীয়। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কাঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলেন এবং এমন শাস্তি দিয়েছিলেন, যা অহংকারীদের যথার্থই প্রাপ্য। আর শুধু দুনিয়ার শাস্তিই তো শেষ নয়, তাদের জন্যে আখেরাতের আযাবও অপেক্ষা করছে। ওদিকে আরশ বহনকারী ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের এবাদাত করে ও দুনিয়াবাসী মোমেনদের মাগফেরাত কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া করে। এর পাশাপাশি কেয়ামতের দিন কাফেরদের কী শোচনীয় পরিণতি হবে তাও দেখানো হয়েছে। মোমেনদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ডেকে বলা হবে, 'আজ তোমরা নিজেদের ওপর যতোটা ক্ষুব্ধ হচ্ছো, তোমাদেরকে যেদিন ঈমানের দাওয়াত দেয়া হচ্ছিলো, আর তোমরা সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছিলে, সেদিন আল্লাহর ক্রোধ আরো সাংঘাতিক ছিলো।'

দুনিয়ার জীবনের অহংকার ও গর্ব সেদিন ধুলোয় মিশে যাবে। সেদিন তারা চরম বিনয়ের সাথে নিজেদের সমস্ত পাপের স্বীকারোক্তি করবে এবং তাদের প্রতিপালককে মেনে নেবে। কিন্তু এই স্বীকারোক্তিও মেনে নেয়াতে কোনো লাভ হবে না। আসলে তারা শুধু তাদের পার্থিব জীবনের শেরক দাম্ভিকতা ও যাবতীয় অপকর্মই স্মরণ করবে। আখেরাতে আল্লাহর সামনে তাদের অবস্থান প্রসংগে দুনিয়ার কথা পুনরায় স্মরণ করানো হবে,

'তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখান এবং তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে জীবিকা অবতীর্ণ করেন।'

তিনি এসব নিদর্শন স্মরণ করান এ জন্যে যেন তারা তাদের প্রতিপালকের অনুগত হয় এবং একমাত্র তার এবাদাত করে, 'অতএব আল্লাহর এবাদাত করো একনিষ্ঠ আনুগত্য সহকারে, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।'

এরপর সেই কঠিন দিন সম্পর্কে যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছিলো এবং ওহী পাঠানো হয়েছিলো, তার উল্লেখ করে কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য পুনরায় তুলে ধরা হচ্ছে,

'যেদিন তারা আত্মপ্রকাশ করবে, সেদিন তাদের কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে না।'

সেদিন বড় বড় দাম্ভিক, একনায়ক ও বিতর্ককারী সবাই উধাও হয়ে যাবে। সেদিন বলা হবে 'আজকের রাজত্ব কার? একমাত্র পরাক্রমশালী এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর।' এরপর এই দিনের আরো কিছু চিত্র দেখানো হয়েছে, যেদিন আল্লাহ তায়ালাই এককভাবে শাসন ও বিচার পরিচালনা করবেন। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যা কিছুর পূজা উপাসনা করা হতো সেদিন সে সবের আর কোনো পাত্তা থাকবে না। অনুরূপভাবে দুনিয়ায় যারা অবাধে পাপাচারে লিপ্ত থাকতো ও জনগণের ওপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাতো, তাদেরও আর কোনো খোঁজ থাকবে না।

দ্বিতীয় অংশটা প্রাচীনকালের ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহদ্রোহীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। এটা এসেছে ফেরাউন, হামান ও কারূণের সাথে হযরত মূসার ঘটনাবলী বর্ণনার ভূমিকা হিসাবে। সত্যের দাওয়াতের বিরুদ্ধে ফেরাউনের ভূমিকার বর্ণনা প্রসংগে এখানে এমন একটা ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে, যা

www.pathagar.com

হযরত মূসার কাহিনীতে ইতিপূর্বে কখনো উল্লেখ করা হয়নি এবং এই সূরায় ছাড়া আর কোথাও তার উল্লেখ নেই। এই ঘটনা হলো, ফেরাউনের অনুসারীদের মধ্য এমন এক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ, যিনি এ যাবত তার ঈমান গোপন রেখে আসছিলেন। হযরত মূসাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হতে দেখে এই ব্যক্তি আর চুপ থাকতে পারেননি। তিনি এই হত্যার ষড়যন্ত্র নস্যাত করতে সচেষ্ট হন। প্রথমদিকে তিনি সত্য ও ঈমানের কথা অত্যন্ত সন্তর্পণে ও বিনীতভাবে প্রকাশ করেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে খোলাখুলি ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি ফেরাউনের সাথে অত্যন্ত জোরালো ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তর্ক করেন। তাকে ও তার দলবলকে কেয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করেন। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় কেয়ামতের কিছু কিছু দৃশ্যও তুলে ধরেন এবং তাদের ও তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। এ প্রসংগে তিনি হযরত ইউসুফ ও তার রেসালাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। এভাবে এ কেসসা বর্ণনা করতে করতে ফেরাউনের আখেরাতে কী অবস্থা হবে, তাও ব্যক্ত করেন। সূরার এই পটভূমিকায় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূলকে ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর ওয়াদার প্রতি আস্থাশীল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার উপদেশ দিয়েছেন।

সূরার তৃতীয় অংশটা শুরু হয়েছে এই বক্তব্য দিয়ে যে, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই তর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে সত্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য থাকে বলেই তারা এটা করে। অথচ তারা এই সত্যের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র। এরপর আল্লাহর সৃষ্টি করা এই বিশাল বিশ্বজগতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যা সমগ্র মানব জাতির চেয়েও বিরাট ও বিশাল। অহংকারী ও দাম্ভিক লোকেরা যদি আল্লাহর সৃষ্টির বিশালত্বের সামনে নিজেদের ক্ষুদ্রত্বকে অনুধাবন করতো, তাহলে তারা এমন অন্ধ ও গোঁড়া হতো না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ও অন্ধ ব্যক্তি, আর সৎকর্মশীল ব্যক্তি ও অসৎকর্মশীল ব্যক্তি সমান হয় না। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।'

এই পর্যায়ে মানুষকে কেয়ামতের আগমনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং দোয়া কবুলকারী মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করতে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। পক্ষান্তরে যারা দাম্ভিকতা দেখায়। তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতপর আল্লাহ তায়ালার এমন কিছু কিছু প্রাকৃতিক নিদর্শন স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, যার কাছ দিয়ে তারা উদাসীনভাবে চলাচল করে। রাতকে অবকাশ যাপন ও বিশ্রামের সময় এবং দিনকে আলোকোজ্জ্বল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পৃথিবীকে অবস্থানের জায়গা ও আকাশকে ছাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে, আর তাদের নিজেদের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তাদেরকে তিনি কতো সুন্দর গঠন ও আকৃতি দান করেছেন। অতপর তাদেরকে একনিষ্ঠ আনুগত্য সহকারে আল্লাহর এবাদাত করার নির্দেশ দান করেছেন। রসূল (স.)-কে আদেশ দিয়েছেন যেন তিনি তাদের মূর্তিপূজা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন, তাদের দেব দেবী থেকে দূরে থাকা সম্পর্কে আল্লাহর

www.pathagar.com

আদেশ জনগণকে অবহিত করেন, তাকে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করার আদেশ প্রচার করেন। জনগণের মনে এই সত্য বদ্ধমূল করা হয়েছে যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে প্রথমে মাটি থেকে, অতপর বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা। অতপর পুনরায় রসূল (স.)-এর কাছে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বিতর্ককারীদের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাদেরকে কেয়ামতের আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'সেদিন তাদের ঘাড়ের ওপর বেড়ি ও শেকল পরানো হবে, তাদেরকে ফুটন্ত পানির দিকে টেনে নেয়া হবে, অতপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে।'

যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করতো তারা সেদিন সব দায়দায়িত্ব অস্বীকার করবে। এমনকি স্বয়ং মোশরেকেরাও দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করার কথা অস্বীকার করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। তাদেরকে বলা হবে, 'জাহান্নামের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ো এবং ওখানে চিরদিন অবস্থান করো। দাম্ভিকদের আবাসস্থল কতই না জঘন্য!'

এ দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাঁর রসূলকে পুনরায় ধৈর্যধারণের পরামর্শ দিচ্ছেন এবং আস্থা রাখতে বলছেন যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, চাই এই প্রতিশ্রুতির কিছু অংশ দুনিয়াতেই কার্যকরী হওয়া পর্যন্ত সে বেঁচে থাক অথবা তার আগেই মারা যাক। সর্বাবস্থায় প্রতিশ্রুতি কার্যকর হবেই।

সূরার শেষ ভাগটি তৃতীয় অংশের সাথেই সংযুক্ত। রসূল (স.)-কে ধৈর্যধারণ ও অপেক্ষা করতে আদেশ দেয়ার পর বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর আগে বহু রসূল পাঠিয়েছেন। 'কোনো রসূলই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন নিয়ে আসতে পারে না।' সাধারণভাবে বিশ্ব প্রকৃতির সর্বত্র এবং সকলের চোখের সামনে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার ব্যাপারে সবাই উদাসীন। যেমন ধরা যাক, এইসব জীবজন্তু যারা মানুষের ইংগিতে চলে। কে তাদেরকে মানুষের অনুগত করলো? আর এইসব নৌযান, যা মানুষকে এখান থেকে ওখানে নিয়ে যায়। নিদর্শন তারা কি দেখতে পায় না? আর অতীতের জাতিগুলোর ধ্বংসের বৃত্তান্ত কি তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে না? কোনো উপদেশই কি তাদেরকে দেয় না? সূরাটার সমাপ্তি টানা হয়েছে কাফেরদের ধ্বংসের কাহিনী সম্পর্কে একটা জোরদার মন্তব্য করার মধ্য দিয়ে। তারা আল্লাহর আযাব দেখে ঈমান এনেছিলো। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। এই সমাপনী বক্তব্য থেকে দাম্ভিক লোকদের পরিণতি কী হয়, তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

সূরা হা-মীম আস সাজদা

আকীদাসংক্রান্ত মৌলিক তত্ত্বসমূহ তথা তাওহীদ, রেসালাত, আখেরাত আল্লাহর দিকে দাওয়াত ও দাওয়াতদাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়।

সূরায় আর যে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা উক্ত তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সাক্ষ্য প্রমাণের পর্যায়ভুক্ত। তাছাড়া প্রকৃতিতে ও মানব সত্ত্বায় আল্লাহর নিদর্শনাবলী

www.pathagar.com

প্রদর্শন, এইসব নিদর্শনকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করার বিরুদ্ধে হুশিয়ারি, অতীত প্রজন্মসমূহের মধ্য থেকে যারা অস্বীকার করেছিলো তাদের ধ্বংসের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং কেয়ামতের দিনে কাফেরদের পরিণতির দৃশ্যাবলী এ সূরার অন্যতম উপাদান। সেই সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে যারা এ সত্যগুলোকে অস্বীকার করে, তারা ছাড়া আকাশ, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, ও ফেরেশতা ইত্যাদি সমুদয় সৃষ্টি এই সব সত্যকে স্বীকার করে, একমাত্র আল্লাহর সামনে সেজদা করে ও আত্মসমর্পণ করে। তাওহীদ সংক্রান্ত আয়াতগুলো হলো

'বলো, আমি তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। তোমাদের সাথে সাথে আমার পার্থক্য হচ্ছে, আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের মাবুদ একজন মাবুদ মাত্র। অতএব, তাঁর ওপর অবিচল থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। আর মোশরেকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ।'....... 'বলো, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করো, যিনি পৃথিবীকে দু'দিনে সৃষ্টি করেছেন? আর আ'দ ও সামুদ সম্পর্কে জানান যে, তাদের রসূলরাও তাদেরকে এই একই কথা বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না। সূরার মাঝখানে বলা হয়েছে! 'তোমরা সূর্য ও চন্দ্রের সামনে সেজদা করো না। বরং যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তাকে সেজদা করো।' সূরার শেষভাগেও এই একই বিষয়ে বলা হয়েছে; 'যেদিন তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার শরীকরা কোথায়........?'

আখেরাত সম্পর্কে বলতে গিয়ে যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হয়েছে, 'মোশরেকদের জন্যে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয়না এবং আখেরাতে অবিশ্বাস করে।' শেষ আয়াতে বলা হয়েছে! 'শুনে রাখো, তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দিহান। জেনে রাখো, তিনি প্রতিটা জিনিসকে ঘেরাও করে রেখেছেন।' অনুরূপভাবে কেয়ামতের দৃশ্যাবলীর মধ্যেও এ বিষয়টার উল্লেখ পাওয়া যায়। এদ্বারা স্বভাবতই কেয়ামতের দিনে যা যা ঘটবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিটাই এ বিষয়কে গুরুত্ব দেয়ার জন্যে অধিকতর উপযোগী।

ওহী ও রেসালাত সম্পর্কে এতো বেশী আলোচনা এসেছে যে, এ বিষয়টাই এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় বলে মনে হয়। সূরার শুরুতেই এ বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য দেয়া হয়েছে। যথা, হা-মীম-পরম দাতা ও দয়ালুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ..... (আয়াত ১-৬)

সূরার মাঝখানে রয়েছে মোশরেকরা কোরআনের অভ্যর্থনা কিভাবে করতো তার বিবরণ– 'কাফেররা বললো, তোমরা এই কোরআন শুনো না, বরং এর ভেতরে হৈচৈ করো, হয়তো তোমরা বিজয়ী হবে।' এরপর এই অভ্যর্থনার বিস্তারিত বিবরণ ও এর জবাব রয়েছে। (আয়াত ৪১-৪৪)

আর দাওয়াত ও দাওয়াতকারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। (আয়াত ৩৩-৩৬)

এই বিষয়গুলো গভীর আবেগোদ্দীপক বিপুলসংখ্যক আয়াতের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। বিরাট বিরাট নিদর্শনাবলীতে পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক জগত, বিস্ময়কর গঠন

www.pathagar.com

সম্বলিত মানবীয় মনোজগত, অতীতের আল্লাহদ্রোহীদের ধ্বংসযজ্ঞ এবং সর্বশেষে কেয়ামতের লোমহর্ষক কিছু দৃশ্যের বিবরণের মধ্য দিয়ে এ সূরার আকীদা সংক্রান্ত আলোচ্য বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই সূরার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্য থেকে আকাশ ও পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টির অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য সম্বলিত বিশদ বিবরণটা খুবই উপভোগ্য। এ বিবরণটা ৯নং আয়াত থেকে শুরু হয়ে ১২নং আয়াতের শেষে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে রাতদিন ও সূর্য-চন্দ্রের নিদর্শন এবং ফেরেশতাদের এবাদাত, পৃথিবীর বিনীত এবাদাত ও ভূপৃষ্ঠে জীবনের সমারোহের বিবরণও এ সূরার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ৩৭নং থেকে শুরু করে ৩৯নং আয়াতে এই বিবরণ বিস্তৃত। আর মানুষের মনমানসসংক্রান্ত তথ্যাবলী খুবই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। (আয়াত ৪৯-৫১)

অতীতের অবিশ্বাসীদের ধ্বংসের বিবরণ থেকে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে আ'দ ও সামুদের ধ্বংসযজ্ঞ। (আয়াত ১৫-১৮)

এ সূরায় কেয়ামতেরও অনেক দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। (আয়াত ১৯-২০)

অনুরূপভাবে, দুনিয়াতে যারা প্রতারিত হয়েছিলো, তারা প্রবঞ্চনাকারীদের ওপর যে ক্রোধ প্রকাশ করবে। সে দৃশ্যও এর আওতাভুক্ত। এ দৃশ্যটা রয়েছে ২৯ নং আয়াতে।

এভাবে ইসলামী আকীদা বিষয়ক তত্ত্বগুলো অত্যন্ত আবেগোদ্দীপক ভাষায় এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, এদ্বারা সমগ্র সূরার পরিবেশ, প্রকৃতি ও প্রভাব কেমন তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের মন আকাশ ও পৃথিবীর সুবিশাল সাম্রাজ্যে, নিজের মনোজগতের গভীর থেকে গভীরতর প্রকোষ্ঠে, অতীতের আল্লাহদ্রোহীদের ধ্বংসের ইতিবৃত্তে ও কেয়ামতের জগতে বিচরণ করতে থাকে এবং মনের ওপর এসবের গভীর প্রভাব পড়ে।

সূরাটা তার সমস্ত আলোচ্য বিষয় ও অন্যান্য উদ্দীপনাময় উপদেশসমূহ সহ দুটো পর্বে বিভক্ত, যার উভয়টা পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ও সমন্বিত।

প্রথম পর্বের সূচনা হয়েছে কোরআন নাযিল হওয়া, তার প্রকৃতি ও তার প্রতি মোশরেকদের ভূমিকা দিয়ে। এর পরপরই রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি বৃত্তান্ত, অতপর আ'দ ও সামুদের কাহিনী, তারপর আল্লাহর শত্রুদের পরকালের দৃশ্য এবং তাদের চামড়া, চোখ ও কান কর্তৃক তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের দৃশ্য। এখান থেকে প্রসংগ পাল্টে গিয়ে তাদের দুনিয়ার জীবনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কিভাবে তারা এতো বিপথগামী হলো তা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে কিছু অসৎ লোককে তাদের সংগী বানিয়ে দিয়েছিলেন। এই সংগীরা তাদের সামনের ও পেছনের সব কাজকে সুন্দর ও শোভন করে দেখাতো। এর ফলে তারা পরস্পরকে বলতো যে, 'তোমরা কোরআন শুনোনা, বরং হৈ চৈ করো। তাহলে হয়তো জয় লাভ করতে পারবে।' এরপর এইসব সংগী তাদের সাথে ধোঁকাবাজী করার কারণে তারা কেয়ামতের দিন তাদের ওপর যে ক্রোধ ঝাড়বে, তার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে রয়েছে তারা, যারা বলেছে! আমাদের প্রভু আল্লাহ এবং তারপর এই ঘোষণায় অবিচল থেকেছে। এদের ওপর

www.pathagar.com

কোনো খারাপ সংগী নয়, বরং ফেরেশতারা নাযিল হবে। এই ফেরেশতারা তাদেরকে আশ্বাস দেবে, সুসংবাদ দেবে এবং নিজেদেরকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে তার সাথী বলে জানাবে। এর অব্যবহিত পরই রয়েছে দায়ী ও দাওয়াতদাতা সংক্রান্ত আলোচনা এবং এখানেই এ পর্বের সমাপ্তি ঘটেছে।

এরপরই শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্ব। এর শুরুতেই রয়েছে রাত ও দিন। সূর্য ও চন্দ্র, এবাদাতরত ও অনুগত ফেরেশতারা বিনয়াবনত পৃথিবী এবং পৃথিবীতে অজন্মার পর জীবন ও উদ্ভিদের সমারোহ সংক্রান্ত আলোচনা। তারপর যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে ও তার কেতাবে বক্রতা অনুসন্ধান করে তাদের নিয়ে বক্তব্য এসেছে। এই পর্যায়ে কোরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং তারপরই উল্লেখ করা হয়েছে হযরত মূসার কেতাব ও তা নিয়ে তার জাতির মতবিরোধের প্রসংগ। তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে কেয়ামত সম্পর্কে কথা এসেছে এবং বলা হয়েছে যে, এ সংক্রান্ত জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে নেই। একমাত্র তিনিই জানেন ফলের ঝুঁড়িতে কত ফল এবং মায়ের পেটে কি সন্তান রয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, কাফেরদের কাছে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে, আল্লাহর সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক বানাতে, তারা কোথায় গেলো। এরপরই এসেছে মানুষের নিজ সত্ত্বা সংক্রান্ত বক্তব্য। বলা হয়েছে যে, মানুষ নিজের এত কল্যাণকামী হয়েও তার ব্যাপারে সতর্ক হয় না, বরং কুফরি করে ও মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়, যার ফলে তার জন্য আযাব ও ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি ঘোষণার মাধ্যমে যে, তিনি মানুষের নিজ সত্ত্বা ও বাইরের প্রকৃতি সংক্রান্ত নিদর্শন তথা এর তথ্য তার কাছে উন্মোচিত করবেন, যাতে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত ও সংশয়মুক্ত হয়। (শেষ আয়াত দুটো দেখুন।)

সূরা আশ শূ-রা

এই সূরাটায় অন্যান্য মক্কী সূরার মতো আকীদা ও ঈমান সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ সূরায় ওহী ও রেসালাতের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বলতে গেলে এটাই এ সূরার কেন্দ্রীয় ও প্রধান আলোচ্য বিষয়। অন্যান্য বিষয় নিয়ে এখানে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তা কেবল ওহী ও রেসালাতের আনুষংগিক বিষয় হিসাবেই করা হয়েছে।

এ ছাড়া এ সূরায় তাওহীদ, কেয়ামত ও আখেরাতের বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সূরার বিভিন্ন স্থানে কেয়ামত ও আখেরাতের বিভিন্ন দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। অনুরূপভাবে জোর দেয়া হয়েছে কেয়ামত ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের ওপর এবং ঈমান আনয়নকারীদের চমকপ্রদ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সদগুণাবলীকে তুলে ধরা হয়েছে। একপর্যায়ে জীবিকা, জীবিকার স্বল্পতা ও প্রাচুর্য কিভাবে হয় এবং স্বল্পতা ও প্রাচুর্যে মানুষের মতিগতি কি ধরনের হয়, সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তবে সব কিছু সত্তেও ওহী ও রেসালাতই সূরার প্রধান

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। অন্য যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা এই ওহী ও রেসালাতের গুরুত্ব বর্ধক হিসাবেই আলোচিত হয়েছে বলে মনে হয়।

সূরায় উক্ত বিষয়টা ও তার অনুষংগ অন্যান্য বিষয়কে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, অধিকতর চিন্তা গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্যে বিভিন্ন আয়াতে বিষয়টাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব আয়াতের মাঝখানে স্রষ্টার একত্ব, জীবিকাদাতার একত্ব, মন মস্তিস্ক নিয়ন্ত্রণকারীর একত্ব একত্ব বিষয়ক আয়াত রয়েছে। তাছাড়া ওহী ও রেসালাত বিষয়ক আয়াতগুলোতে আনুষংগিকভাবে ওহী প্রেরণকারীর একত্ব, ওহীর একত্ব, ইসলামী আকীদার একত্ব, ইসলামী আইন ও বিধানের একত্ব এবং সর্বশেষে ইসলামী আকীদার আওতাধীন মানবজাতির নেতৃত্ব সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

এভাবে সূরাটা অধ্যয়ন করলে সামগ্রিকভাবে অন্তরে একত্বের সুস্পষ্ট ছাপ পড়ে, যদিও এই একত্বের মাঝে বিবিধ রকমের ইশারা-ইংগিত ও তাৎপর্য রয়েছে। সূরায় বহু বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। সূরার বিস্তারিত আলোচনার আগে এ সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত উদাহরণ পেশ করছি।

প্রথমে বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার প্রসংগে আসা যাক। সূরার শুরুতেই রয়েছে, হা-মীম-আইন-সীন-কাফ'। এর অব্যবহিত পরেই আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'এভাবেই তোমার এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে মহা পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ ওহী প্রেরণ করে থাকেন।' এ আয়াতের মাধ্যমে জানানো হলো যে, সকল যুগের নবীদের কাছে প্রেরিত ওহীর উৎস একটাই 'তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে,' কথাটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এরপর মহান আল্লাহ কেমন মহাপরাক্রমশালী ও কেমন মহাবিজ্ঞানী তা বুঝানোর জন্যে বলা হয়েছে। 'যা কিছু আকাশে ও যা কিছু পৃথিবীতে আছে, সব তাঁরই মালিকানাধীন।' (আয়াত ৪) এ আয়াতের মাধ্যমে জানানো হলো যে, আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান যাবতীয় প্রাণী বা বস্তুর মালিক একজন মাত্র এবং সব কিছুর ওপর একমাত্র তাঁরই আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত।

এরপর বিশ্বজাহানের মালিকের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে ও মানবজাতির একাংশের মোশরেক হওয়ার ব্যাপারে সমগ্র সৃষ্টিজগত কী ভূমিকা পালন করে, তা তুলে ধরা হয়েছে ৫ ও ৬ নং আয়াতে। এখানে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত ঈমান ও শেরেকের ব্যাপারে এতোটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে যে, বিশ্ববাসীর একাংশ মহান আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী না হওয়ায় তারা যেন বিক্ষোভে ফেটে পড়ার উপক্রম। অপরদিকে মানবজাতির এই বিকারগ্রস্ত শ্রেণীটার এই জঘন্য কর্মকান্ড ক্ষমা করার জন্যে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে আবেদন জানান।

এই প্রথম পর্বটা শেষ করার পর ৭ নং আয়াত থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে মূল বিষয়টা অর্থাৎ ওহী ও রেসালাত সংক্রান্ত আলোচনা। বলা হয়েছে যে, মানবজাতির

www.pathagar.com

একটা গোষ্ঠী ওহী ও রেসালাতে বিশ্বাস করার কারণে জান্নাতে এবং অপর গোষ্ঠী বিশ্বাস না করায় জাহান্নামে যাবে। এই দুটো গোষ্ঠীর উল্লেখের পর পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তবে সমগ্র মানব জাতিকে একটা জাতিতেই পরিণত করতেন। তবে তিনি নিজের সীমাহীন জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাঁর পছন্দসই লোকদেরকে (অর্থাৎ ঈমানদার সৎ লোকদেরকে) তাঁর রহমতের ভেতরে প্রবেশ করাবেন। পক্ষান্তরে অত্যাচারীদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। তারপর বলা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সকলের অভিভাবক, জীবনদাতা, মৃত্যু-সংঘটনকারী ও সর্বশক্তিমান। (আয়াত-৯)

এখানে থেকে পুনরায় মূল বিষয় অর্থাৎ ওহী ও রেসালাত সংক্রান্ত আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানবজাতি যেসব বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়, সেসব বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, যিনি এই কোরআন নাযিল করেছেন, যাতে মানুষ যে কোনো মতভেদ নিরসনের জন্যে কোরআনেরই শরণাপন্ন হতে পারে। (আয়াত-১০)

এরপর ১১ ও ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনিই একক স্রষ্টা, অতুলনীয় সত্ত্বা, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের নিরংকুশ ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। জীবিকা প্রশস্ত বা সংকীর্ণ করার একচেটিয়া ক্ষমতার মালিক এবং সর্ববিষয়ে সর্বাত্মক জ্ঞানের অধিকারী।

এরপর পুনরায় ওহী ও রেসালাত বিষয়ক আলোচনা এসেছে ১৩, ১৪ ও ১৫ নং আয়াতে। এভাবে সমস্ত সূরা জুড়ে ওহী ও রেসালাতের বিষয়টা বারবার ঘুরে ঘুরে অন্যান্য বিষয় দ্বারা বেষ্টিত হয়ে এসেছে। তাই আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত এই সব বিষয় ওহী ও রেসালাতের অনুষংগ হলেও মনে হয় যেন ওগুলোই মূল আলোচ্য বিষয়। আর আলোচ্য বিষয়ের এই ধারাবিন্যাস বিশেষভাবে সূরার প্রথম অংশে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট। কয়েকটা আয়াত পরপরই পাঠক কোনো না কোনোভাবে ওহী ও রেসালাত বিষয়ক বক্তব্যের সাক্ষাত পায়।

সূরার দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে সূরার বাদ বাকী অংশ। এ অংশের শুরুতে জীবন জীবিকার সংকীর্ণতা ও স্বচ্ছলতা, আল্লাহর দয়াক্রমে বৃষ্টি বর্ষণে, প্রাণীসমূহের বিচরণে এবং সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজে ও নৌকায় আল্লাহর যে নিদর্শন রয়েছে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে মোমেনদের গুণাবলী, যা তাদেরকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে থাকে।

এরপর কেয়ামতের একটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছে অপরাধীরা আযাব দেখে কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে। (আয়াত ৪৪ ও ৪৫) সেই সাথে মোমেনদের উচ্চ মর্যাদা এবং যালেমদের শাস্তির প্রতি তাদের সমর্থনেরও উল্লেখ রয়েছে ৪৫ নং আয়াতে। আর এই দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই সময় থাকতে আত্মশুদ্ধি করে আযাব থেকে আত্মরক্ষা করার আহ্বান জানানো হয়েছে ৪৭ নং আয়াতে। আবার এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে ওহী ও রেসালাত সংক্রান্ত আলোচনায় ৪৮ নং আয়াতে।

www.pathagar.com

এরপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই বিষয়েই আলোচনা অব্যাহত রয়েছে সূরার শেষ পর্যন্ত (আয়াত ৫২-৫৩) সূরার সমগ্র অবয়ব জুড়ে ওহী ও রেসালাত বিষয়ক আলোচনার এই প্রাধান্য থেকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সূরার বিষয়বস্তুর ধারা বিন্যাস ও বর্ণনাভংগীর সাথে এই উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে। এই উদ্দেশ্যটা হলো, শেষ নবী ও তাঁর অনুসারী এই শেষ উম্মাহকে মানব জাতির নেতা ও পথ প্রদর্শকরূপে নিযুক্ত করা। কেননা এই উম্মাহ আল্লাহর সেই বিধান ও শরীয়তের অনুসারী, যা চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়।

সূরার শুরুতে বলা হয়েছে, 'এভাবেই তোমার কাছে ও তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে ওহী নাযিল করেন মহা প্রতাপশালী ও মহাকুশলী আল্লাহ তায়ালা।' (আয়াত ৩) এ উক্তি থেকে স্পষ্টতই প্রতিভাত হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালাই সকল নবী ও রসূলের কাছে ওহী পাঠান এবং শেষ নবীর কাছে আগত দ্বীন ও শরীয়ত নতুন কিছু নয়, বরং প্রাচীন কাল থেকে অব্যাহতভাবে চলে আসা একটা প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ মাত্র।

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বলা হয়েছে, 'এভাবেই আমি তোমার কাছে আরবী কোরআন নাযিল করেছি, যাতে তুমি মক্কা ও তার আশপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক করো।' (আয়াত-৭) এভাবে নতুন নেতৃত্বের কেন্দ্রস্থল কী, তা জানিয়ে দেয়া হলো।

৩ নং আয়াতে সকল রেসালাত ও নবুওতের উৎস এক ও অভিন্ন বলে উল্লেখ করার পর ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই রেসালাত ও নবুওত মূলত এক ও অভিন্ন জিনিস।

তারপর ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদিও রেসালাত ও তার উৎস এক ও অভিন্ন এবং এ নিয়ে ভেদাভেদ করার অবকাশ নেই, তথাপি ১৩ নং আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাকে লংঘন করে ভেদাভেদ করা হয়েছে। আর উক্ত মহান রসূলদের অনুসারীরা এই ভেদাভেদ জেনে ও বুঝে করেছে, হিংসা ও অহংকারের মনোভাব নিয়ে করেছে। এরপর এই ভেদাভেদকারীদের উত্তরাধিকারীদের চরিত্রও তুলে ধরা হয়েছে এই বলে যে, 'তারা ঘোরতর সংশয়ে লিপ্ত।'

এই পর্যায়ে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানবজাতি সন্দেহ উচ্ছৃংখলতার যুগে ফিরে গিয়েছিলো এবং নির্ভুল পথে পরিচালিত কোনো নেতৃত্ব তার ছিলো না। কেননা মহান আল্লাহর প্রেরিত রসূলের নেতৃত্বের ব্যাপারে তার অনুসারীরা সংশয়ে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের উত্তরাধিকারীরাও সংশয়ে লিপ্ত থাকে এবং কোনো সঠিক নেতৃত্ব তাদের মধ্যে ছিলো না।

এ কারণেই সর্বশেষ রসূলকে এই নেতৃত্বের ম্যান্ডেট দেয়া হয়েছে এই বলে, 'অতএব, তুমি দাওয়াত দাও, তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার ওপর অবিচল থাকো এবং বলো, আল্লাহ যে কেতাব নাযিল করেছেন, তাতে আমি ঈমান এনেছি। আর আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তোমাদের প্রতি ন্যায় বিচার করি .....।'

www.pathagar.com

(আয়াত ১৫) আর এ কারণেই এ সূরার দ্বিতীয় অংশে মানবজাতিকে নির্ভুল ও স্থীতিশীল ওহীভিত্তিক আদর্শবাদী নেতৃত্ব প্রদানের স্বাভাবিক যোগ্যতাকে মুসলমানদের অন্যতম জাতীয় ও সামষ্টিক বৈশিষ্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে এই সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় ও অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের মূল সূর ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

সূরা আয যোখরুফ

এ সূরা ইসলামী আন্দোলনের এমন একটা অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছে যখন তা ছিলো নানাবিধ বাধা-বিপত্তি, সমস্যা-সংকট এবং প্রশ্ন ও আপত্তির বাণে জর্জরিত। সেই সাথে এটাও দেখানো হয়েছে যে, কোরআন কিভাবে সেই সব সমস্যার সমাধান দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছে, আর এই সব সমস্যার সমাধান দেয়ার মাধ্যমে কিভাবে বা সে মানুষের মন মগয থেকে জাহেলী যুগের বাতিল ধ্যান ধারণাকে দূর করে সেখানে তার নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই সব জাহেলী ধ্যান ধারণা, চরিত্র ও মানসিকতা শুধু তৎকালীন আরবের গন্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সকল যুগে ও সকল দেশে তা আংশিকভাবে হলেও বিদ্যমান থাকে, আছে ও থাকবে।

জাহেলী যুগের পৌত্তলিকেরা বলতো, মানুষের অধীনস্থ এই সব জীব জন্তুতে আল্লাহর একটা অংশ রয়েছে এবং আমাদের দেব দেবীদেরও একটা অংশ রয়েছে। (সূরা আনয়ামের ১৬৬)

জাহেলী সমাজে পশুদের সম্পর্কে নানারকমের কুসংস্কার প্রচলিত ছিলো। বিকৃত আকীদা বিশ্বাস থেকে এসব কুসংস্কারের উদ্ভব ঘটেছিলো। এ সব কুসংস্কার অনুসারে কিছু পশুর পিঠে সওয়ার হওয়া এবং কিছু পশুর গোশ্‌ত খাওয়া তারা নিষিদ্ধ করে রেখেছিলো। (সূরা আনয়াম-১৩৮)

আলোচ্য সূরা যোখরুফে এসব বিকৃত আকীদা বিশ্বাসের সংশোধন করা হয়েছে এবং মানুষকে প্রকৃত ও নির্ভুল তথ্য পরিবেশন করে বলা হয়েছে যে, পশুরা সব আল্লাহর সৃষ্টি। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সাথে এগুলোর যোগসূত্র রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের অনুগত বানিয়েছেন; যাতে তারা আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করে শোকর আদায় করে। এ জন্যে নয় যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানাবে এবং পশুদের ব্যাপারে এমনসব মনগড়া নিয়ম-বিধি ও প্রথা তৈরী করে নেবে, যা আল্লাহ তায়ালা তৈরী করতে বলেননি। তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এ কথা স্বীকার করলেও-এর ফলশ্রুতিতে যে দায়িত্ব তাদের ওপর এসে পড়ে, তা তারা স্বীকার করে না। এ সত্যটাকে তারা বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং মনগড়া ভ্রান্ত ধ্যান ধারণার অনুসরণ করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তাদেরকে যদি তুমি জিজ্ঞেস কর, আকাশ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, মহা পরাক্রমশালী

www.pathagar.com

মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা ওগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।' (আয়াত ৯-১৪)

জাহেলী যুগের পৌত্তলিকরা বলতো, ফেরেশতারা হলো আল্লাহর মেয়ে। যদিও তারা নিজেরা পছন্দ করতো না যে, তাদের কারো মেয়ে হোক, তবুও আল্লাহর জন্যে তারা মেয়ে পছন্দ করতো! আর এই ফেরেশতাদের তারা পূজো করতো ও বলতো, আমরা তো আল্লাহর ইচ্ছামতোই ওদের পূজো করি। আল্লাহর ইচ্ছে না থাকলে আমরা তা করতাম না। অথচ এটা ছিলো নিছক তাদের ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত তাদের কুসংস্কার। এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা কোথাও মোশরেকদের যুক্তি দিয়েই তাদের দাবী খন্ডন করেছেন। আবার কোথাও সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক যুক্তি দিয়ে তাদের সামাজিক কুপ্রথার অসারতা প্রমাণ করেছেন। (আয়াত ১৫-২২)।

আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা মূর্তি ও গাছ-পালার পূজো করে থাকো, তোমরা ও তোমাদের উপাস্যরা দোজখের কাঠ, আল্লাহ ছাড়া আর যারই উপাসনা করা হোক উপাসকও জাহান্নামের কাঠ, তখন এই সুস্পষ্ট বক্তব্যকে তারা বিকৃত করে এবং এ নিয়ে তর্ক বাধায়। তারা বলে, ঈসাকেও তো তার জাতি পূজো করে থাকে। তিনিও দোযখে যাবেন নাকি? তারা আরো বলে, মূর্তিগুলো হলো ফেরেশতাদের প্রতীক। আর ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে। সুতরাং আমাদের উপাসনা খৃষ্টানদের উপাসনার চেয়ে ভালো। কেননা তারা হযরত ঈসার পূজো করে। হযরত ঈসা তো মানুষ। মানবীয় প্রকৃতির অধিকারী।

এই সূরায় তাদের কূটতর্কের জবাব দেয়া হয়েছে এবং হযরত ঈসার অনুসারীরা ঈসাকে আকাশে তুলে নেয়ার পর যেসব অপকর্ম করেছে, তার দায় দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। (আয়াত ৫৭-৫৯)

জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে থেকেও মোশরেকরা দাবী করতো যে, তারা হযরত ইবরাহীমের ধর্মের অনুসারী। এদিক দিয়ে তারা নাকি ইহুদী খৃষ্টানদের চেয়ে উত্তম ধার্মিক।

এ জন্যে এ সূরায় হযরত ইবরাহীমের ধর্মের প্রকৃত রূপ তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, ওটা তো নির্ভেজাল তাওহীদ। সে তাওহীদের বাণী এখনো বহাল রয়েছে। সেই তাওহীদের বাণী নিয়েই রসূল (স.) এসেছেন। কিন্তু তারা সেই বাণী ও রসূল (স.)-কে যেভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, হযরত ইবরাহীমের বংশধরের পক্ষে তা মোটেই শোভনীয় হয়নি। (২৬-৩০)

কোন যুক্তিতে ও কোন মহৎ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে রসূলরূপে মনোনীত করেছেন, তা তারা উপলব্ধি করেনি। যে অসার ও নিকৃষ্ট জড়বাদী মূল্যবোধের নিরীখে তারা মানুষের মূল্যায়ন করতে অভ্যস্ত, সেই সব মূল্যবোধই তাদেরকে উপলব্ধি করতে দেয়নি।

এ প্রসংগেই আলোচ্য সূরায় তাদের ধ্যান-ধারণা ও কথাবার্তা উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাদের সামনে বিচার বিবেচনার আসল মানদন্ড তুলে ধরা হয়েছে এবং তারা যেসব মূল্যবোধে বিশ্বাসী তার অসারতা ব্যক্ত করা হয়েছে। ..... (আয়াত ৩১-৩৫)

www.pathagar.com

এরপর হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর একটা অংশ আলোচনা করা হয়েছে। এ অংশটাতে দেখা যায়, ফেরাউন সেই সব অসার জড়বাদী মূল্যবোধ নিয়ে কেমন গর্বিত ছিলো, অথচ আল্লাহর কাছে ওগুলো ও ফেরাউন কতো তুচ্ছ ও নগণ্য ছিলো। (আয়াত ৪৬-৫৬)

উল্লেখিত পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কার, আকীদাগত বিভ্রান্তি এবং উল্লেখিত ভ্রান্ত ও অসার মানদন্ড ও মূল্যবোধকে কেন্দ্র করেই সমগ্র সূরাটা আবর্তিত এবং ওগুলোই সূরাটার আলোচ্য বিষয়। সূরাটা তিনটে অংশে বিভক্ত। এবার বিশদ তাফসীরে মনোনিবেশ করা যাক।

সূরা আদ দোখান

ছোট ছোট ছন্দময় আয়াত এবং প্রত্যেক আয়াতের শেষে প্রায় মিত্রাক্ষর শব্দসম্বলিত এই মক্কী সূরার তীব্র সূরের ঝংকার, ভয়াবহ দৃশ্য ও তাৎপর্যময় শিক্ষা আমাদের হৃদয়ে প্রচন্ড ভাবান্তর সৃষ্টি করে।

সমগ্র সূরা একটা অখন্ড ও এককেন্দ্রিক একক বলে মনে হয়। সেই কেন্দ্রের সাথে এর সব কটা অংশ এক সূত্রে বাঁধা, চাই সে অংশ কেসসা কাহিনী সম্বলিত হোক, কেয়ামতের দৃশ্য সম্বলিত হোক, অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্তদের কাহিনী সম্বলিত হোক, প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত হোক। এগুলো সবই মানুষের হৃদয়ে চেতনা সঞ্চারে কার্যকর ও সহায়ক এবং কোরআন মানুষের অন্তরে ঈমানের যে সতেজ ও প্রাণবন্ত বীজ বপন করে, তাকে সাদরে গ্রহণের জন্যে প্রেরণাদায়ক ও উদ্বুদ্ধকারী।

সূরাটা কোরআন সংক্রান্ত বক্তব্য দিয়ে এবং তাকে সেই কল্যাণময় রজনীতে নাযিল করার বর্ণনা দানের মাধ্যমে শুরু হয়েছে যে রাতে প্রতিটা প্রজ্ঞাময় আদেশ বিতরণ করা হয় তা দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন ও সতর্ক করা হয়। অতপর মানুষের কাছে তাদের প্রতিপালককে পরিচিত করা হয়, যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রভু। তারপর তার একত্ব প্রকাশ করে তাকে জীবন ও মৃত্যুর মালিক এবং অতীত ও বর্তমানের সকলের প্রতিপালক বলে ঘোষণা করা হয়।

এরপর প্রসংগ পরিবর্তন করে আরবদের সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে,

'বরং তারা সংশয়ে পতিত হয়ে ছিনিমিনি খেলছে।'

আর এর অব্যবহিত পর এই সংশয় ও ছিনিমিনি খেলার জন্যে শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে, (আয়াত ১০-১১)

এরপর আযাব দূর করার জন্যে তাদের দোয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যেদিন আযাব এসে পড়বে, সেদিন তা আর দূর হবে না। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই আযাব এখনো আসেনি, এখনো এই আযাব তাদের কাছ থেকে দূরে আছে, কাজেই আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার আগে তাদের এই সুযোগ কাজে লাগানো

www.pathagar.com

উচিত। কেননা আল্লাহর কাছে ফিরে গেলে আযাব থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। (আয়াত ১৬)

আযাব, প্রতিশোধ ও কঠিনতম পাকড়াও এর দৃশ্য সংক্রান্ত ভয়ংকর ঘোষণা প্রদানের পর ফেরাউন ও তার দলবলের ধ্বংসের বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেদিন ফেরাউনের কাছে আল্লাহর রসূল এসেছিলো এবং বলেছিলো, আমার কাছে আল্লাহর বান্দাদেরকে সোপর্দ কর, আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল, আল্লাহর সাথে বাড়াবাড়ি করো না। তারা তার কথায় কর্ণপাত করলো না। ফলে আল্লাহর রসূল হতাশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু এত হাম্বি তাম্বি ও দম্ভোক্তি করার পরও ফেরাউন ও তার দলবল চরম অসহায় অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেলো। (আয়াত ২৫-২৯)

এরপর এই দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে তাদের আখেরাত প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত বক্তব্যে ফিরে যাওয়া হচ্ছে এবং তাদের এই উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যে, 'আমাদের প্রথম মৃত্যুই শেষ কথা। আমাদের আর পুনরুজ্জীবিত হতে হবে না। বেশ, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে নিয়ে এসো'। 'তুব্বা' নামক জাতির ধ্বংসের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। কেননা আরবরা তাদের চেয়ে ভালো নয় যে, তাদের ন্যায় পরিণতি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

এরপর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির যৌক্তিকতা ও আখেরাতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। (আয়াত ৩৮-৩৯)

একটুপরেই কেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে। (আয়াত ৪০) এরপর যাক্কুম গাছ ও অন্যান্য আযাবের উপকরণ সহ ভয়াবহ আযাবের দৃশ্য তুলে ধরে চরম বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলা হয়েছে, 'নাও, স্বাদ গ্রহণ করো, তুমি তো পরম সম্মানিত ও প্রতাপশালী, এই যে সেই জিনিস, যা নিয়ে তুমি সন্দেহ প্রকাশ করতে।'

এর পাশাপাশিই দেখানো হয়েছে জান্নাতের গভীর উপভোগ্য দৃশ্য। জাহান্নামের আযাব যতো কঠিন, জাহান্নামের নেয়ামত ততোই সুখময়। সূরার সামগ্রিক কাঠামোর সাথে এই তুলনামূলক বিবরণ অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূরার শুরুর মতো সমাপ্তিও টানা হয়েছে কোরআন সংক্রান্ত বক্তব্য দিয়ে। সেই সাথে একটা প্রচ্ছন্ন হুশিয়ারীও দেয়া হয়েছে সর্বশেষ আয়াতে, 'অতএব অপেক্ষা করো, তারাও অপেক্ষায় আছে।'

সূরাটা শুরু শেষ পর্যন্ত এর দ্রুত ও ক্রমাগত ধ্বনি দ্বারা এবং এর বিভিন্ন দৃশ্য ও রকমারি তাৎপর্যময় বক্তব্য দ্বারা থেকে মানুষের মনের ওপর ক্রমাগত ও প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিতে থাকে। তাকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী বিভিন্ন জগত, দুনিয়া আখেরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম, অতীত ও বর্তমান, দৃশ্য ও অদৃশ্য অংগন, জীবন ও মরণ এবং সৃষ্টির বিধান ও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানায়। এককথায় বলা যায়, সূরাটা অপেক্ষাকৃত ছোটো হলেও এতে রয়েছে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের এক বিরাট তথ্যভান্ডার।

www.pathagar.com

সূরা আল জাছিয়া

এই মক্কী সূরাটা ইসলামী আন্দোলনের সাথে মোশরেকদের আচরণ, ইসলামী দাওয়াতের যুক্তি প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর মোকাবেলায় তাদের কর্মপন্থা, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের গোয়ার্তুমি ও হঠকারিতা এবং প্রবৃত্তির সর্বাত্মক অনুকরণে তাদের সংকোচহীনতা ও লজ্জাহীনতার একটা দিক তুলে ধরেছে। সেই সাথে এটাও তুলে ধরেছে যে, কোরআন কিভাবে তাদের গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমিতে পরিপূর্ণ মনের চিকিৎসা করে। কোরআন তাদের এসব জটিল ব্যাধিকে তার গভীর প্রভাবশালী, সুতীক্ষ্ম আয়াতগুলোর সাহায্যে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তোলে, তাদেরকে আল্লাহর আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাঁর পুরস্কার ও প্রতিদানের বিবরণ দেয় এবং তাঁর নিয়ম নীতি ও বিশ্বজগতে কার্যকর তার প্রাকৃতিক বিধান তাকে অবহিত করে।

যারা মক্কায় বসে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলো এই সূরার আয়াতগুলোতে তাদের বিবরণ পড়তে গিয়ে আমরা তাদের মধ্য থেকে এমন একটা গোষ্ঠীকে দেখতে পাই, যারা গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে লিপ্ত থাকতে বদ্ধপরিকর, যারা সত্যের বিরুদ্ধে চরম আগ্রাসী ও হঠকারী মানসিকতায় আক্রান্ত। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বাণীর প্রতি চরম বেয়াদব ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে অভ্যস্ত এবং তার মোকাবেলায় তারা এমন কর্মকান্ডের আশ্রয় নেয়, যা তাদেরকে কঠিন আযাবের হুমকির যোগ্য বানায়। ৭ থেকে ৯ আয়াত পর্যন্ত এই গোষ্ঠীটার পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

আরো একটা মানবগোষ্ঠীর পরিচয় পাই, যারা খুব সম্ভবত আহলে কেতাবের অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধ্যান ধারণা ও কুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি। নির্ভেজাল ঈমানদার ও সৎ মানুষের কোনো মূল্যই তাদের কাছে নেই। তারা নিজেরা অত্যন্ত অসৎ কর্মশীল হওয়ায় তাদের সাথে সৎ কর্মশীল মোমেনদের মৌলিক পার্থক্য কী, তা তারা অনুধাবন করে না। কোরআন তাদের জানিয়ে দেয় যে, আল্লাহর মানদন্ডে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে এ কারণে তাদের কুচিন্তা ও কুসিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে এবং সৃষ্টির আদিকাল থেকে আল্লাহর মানদন্ডে ন্যায়বিচারই যে সৃষ্টির মূল ভিত্তি সে কথা জানিয়ে দিয়েছে। (আয়াত ২১-২২)

আরো একটা মানবগোষ্ঠী আমরা দেখতে পাই, যাদের একমাত্র মনিব হলো তাদের প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিকে তারা উপাস্য মেনে বসে আছে এবং এর নির্দেশ শীরোধার্য করে চোখ বুঁজে তারা তার আনুগত্য করে। এ গোষ্ঠীটার পরিচয় দেয়া হয়েছে ২৩ নং আয়াতে। এই গোষ্ঠী আখেরাতকে অস্বীকার করে, পুনরুজ্জীবন ও হিসাব নিকাশকে অবিশ্বাস করে এবং তার জন্যে এমন প্রমাণ চায় যা এই পৃথিবীতে দেয়ার কোনো উপায় নেই। কোরআন এই গোষ্ঠীকে আখেরাতের সত্যতার যেসব অখন্ডনীয় যুক্তি প্রমাণ রয়েছে, তার দিকে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানায়। অথচ তারা এ আহ্বানকে উপেক্ষা করে। (আয়াত ২৪-২৬)

www.pathagar.com

এই সব কটা গোষ্ঠীকে একই গোষ্ঠীরূপেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। আবার মক্কায় যারা ইসলামের দাওয়াতের বিরোধিতা করতো, তারা একাধিক গোষ্ঠীও হতে পারে। এদের মধ্যে একশ্রেণীর আহলে কেতাবও ছিলো, যাদের সংখ্যা মক্কায় খুবই কম ছিলো। এমনও হতে পারে যে, মক্কাবাসীর শিক্ষা গ্রহণের জন্যে এই গোষ্ঠীটার উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে তারা মক্কায় বাস করতো না এবং বাস করা জরুরীও নয়।

যাই হোক, কোরআন এই শ্রেণীর মানুষগুলোর এসব অসদগুণ ও অসৎ কর্মের কঠোর সমালোচনা করেছে, এই সূরায় তাদের সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছে, প্রকৃতিতে ও তাদের সত্ত্বায় বিদ্যমান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সাহায্যে তাদের মোকাবেলা করেছে, কেয়ামতের হিসাব নিকাশ সম্পর্কে সতর্ক করেছে এবং আল্লাহর দ্বীন থেকে অতীতে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের কী পরিণতি হয়েছে, তা দেখিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সাহায্যে অতি সহজেই এসব সামগ্রী খুঁজে পাওয়া যায়। (আয়াত ৩ -৬)

আল্লাহর নেয়ামতগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমেও তাদের মোকাবেলা করা হয়েছে। (১২ ও ১৩ নং আয়াত দ্রষ্টব্য) অনুরূপভাবে কেয়ামতের দিন তাদের অবস্থা ও পরিণতির উল্লেখ করেও তাদের মোকাবেলা করা হয়েছে। (আয়াত ২৭-৩৬)

অনুরূপভাবে ১৫ নং আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে ইসলামের কঠোর কর্মফল নীতি ও জবাবদিহিতার নীতি। যারা অন্যায় ও অসৎ কর্মে নিমজ্জিত থেকেও মনে করে যে, তারা আল্লাহর কাছে সৎকর্মশীলদের মতোই বিবেচিত হবে, তাদের জবাব দেয়া হয়েছে ২১ ও ২২ নং আয়াতে।

যদিও সমগ্র সূরা তার বিষয়বস্তুর বিচারে একটা একক ও অখন্ড সূরা, কিন্তু এর ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার সুবিধার্থে একে আমরা দুটো পর্বে ভাগ করেছি,

হা-মীম এই দুটো বর্ণ দিয়ে সূরাটি শুরু হয়েছে। আর এর মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। 'মহা পরাক্রমশালী মহা বিজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা কেতাব।' আর সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা। তার সর্বময় প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের উল্লেখ, তাঁর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার মাধ্যমে। আর এসব ঘোষণা করা হয়েছে যারা আল্লাহর আয়াতগুলো সম্পর্কে উদাসীন, অহংকারী ও বিদ্রূপকারী তাদের মোকাবেলায়। 'অতএব আল্লাহর জন্যেই প্রশংসা ....।' (আয়াত ৩৬ ও ৩৭)

সূরাটা তার বিষয়বস্তুকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সাবলীল ভাষায় পেশ করে। এদিক দিয়ে এ সূরা সূরা দোখানের বিপরীত। কেননা সূরা দোখানে মানুষের হৃদয়ের ওপর হাতুড়ি পেটানো হয়েছে। হৃদয়ের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা। কোরআন নাযিলকারীও আল্লাহ তায়ালা। পরিস্থিতি ও পরিবেশের বিভিন্নতার প্রেক্ষাপটে তিনি কখনো হৃদয়কে প্রচন্ডভাবে আঘাত করেন, কখনো মৃদু মৃদু ও কোমল পরশ বুলান। কখনো শান্ত ও বিনম্র ভাষায় কথা বলেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, গভীর তত্ত্বজ্ঞানী, মহা পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী।

www.pathagar.com

সূরা আল আহকাফ

হিজরতের আগে অবতীর্ণ এই সূরাটিতে সামগ্রিকভাবে ঈমান ও আকীদার বিষয় আলোচিত হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়, এই সমগ্র সৃষ্টি জগতে যতো জীব ও জড় বিদ্যমান তাদের সকলের তিনি একমাত্র সর্বময় কর্তা, মালিক ও প্রভু প্রতিপালক, ওহী ও রেসালাত সত্য, হযরত মোহাম্মদ (স.) একজন রসূল, তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়েছেন। হযরত মোহাম্মদের ওপর কোরআন নাযিল করা হয়েছে তার পূর্ববর্তী কেতাবগুলোকে সত্য প্রতিপন্নকারী হিসাবে। মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া ভালো মন্দ কর্মের প্রতিফল প্রাপ্তি অনিবার্য- এই মর্মে বিশ্বাস স্থাপনের আহবানই এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

এই প্রাথমিক আকীদা বিশ্বাসের ওপরই ইসলাম তার সমগ্র ইমারতের ভিত্তি গড়ে তোলে। এ কারণেই কোরআন তার প্রত্যেকটা মক্কী সূরায় এ বিষয়টাকে মৌলিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করেছে। এমনকি মুসলিম জাতি ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর মাদানী সূরাগুলোতে যখনই সে জীবন যাপনের কোনো বিধিবিধান বা নির্দেশ জারী করতে চেয়েছে, তখনও সে এই ঈমান ও আকীদা বিষয়ক মূলনীতিসমূহের ওপর নির্ভর করেছে। কেননা এই দ্বীনের প্রকৃতিই এরূপ যে, তা আল্লাহর একত্ব, মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাত এবং আখেরাতের হিসাব নিকাশ ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে তার যাবতীয় নিয়ম বিধি আইন কানুনের ভিত্তি ও তার সফল প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস গণ্য করে। আর এই ঈমানের শাশ্বত প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই ইসলামের সকল আইন কানুন, রীতিনীতি ও বিধিবিধান চিরঞ্জীব, চিরউদ্দীপ্ত ও চির উষ্ণ থাকে।

সূরা আল আহকাফ তার এই ঈমান বিষয়ক বক্তব্যকে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে সর্বতোভাবে মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করেছে এবং সর্বপ্রকারের জাগতিক, মানসিক ও ঐতিহাসিক প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গনে তাকে তুলে ধরেছে। এমনকি এই ঈমান ও আকীদার বিষয়কে এ সূরা শুধু মানবজাতির নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যবস্তু রূপে গণ্য করে। এ কারণেই সে কোরআনের সাথে জিনদের সংশ্লিষ্টতার ঘটনার একটা দিকও বর্ণনা করে, যেমন বর্ণনা করে কোরআনের প্রতি বনী ইসরাঈলের কারো কারো আকৃষ্ট হওয়ার প্রসংগটিও। একইভাবে এ সূরায় সত্যের নীরব সাক্ষী প্রাকৃতিক জগতের সাক্ষ্য এবং বনী ইসরাঈলের এক (তাওরাত অভিজ্ঞ) ব্যক্তির সাক্ষ্যকেও সমান গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে এই সূরা মানব হৃদয়কে আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল দিগন্তে ও পরকালের কেয়ামত নামক প্রান্তরে বিচরণ করায়। অনুরূপভাবে এটি তাদেরকে হূদ সম্প্রদায় এবং মক্কার চারপাশের বিধ্বস্ত জনপদগুলোর ধ্বংসলীলাও পরিদর্শন করায়। সেই সাথে আকাশ ও পৃথিবীকে সে কোরআনের মতোই একটা সত্যভাষী গ্রন্থ রূপে উপস্থাপন করে।

www.pathagar.com

সূরাটি এমন চারটি পর্বে বিভক্ত, যার প্রতিটি পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। পুরো সূরাটা চারটা অংশে বিভক্ত হলেও মূলত একটা একক ও একীভূত সূরা। প্রথম পর্বের সাথে সাথেই সূরার সূচনা হয়েছে। পূর্ববর্তী ছ'টা সূরার মতোই এটিও আরবী বর্ণমালার অক্ষর 'হা মীম' দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। আর এ দুটো অক্ষরের অব্যবহিত পরই মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের নাযিল হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে, 'এই কেতাব নাযিল হয়েছে মহাবিজ্ঞানী ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে।' এর পরপরই মহাবিশ্বরূপী গ্রন্থের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত। 'আমি আকাশ পৃথিবী ও উভয়ের মাঝে বিরাজমান সব কিছুকে কেবল সত্যের ভিত্তিতে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।' সুতরাং পঠিত কোরআনরূপী গ্রন্থ ও দৃশ্যমান জগতরূপী গ্রন্থ উভয়েই সত্যানুগ ও সুপরিকল্পিত হওয়ার দিক দিয়ে সমান। আল্লাহ তায়ালা এর পরই বলছেন, 'আর কাফেরদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই।'

এই সর্বাত্মক ও শক্তিশালী ভূমিকা দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা শুরু করেছেন। শুরুতেই বলেছেন যে, তৎকালীন জাহেলী সমাজের মানুষ যে শেরেকের অনুসারী ছিলো, তা একদিকে যেমন প্রাকৃতিক বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না, অপরদিকে তেমনি তার পেছনে কোন সঠিক তথ্য ও বিশ্বস্ত সনদও ছিলো না, 'তুমি বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যেসব জিনিসের উপাসনা করে থাকো, সেগুলো নিয়ে ভেবে দেখেছো কি? তারা পৃথিবীর কী কী জিনিস সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও তো দেখি! না কি আকাশে তাদের কোনো অংশদারিত্ব আছে?' সেই সাথে যারা নিজেদের উপাসকদের ফরিয়াদ শুনতেই পায় না, তাদের পূজারীদের ঘোরতর নির্বুদ্ধিতারও নিন্দা করা হয়েছে। সেসব অপদার্থ উপাস্যরা কেয়ামতের সেই সেই বিপদের দিনে তাদের কৃত উপাসনাকেই প্রত্যাখ্যান করবে!

এরপর হযরত মোহাম্মদ (স.) তাদের কাছে যে সত্যের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তার সাথে তাদের অন্যায় ও অশোভন আচরণের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, 'তারা তাকে প্রকাশ্য জাদু তো বলেছেই উপরন্ত তাকে মোহাম্মদ (স.)-এর মনগড়া বাণী বলেও অপবাদ দিয়েছে। এই পর্যায়ে রসূল (স.)-কে শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে, তিনি যেন এর এমন দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন, তার নবুওত, আল্লাহভীতি এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার সার্বিক আল্লাহনির্ভরতার সপক্ষে যুক্তি পেশ করেন এবং এসব বিদ্বান আহলে কেতাবের সাক্ষ্য দেয়ার পরও দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে যেন তাদের নিন্দা ও সমালোচনা করেন। (আয়াত ৮, ৯, ১০)

এরপর এই অব্যাহত প্রত্যাখ্যানের পক্ষে তারা যেসব খোঁড়া ওজুহাত পেশ করে থাকে, পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে তার স্বরূপ উন্মোচন অব্যাহত রাখা হয়েছে। এখানে তাদের এই গোয়ার্তুমির আসল কারণ তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে পূর্ববর্তী কেতাব তাওরাতের প্রতি কোরআনের সমর্থন এবং এ কেতাবের প্রকৃত ভূমিকা ও লক্ষ্য কি

www.pathagar.com

সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষে যারা ঈমান এনেছে ও ঈমানের ওপর অবিচল থেকেছে, তাদের শুভ পরিণামের বিবরণ দিয়ে প্রথম পর্বের সমাপ্তি টানা হয়েছে। (আয়াত ১১, ১২, ১২ ও ১৪)

দ্বিতীয় পর্বে মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির দুটো নমুনা তুলে ধরা হয়েছে, একটা সুস্থ অপরটা বিকৃত। আকিদা বিষয়ক বিতর্কের ক্ষেত্রে এই দুটো নমুনাই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে। উভয় নমুনার বিবরণ দেয়া শুরু করা হয়েছে উভয়ের প্রথম উন্মেষকাল তথা মা বাবার কোলে অবস্থান করে তখন থেকেই। তারপর তাদের বয়োপ্রাপ্তি ও বিচার বিবেচনার ক্ষমতা প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত তাদের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রথম নমুনার মানুষ আল্লাহর নেয়ামতের ব্যাপারে সচেতন, মা বাবার প্রতি সদাচারী, কৃতজ্ঞ, তাওবাকারী ও আত্মসমর্পণকারী। (আয়াত ১৫)

এই শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের সর্বোত্তম কাজগুলো আমি গ্রহণ করি। (আয়াত ১৬) অপর নমুনাটা হলো মা ও বাবার অবাধ্য হওয়া। সে আল্লাহরও অবাধ্য এবং সে আখেরাতকেও অস্বীকার করে। এই শ্রেণীর মানুষের প্রতি তার মা ও বাবা বিরক্ত অসন্তুষ্ট থাকে। এই শ্রেণীটা সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, এরাই হচ্ছে সেইসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহর উক্তি সত্য প্রমাণিত হয়েছে...... তারা ক্ষতিগ্রস্ত। এই শ্রেণীর লোকদের ভয়াবহ পরিণতি সম্বলিত একটা ত্বরিত দৃশ্য দেখিয়ে এই পর্বটার ইতি টানা হয়েছে। সে দৃশ্যটা হলো, 'যেদিন কাফেরদেরকে আগুনের সামনে হাযির করা হবে। বলা হবে, তোমরা তো তোমাদের সমস্ত উত্তম উপকরণগুলো পার্থিব জীবনেই শেষ ও উপভোগ করে এসেছো। তাই আজ তো তোমরা শুধু অপমানজনক আযাবই ভোগ করবে....। (আয়াত ২০)

তৃতীয় পর্বে আ'দ জাতির ধ্বংসলীলা দেখানো হয়েছে। তাদের সতর্ককারী নবীকে প্রত্যাখ্যান করেই তাদেরকে ধ্বংস হতে হয়েছিলো। এই কাহিনীর কেবল একটা অংশই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তাদের কাছে পানিবিহীন বাতাস ও মেঘ ভেসে আসছিলো। তারা তা থেকে জীবন ও বৃষ্টির প্রত্যাশা করছিলো। অথচ তা তাদের কাছে নিয়ে এসেছিলো সর্বাত্মক ধ্বংস ও তাদের ঈপ্সিত আযাব। (আয়াত ২৪, ২৫)

এই ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাস বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা আরবের কাফেরদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, আ'দ জাতি এদের চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী ও বিত্তশালী ছিলো, তথাপি তারা আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে পারেনি। (আয়াত ২৬)

পর্বের শেষ ভাগে মক্কার পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোর আযাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া, তাদের তথাকথিত দেবদেবীর তাদের সাহায্যে অক্ষম হওয়া এবং তাদের মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচিত হওয়ার বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে। কেননা এ দ্বারা আরবের বর্তমান মোশরেকরা সচেতন হবে ও হেদায়াত লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

চতুর্থ পর্বে রয়েছে একদল জ্বিনের কোরআনের সংস্পর্শে আসার কাহিনী। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কোরআন শুনতে রসূল (স.)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তারা সেখানে গিয়ে কোরআন শুনে এতোই অভিভূত হলো যে, কোরআনকে সত্য বলে বিশ্বাস করা ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর থাকলো না। তারা বলতে বাধ্য হলো যে, 'এ কোরআন পূর্ববর্তী কেতাবকে সত্য বলে, সত্যের দিকে পথপ্রদর্শন করে .....।' এরপর তারা স্বজাতির লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও সতর্ক করে ও ঈমানের দাওয়াত দেয়। তারা বলে, হে আমাদের জনগণ, আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি দাওয়াত দিচ্ছেন তার কথা শোনো ও তার প্রতি ঈমান আনো। ...... (আয়াত ৩১, ৩২)

এই জ্বিন দলটি তাদের স্বজাতির লোকদের কাছে গিয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছে, তা ৩১, ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। ৩৩ নং আয়াতে প্রকৃতির উন্মুক্ত গ্রন্থের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা প্রথম সৃষ্টি ও পুনসৃষ্টি উভয় কাজেই আল্লাহর ক্ষমতা ব্যক্ত করে। এই পর্যায়ে কাফেরদেরকে দোযখের সামনে উপস্থাপনের দৃশ্যটা দেখিয়ে মক্কার কাফেরদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। তখন দোযখ সামনে দেখে তারা স্বীকার করবে যে, দোযখ সত্য। অথচ দুনিয়ায় থাকাকালে তারা তা স্বীকার করতো না, কিন্তু সেদিন স্বীকার করায় কোনো লাভ হবে না।

সূরার শেষ আয়াতটিতে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন ধৈর্যধারণ করেন ও কাফেরদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে তাড়াহুড়ো না করেন। কারণ তাদের তো একটা ক্ষুদ্র মেয়াদ পর্যন্তই অবকাশ দেয়া হয়েছে। এ মেয়াদটুকু শেষ হওয়া মাত্রই তারা আযাব ও ধ্বংসের শিকার হবে। বলা হয়েছে, দৃঢ় প্রতিষ্ঠ ও সাহসী নবীরা যেরূপ ধৈর্যধারণ করেছে, তুমিও তদ্রূপ ধৈর্যধারণ করো।' (আয়াত ৩৫)

সূরা ক্বাফ

রসূলুল্লাহ (স.) সাধারণত এই সূরা দিয়ে ঈদ ও জুময়ার জামায়াতে ভাষণ দিতেন এবং তাতে শ্রোতাদের মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হতো।

আসলে এটি একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ভীতিপ্রদ বিবরণ সম্বলিত সূরা। আল্লাহ তায়ালা যে তাঁর সকল সৃষ্টিকে প্রতি মুহূর্তে অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন এবং সেই পর্যবেক্ষণ যে তার ওপর তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, মৃত্যু থেকে পুনরুজ্জীবন পর্যন্ত, তার পর থেকে কেয়ামতের ময়দানে জমায়েত হওয়া পর্যন্ত এবং তারপর থেকে হিসাব গ্রহণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, সে কথা এই সূরায় সুন্দর করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এটি একটি নিদারুণ ভীতিপ্রদ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, যা মানুষ নামক এই দুর্বল সৃষ্টির ওপর পরিপূর্ণভাবে কার্যকর রয়েছে ও থাকবে। মানুষ এমন এক সত্তার মুঠোর মধ্যে রয়েছে, যিনি তার সম্পর্কে কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও উদাসীন হন না এবং একটুও দূরে সরেন না। তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসকে তিনি গুনে রাখেন। তার মনের প্রতিটি চিন্তা তার জানা। তার প্রতিটি উচ্চারণ তাঁর কাছে লিখিত এবং তার প্রতিটি কার্যকলাপ ও নড়াচড়ার হিসাব তাঁর কাছে সংরক্ষিত। এই সর্বাত্মক ও ভয়ংকর

www.pathagar.com

পর্যবেক্ষণের আওতাধীন রয়েছে তার অন্তরের প্রতিটি ভাবনা এবং তার অংগ-প্রত্যংগের প্রতিটি তৎপরতা। প্রতিটি মুহূর্তে তার প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য কাজের ওপর এই সর্বাত্মক প্রহরা কার্যকর রয়েছে।

আল্লাহর এই সর্বাত্মক প্রহরা ও পর্যবেক্ষণের বিষয়টি সর্বজন বিদিত। কিন্তু এই সূরায় তা এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেন তা নতুন কিছু, যেন তা শরীরে রোমাঞ্চ তোলে, স্নায়ুতে শিহরণ জাগায় এবং উদাসীন মানুষকে সচকিত করে তোলে। আর এ সব কিছুই করা হয় জীবন, মৃত্যু, পরকাল ও কেয়ামতের কথা স্মৃতিতে জাগরূক করার মাধ্যমে এবং আকাশ, পৃথিবী, পানি, উদ্ভিদ, ফল ও ফসলের দৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে।

এ ধরনের সূরার আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা খুবই কঠিন। তবু আমি আমার সাধ্যমতো কিছু পেশ করলাম।

সূরা আয যারিয়াত

এই সূরাটির একটি বিশেষ আবহ ও পরিবেশ রয়েছে। এর শুরুতেই আল্লাহর সৃষ্টিজগতের চারটি শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে কিছুটা রহস্যময় ভাষায়। সূচনাতেই এই ধারণা দেয়া হয় যে, সে কতকগুলো রহস্যময় জিনিসের সম্মুখীন। প্রথমেই আল্লাহ তায়ালা একটি বিষয়ে কসম খেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'কসম ধুলিঝঞ্ঝার .... তোমাদেরকে যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে, আর কর্মফল প্রদানের কাজ অবশ্যই সম্পন্ন হবে।'

প্রথম দফায় যে চারটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে 'যারিয়াত', 'হামেলাত', 'জারিয়াত' ও 'মোকাসসেমাত'। এ শব্দ কয়টির অর্থ তেমন সুপরিচিত নয়। ফলে এর অর্থ জানার জন্যে প্রশ্ন ও উত্তরের প্রয়োজন পড়ে। উপরন্তু এ শব্দ কয়টি মানুষের অনুভূতিতে অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করে, আর এটাই বোধ হয় সূরার প্রথম উদ্দেশ্য।

এরপর দ্বিতীয় দফা কসম খাওয়া হয়েছে এভাবে, 'কসম বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের। নিশ্চয় যে বিষয়ে তোমরা নানা ধরনের বক্তব্য দিয়ে থাকো।' অর্থাৎ যে সব বক্তব্যের মধ্যে কোনো সমন্বয় ও সামঞ্জস্য নেই, যা কোনো জ্ঞানভিত্তিক নয়, বরং অনুমান ভিত্তিক।

সূরা এভাবে শুরু হওয়া এবং গোটা সূরা জুড়ে একই ধরনের বক্তব্যের প্রাধান্য পাওয়া সত্ত্বেও এর একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। সেই উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনকে আল্লাহ ও তাঁর অদৃশ্য জগতের সাথে যুক্ত করা, তাকে যাবতীয় পার্থিব মলিনতা থেকে পবিত্র করা এবং আল্লাহর আনুগত্যের পথের সকল বাধা থেকে তাকে মুক্ত করা। এ উদ্দেশ্যের সাথে সূরার দুটি আয়াতের বক্তব্যের মিল রয়েছে। যথা, 'তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো' এবং 'আমি জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমার দাসত্বের জন্যে সৃষ্টি করেছি।' প্রথমটিতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টিতে বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

যেহেতু জীবিকা উপার্জনে ব্যস্ত থাকা ও তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজই আল্লাহর ইবাদতের পথে সবচেয়ে বড় বাধা, তাই এই সূরায় মানুষের অনুভূতিতে জীবিকার হাতে যিম্মী হওয়া থেকে মুক্ত করার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং মানুষের এবং এ ব্যাপারে মনকে পৃথিবী ও পার্থিব উপকরণাদির ওপর নয় বরং আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে এই সূরায় একাধিক জায়গায় বক্তব্য রাখা হয়েছে। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে যথা 'আকাশেই তোমাদের জীবিকা ও তোমাদের জন্যে প্রতিশ্রুত অন্যান্য জিনিস রয়েছে।' 'আল্লাহই জীবিকাদাতা এবং অটুট শক্তির অধিকারী।' আবার কোথাও আভাস-ইংগিতে, যথা, 'তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের প্রাপ্য রয়েছে।' এবং হযরত ইবরাহীমের দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতার বিবরণ দানের মাধ্যমেও শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

সুতরাং এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো, মন-মগযকে জীবিকার গোলামী, বাঁধা ও বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল করা ও তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণের শিক্ষা। অন্য সকল আলোচিত বিষয় ও ঘটনাবলী এই মূল বিষয় থেকেই উদ্ভূত। এ জন্যেই সূরাটি এভাবে কসমের মাধ্যমে ও অস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং তারপর আকাশের নামে শপথ ও বারবার আকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরার প্রথম দিকে পরহেযগার লোকদের যে ছবি আঁকা হয়েছে, যথা–'নিশ্চয় পরহেযগার লোকেরা বাগানসমূহে ও ঝর্নাসমূহে অবস্থান করবে। .... তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।' এ আয়াতগুলোতে আল্লাহর প্রতি অনুরাগ ও নিষ্ঠা, রাত জেগে তাঁর এবাদাত, শেষ রাতে তাঁর দরবারে ধরণা দেয়া, সেই সাথে সম্পদের লালসা ও প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং প্রার্থী ও বঞ্চিতের প্রাপ্য দেয়াকে পরহেযগারদের বৈশিষ্ট রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আর এ প্রসংগেই মোমেনদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে পৃথিবীতে ও তাদের নিজ সত্তায় আল্লাহর যে নিদর্শনাবলী বিরাজ করছে তার দিকে মনোযোগ দিতে, আর সেই সাথে জীবিকা অর্জনের পার্থিব উপকরণগুলোর পরিবর্তে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হতে বলা হয়েছে, 'আর পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের জন্যে বহু নির্দশন রয়েছে....... তবু কি তোমরা তা দেখতে পাওনা? আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা এবং যা যা তোমাদেরকে দেয়ার ওয়াদা করা হয়।'

এই প্রসংগে আকাশকে সুন্দরভাবে নির্মাণ করা, পৃথিবীকে বিস্তৃত করা, পৃথিবীতে জোড়ায় জোড়ায় প্রাণী ও উদ্ভিদ ইত্যাদি সৃষ্টি করা এবং এ সবের ওপর আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আকাশকে আমি নির্মাণ করেছি এবং আমি প্রশস্তকারী .....।' অতএব আল্লাহর কাছে আশ্রয় নাও। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য সতর্ককারী।'

সর্বশেষে সূরার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি উচ্চারিত হয়েছে, যাতে আল্লাহ তায়ালা জ্বিন ও মানুষের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য কী, তার উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বলা হয়েছে, 'আমি আমার এবাদাত ব্যতীত আর কোনো উদ্দেশ্যে জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করিনি।' .... নিশ্চয় আল্লাহই জীবিকাদাতা, শক্তিশালী ও চিরঞ্জীব।'

এভাবে সূরাটিতে বিভিন্ন সুরে ও বিভিন্ন ভংগিতে একটা বক্তব্যই উচ্চারিত হয়েছে। তাহলো, মানুষ যেন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়।

এ সূরায় অতি সংক্ষেপে হযরত ইবরাহীম, লূত, মূসা, আদ জাতি, সামুদ জাতি ও নূহ (আ.)-এর সমকালীন মানবজাতির ঘটনাবলীর প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীমের ঘটনার প্রতি ইংগিত দিতে গিয়ে সম্পদ ব্যয় করে আতিথেয়তা, তাকে একটি জ্ঞানী পুত্র দানের সুসংবাদ প্রদান এবং তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সন্তান দানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর বাদবাকী ঘটনাগুলোতে আল্লাহর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের বিবরণ দেয়া হয়েছে যা তিনি সূরার শুরুতে কসম খেয়ে দিয়েছেন। যথা 'তোমাদেরকে যা যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই সত্য।' আর সূরার শেষে মোশরেকদেরকে যে হুমকি দেয়া হয়েছে, তাও সত্যে পরিণত করার বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই হুমকি হলো, 'যালেমদের জন্যে তাদের সমমনাদের মতোই শাস্তি প্রাপ্য রয়েছে....' আর এর কিছু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেরদের বংশধরেরা যেন আবহমান কাল ধরে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে। বলা হয়েছে, অনুরূপভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোনো রসূল এসেছে, অমনি তাকে জাদু-করে অথবা পাগল বলে অভিহিত করেছে! তবে কি তারা পরস্পরকে এ কথা বলার জন্যেই উদ্বুদ্ধ করে আসছে? আসলে তারা একটা গোমরাহ জাতি।'

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেলো যে, এ সূরার কিস্সা কাহিনী তার মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথেই সংযুক্ত। সেই মূল বিষয়টি হলো আল্লাহর এবাদাতের জন্যে মনকে একাগ্র ও একনিষ্ঠ করা, তাকে ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যয়ের অটুট বন্ধন দ্বারা আল্লাহর সাথে যুক্ত করা এবং সর্বশেষে সকল বাধাবিপত্তি ও ব্যস্ততাকে অতিক্রম করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়া।

সূরা আত তূর

আলোচ্য সূরাটি মানুষের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং পড়ার সময় পাঠকের অন্তর থেকে যাবতীয় পেরেশানী, সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং নানাভাবে আগত যেসব ভুল চিন্তা ও চেতনা, যা তার অন্তরে বাসা বেঁধে রয়েছে–দূর হয়ে যায়, আর যেসব ওযর-অজুহাত দিয়ে এই মিথ্যার মায়াজাল তাকে অভিভূত করে রেখেছিলো এবং সত্য গ্রহণ করা থেকে সরিয়ে রেখেছিলো তা খান খান হয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সূরাটি এতো গভীরভাবে অন্তরকে প্রভাবিত করে যে, কোনো পাঠকই এ প্রভাবকে উপেক্ষা করতে পারে না, যার ফলে আল্লাহর কাছে সে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর হুকুম মানতে সে বাধ্য হয়ে যায়।

www.pathagar.com

সূরাটির মধ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলো এবং হৃদয়ে গেঁথে যাওয়ার মতো বিভিন্ন আলোচ্য-বিষয় রয়েছে, এ উভয়ের সমন্বয়েই গঠিত হয়েছে এ বশীভূত করার ক্ষমতা। উপরন্তু এতে রয়েছে অর্থ ও শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের ব্যাপকতা। আরও রয়েছে এর মধ্যে ছবির মতো আঁকা বিবরণসমূহ। বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে সূরাটির মধ্যে এতো সুন্দরভাবে যে, বিভিন্ন অনুচ্ছেদ ও অধ্যায়ে বর্ণিত কথাগুলো যেন সুরের এক মূর্ছনা সৃষ্টি করেছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণিত ঘটনা পরম্পরা তাই পাঠকের হৃদয়কে দারুণভাবে অভিভূত করে। সূরাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো যেন তীরবেগে পাঠকের হৃদয়ে বিদ্ধ হয়, ঘটনাবলী যেন বজ্রপাতের মতো এবং চিত্রের মতো আপতিত হয়, আঁকা কথাগুলো যেন অনুভূতির দুয়ারে এমনভাবে কষাঘাত করতে থাকে যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি মুহূর্তও যেন তা থামতে চায় না।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা যমীন ও আসমানের বিভিন্ন পবিত্র বিষয় ও জিনিসের নাম নিয়ে শপথ গ্রহণ করার সাথে সূরাটি শুরু করছেন। সে বিষয়গুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি আমাদের সুপরিচিত যা খোলাখুলি বাহ্যিক চোখে দেখা যায় এবং কোনো কোনোটি থাকে চোখের আড়ালে এবং মানব সাধারণের কাছে অপরিচিত ও বুদ্ধিরও অগম্য। এরশাদ হচ্ছে,

'কসম তূর পর্বতের এবং লিপিবদ্ধ কিতাবের, যা লিখিত হয়েছে সপ্রশস্ত কিতাবে। কসম বায়তুল মা'মুর-এর সমুন্নত ছাদের এবং উত্তাল সমুদ্রের।'

এখানে অতি ভয়ানক কিছু বিষয়ের কসম খাওয়া হয়েছে, যা অনুভূতিকে প্রবলভাবে ভীতসন্ত্রস্ত করে। সূরাটির ব্যাখ্যার মধ্যে 'ভয়' কথাটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। আর যেসব দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে তাতে দারুণভাবে হৃদয় প্রকম্পিত হতে থাকে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই তোমার মালিকের আযাব সংঘটিত হবে, কোনো কিছুই তাকে রোধ করতে পারবে না। সে দিন আকাশ ভীষণভাবে আন্দোলিত হতে থাকবে এবং পাহাড়-পর্বত স্থানচ্যুত....।'

এ ভয়ংকর দৃশ্যের মধ্যে আমরা প্রবল কম্পনের একটা দৃশ্য দেখতে পাব এবং তার ভয়ানক আওয়াযও শুনতে পাবো। চতুর্দিকে দেখা যাবে শুধু ধ্বংস-বিপর্যয়, প্রচন্ড ধাক্কা ও সব কিছু ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ার ভয়ংকর দৃশ্য। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং চরম ধ্বংস নেমে আসবে সেদিন সেইসব মিথ্যারোপকারীদের জন্যে, যারা হেলায় খেলায় নানা প্রকার মিথ্যা কথা বলে। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তাদেরকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এ-ই হচ্ছে সেই অগ্নিকুন্ড, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে ......তোমাদের তো সেই সকল কাজের প্রতিদান দেয়া হচ্ছে যা তোমরা (দুনিয়াতে) করতে থেকেছো।'(আয়াত, ১১-১৬)

www.pathagar.com

পাপীদের প্রতি উপর্যুপরি যে আক্রমণ হবে তার শেষ পরিণতি হবে এই দোযখ। অবশ্য অন্য আরও অনেকভাবে কঠিন পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষমান থাকবে। অতি কঠিন ও ভয়ানক এ পরিণামের দিকে তাদের এগিয়ে যাওয়ার কারণ হবে তাদের বল্লাহারা কুপ্রবৃত্তির চাহিদা মেটাতে গিয়ে বেপরোওয়া হয়ে যাওয়া। যখন দুনিয়াতে তারা নিরাপত্তা লাভ করেছে ও নানাপ্রকার বিলাসিতার উপকরণ লাভে ধন্য হয়েছে, তখনই কুপ্রবৃত্তির তাড়নে তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছে। কেয়ামতের সে ভয়াবহ দিনে তারা আশাভরা চাহনি নিয়ে তাকাতে থাকবে

নিরাপদ অবস্থানে থেকে নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাহদের দিকে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নানা বর্ণের নানা প্রকৃতির ভোগ-বিলাসের অফুরন্ত উপকরণ ও সম্মানপ্রাপ্তি দেখে, আযাবে পতিত সে হতভাগারা লালায়িত হবে, সেসব নেয়ামতের প্রাচুর্য দেখে তাদের অনুভূতি ছটফট করবে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আল্লাহভীরু লোকেরা বাগ-বাগিচায় ভরা বেহেশতে এবং স্বয়ং আল্লাহ পাকের দেয়া নেয়ামতের মধ্যে মাতোয়ারা হয়ে থাকবে .....সারিবদ্ধ খাট-পালং-এ হেলান দিয়ে তারা আরামের সাথে উপবিষ্ট থাকবে।' (আয়াত, ১৭-২০)

আল্লাহ তায়ালা আরও জানাচ্ছেন, 'আমি আয়ত-লোচনা সুন্দরী রমণীদের সাথে তাদের বিয়ে দেবো। আর যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের সাথে যে সকল সন্তান-সন্ততি তাদের অনুসরণ করেছে, তাদেরকে ওদের সাথে মিলিত করে দেবো..... বেহেশতীরা এই বলে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যাবে, 'আমরা তো এর পূর্বেও এমনি করে পরস্পরের প্রতি দরদী ও সহানুভূতিশীল ছিলাম, তাই না? এজন্যই আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি এই দয়া করেছেন এবং আমাদেরকে প্রচন্ড উত্তপ্ত আগুনের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। অবশ্যই আমরা ইতিপূর্বে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করেছি, নিশ্চয়ই তিনি অতি মহান ও নেক কাজের প্রতিদান দেন এবং তিনি অতি মেহেরবান।' (আয়াত, ২০-২৭)

আমরা দেখতে পাচ্ছি, আলোচ্য সূরার মধ্যে প্রথমেই মানুষের সামনে আযাবের কষাঘাতের কথা তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়ের মধ্যে বলা হয়েছে যে, মানুষের অন্তর আল্লাহ্ পাকের অতুলনীয় নেয়ামতের স্বাদ অবশ্যই অনুভব করে এবং তৃতীয় আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে, মানুষ এমনই এক জীব যে সে কোনো কিছু যেন বেশীদিন স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারে না, বরং নানা প্রকার পেরেশানী ও প্ররোচনা তাকে যেন তাড়িয়ে বেড়ায়, তার মনের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় দানা বাঁধতে থাকে এবং নানাপ্রকার ভ্রান্তির বেড়াজালে সে আবদ্ধ হয়ে যায়। তখন সে বিবিধ হিলা-বাহানা ও ওযর-আপত্তি পেশ করে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়, অথচ পরিষ্কারভাবে তাদের সামনে সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে এবং অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সত্যের বাতিকে উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে। সত্যের বাণীকে এমন উত্তম যুক্তি সহকারে পেশ করা হয়েছে যে অন্য কোনো ব্যাখ্যা করে সত্য থেকে দূরে থাকার কোনো সুযোগ নেই। সত্য-সঠিক পথ হচ্ছে এমন সরল ও মযবুত পথ যে তার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা বা মারপ্যাঁচ নেই। সত্যের জোরালো যুক্তির কাছে মানুষের ঘাড় আপনা থেকেই ঝুঁকে পড়ে এবং

www.pathagar.com

পরিশেষে মেনে নিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়, আর এ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই কথা বলার জন্য রসূলুল্লাহ (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি মানুষকে সঠিক উপদেশ দিতে পারেন। যদিও রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে তারা চরম বেআদবী করে আসছিলো, তবু অত্যন্ত শক্তিশালী ও যুক্তিপূর্ণ কথা দ্বারা তাদের হৃদয় দুয়ারে বারবার আঘাত হানার জন্য রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি এ নির্দেশ ছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব, (হে আমার নবী) উপদেশ দিতে থাকো, তুমি তোমার রব-এর মেহেরবানীতে কোনো গনক নও এবং পাগলও নও। ..... আমিও তোমাদের সাথে সে বিপজ্জনক অবস্থার জন্য অপেক্ষা করছি.........তাঁর ক্ষমতায় কেউ অংশীদারি গ্রহণ করুক এ দুর্বলতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। (আয়াত, ২৯-৩১)

মোটকথা, এইসব উপর্যুপুরি প্রশ্নের পেছনে একথা বলা রয়েছে, নবী (স.)-কে আঘাত দেয়ার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত এই প্রশ্নবাণের মূলে কোন ইচ্ছা কাজ করছে? হাঁ, এসব কটূক্তি দ্বারা তারা চাইছে যে, যে সত্য সমাগত হয়েছে তা বাতিল শক্তির এইসব প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে ময়দান থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রতিযোগিতায় এবং হিংসাত্মক কাজ করার সংগ্রামে তারাই বিজয়ী হোক, মোহাম্মদ (স.)-এর পয়গাম পৌছানোর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাক এবং সত্য প্রচারের আন্দোলন থেমে যাক। এর পেছনে সত্যের নিশানবর্দারকে নিস্তেজ করে দেয়ার অসৎ ইচ্ছা ও বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব যে প্রকটভাবে রয়েছে তা সহজেই অনুভব করা যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'যদি ওরা কখনও আকাশের কোনো টুকরাকে পতিত হতে দেখে তখন বলে উঠে এটা তো নিছক ঘণীভূত এক খন্ড মেঘমালা'। কিন্তু 'আকাশ থেকে কোনো টুকরার স্খলিত হওয়া এবং মেঘমালার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সে সব কিছু জেনে-বুঝেও স্পষ্ট সত্যের বিরোধিতা করার অসদুদ্দেশ্যে তারা সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করে চলেছে।

এখানে তাদের প্রতি শেষ বাণ নিক্ষেপ করা হচ্ছে, এ হচ্ছে প্রচন্ড এক ধমকের বাণ যখন এ ভয়ানক দৃশ্য তারা দেখবে তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে আযাবের এই ধমক, আর এরই উল্লেখ হয়েছে সূরাটির শুরুতে, 'ছেড়ে দাও ওদেরকে সেই প্রলয়ংকরী চীৎকারধ্বনির আযাবের মধ্যে পতিত হওয়ার জন্য ..... সে দিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোনো কাজেই লাগবে না এবং তাদেরকে কোনো দিক থেকে সাহায্যও করা হবে না।' এইভাবে এই রকম আরও একপ্রকার শাস্তির ধমক তাদেরকে দেয়া হচ্ছে, 'যারা যুলুম করেছে তাদেরকে এ আযাব ছাড়া আরও একপ্রকার আযাব দেয়া হবে। কিন্তু ওদের অধিকাংশই এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান রাখে না।'

এরপর কিছু নমনীয় ও সন্তোষজনক কথা দ্বারা সূরাটিকে সমাপ্ত করা হয়েছে, ওরা রসূল (স.)-কে যে সব কথা বলতো তার উল্লেখ করে আয়াতে বলা হয়েছে, 'ও তো একজন কবি, যার ওপর মৃত্যুসম কোনো বিপদ নেমে আসুক এরই অপেক্ষায় আমরা

www.pathagar.com

আছি।' ওরা নবী সম্পর্কে আরও বলতো, 'এ লোকটি একজন গনক বা জ্যোতির্বিদ অথবা পাগল।' আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী (স.)-কে লক্ষ্য করে সম্ভ্রম ও সান্ত্বনার স্বরে এমন মধুর বচনে বলা হয়েছে যার কোনো নযির ইতিপূর্বে কোরআন করীমে পাওয়া যায়নি এবং কোনো নবী-রসূলকে এর আগে এই ভাবে সম্বোধন করাও হয়নি-'তোমার রব-এর পক্ষ থেকে আসা ফায়সালার অপেক্ষা করো, আমি বলছি, কিসের চিন্তা, যখনই তুমি নামাযে দাঁড়াবে, তখন তোমার রব-এর প্রশংসায় আত্মনিয়োগ করবে এবং রাতের এক অংশে তাঁর নামের গুণ গাইতে থাকবে আর তখনও তাঁর প্রশংসায় ....।'

উক্ত মধুর বচন দ্বারা মেহেরবান পরওয়ারদেগার তাঁর প্রিয় নবীর ওপর দুশমনদের পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত বাক্যবাণের প্রলেপ দান করছেন। অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আসা এ কথাগুলো রসূল (স.)-এর জর্জরিত হৃদয়ে এমন মধুর পরশ বুলিয়ে দিয়েছিলো, যার কারণে শত্রু কর্তৃক উপর্যুপরি আঘাতের ঘা সহজেই শুকিয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহ্ তায়ালা তূর পর্বতের কসম খেয়ে বলছেন, 'কসম তূর পর্বতের, লিখিত আকারে আসা কেতাবের, ...।' (আয়াত ১-১৬)

এই ছোট ছোট আয়াতগুলো যা বড়ই মনোরম সংগীতের মতো অবতীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে মানুষদের কাছে গাওয়া হয়েছে। সূরাটির শুরুর দিক লক্ষ্যণীয়, এক একটি শব্দ উচ্চারণ করে তার কসম খাওয়া হয়েছে, তারপরই দুটি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে, তারপর একটু একটু করে অগ্রসর হয়ে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে বারোটি কথায়। এই কথাগুলোতে শক্তিশালী একটি প্রসংগ বিধৃত হয়েছে।

সূরা আন নাজম

আলোচ্য সূরাটির প্রধান অংশ মনে হয় কবিতা আকারে নাযিল হয়েছে। এর প্রতিটি শব্দ ও ছত্রের মধ্যকার চমৎকার ছন্দ পাঠকের মনে প্রাণ মাতানো এমন এক ঝংকার তোলে, যা যে কোনো সংগীতের মূর্ছনাকে হার মানায়। সংগীতের এই ধ্বনি সূরাটির সর্বত্র যদিও এক মনোমুগ্ধকর আবেগের পরশ বুলিয়ে দেয়, তবুও সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠে, পাঠককে তা সচেতন করে তোলে। তার হৃদয়-কমলে ভাবের আবেগ সৃষ্টির জন্যে এবং আলোচ্য বিষয়টির গুরুত্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কখনও কখনও সমার্থবোধক শব্দের সংযোজন করা হয়েছে, অথবা কখনও পংক্তির শেষে চমৎকার মিল দেখানো হয়েছে। এইভাবে কোরআনের বর্ণনা পদ্ধতি অনুসারে মূল উদ্দেশ্যকে অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে; যেমন বলা হয়েছে,

'তোমরা কি লাত ও ওযযাকে দেখোনি, দেখোনি কি মানাত নামীয় তৃতীয় আরো একজনকে?' যদি বলা হতো 'মানাতাল্ উখরা', তাহলে ছন্দ পতন ঘটতো। আবার যদি বলা হতো 'অ-মানাতাস্ সালেছাতা' তাহলেও লাইনের শেষে মিল থাকতো না। আর যেহেতু যে কোনো বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দের নিজস্ব একটি মূল্যমান রয়েছে, তাই অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যেকটি বাক্যের প্রতিটি শব্দের শেষে যেমন মিল রাখা হয়েছে, তেমনি ছন্দ পতন না ঘটে সেদিকেও খেয়াল রাখা হয়েছে। এমনই পরবর্তী

www.pathagar.com

দুটি আয়াতের ছন্দের সাথে মিল রাখতে গিয়ে মাঝে আর একটি শব্দ 'ইযান' ব্যবহার করা হয়েছে।

দেখে মনে হচ্ছে শুধু ছন্দ ঠিক রাখার জন্যেই 'ইযান' শব্দটি বসানো জরুরী মনে করা হয়েছে, কারণ এ শব্দটি ছাড়াই বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়। এইভাবে কথাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে ছন্দের মিল-এর দিকে বিশেষভাবে খেয়াল দেয়া হয়েছে।

এখানে এই সুরের মূর্ছনার দুটি উল্লেখযোগ্য দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি হচ্ছে এর বর্ণনাভংগি, যা পাঠকের অন্তরে ভাবের এক তরংগ সৃষ্টি করে এবং রব্বুল আলামীনের সাথে তার নিবিড় সম্পর্কের কথা জানায়, বিশেষ করে সূরাটির প্রথম ও শেষ ভাগে এ বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ভাগের ছন্দময় কথাগুলো পাঠকের হৃদয়কে এমন আবেগমুগ্ধ করে যে, সে যেন সাগরের ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে থাকে এবং প্রেমাস্পদের সাথে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা তার মধ্যে এক মধুময় কম্পন সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত কথাগুলো বান্দা ও প্রভুর.মধ্যে সম্পর্কের যুক্তিপূর্ণ কথাগুলোকে তুলে ধরে। আর এই দুটি অধ্যায়ের মাঝের কথাগুলো আবেগ ও যুক্তির মধ্যে এক সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে।

সৃষ্টি রহস্যের বাস্তব চিত্র এবং অজানা-অচেনা অথচ গভীর ও আকর্ষণীয় এক মধুময় সম্পর্কের আবেগ যেন এক মায়াময় ছায়া যা পাঠকের হৃদয়পটে নূরানী আলোর এক শুভ্র সমুজ্জ্বল ছটা ছড়িয়ে দেয় এবং ভক্তের হৃদয়কে প্রভুর অস্তিত্ববাহী আদিগন্তব্যাপী রহস্যরাজির সাথে গভীরভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়। সৃষ্টির উন্মুক্ত অঙ্গনে সঞ্চরণশীল বিশ্বস্ত বার্তাবাহক জিবরাঈল (আ.) সে রহস্যজাল ভেদ করে সম্মানিত রসূল (স.)-এর কাছে আল্লাহর বাণী বহন করে হাযির হয়েছেন তা আর বুঝতে কষ্ট হয় না। সৃষ্টি রহস্যের দৃশ্য-অদৃশ্য ছবি সঞ্চরণশীল গ্রহ-উপগ্রহ ও তারকারাজি, ইন্দ্রিয়গাহ্য বিষয়াদি এবং আত্মিকভাবে অনুভব করার মতো বিষয়সমূহ সব কিছুই পরস্পর এক অবিচ্ছেদ্য সুতায় গাঁথা রয়েছে। আলোচ্য সূরার চমৎকার ছন্দময় আয়াতগুলোর সুরের ঝংকারে এ সত্যটি ধরা পড়ে।

তারপর দেখা যায় শ্বাস-রোধকারী এক আশ্চর্য আবেগ ছড়িয়ে রয়েছে সূরাটির সর্বত্র। এই আবেগের চিহ্নগুলো পরিস্ফূট হয়ে রয়েছে নীচে বর্ণিত অধ্যায়গুলোতে যা পাঠকের হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করে তাকে উজ্জীবিত করে তোলে তার অস্তিত্বের অণুপরমাণুগুলোর মধ্যে এক প্রকম্পন সৃষ্টি হয়, সে ভাবের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠে এবং আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় তাই যা অন্যান্য মক্কী সূরার মধ্যে বর্তমান, অর্থাৎ ঈমান-আকীদার মূল বিষয়গুলো, ওহী, আল্লাহ তায়ালার একত্ব এবং আখেরাত। আরও নির্দিষ্ট করে বললে বলা যায় যে, ওহীর সত্যতা সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস জন্মানো এবং

www.pathagar.com

শেরেক ও-এর অলীক ধারণা-কল্পনার অসারতা প্রমাণের জন্যে এ সূরাটির মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

সূরাটির প্রথমাংশে আলোচ্য বিষয়ের লক্ষ্য হচ্ছে ওহীর প্রকৃতি ও তাৎপর্য পেশ করা এবং এ বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্য বহনকারী বিভিন্ন প্রমাণের মধ্যে দুটি প্রমাণ হাযির করে ওহীর সত্যতা ও বাস্তবতা তুলে ধরা। এ বিষয়ে রসূল (স.) এবং জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত, তাঁকে খোলা চোখে সুবিস্তীর্ণ ময়দানে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা এবং মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত আয়াতসমূহ দ্বারা তার সাক্ষ্যদানও এ সূরার মধ্যে পেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশে মোশরেকদের দাবী করা দেব-দেবী লাত, উযযা ও মানাত এবং ফেরেশতাকুল সম্পর্কে তাদের কাল্পনিক ধারণা সম্পর্কে বিবরণ পেশ করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে তাদের আল্লাহর কন্যা হওয়া সম্পর্কে কল্পকাহিনীর কথা এবং নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে উঠা বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার কথা। অথচ অনুমান সত্যপ্রাপ্তির পথে মোটেই সহায়ক নয়। পাশাপাশি এ কথাও তুলে ধরা হয়েছে যে, 'আমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল (স.) বর্তমান রয়েছেন, যিনি তাদেরকে সেই জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে আহবান করে যাচ্ছেন যার দিকে তিনি পরিপূর্ণ দৃঢ়তা, চাক্ষুষ সাক্ষ্য ও পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এ পর্যন্ত ডেকে এসেছেন।'

সূরার তৃতীয় অংশে রসূলুল্লাহ (স.)-কে বিশেষভাবে পার্থিব সেইসব বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে চলা হয়েছে যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয় এবং শুধু দুনিয়ার জীবন নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে এবং এমন সব বাধায় লাগিয়ে দেয় যার কল্যাণকারিতা সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞানই নেই। আখেরাত ও আখেরাতের জীবনে মানুষের অতীত কার্যকলাপের যে প্রতিদান দেয়া হবে সে সম্পর্কে তাঁকে ইংগিত দেয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে যে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তাদের সৃষ্টির দিন ও পৃথিবীতে প্রেরণের দিন থেকেই অবগত এবং তখন থেকেই সবার অবস্থা আল্লাহ তায়ালা জানেন। তারা নিজেরা নিজেদের সম্পর্কে যেটুকু জানে তার থেকেও বেশী তিনি তাদেরকে জানেন। সুতরাং এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি তাদের হিসাব-নিকাশ নেবেন ও প্রতিদান দেবেন, কোনো আন্দায-অনুমানের ভিত্তিতে নয়। আর এইভাবে অবশেষে তাদের কাজের যথাযথ ফল তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

সূরার চতুর্থ ও শেষ অংশে, আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি কি, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে; আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বার্তাবাহক আগমনের সূচনা থেকে নিয়ে এক এক করে তাঁর অনুসারী বৃদ্ধি পাওয়া, সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ, ইনসাফের সাথে প্রতিদান দেয়ার ব্যবস্থা এবং সৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে স্বাধীনভাবে তাদের সকল কাজ নিয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাযির হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা এসেছে। এসব কিছুর সাথে আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে

www.pathagar.com

প্রাচীনকালের সত্যবিরোধী ও সত্য অস্বীকারকারীদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া সম্পর্কে, যারা শেষ পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাই বলা হচ্ছে, 'এ ব্যক্তি হচ্ছে পূববর্তী সতর্ককারীদের মতই একজন সতর্ককারী। কেয়ামত আগতপ্রায়, ... তার ভয়াবহতা বুঝতে না পারার কারণে কাঁদছ না? বরং তোমরা কি কৌতুক করছো? (সময় থাকতেই সাবধান হও) আল্লাহর কাছে অবনত মাথায় ঝুঁকে পড়ো এবং নিরংকুশভাবে তাঁরই আনুগত্য করো।' এইভাবেই সূরাটির সূচনা ও পরিসমাপ্তির কথাগুলোর মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে তা সর্ব সাধারণের বোধগম্য হয়ে ফুটে উঠেছে।

সূরা আল ক্বামার

এ সূরাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়েছে সেই সকল সত্য-বিরোধী হঠকারী ও নবীদের প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তিদের অন্তরের মধ্যে কেয়ামতের ভীষণ ও কঠিন ভয়ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। অপরদিকে সত্যপন্থী মোমেনদের জন্যে সূরাটি গভীর প্রশান্তি ও তাদের অন্তরসমূহে দৃঢ় আস্থা সৃষ্টিকারী হিসেবে কাজ করেছে। সূরাটির মধ্যে আলোচ্য কথাগুলো বৃত্তের ন্যায় একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং প্রত্যেকটি বৃত্তে সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তি একটি জীবন্ত ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে। পরিসমাপ্তিতে যে কথাগুলো এসেছে তাতে পাঠকের মন ভীষণভাবে আন্দোলিত হতে থাকে। তখন আল্লাহর এই কথা সামনে এসে যায় 'কেমন ছিলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী?' তার অনুভূতিতে ভীষণ চাপ ও আন্দোলন সৃষ্টি করার পরই আবার তার প্রতি অত্যন্ত জোরালোভাবে যে কথাটি এসেছে তা হচ্ছে, 'আর অবশ্যই আমি আল্লাহ তায়ালা। কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, অতপর একে স্মরণ করবে এমন কেউ আছে কি?'

এ সূরার শুরুতে যে সব বিষয় রয়েছে সাধারণত তার ক্ষেত্র মক্কা মোকাররমা, আর তা হচ্ছে, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে যে ভয়ানক দৃশ্যটির অবতারণ হবে তার বর্ণনা এবং সূরার শেষে সে অবস্থাগুলোর মধ্য থেকে আর একটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এই দুই প্রান্তের মাঝামাঝি স্থানে নূহ (আ.)-এর কওমের নানা প্রকার অপতৎপরতা এবং আদ, সামূদ ও লূত আলাইহিমুসসালামের জাতিদের সীমলংঘনকর কার্যকলাপের কথা তুলে ধরা হয়েছে। মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে এসব বিষয়গুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে এসেছে। তবে আলোচ্য সূরায় এসব কথাকে এক বিশেষ ভংগিতে পেশ করা হয়েছে। এখানকার বর্ণনাভংগি সম্পূর্ণ নতুন।

এসব বিষয় অত্যন্ত কঠিন, ভয়ানক, দ্রুতবেগে ও নিশ্চিতভাবে আসা ভীষণ অবস্থার কথা জানাচ্ছে। এসব অবস্থার বিবরণ যখন সামনে আসে, তখন পাঠকের হৃদয় সাংঘাতিকভাবে আতংকগ্রস্ত হয়ে যায়, তার সর্বাংগে এর প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং ধ্বংসের ভয় ও সন্ত্রাস তার শ্বাস রুদ্ধ করে দিতে চায়।

www.pathagar.com

এ সূরার মধ্যে সব থেকে বড় বৈশিষ্ট ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে যে, এখানে এতো দ্রুত বেগে সেই ভয়ানক কঠিন আযাবের আগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে যা পাঠককে ভীষণভাবে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। দুঃখে তার জিভ বের হয়ে আসতে চায়। কেয়ামতের দিন সত্যকে অস্বীকারকারীরা এসব দৃশ্য এমনভাবে দেখতে থাকবে যেন তারা নিজেরাই এই আযাবের মধ্যে পতিত রয়েছে এবং সে আযাবের বৃশ্চিক দংশনজ্বালা তীব্রভাবে অনুভব করছে। তারপর এক প্রকার আযাব শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর এক প্রকার আযাব তাদেরকে পাকড়াও করবে, যা পূর্বের আযাব থেকে আরও বেশী কঠিন হবে। এমনিভাবে পর পর সাত প্রকার আযাবের খবর দেয়া হয়েছে যা হবে চরম ধ্বংসাত্মক এবং অকল্পনীয় কঠিন।

অবশেষে মোমেনদের জন্যে যে অবস্থাটি আসবে তার উল্লেখ করে সূরাটি সমাপ্ত করা হয়েছে। এ হবে ভিন্ন আর একটি দৃশ্য, যার বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, নেককার ব্যক্তিরা ছায়াঘন বাগবাগিচার মধ্যে মনোরম ঘর-বাড়ীতে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তির মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করবে। আল্লাহভীরুদের জন্যেই হবে এ চিত্তাকর্ষক ব্যবস্থা। এরশাদ হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই মোত্তাকীরা প্রবাহমান নহর-পরিবেষ্টিত বাগবাগিচার মধ্যে আনন্দ বিহারে সময় কাটাবে করবে। তারা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান সম্রাটের সান্নিধ্যে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদায় অবস্থান করবে। সত্য বিরোধীরা নিদারুণ ভয়-ভীতি ও কঠিন আযাবে ভরা কম্পন সৃষ্টিকারী ও অপমানজনক শাস্তির মধ্যে পড়ে থাকবে। এরশাদ হচ্ছে, 'সেদিন তাদেরকে মুখের ওপর টানতে টানতে নিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করে বলা হবে, গ্রহণ করো আগুনের স্বাদ।'

তারপর তারা আর যাবে কোথায়। আর কোন্ কোন্ দৃশ্য তারা দেখবে? কোন্ কোন্ শাস্তির পর্যায় তারা অতিক্রম করবে? কোন্ কোন্ শাস্তিতে তারা নিপতিত হবে? এই ঠিকানা থেকে অপর কোন্ ঠিকানায় তারা গিয়ে পড়বে? এসব বিষয়ে এ সূরায় পর্যায়ক্রমি ধারা-বিবরণী রয়েছে।

সূরা আল ওয়াক্বেয়া

আল ওয়াকেয়াহ- কেয়ামতের ঘটনা........এটি সূরার নামও এবং এর আলোচ্য বিষয়ের আভাসদানকারী শিরোনামও। এই মক্কী সূরায় আলোচিত প্রথম বিষয়টি হচ্ছে আখেরাতে পুনরুত্থানের ঘটনা। আখেরাতের পুনরুত্থানে সন্দেহ পোষণকারী মোশরেক ও কোরআন অবিশ্বাসীদের নিম্নোক্ত উক্তির জবাবে এ বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে, 'আমরা যখন মারা যাবো এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাবো, তখন কি আবার আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা পুনরুজ্জীবিত হবো?'

এ কারণেই কেয়ামতের বিবরণ দিয়ে সূরা শুরু হয়েছে। এখানে কেয়ামতের বিবরণ এমনভাবে দেয়া হয়েছে যে, তা সকল সন্দেহ নিরসন করে, সকল বিবাদ দূর করে এবং এ ব্যাপারে অকাট্য ও সুদৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করে। 'যখন কেয়ামতের

www.pathagar.com

ঘটনাটা ঘটবে, যার বাস্তবতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।.......' এখানে এই দিনের ঘটনাবলী থেকে শুধু সেই ঘটনা কয়টির উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাকে অন্য সকল দিন থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দিন হিসাবে চিহ্নিত করে। এদিনে মানুষের ধ্যান ধারণা ও পৃথিবীর অবস্থা পাল্টে যাবে, ভয়ংকর আলোড়ন ও বিভীষিকার ফলে পৃথিবীর ভূমির এবং তার সম্পদ ও মূল্যবোধের বিরাট পরিবর্তন ঘটবে। ৩, ৪, ৫, ৬ ও তৎপরবর্তী আয়াতে এই পরিবর্তনের বিবরণ দেয়া হয়েছে। যেমন, 'এ ঘটনা নীচু করে দেবে, উঁচু করে দেবে, যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী।'

এরপর তিন শ্রেণীর মানুষের পরিণতি সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে– অগ্রবর্তীরা, ডান দিকের ও বাম দিকের লোকেরা। এই তিন শ্রেণীর লোকেরা যথাক্রমে যে নেয়ামত ও আযাব ভোগ করবে, তার এতো বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, ঘটনাটা একেবারে অবধারিত ও সন্দেহাতীতরূপে সত্য বলে মনে হয়। আর তার এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ চাক্ষুষ দর্শনের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে। ফলে অস্বীকারকারীরা নিজেদের পরিণাম ও মোমেনদের পরিণাম স্বচক্ষে দেখতে পাবে। এমনকি তাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাবের বিবরণ দেয়ার পর ওখানেই এরূপ বলাবলি করা হবে যে, 'তারা ইতিপূর্বে সীমালংঘনকারী ছিলো, তারা বার বার প্রতিজ্ঞা ভংগ করতো.......' যেন আযাবটাই বর্তমান, আর দুনিয়ার জীবন অতীত, যার উল্লেখ কেবল তাদের দুনিয়ার জীবনকে ঘৃণ্য এবং তাদের কুফরী ও অস্বীকৃতিকে বিকৃত বলে আখ্যায়িত করার জন্যে করা হচ্ছে।

এখানে সূরার প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয় এবং ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের আলোচনা বিশেষত আখেরাত ও পুনরুত্থানের আলোচনার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। কেননা, আখেরাতই এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই পর্বে আখেরাত সংক্রান্ত আলোচনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় করা হয়েছে। মানুষ যে পরিবেশেই থাকুক এবং তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যে স্তরেরই হোক, এ পর্বের আয়াতগুলো পড়লে তার কাছে মনে হবে আখেরাতের আলোচিত দৃশ্যগুলো তার অনুভূতি ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আওতাধীন।

মানুষের প্রথম আবির্ভাবটা দেখানো হয়েছে এক ফোঁটা বীর্য থেকে, আর তাদের মৃত্যু ও তাদের পরবর্তীতে তাদের স্থলে অন্যদের আবির্ভাবকে আখেরাতের পুনরুত্থানের প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়ার প্রথম জন্ম ও মৃত্যু কতো সহজ স্বাভাবিক, তা সব মানুষের জানা আছে বলেই এটিকে আখেরাতে তাদের পুনর্জন্মের প্রমাণ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

এ পর্যায়ে দুনিয়ার কৃষি কাজ ও ফসল উৎপাদনের দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। কেননা, এটাও জীবন সৃষ্টির একটা রূপ। আল্লাহর হাতেই জীবন সৃষ্টির একচ্ছত্র ক্ষমতা নিহিত। তিনি ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে আদৌ কোনো জীবন সৃষ্টি করতেন না এবং কোনো ফল বা খাদ্য উৎপন্ন হতো না।

জীবনমাত্রেরই উৎপত্তি যে মিষ্টি পানির ওপর নির্ভরশীল, তারও বিবরণ দেয়া হয়েছে। এই পানি আল্লাহর একক ইচ্ছা ও ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। তিনি মেঘমালা

www.pathagar.com

থেকে এই পানি বর্ষাণ। ইচ্ছা করলে তিনি এই পানিকে এমন লবণাক্ত ও বিস্বাদ বানিয়ে দিতে পারতেন, যা থেকে কোনো জীবনেরই উদ্ভব হয় না এবং যা জীবনের অনুকূল ও উপযোগী নয়।

এখানে দেখানো হয়েছে আগুনের দৃশ্যও। মানুষের ব্যবহৃত এ আগুনের উৎস হচ্ছে বৃক্ষ। আগুনের উল্লেখ হওয়া মাত্রই মানুষের অনুভূতি সচকিত হয়ে ওঠে এবং আখেরাতের সেই আগুনকে তাদের মনে পড়ে যায়, যা নিয়ে তারা সন্দিহান ছিলো।

এ সবই মানুষের নিত্যকার সুপরিচিত জিনিসের বাস্তব দৃশ্য। এগুলো তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং তারা এ সবের পশ্চাতে আল্লাহর হাত রয়েছে বলে অনুভব করে। এ সব জিনিস আল্লাহই সৃষ্টি করেন এবং তিনিই এগুলোর তদারক করেন।

এই পর্বে কোরআন নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এই কোরআনই তাদের কেয়ামতের ঘটনা অবহিত করে। কাফেররা কেয়ামতের সত্যতায় যখন সন্দেহ পোষণ করে, তখন সে নক্ষত্রের অবস্থান স্থলসমূহের শপথ করে। এই শপথ যে অত্যন্ত গুরুতর তাও সে জানায়। শপথ করে সে জানায় যে, কোরআন অত্যন্ত মহিমান্বিত গ্রন্থ, যাকে পবিত্র ব্যক্তিরা ছাড়া স্পর্শ করতে পারে না এবং তা বিশ্ব প্রভুর নাযিল করা গ্রন্থ।

সবার শেষে মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার সময়কার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায়। মানুষের আত্মা যখন কণ্ঠনালীতে এসে পৌঁছে, মৃত্যুমুখী মানুষ যখন পার্থিব জীবনের শেষ প্রান্তে পদার্পণ করে, তখন সবাই অসহায় দর্শক হয়ে তার পাশে অবস্থান করে। তারা না পারে তার কোনো সাহায্য করতে, না পারে তার ভেতরে ও বাইরে কী হচ্ছে তা জানতে। একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে। একমাত্র সেই দেখতে পায় তার গন্তব্যের পথ। সে যা দেখতে পায় তা সম্পর্কে কাউকে কিছু বলা তো দূরের কথা, ইংগিতও সে করতে পারে না।

অতপর ওহীর গুণের অকাট্যতা পুনরায় ঘোষণা ও মহান স্রষ্টা আল্লাহর তাসবীহের মধ্য দিয়ে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে। এভাবে সূরার সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে পূর্ণতম যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।

সূরা আল মুলক

আলোচ্য পারাটির সব কয়টি সূরাই মক্কায় অবতীর্ণ। ঠিক এর বিপরীত, পূর্ববর্তী ২৮ নং পারার সব কয়টি সূরাই ছিলো মদীনায় অবতীর্ণ। এই পারার কোনো কোনো সূরার প্রথমাংশ পবিত্র কোরআনের সূচনাকালীন ওহীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন সূরা আল মোদ্দাসসের ও সূরা আল মোয্যাম্মেলের প্রথমাংশ। আবার এই পারায় এমন কিছু সূরাও রয়েছে যা সম্ভবত নবুয়ত লাভের প্রায় তিন বছর পর নাযিল হয়েছে, যেমন সূরা আল ক্বালাম, আবার কোনোটা নাযিল হয়েছে নবুয়ত লাভের প্রায় দশ বছর পর যেমন সূরা আল জ্বিন।

বর্ণিত আছে, বনু সকীফ গোত্রের নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রসূল (স.) যখন তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে সূরা জ্বিন নাযিল হয়। ঘটনার

www.pathagar.com

বিবরণ এমন যে, আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-এর কাছে একদল জ্বিনকে পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন রসূল (স.)-এর কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি কোরআন পড়ছিলেন। জ্বিনেরা তাঁর কোরআন পাঠ শুনতে লাগলো। তায়েফের এই সফর সংঘটিত হয়েছিলো খাদিজা (রা.) ও আবু তালেবের ইন্তেকালের পর হিজরতের এক বছর বা দু'বছর আগে। অবশ্য অপর একটি রেওয়ায়েতে অনুসারী সূরা জ্বিন নবুওতের প্রথম দিকেই নাযিল হয়েছিলো। এই শেষোক্ত রেওয়ায়াতটিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

পবিত্র কোরআনের মক্কায় নাযিল হওয়া অংশ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা, ওহী ও আখেরাত সংক্রান্ত আকীদা এবং এই আকীদা থেকে বিশ্বজগত ও তার স্রষ্টার সাথে বিশ্বজগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে। সেই সাথে স্রষ্টার পরিচয়ও এই সূরাগুলোতে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যে, স্রষ্টার সম্পর্কে মানবহৃদয়ে এক জীবন্ত চেতনার উন্মেষ ঘটে। সেই চেতনা অত্যন্ত কার্যকর এবং আপন মনিবের অনুগত বান্দার যেরূপ মানসিকতা থাকা উচিত, সেরূপ মানসিকতারই উদ্দীপক, বান্দার মধ্যে আপন প্রভুর উপযুক্ত আদব ও ভক্তির উদ্‌গাতা এবং বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু ও ঘটনাবলীর মূল্যায়ন ও মান নির্ণয়ে একজন মুসলমানের যে দৃষ্টিভংগী ও মূল্যবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়, তারই উজ্জীবক। পূর্ববর্তী মক্কী সূরাগুলোতে আমরা এই বক্তব্যের নমুনা দেখেছি। বর্তমান পারায় আমরা তার আরো নমুনা দেখতে পাবো।

পক্ষান্তরে মাদানী সূরা ও আয়াতগুলো প্রধানত উপরোক্ত আকীদা এবং ধারণা ও মূল্যমানকে বাস্তব জীবনে কার্যকর রূপদান সম্পর্কে সোচ্চার থাকে। সেই সাথে মানুষের মনকে জীবনের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও শরীয়তী বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে। এ ব্যাপারে মানুষকে মানসিক ও বাহ্যিক উভয়ভাবে প্রস্তুত করে। পূর্বোক্ত মাদানী সূরাগুলোতে যেমন আমরা এর নযীর দেখেছি, চলতি পারার সূরাগুলোতেও তেমনি দেখতে পাবো।

'সূরা তাবারাকা' বা 'সূরা আল মুল্‌ক' এ পারার প্রথম সূরা। সৃষ্টিজগত ও তার স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা এ সূরায় পরিলক্ষিত হয়েছে। ধারণাটা এতো ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী যে, তা সংকীর্ণ ও সীমিত পার্থিব পরিমন্ডলকে অতিক্রম করে মহাকাশের বিভিন্ন জগত, আখেরাতের জীবন, পার্থিব জগতের মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টি তথা জ্বিন, পাখি, আখেরাতের জাহান্নাম ও তার রক্ষীরা এবং অদৃশ্য জগতের এমন আরো বহু জিনিস পর্যন্ত বিস্তৃত, যার সাথে মানুষের মন ও আবেগ জড়িত, তাই এর আলোচ্য বিষয় শুধু দৃশ্যমান পার্থিব জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উপরন্তু তা মানুষের চোখের সামনে, বাস্তব জীবনে ও আপন সত্তার মধ্যে বিরাজমান বহু জিনিস সম্পর্কেই চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এই সূরা মানুষের মনমানসে পুঞ্জীভূত যাবতীয় স্থবির ও পশ্চাদমুখী জাহেলী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারাকে নাড়া দিয়ে ঝেড়ে ফেলে, চেতনার স্থানে স্থানে সংযোগের জানালা খুলে দেয়। সেখান থেকে জড়তার ধুলাবালি মুছে ফেলে এবং বিবেক, চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টিকে স্বাধীন করে দিয়ে বিশ্ব প্রকৃতির মুক্ত দিগন্তে, আপন সত্তার গভীরতম

www.pathagar.com

প্রকোষ্ঠে, মহাশূণ্যের দূর নিলীমায়, মহা সমুদ্রের অথৈ জলরাশিতে এবং অদৃশ্য জগতের সকল গোপন ঘাঁটিতে বিচরণ ও পর্যবেক্ষণে উদ্দীপিত করে। এই বিচরণের মধ্য দিয়ে সে সর্বত্র দেখতে পায় আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও নৈপুণ্যে পরিচালিত সৃষ্টিজগতের তৎপরতা, তারপর এই বিশাল সৃষ্টি জগতকে স্বীয় উপলব্ধির উর্ধে বিবেচনা করে তার পর্যবেক্ষণ থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে তার মন-মগয। সে বুঝতে পারে যে, এ মহাবিশ্বের পরিধি তার কল্পনার চেয়েও বিশালতর। ফলে সে পৃথিবীর প্রশস্ততাকে অতিক্রম করে চলে যায় আকাশে, দৃশ্যমান জগত থেকে তা গিয়ে উপনীত হয় প্রকৃত জগতে, স্থবিরতা থেকে সচলতায় অদৃষ্ট, জীবন ও জগতে জীবসুলভ এক চঞ্চলতায়।

জীবন ও মৃত্যু একটি সুপরিচিত ও বারংবার সংঘটিত ব্যাপার। কিন্তু এই সূরা মানুষের চিন্তাধারাকে জীবন ও মৃত্যুর অপর পারে সঞ্চালিত করে। আল্লাহর নির্ধারিত অদৃষ্ট, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তার প্রজ্ঞা ও কৌশল নিয়ে ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। সূরার একটি আয়াতে বলা হয়েছে, 'যিনি জীবন ও মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে বেশী সৎকর্মশীল। তিনি মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।'

আকাশ হচ্ছে অজ্ঞ মানুষের চোখের সামনে বিরাজিত স্থির নিশ্চল এক সৃষ্টি। এ সৃষ্টির পশ্চাতে তার সৃজনকারী হাতকে সে দেখতে পায় না। এতে কি পূর্ণতা ও চমৎকারিত্ব বিদ্যমান তাও তার চোখে পড়ে না। কিন্তু আলোচ্য সূরা তার চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ শক্তিকে এর মাঝে যে অপরূপ সৌন্দর্য ও পূর্ণতা নিহিত রয়েছে তা নিয়ে ভাবতে শেখায় এবং তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই উপরোক্ত আয়াতের পরবর্তী আয়াতের বক্তব্য হলো,

'যিনি সাতটি আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। আচ্ছা, দৃষ্টি ফেরাও তো। কোনো অসম্পূর্ণতা দেখতে পাও কি? পুনরায় দৃষ্টি ফেরাও। তোমার দৃষ্টি তোমার কাছেই ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে......।'

জাহেলিয়াতের দৃষ্টিতে পার্থিব জীবনই হচ্ছে জীব-জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু আলোচ্য সূরা আরেকটি জগত উদঘাটিত করেছে। নতুন করে সৃজিত সেই জগতটি শয়তানদের ও কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। সে জগত চঞ্চলতা, চমক ও প্রতীক্ষায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত করে রেখেছি..... আর জাহান্নাম খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা .... জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডবাসীর ওপর অভিশাপ।'

জাহেলিয়াতমুখী মন-মগয জীবন যাপনের এই প্রকাশ্য পরিমন্ডলের বাইরের আর কিছুর অস্তিত্ব মানে না। অদৃশ্য জগত ও তার অন্তর্নিহিত সত্যগুলো নিয়ে চিন্তাও করে না। তার সমস্ত চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র পার্থিব জীবনকে নিয়েই কেন্দ্রীভূত এবং দৃশ্যমান পৃথিবীর বদ্ধ খাঁচায় সে আবদ্ধ। তাই এ সূরা মানুষের মনকে ও দৃষ্টিকে অদৃশ্য জগত,

www.pathagar.com

আকাশ ও সেই সীমাহীন ক্ষমতার প্রতি নিবদ্ধ করে, যা চোখের অগোচরে থাকলেও যা ইচ্ছা যখন ইচ্ছা ও যেখানে ইচ্ছা তা করতে সক্ষম। যে ইহকালীন জগত নিয়ে তারা ডুবে আছে এবং যার প্রতি তারা পরম আস্থাশীল রয়েছে, সেই ইহকালীন জগতের প্রতি তাদের আস্থা নাড়িয়ে দেয়। সূরার একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

'যারা তাদের অদৃশ্য প্রভুকে ভয় পায়, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান। .... যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি যে তোমাদেরকে মাটির নিচেও পুঁতে ফেলতে পারেন.. ....'

পাখি এমন এক সৃষ্টি যাকে মানুষ প্রতিনিয়তই দেখতে পায়, অথচ তার অলৌকিকত্ব নিয়ে তেমন চিন্তাভাবনা করে না। কিন্তু এই সূরা মানুষের চোখকে পাখির দিকে তাকাতে এবং তার মনকে পাখি নিয়ে ভাবতে শেখায়। আল্লাহর যে সীমাহীন ক্ষমতা এই বিচিত্র সৃষ্টিকে সৃজন ও তার পরিকল্পনা করেছে, সে সম্পর্কে তাকে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

'তারা কি পাখিদের দিকে তাকায় না, কিভাবে তারা মানুষের মাথার ওপর পাখা মেলে ও গুটিয়ে নেয়? দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদেরকে তো আর কেউ থামাতে পারে না.... ।'

মানুষ যখন নিজ বাসস্থানে আল্লাহর ক্ষমতা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে অবস্থান করে, সেই সময়ে এই সূরা তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে এক মানসিক উদাসীনতা থেকে মুক্ত করে দেয়। অবশ্য সে চিন্তাভাবনা করলে বুঝতো, যে তার পায়ের তলা থেকে পৃথিবী এবং চারপাশ থেকে গোটা প্রকৃতি ইতিপূর্বেই তাকে আল্লাহর পরাক্রম ও প্রতাপ সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিয়েছে, অথচ এটাকে সে হিসাবেই ধরেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমাদের কাছে কি এমন কোনো বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে, যারা রহমানের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে! আসল কথা হলো, অমান্যকারীরা প্রতারণার শিকার।'

মানুষ যে জীবিকা উপার্জন করে, তা তার ধারণায় উপায় উপকরণের নাগালের কাছাকাছি এবং সহজেই তা উপার্জন করা সম্ভব। আর এই উপায়-উকরণ হচ্ছে তাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। কিন্তু আলোচ্য সূরা তাদের দৃষ্টিতে অনেক দূরে আকাশের ওপরে পর্যন্ত প্রসারিত করে। তাদের ধারণা অনুসারে তাদের সুপরিচিত উপায়-উপকরণের উর্ধে টেনে নিয়ে যায়। এ সম্পর্কে একটি আয়াতের বক্তব্য দেখুন! 'যে তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করে থাকে, তার জীবিকা যদি আল্লাহ তায়ালা বন্ধ করে দেন, তাহলে কি হবে ভেবে দেখতো। আসলে তারা আল্লাহদ্রোহিতা ও সত্য পরিত্যাগের ওপর জেদ ধরে রয়েছে।'

মানুষ যখন তার বিভ্রান্তিতে অনড় হয়ে বসে থাকে আর ভাবে যে, আমি সঠিক পথে আছি, তখন এই সূরা তার কাছে তার প্রকৃত অবস্থা এবং প্রকৃত সত্য পথচারীদের অবস্থা ও গুণাগুণ বর্ণনা করে এক চলন্ত, জীবন্ত ও উদ্বুদ্ধকারী ভংগীতে।

www.pathagar.com

'ভেবে দেখো তো, যে লোক মুখের উপর উল্টো হয়ে হাটছে, সে সঠিক সত্য পথপ্রাপ্ত, না যে লোক মাথা উঁচু করে চলে যাচ্ছে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত।'

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তার সত্তায় যেসব যোগ্যতা, ক্ষমতা ও প্রতিভা দিয়েছেন, তাকে সাধারণত সে কাজে লাগায় না। তার স্নায়ু ও পঞ্চইন্দ্রিয় যা অনুভব করে তাকে অতিক্রম করে এই ইহজগতের উর্ধের কোনো কিছুতে সে ভ্রুক্ষেপ করে না। এ জন্যে আলোচ্য সূরা তাকে দেয়া আল্লাহর সেই নেয়ামতগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয় যেগুলো দৃশ্যমান বর্তমানের বহির্ভূত অজানা ভবিষ্যতের পথকে আলোকিত করে দেয় এবং চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌছার দিকনির্দেশনা দেয়!

'তুমি বলো! তিনিই সেই মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের চোখ, কান ও অন্তর দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। বলো, তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তার কাছেই ফিরে যাবে।'

কাফেররা পরকালীন জীবনে পুনরুজ্জীবন ও কেয়ামতকে অস্বীকার করে থাকে এবং তার নির্দিষ্ট সময়কাল জানতে চায়। এই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য সূরা তার সামনে কেয়ামতকে একটা অবধারিত আকস্মিক ঘটনা হিসাবে তুলে ধরে এবং সে ঘটনা যখন ঘটবে তখন তা তাদের জন্যে অবশ্যই বিব্রতকর হবে।

'তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলতো এই ঘটনা কবে ঘটবে? বলো, প্রকৃত জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে আর আমি তো শুধু খোলাখুলি সতর্ককারী। পরে তারা যখন এই কেয়ামতকে একান্ত কাছে উপস্থিত দেখবে, তখন এই অস্বীকারকারীদের মুখ বিকৃত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এই হচ্ছে সেই বিষয়, যার জন্যে তোমরা তাগাদা দিচ্ছিলে।'

কাফেররা ভাবতো যে, রসূল (স.) ও তার সংগীরা মারা গেলে খুবই ভালো হতো এবং তারা হেদায়াতের এই বিরক্তিকর আওয়ায শোনার হাত থেকে রেহাই পেতো। যে আওয়ায প্রতিনিয়ত তাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সতর্ক করে এবং তাদের আয়েশী ঘুম ভেংগে দেয়, তার হাত থেকে নিস্তার পেতো। কিন্তু আলোচ্য সূরা তাদেরকে বলে যে, মোমেন জনগোষ্ঠীর মরা বা বাঁচাতে কিছু এসে যায় না। রসূল (স.)-কে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহর যে আযাব তাদের জন্যে অবধারিত হয়ে আছে, তা থেকে তাদের রেহাই নেই। কাজেই সেই ভয়াবহ দিন ঘনিয়ে আসার আগে তাদের নিজ নিজ অবস্থা ও করণীয় বিবেচনা করা উত্তম।

'তুমি বলো! আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করে দেন অথবা আমাদের ওপর দয়া করেন, তাহলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কাফেরদেকে কে রক্ষা করবে? তুমি বলো, তিনি দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নন। আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং তারই ওপর নির্ভরশীল আছি। প্রকৃত গোমরাহ কে, তা তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।'

সর্বশেষে এই সূরা আরবদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংগ পানি যে কোনো মুহূর্তে চলে যেতে পারে এ আশংকা ব্যক্ত করে সাবধান করেছে। সে বলছে যে,

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালাই এই পানি সরবরাহ করেন। অথচ তাকেই তারা অগ্রাহ্য করছে, 'বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো যে, তোমাদের পানি যদি উধাও হয়ে যায়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান পানি এনে দেবে?'

এ সব বক্তব্য বিবেচনা করলে মনে হয় সূরাটি আগাগোড়াই একটি আন্দোলন, অনুভূতিতে একটি শিহরণ এবং চিন্তায় ও চেতনায় একটি অভ্যুত্থান, আর গোটা সূরার মূল ও প্রধান বক্তব্য হলো তার সূচনা বাক্য,

'পরম কল্যাণময় তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সাম্রাজ্য এবং তিনিই সর্ববিষয়ে শক্তিমান।'

আর এই সাম্রাজ্য ও তাতে সর্বশক্তিমান হওয়ার তত্ত্ব থেকেই এই সূরায় নিবেদিত সকল দৃশ্য এবং সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য তৎপরতার উৎপত্তি।

সূরা আল কালাম

সূরাটির নাযিল হওয়ার সঠিক সময় নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। সূরার প্রথমাংশেরও নয়, পুরো সূরারও নয়। সূরার প্রথমাংশটিই যে প্রথমে এবং শেষ অংশ যে শেষে নাযিল হয়েছে, এটাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। এমনকি এই শেষোক্ত ধারণা অগ্রগণ্য কিনা তাও নির্ধারণ করার উপায় নেই। কেননা সূরার প্রথমাংশ ও শেষাংশের আলোচ্য বিষয় একই রকম।

বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর রসূলের ওপর কাফেরদের আক্রমণাত্মক ও মারমুখো হয়ে ওঠা এবং তাঁকে পাগল বা ভুতে ধরা ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করতে থাকা। বেশ কিছু বর্ণনায় এটিকে সূরা 'আলাক'-এর পর নাযিল হওয়া দ্বিতীয় সূরা বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সংকলনে যে এই সূরাটি দ্বিতীয় সূরা হিসাবে সংকলিত হয়েছিলো, সে ব্যাপারেও কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু সূরার পূর্বাপর বক্তব্য, আলোচ্য বিষয় ও বাচনভংগী আমাদেরকে এই মত পোষণে বাধ্য করে যে, এটি সূরা 'আলাক্বের' অব্যবহিত পরে নাযিল হওয়া সূরা তো নয়ই; বরং খুব সম্ভবত সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াতের সূচনা হওয়ার বেশ কিছুকাল পরে এটি নাযিল হয়েছিলো।

ইসলামের এই সার্বিক দাওয়াতের সূচনা হয়েছিলো ব্যক্তিগত পর্যায়ের দাওয়াত চালু হওয়ার প্রায় তিন বছর পর। এই সূরা নাযিল হওয়ার সময়ে কোরায়শরা ইসলামী দাওয়াতকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছিলো এবং তার বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠেছিলো। এ জন্যে তারা রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে সেই জঘন্য উক্তিও করতে পেরেছিলো যে, 'তুমি একটা পাগল' (নাউযুবিল্লাহ!) আর কোরআনও এ উক্তি খন্ডন ও তার প্রতিবাদ করা এবং ইসলাম বিরোধীদেরকে হুমকিও দিতে শুরু করেছিলো। এই সূরায় সেই হুমকি বর্ণিত হয়েছে।

এরূপ ধারণাও প্রচলিত আছে যে, সূরাটির প্রথমাংশ হয়তো সূরা 'আলাক্বের' প্রথমাংশের পরে নাযিল হয়েছিলো এবং এ সূরার শুরুতে যে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও'– তা হয়তো রসূল (স.)-এর নিজের ভীতি দূর করার জন্যেই বলা হয়েছে। কেননা ওহীর প্রথম দিকে তিনি নিজের সম্পর্কেই শংকিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর মাথায় কোনো গোলমাল হয়ে গেলো কিনা এবং ওহী তারই কোনো উপসর্গ কিনা। কিন্তু এই ধারণাটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা রসূল (স.)-এতদূর ঘাবড়ে গিয়েছিলেন বা এতখানি শংকিত হয়ে পড়েছিলেন, এর সপক্ষে কোনো প্রামাণ্য বর্ণনা নেই।

তাছাড়া সূরার নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা সাক্ষ্য দেয় যে, 'তুমি পাগল নও' এ উক্তিটি সূরার শেষাংশের এই উক্তির সাথে মিল রয়েছে, 'কাফেররা কোরআন শোনার পর তাদের চোখ দিয়েই তোমাকে পদস্খলিত করে দিতে চায় এবং বলে যে, সে তো পাগল।'

বস্তুত এ অপবাদটিকে সূরার শুরুতেই খন্ডন করা হয়েছে। আগাগোড়া সুসমন্বিত বক্তব্য সম্মিলিত এ সূরাটি পড়লে মনে প্রাথমিকভাবে এমন একটি ধারণাই সৃষ্টি হয়।

কোনো কোনো বর্ণনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ সূরায় কিছু মাদানী আয়াত রয়েছে। এই মতানুসারে ১৭শ আয়াত থেকে ৩৩তম আয়াত এবং ৪২তম আয়াত থেকে ৫০তম আয়াতগুলো মাদানী। প্রথমাংশ বাগানের মালিকদের ও তাদের ওপর আপতিত দুর্যোগ সংক্রান্ত। আর দ্বিতীয়াংশ মাছের পেটে প্রবিষ্ট হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা সম্বলিত। আমাদের ধারনার এ মতটিও সঠিক নয়। আমাদের মতে গোটা সূরাই মক্কী। কেননা উল্লিখিত আয়াতগুলোর বক্তব্যে মক্কী ভাবধারার সুগভীর ছাপ বিদ্যমান। সূরাটির আগাগোড়া বক্তব্য যেহেতু মক্কী, তাই আয়াতগুলোকে সূরার আলোচ্য বিষয় ও আলোচিত সমসাময়িক পরিস্থিতির আলোকে বিবেচনা করাই অধিকতর সমীচীন।

সামগ্রিক বিবেচনায় আমরা এই মতটিকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি যে, সূরাটি নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় সূরা নয় বরং এটি নবুওত লাভের বেশ কিছুকাল পর সাধারণ দাওয়াতের সূচনা হওয়ার পর নাযিল হয়েছে। কারণ প্রথমত এর আগেই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো যে, 'তোমার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়স্বজনকে সতর্ক করো।'

দ্বিতীয়ত, অতীত জাতিসমূহের কাহিনীসমূহ বর্ণিত হয়েছে এমন বেশ কিছু সূরা ও আয়াত এর আগেই নাযিল হয়েছিলো। আর সে জন্যে কাফেরদের কেউ কেউ ওগুলোকে 'প্রাচীনকালের উপাখ্যান' বলে আখ্যায়িত করেছিলো।

তৃতীয়ত, কোরায়শকে গোষ্ঠীগতভাবে ও সার্বিকভাবে ইসলাম গ্রহণের আহবান ইতিপূর্বেই জানানো হয়েছিলো। আর কোরায়শ এ দাওয়াতকে মিথ্যা অপবাদ ও সর্বাত্মক আগ্রাসী আক্রমণ দ্বারা রুখতে চেয়েছিলো। এর প্রতিক্রিয়ায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যে তীব্র নিন্দাবাদ ও সমালোচনা এই সূরায় ধ্বনিত হয়েছে এবং সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে প্রচন্ড হুমকি উচ্চারিত হয়েছে, তা স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, এ সূরা ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক যুগে নয়; বরং কঠিন প্রতিরোধ ও চরম শত্রুতার যুগে

www.pathagar.com

নাযিল হয়েছিলো। চতুর্থত, এ সূরার সর্বশেষ দৃশ্যও আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। শেষের দিকের এ আয়াতটি লক্ষণীয়,

'কাফেররা স্মরণিকা (কোরআন) শোনার পর তাদের চোখ দিয়েই তোমাকে পদস্খলিত করে দিতে উদ্যত হয় এবং বলে যে, সে তো একটা আস্ত পাগল।'

এই আয়াতটি এমন একটি পরিস্থিতির দৃশ্য আমাদের সামনে তুলে ধরে, যখন বড় বড় জনসমাবেশে ব্যাপকভাবে আগে থেকেই দাওয়াত দেয়া চালু হয়ে গিয়েছিলো। মক্কার কাফেররা প্রকাশ্য সমাবেশে কোরআন শুনতো, তারপর ক্রোধে অধীর হয়ে চোখ পাকাতো এবং রসূল (স.)-কে পাগল বলতো। দাওয়াতের সূচনা কালে এ পরিস্থিতি ছিলো না। তখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রচার চলতো, ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিকে গোপনে দাওয়াত দেয়া হতো। কাফেরদের প্রকাশ্য সমাবেশে দাওয়াত দেয়া হতো না। এ ধরনের দাওয়াতের কাজ বিশ্বস্ত সূত্র মতে দাওয়াতের সূচনার তিন বছর পর চালু হয়।

পঞ্চমত, এই সূরায় এমন কিছু আভাস ইংগিতও রয়েছে, যা দ্বারা মনে হয় যে, তখন মোশরেকরা রসূল (স.)-কে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার ব্যাপারে কিছু আপোস রফার প্রস্তাব দিয়েছিলো, যেন তিনি মাঝপথে স্বীয় কাজে বিরতি দেন। সূরার এক আয়াতে বলা হয়েছে,

'তারা চায় তুমি কিছু নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হয়।'

এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াত চলাকালে হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য, কেননা তখন তাতে তাদের কোনো ক্ষতির আশংকা ছিলো না। প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু হওয়ার পরই মোশরেকদের এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার সম্ভাবনা ছিলো।

এ সব যুক্তি ও সাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে বলা যায় যে, এ সূরা ইসলামী দাওয়াতের সূচনাকালে নয় তারও বেশ কিছুদিন পরে নাযিল হয়ে থাকবে। মনে হয় দাওয়াতের সূচনা এবং এই সূরা নাযিলের মাঝখানে তিন বছরের কম তো নয়ই বরং বেশী সময়ও কেটে যেয়ে থাকতে পারে। আর এ কথাও বোধগম্য মনে হয় না যে, তিন বছরে কোরআনের মোটেই কোনো আয়াত বা সূরা নাযিল হয়নি। বরং এ সময়ে বহুসংখ্যক সূরা এবং বহু সংখ্যক আয়াত নাযিল হয়ে থাকতে পারে, যাতে হয়তো অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে এই সূরার মতো কোনো আক্রমণাত্মক সমালোচনা করা হয়নি, কেবল সাদামাটাভাবে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসই প্রচারিত হয়েছে।

তাই বলে এসব যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এই সূরা এবং সূরা মোয্যাম্মেল ও সূরা মোদ্দাসসের দাওয়াতের প্রাথমিক যুগের সূরাই নয়, যদিও তা একেবারে প্রাথমিক ওহী নয়। প্রাথমিক ওহী না হওয়ার কারণগুলো আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি। সে কারণগুলো সূরা আল মোয্যাম্মেল ও মোদ্দাসসেরের বেলায়ও প্রযোজ্য।

এখানে প্রসংগত এ কথাটাও উল্লেখ করা দরকার যে, আরব ভূমিতে যখন ইসলামের চারাগাছটি প্রথম লাগানো হয় তখন শুধু আরব উপদ্বীপে নয়; বরং সমগ্র

www.pathagar.com

পৃথিবীতে বিরাজমান জাহেলিয়াতের কাছে তা একেবারেই অচেনা মনে হয়েছিলো। এরূপ মনে হওয়ার কিছু কারণও ছিলো। আরবে জাহেলিয়াত নিজেকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরাধিকারী হবার দাবী করতো। এটা ছিলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শের সুস্পষ্ট বিকৃতি। কোরায়শী পৌত্তলিকরা তাদের এই ধর্মীয় ভন্ডামীকে রকমারি মিথ্যার আড়ালে লুকিয়ে রাখতো। তাদের সমাজে বহু সংখ্যক হাস্যকর আকীদা-বিশ্বাস, রসম-রেওয়ায ও পূজা উপাসনা চালু ছিলো।

রসূল (স.) তাদের কাছে যে ধর্ম পেশ করলেন, তা মৌলিক নীতিমালা ও আদর্শের দিক দিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মূল ধর্মের সাথে শুধু যে সামঞ্জস্যশীল ছিলো তাই নয়, বরং তা এতো নিখুঁত, নির্ভেজাল, স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও সহজ, সরল এবং এতো পূর্ণাংগ ছিলো যে, বিশ্ব মানবতার সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বিধান হবার যোগ্য প্রমাণিত হয়েছিলো। ইবরাহীমী (আ.) দ্বীনের নামে পৌত্তলিক কোরায়শদের ভন্ডামীর সাথে এই সত্যিকার ইসলামী ও ইবরাহীমী আদর্শের ব্যবধান এতো বেশী ছিলো যে, প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে উত্তরণ ছিলো এক বিরাট ও সর্বাত্মক পরিবর্তনের শামিল। কোরায়শরা এটা মেনে নিতে ও বরদাশত করতে রাজী ছিলো না।

কোরায়শ পৌত্তলিকরা এক আল্লাহর পরিবর্তে শত শত উপাস্য মানতো। ফেরেশতা, জ্বিন ও তাদের আত্মার প্রতিমূর্তির পূজা করতো। কোরআন তাদের সামনে পেশ করলো এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সত্তাকে এবং সকল সৃষ্টির সাথে তার ইচ্ছাকে অপরিহার্য শর্ত হিসাবে সংযুক্ত করলো। পৌত্তলিকদের উক্ত আচরণটির সাথে কোরআনের এই দাওয়াতের ব্যবধান এতো দুস্তর ছিলো যে, প্রথমটি পরিত্যাগ করে দ্বিতীয়টিকে গ্রহণ করা তাদের কাছে ছিলো কল্পনারও অতীত।

একদিকে ছিলো আরব উপদ্বীপের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় পুরোহিত সম্প্রদায়, কা'বার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত অভিজাত গোত্রীয় সরদাররা এবং তাদের চেয়ে নিচু জাত বলে বিবেচিত সাধারণ আরববাসী। আর অপরদিকে ছিলো কোরআন প্রবর্তিত সরলতা, আল্লাহর চোখে সকল মানুষের সমতা এবং কোনো পুরোহিত ইত্যাদি ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের মাঝে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের তত্ত্ব। এই দু'য়ের মাঝেও ছিলো দুস্তর ব্যবধান, যা অতিক্রম করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলো না।

তৎকালে জাহেলী সমাজে যে নৈতিক মূল্যবোধ প্রচলিত ছিলো, তার সাথেও কোরআন বর্ণিত ও রসূল (স.)-এর পেশ করা নৈতিকতার সাথে দুস্তর ব্যবধান ছিলো। শুধুমাত্র এই ব্যবধান নতুন মতাদর্শের সাথে কোরায়শ, তাদের চিন্তাধারা ও চরিত্রের সংঘাত বেধে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিলো। অথচ সেখানে শুধুমাত্র এই ব্যবধানই ছিলো না বরং এর পাশাপাশি আরো অনেক বিষয় ছিলো, যা কোরায়শ নেতাদের কাছে হয়তো তাদের ধর্মের চেয়েও অনেক বড় ছিলো।

সামাজিক উঁচু নিচু ও আভিজাত্যবোধ তথা কৌলিন্য প্রথা এতো প্রবল ছিলো যে, কোরআনের বর্ণনা মোতাবেক এর প্রভাবে একজন বলে বসেছিলো, 'এই কোরআন দুই

www.pathagar.com

শহরের কোনো প্রধান ব্যক্তির কাছে নাযিল হলো না কেন?' দুই শহর বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে মক্কা ও তায়েফকে। রসূল (স.)-এর উচ্চ বংশীয় মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও নবুওতের পূর্বে তিনি তেমন কোনো সমাজপতি বা গোত্রপতি ছিলেন না। মক্কার কোরায়শ বংশ ও তায়েফের সাকীদ বংশে গোত্রপতির মর্যাদা ছিলো সব কিছুর উর্ধে। তাই সেসব সরদার ও মোড়লদের পক্ষে মোহাম্মদ (স.)-এর আনুগত্য মেনে নেয়া সহজ ছিলো না।

গোত্রীয় বা পারিবারিক আভিজাত্যবোধও এমন এক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, যা আবু জেহেলের মতো ব্যক্তিকে সত্য বাণীকে শুধুমাত্র এই বিবেচনায় প্রত্যাখ্যান করতে প্ররোচিত করেছিলো যে, নবী (স.) বনু আবদে মানাফ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

এই সব জাহেলী গোষ্ঠী বিদ্বেষ ও উগ্র জাত্যাভিমান ছাড়াও আরো কিছু বিচার বিবেচনা আরব সমাজে এমনও ছিলো, যার কারণে কোরায়শরা ইসলামের নব উদগত চারা গাছটিকে উপড়ে ফেলতে চাইছিলো। এই সব বিচার বিবেচনার কোনো নৈতিক বা মানবিক মূল্যবোধের সাথে নয় বরং শুধু জাহেলী চিন্তাচেতনা থেকে উদ্ভূত ব্যক্তিগত শ্রেণীগত বা গোত্রীয় স্বার্থপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো। ইসলামের চারা গাছটির শেকড় মজবুত হওয়া ও শাখা প্রশাখা বিস্তারের আগেই তারা তাকে সমূলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলো, কেননা পরে হয়তো এ কাজ করা দুরূহ হয়ে যাবে।

বিশেষত যখন ইসলাম ব্যক্তিগত দাওয়াতের যুগ পেরিয়ে সামষ্টিক দাওয়াতের যুগে প্রবেশ করেছে। তখন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীকে (স.) প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। ফলে দাওয়াতের নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। কোরআন জাহেলিয়াতের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করেছে এবং শেরেকী আকীদা বিশ্বাস ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে দিয়েছে, তখন হয়তো পরে আর কখনো এ সুযোগ আসবেই না।

রসূল (স.) যদিও একজন নবী ছিলেন, স্বীয় প্রভুর কাছ থেকে ওহী লাভ করতেন এবং আল্লাহর উর্ধতন ও ঘনিষ্টতম ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তথাপি তিনি তো মানুষই ছিলেন। মানবীয় আবেগ উত্তেজনা তাকে মাঝে মাঝে বিব্রত করতো। মোশরেকরা তার বিরুদ্ধে যে সহিংস প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো, তা তাকে ও তার মুষ্টিমেয় মোমেন সাহাবাদেরকে অস্থির করে তুলেছিলো। মোশরেকেরা রসূল (স.)-কে যে সব আজেবাজে কথা বলে কটাক্ষ করতো, 'পাগল' বলাও তার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আর এ ছাড়াও আরো অনেক বিদ্রুপের বানে স্বয়ং রসূল (স.)-কে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে বিদ্ধ করতো—এ সবই তাদেরকে শুনতে হতো। এ সব বিদ্রুপ ও মশকরা কোরআনের বিভিন্ন সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও সাহাবীদের অনেকে নিজের ঘনিষ্টজনদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের দৈহিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হতো। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উপহাস-কটাক্ষ প্রত্যেক মানুষকেই যতখানি ব্যথিত ও মর্মাহত করে, ততখানি আর কোনটাই করে না। এমনকি তার শিকার যদি খোদ রসূলও হন, তবে তিনিও এর ব্যতিক্রম নন।

www.pathagar.com

এ কারণেই আমরা আমপারার সূরাগুলো সহ সকল মক্কী সূরায় দেখতে পাই যে, আল্লাহ তায়ালা যেন রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদেরকে কোলে নিয়ে আদর করছেন, তাদেরকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিচ্ছেন, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছেন, তাদের প্রশংসা করছেন। ইসলামী দাওয়াতে ও রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্বে ইসলামের যে চারিত্রিক মহত্ব ফুটে উঠেছে তা প্রকাশ করছেন। মোশরেকরা তাদের বিরুদ্ধে যেসব মনগড়া কথা বলে, তা খন্ডন করছেন এবং এই বলে দুর্বল মুসলিমদেরকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, 'তোমাদের শত্রুরা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তাদের নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিও না। তোমাদের পক্ষে আমিই তাদের সাথে লড়বো।'

সূরা আল-কালামের শুরু থেকেই আমরা রসূল (স.) সম্পর্কে এ ধরনের কথাবার্তা উচ্চারিত হতে দেখি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কলমের শপথ এবং লোকেরা যা লেখে তার শপথ, তুমি স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাগল নও। নিসন্দেহে তোমার জন্যে চিরস্থায়ী প্রতিদান রয়েছে। নিসন্দেহে তুমি এক সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছো।'

দ্বিতীয় রুকুতে আল্লাহ তায়ালা এ সূরায় বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহভীরুদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ বাগিচা রয়েছে। আমি কি মুসলিমদেরকে অপরাধীদের মতো করে দেবো? তোমাদের কি হয়েছে? এ কি ধরনের সিদ্ধান্তে তোমরা উপনীত হচ্ছো?'

অপর এক জায়গায় রসূল (স.)-এর জনৈক কট্টর দুশমন প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'সেই ব্যক্তির অনুসারী হয়ো না, যে ব্যক্তি কথায় কথায় শপথ করে, অত্যধিক পরনিন্দুক ও চোগলখোর। সৎ কাজে বাধা দানে অতীব তৎপর, অত্যাচারী ও পাপিষ্ট, অতি মাত্রায় অহংকারী ও জারজ, প্রচুর সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতির অধিকারী হওয়ার কারণে যার এতো স্পর্ধা, যার সামনে কোরআন পাঠ করা হলেই বলে ওঠে, 'সব তো সেকেলে কিচ্ছা কাহিনী। অচিরেই আমি তার শুঁড়ে দাগ দিয়ে দেবো।'

অতপর যারা ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের সকল শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সুতরাং আমাকে এবং এই বাণীকে যে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে তুমি ছেড়ে দাও। আমি প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে এমনভাবে তিলে তিলে শেষ করে দেবো যে তারা টেরই পাবে না। আমি তাদেরকে ঢিল দেবো। আমার কৌশল খুবই সূক্ষ্ম।'

এই কৌশল আখেরাতের সেই আযাবের অতিরিক্ত, যা অহংকারীদের অহংকারকে ধুলায় মিশিয়ে দেবে। যে দিন অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতি দেখা দেবে এবং তাদেরকে সাজদা করার আহবান জানানো হবে, কিন্তু তারা তা করতে পারবে না। তখন তারা ঘোরতর লাঞ্ছনার শিকার হবে। অথচ ইতিপূর্বে তাদেরকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সাজদার জন্যে ডাকা হতো।

www.pathagar.com

অহংকারের পরিণাম প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা একটা বাগানের মালিকদের ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধনবল ও জনবলে বলীয়ান হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী কুচক্রী কোরায়শ নেতাদের শাসানো ও ভয় দেখানো। সূরার শেষে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে তাই অটুট ধৈর্য অবলম্বনের উপদেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমার প্রভুর নির্দেশের জন্যে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করো এবং মাছের পেটের অধিবাসীর মতো হয়ো না।'

এই সান্ত্বনা সহানুভূতি প্রশংসা ও প্রবোধসূচক বক্তব্য এবং ইসলামী দাওয়াত অস্বীকারকারীদের প্রতি কঠোর আক্রমণাত্মক ও হুমকিসূচক বক্তব্য উচ্চারণের পর আল্লাহ তায়ালা একই ধরনের কঠোর ভাষায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে আমরা সেই সময়কার মুসলমানদের কিছু বৈশিষ্টের সন্ধান পাই। সেটা ছিলো মুসলমানদের দুর্বলতা ও সংখ্যা স্বল্পতার যুগ, তাদের জন্যে এক দুর্বিষহ কঠিন সময়। সেটা ছিলো সেই শক্ত ভূখন্ডে দ্বীনের সেই মহতী চারাগাছটিকে রোপনের জন্যে মোমেনদের দুঃসাহসী চেষ্টার এক পবিত্র মুহূর্ত। অনুরূপভাবে সূরার বাচনভংগী ও বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে আমরা সেই সময়কার ইসলামী আন্দোলন কি ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলো তাও জানতে পারি। সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তৎকালীন চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা, আবেগ অনুভূতি, চেতনা এবং সমস্যা সব কিছুতেই একটি আদিমতার ছাপ পরিস্ফুট ছিলো।

ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরোধে তারা যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলো, তাতেই আমরা এই আদিমতার সাক্ষাৎ পাই। তারা রসূল (স.) কে 'পাগল' বলেছিলো। এই অপবাদটি আরোপে বিন্দুমাত্রও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করা হয়নি। কোনরূপ যুক্তি ও ভূমিকা ছাড়াই নবীর প্রতি অশ্রাব্য গালি ছুঁড়ে মারা ছাড়া তারা দ্বিমত প্রকাশের আর কোনো ভাষাই খুঁজে পায় না, সভ্যতার সেই আদিম স্তরের লোকদের রীতিই এটা।

আদিম স্তরের মানুষের উপযোগী এই ভাষার সরলতা আমরা দেখতে পাই তাদের মিথ্যা অপবাদ খন্ডনে আল্লাহ তায়ালা যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তাতেও। তিনি বলেন,

'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও। তোমার জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী প্রতিদান। তুমি প্রতিষ্ঠিত আজ এক সুমহান চরিত্রের ওপর।'

অনুরূপভাবে এটা দেখতে পাই সূরার এ আয়াতে ঝংকৃত প্রকাশ্য রোষ কষায়িত হুংকারে,

'আমাকে ও আমার বাণী প্রত্যাখ্যানকারীকে ছেড়ে দাও, আমি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে (অধপতনের শেষ স্তরে) এমনভাবে নিয়ে যাবো যে, তারা টেরও পাবে না। আমি তাদেরকে ঢিল দিয়ে দেই। আমার কৌশল অত্যন্ত সূক্ষ্ম।' ভাষার এই সরলতা কাফেরদের এক ব্যক্তির ওপর পাল্টা গালাগাল বর্ষণের মধ্য দিয়েও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, 'তুমি সেই ব্যক্তির অনুসরণ করো না যে ঘন ঘন শপথ করে, যে অত্যন্ত নীচ, যে অতিশয় নিন্দুক ও চোগলখোর, সৎ কাজে বাধা দানকারী, সীমাতিক্রমকারী পাপিষ্ঠ, ধিকৃত ও জারজ। ....'

www.pathagar.com

ভাষার উক্ত সরলতা আমরা বাগানের মালিকদের সংক্রান্ত সেই ঘটনাতেও দেখতে পাই, যা আল্লাহ তায়ালা এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করেছেন। এটি ছিলো এমন একটি দলের ঘটনা, যারা আপন চিন্তাধারায়, ধ্যান ধারণায়, অহংকারে, কথাবার্তায় ও চালচলনে অসভ্য ও নির্বোধ মানুষের মতই সরল ছিলো। সূরার এক জায়গায় তাদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে,

'তারা অতি সংগোপনে এরূপ শলাপরামর্শ করতে করতে রওনা হলো যে, আজ বাগানের ভেতরে কোনো মিসকীনই যেন ঢুকতে না পারে।....'

সর্বশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি যে বিতর্কের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন তাতেও একই ধরনের সরল ও সহজবোধ্য বাচনভংগী দেখতে পাই,

'তোমাদের কাছে কোনো কেতাব আছে নাকি, যা তোমরা পড়ো? তাতে কি তোমাদের অতি পছন্দনীয় কথাবার্তা আছে? ...... হে নবী! ওদেরকে জিজ্ঞেস করো যে, এ সব বিষয়ে জবাব দেয়ার দায়িত্ব কে নেবে?'

এ সব প্রশ্ন থেকে বুঝা যায় মোশরেকরা কি ধরনের চিন্তাগত বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলো। সেই সাথে কোরআনের বিশিষ্ট বাচনভংগীর মাধ্যমে রসূল (স.)-এর জীবনের ঘটনাবলী জানা যায়, জানা যায় ইসলামী দাওয়াত কি কি অবস্থার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিলো, কোরআন সেই পরিবেশকে এবং ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত সেই দলটিকে রসূল (স.)-এর জীবনের শেষভাগে কতখানি উন্নীত করেছিলো এবং তাকে সেই প্রাক ইসলামী জাহেলী চিন্তাধারা, ধ্যান ধারণা, চেতনা, মূল্যবোধ ও নির্বোধ সুলভ সরলতার স্তর থেকে কত উচ্চে উত্তোলন করেছিলো।

কোরআনের বর্ণনা থেকে আরো জানা যায়, কোরআন থেকে হেদায়াত লাভের পর তাদের জীবনে, আকীদা বিশ্বাসে, ধ্যান-ধারণায়, মূলবোধে, আবেগ-অনুভূতিতে ও বাস্তবতায় মাত্র বিশ বছরের মধ্যে কি আমূল পরিবর্তন এসেছিলো। বিশ বছর যদিও কোনো জাতির জীবনে নিতান্তই অনুল্লেখযোগ্য একটি সময়, তবুও সেই সংক্ষিপ্ত সময়ে তাদের জীবনে যে সর্বব্যাপী ও সুদূরপ্রসারী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিলো, সমগ্র মানবেতিহাসে তার তুলনা নেই।

সেই বিপ্লবের বদৌলতে তারা গোটা মানবজাতির নেতৃত্ব হস্তগত করেছিলো এবং তাদের চিন্তাধারা ও স্বভাবচরিত্রের এতো উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করেছিলো, যা ইতিহাসে আর কখনো সাধিত হয়নি। সেই নযীরবিহীন বিপ্লব সাধিত হয়েছিলো আকীদা বিশ্বাসের ধরনে ও গুণমানে, মানুষের পার্থিব জীবনে সেই আকীদা বিশ্বাসের বাস্তব রূপায়নে, সমগ্র মানবজাতিকে উদারতা ও সহমর্মিতার এক অখন্ড ও বিশালকার বৃত্তে সমবেতকরণ ও একীভূতকরণে, সর্বোপরি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের যাবতীয় চেতনাগত, চিন্তাগত, সামাজিক ও সাংগঠনিক প্রয়োজন পূরণে। তাদের জীবনে সংঘটিত এই সর্বাত্মক বিপ্লব ছিলো আসলেই একটা অলৌকিক ঘটনা।

এ সর্বাত্মক বিপ্লব নিছক একটি সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত করা এবং একটি দুর্বল মানবগোষ্ঠীকে শক্তিমানে পরিণত করার চেয়ে অনেক বড় ও ব্যাপক ব্যাপার। কেননা ব্যক্তি মানুষের মনমানস ও স্বভাব চরিত্র গঠন গোষ্ঠী ও সমাজ মানস গঠনের চেয়ে অনেক কঠিন কাজ।

www.pathagar.com

সূরা হাক্কাহ

এটি একটি ভয়ংকর আতংক সৃষ্টিকারী সূরা। এটি শোনামাত্রই স্নায়ুতে একটা তীব্র ঝাকুনি অনুভূত হয়। সূরাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেতনায় ক্রমাগত করাঘাত করতে থাকে। এটি যেই পড়ে এক অবর্ণনীয় ভীতি তার গোটা সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিভীষিকাময় দৃশ্যগুলো একের পর এক তার সামনে আসতে থাকে এবং তা তার স্বায়ূতন্ত্রীকে ঝাকুনি দিয়ে চলে যায়। কখনো ভীতি ও শংকা, কখনো ভক্তি ও শ্রদ্ধা আবার কখনো শান্তির অনুভূতি জাগে। আর প্রতি মুহূর্তে অনুভূত হয় এক অতন্দ্র ও সদা জাগ্রত সত্তার দৃপ্ত তৎপরতা।

সূরাটি সামগ্রিকভাবে শ্রোতার চেতনায় সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে যে অনুভূতি জাগ্রত করে তা হচ্ছে এই যে, দ্বীন ও ঈমানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা কোনো তামাশার বিষয় নয়। এতে কোনো তামাশার অবকাশই নেই। এটি দুনিয়াতেও গুরুত্বপূর্ণ, আখেরাতেও গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহর দাড়িপাল্লায় ও হিসাব-নিকাশেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা। তাই এ বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া বা উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই। যে কেউ এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করার চেষ্টা করবে, সে আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য গযবের কবলে পড়বে। রসূল (স.) যদি একে উপেক্ষা বা অবহেলা করতেন, তাহলে তাঁরও রেহাই ছিলো না। কেননা দ্বীন ও ঈমান গোটা মানব জাতির চেয়েও মূল্যবান, দুনিয়া জাহানের সবকিছুর চাইতেও বেশী গুরুত্বপুর্ণ, মহীয়ান ও গরিয়ান।

বস্তুত আল্লাহর এ দ্বীনই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য, চিরন্তন ও শাশ্বত সত্য এবং দৃঢ় প্রত্যয়মূলক, অকাট্য মহা সত্য– যাতে সন্দেহ সংশয়ের লেশমাত্রও নেই। সর্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এ দ্বীন তাই সৃষ্টি জগতের সব কিছুর উর্ধে।

উপরোক্ত নিগুঢ় তত্ত্ব এই সূরার নাম থেকেই প্রতিভাত হয়। সূরাটিতে কেয়ামতেরও একটি নাম মনোনীত করা হয়েছে। নামটি হচ্ছে 'আল-হাক্কাহ'। এ শব্দটি শাব্দিক ও অর্থগত উভয় ভাবেই মানবীয় স্নায়ূতে সত্য প্রিয়তা, সত্যনিষ্ঠা এবং সত্যের জন্যে দৃঢ়তার ভাবধারা বদ্ধমূল করে দেয়। শব্দটির ধ্বনিতাত্বিক ও উচ্চারণগত ভারত্বের বিশ্লেষণ করলেও মনে হয়, এটি শ্রোতার ওপর এমন ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয় যে সত্যের অবস্থানে সে একেবারেই স্থির হয়ে যায়।

এই দ্বীন, এই আকীদা এবং আখেরাতে অবিশ্বাসীদের শোচনীয় পরিণতির মধ্য দিয়েও এই তাৎপর্য প্রতিভাত হয়। সেই পরিণামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে ধারাবাহিকভাবে সূরার শুরু থেকেই। সে বিবরণে দেখানো হয়েছে কি সাংঘাতিক ও বীভৎস পরিণতি ইসলামের দুশমনদের কপালে জুটেছিলো। বলা হয়েছে, 'সামূদ ও আদ জাতি অবিশ্বাস করেছিলো সেই অতর্কিতে নেমে আসা ভয়ংকর ঘটনাকে। সামুদ তো এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে গেছে, আর আদকে ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় দিয়ে।'

www.pathagar.com

'.......যেন কোনো সংরক্ষক তার স্মৃতিকে সংরক্ষণ করে রাখে।'

এভাবে যে বা যারাই এই সত্যকে অগ্রাহ্য করেছে, তাকে বা তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। সে পরিণতি ছিলো ততটাই ভয়াবহ ও মারাত্মক, যতটা গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তব এই মহাসত্য। এতে আদৌ কোনো তামাশা বা অবজ্ঞা অবহেলার অবকাশ ছিলো না।

কেয়ামতের যে ত্রাস-সঞ্চারী দৃশ্য এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে, তাতেও সত্যের উল্লেখিত তাৎপর্য প্রতিফলিত। সে সময়ে সৃষ্টি জগতের শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং মহান আল্লাহর জ্যোতির বিস্ফোরণ ঘটবে। বলা হয়েছে, 'যখন শিংগায় একটি ফুঁক দেয়া হবে..... তোমার প্রভুর সিংহাসন সেদিন মাথার ওপর বহন করবে আটজন।'

পূর্বেকার আতংকজনক বিবরণ আর এখানকার ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুভূতি জাগ্রতকারী বিবরণ এ দুয়ে মিলে হিসাব নিকাশের দৃশ্যের ভয়াবহতা আরো বাড়িয়ে দেয় এবং উল্লিখিত নিগুঢ় তাৎপর্যকে চেতনায় আরো গভীরভাবে বদ্ধমূল করে। এরপর মুক্তিলাভকারী ও শাস্তি ভোগকারীদের বাক্যালাপের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। যথা,

'যাকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সে বলবে এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো। আমার এই হিসাব-নিকাশ হওয়ার এই দিনটির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো।'

এই ব্যক্তি মুক্তি পেয়ে গেছে। তবু স্পষ্ট করে নিজের মুক্তির কথা ব্যক্ত করবে না। পক্ষান্তরে যাকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সে বলবে, 'হায়, আমার আমলনামা না দিলেই ভালো হতো। আমার হিসাব যদি আমি না জানতাম এবং আমার মৃত্যুই যদি আমাকে নিশ্চিত করে দিতো, তাহলে কতোই না ভালো হতো। আমার সহায় সম্পদ (আজ) কোনো কাজে লাগলো না। ....।' এভাবেই অপরাধীর শোচনীয় পরিণতি মানবীয় অনুভূতিতে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

এরপর সেই ভয়াবহ দিনের বিভীষিকাময় দৃশ্যে আরো একটা ব্যাপার সংযোজিত হয়। সেটা হলো সে দিনের সর্বময় কর্তার এই ঘোষণা, 'ওকে গ্রেপ্তার করো এবং ওর ঘাড়ে শেকল পরাও। তারপর ওকে জাহান্নামে ছুড়ে মারো। তারপর সত্তর হাত লম্বা শেকলে ওকে বাঁধো।' এ আয়াত কয়টির প্রতিটি আয়াত যেন সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীর সমান ভারী হাতুড়ি হয়ে আমাদের বুকে অত্যন্ত ভয়ংকর ভাবে আঘাত হানে।

পরবর্তী আয়াতগুলোতে এই ভয়াবহ পরিণতির কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'সে (আসলে) মহান আল্লাহর ওপর ঈমান রাখতো না, দরিদ্রকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না। আজ তাই এখানে তার কোনো অন্তরংগ বন্ধু নেই। ক্ষতস্থানের নোংরা নির্যাস ছাড়া তার আর কোনো খাদ্য নেই, যা কেবল পাপিষ্ঠ লোকদের খাদ্য।'

তারপর সেই তাৎপর্য এই শপথ বাক্যেও প্রতিফলিত হয়, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন সম্পর্কে উচ্চারণ করেছেন, 'তোমরা যা দেখতে পাও ও যা দেখতে পাওনা তার শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই এ বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন মহান দূতের বাণী। এটা কোনো কবির কথা নয়.... বিশ্ব প্রভুর প্রত্যাদেশ।' সর্বশেষে

www.pathagar.com

এই মর্মে চূড়ান্ত হুমকি ও হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে যে, এই দ্বীনকে নিয়ে কেউ যদি ছিনিমিনি খেলে বা বিকৃত করে, তা সে যেই হোক না কেন, এমনকি খোদ রসূলও যদি হয়, তবু তার রেহাই নেই,

'যদি মোহাম্মদ (স.)ও নিজের কোনো মনগড়া কথাকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিত, তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠ-শিরা ছিঁড়ে ফেলতাম। আর সে অবস্থায় তোমাদের কেউই তাকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারতে না।' বস্তুত এ দ্বীন এমন একটি জিনিস, যার ব্যাপারে কোনো আপোষ, দরকষাকষি বা উদাসীনতার অবকাশ নেই।

সূরার শেষে কোরআন ও তার উপস্থাপিত দ্বীন সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে,

'নিশ্চয়ই এই কোরআন আল্লাহভীরুদের জন্যে স্মরণিকা। .....অতএব তোমার মহান প্রভুর নামে পবিত্রতা ঘোষণা করো।' সূরার শেষে এ হচ্ছে কোরআন সম্পর্কে চূড়ান্ত বক্তব্য।

এই সূরার বর্ণনাভংগী এমন দৃশ্য তুলে ধরে যে, পাঠক তার সামনে একেবারে সত্য ঘটনা চলন্ত ও জীবন্ত দেখতে পাচ্ছে বলে অনুভব করে। এ দৃশ্য সমূহ অত্যন্ত নাটকীয়, প্রভাবশালী, সংক্ষিপ্ত ও ক্ষীপ্রগতিসম্পন্ন। যেন সামূদ, আদ, ফেরাউন ও লুত (আ.)-এর জাতির বিধ্বস্ত জনপদগুলোর দৃশ্য একের পর এক আমাদের সামনে দিয়ে জীবন্ত হয়ে অতিক্রান্ত হয়।

হযরত নূহ (আ.)-এর আমলের মহাপ্লাবনের ঘটনা, কিছু সংখ্যক মানুষের নৌকায় আরোহন ও বাদবাকীদের ধ্বংসের দৃশ্য এবং একটি ঐতিহাসিক সত্যকে মাত্র কয়েকটি শব্দে ব্যক্ত করে দিচ্ছে। আদ জাতির ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য এবং তাদের সম্পর্কে এই শব্দগুলো এরূপ উপমা দেয় যে, তারা খেজুরের পুরানো পতিত ডালের মতো বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছিলো। সাত রাত ও আট দিন ধরে এক নাগাড়ে ঝড় চলতে থাকা এবং আদ জাতিকে সমূলে উৎখাত করার বিবরণ এমন চমৎকার অলংকার সমৃদ্ধ ভাষায় দেয়া হয়েছে যে, তার তুলনা বিরল। কোরআন যে আসলেই ভাষার মোজেযা, এ সূরা অধ্যয়ন করলে সে সম্পর্কে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়।

কেয়ামতের ভয়াবহ বিস্ফোরণের কথা এমন ভাষায় বলা হয়েছে যে, মনে হয় এ বিস্ফোরণ এক্ষুণি আমাদের সামনেই সংঘটিত হবে। আকাশ ও পৃথিবীকে এক সাথে উত্তোলন করা ও তারপর এক সাথে আছাড় দেয়া। তারপর আকাশ ফেটে যাওয়া এবং সেদিন আকাশের খুবই দুর্বল হওয়া এবং ফেরেশতাদের আকাশের প্রান্তে অবস্থান এ সব আল্লাহর দোর্দন্ড প্রতাপের এমন ভয়াল দৃশ্য যেন তা এক্ষুণি সংঘটিত হচ্ছে। তা ছাড়া আটজন ফেরেশতার আল্লাহর আরশকে ঘাড়ে তোলা, মানুষের যাবতীয় কৃতকর্ম সহ আল্লাহর সামনে হাযির হওয়া এবং তাদের কোনো কাজ বা কথাই গোপন না থাকা এ সব বিবরণ পড়ে সত্যি যেন কেয়ামতের মাঠ ও আল্লাহর আদালতের ছবি চোখের সামনে প্রতিভাত হয়।

www.pathagar.com

এরপর মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দৃশ্য দেখানো হয়েছে। তার ডান হাতে তার আমলনামা। তার এতো আনন্দ যেন সমগ্র পৃথিবী তার সে আনন্দে মাতোয়ারা। উল্লসিত হয়ে সে সবাইকে তার আমলনামা পড়ে দেখার জন্যে ডেকে। বলছে, 'এই যে আমার আমলনামা তোমরা পড়ো। আমি বিশ্বাস করতাম যে, একদিন হিসাব নিকাশের সম্মুখীন আমাকে হতে হবে।' অপরদিকে ব্যর্থকাম মানুষের দৃশ্য। তার বাম হাতে তার আমলনামা। আর তার প্রতিটি বাক্য থেকে অনুতাপ, দুঃখ ও হতাশা প্রতিফলিত। 'হায় আফসোস! আমাকে আমার আমলমানা না দেয়া হলেই ভালো হতো.....আমার সমস্ত প্রভাব প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে গেছে।'

আল্লাহ তায়ালা যখন বলবেন 'ওকে গ্রেফতার করো অতপর শেকল পরাও.....' একথা শুনে কম্পিত হবে না এমন কে আছে? সেদিন আল্লাহর এ আদেশ কেমন ক্ষিপ্রগতিতে প্রতিপালিত হবে তা সবাই দেখতে পাবে। সেদিন যারা ব্যর্থ হবে তাদের অবস্থা হবে বড়ই করুণ। বলা হয়েছে, সেদিন সেখানে তার কোনো বন্ধু থাকবে না ......' এ সব সত্যিই খুব ভয়াবহ দৃশ্য।

সবার শেষে যে হুমকি আল্লাহর নামে মনগড়া মিথ্যা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছে তা শুনে আতংক অনুভব করে না এমন মানুষ অত্যন্ত কম।

এই সুরায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহের ধ্বনাত্মক বৈশিষ্ট খুবই লক্ষণীয়। বাক্যের ভেতরে যে দৃশ্য সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সব দৃশের অনুপাতে শব্দের স্বরগত তারতম্য রয়েছে। উদারহণ স্বরূপ সূরার শুরুতে 'আল-হাক্কা, উচ্চারণে দীর্ঘ টান, দ্বিত্ব প্রয়োগ ইত্যাদি বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে।

প্রথম আয়াত দুটিতে থামলেও যেমন শ্রোতার মনে তা বিশেষ প্রভাব পড়ে, না থামলেও তেমনি। এ শব্দগুলো দুনিয়া ও আখেরাতে আনন্দ ও বেদনা, আশা ও নিরাশার যে দৃশ্য রয়েছে, তাও যেন সংশ্লিষ্ট শব্দ সমূহ উচ্চারণের সাথে সাথেই জীবন্ত ও মূর্ত হয়ে ওঠে। আর এই শব্দগুলোর ধ্বনি ও গঠন প্রণালীর সাথে সে দৃশ্য সমূহের ঘনিষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। তারপর যেই অপরাধীর শাস্তির বিবরণ শুরু হয় অমনি শব্দের সূর ও ধ্বনি পাল্টে যায়।

'ওকে ধরো, শেকল পরাও, অতপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো' এর প্রতিটি শব্দের সূর বক্তব্য বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। অতপর সহসাই সূর পাল্টে যায় যখন আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্তের কারণ বর্ণনা করে বলেন, 'সে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখতো না, তোমার মহান প্রভুর তাসবীহ করো।'

এখানে শব্দগুলোর সুর ও ধ্বনি দীর্ঘায়িত হয়েছে। কেননা এখানে কারণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এ কয়টা জিনিস আমি উদাহরণ হিসাবে বর্ণনা করলাম। নচেৎ সমগ্র সূরা আসলে এরূপ। বস্তুত এ সূরার শব্দ কাঠামোই এমন যে, যে-ই তা শুনবে, সে প্রকম্পিত না হয়ে পারবে না এবং তা যে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও অলংকার বর্ণনার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী।

www.pathagar.com

সূরা আল মায়ারেজ

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ সে সকল সূরার অন্যতম যা মানুষের অন্তরকে জাহেলিয়াতের গভীর অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে আমরা যদি একটু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে, প্রাচীনকালের জাহেলিয়াত এবং আধুনিক কালের জাহেলিয়াতের মধ্যে পার্থক্য শুধুই বাহ্যিক, মৌলিকভাবে এতে কোনো পার্থক্য নেই, তাই আধুনিককালের যে কোনো জাহেলিয়াতের মোকাবেলায়ও এ সূরাটি সমভাবে ক্রিয়াশীল।

অন্যকথায় বলতে গেলে অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানব মনে যতো প্রকার সংকট ও সমস্যা এসে তাকে কঠিন অবস্থায় নিক্ষেপ করেছে এবং সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুঞ্জিভূত যে সকল কুসংস্কার মানুষকে সরল সত্য পথ গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে, ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে সে সময় মুসলমানদেরকে এই সব ধরনের জটিলতারই সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। যে অবধারিত সত্যটি এ সূরার আলোচ্য বিষয় তা হচ্ছে–

আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং সেখানে প্রত্যেক মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে, বিশেষ করে কাফেরদেরকে অবশ্যই আযাব পেতে হবে।

কোরআনে করীমের বহু স্থানে এই আযাবের বিশদ বর্ণনা এসেছে। ঈমানের পথে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকা এবং ঈমানের দাবী অনুসারে জীবনকে গড়ার জন্যে যে মযবুত ইচ্ছার প্রয়োজন তাকে এক রকম পাগলামীর সাথেই তুলনা করা যায়, কারণ জীবনলক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে পাগলপ্রায় না হলে সে লক্ষ্য লাভ করা সম্ভব নয়। এ কাজে দুঃখ কষ্ট সহ্য করা, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করা ও অনেক রকমের ত্যাগ স্বীকারের দাবী জানায়।

এ বাস্তব সত্যটি ঈমানে পরিপূর্ণ দিল এবং ঈমানশূন্য অন্তর উভয়ের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। যদিও লক্ষ্য তাদের সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী, কিন্তু উভয় শ্রেণীর মানুষই নিজ নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে দেওয়ানা না হয়ে সে লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। চিন্তার ক্ষেত্রে, চলার পথে ও মর্যাদা লাভের আকাঙ্খায়, সর্বত্র তার এই একাগ্রতা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহর পথকে পরিহার করে যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বড় হয়ে থাকার জন্যে তার সকল কাজ ও ব্যবহারকে পরিচালনা করবে তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা হীনতা, অপমান এবং ঘৃণা নির্ধারিত করে রেখেছেন। এই দুই শ্রেণীর মানুষের মূল্যের পার্থক্য আল্লাহর কথা থেকে যেমন জানা যায় তেমনি প্রকাশ পায় মানুষের কথা থেকেও। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও তাদের এই পার্থক্য ধরা পড়ে।

জাহেলিয়াতের সে জটীল গ্রন্থীগুলো খোলা এবং মানুষের মন-মানসিকতার দুর্ভেদ্য সংকট দূর করার জন্যে এ সূরাটির অবতারণা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোরআনে কারীম যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং

www.pathagar.com

গোটা সমাজকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোই তার উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে ব্যক্তি জীবনে পরিবর্তন এনে সমাজের মধ্যে তাকে মডেল হিসেবে তুলে ধরার মাধ্যমে কোরআনে কারীম আপন বক্তব্য তুলে ধরেছে। একারণেই মোমেনের হাতে তরবারি তুলে দেয়ার পূর্বে তাদেরকে এমন সব মানবীয় গুণাবলীতে ভূষিত করা হয়েছে যার ফলে ইসলামের দুশমনদেরকে শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছে।

কোরআনে পাককে যারা মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে তাদের কাছে নবী মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর মধুর চরিত্র এমনভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে যে, তা এদের মন মেজাযের ওপর এক স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। সে শক্তিশালী প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে যাওয়া তাদের জন্যে আর সম্ভব হয় না। রসূলুল্লাহ (স.)-এর এই অদ্ভুত ও আশ্চর্য আকর্ষণ অবশেষে তাদেরকে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করে। মক্কার জনগণ এভাবেই তাঁকে শেষপর্যন্ত তাদের নেতা হিসেবে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিলো।

তাঁর এই সর্বগ্রাসী চারিত্রিক প্রভাবকে কখনও এক ভীষণ তুফানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যার আওতা থেকে কিছুই রেহাই পায় না। আবার কখনও সে যাঁতাকলের সাথে তুলনা করা যায়, যার মধ্যে কিছু পড়লে তা গুঁড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় অথবা এমন চাবুকের সাথে তুলনা করা যায় যার ভীষণ যন্ত্রনাদায়ক কষাঘাত থেকে যেমন রেহাই পাওয়া যায় না তেমনি তা সহ্যও করা যায় না। এর অগ্নিবর্ষি আয়াতে হৃদয় মন বিকল হয়ে যেতে চায়, আবার সে আকুল আবেদনের সাথে কখনও তুলনা করা যেতে পারে যা অগ্রাহ্য করা মুশকিল। অথবা তুলনা করা যায় সে মনোরম সফরের সাথে যা যে কোনো যাত্রীর হৃদয় মনকে মুগ্ধ-আবেগে এমনভাবে বিমোহিত করে যেন তার সেখানে নিজস্ব চেতনা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

কখনও আবার তার ভীষণ প্রভাবকে এক নিদারুণ ভীতি ও ভয়ংকর চীৎকার ধ্বনির সাথে তুলনা করা যায়, যার কারণে মানুষ ভীত বিহবল চিত্ত ও বিস্ফোরিত নয়নে তার দিকে চেয়েই থাকে, কখনও এই প্রভাব বলয়ের মধ্যে পতিত হওয়ার কারণে তার কাছে সত্য এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগই তার থাকে না।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর মধুর চরিত্রের সংস্পর্শে এসে সুন্দর এক সপ্নিল আশায় মোমেনের মনপ্রাণ ভরপুর হয়ে যায়, পার্থিব যে সংকটাবর্তে ইতিপূর্বে তারা হাবুডুবু খাচ্ছিলো তা থেকে স্বানন্দে বেরিয়ে আসে। অনাগত দিনের আগমন কামনায় তাদের অন্তর উদ্বেলিত হয়।

আবার কখনও একে তুলনা করা যায় সে অবস্থার সাথে যে, সত্যের সংস্পর্শে এসে বিরোধীদের ভ্রুকুটিতে মন যখন বিচলিত হয়ে পড়তে চায়, তখন মনে হয় বন্ধুর গিরিসংকট অতিক্রম করার পর্যায়ে এসে ক্লান্ত পথিকের সামনে সেই হতাশ মুহূর্তে তা যেন অকস্মাৎ আশার এক আলোক রেখা। যেন সংকটাবর্তের গভীরে নিজ চোখে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

www.pathagar.com

এগুলোর যারা বিরোধিতা করে তাদেরকে পরাজয়ের গ্লানি লজ্জিত করে তোলে, সত্যের এই প্রসারকে তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, সত্য থেকে গাফেল এই গোষ্ঠি তখন নানা প্রকার প্রতিহিংসায় ফেটে পড়তে চায়। এই বিরোধিতায় যারা সত্যের বিজয়কে গভীর উৎসাহের সাথে অবলোকন করতে থাকে, তাদের সামনে যখন কোরআনের পাঠক তার দিগবিজয়ী দাওয়াতকে তুলে ধরে এবং 'একজন দায়ী ইলাল্লাহ' (সত্যের দিকে আহ্বানকারী) সকল কিছুর বিনিময়ে সত্যের এই সংগ্রামী পথ পরিক্রমায় সফলতা লাভ করে–যখন সত্যের মুঠো মুঠো আলোতে সে নিজে অবগাহন করতে তাকে তখন সমাজ জীবনের ব্যাধিসমূহ এমনিই ধীরে ধীরে অপসারিত হতে থাকে। এ সময় এই সত্য সন্ধিৎসু ব্যক্তি দেখতে পায় কেমন করে কোরআনে পাক সেই বিদ্রোহী ও কঠিন হৃদয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে চলেছে।

সত্যের এই উদাত্ত আহ্বান পেশ করে জাহেলিয়াতের পর্দা উন্মোচনের প্রচেষ্টা চালানোর সাথে সাথে সূরাটি আখেরাতের বাস্তবতাকেও ফুটিয়ে তুলেছে। এই আখেরাত-কেন্দ্রিক জীবন গ্রহণ করতে গিয়ে দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ও কঠিন পথ পরিক্রমের প্রয়োজন।

আখেরাতের বাস্তবতা মেনে নেয়ার জন্যে বিরোধীদের কাছে সূরা 'আল হাক্কা'তে প্রচুর যুক্তি পেশ করা হয়েছে। অবশ্য সেখানে আলোচনা এসেছে কিছুটা ভিন্নভাবে, সেখানে সম্পূর্ণ এক নতুন দিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সূরা 'আল-হাক্কা'-তে আখেরাতের ভয়াল ও বিভীষিকাময় অবস্থার চিত্র আঁকা হয়েছে, কিন্তু এ সূরার আলোচনা এসেছে ভিন্ন পদ্ধতিতে। এখানে নতুন এক দৃষ্টিকোণ পেশ করা হয়েছে, নতুন চিত্র ও মর্মস্পর্শী কিছু নতুন অবস্থা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

এরশাদ হচ্ছে, 'যখন একটিবার মাত্র শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতও যখন একটিবার ভীষণভাবে দুলে উঠবে সেই দিনই কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং তখন সে আকাশ ফেটে পড়বে। সেদিন সেই ভয়ানক অবস্থা সকল কিছুকে শক্তিহীন করে দেবে।'

'ফেরেশতারা সেদিন নিজ নিজ স্থানে স্থবির হয়ে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষমান থাকবে এবং তোমার মালিকের আরশ-কে সেদিন আটজন (ফেরেশতা) তাদের মাথার ওপরে ধরে রাখবে।' সে অবস্থার বর্ণনা মানুষের চেতনাসমূহকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত ও অভীভূত করে। এরশাদ হচ্ছে, 'সেদিন তোমাদের সবাইকে হাযির করা হবে, কোনো আত্মগোপনকারীই সেদিন নিজেকে গোপন রাখতে পারবে না।' এভাবে সেই দিনের আযাবের দৃশ্যসমূহ মানুষের মনে এমন ভয় ভীতির সঞ্চার করবে যে এতে তাদের বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে যাবে। হুকুম হবে, 'পাকড়াও করো ওকে, কষে বেঁধে ফেলো তাকে, তারপর ওকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দাও। অতপর সত্তর গজ দীর্ঘ শেকলে আবদ্ধ করে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাও।'

এ বর্ণনায় শাস্তিপ্রাপ্ত এ ব্যক্তিদের চীৎকার হা-হুতাশ ও হাহাকারের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। তারা বলবে, 'হায় আফসোস, আমাকে যদি আমার আমলনামা নাই দেয়া হতো, যদি আমি আমার ভাগ্য-লিখন মোটেই না জানতাম! হায়, আমি যদি (আজ) মৃত হতাম!'

www.pathagar.com

এ সূরার মধ্যে কেয়ামতের বিভীষিকার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে সেখানে তাদের চেহারার কি ভয়ানক রূপ হবে তা দেখানো হয়েছে, কেমন সন্ত্রস্তভাবে তারা হাঁটবে এবং তাদের চলার পথ কতো ভয়ংকর হবে। এ অবস্থা পৃথিবীর যে কোনো ভয়ংকর অবস্থা থেকে অনেক বেশী গুণে কঠিন হবে। আসলে সে ভয়ংকর অবস্থার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না, অর্থাৎ যতো প্রকার ভীতিজনক অবস্থা মানুষ চিন্তা করতে পারে এটা তার থেকেও অনেক কঠিন।

আগুন এর শাস্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তা পায়ের গিরা স্পর্শ করলে তার তাপে মাথার মগয পর্যন্ত টগবগ করে ফুটতে থাকবে। সে বর্ণনা দিতে গিয়ে কোরআনে পাক বলছে– 'সেদিন আকাশ বিগলিত তামার মতো হয়ে যাবে এবং পাহাড়-পর্বতগুলো সব হয়ে যাবে ধুনা তুলার মতো।'

সে সময় অন্তরংগ বন্ধু তার পরম বন্ধুকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। অপরাধী ব্যক্তি সেই কঠিন দিনে নিজের ছেলেকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে তার বিনিময়ে কঠিন আযাব থেকে বাঁচতে চাইবে। শুধু তাই নয়, নিজের জীবন-সংগিনী, ভাই, নিজের এমন আত্মীয় যার কাছে সে (প্রয়োজনের সময়) আশ্রয় নিয়েছে এবং পৃথিবীর যতো মানুষ ও সম্পদ আছে সকলের বিনিময়ে হলেও নিজেকে সে শাস্তি থেকে বাঁচাতে চাইবে।

জাহান্নামের যে ছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে মনে হয় তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র এক গতিশক্তি এবং এক অনুভূতি থাকবে। এ জাহান্নাম জীবন্ত কিছুর মতো জীবন্ত প্রাণীকে ভীতি প্রদর্শনে সক্ষম হবে। এরশাদ হচ্ছে–

'জাহান্নামের সে ডগডগে আগুন গোটা দেহকে ঝলসে দেয়ার পর শরীরের চামড়া ও মাংসকে খসিয়ে দিতে থাকবে। সে ওই ব্যক্তিকে তার দিকে ডাকতে থাকবে যে সত্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো এবং মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিলো! যে ধন সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখতো এবং তাই নিয়েই সর্বদা মাথা ঘামাতো ও তাতেই মেতে থাকতো।'

আর যে আযাবের কথা এখানে বলা হচ্ছে তা অপরাধীদেরকে ঘিরে ফেলবে এবং অকল্পনীয়ভাবে একের পর এক তার ওপর বিপদসমূহ আসতে থাকবে। বলা হচ্ছে–

'সেদিন তারা কবর থেকে এমন দ্রুতগতিতে বেরিয়ে আসবে যেন কোনো এক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর জন্যে তারা সবাই ছুটে চলেছে। তাদের চোখগুলো থাকবে ভীত সন্ত্রস্ত এবং হীনতা-দীনতা ও বে-ইযযতির গ্লানিতে তাদের গোটা সত্ত্বা ঢাকা থাকবে.....।'

এ দিনের দৃশ্য, বাস্তব ছবি ও প্রতিবিম্বের যেসব কথা এই সূরাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে তা সূরা 'আল হাক্কা'-এর বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু সূরা দুটিতে বর্ণনার ভিন্নতা থাকলেও বিষয়বস্তু মূলত একই। সুখে দুঃখে, সংকটে সচ্ছলতায় এবং ঈমানদার অবস্থায় বা ঈমানহীন অবস্থায় জীবন যাপন করতে গিয়ে একজন মানুষের মধ্যে যতো প্রকার অবস্থা দেখা দিতে পারে সূরায়ে 'মায়ারেজ'-এ তার বিশদ বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যে যে অভ্যাসটি একই রকম দেখা যায় তা হচ্ছে,

www.pathagar.com

'নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ব্যস্ত চরিত্রের সৃষ্টি রূপে, যখন কোনো দুঃখ কষ্ট বা অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে পেরেশান হয়ে যায়, আবার যখন কল্যাণ ও শুভদিনের মুখ দেখে তখন কাউকে দান করার ব্যাপারে সে সংকীর্ণ-হৃদয় হয়ে ওঠে, তবে সেই সকল নামাযী, যারা সদা সর্বদা নামাযে যত্নবান তাদের কথা আলাদা।'

তারপর বর্ণনার ধারা সাবলিল গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং মোমেনদের গুণাবলী, মন মানসিকতা ও তাদের চলার প্রকাশ্য ও গোপন পথ সম্পর্কে এ সূরাটির মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ, আল্লাহর অনুগত ও না-ফরমান উভয় প্রকার লোকই বর্তমান থাকে। আল্লাহর অনুগত যারা, সকল যামানায় তাদের বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেসব গুণ থাকতে পারে এখানে তা তুলে ধরে বলা হয়েছে, 'তবে সে সকল মুসল্লী যারা নামাযে যত্নবান, তাদের সম্পদের মধ্যে সে সব লোকের হক্ব রয়েছে যারা হাত পেতে কিছু চায় এবং যারা প্রয়োজনীয় মৌলিক বস্তুসমূহ থেকে বঞ্চিত।'

সূরা 'আল হাক্কা'-তে যে মূল বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যায় তা হচ্ছে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, মূলত এর ভিত্তিতেই মানুষের সমস্ত কাজ পরিচালিত হয়। তারপর অন্য যে সব বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে আখেরাত অন্যতম। এ সূরায় আলোচ্য আরো কিছু বিষয় হচ্ছে সত্য অস্বীকারকারী এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে। এরা আখেরাতে ধরা পড়ে যাবে এবং তাদের রেহাই পাওয়ার কোনো উপায়ই থাকবে না।

অপরদিকে সূরা 'মায়ারেজ'-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে আখেরাতের বাস্তবতা তুলে ধরা এবং সেখানে যে প্রতিফল ভোগ করতে হবে সে বিষয়ের প্রামাণ্য চিত্র অংকন করা। আসলে সূরাটির মূল বক্তব্যই হলো আখেরাত যে সংঘটিত হবেই সকল প্রকার সম্ভাব্য যুক্তির মাধ্যমে তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করা।

অন্যান্য যতো কথাই এ সূরার মধ্যে বলা হয়েছে তার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে আখেরাতের সাথে অর্থাৎ আখেরাতকে কেন্দ্র করেই অপর সকল বিষয়ের অবতারণা। আলোচনার মধ্যে আখেরাত অস্বীকারকারীদের প্রতি আল্লাহর পাকড়াও এবং মানুষের তরফ থেকে তাদের ওপর নেমে আসা শাস্তির বর্ণনাও পেশ করা হয়েছে। অতপর এরশাদ হচ্ছে– 'তাঁর কাছে ফেরেশতারা এবং রূহ উঠে যায় এমন এক দিনে যেদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান; অতএব সুন্দরভাবে সবর করো, যে (বিষয়)-কে তারা সুদূর পরাহত মনে করে আমি তো তা দেখছি খুবই কাছে.....।'

একথাগুলো আখেরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। ঈমানদার ও বে-ঈমান লোকদের দুঃখ ও সুখের জীবন যাপনের মধ্যে এই ধরনেরই পার্থক্য সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এই উভয় প্রকার লোকদেরকেই শেষ বিচারের দিনে নিজ নিজ কাজের বদলা পেতে হবে।

সূরাটির আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে এটাও আলোচ্য বিষয় যে, কাফেররা চরম ধোকার মধ্যে রয়েছে, তারা এটা মনে করে খুবই আশান্বিত হয় যে, তারা সবাই জান্নাতে যাবে, যতোই তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলুক বা

www.pathagar.com

পরকাল সম্পর্কে যতোই উদাসীন থাকুক না কেন। সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে কাফেরদের এই মিথ্যা আশার কথা পেশ করা এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

এই সূরা আখেরাতের অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া থেকে বিরত থেকেছে, অথচ সে বিষয়ের অন্যান্য তথ্য জানার জন্যে পাঠকের হৃদয় মন ব্যাকুল হয়ে থাকে।

আর একটি বিষয়ও এ সূরার মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং এখানে দেখা যায় তা নতুন এক ভংগিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা অন্য সূরাগুলো থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সূরায়ে 'আল হাক্কা' এবং এ সূরার বর্ণনাভংগির মধ্যে আরো কিছু পার্থক্য বিদ্যমান, যদিও আলোচ্য বিষয় একই। সূরা 'মায়ারেজ'-এর এ বর্ণনায় বৈচিত্র রয়েছে, একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, শুধু বাক্যের ছন্দের মিলই নয় বরং প্রতিটি শব্দও অত্যন্ত সামঞ্জস্য রয়েছে।

এখানে প্রতিটি বাক্যের মধ্যে যে ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয় তা অন্য যে কোনো সূরার তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক। সূরাটির প্রথমার্ধে আরো কিছু বর্ণনা বৈচিত্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রথমার্ধের শুরুর তিনটি বাক্যের দিকে তাকালে সূরাটির বর্ণনা বৈচিত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্যটি বুঝা সহজ হবে। এখানে দেখা যায়, বাক্যের মধ্যে আলোচিত কথাগুলো তার সমাপনী কথার দৈর্ঘের সাথে ও নিম্ন বর্ণিত কিছু বিষয়ের সাথে পরিপূর্ণভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। এরশাদ হচ্ছে,

'জিজ্ঞাসা করলো এক ব্যক্তি সে আযাব সম্পর্কে যা কাফেরদের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে এবং যাকে দূরে সরিয়ে দেয়ার মতো কেউ নেই।' (আয়াত ১-২)

পঞ্চম আয়াতের শেষে সবর-এর কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘ টান দেয়ার মতো 'আলিফ' ব্যবহার করা হয়েছে। 'ওরা তো দেখছে সে দিনটি অনেক দূরে, আর আমি দেখছি সে দিনটিকে অত্যন্ত কাছে।' এখানেও দ্বিতীয় বারের মতো দীর্ঘ 'আলিফ' ব্যবহার হয়েছে। 'সে দিন আকাশ হবে বিগলিত (তরল) তামার মতো, আর পাহাড়গুলো হবে ধুনা তুলার মতো এবং সে দিন কোনো অন্তরংগ বন্ধুই তার বন্ধু সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না-কেউ কারো খোঁজ খবরও নেবে না।'এখানেও তৃতীয়বারের মত দীর্ঘ 'আলিফ' দ্বারা বাক্য শেষ করা হয়েছে, আয়াতের অভ্যন্তরে কিন্তু একই ধরনের শব্দ বা বর্ণনাভংগী ব্যবহার করা হয়নি। আযাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে আযাবের দৃশ্যগুলো যখন তাদেরকে দেখানো হবে তখন অপরাধী সেই কঠিন অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে নিজের ছেলেকে মুক্তিপন হিসেবে সোপর্দ করতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। এখানেও দেখা যায় প্রথম বারের মতো দীর্ঘায়িত 'আলিফ' দ্বারা বাক্যটি শেষ করা হয়েছে।

'সে ভয়ানক আগুন ঝলসিয়ে দিয়ে শরীরের চামড়া ও রক্ত মাংসকে খসিয়ে দিতে থাকবে, ডাকতে থাকবে সে ব্যক্তিকে যে (সত্যকে) পেছন (ফেলে) চলে গিয়েছিলো এবং সত্য গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো।' (আয়াত ১৫-১৭)

www.pathagar.com

এ সূরার মধ্যে যে পাঁচ জায়গায় দীর্ঘায়িত 'আলিফ' রয়েছে সেখানকার দুটি সমাপনী 'আলিফ-এর' উচ্চারণ প্রথম তিনটি আয়াতের উচ্চারণ থেকে আবার একটু ভিন্ন।

এরপর সূরার অবশিষ্ট আয়াতগুলোতে দেখা যায় 'মীম' এবং 'নূন' দিয়ে শেষ করা হয়েছে এবং এগুলোর প্রায় সবগুলোর পূর্বেই 'ওয়াও' অথবা 'ইয়া' এসেছে।

আর একটি বৈশিষ্ট এ সূরার শুরুতে রয়েছে যা সূরাটিকে অত্যন্ত গোছালো এবং এর বর্ণনা পরম্পরাকে চমৎকারভাবে সামঞ্জস্যশীল বানিয়ে দিয়েছে এবং তা হচ্ছে, যে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, সে ঘটনা সংঘটিত হবেই। যে কোনো শ্রোতার মনে একথাটি দৃঢ় প্রত্যয় জাগায়। তৎকালীন আরব পরিবেশে যে ধর্ম-বিশ্বাস বিরাজ করছিলো তাতে পরকালের আযাবের কথা বলা যেমন কোনো পরিচিত বিষয় ছিলো না, তেমনি আরববাসীদের কানগুলোও এমন কোনো কথা শুনতে এবং তার প্রভাব গ্রহণ করতে মোটেই অভ্যস্থ ছিলো না। এ অবস্থায় আখেরাতের আযাব সম্পর্কে কোরআন অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে মানুষকে এমন কিছু কথা জানিয়েছে যা তৎকালীন আরববাসীরা সাধারণভাবেই গ্রহণ করতে পেরেছে, যদিও তারা যেভাবে জীবন যাপন করছিলো তাতে এ দাওয়াত তাদের কাছে ছিলো নতুন এবং অপরিচিত।[১]

সূরা আন নূহ

আলোচ্য সূরার সবটুকুর মধ্যেই নূহ আলাইহিস সালামের কেসসা ও তাঁর জাতির করুণ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীর বুকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে কতো ধরনের অভিজ্ঞতা একজন মানুষের হতে পারে তার বাস্তব ছবি এ সূরার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর বিশেষ একটি সময়ের অবস্থাকে তুলে ধরে স্থায়ীভাবে জাহেলিয়াতরূপী কঠিন রোগটির চিকিৎসা সম্পর্কেও এখানে জানানো হয়েছে। এ বর্ণনার মধ্যে একথাটাও জানানো হয়েছে যে, ভালো ও মন্দের মধ্যে সংঘর্ষ এক চিরন্তন ব্যাপার।

নূহ (আ.)-এর ঘটনা জানার পর মানুষ যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার মধ্যে একটি বড়ো অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, প্রতিহিংসাপরায়ন, বিপথগামী, অহংকারী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বরাবরই সত্যবিমুখ থাকে। হেদায়াতের যুক্তিপ্রমাণ তারা কিছুতেই বুঝতে চায় না। তাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যে যেসব বিস্ময়কর জিনিস তারা অনুভব করে এবং আদিগন্ত বলয়ে মনোমুগ্ধকর যা কিছু আছে তা থেকে ওরা মোটেই শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

দৃশ্য ও অদৃশ্য এ সব কিছুর মধ্যে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের নিদর্শন রয়েছে যা মানব মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। সেই নেয়ামতগুলোর দিকে একটু ভালোভাবে

১. উৎসাহীদের এ ব্যাপারে 'আত তাসওয়ীরুল ফান্নী ফিল কোরআন' পুস্তকের 'আত তানাসুকুল ফান্নী ফিল কিতাব' অধ্যায় দেখার জন্য অনুরোধ করছি।—সম্পাদক

www.pathagar.com

দৃষ্টিপাত করলে সেগুলোর আলোকে সঠিক পথপ্রাপ্তি মোটেই কঠিন হয় না। আল্লাহর সেই বিধানসমূহ হিংস্র, বিপথগামী, অসৎ, সত্যবিমুখ ও অহংকারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবক্তাদের মনেও রসূল (স.)-এর আগমনের যথার্থতা ও কল্যাণকারিতা সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মায়। এইসব প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে সাথে রয়েছে নবী রসূলদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, ইসলামের ভুবন মোহিনী দাওয়াতকে মানব সাধারণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার জন্যে তাঁদের পূর্ণাংগ আত্মনিবেদন, এ কাজের জন্যে বাঞ্ছনীয় নানা প্রতিকুলতার মোকাবেলায় পর্বত-সম তাঁদের অবিচলতা এবং নিরন্তর অধ্যবসায়, যা ভুলপথে পরিচালিত বিরোধী মনোভাবাপন্ন, পাপপ্রবণ ও উচ্ছৃংখল মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নিখুঁত ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছে।

কিন্তু আফসোস, ওদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, ওরা বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করার যৌক্তিকতা বুঝতে পারছে না, ওদের কাছে সত্যপথের পথিক যারা হেদায়াতের পথে চলছে, তাদের কোনো মূল্য বা মর্যাদা নেই, তারা ঈমানী যিন্দেগীর মধ্যে উপস্থিত কোনো লাভ দেখতে পায় না! তারা তো মনে করে স্কুল কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কাজ করলে, পড়াশুনা করলে বা পড়ালে যেমন মজুরী বা নানা প্রকারের সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যায়, ইসলাম গ্রহণ করলেও সে ধরনের কিছু না কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে। যারা ইসলাম গ্রহণ করছে তাদেরকে যখন এরা কোনো বৈষয়িক সুবিধা পেতে দেখে না, তখন তারা পরবর্তীকালে অবশ্যম্ভাবী সাফল্যের খবরের প্রতি কোনোভাবেই আস্থা আনতে পারে না।

এমনি ধরনের এক পরিবেশের মোকাবেলা করতে হয়েছে নূহ (আ.)-কে। দীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর নিরন্তর চেষ্টা করার পর তিনি তাঁর হতভাগা জাতির বিরুদ্ধে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে নালিশ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি বিরোধীদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে দিবারাত্র চেষ্টা করেছেন, এর জন্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টা চালানোর সময়ে বিরোধীদের সকল বাধা-বিপত্তি, উপহাস, বিদ্রূপ, অবহেলা ও অবজ্ঞা-নীরবে সহ্য করেছেন। ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকার বিরোধীদেরকে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ নিয়ে দীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর আহ্বান করার পর তিনি তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর দরবারে পেশ করার প্রয়োজন বোধ করেন। তিনি এই বলে দোয়া করেন,

'হে আমার রব, অবশ্যই আমি আমার জাতিকে রাত-দিন ডেকেছি, কিন্তু আমার সেই আহবানের ফল তাদের জন্যে পালানো ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করেনি; আর যতবারই আমি তাদেরকে ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে ডেকেছি ততবারই তারা কানে আংগুল দিয়ে থেকেছে ...।'

এরপর বলেছি, ক্ষমা চাও তোমাদের প্রতিপালকের কাছে. .... নূহ (আ.) পুনরায় দোয়া করতে গিয়ে বলছেন, 'হে আমার রব, ওরা আমার সাথে নাফরমানী করেছে এবং সেই ব্যক্তির আনুগত্য করেছে যার ধনসম্পদ এবং সন্তান শুধু তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে ....।'

www.pathagar.com

সামগ্রিকভাবে এই হচ্ছে তৎকালীন সমাজের অবস্থা, আর পাশাপাশি আল্লাহর প্রেরিত নবীর দায়িত্ব পালন প্রণিধানযোগ্য। তিনি রেসালাতের হক আদায় করতে একটুও কসুর করেননি।

অনুরূপভাবেই সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করার জন্যে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। সমগ্র পৃথিবীর বুকে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা তথা আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের দায়িত্ব ছিলো শেষ যামানার নবীর প্রতি মহাপবিত্র এক আমানত। রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি অর্পিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে এটাই ছিলো সবচাইতে বড় এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনকালে তাকে দেখানো হচ্ছে, তাঁর পূর্বসূরী তারই এক ভাই নূহ (আ.) পৃথিবীতে ঈমানী যিন্দেগী প্রতিষ্ঠার জন্যে কতো কঠিন দায়িত্ব কতো দীর্ঘকাল ধরে পালন করেছেন ।

তাঁকে আরও জানানো হচ্ছে, দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার সময়ে তাঁকে অতীতে কতো সাংঘাতিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, দেখানো হয়েছে সত্য-সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিরোধিতায় বাতিলপন্থী নেতারা কতো কঠিন ও হিংস্র। আরও এটাও দেখানো হয়েছে যে, এতসব বাধা বিঘ্ন ও অসৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্তেও মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন-কানুন চালু করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলদের প্রেরণের এক অবিরত ধারা, যার একটি পর্যায় নূহ আলাইহিস সালামের ওপর এসে শেষ হয়েছে।

বিশেষভাবে মক্কার মুসলমানদের সামনে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলমানের সামনে নূহ (আ.)-এর যামানার সেই মহা সংকট ও সেই চরম বিদ্রোহী জাতির শাস্তির অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। জানানো হয়েছে যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্যে এই মুসলিম জাতিই নবী (স.)-এর ওয়ারেস বা উত্তরাধিকার হিসেবে কাজ করবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে মানুষকে এগিয়ে আনার জন্যে দাওয়াত দানের কাজ তারা করবে, সেই জনপদকে সত্যের দিকে আহবান জানানোর জন্যে কাজ করবে, যারা শেরক বেদ্য়াতে ভরা পরিপূর্ণ জাহেলিয়াতের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত, যারা জাহেলিয়াতের মধ্যে বরাবর হাবুডুবু খেয়েছে তারা হচ্ছে সেই সকল জাহেল যারা সবরকম অন্যায় ও অপকর্মের মধ্যে মজবুতভাবে টিকে থাকার জন্যে চূড়ান্ত রকমের চেষ্টা করেছে এবং সেই সময়কার ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করেছে। সংখ্যায় তারা যদিও ছিলো অতি নগণ্য।

কোরায়শদের সামনে নূহ (আ.)-এর সময়কার সেই দীর্ঘ কাহিনী তুলে ধরা হচ্ছে যাতে করে তারা হৃদয়ের চোখ দিয়ে তাদের পূর্বসূরী সত্যবিরোধী ও সত্যকে অস্বীকারকারীদের পরিণতিকে দেখতে পায়, তাদের কাছে প্রেরিত রসূলের মায়াভরা ব্যবহার যেন দেখতে পায়।

এ অবস্থায় নিশ্চিত তারা অনুভব করবে যে, রসূল (স.) তাদেরকে কোনো ধ্বংসের দিকে আহবান জানাচ্ছেন না, বরং তারা তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নির্ধারিত দয়ার এক প্রতিমূর্তি হিসেবে দেখবে-সুনির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্যে ঢিল দেয়া বা অবকাশ দেয়ার অবস্থাকেও তারা দেখতে পাবে। যেহেতু সত্যকে বুঝার জন্যে

www.pathagar.com

সর্বপ্রকার উপায়-উপকরণ ও উদাহরণ তাদের সামনে চূড়ান্তভাবে এসে গেছে, এ জন্যে নূহ (আ.)-এর যামানার মতো এতো দীর্ঘ সময়ের জন্যে দাওয়াত পেশ করার এখন আর প্রয়োজন হবে না। নূহ (আ.)-এর প্রার্থনার ফলে যে কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো সেই কঠিন পরিস্থিতিও এখন আর কোনোদিন আসবে না।

কিন্তু আফসোস সেই কোরায়শদের জন্যে, এ সকল যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ কথা তাদের গোমরাহী বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনো কাজই করলো না। এরশাদ হচ্ছে,

'নূহ দোয়া করতে গিয়ে বললো, হে আমার রব, পৃথিবীতে কাফেরদের একটি ঘরও ধ্বংস না করে তুমি ছেড়ে দিয়ো না। যদি তুমি (ধ্বংস না করে) তাদেরকে ছেড়ে দাও তাহলে তারা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করবে, আর অপরাধপ্রবন ও অস্বীকারকারী কাফের ব্যতীত তারা অন্য কোনো সন্তানই জন্ম দেবে না।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর দিকে মানুষকে বরাবর যে আহ্বান জানানো হয়েছে সেই একই দাওয়াত মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ, (স.) তাঁর দেশবাসীর কাছে পেশ করেছেন, আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালাই যে একমাত্র মালিক ও একক শক্তি এই চরম ও পরম সত্য গ্রহণ করার জন্যে আহবান জানানো, এ কথাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা, নিজে মেনে নেয়া এবং এর মূলনীতিসমূহকে দৃঢ়ভাবে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো এই দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য।

বিরোধীদের জন্যে এটা কোনো নতুন ও অস্বাভাবিক জিনিস ছিলো না। তারা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল সৃষ্টিকুলের সব কিছুর মধ্যে প্রতিনিয়ত একই সুর ধ্বনিত হচ্ছে, সব কিছুর মধ্যে পারস্পরিক একটা অবিচ্ছেদ্য গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং সব কিছু একই শক্তির ইচ্ছার অধীনে নিরন্তর গতিশীল কাজ করে যাচ্ছে। সৃষ্টিজগতের সব কিছু আবহমানকাল ধরে এক সুপরিকল্পিত কর্মসূচী মোতাবেক কাজ করে চলেছে। সৃষ্টিকুলের এ রহস্যসমূহের সবকিছুকেই নূহ (আ.) তাঁর জাতির সামনে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কথা দ্বারা তুলে ধরেছিলেন।

কেমন করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছেন তা লক্ষণীয়,

সে (নূহ) বললো, হে আমার জাতি, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী, আমি তোমাদের এ কথাটি গ্রহণ করতে আহবান জানাচ্ছি যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাঁকেই ভয় করো, আর আনুগত্য করো একমাত্র আমারই, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (অতীতের) সকল অপরাধ মাফ করে দেবেন ....। অবশ্যই সব কিছুর জন্যে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত এক মেয়াদ, সেই নির্দিষ্ট ক্ষণ যখন এসে যাবে তখন আর কাউকে একটুও সময় দেয়া হবে না। হায়, এ সম্পর্কে যদি তোমাদের সঠিক কোনো জ্ঞান থাকতো এবং সে জ্ঞানকে তোমরা কাজে লাগাতে! তাহলে তোমরা, এইভাবে তোমাদের ধ্বংস ডেকে আনতে না!

অর্থাৎ, কি ব্যাপার, আল্লাহর কোনো মর্যাদা আছে বলেও কি তোমরা মনে করো না, অথচ তিনি তোমাদেরকে একটার পর এক পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন? তোমরা কি

www.pathagar.com

দেখছো না কেমন করে তিনি সাতটি আসমানকে সুসামঞ্জস্যভাবে সৃষ্টি করেছেন? তার মধ্যে চাঁদকে স্নিগ্ধ বাতি বানিয়ে দিয়েছেন এবং সূর্যকে মহা সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা-স্বরূপ বানিয়েছেন? আবার তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে অন্যান্য গাছপালার মতো করে উৎপন্ন করেছেন, তারপর এক সময় আসবে যখন এই যমীনের মধ্যেই তোমাদেরকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন এবং এরপর একদিন তোমাদেরকে এই যমীন থেকে বের করে নেবেন। এটা তো এক বাস্তব সত্য যা তোমরা দেখছো। আল্লাহ তায়ালা যমীনকে তোমাদের জন্যে বিছানাস্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন যাতে করে তোমরা তার গিরিসংকটের মধ্য থেকে পথ বের করে নিতে পারো।

মুসলমানদের অন্তরের মধ্যে বাস্তব সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাদের সামনে নূহ (আ.)-এর কাহিনীকে এখানে পেশ করা হয়েছে। কোরায়শ জনগণের মধ্যে শুরু থেকে যে গভীর গোত্রীয় সম্প্রীতি বিরাজ করছিলো, তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে যে একাত্মতা, দলীয় সংগঠন ও সংঘবদ্ধতা গড়ে উঠেছে সেই সৌহার্দকে টিকিয়ে রাখার জন্যেই এই দাওয়াতী কাজের প্রসার প্রয়োজন। মানুষকে দাওয়াতের মাধ্যমে যে জীবনব্যবস্থা দান করা হয়েছে তার ওপর তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এটাই আল্লাহর প্রাচীনতম ও মজবুত পথ, যার ওপর মানুষ দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতে পারে।

কিন্তু আল্লাহর রসূলরা যখনই পথহারা মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা বহন করে এনেছেন, তখনই মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। কখনও তাদেরকে অজানা এক ভয় ভীতি পেয়ে বসেছে যে, তারা বাপ-দাদার আমল থেকে যে দেব-দেবীর পূজা করে আসছিলো তাদেরকে পরিত্যাগ করলে তারা রুষ্ট হবে, অকল্যাণ ডেকে আনবে-এমনকি অভিশাপ দিয়ে তাদেরকে ছারখার করে দেবে। এই বিরোধী লোকেরা একের পর এক রসূলদের সম্পর্কে নানা ভুল চিন্তা-ভাবনা করতো।

মানুষের মনে স্বভাবতই এ প্রশ্ন জাগে যে, নূহ (আ.) এতো ত্যাগ স্বীকার করে দীর্ঘকাল ধরে যে দাওয়াতী কাজ করলেন এবং মহা প্লাবনের পর আরও দীর্ঘ বছর ধরে যে মোমেন গোষ্ঠী গড়ে তুললেন তারা মোহাম্মদ (স.) এর যামানা আসতে আসতে কেন গোমরাহ হয়ে গেলো?

এই সূরা ও কোরআনে বর্ণিত আরও কয়েকটি সূরায় নূহ (আ.)-এর ত্যাগ তিতীক্ষার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে এতো দীর্ঘ সময় ধরে আর কেউ ত্যাগ তিতীক্ষার কষ্ট করেছেন বলে কোনো নযীর নেই। এতদসত্ত্বেও কেন তার জাতির বিরোধিতা শেষ হলো না? বরং তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস-উপেক্ষা অবিরাম গতিতে চলতে থাকল। এসত্ত্বেও নূহ (আ.) এসব কিছু পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, উত্তম ব্যবহার, অতি সুন্দর ও বিনয় আচরণ এবং স্নিগ্ধ ও মনোরম বাচনভংগীতে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন।

www.pathagar.com

তাঁর প্রাঞ্জল ও মনমোহিনী ভাষায় দাওয়াত দানের সূচনা থেকেই সেই দীর্ঘস্থায়ী বিরোধিতা শুরু হয়ে যায় এবং মহাপ্লাবন না আসা পর্যন্ত একটি দিনের জন্যেও তাঁর কাজ বন্ধ থাকেনি। আরও বহু রসূল দুনিয়ায় এসেছেন, যাঁদের মধ্যে কাউকে উপহাস বিদ্রূপ করা হয়েছে, কাউকে আগুনে পোড়ানো হয়েছে, কাউকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে, কাউকে পরিবার ও বাড়ী ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহর মহান বার্তার আগমন দিবস সমাগত হলো। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগ্রাম সাধনা শুরু হলো। এ সংগ্রাম সমকালীন সবাই দেখেছে। রসূল (স.) নিজেও যেমন ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁর সাথে তেমনি স্বীকার করেছেন তাঁর সাহাবারাও। তারপর থেকে দেশে যখনই এই দাওয়াত পেশ করা হয়েছে বিরোধীদের মোকাবেলায় যারাই এই সংগ্রাম করেছে তার অব্যাহত ধারা সমান গতিতে চলেছে।

কিন্তু সকল যামানার সকল সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকারকে একত্রিত করলেও কি নূহ (আ.)-এর সাথে তার জাতি যে দুর্ব্যবহার করেছে তার সমান হবে? আবার তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও মনোবল, দুর্ব্যবহার সহ্য করার জন্যে দান করা হয়েছিলো, তাও কি অন্যান্য সবার সম্মিলিত ধৈর্য থেকে কোনো অংশে কম হবে? নিসন্দেহে এখানে নূহ (আ.)-এর ত্যাগ তিতিক্ষা হবে সব কিছুর ওপরে।

একথা সত্য যে, পৃথিবীতে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই এই কঠিন সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিলো। এই সহিষ্ণুতা, অবিচলতা, এই দুঃখ-কষ্ট ছিলো সকল যামানার রসূল ও তাঁদের সংগীসাথীদের পক্ষ থেকে এক মহান ত্যাগ।

সম্ভবত পৃথিবীতে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তা অন্যান্য সকল চেষ্টা করা থেকে অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ; বরং সত্য বলতে কি, আল্লাহর ওপর গভীর বিশ্বাস গোটা পৃথিবী এবং এর ওপর অবস্থিত সকল জিনিস থেকে বড়, তোমাদের অনুভূতি ও দৃষ্টিতে যেগুলো ধরা পড়তে পারে সে সব কিছু থেকেও ঈমানের গুরুত্ব অনেক বেশী।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা হয়েছিলো তিনি সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ কিছু গুণসম্পন্ন একটি জীবের অস্তিত্ব এই দুনিয়ায় পাঠাবেন, তাই এই গুণাবলী দেয়া হয়েছে তার বুঝ-শক্তির মধ্যে। তার জীবন-পদ্ধতিতে ঠিক সে পরিমাণ দেয়া হয়েছে যা সে আল্লাহর সাহায্য ও নিজ নিজ তৌফিক অনুসারে চেষ্টা করে অর্জন করতে পারে। কিন্তু এ সব গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করে কেন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পয়দা করলেন এটা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি।

তবে বুঝে সুঝে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা সাধনা করার জন্যে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ঈমানকে তার নিজের চিন্তা চেতনার মধ্যে এবং জীবনে চলার পথে বাস্তবে যেন সে প্রয়োগ করতে পারে তার জন্যে কোনো চাপ প্রয়োগ না করে তার সুবিবেচনার ওপর এই ভার দেয়া হয়েছে। ঈমান গ্রহণ ও আনুগত্য প্রদর্শনে ফেরেশতাদের মতো তাদেরকে মযবুর করা হয়নি। আবার অন্যায় ও অপরাধজনক

www.pathagar.com

কাজ করার জন্যেও তাকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি যে, শয়তানের মতো সর্বদা অন্যায় এবং অযৌক্তিক কাজই সে করে যাবে।

এর রহস্য আমাদের বোধগম্য নয়, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি গোটা সৃষ্টিজগতের সাথে সংযোগ রক্ষা করার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা এ সব বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমাদেরকে পয়দা করেছেন।

সুতরাং ঈমানদার মানুষের কর্তব্য গোটা মানবমন্ডলীর মধ্যে ঈমানের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই দায়িত্ব দিয়েই তিনি নবী রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ও তাঁদের অনুসারীদের এই চেষ্টা সাধনাকে বরাবরই কবুল করেছেন। পৃথিবীর বুকে সত্য প্রতিষ্ঠায় তারা হচ্ছে নিবেদিতপ্রাণ। যারা জান মালকে নিঃশেষে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর যমীনে আল্লাহর প্রভুত্বকে কায়েম করার প্রচেষ্টায় তাদের সার্বিক ত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।

অন্তরের মধ্যে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা সেই অন্তরে আল্লাহর নূরের ঝলক পয়দা করে দেয়। এই কারণেই তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টির বহু রহস্য সম্পর্কে অবগত হন। আর এই কারণেই সৃষ্টির মধ্যে যেসব রহস্য বর্তমান রয়েছে সেগুলোর বহুলাংশকে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে অবহিত করান। এটাই হচ্ছে বাস্তব কথা, এটা কোনো ভাষাভাষা ছবি বা কোনো অলীক অভিব্যক্তি নয়। এটা হচ্ছে সব থেকে বড় সত্য, যা মানুষের মধ্যে, যমীন ও আসমানের মধ্যে এবং সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

এমনি করে কোনো এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঈমানের অস্তিত্ব থাকার অর্থ হচ্ছে পার্থিব জীবনের সাথে আখেরাতের জীবনের সমন্বয় সাধন এবং তার জীবনকে এতটা উন্নীত করা যেন উভয় জীবনের মধ্যে তা সংযোগ স্থাপন করার যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ক্ষয়িষ্ণু জীবন ও স্থায়ী জীবনের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করা। পরিপূর্ণ জীবনের সাথে আংশিক জীবনের যোগাযোগ সৃষ্টি করা, এ হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা বহু চেষ্টা-সাধনা করেই পাওয়া যায়। এর জন্যে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যদি কেউ উভয় জীবনের সমন্বয়ে স্থায়িত্ব লাভ করতে চায় তাহলে অবশ্যই কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার তাকে করতেই হবে। এই কষ্ট-পরিশ্রম ও ত্যাগই তার জন্যে জীবনের দুর্গম পথ পরিক্রমায় এক উজ্জ্বল আলোক হিসেবে কাজ করবে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে বারবার একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে আল্লাহর ওপর মযবুত ঈমান ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই জীবনে কোনো মহৎ কাজ সম্পাদন করতে পারে না। এই গুণের ধারক ও বাহক হওয়ার কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অতীতে দীর্ঘকাল যাবত এসব মানুষের সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। যাদের অধীনে মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করতে সমর্থ হয়েছে। আসলে এটাই হচ্ছে সেই অনুপম বিশ্বাস যা মানুষের জীবনকে ঈমানের ধারা সঞ্জীবিত করে।

www.pathagar.com

মানুষের চিন্তা প্রসূত কোনো কাজ, তার রচিত কোনো জীবন-দর্শন, তার গবেষণালব্ধ কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান বা আবিষ্কার, অথবা পৃথিবীতে বিরাজমান কোনো ধর্ম অথবা জীবন পদ্ধতি মানুষকে সেই ভাবে কখনো পথ দেখাতে পারেনি, যেমন করে আল্লাহর ওপরে ঈমানের দৃঢ়তা মানুষের জীবনকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের চরিত্রকে গড়ে তুলতে পেরেছে এবং তাদের জীবনকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন ও মর্যাদা দান করতে পেরেছে—এমনটি দ্বিতীয় নেই। এই সঠিক বিষয় থেকেই পূর্ণাংগ-জীবনের জন্যে সঠিক পথপ্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে। ঈমানের সেই উৎস থেকে উৎসারিত জীবন পথের এ দিশা অতীতের নবীদের কাছে সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে, কিন্তু শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ কেতাবে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে সত্য সঠিক জীবন লাভের বিস্তারিত ও বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

এই আকীদা হচ্ছে এমন এক অকাট্য বিষয়, যা স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে। এ হচ্ছে সেই সত্য, যা ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনাবলীর মাধ্যমে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। ঈমানী যিন্দেগী যাপন করে মানুষ যা লাভ করছে তা মানুষের তৈরী কোনো তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা অর্জিত হয়নি। কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান, কোন দর্শন, কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, কোন মানবরচিত জীবন ব্যবস্থা—কোনটিই ঈমানী যিন্দেগীর মতো অবদান রাখতে পারেনি। একারণে পৃথিবীতে যখনই প্রকৃত মোমেনদের নেতৃত্ব বিলুপ্ত হয়েছে তখন তাদের স্থান অন্য কেউ কোনোভাবেই পূরণ করতে পারেনি। বরং তাদের জীবনের মূল্যমান এর ফলে অনেক নীচে নেমে গিয়েছে, মানবতার মর্যাদা এতে দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। এইভাবে তারা ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতি, চিন্তার নৈরাজ্য এবং দলীয় সংকীর্ণতাসহ নানাপ্রকার ব্যাধির শিকারে পরিণত হয়েছে; যদিও বস্তুগত কিছু কিছু ময়দানে তারা অগ্রসর হয়েছে এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসের জিনিস ও আমোদ-প্রমোদের বিষয়াদিতে তারা যদিও বহু উন্নতি করেছে বলে মনে হয়েছে।

ঈমানের শান্তি ছায়ায় যেমন করে মানুষের জীবনের উন্নতি হয়েছে তেমন উন্নতি আর কোনো অবস্থায় কোনোদিনই হয়নি। ঈমানী জীবন যাপন কালে মানুষ যেমন করে তাদের বিশ্বাসের ফল লাভে সমর্থ হয়েছে, তেমনি করে অন্য কোনো জিনিসের বিনিময়ে লাভ করতে পারেনা। এটা একথার এক অকাট্য দলীল যে, এই দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত সেই মহাসত্য, যার ছোঁয়া পেয়ে মানবজাতির উন্নতিতে এক যুগান্তর সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর প্রতি ঈমান তার জীবনকে এমন মহীয়ান করেছে যা মানবরচিত কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে কখনও অর্জিত হয়নি।

ঈমানের ছায়াতলে এসে জীবন সম্পর্কে তার চিন্তাধারার যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তাও ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। এই আকীদা বিশ্বাসের কারণে সৃষ্টিজগতের সাথে তার যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা অন্য কোনো জিনিসের মাধ্যমে কখনও গড়ে উঠা সম্ভব নয়। এই ঈমানের বদৌলতে মানুষের মধ্যে যে আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে উঠেছে তা কখনও অন্য কোনো জিনিসের মাধ্যমে সম্ভব হয়নি। এইভাবে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে আমরা যে ধ্যান-ধারণা পাই তা হচ্ছে এই যে অন্যান্য সকল সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন।

www.pathagar.com

সুতরাং নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, পৃথিবীতে ঈমানী যিন্দেগী প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং আল্লাহর আলোর পরশ পাওয়ার জন্যে যে চূড়ান্ত চেষ্টা সাধনা এবং যে ত্যাগ কোরবানী স্বীকার করা হয় তার মধ্য দিয়েই বাস্তব জীবনের জন্যে আল্লাহর প্রদর্শিত পথ বেরিয়ে আসে, মানুষের চিন্তার ক্ষেত্র উন্নত হয় এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মানুষের কাজ ও ব্যবহারেরও ব্যাপক উন্নতি হয়। মানব জীবনের ইতিহাস বরাবর একথার সাক্ষ্য বহন করে এসেছে যে, একমাত্র আল্লাহর ওপর যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তার ভয়ভীতিকে অন্তরে পোষণ করে জীবন যাপন করেছে তারাই মানবজীবনের দীর্ঘস্থায়ী শান্তি সমৃদ্ধি স্থাপনের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

অতীতের ঘটনাপঞ্জীর নিরীখে আমরা একথা নিসংকোচে বলতে পারি যে, শীঘ্রই মানব জাতি সেসব ঘটনা ও তার পাশাপাশি মানুষের সে কঠিন ব্যবহার প্রত্যক্ষ করবে, যা নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা আলাইহিমুস্ সালাম ও মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাদের সংগী সাথীদের দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়েছিলো। অচিরেই সে দিন আসবে যখন ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে পতিত এক গোমরাহ নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসতে থাকবে, এরা অন্যায় ও গোমরাহীর কাজে পরস্পর সহায়তা করবে। সত্যের দিকে আহ্বানকারীদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করবে এবং বিভিন্নভাবে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করবে।

এভাবেই একদিন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তারা আগুনে নিক্ষেপ করেছিলো, আবার কাউকে তারা করাত দিয়ে চিরে ফেলেছিলো। আরো কিছু লোক নবী-রসূলদেরকেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস উপেক্ষা করে যে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে, ইতিহাস আজও সে সাক্ষ্য বহন করছে।

এতদসত্ত্বেও আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর দিকে আহ্বান করার এই কাজ নিজ গতিতে চলতে থাকবে। যেহেতু এ সকল কাজের দাবীই হচ্ছে চূড়ান্ত সংগ্রাম এবং মহান কোরবানী, এজন্যে যত ক্ষুদ্র আকারেই একাজ করা হোক না কেন এ কাজ যখনই সঠিকভাবে শুরু করা হবে–বাতিলপন্থীদের তরফ থেকে প্রতিক্রিয়া আসবেই, আর সেই প্রতিক্রিয়ার মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করতে গিয়ে আল্লাহর নূর এবং তাঁর মেহেরবানীর পরশ প্রত্যেক দায়ী ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) ব্যক্তি তার অন্তরের গভীরে অনুভব করবে।

'দায়ী ইলাল্লাহর' এই জনগোষ্ঠী নূহ (আ.)-এর সময় থেকে মোহাম্মদ (স.) -এর যামানা পর্যন্ত যারাই রসূল হয়ে এসেছিলেন তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর ইচ্ছানুসারে ঈমান-এর তাৎপর্য বুঝানোর উদ্দেশ্যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন। তাদের এই দাওয়াতের প্রকৃতি এবং প্রতিক্রিয়া সর্বকালে একইরকম থেকেছে। এ ক্ষেত্রে সব থেকে কম যে কাজটি 'দায়ী ইলাল্লাহ্' করতে পারেন তা হচ্ছে যদি অন্য কেউই তাদের ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে তারা তাদের নিজেদের অন্তরের মধ্যে আমরণ ঈমানের এই আমানতকে নিজেরা সংরক্ষণ করে যাবে। মৃত্যু যদি আসে সেক্ষেত্রেও সত্যের এই আহ্বানকারীরা এ দায়িত্ব থেকে পিছপা হবেন না।

www.pathagar.com

নবী রসূলদের এই বৈশিষ্টের কারণে তাঁদের মর্যাদা হামেশাই দুনিয়ার অন্য সবার ওপরে। দুনিয়ার কোনো আকর্ষণ বা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাদেরকে কর্তব্যচ্যুৎ করতে পারেনা। তাদের সেরা মানুষ হওয়ার জন্যে তাদের এই গুণটিই যথেষ্ট। এটাই তাদের চূড়ান্ত সফলতার প্রতীক। নবীদের মতো এটা দাওয়াত দানকারীদেরও এক অমূল্য উপার্জন, যারা এ গুণটি অর্জন করতে পারে তারাও দুনিয়ার মান ইযযত লাভ করা ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্যে এই গুণটিকে এক মহান সম্পদ রূপে মনে করতে পারে। এই গুণটির কারণেই আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে তারা সেজদা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছে, যদিও এই মানুষের মধ্যে পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ ছড়ানো ও রক্তক্ষয়ী বিবাদ-বিসম্বাদ করার প্রবণতাও বিদ্যমান ছিলো।

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান জানানোর দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে, এজন্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মরণ-পণ সংগ্রাম করে, এর জন্যে সবরকমের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় এবং দুর্বল ও অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও এই সকল কাজের বিনিময়ে আল্লাহর যমীনে তাঁর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে তার কাছেই সে সাহায্য-প্রার্থী। সেই হচ্ছে সফল ব্যক্তি, কেননা তারা চায় আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান আল্লাহর যমীনে কায়েম হোক।

এই উদ্দেশ্যেই সে প্রাঞ্জল ভাষায় মানুষদের দাওয়াত দেয়, সে মনে প্রাণে চায় আল্লাহর দ্বীনের সংস্পর্শে এসে মানুষের জীবন উদ্ভাসিত হোক। এতে সে সবরকম কষ্ট, দুঃখ এমনকি মৃত্যু যন্ত্রণা অথবা এর থেকেও কষ্টকর কিছুকে হযম করতে প্রস্তুত। বিশ্বাসের দৃঢ়তার কারণেই এই দুঃখ-কষ্ট সে সহ্য করতে পারবে, যেহেতু তার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এর বিনিময়ে সে আখেরাতে মুক্তি পাবে। এ কারণেই সে কর্তব্য সচেতন হয়, আর যে ব্যক্তি কর্তব্য বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করে সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই নিজ মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

মানুষের অন্তরের মধ্যে আখেরাতের মুক্তির প্রেরণা যখন একবার স্থান লাভ করে তখন তার কাছে দুনিয়ার সকল কষ্ট লাঘব হয়ে যায়, কষ্টের অনুভূতি কমে যায় এবং যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করা তার জন্যে তখন মোটেই আর কঠিন থাকে না। এগুলো তার আমলনামায় যোগ হয়ে তার সৎকর্মের পাল্লাকে ভারী করে দেয়, এটাই হয় তার সব পাওয়ার বড় পাওয়া।

সূরা আল জ্বিন

এই সূরাটির আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু, তত্ত্ব ও তথ্যের দিকে দৃষ্টি দেয়ার আগেই পাঠকের অনুভূতিতে এর ভিন্ন একটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত আকস্মিক অথচ স্বতস্ফূর্তভাবে রেখাপাত করে। সে বৈশিষ্ট্যটি এই যে, এ সূরাটি পড়া শুরু করতেই মানুষের মনে সর্বাগ্রে মন মাতানো একটি ধ্বনির মূর্ছনা ও জোরালো শব্দের একটি ঝংকার বেঝে উঠে। সেই সাথে এর ছন্দায়িত শব্দে রয়েছে কিছুটা বেদনার ছাপ, এর সূরে বুলানো রয়েছে সহানুভূতির বিভিন্ন পরশ। রয়েছে এর প্রতিধ্বনিতে কিছুটা আবেগময় সূর।

www.pathagar.com

সূরার ভাষায় যে দৃশ্য ও ছবি অংকিত হয়েছে এবং উদ্দীপনার যে প্রাণশক্তি এতে নিহিত রয়েছে, বিশেষত সূরার শেষাংশে জ্বিনদের বক্তব্যের যে উদ্বৃতি রয়েছে তা এর আংগিক বৈশিষ্ট্যকে সমর্থন করে এবং তা তার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূরার শেষাংশে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা এই সূরার প্রতিটি পাঠকের মনকে রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট ও তাকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। আর খোদ্ রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন দুটো বিষয় জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, প্রথমত, ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনে তার ভূমিকা এর চেয়ে বেশী কিছু নয় যে, তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেবেন।

দ্বিতীয়ত, যতোক্ষণ তিনি এই প্রচারের কাজে লিপ্ত থাকবেন ততোক্ষণ তার ওপর আল্লাহর সার্বক্ষণিক প্রহরা ও তত্ত্বাবধান সক্রিয় থাকবে। সূরার দ্বিতীয় রুকুটি পড়লে এ কথার যথার্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে!

'হে নবী! তুমি বলো, আমি তো কেবল আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না .....এবং তিনি সকল জিনিসকে গুনে গুনে রেখেছেন।'

এর পাশাপাশি রয়েছে জ্বিনদের বক্তব্যের সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি এবং এর মধ্য দিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে তার বিবরণ। এই সকল তত্ত্ব ও তথ্যকে গ্রহণ করে নিলে তা মানুষের মনমানস ও চেতনায় এক গভীর চিন্তা ভাবনার জন্ম দেয়। মনমগযে এই চিন্তাভাবনার জন্ম সূরার সুরেলা ছন্দ, আবেগময় ধ্বনি ও বেদনা বিধুর করুণ সূরের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। সূরাটিকে একটু ধীরে ধীরে থেমে থেমে পড়লে তা মানুষের চিন্তা চেতনায় উপরোক্ত ভাবধারাগুলোকে আরো গভীরভাবে বদ্ধমূল করে।

সূরা আল মোযযাম্মেল

এই সূরা নাযিল হওয়ার কারণ প্রসংগে বর্ণিত আছে যে, একবার কোরায়শ নেতারা তাদের 'দারুণ নাদওয়াহ' নামে পরিচিত পরামর্শ গৃহে সমবেত হয়ে রসূল (স.) ও তাঁর দাওয়াতী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। এ খবর জানতে পেরে রসূল (স.) অত্যাধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি কাপড় চোপড় দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে ও কম্বল মুড়ি দিয়ে বেদনা ভারাক্রান্ত অবস্থায় শুয়ে পড়েন। এই সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর কাছে এই সূরার প্রথম রুকু নিয়ে এলেন।

এর দ্বিতীয় রুকু দীর্ঘ এক বছর পর নাযিল হয়। রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদের একটি দল তখন রাতের বেলায় এতো বেশী নামায পড়তেন যে, তাদের পা ফুলে যেতো। এ জন্যে বারো মাস পর তাদেরকে আরো কম নামায পড়ার নির্দেশ দিয়ে এই সূরার দ্বিতীয় রুকু নাযিল হয়।

www.pathagar.com

এ প্রসংগে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে। সেই বর্ণনাটি সূরা আল মোযযাম্মেল প্রসংগেও বর্ণিত হয়েছে। সূরা আল মোদ্দাসসের নাযিলের কারণ প্রসংগে তা যথাস্থানে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার এই যে, রসূল (স.) নবুওত লাভের তিন বছর পূর্ব থেকে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন বাস করতেন। অর্থাৎ পাক পবিত্র অবস্থায় একাকী এবাদাত করতেন। প্রতি বছর তিনি এক মাস এভাবে নির্জনে কাটাতেন। এটি থাকতো রমযান মাস। মক্কা থেকে প্রায় দুই মাইল দূরবর্তী হেরা গুহায় এই নির্জন বাস কালে তাঁর পরিবার তাঁর কাছাকাছিই থাকতো। পুরো এক মাস তিনি এখানে কাটাতেন। এ সময়ে তাঁর কাছে কোনো গরীব দুঃখী এলে তাকে খাবার দিতেন এবং এবাদত ও ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাঁর ধ্যান ও চিন্তা-গবেষণার বিষয় ছিলো তার চারপাশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং তার অন্তরালে অবস্থানরত মহা শক্তিধর স্রষ্টা। তাঁর দেশবাসী যে অসার পৌত্তলিক আকীদা-বিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিলো, তাতে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু এমন কোনো সুস্পষ্ট বিকল্প পথ, কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা এবং কোনো ভারসাম্যপূর্ণ নীতি তাঁর জানা ছিলো না যা তিনি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন।

রসূল (স.)-এর এই নির্জন বাসের কর্মসূচী তাঁর জন্যে আল্লাহর গৃহীত সুপরিকল্পিত কৌশলের একটি অংশ ছিলো। আগামী দিনে যে বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁর অপেক্ষায় ছিলো, তার জন্যে তাঁকে তৈরী করাই ছিলো এই কৌশলের উদ্দেশ্য। এই সময় তিনি একান্তভাবে শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন ও আপন মনে চিন্তাভাবনায় মশগুল থাকতেন। সংসারে যাবতীয় ঝামেলা ও খুটিনাটি ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে নিভৃতে বসে নিঝুম প্রকৃতির অস্ফুট ভাষা ও আকুতি বুঝতে চেষ্টা করতেন। জানতে চেষ্টা করতেন কিভাবে এই নির্বাক মহাবিশ্ব নিজেই তার নিপুন স্রষ্টার অস্তিত্বের অকাট্য সাক্ষ্য দিচ্ছে। পর্বতগুহার সেই মর্মবিদারী নিস্তব্ধতায় থেকে থেকে তাঁর আত্মা গোটা সৃষ্টি জগতের আত্মার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে স্রষ্টার গুণগানে সোচ্চার হয়ে উঠতো। সৃষ্টির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ও নিষ্কলূষ পবিত্রতাকে তাঁর সত্ত্বা সানন্দে আলিংগন করতো এবং তিনি আপন মনে পরম সত্যকে গড়ে তুলতেন।

যে ব্যক্তিকে মানবজাতির বাস্তব ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তার আমূল পরিবর্তন সাধন ও নিভৃতে অবস্থান এবং পৃথিবীর নিত্যকার ব্যস্ততা, হৈ, চৈ, সংসারের শোরগোল ও ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে কিছু সময় কাটানো একান্ত প্রয়োজন।

বিশাল মহাবিশ্ব ও তার অগণিত তথ্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা, তার ব্যাপারে নীতি ও দৃষ্টি ভংগী নির্ণয়ের জন্যে কিছুটা আলাদা সময় অপরিহার্য। কেননা কর্মচঞ্চল সাংসারিক জীবনের সাথে সর্বাত্মক, সার্বক্ষণিক ও নিবিড়ভাবে মেলামেশা করতে করতে মানুষের মন-মেযাজ তার সাথে এতো অভ্যস্ত ও পরিচিত হয়ে যায় যে, তাতে পরিবর্তন সাধনের জন্যে আর কোনো চেষ্টা করতে চায় না। ক্ষণিকের জন্যে এই সব ব্যস্ততা এবং সংসার জীবনের বন্দীদশা থেকে অব্যহতি পেয়ে সাময়িকভাবে হলেও পূর্ণ মুক্ত জীবন যাপন মানুষের আত্মা ও বিবেককে প্রশস্ততা ও তীক্ষ্ণতা দান করে। তাকে

www.pathagar.com

পৃথিবীর চেয়ে বৃহত্তর জিনিস দেখার ও বুঝার যোগ্য বানায় এবং মানুষের সমাজ ও সামাজিক রীতি প্রথার মুখাপেক্ষী না হয়ে আপন সত্তার পূর্ণতা ও পরিপক্কতা অর্জনের জন্যে আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি সাহায্য গ্রহণ এবং স্বনির্ভর হতে অভ্যস্ত বানায়।

বস্তুত, আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মাদ (স.)-কে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন, পৃথিবীর জীবন ধারাকে ও চেহরাকে আমূল পাল্টে দেয়া এবং ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যে এ পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। নবুওতের তিন বছর আগে তাকে এই নির্জন বাসে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই নির্জনবাস বিরতিহীনভাবে একমাস স্থায়ী হতো। এ সময় একমাত্র মুক্ত প্রকৃতিই হতো তাঁর সাথী। প্রকৃতির অন্তরালে অদৃশ্য জগতের সাথে তার সংযোগ স্থাপিত হওয়া পর্যন্ত এই নির্জনবাসের কর্মসূচী অব্যাহত থাকলো।

অবশেষে যখন আল্লাহর মর্জি হলো এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিশ্ববাসীর ওপর তার এই করুণাধারা বর্ষণ অর্থাৎ ওহী নাযিল করবেন, তখন জিবরাঈল (আ.) রসূল (স.)-এর কাছে এলেন। তিনি তখনো হেরার গুহায় অবস্থান করছিলেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মোতাবেক রসূল (স.) তাঁর এ ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন,

'আমি তখন নিদ্রিত। সেই অবস্থায় জিবরাঈল এলেন রেশমী রুমাল নিয়ে। তাতে কি একটা কথা লেখা ছিলো। জিবরাঈল আমাকে সেই লেখাটি দেখিয়ে বললেন, পড়ুন তো!

আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না।

জিবরাঈল আমাকে এমন জোরে আলিংগন করলেন যে, মনে হলো আমি মরে যাচ্ছি। তারপর ছেড়ে দিলেন।

তারপর পুনরায় বললেন, পড়ুন!

আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না।

তারপর আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি এমন চাপ দিলেন যে, মনে হলো আমার মৃত্যু এসে গেছে। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন!

আমি বললাম, কী পড়বো? এ কথাটা আমি শুধু এই আলিংগনের পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বলেছিলাম।

জিবরাঈল বললেন, 'পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়ো, আর তোমার মহান প্রভু, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।'

রসূল (স.) বলেন, আমি এগুলো পড়লাম। অতপর পড়ার পালা শেষ হলো এবং তিনি চলে গেলেন। আমি ঘুম থেকে যখন জাগলাম তখন মনে হলো, আমার মানসপটে কথাগুলো লিখে নিয়েছি।

এরপর আমি গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম। পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে এসে শুনলাম, আকাশ থেকে আওয়ায আসছে, 'হে মোহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল, আর আমি জিবরাঈল।'

www.pathagar.com

আমি আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, জিবরাঈল একজন বিশালকায় মানুষের বেশে দাঁড়িয়ে। আকাশের এক প্রান্তে তার এক পা।

তিনি বলছেন, ' হে মোহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল, আর আমি জিবরাঈল।'

আমি তার দিকে তাকিয়েই রইলাম। আগে পিছে একটুও না সরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অথচ আকাশের যে প্রান্তেই তাকাই দেখি তিনি সেখানে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি এইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। আগে পিছে এক চুলও সরছি না।

এমতাবস্থায় খাদিজা আমার সন্ধানে লোকজন পাঠালো। তারা মক্কার উচ্চতম প্রান্তে গিয়ে ঘুরে ফিরে আবার খাদিজার কাছে ফিরে গেলো। আমি তখনো আমার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। এরপর এক সময় জিবরাঈল চলে গেলেন। আমিও আমার পরিবারের কাছে ফিরে গেলাম। গিয়ে খাদিজার একবারে কোলের কাছে ঘনিষ্ট হয়ে বসলাম।

তিনি বললেন, 'ওহে কাসেমের বাবা! আপনি কোথায় ছিলেন? আমি আপনার খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলাম। তারা মক্কায় গিয়ে আবার ফিরে এসেছে।'

অতপর আমি তাঁকে যা যা দেখেছি বললাম।

খাদিজা বললো, 'হে আমার চাচাতো ভাই, আপনি এটিকে শুভ সংবাদ হিসাবে গ্রহণ করুন এবং স্থির থাকুন। খাদিজার প্রাণ যার হাতে, তার শপথ করে আমি বলছি যে, আমি মনে করি আপনি এ যুগের মানব জাতির নবী।'

এরপর রসূল (স.) পুনরায় পাহাড়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওহী স্থগিত থাকলো। যেদিন পুনরায় সেখানে গেলেন, চোখ মেলে তাকাতেই জিবরাঈলকে দেখলেন। দেখে এবার তিনি ভয়ে কেঁপে উঠলেন। ভয়ে তিনি সংকুচিত হয়ে মাটির কাছাকাছি ঝুঁকে পড়লেন। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীতে গিয়ে বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।'

সবাই তাঁকে ঢেকে দিলো। তবু তাঁর কাঁপুনি বন্ধ হলো না। এই সময় জিবরাঈল তাকে ডেকে বললেন, 'ইয়া আইয়ুহাল মোদ্দাসসের' (হে কম্বল মুড়ি দেয়া ব্যক্তি) কেউ কেউ বলেন, জিবরাঈল বললেন, ইয়া আইয়ুহাল মোয্যাম্মেল' (হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি) প্রকৃত পক্ষে এ সময় কোন সূরা নাযিল হয়েছিলো, তা আল্লাহই ভালো জানেন। চাই পূর্ববর্তী বর্ণনাই সঠিক হোক, কিংবা শেষোক্ত বর্ণনাই সঠিক হোক, এ কথা সত্য যে, রসূল (স.) ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর আর ঘুম পাড়ার অবকাশ নেই, তাঁর ঘাড়ে বিরাট দায়িত্বের বোঝা চেপেছে। তাঁর সামনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ সংগ্রাম। জিবরাঈল-এর সেই ডাক শোনার পর তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে শুধুই জাগরণ, কাঠোর প্ররিশ্রম ও অক্লান্ত চেষ্টা সাধনা।

রসূল (স.)-কে বলা হলো, 'ওঠো, তিনি উঠলেন। তারপর বিশ বছরেরও বেশী কাল ধরে তিনি উত্থিতই রইলেন।' অর্থাৎ কোনো বিশ্রাম নিতে পারলেন না, স্থির হতে

পারলেন না। নিজের জন্যে বা নিজের পরিবারে জন্যে এক মুহূর্ত শান্তভাবে জীবন উপভোগ করতে পারলেন না।

আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিতে তিনি সেই যে উঠলেন– আর বসলেন না, আর থামলেন না। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ভারী দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুললেন। সমগ্র মানবজাতির দায়িত্ব, গোটা দ্বীনের দায়িত্ব এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের দায়িত্ব ঘাড়ে তুললেন।

তাঁর এ সংগ্রাম ছিলো জাহেলিয়াতের সৃষ্ট মতবাদ ও ধ্যান ধারণায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ভোগ লালসার ভারে ভারাক্রান্ত ও তার প্রলোভনে আকৃষ্ট এবং প্রবৃত্তির গোলামীর যিঞ্জীরে আবদ্ধ মানবীয় বিবেককে মুক্ত করার সংগ্রাম। যখন তিনি তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবীর বিবেককে এই জাহেলিয়াতের আবর্জনার ভারমুক্ত এবং ইহলৌকিক জীবনের কলুষমুক্ত করতে সক্ষম হলেন, তখন আরেক রণাংগনে শুরু করলেন অপর এক যুদ্ধ।

এটি যুদ্ধ তো নয়, বরং বলতে গেলে যুদ্ধের এক অন্তহীন ধারা। ইসলামী আন্দোলনের যেসব দুশমন আন্দোলন ও আন্দোলনের সহযোগী মোমেনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো, ইসলামের এই সদ্য গজানো নিষ্পাপ চারা গাছটিকে অংকুরেই যারা বিনষ্ট করতে চেয়েছিলো, এবং মাটিতে তার শেকড় ও আকাশে ডালপালা বিস্তার করার আগেই তাকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলো, সেই ভয়ংকর আগ্রাসী দুশমনদের বিরুদ্ধে ছিলো তাঁর এ যুদ্ধ, আর আরব উপদ্বীপের ভেতরকার যুদ্ধগুলো শেষ করতে না করতেই রোম সাম্রাজ্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো এই নতুন জাতিকে তার উত্তর সীমান্ত দিয়ে আঘাত হানতে।

এই রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধ চলাকালেও প্রথমোক্ত বিবেকের যুদ্ধ থামেনি। কারণ, ওটা এক শাশ্বত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের হোতা হচ্ছে শয়তান। মানুষের বিবেকের গভীরতম প্রকোষ্ঠে আপন তাৎপরতা চালানো থেকে সে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরত হয় না।

পক্ষান্তরে রসূল (স.)ও আল্লাহর পথের দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজ একইভাবে অব্যাহত রাখলেন। দাওয়াতের পাশাপাশি চালিয়ে গেলেন বহুমুখী সংগ্রাম। দুনিয়ার যাবতীয় সুখ সম্ভোগের সুযোগ তার জন্যে অবারিত ছিলো, তথাপি তিনি কষ্টকর জীবন যাপন করতেন। কঠোর পরিশ্রম করতেন, মোমেনরা তাঁর চারপাশে থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন। তারা সেই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে প্রশমিত করতেন। রাত জেগে তারা নামায পড়তেন, আল্লাহর বন্দেগী করতেন, ধীরে ধীরে বিশুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর প্রতি একান্তভাবে মনোনিবেশ করতেন। আল্লাহ তায়ালা সূরার প্রথম দশ আয়াতে তাকে এভাবেই জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন,

'হে কম্বলাচ্ছাদিত! ওঠো, রাত্রি জাগরণ কর, তবে অল্প কিছু অংশ বাদে ....।'

এভাবে রসূল (স.) ২০টি বছর কাটিয়ে দিলেন। এ সময়ের ভেতরে কোনো ক্ষেত্রেই এবং কোনো অবস্থাতেই তিনি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখাননি। ওহীর প্রথম দিন থেকেই তিনি তাঁর এই অক্লান্ত সাধনা অব্যাহত রাখেন।

www.pathagar.com

সূরার প্রথম রুকু একটি বিশেষ ধরনের ছন্দবদ্ধ গদ্যের সমাহার। এটি অত্যন্ত কোমল অথচ ভাবগম্ভীর ছন্দ। যে গুরুগম্ভীর দায়িত্ব ও কড়া নির্দেশাবলী এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, তার সাথে এ ছন্দ বেশ মানানসই। যে দুর্বহ বক্তব্য নাযিল করার প্রতিশ্রুতির বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি, তার ভয়াবহতা এবং 'আমাকে ও রসূলের আহবান প্রত্যাখ্যানকারী বিত্তশালীদেরকে ছেড়ে দাও, তাদেরকে সামান্য অবকাশ দাও, আমার কাছে শাস্তি ও দোযখ রয়েছে এবং কাঁটাযুক্ত খাদ্য ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে' এ উক্তির ভয়াবহাতার সাথে এই গুরুগম্ভীর ছন্দবদ্ধ গদ্য যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ।

প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যে এবং হৃদয়ের গভীরে যে ভীতিপ্রদ নিদর্শনাবলী প্রতিফলিত হয়েছে, তার সাথেও এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যথা, 'যেদিন পাহাড় ও পৃথিবী কাঁপতে থাকবে.... যেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে, যেদিন আকাশ ফেটে যাবে। ....'

দ্বিতীয় রুকু যে দীর্ঘ আয়াতটি নিয়ে গঠিত, তা নাযিল হয়েছে রাত জেগে নামায পড়তে পড়তে রসূল (স.) ও তাঁর সহচরদের পা ফুলে যাওয়ার ঘটনার এক বছর পর। যে মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ও তাঁর সাহাবীদেরকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এই রাত্রি জাগরণের উদ্দেশ্যও ছিলো তাই।

এ আয়াতে তাদের রাত্রি জাগরণের সময় কমানো হয়েছে। সেই সাথে এ আশ্বাসও দেয়া হয়েছে যে, সময় কমানোর এই সিদ্ধান্তে বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাঁদের পরবর্তী কালের দায়দায়িত্বের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় জ্ঞান ও দূরদর্শিতা অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, এ আয়াতটির ছন্দ ও ভাষাগত কাঠামো প্রথম রুকু থেকে ভিন্ন ধরনের। এটি দীর্ঘ আয়াত এবং এতে স্থীতি ও প্রশান্তির প্রতিফলন ঘটেছে।

সূরাটি তার উভয় অংশের সম্মিলিত রূপ নিয়ে সামগ্রিকভাবে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে তুলে ধরেছে। এর শুরু হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক স্নেহময় সম্বোধন ও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমর্পণের মধ্য দিয়ে। তারপর রাত জেগে নামায পড়া. কোরআন তেলাওয়াত করা, একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে স্মরণ করা, একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করা, দুঃখ কষ্ট ও নিপীড়নের ওপর ধৈর্য অবলম্বন, প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ভালোভাবে পরিত্যাগ করা এবং তাদেরকেও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহকে একা ছেড়ে দেয়া, যাতে তিনি তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারেন এই সব বিষয় সূরায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অবশেষে সূরার উপসংহার টানা হয়েছে 'নিশ্চয় আল্লাহ দয়ালু ও ক্ষমাশীল' এই প্রশান্ত ও করুণাসিক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

এ সূরার উভয় রুকুতে রসূল (স.)-এর প্রিয় ও আল্লাহর মনোনীত সেই আদর্শ মোমেনদের দলটির মহৎ গুনাবলী চেষ্টা সাধনার ও প্রশংসা করা হয়েছে। পথভ্রষ্ট মানব জাতিকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা, দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পার্থিব স্বার্থের মোহমুক্ত থাকা, প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীতে তারা ভূষিত ছিলেন।

www.pathagar.com

সূরা আল মোদ্দাসসের

এই সূরাটি নাযিল হওয়ার কারণ ও সময় প্রসংগে পূর্ববর্তী সূরা 'আল মোযযাম্মেল'-এ যা কিছু আলোচিত হয়েছে, এই সূরাটির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। সেখানে এই মর্মে একাধিক বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এটি সূরা 'আল আলাক'-এর পরে নাযিল হওয়া প্রথম ওহী। অপর একটি বর্ণনা এই মর্মেও উদ্বৃত হয়েছে যে, প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার এবং রসূল (স.)-এর ওপর মোশরেকদের নির্যাতন শুরু হওয়ার পর এটা নাযিল হয়েছে।

ইমাম বোখারী (র.) বর্ণনা করেন যে, ইয়াহিয়া ইবনে কাসীর বলেন, আমি আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমানকে কোরআনের প্রথম নাযিল হওয়া অংশ কোনটি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি জবাবে বলেন, সূরা আল 'মোদ্দাসসের'।

আমি বললাম, লোকেরা তো বলে সূরা 'আল আলাক্ব।'

আবু সালমা বললেন, আমিও জাবের ইবনে আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তুমি আজ আমাকে যা বললে, সে কথা আমিও তাকে বলেছিলাম।

কিন্তু জাবের আমাকে বললেন, আমি তোমাকে যা বলছি তা খোদ রসূল (স.) আমাকে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি হেরায় কিছুকাল অবস্থান করেছিলাম। সেই অবস্থান শেষ হওয়ার পর নেমে আসতেই শুনলাম কে যেন আমাকে ডাকছে। আমি ডান দিকে তাকালাম। কিছুই দেখলাম না। অবশেষে ওপরের দিকে তাকাতেই একটা কিছু দেখে সংগে সংগেই আমি খাদীজার কাছে এসে বললাম, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও এবং আমার ওপর ঠান্ডা পানি ঢালো। আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো এবং আমার ওপর ঠান্ডা পানি ঢালা হলো। এরপরই সূরা 'মোদ্দাসসের' নাযিল হলো।'

মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুসারে রসূল (স.) বলেন, 'আমি চলার সময়ে হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম। আমি তৎক্ষণাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে আছেন সেই ফেরেশতা, যিনি হেরার গুহায় আমার কাছে এসেছিলেন। আমি হাঁটু গেড়ে প্রায় মাটির সাথে মিশে বসে পড়লাম। তারপর আমার পরিবারের কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে ঢেকে দেয়া হলো। এই সময় সূরা 'আল মোদ্দাসসের' নাযিল হলো। এরপর ক্রমাগত ওহী আসতে লাগলো। উল্লেখ্য যে, বোখারীতেও এ হাদীসটি অবিকল একই ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে।

ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীরে এই হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এই বিবরণটিই মনে হয় সংরক্ষিত। আর এ বিবরণ থেকে মনে হয়, এর আগেও ওহী নাযিল হয়েছিলো। কেননা রসূল (স.) বলেছেন, 'দেখলাম যে ফেরেশতা আমার কাছে হেরা গুহায় এসেছিলেন তিনিই ....।'

www.pathagar.com

আসলে তিনি হচ্ছেন জিবরাঈল। তিনি ইতিপূর্বে সূরা 'আল আলাক্ব' নিয়ে এসেছিলেন। এরপর ওহীর বিরতি ঘটে। তারপর পুনরায় ফেরেশতা নাযিল হয়। সুতরাং দুই বর্ণনার সমন্বয়ের উপায় এই যে, এই সূরা (সূরা মোদ্দাসসের) একেবারে প্রথম নাযিল হওয়া সূরা নয়, বরং বিরতির পর নাযিল হওয়া প্রথম সূরা।

তাবরানীতে অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদিন ওলীদ ইবনে মুগীরা কোরায়শ বংশের লোকদেরকে দাওয়াত করে বললো, এই লোকটি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?

তখন কেউ বললো, জাদুকর। কেউ বললো, না, জাদুকর নয়। আবার কেউ বললো, জ্যেতিষী। কেউ বললো, না, জ্যেতিষী নয়। কেউ বললো, কবি। আবার কেউ বললো, না কবি নয়। কেউ বললো, বরঞ্চ প্রাচীনকাল থেকে বংশানুক্রমে চলে আসা এটা একটা জাদুমন্ত্র।

অতপর সবাই একমত হলো যে, মোহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রচারিত বাণী বংশানুক্রমে প্রাপ্ত একটা জাদুমন্ত্র।

কাফেরদের এই সমাবেশ ও তাদের অভিব্যক্তি এই মতামতের কথা জানতে পেরে রসূল (স.) ভীষণ মর্মাহত হলেন এবং বিমর্ষ অবস্থায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন। এমতাবস্থায় সূরার এই প্রাথমিক আয়াত কয়টি নাযিল হলো!

'হে কম্বলাচ্ছাদিত! ওঠো। সতর্ক করো। তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পোশাক পবিত্র করো। অপবিত্রতাকে বর্জন করো। অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করো না। নিজের প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো।'

সূরা 'আল মোযযাম্মেল'-এ নাযিল হওয়ার কারণ প্রসংগে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, অবিকল সেটা আলোচ্য সূরা সংক্রান্ত বর্ণনাও হতে পারে। এই অনিশ্চয়তার কারণে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না যে, এই দুই সূরার মধ্যে কোনটি আগে নাযিল হয়েছে এবং কোনটি কোন উপলক্ষে নাযিল হয়েছে।

এ আয়াত কয়টির উদ্দেশ্যে রসূল (স.)-কে তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলা। অতপর প্রকাশ্যভাবে ও পরিপূর্ণরূপে ইসলামের দাওয়াতদানের মাধ্যমে কোরায়শদের মোকাবেলা করা। এ কাজ করতে গিয়ে স্বভাবতই তাকে নানা রকম নিগ্রহের সম্মুখীন হতে হবে, আর তার সম্মুখীন হতে হলে তাকে পূর্বাহ্নে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। উভয় সূরার এই প্রথম আয়াত কয়টির পরবর্তী অংশ সম্ভবত কিছুকাল পরে নাযিল হয়েছে, যখন কোরায়শরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, একগুঁয়েমী প্রদর্শন করেছে এবং রসূল (স.)-কে মিথ্যা অপবাদ ও হীন চক্রান্ত দ্বারা কষ্ট দিয়েছে। তবে উল্লেখিত দুটি সম্ভাবনার যেটিই বাস্তব হোক–এটা মোটেই বিচিত্র নয় যে, উভয় সূরার প্রথমাংশ ও পরবর্তী অংশ এক সাথে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। কেননা উভয়াংশের একটা অভিন্ন প্রেক্ষাপট ও উপলক্ষ্য রয়েছে।

www.pathagar.com

মোট কথা হচ্ছে, রসূল (স.)-কে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা, প্রত্যাখ্যান করা এবং কোরায়শ নেতাদের ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধির জন্যে রসূল (স.)-এর প্রচন্ডভাবে মর্মাহত হওয়া। এটা যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে উভয় সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট সূরা 'আল কলাম'-এর মতো হবে। সেই প্রেক্ষাপট আমরা সূরা 'আল কলাম'-এর শুরুতে আলোচনা করেছি।

সূরার নাযিল হওয়ার প্রকৃত কারণ ও উপলক্ষ্য যাই হোক না কেন, এর প্রথমেই যে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীদের সম্বোধন করে ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত করেছেন এবং তাঁকে তাঁর ঘুম, ভীরুতা ও জড়তা কাটিয়ে উঠে জেহাদ, সংগ্রাম ও কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

প্রথম দুটি আয়াতেই এই সম্বোধন ও নির্দেশনা সুস্পষ্ট হয়ে আছে। যথা,

'হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো, সতর্ক করো।'

তারপর পরবর্তী ৫টি আয়াতে তাকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা এবং আল্লাহর নির্দেশিত কার্যক্রমের মাধ্যমে শক্তি আহরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যথা,

'তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষাণা করো, তোমার পোশাক পবিত্র করো, অপবিত্রতাকে বর্জন করো, অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করো না। আর তোমার প্রভুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো।' সূরা মোযযাম্মেলের মতো এখানেও সূরার প্রথমাংশের নির্দেশাবলীর শেষে স্থান পেয়েছে ধৈর্যের আদেশ। এরপরই সূরায় অংগীভূত হয়েছে আখেরাতকে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হুমকি, হুঁশিয়ারী ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধের ঘোষণা। এ ক্ষেত্রেও সূরা 'আল মোযযাম্মেল'-এর সাথে এ সূরার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

'যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিনটি হবে এক কঠিন দিন। .... অচিরেই আমি তাকে দুরূহ জায়গায় আরোহন করাবো।' (আয়াত ৮-১৭)

সূরা আল কলাম-এর মতো সূরা মোদ্দাসসেরও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরদের মধ্য থেকে একজনকে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট দ্বারা চিহ্নিত করেছে এবং তার অসংখ্য দুরভিসন্ধির মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটির দৃশ্য অংকিত করেছে। সম্ভবত উভয় ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। অনেকের মতে এই ব্যক্তিটি হচ্ছে ওলীদ ইবনে মুগীরা। আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে আগামীতে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সবিস্তারে উল্লেখ করা হবে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে–কি কি কারণে আল্লাহ তায়ালা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

'সে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং কিছু কথাবার্তা রচনা করার চেষ্টা চালিয়েছে। পুনরায় আল্লাহর অভিশাপ হোক তার ওপর! .... শেষ পর্যন্ত সে বললো, এতো আর কিছু নয়, আগে থেকে চলে আসা জাদুমন্ত্র মাত্র। এতো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছু নয়।' (আয়াত ১৮-২৫)

www.pathagar.com

পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে, 'দোযখে নিক্ষেপ করবো। আর তুমি কি জানো, সে দোযখটা কেমন? তা কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, কাউকে ছাড়েও না। চামড়া ঝলসিয়ে দেয়। তার ওপর উনিশ জন কর্মচারী নিয়োজিত।'

অতপর দোযখের দৃশ্য, দোযখের দায়িত্বশীল উনিশ জন ফেরেশতার উল্লেখ এবং এই উনিশ সংখ্যাটির কথা শুনে মোশরেক ও দুর্বল মোমেনদের মধ্যে হৈ চৈ, সন্দেহ সংশয় বিভ্রান্তি, কুটিল প্রশ্ন ও বিদ্রুপের যে হিড়িক চলেছিলো, সেই প্রসংগে এই সূরার পরবর্তী আয়াতে এই সংখ্যা উল্লেখের পেছনে আল্লাহর কি গভীর ও মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আল্লাহর অদৃশ্য জ্ঞানের খানিকটা অজানা রহস্য উম্মোচন করে প্রসংগত এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, গায়েব বা অদৃশ্য জগতের জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। উম্মোচিত এই অজানা রহস্য গায়েবের প্রতি ঈমানের একটি জরুরী তথ্যের ওপর আলোকপাত করে। আয়াতটির বক্তব্য,

'আমি কিছু সংখ্যক ফেরেশতা ছাড়া আর কাউকে দোযখের দায়িত্বশীল বানাইনি, আর তাদের সংখ্যা শুধু এ জন্যে উল্লেখ করেছি যেন কাফেররা বিভ্রাটে পড়ে। .... আর তোমার প্রভুর সৈন্য সামন্তের সংখ্যা কতো, তা কেবল তিনিই জানেন.....।' (আয়াত ৩১)

অতপর আখেরাত, দোযখ এবং দোযখের দায়িত্বশীলদের বিষয়টির সাথে দৃশ্যমান প্রাকৃতিক দৃশ্যের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মনে চেতনা ও সতর্কতা সৃষ্টির জন্যে উক্ত উভয় প্রকারের নিদর্শনের সাহায্য নেয়া হবে। বলা হয়েছে, 'কখনো নয়, চাঁদের শপথ, পশ্চাদপসরনরত রাতের শপথ এবং বিকাশমান প্রভাতের শপথ। নিশ্চয় দোযখ বড় বড় নিদর্শনসমূহের অন্যতম। মানুষের জন্যে ভীতি প্রদর্শনকারী। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এগিয়ে যেতে যায় অথবা যে ব্যক্তি পিছিয়ে থাকতে চায় তার জন্যে ভীতিপ্রদ।'

অতপর অপরাধীদের ও সৎকর্মশীলদের অবস্থানস্থল বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, অপরাধীরা দীর্ঘ যবানবন্দীতে তাদের অপরাধের স্বীকারোক্তি দেবে এবং যে যে কারণে তারা কেয়ামতের দিন আটকাবস্থায় ও যিম্মী হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে, তা খুলে বলবে। তারপর তাদের ব্যাপারে কারো সুপারিশেও যে কাজ হবে না, সে কথাও লক্ষণীয়,

'প্রত্যেক প্রাণী স্বীয় কৃতকর্মের যিম্মী হবে। কেবল দক্ষিণ বাহু ওয়ালারা (অর্থাৎ সৎকর্মশীলরা) বাদে। এরা বেহেশতে অবস্থান করে অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করবে, কি কি কারণে তোমরা দোযখে গিয়েছো? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, দরিদ্রদেরকে খাবার খাওয়াতাম না, আর সত্যের বিরুদ্ধে বাজে কথা রটনাকারীদের সাথে যোগ দিয়ে আমরাও তা রটনা করতাম, আর কর্মফল দেয়ার দিনটিকে অস্বীকার করতাম। শেষ পর্যন্ত আমরা সেই অকাট্য সত্যের সম্মুখীন হয়ে পড়লাম....।'

www.pathagar.com

কেয়ামতের এই অবমাননাকর দৃশ্য ও অপমানজনক স্বীকারোক্তির প্রেক্ষাপটে কোরআন তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের বর্তমান অভিমত কি জানতে চাইছে। সেই ভয়াবহ পরিণতি থেকে রেহাই পাওয়ার ও সময় থাকতে সদুপদেশ গ্রহণের এই আহবান সম্পর্কে তাদের বিবেচনা কি তা জানতে চাইছে। আর সেই সাথে এই দাওয়াত থেকে তাদের বন্য পশুর মতো ছুটে পালানোর একটা হাস্যকর ও বিদ্রুপাত্মক দৃশ্য তুলে ধরেছে। যথা, 'ওদের কি হলো যে, এই স্মরণিকাকে উপেক্ষা করছে, যেন ওরা বাঘ থেকে ছুটে পালানো বন্য গাধা।'

অতপর তাদের সেই মতিভ্রমের রহস্য উন্মোচন করা হচ্ছে, যা তাদেরকে ঘেরাও করে রাখছে এবং পরম হিতাকাংখী উপদেশদাতার দাওয়াত কবুল করতে বাধা দিচ্ছে,

'আসলে তাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা যেন তাকে প্রকাশ্য গ্রন্থসমূহ দেয়া হয়।'

বস্তুত এরূপ ইচ্ছার পেছনে রয়েছে রসূল (স.)-এর প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ। প্রত্যেকের কাছে আসমানী কিতাব নাযিল করা হোক এই তাদের বাসনা। আর অপর সুপ্ত কারণ হলো তাদের ভীতির অভাব, 'কখনো নয়, আসল কথা হলো, তারা আখেরাতকে ভয় পায় না।'

উপসংহারে এক আপোষহীন ঘোষণার মাধ্যমে সব কিছুকে আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার হাতে সোপর্দ করা হচ্ছে। বলা হয়েছে 'কখনো নয়; নিশ্চয়ই এ এক স্মরণিকা। যার ইচ্ছা, সে এসে স্মরণ করুক। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে কেউ স্মরণ করবে না। তিনিই তাকওয়ার উপযুক্ত এবং তিনিই ক্ষমা করার মালিক।'

এভাবে এ সূরা কোরআনের সেই জেহাদের একটি অংশ রূপে বিবেচ্য, যা কোরায়শদের অন্তরে বদ্ধমূল জাহেলিয়াত ও জাহেলী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে কোরআন পেশ করেছে। অনুরূপভাবে ইসলামী দাওয়াতের প্রতি তারা ইচ্ছাকৃতভাবে যে উপেক্ষা প্রদর্শন ও প্রচন্ড শত্রুতার মনোভাব পোষণ করেছিলো এবং নানা চক্রান্ত এসেছিলো, কোরআন তার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়েছে।

এদিক দিয়ে সূরা মোযযাম্মেল, মোদ্দাসসের ও কলাম-এর বিষয়বস্তুর গভীর সাদৃশ্য দেখলে মনে হয়, এই তিনটি সূরাই কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়েছিলো। অবশ্য সূরা মোযযাম্মেল-এর শেষাংশ এর ব্যাতিক্রম। কেননা আমরা আগেই বলেছি যে, এ অংশটি রসূল (স.) ও তাঁর সাথীদের একটি গোষ্ঠির বিশেষ রুহানী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিলো।

শব্দগত ও ধ্বনিগত কাঠামো ও আংগিক সৌষ্ঠবের দিক থেকে সূরাটির বিন্যাস চমকপ্রদ। একটি মাত্র আয়াত ছাড়া সমগ্র সূরা ছোট ছোট আয়াতে বিন্যস্ত। অত্যন্ত দ্রুত পড়ে যাওয়া যায়। প্রত্যেক আয়াতের শেষের শব্দগুলো মিত্রাক্ষর। আয়াতগুলো কখনো গুরু কখনো লঘু ছন্দে ছন্দায়িত। বিশেষত, এই কট্টর কাফেরটির চিন্তা পরিকল্পনা, কপাল সংকুচিত করা ও মুখ বাঁকা করার দৃশ্য যেখানে অংকন করা হয়েছে, আর দোযখের দৃশ্য যেখানে এই বলে অংকন করা হয়েছে যে, তা কোনো কিছুই

www.pathagar.com

অবশিষ্ট রাখে না ও কাউকে ছাড়ে না। যেখানে তাদের পালানোর চিত্র অংকন করা হয়েছে এই বলে যে, তারা যেন বাঘ দেখে পালানো কতিপয় বন্য গাধা।

এভাবে মর্মগত ও বিষয়গত বিভিন্নতার সাথে সাথে আয়াতের আংগিক বিন্যাস তথা ছন্দগত ও মিত্রাক্ষরজনিত বিভিন্নতা সূরায় সামগ্রিকভাবে একটা বিশেষ ধরনের স্বাদ সৃষ্টি করে। তাছাড়া স্থান বিশেষে এই বিভিন্নতার বিশেষ উদ্দেশ্যও রয়েছে। কোথাও তার উদ্দেশ্য নানা প্রশ্ন ও ধিক্কার তুলে ধরা, কোথাও কাফেরদের দুষ্কর্মের প্রতি বিদ্রুপ ও উপহাস করা।

সূরা ক্বেয়ামাহ

এই ক্ষুদ্র সূরাটি মানুষের হৃদয়ে এত বিপুল পরিমাণ উচুঁ মানের তত্ত্ব ও তথ্য, ইশারা ও ইংগিত, দৃশ্য ও চিত্র এবং অনুভূতি ও উপলব্ধির সমাবেশ ঘটায়, যাকে সে প্রতিরোধও করতে পারে না আবার উপেক্ষাও করতে পারে না। অত্যন্ত ক্ষুরধার ভাষায় ও বিশেষ কোরআনিক বাচনভংগীর আশ্রয় নেয় যা তার ভাষাগত কাঠামোতে এবং শৈল্পিক সূরে ও ধ্বনিতে সমভাবে প্রতিফলিত হয়। ভাষাগত ও ধ্বনিগত উভয় প্রকারের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে এতে এক শক্তিশালী প্রভাবের সৃষ্টি হয়, যার মোকাবেলাও করা যায় না, আবার তাকে উপেক্ষাও করা যায় না।

প্রথম দুটি আয়াতে কেয়ামত সংক্রান্ত বচন ও মন সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্য দিয়ে সূরাটির সূচনা হয়েছে। তারপর মন ও কেয়ামত সংক্রান্ত বক্তব্য অব্যাহত রয়েছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুটি বিষয় পাশাপাশি চলেছে। এ হিসাবে প্রথম দুই আয়াতের বক্তব্যকে সূরার বিষয়বস্তুর বিবরণ অথবা এমন একটি জরুরী বক্তব্য বলে আখ্যায়িত করা যায়, যা সূরার বহুসংখ্যক বাক্যে ঘুরে ফিরে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এই পুনরাবৃত্তি হয়েছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও চমকপ্রদ ভংগীতে।

মানুষের মনের সামনে এই সূরা যে বড় বড় তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে তার চারপাশে দুর্লংঘ্য প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে মৃত্যু সংক্রান্ত নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ সত্যটি। এটি এমন নির্মম বাস্তবতা, প্রত্যেক প্রাণীই যার সম্মুখীন হয়ে থাকে, অথচ সে নিজে অথবা তার আশপাশের কেউই তা প্রতিরোধ করতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে অগণিত প্রাণী মৃত্যুর শিকার হচ্ছে, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি শিশু, কি বৃদ্ধ, কি সবল, কি দুর্বল, সকলেই এর শিকার হচ্ছে অথচ সকলে তার সামনে একই রকম অসহায়। কোনো কলাকৌশল বা ফন্দি-ফিকির, কোনো উপায়-উপকরণ, কোনো জোর-জবরদস্তি, কোনো সুপারিশ, কোনো প্রতিরোধ কিংবা কোনো বিলম্বিত করণের কৌশল প্রয়োগ করে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দিক থেকেই তার সামনে আসে এবং মানুষ তা ঠেকানোর কোনো উপায়ই জানে না। মৃত্যুর কাছে এবং যে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তা পাঠায় তার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া মানুষের আর কিছুই করার থাকে না। সূরার ২৬-৩০ আয়াতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় এ বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

সূরার উপস্থাপিত বিষয়সমূহের আর একটি অন্যতম বিষয় হলো মানুষের ইহকালীন জন্ম। এই জন্ম দ্বারা তার মৃত্যু পরবর্তী পুনর্জন্ম এবং মানব সৃষ্টির মূলে নিহিত পরিকল্পনার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এটি এমন একটি বাস্তবতা, যার সূক্ষ্মতা, নিপুণতা এবং অব্যাহত পুনরাবৃত্তি একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। যারা আখেরাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তারাও কখনো একথা দাবী করে না যে, পৃথিবীর কোনো একটি জিনিসও তারা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনার কাজ একজন স্রষ্টাই করে থাকেন। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা এই মর্মেও সাক্ষ্য দেয় যে, পরকালীন পুনরুজ্জীবন আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সহজই শুধু নয়, বরং অপরিহার্য। কেননা প্রকৃতির ব্যবস্থাপনা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষকে নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়নি এবং তার জীবন ও কর্মকে মূল্যায়ন না করে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে না। এই বক্তব্য নিয়েই এই সূরা মানব হৃদয়কে স্পর্শ করে। সূরার সূচনাতেই সে বলেছে, মানুষ কি মনে করে যে, আমি কখনো তার হাড়গুলোকে একত্রিত করবো না? আবার শেষের দিকে বলেছে, মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে?

সূরার উপস্থাপিত অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী দৃশ্য হচ্ছে কেয়ামতের দৃশ্য, কেয়ামতে সংঘটিত প্রাকৃতিক জগতের ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার দৃশ্য। মনস্তাত্তিক বিপর্যয় এবং সমগ্র সৃষ্টিতে ছড়িয়ে পড়া সর্বাত্মক ভীতি ও ত্রাস। মানুষের প্রশ্নের জবাবে কেয়ামতের এই বিরাট ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ দেয়া হবে অত্যন্ত সংক্ষেপে ও দ্রুতগতিতে। যথা..... সে জিজ্ঞাসা করে, কবে হবে কেয়ামত। সেটি হবে সেই দিন যেদিন দৃষ্টিশক্তি যাবে....'

সেদিনের দৃশ্যসমূহের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য হবে মোমেনদের দৃশ্য। তারা সেদিন পরম আনন্দে ও শান্তিতে থাকবে। সেই ভয়াবহ দিনে তারা আল্লাহর সাক্ষাত লাভের আশায় আশান্বিত থাকবে। অপর দৃশ্যটি হবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন, হতাশাগ্রস্ত, আপন পাপ ও কুফরীর শাস্তির আশংকায় তটস্থ অবাধ্য লোকদের দৃশ্য। এ দৃশ্যটি এত শক্তিশালী ও জীবন্তভাবে তুলে ধরা হয়, যেন তা কোরআন পাঠের সময় পাঠকের সামনেই উপস্থিত। এতে মানুষের ইহকাল প্রীতি ও আখেরাতকে অবহেলার সমালোচনা করা হয়েছে। 'কখনো নয়, তোমরা বরঞ্চ দুনিয়ার জীবনকেই ভালোবাস আর আখেরাতকে ছেড়ে দাও।'

এইসব দৃশ্য বর্ণনার মাঝখানে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয় কোরআন শিক্ষার ব্যাপারে রসূল (স.)-এর ব্যাকুলতা সম্পর্কে দেয়া বিশেষ নির্দেশ সম্বলিত চারটি আয়াত। মনে হয় খোদ সূরার ভেতরেই এই শিক্ষার প্রসংগ বিদ্যমান রয়েছে। রসূল (স.) আশংকা করতেন যে, কোরআনের কোনো অংশ হয়তো তিনি ভুলে যাবেন। তাই ভুলে যাওয়ার ভয়ে তিনি ওহী নাযিল হওয়ার সময় এর এক একটি করে বাক্য বারবার মুখে আওড়িয়ে মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। এই প্রসংগেই নাযিল হয়, 'তাড়াহুড়া করে মুখস্থ করার জন্যে কোরআনের আয়াত উচ্চারণ করে নিজের জিহবা নাড়িও না। একে একত্রিত করা ও পড়িয়ে দেয়া আমারই দায়িত্ব। যখন আমি পড়বো, তখন তা অনুসরণ

www.pathagar.com

করে পড়ো। তারপর তার ব্যাখ্যা করাও আমার দায়িত্ব।' তাঁর কাছে এ নির্দেশিকা আসার কারণ এই যে, কোরআনের সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দায়িত্ব—এটা যেন তিনি বোঝেন ও নিশ্চিন্ত থাকেন।

তাঁর ভূমিকা শুধু কোরআন নিজে আহরণ করা ও অন্যদের কাছে পৌছানো। যথাসময়ে তিনি পুরো কোরআন তার অন্তরে রক্ষিত দেখতে পাবেন। আসলে হয়েছিলোও তাই। এই নির্দেশ কোরআন নাযিল হওয়ার সময়েই সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। যেহেতু এ নির্দেশটি স্বয়ং আল্লাহরই উক্তি, তাই আল্লাহর এই উক্তি অকাট্য ও অক্ষয় প্রমাণিত হয়েছিলো। খোদ্ কোরআনের মতোই এ কথাগুলোও অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত হয়েছে। এ থেকে একটি অক্ষরও হারায়নি বা খোয়া যায়নি। বস্তুত এ কথাগুলোও ছিলো অকাট্য সত্য।

এই সূরাটি পড়ার সময় প্রত্যেক পাঠকের মন উপলব্ধি করে যে, সে চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে আছে তার পালানোর অবকাশ নেই। তার কর্মফলের সাথেই তার ভাগ্য আবদ্ধ। এ থেকে তার নিস্তার নেই। এ থেকে তার কোথাও আশ্রয় নেই। কেউ তার রক্ষক নেই।

স্বয়ং আল্লাহর জ্ঞান ও পরিকল্পনা দ্বারা তার জন্ম ও তৎপরতা নিয়ন্ত্রিত। দুনিয়াতে ও আখেরাতে একইভাবে নিয়ন্ত্রিত—চাই সে যতই খেলাধুলা, তামাশা ও অহংকার করে কাটাক না কেন। এ কথাই পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বিধৃত হয়েছে,

'কিন্তু সে—না সত্য মেনে নিলো, না সে নামায পড়লো। বরং সত্যকে মনে করলো ও ফিরে গেলো। পরে অহমিকা সহকারে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে রওনা হয়ে গেলো।'

আর সেই বিপুলসংখ্যক তত্ত্ব, তথ্য ও আবেগ অনুভূতির সমাবেশ ঘটানোর পাশাপাশিই পরোক্ষ হুমকির বাণী শোনানো হয়েছে এভাবে, 'এরূপ আচরণ তোমার জন্যেই উপযুক্ত এবং তোমাতেই শোভা পায়। হাঁ, এই আচরণ ...... তোমাতেই শোভা পায়।'

এ ভাবেই সূরাটি মানুষের মনের একগুয়েমী, গোয়ার্তুমী, হঠকারিতা, অবহেলা, ও খেল তামাশা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করে এবং তাকে গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সজাগ করে। কেননা এ কোরআন মহান প্রভু আল্লাহর কালাম। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি তাঁর কালামে মুখরিত, প্রকৃতির নিরাপদ রেজিষ্টারে তা সুরক্ষিত এবং এই পবিত্র গ্রন্থেও তা সংরক্ষিত।

ইতিপূর্বে আমি নিছক বর্ণনার খাতিরে সূরার বক্তব্য বিষয় ও দৃশ্যসমূহ তুলে ধরেছি। কিন্তু মূল সূরায় সে বিষয়গুলোর স্বরূপ সম্পূর্ণ অন্যরকম। কেননা উক্ত বিষয়গুলো ক্রমাগতভাবে বর্ণনা করা, কোথাও একাধিক বিষয়ের একত্র সমাবেশ, আবার কোথাও সত্যের একটি বিশেষ দিকের বর্ণনা এবং পুনরায় তার অপরাংশের বর্ণনায় প্রত্যাবর্তন—এ সবই মানব হৃদয়কে সম্বোধনের কোরআনের বিশেষ বাচনভংগী। অন্য কোনো বাচনভংগী এর ধারে কাছেও যেতে পারেনি।

www.pathagar.com

সূরা আদ দাহর

কোনো কোনো বর্ণনায় যদিও এই সূরাটিকে মাদানী বলে অভিহিত করা হয়েছে কিন্তু আসলে এটি হচ্ছে একটি মক্কী সূরা। বিষয়বস্তু, বক্তব্য ও যাবতীয় লক্ষণের দিক দিয়ে এর মক্কী হওয়াটাই স্পষ্ট। এ জন্যে আমরা এর মক্কী হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনাকেই অগ্রগণ্য মনে করেছি। এর বক্তব্য বিবেচনা করলে মনে হয়, এ সূরা কোরআনের মক্কায় নাযিল হওয়া অংশের প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। এতে আখেরাতের জীবনে দৈহিক উপভোগ্য নেয়ামতসমূহের পাশাপাশি কঠিন ও ভয়ংকর আযাবের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে রসূল (স.)-কে স্বীয় প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করা এবং পাপিষ্ঠ ও অবাধ্য মোশরেকদের কারো আনুগত্য না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ সময়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলছিলো। একদিকে মোশরেকদেরকে আরো একটু সময় দেয়া এবং অপরদিকে রসূল (স.)-কে তাঁর কাছে নাযিল করা ওহীর ওপর অবিচল থাকা, বাতিলপন্থীদের চাপ ও প্রলোভনের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা আল ক্বালাম, সূরা আল মোযযামমেল ও সূরা আল মোদদাসসের-এর বক্তব্যও অনেকটা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই আমাদের দৃষ্টিতে এই সূরার মাদানী হওয়ার সম্ভাবনা এতো কম যে, তা বিবেচনা না করলেও চলে।

সামগ্রিকভাবে সূরার বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহর অনুগত হওয়া, তাঁর কাছে একাগ্রমনে আশ্রয় প্রার্থনা করা, তার সন্তোষ কামনা করা, তাঁর নেয়ামতসমূহকে স্মরণ করা, তাঁর অনুগ্রহকে অনুভব করা, তাঁর আযাব থেকে সতর্ক হওয়া, তাছাড়া তাঁর পরীক্ষা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং তাঁর সৃষ্টি, নেয়ামত বিতরণ পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টে নিক্ষেপ করার পেছনে যে মহত্তর সুক্ষ্ম, গভীর জ্ঞান ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা উপলব্ধি করার উদাত্ত, বিনম্র ও মৃদু আহবানও এতে রয়েছে।

সূরার শুরুতেই এই মর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করে মানুষের হৃদয়ে একটি হালকা অনুভূতির পরশ বুলাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, মানুষ তার জন্মের পূর্বে কোথায় ছিলো? কে তাকে অস্তিত্বে আনলো? এক সময়ে যার কোনো অস্তিত্ব ছিলো না, সেই মানুষ একদিন এই সৃষ্টিজগতে কিভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়ে পরিণত হলো। বলা হয়েছে, 'মানুষের ওপর কি মহাকালের এমন একটা সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো জিনিসই ছিলো না!'

এরপর তার জন্মের উৎস ও রহস্য উদঘাটন করে তার সৃষ্টির পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা বর্ণনা করা হয়েছে, অতপর তার যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে আরেকটি হালকা পরশ বুলানো হয়েছে। 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত বীর্য থেকে, যাতে করে আমি তার পরীক্ষা নিতে পারি, অতপর আমি তাকে শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন বানিয়েছি।'

www.pathagar.com

এরপর তৃতীয় আরেকটি পরশ বুলানো হয়েছে এই মর্মে যে, আল্লাহ তায়ালাই তাকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছেন, সত্য ও সঠিক পথে চলতে তাকে সাহায্য করেছেন, অতপর নিজের গন্তব্যস্থল নিজেই বেছে নেয়ার জন্যে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন, 'আমি তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি, এখন চাই সে কৃতজ্ঞ হোক কিংবা অকৃতজ্ঞ হোক।'

ওহীর মাধ্যমে এই তিনটি পরশ বুলানো এবং এগুলোর ফলে মানুষের মনে সৃষ্ট গভীর চিন্তা-ভাবনা করা, আগে পিছে ভাবতে বলা হয়েছে, অতপর নির্দিষ্ট পথটি মনোনীত করার প্রাক্কালে সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে তাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সূরাটি মানুষকে জাহান্নামের পথ প্রত্যাখ্যান করারও আহ্বান জানিয়েছে এবং তার দ্বিধাদ্বন্দের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করেছে। এ জন্যে উৎসাহ দানের যতো পথ ও পন্থা থাকতে পারে তাও দেখানো হয়েছে। আরাম আয়েশ, সুখ শান্তি ও উচ্চ মর্যাদার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে যতো আকর্ষণীয় ভাষা থাকতে পারে তা প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা, 'আমি কাফেরদের জন্যে হাতকড়া, জিঞ্জির ও জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। সৎ লোকেরা এমন পেয়ালায় পান করবে, যার সাথে কর্পূরের সুগন্ধি মিশ্রিত থাকবে। তা হবে এমন একটি প্রবহমান ঝর্ণা, যার কিনারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর বান্দারা পান করবে এবং যেখানে যেমন খুশী তারা তার শাখা-প্রশাখা বের করে নেবে।'

আখেরাতের সেই অঢেল সুখ সমৃদ্ধির উপকরণগুলো বর্ণনা করার আগে এই সৎ লোকদের গুণ বৈশিষ্টসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনার জন্যে এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে আগাগোড়াই সহানুভূতি, ঔদার্য, সৌন্দর্য ও আন্তরিকতার অভিব্যক্তি রয়েছে, আর এই সবই হচ্ছে সৎ লোকদের জন্যে নির্ধারিত সেই আনন্দদায়ক তৃপ্তিকর ও মনোমুগ্ধকর নেয়ামতসমূহের সাথে পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যথা,

'তারা মান্নত পূরণ করে এবং সেই দিনটিকে ভয় করে যার বিপদ সবত্র বিস্তৃত হবে, খাবারের প্রতি নিজেদের থাকা সত্তেও তারা মেসকীন, এতীম ও কয়েদীদেরকে খাবার খাওয়ায়....।'

তারপর এই সব সৎ বান্দাদের পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অনমনীয় ও সংকল্পবদ্ধ ছিলো, যারা আখেরাতের কঠিন দিনকে ভয় করতো, যারা নিজেদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দরিদ্রদেরকে খাওয়াতো এবং এ জন্যে কারো কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করতো না, শুধুমাত্র কেয়ামতের কঠিন দিনের ভয়েই তারা খাবার খাওয়াতো।

এভাবে যারা নিছক আখেরাতের ভয়ে দরিদ্রদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে খাওয়াতো, তাদের কি প্রতিদান দেয়া হবে পরবর্তী আয়াতে এবার তার বিবরণ দেয়া হচ্ছে, 'তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সেই দিনের মুসিবত ও আযাব থেকে রক্ষা করবেন এবং দান করবেন প্রফুল্লতা ও আনন্দ। তাদের ধৈর্যের কারণে .... প্রতিদান হিসেব বেহেশত ও রেশমী বস্ত্র দেবেন...।'

www.pathagar.com

এভাবে প্রথম রুকুর শেষপর্যন্ত এই প্রতিদানের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এই তৃপ্তিকর নেয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরার পর স্বয়ং রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে তাঁকে সকল অবজ্ঞা অবহেলা ও অস্বীকৃতির মুখে দাওয়াতের কাজে অবিচল থাকা ও ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ও পথ যতোই দীর্ঘ হোক তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করার আদেশও তাকে দেয়া হয়েছে।

সূরার দ্বিতীয় রুকুর প্রথম চারটি আয়াত হচ্ছে এই আদেশ সম্বলিত। অতপর সূরার শেষ আয়াতগুলোতে কেয়ামতের কঠিন দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, অবিশ্বাসীরা এই দিনটির যথাযথ গুরুত্ব না দিলেও নেককার লোকেরা তাকে ভয় করে, সাবধানতা অবলম্বন করে। সেই সাথে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই অবিশ্বাসীদেরকে খতম করে দিয়ে তাদের জায়গায় নতুন মানব গোষ্ঠীকে সৃষ্টি করা আল্লাহ তায়ালার পক্ষে খুবই সহজ কাজ। কেননা তিনিই তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দেহ ও মনে বিদ্যমান যাবতীয় শক্তি ও যোগ্যতার যোগান দিয়েছেন। এখানে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কি এবং তাঁর পরীক্ষার কি পরিণতি হয়ে থাকে তাও তিনি এ সূরায় ব্যক্ত করেছেন।

মানুষের জন্মের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তাকে যে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন, তা জানানোর মধ্য দিয়ে সূরাটির সূচনা হয়েছে, আর সূরাটির সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে সে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার মধ্য দিয়ে। কেননা শুরু থেকেই এ ধরনের পরিকল্পনা আল্লাহর ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

সূরাটির উল্লেখিত সূচনা ও উপসংহার জীবনের বাইরের সকল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়। এটাকে বুঝবার চেষ্টা না করে এড়িয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা তাকে পরীক্ষার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে, আর উপরোক্ত সত্যকে বুঝবার চেষ্টা করাটাও এই পরীক্ষার আওতাভুক্ত। বুঝবার ক্ষমতাটুকু তাকে এ জন্যে দেয়া হয়েছে যেন সে পরীক্ষায় কামিয়াব করতে পারে।

সূচনা ও সমাপ্তির মাঝে আখেরাতের নেয়ামতসমূহের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা কোরআনের দীর্ঘতম বিবরণ। অথবা বলা যেতে পারে যে, সূরা 'আল ওয়াকেয়া'-য় যে বিবরণ এসেছে তার তুলনায় এটা দীর্ঘ। সামগ্রিকভাবে এ নেয়ামত দৈহিকভাবে অনুভবযোগ্য ও উপভোগ্য। সেই সাথে রয়েছে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও সম্মানের বাড়তি পুরস্কার।

এই উভয় ধরনের পুরস্কার বা প্রতিদানের বিবরণ স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। কেননা মক্কাবাসীরাই ছিলো জাহেলিয়াতের সাথে সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ট। দৈহিকভাবে উপভোগ্য সামগ্রীর প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিলো তীব্র। এ ধরনের ভোগ্য সামগ্রী সমাজের বহু শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মনকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। প্রতিদান হিসাবেও এ ধরনের দ্রব্যসামগ্রী অনেকের কাছে সর্বোত্তম বিবেচিত হয়।

www.pathagar.com

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কাদের কি অভিরুচি, কাদের কাছে কি বেশী প্রিয়, কার মন-মানসিকতার সাথে কোন দ্রব্য সামগ্রী বেশী উপযোগী ও মানানসই, তা তিনিই ভালো জানেন। তাঁর বান্দাদের মধ্যে আবার অনেকে এমনও আছে, যাদের কাছে স্থুল ভোগ্য সামগ্রীর চেয়ে উন্নতমানের প্রতিদান বেশী আকর্ষণীয়। যেমন সূরা 'আল কেয়ামা'য় আছে, 'কিছু মুখমন্ডল সেদিন প্রফুল্ল থাকবে এবং তারা আপন প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে।'

সূরা আল মোরসালাত

প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী অনেকগুলো দৃশ্য ও সুতীব্র প্রভাব বিস্তারকারী বহু বক্তব্যে এ সূরাটি পরিপূর্ণ। মনে হয় এর প্রত্যেকটি বাক্য এক একটি জলন্ত আগুনের কাঠি। এগুলো যেন শ্রোতার বিবেকের ওপর অত্যন্ত ভয়ংকর আঘাত করে। তার বিবেকের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন ও হুমকির কিছু বান যেন ছুড়ে মারে।

সূরাটি দুনিয়া ও আখেরাতের বিভিন্ন দৃশ্য, মানব সত্ত্বা সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব এবং কেয়ামত ও আযাবের বহু চিত্র তুলে ধরে। আর প্রত্যেকটি দৃশ্য তুলে ধরার পর অপরাধীর মনের ওপর যেন এই বলে একটা একটা ধারালো আগুনের শূল নিক্ষেপ করে।

'সেদিন অবিশ্বাসীদের জন্যে ধ্বংস অনিবার্য।'

পুরো সূরাটিতে দশবার এই ছন্দায়িত মন্তব্যটি পেশ করা হয়েছে। এটি এই সূরার একটি বিশিষ্ট বাকধারায় পরিণত হয়েছে। আলোচনার ক্ষুরধার ইংগিত, আলোড়ন সৃষ্টিকারী দৃশ্যসমূহ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী উপস্থাপনা ভংগির সাথে এই মন্তব্যগুলো একান্ত সংগতিপূর্ণ।

সূরা 'আর রহমান'-এ আল্লাহর এক একটি নেয়ামতের বিবরণ দেয়ার পর বারবার উচ্চারিত হয়েছে, 'অতপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতটি অস্বীকার করবে?'

অনুরূপভাবে সূরা 'আল কামার'-এ প্রতিটি আযাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর বারবার এ কথাটি উচ্চারিত হয়েছে যে, 'অতপর দেখলে তো আমার আযাব ও হুঁশিয়ারী কেমন ছিলো?'

আলোচ্য সূরায় এই বারবার উচ্চারিত তাৎপর্যবহ বাক্যটি আগের সূরা দুটোর সে বাক্য দুটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে এটির বারবার উচ্চারণ সূরাটিকে একটি বিশেষ চরিত্রে ও মহিমায় মন্ডিত করেছে এবং তাকে বহুলাংশে ধারালো ও তেজস্বী করে তুলেছে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সূরার আয়াতগুলো ছোট ছোট, গতিশীল ও প্রচন্ড প্রভাবময়ী। অধিকাংশই বিচিত্র মিত্রাক্ষর শব্দে সমাপ্ত আয়াতের সমষ্টি। আয়াতের শেষে কখনো কখনো একই মিত্রাক্ষর শব্দ পুনরুচ্চারিত হয়েছে। এসব মিত্রাক্ষর শব্দগুলো ছোট ও গতিশীল। এর বাক্যগুলো শ্রোতার স্নায়ুতে তীব্র এক দাহ ও প্রবল প্রেরণার সৃষ্টি করে। এসব অনুভুতি তাদের মনে একের পর এক অবিরত ধারায় সৃষ্টি হতে থাকে। একটির রেশ না মিলাতেই আর একটির উদ্ভব হয়।

www.pathagar.com

সূরার শুরু থেকেই এই ধারা শুরু হয়েছে। তীব্র ঘুর্ণিবায়ু অথবা ফেরেশতার উল্লেখ দ্বারা সূরার পরিবেশকে ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ করা হয়েছে। এপর্যায়ে প্রথম ৭টি আয়াত লক্ষণীয়। এই উদ্বোধনী বক্তব্যগুলো সূরার সার্বিক পরিমন্ডল ও তার প্রভাব বলয়ের সাথে পুরোপুরিভাবেই সংগতিশীল।

এসব ক্ষেত্রে কোরআন একটি বিশেষ রীতি অনুসরণ করে থাকে। কোথাও সূরা 'আদ্ দোহা'র ন্যায় স্নেহপ্রীতি ও দরদ মাখা দৃশ্য অংকন করে। আবার কোথাও অনুসরণ করে সূরা 'আ'দিয়াত' এর ন্যায় ঊষাকালীন দ্রুতগামী অশ্বের ধুলা উড়ানো এবং কবর খুলে কবরবাসীর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার দৃশ্য। এভাবে বিভিন্ন দৃশ্য বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরা হয়ে থাকে।

এই উদ্বোধনী বক্তব্যের পর সূরার যে দশটি প্যারা সম্বলিত ছোট ছোট বাক্যগুচ্ছ রয়েছে, তার প্রত্যেকটিই বলতে গেলে শ্রোতাকে এক একটি স্বতন্ত্র জগতে টেনে নিয়ে যায়। প্রত্যেক জগতে পরিভ্রমণের সময় সূরাটি নিজেই যেন চিন্তা গবেষণা, আবেগ, উদ্দীপনা মানসিক প্রতিক্রিয়া ও সাড়ার এক একটি বিশাল অংগনে রূপান্তরিত হয়। ব্যবহৃত ভাষা ও শব্দের তুলনায় সেই বাস্তব অংগনগুলো অনেক প্রশস্ত ও সুপরিসর। শব্দগুলো যেন এক একটি সাংকেতিক তীর, যা বিভিন্ন জগতের দিকে ইংগিত করে যায়।

এর মধ্যে প্রথম বাক্যগুচ্ছটি (৮-১৫তম আয়াত) কেয়ামতের দিনের দৃশ্য বর্ণনা সম্বলিত। এতে আকাশ ও পৃথিবীতে যে ভয়াবহ পরিবর্তন সূচিত হবে তার একটা সুন্দর চিত্র আঁকা হয়েছে। এই চিত্র সে সময়কার, যখন রসূলরা সবাই মানব জাতির সাথে এক হয়ে হিসাব চুকিয়ে দেবেন।

দ্বিতীয় প্যারাটি হচ্ছে অতীত যমানার আল্লাহদ্রোহীদের ধ্বংসের কাহিনী সম্বলিত। আল্লাহর বিধান ও দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কি নীতি অবলম্বন করে থাকেন এখানে তার প্রতি ইশারা ইংগিত রয়েছে। এ প্যারাটি ১৬ থেকে ১৯ তম আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত।

তৃতীয় প্যারাটি মানুষের ইহকালীন জীবনের সূচনা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এবং এটি ২০-২৪ আয়াত জুড়ে বিস্তৃত।

চতুর্থ প্যারাটি ২৫-২৮ আয়াত জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। এতে পৃথিবী, তার জীবিত ও মৃত অধিবাসীদের বাসস্থানের বর্ণনা, তার স্থীতি ও তাতে জীবন দানকারী পানির প্রাচূর্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চম প্যারাটি রয়েছে ২১-৩৪ আয়াতসমূহে। ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের কেয়ামতের দিন যে আযাবে ভুগতে হবে এতে তার বিবরণ রয়েছে।

ষষ্ঠ (৩৫-৩৭) ও সপ্তম প্যারায় (৩৮-৪০) দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের ভয়াবহ পরিণতির আরো কিছু বিবরণ এসেছে।

www.pathagar.com

পার্থিব জীবনের সব কিছুই এই আখেরাত বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত মূল্যবোধের বিশুদ্ধিও এর ওপর নির্ভরশীল। তাই এই আকীদাকে মনে বদ্ধমূল করার জন্যে এক দীর্ঘস্থায়ী চেষ্টা সাধনার প্রয়োজন ছিলো।

সূরা আন-নাবা

আলোচ্য সূরাটি আমপারায় বর্ণিত বিষয়গুলোর এক চমৎকার উদাহরণ। এ পারাতে উপস্থাপিত হয়েছে উদাহরণ, প্রাকৃতিক বর্ণনা, ঘটনাপঞ্জি, বিভিন্ন জিনিসের প্রতিচ্ছবি, বিশ্ব প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে বিরাজমান বিষয়সমূহ। প্রাণীজগত ও জড়জগতের সুরঝংকার, দুনিয়া ও আখেরাতের বর্ণনা, অনুভূতি ও বিবেককে আকর্ষণকারী শব্দ ও বাচনভংগিও এখানে রয়েছে। জগত ও জীবন সম্পর্কে বর্ণিত এসব কথা এ সূরাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সূরাটি শুরু করা হয়েছে একটি হৃদয়স্পর্শী প্রশ্নে মধ্য দিয়ে। কোরায়শরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলো তার গুরুত্ব এতে আরো অনেক বেড়ে গেলো। অর্থাৎ প্রশ্নের বিষয়টি পাঠকের কাছে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হলো যে, সে বিষয়ে সন্দেহ করার আর কোনো সুযোগই রইলো না। তবু কি তারা মতভেদ করছে? এ প্রসংগে তাদের সতর্ক করতে গিয়ে বলা হচ্ছে– যেদিন সবকিছু ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে।

'কোন্ বিষয়ে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে?সেই মহা খবর সম্পর্কে কি, যে বিষয়ে তারা মতভেদে লিপ্ত? না– যা তারা ভাবছে তা কিছুতেই হবার নয়। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। অবশ্যই তারা জানতে পারবে।' তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে এই মহাসংবাদ সম্পর্কিত আলোচনা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রেখে বলা হয়েছে, আমাদের সামনে ও আশেপাশে যে অবস্থা বিরাজ করছে, আমাদের অন্তরে যা আমরা অনুভব করছি এবং বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বিরাজমান অবস্থা সেই ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা পরবর্তীকালে আসবে–

আমি কি পৃথিবীকে বিছানা, পাহাড়গুলোকে পেরেক (-এর মতো করে) পয়দা করিনি? আমি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি। বানিয়েছি তোমাদের নিদ্রাকে আরামের বস্তু, রাতকে (আচ্ছাদনকারী) পোশাক এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সময়। এরপর (তোমাদের মাথার ওপর) সাতটি মযবুত আসমান বানিয়েছি। তারপর কম্পমান আলোকমালা দ্বারা এগুলোকে সজ্জিত করেছি। খাদ্যশস্য, শাকসবজি এবং ঘন সন্নিবেশিত বাগবাগিচা তৈরী করার জন্য মেঘমালা থেকে পানি বর্ষণ করেছি।

বাস্তব জীবনের এ সকল উদাহরণ দ্বারা সূরাটির মধ্যে সেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যে সম্পর্কে তারা মতভেদে লিপ্ত ছিলো। যখন তারা সেদিনকে প্রত্যক্ষভাবে জানবে, তখন সেদিনটি তাদের সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যেন বলতে চান, কি সে জিনিস এবং কোন সে জিনিস (তোমরা কি বলতে পারো)? অবশ্যই ফয়সালার দিনটি নির্দিষ্ট রয়েছে, সেদিন শিঙ্গায়

www.pathagar.com

ফুঁক দেয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে এগিয়ে আসবে। সে সময় আকাশ খুলে দেয়া হবে, আর তা বহু দরজায় পরিণত হয়ে যাবে, পাহাড়গুলোকে সঞ্চালিত করা হবে, যা ধুলাবালির স্তূপে পরিণত হয়ে যাবে।

এরপর ভয়ংকর এক আযাবের দৃশ্যের কথা পেশ করা হয়েছে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে বিদ্রোহীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে। যেখানে তারা যুগ যুগ ধরে পড়ে থাকবে। ঠান্ডা অথবা পানীয় বস্তুর স্বাদ তারা সেখানে পাবে না। শুধু গরম পানি ও যখমের ধোয়ানী (বা পুঁজ, রক্ত) ছাড়া। এটাই হবে তাদের পরিপূর্ণ প্রতিদান। বলা হবে, (এগুলোর স্বাদ) তোমরা ভোগ করো, আমি (আজ) শাস্তি ছাড়া তোমাদের অন্য কিছুই বাড়াবো না।

অনুরূপভাবে তাঁর নেয়ামতের বিবরণও দেয়া হয়েছে, ছন্দের তালে তালে যার আলোচনা এগিয়ে আসছে। বলা হচ্ছে, অবশ্যই মোত্তাকী পরহেযগারদের জন্যে চূড়ান্ত সাফল্য আসবে, হাযির হবে সোহাগিনী সমবয়সী তরুণীরা কানায় কানায় ভরা পানপাত্র নিয়ে। যার মধ্যে থাকবে না কোনো বাজে কিছু। তোমার রবের পক্ষ থেকে দেয়া হবে এ প্রতিদান।

সূরাটির সমাপ্তি টানতে গিয়ে ওই মহাদিবসের চমৎকার এক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওই দিবসটি আগমনের পূর্বেই তার দৃশ্যের অবতারণার মধ্যে ফুটে উঠেছে সতর্কীকরণ ও সুসংবাদদানের এক চমৎকার উপস্থাপনা। তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিক। এ দুইয়ের মধ্যে আর যা কিছু আছে সে সবকিছুর প্রতিপালক। তিনি রহমান, দয়াময় প্রভু। আর সেদিন কেউ তাঁকে সম্বোধন করে কিছু বলার ক্ষমতা রাখবে না। সেদিন রূহ ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। দয়াময় আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সেদিন কোনো কথা বলবে না, আর (অনুমতি পেলেও) সত্য সঠিক কথাই বলবে। ওই সঠিক দিনটি নিশ্চিতভাবে আসবে।

এখন যে তার পরয়ারদেগারের কাছে আশ্রয় পেতে চায় সে আশ্রয় নিক। আমি তোমাদের আসন্ন এক আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করছি। সে দিন এবং এ দিনকে অস্বীকারকারী প্রতিটি ব্যক্তি বলতে থাকবে 'হায়, আফসোস! (মানুষ না হয়ে) যদি আমি আজ মাটি হয়ে যেতাম!

সূরা আন নাযেয়াত

আখেরাত সংঘটিত হওয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে ৩০ পারার অন্যান্য সূরার মধ্যে যেসব উদাহরণ দেয়া হয়েছে এ সূরাটিতেও অনুরূপ কিছু উদাহরণ রয়েছে। আখেরাতের আগমন যে অবশ্যম্ভাবী, তা কতো ভয়ানক, তার দৃশ্যসমূহ কতো কঠিন এবং এই পৃথিবীর পরিণতির জন্যে আখেরাত সংঘটিত হওয়ার গুরুত্ব কতো বেশী, এই সূরার ছত্রে ছত্রে তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ফুটে উঠেছে মহান স্রষ্টার সুনিপুণ তৈরী পৃথিবীর উপরিভাগ ও অভ্যন্তরভাগের প্রতিটি জিনিসের পরিণতির আভাস। তারপর এর বাসিন্দাদের যে আখেরাতে আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে তার বহু যুক্তিও এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। আখেরাতের বাস্তবতা সম্পর্কে

www.pathagar.com

মানব মনে প্রত্যয় জন্মানোর উদ্দেশে প্রথমেই এক ভীষণ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। অনুভূতির তীব্রতা বৃদ্ধির জন্যে এই ভীতিজনক, বিস্ময়কর ও কঠিন অবস্থার বর্ণনার সাথে সাথে কতো দ্রুতগতিতে কেয়ামত সংঘটিত হবে সে বিষয়ে পাঠককে সচকিত করা হয়েছে।

ওই ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা করতে গিয়ে প্রথমেই যে বর্ণনা এসেছে তা একজন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এ বর্ণনা মানুষের মনকে ভীষণ ভয়ে বিহ্বল করে দেয়। তার হৃদয়ে এমন কাঁপুনি সৃষ্টি করে যে, তার হৃদয়ের তারগুলো যেন ছিঁড়ে যেতে চায়। তার গোটা সত্তা অবশ্যম্ভাবী ওই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করতে থাকে এবং গভীর পেরেশানীতে তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে চায়।

'গভীরভাবে ডুব দেয়া ও সজোরে বিচ্ছিন্নকারী ফেরেশতাদের কসম, আবার কসম ওই ফেরেশতাদের, যারা ধীর গতিতে সহজভাবে জানগুলো কবয করে নেয়। কসম তাদের যারা রূহগুলো নিয়ে (উন্মুক্ত আকাশের পরিমন্ডলে) সাঁতার কেটে চলে যায়। তাদেরও কসম, যারা প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যায় এবং পর পর আল্লাহর সকল হুকুম পালন করে চলে।'

মানুষের কল্পনার চোখে এসব ঘটনা তুলে ধরে সে দিনের ভীষণ দৃশ্যগুলোর প্রথম অবস্থাটি তুলে ধরা হয়েছে, যার ফলে অন্যান্য অবস্থাগুলো পর পর এমনভাবে আসতে থাকবে যেন এগুলোর আগমন পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে এবং অতি সংগোপনে একটি ঘটনার পরিণতিতে অপরটি আসা অবধারিত হয়ে আছে। কোরআনের বর্ণনাধারা দেখুন– সেদিন আসবে ভীষণ কম্পন সৃষ্টিকারী প্রচন্ড এক ধাক্কা, যার পরে আসবে আবারও ....(আয়াত–৬-১৪)

পরবর্তী অবস্থাগুলোও একের পর এক আসতে থাকবে। মহাশূন্য ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অবশেষে স্থির হয়ে যাবে। এভাবে সবকিছু এক বিশাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। মূসা ও ফেরাউনের সময়কার যে সব বিদ্রোহী সীমালংঘনকারী ব্যক্তি আল্লাহর আযাবে পতিত হয়েছিলো তাদের মতো অন্যান্য সবাই এ ধ্বংসাত্মক অবস্থায় পতিত হবে। তারপর ধীরে ধীরে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এভাবে তাদের সম্পর্কে উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হবে। এরশাদ হচ্ছে– 'এসেছে কি তোমার কাছে মূসার কাহিনী? স্মরণ করে দেখো সে সময়ের কথা, যখন তার রব তাকে তুয়া নামক উপত্যকায় ডেকে বললেন, যাও ফেরাউনের কাছে, ...পাকড়াও করলেন। এর মধ্যে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে সেসব ব্যক্তির জন্যে যে (তাঁকে) ভয় করে।' (আয়াত-১৪-২৬)

এভাবে আল্লাহ তায়ালা ওই মহাসত্য জানানোর জন্যে এখানে একটি ভূমিকা পেশ করছেন। ভূমিকার বর্ণনা শেষে তিনি প্রকৃতির উন্মুক্ত গ্রন্থ তুলে ধরেছেন, যার মধ্যে সর্বশক্তিমান মহান সত্তার অস্তিত্বের বহু চিহ্ন ফুঠে রয়েছে। এটা সেই মহান সত্তার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছার কথা জানায়, জানায় দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুর ওপর তাঁর কর্তৃত্বের কথা, তাঁর তদারকির কথা! সেই মহাশক্তিই যে অতি সংগোপনে সবকিছু পরিচালনা করছে এবং তাঁর ইচ্ছাক্রমেই যে সবকিছু চলছে, এ সূরার শুরুতে তারই আভাস দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

www.pathagar.com

'তোমাদের সৃষ্টি করা বেশী কঠিন, না আকাশ সৃষ্টি করা বেশী কঠিন? এই মহাকাশ তিনি তৈরী করলেন, এর ছাদ সমুন্নত করলেন এরপর সুসমন্বিত করলেন এর গঠন প্রণালীকে। এরপর রাতকে ঢেকে দিলেন (অন্ধকারের চাদর দিয়ে), আর বের করলেন তার থেকে উদীয়মান দিনের উজ্জ্বল আলো। তারপর বিছিয়ে দিলেন যমীনকে, তার থেকে পানি ও তার চারণভূমি বের করলেন, আর তার মধ্যে পর্বতমালাকে গেড়ে দিলেন, যে পানি তোমাদের জন্যে জীবন সামগ্রী এবং তোমাদের গবাদিপশুর জন্যেও প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করে।' (আয়াত-২৭-৩৩)

এ হৃদয়গ্রাহী ভূমিকা বর্ণনা করে প্রাণসঞ্চারী অনুভূতি জাগানোর পর মহাপ্রলয়ের দৃশ্য এবং দুনিয়ার জীবনে সম্পাদিত যাবতীয় কাজের পরিণতির বিবরণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যে প্রতিদান (নেককার লোকদের) দেয়া হবে তার কিছু দৃষ্টান্ত এমনভাবে প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান রয়েছে, যা দেখে পাপাচারীদের সর্বনাশা পরিণতি বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাঁর হেদায়াতের বাতি নিভিয়ে দেয়ার জন্যে মানুষ যা কিছু চেষ্টা সাধনা বা ষড়যন্ত্র করেছিলো, সেদিন তা খুব ভালোভাবেই সে স্মরণ করবে এবং (সেদিন) জাহান্নামকে এগিয়ে আনা হবে সে ব্যক্তির জন্যে– যে তা নিজের চোখে দেখতে পাবে, অর্থাৎ সে-ই সেদিন তার উপযুক্ত হবে। অতএব যে সীমালংঘন করেছিলো এবং দুনিয়ার জীবনকে বড়ো করে দেখেছিলো, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা এবং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে হবে বলে ভয় করেছিলো এবং তার মনকে প্রবৃত্তির দাসত্ব করা থেকে থামিয়ে রেখেছিলো, নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার ঠিকানা।

সেই মহাপ্রলয়ের বিভীষিকাময় দৃশ্যের বর্ণনা শুনে যখন আমাদের অন্তর অভিভূত হয়ে পড়ছে সেই মুহূর্তেই বলা হচ্ছে– 'দোযখকে তার ভয়ংকর চেহারাসহ তাদের সামনে এগিয়ে দেয়া হবে, যারা নিজ চোখে দেখতে পাবে ওই উন্মত্ত দোযখকে। যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের তুলনায় বড়ো করে দেখেছে, আর যারা তাদের রবের সামনে দাঁড়াতে হবে– এ চিন্তায় মনকে তার লাগামছাড়া চাহিদা পূরণ করা থেকে দমন করবে, নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তাদের ঠিকানা।' এ পর্যায়ে এসে সূরার মোড় ফিরে যাচ্ছে ওই ভয়ানক কেয়ামতের অস্বীকারকারীদের দিকে, যারা রসূল (স.)-এর কাছে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। ওদের প্রশ্ন প্রসংগে কেয়ামতের ভয়াল চিত্র তুলে ধরায় তাদের অন্তরের ভয় আরও বেড়ে গেলো। কেয়ামতের সর্বগ্রাসী চেহারার হৃদয়বিদারক বর্ণনা অপরাধীদের মনকে ভয়ে বিহ্বল করে দিলো। দেখুন সে বর্ণনা– 'ওরা জিজ্ঞাসা করছে কেয়ামত সম্পর্কে ......তাদের কাছে মনে হবে (দুনিয়ার সুখের জীবন) একটি মাত্র রাত অথবা একটি মাত্র উজ্জ্বল প্রভাত তারা কাটিয়েছে। 'মাদ্' চিহ্ন বিশিষ্ট 'হা' দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী কেয়ামতকেই বুঝানো হয়েছে, যার ভয়ানক অবস্থা ও বিশালত্বও মনকে কাঁপিয়ে দেয়। (আয়াত-৪২-৪৬)

www.pathagar.com

সূরা আবাসা

আখেরাত সংঘটিত হওয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে ৩০ পারার অন্যান্য সূরার মধ্যে যেসব উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে, এ সূরাটিতেও অনুরূপ অনেক উদাহরণ রয়েছে। আখেরাতের আগমন যে অবশ্যম্ভাবী, তা কতো ভয়ানক, তার দৃশ্য কতো কঠিন এবং এ পৃথিবীর পরিণতির জন্যে আখেরাত সংঘটিত হওয়ার গুরুত্ব কতো বেশী, মহান স্রষ্টার সুনিপুণ তৈরী পৃথিবীর উপরিভাগ ও অভ্যন্তরভাগের প্রতিটি জিনিসের পরিণতির আভাসও এই সূরার ছত্রে ছত্রে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তারপর এর বাসিন্দাদের যে আখেরাতে আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে তার বহু যুক্তি এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। আখেরাতের বাস্তবতা সম্পর্কে মানব মনে প্রত্যয় জন্মানোর উদ্দেশ্যে প্রথমেই এখানে এক ভীষণ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। অনুভূতির তীব্রতা বৃদ্ধির জন্যে এই ভীতিজনক বিস্ময়কর ও কঠিন অবস্থার বর্ণনার সাথে সাথে কতো দ্রুতগতিতে কেয়ামত সংঘটিত হবে সে বিষয়ে পাঠককে সচকিত করা হয়েছে।

এ সূরাটিতে অত্যন্ত দৃঢ় ও সিদ্ধান্তকারী কিছু কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে বহু সূক্ষ্ম এবং হৃদয়গ্রাহী তথ্য, উপস্থাপনা বৈচিত্র্যের অনুপম দৃষ্টান্ত, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং অনুভূতিকে গভীরভাবে নাড়া দেয়ার মতো সুরের মূর্ছনা রয়েছে।

সূরাটির প্রথম অংশে ইসলামের প্রথম যুগের একটি বিশেষ ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে,

একদিন নবী করীম (স.) কোরায়শ নেতাদের একটি দলকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এমন সময়ে আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রা.) সেখানে এসে হাযির হলেন। তিনি ছিলেন একজন দরিদ্র ও অন্ধ ব্যক্তি। রসূল (স.) তখন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোকের সাথে যে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন এ কথা তিনি জানতেন না। তাই তিনি এসে রসূল (স.)-কে অনুরোধ করলেন আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা থেকে তাকে কিছু শেখাতে। এ সময় রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে ব্যাপারটা একটু খারাপ লাগলো, তাই তিনি একটু বেজার হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। তার পর পরই কঠোর ভাষায় তিরস্কার স্বরূপ কোরআনের এ সূরাটি নাযিল হলো।

এ সূরাতে একটি মযবুত মুসলিম সমাজের বুনিয়াদ কিভাবে গড়ে ওঠে এবং ইসলামী দাওয়াতের মূলকথা ও প্রকৃতি কী– সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে–

'সে ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো এ কারণে যে, তার কাছে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসেছে। তুমি কি জানো?' ....(আয়াত-১-১৫)

এ সূরার দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে ওই মহামূল্যবান কেতাবের প্রতি মানুষের অস্বীকৃতি ও আল্লাহর প্রতি লজ্জাকর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্পর্কে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে স্মরণ করাচ্ছেন কিভাবে সে অস্তিত্ব পেলো, কিভাবেই বা তার

www.pathagar.com

জন্মের সূচনা হলো, আর কেমন করেই বা আজ তার জীবন সহজ-সুন্দর হলো। আর পরিশেষে মৃত্যুর পর তার রবের কাছে হাশরের ময়দানে সে হাযির হবে, এতদসত্ত্বেও কেমন করে আজ সে তার রবের হুকুম অমান্য করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে,

'ধ্বংস হোক (অপরিণামদর্শী) মানুষ, কী নিদারুণ অকৃতজ্ঞ সে! জানো কোন জিনিস দিয়ে তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন? একবিন্দু শুক্র থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর এক নির্দিষ্ট পরিমাপ মতো তার গঠন কাজ সম্পন্ন করেছেন। এরপর তার জীবন যাপনের পথ সহজ করে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে তাকে মৃত্যু দান করে কবরস্থ করার ব্যবস্থা করেছেন। এরপর যখন তিনি চাইবেন তাকে হাযির করবেন হাশরের ময়দানে। এতদসত্ত্বেও কিছুতেই সে বিবেকের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না এবং যে নির্দেশ তাকে দেয়া হয়েছে তা পালন করছে না'।

সূরাটির তৃতীয় অংশে মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে তার দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এমন কিছু জিনিসের দিকে ফেরানো হয়েছে, যেগুলোর সাথে তার সার্বক্ষণিক সম্পর্ক বিদ্যমান, সেগুলো হচ্ছে তার ও তার পশুর খাদ্যদ্রব্য। আরো মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে ওই সকল জিনিসের দিকে, যেগুলো চেষ্টাসাধ্য করলে অর্জন করা যায়, যেগুলো তার ভাগ্যে নির্ধারিত রয়েছে, যার ফলে সে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যায়। এরশাদ হচ্ছে-

'মানুষের (অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে) তার খাদ্যদ্রব্যের দিকে তাকানো উচিত। অবশ্যই আমি প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়েছি, তারপর ফাটিয়ে চৌচির করে দিয়েছি যমীনকে, অতপর তার থেকে বের করেছি খাদ্যশস্য, আংগুর ও শাকসবজি। আরও বের করেছি বিভিন্ন ফলমূল। যেমন যায়তুন ও খেজুর, ঘন সন্নিবেশিত পত্রপল্লবে সজ্জিত বাগবাগিচা, আরও বহু প্রকারের ফল ও তৃণলতা, যা তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশুর ভোগের বস্তু।'

সূরাটির সমাপ্তি পর্যায়ে কেয়ামতের বিকট চিৎকারধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। যেদিন সেই মহাবিপজ্জনক দিন তার ভয়াল মূর্তি নিয়ে হাযির হবে, সেদিনকার ওই দৃশ্যের ভয়াবহতা আলোচ্য অংশে বিবৃত শব্দগুলোর মাধ্যমে যেন ঠিক সেইভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে, সেদিনকার মানুষের অবস্থা এমন হবে যে সে একমাত্র নিজেকে বাঁচাতেই ব্যস্ত হবে এবং বাকী সবকিছু থেকে গাফেল হয়ে যাবে। নিদারুণ সে কষ্টের ছাপ লেগে থাকবে অনেকের চেহারায়। এরশাদ হচ্ছে-

'যখন এসে যাবে সেই বিকট চিৎকারধ্বনি, সেদিন মানুষ তার ভাই থেকে পালাতে থাকবে, মা থেকে, বাপ থেকে, তার স্ত্রী ও সন্তান থেকেও। প্রত্যেক ব্যক্তির সেদিন এমন এক কঠিন অবস্থা হবে, যা তাকে অন্য সবকিছু ভুলে যেতে বাধ্য করবে। কিছু চেহারা থাকবে সেদিন শুভ্র-সমুজ্জ্বল, হাস্যোদ্ভাসিত, সুসংবাদের আনন্দে মাতোয়ারা। আবার কিছু চেহারা থাকবে সেদিন কালিমালিপ্ত ও ধুলোমলিন। এরাই হবে তারা, যারা ছিলো অকৃতজ্ঞ ও সত্য অস্বীকারকারী চরম পাপাচারী'।

www.pathagar.com

সূরা আত্ তাকওয়ীর

এ সূরাটিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রত্যেক ভাগে ইসলামী আকীদার মূলনীতিসমূহের প্রধান প্রধান বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে কেয়ামতের বাস্তব কিছু দৃশ্য তুলে ধরা এবং সংঘটিত হওয়ার সময় সৃষ্টিরাজির মধ্যে যে ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা। এ বিপর্যয় আসবে সূর্যে, তারকারাজিতে, পাহাড়-পর্বতসমূহে, সমুদ্রে, পৃথিবীতে, আকাশে, গৃহপালিত পশু ও হিংস্র জীব-জন্তুতে এবং মানুষের মধ্যে।

দ্বিতীয় বাস্তব সত্যটি হচ্ছে ওহী এবং যে ফেরেশতা এ ওহী বহন করে এনেছেন তার বৈশিষ্ট্য ও যার কাছে ওহী পৌঁছেছে সেই নবী সম্পর্কিত। তারপর আলোচনা করা হয়েছে ওই জাতি সম্পর্কে, যাদের সম্বোধন করে ওহী পাঠানো হয়েছিলো।

সূরাটির মধ্যে যে ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা এসেছে তা হচ্ছে প্রলয়ংকরী এক আলোড়ন। যা সবকিছুকে লন্ডভন্ড করে ফেলবে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়ে যাবে প্রতিটি জিনিস। স্থির পদার্থগুলো ছুটে বেড়াতে থাকবে। যারা নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছিলো তারা সব ভয়ে বিহ্বল হয়ে যাবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে মানুষ পরিচিত সকল কিছু থেকে। চেনা জিনিসকেও আর কেউ চিনতে পারবে না। বিপদের এই ঘনঘটায় মানুষ বহু সময় ধরে ভীষণভাবে দুলতে থাকবে। দুনিয়াতে যাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিলো তাদের সকল সম্পর্ক পুরোপুরিভাবে কেটে যাবে। কিছুতেই এক সাথে থাকতে পারবে না তারা, যারা জীবনভর এক সাথে থেকেছে। সেদিন যে ভয়ানক তুফান প্রবাহিত হবে তা পাখীর পলকের মতো সবকিছুকে এমনভাবে উড়িয়ে দিয়ে নিয়ে যাবে, যেন সেগুলোর কোনো ওযনই নেই এবং কোনো স্থায়িত্বও কোনোদিন ছিলো না। সেদিন সকল শক্তির মালিক এক আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কেউ কোনো আশ্রয় অথবা মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে না। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই চিরন্তন, শাশ্বত ও স্থায়ী। শুধু তাঁর এবং একমাত্র তাঁর কাছেই দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়া যাবে ও প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব হবে। চূড়ান্তভাবে সে দিন মানুষ এ ধ্বংশলীলা বুঝতে পারবে।

এ সূরাটিতে একথাই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে যে, সে যাদের কাছে নিশ্চিন্ত মনে সারা জীবন থেকেছে এবং যাদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করেছে, সেসব থেকে মানুষ আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যাতে করে সে একমাত্র আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চায়, তার আশ্রয়েই এগিয়ে আসে এবং তাঁর কাছেই নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব কামনা করে।

সূরাটি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে এতে বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি তুলে ধরার কারণে। এখানে যেমন আমাদের জানা বর্তমান জগতের অনেক চমকপ্রদ ছবি তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি তুলে ধরা হয়েছে আখেরাতের বহু দৃশ্যের বিবরণ।

তখন এমন অনেক আশ্চর্যজনক পরিবর্তন সংঘটিত হবে, যেগুলো আমাদের জানাও নেই, আর সেগুলোর কল্পনাও আমরা করতে পারি না। যে ভীতিপ্রদ বর্ণনা সূরাটিতে পেশ করা হয়েছে তাও এর গাম্ভির্য অনুধাবনে সহায়ক হয়েছে। সূরাটি ছোট্ট

www.pathagar.com

হলেও এর বর্ণনাভংগির বৈচিত্র, শব্দগুলোর চমৎকার মিল, ভাবমূর্তি প্রকাশের স্বচ্ছতা, সবকিছু মিলে একে করেছে অনবদ্য। ফলে অর্থ বুঝে মনোযোগ সহকারে সূরাটি পড়লে মনের গভীরে দাগ কাটে এবং সে চিহ্ন দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকে।

এমন কিছু অপরিচিত শব্দ সূরাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে যা বর্তমান যমানার পড়ুয়াদের বোধগম্যের বাইরে। তেমন অবস্থা না হলে আমি এর ওপর কোনো মন্তব্যই করতাম না, কিন্তু আমি অনুভব করেছি, এর মধ্যে এমন কিছু জটিল ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, কিছু তথ্য ও দৃশ্যের বিবরণ এসেছে, যা মানুষের ভাষায় কখনো প্রকাশিত হতে পারে না, যদিও তা হৃদয়পটে একটা গভীর রেখাপাত করে ও মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। মানুষের ভাষা সেই তথ্যগুলো পেশ করতে সক্ষম না হলেও মানুষের স্রষ্টা সেগুলো পেশ করতে এবং সেগুলোর তাৎপর্য সার্থক ও ক্রিয়াশীলভাবে তুলে ধরতে সম্পূর্ণ সক্ষম। আমাদের এ যমানায় কোরআন বুঝার জন্যে যে গুরুত্ব দিয়ে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, তা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছি। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্যের সব থেকে বড়ো কারণ।

এরশাদ হচ্ছে, 'সূর্যকে যখন জ্যোতিহীন করে দেয়া হবে, তারাগুলো যখন আলোহীন হয়ে ম্লান হয়ে যাবে ....তখন মানুষ জানবে কোন জিনিস নিয়ে সে হাযির হয়েছে।' (আয়াত-১-১৪)

এটাই হচ্ছে সেই সর্বগ্রাসী বিপর্যয়, যা পৃথিবীর সবকিছু নিমেষে গ্রাস করে ফেলবে। এ হবে এমন এক বিপর্যয়, যা থেকে কোনো কিছু রেহাই পাবে না।' আকাশ ও পৃথিবীর সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ বস্তু থেকে নিয়ে হিংস্র প্রাণী, গৃহপালিত পশু এবং সকল মানুষ স্থানচ্যুত হয়ে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। সেদিন সকল অপ্রকাশিত জিনিস প্রকাশিত হবে এবং সকল অজানা তথ্য বেরিয়ে পড়বে।

সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামনে ওই সকল কাজ, কথা ও ব্যবহার দেখতে পাবে, যা সে পরকালের পাথেয় হিসেবে জমা করে রেখেছে। সেদিন চতুর্দিকের সবকিছু বিপর্যস্ত অবস্থায় থাকবে এবং কোনো কিছুই তার আসল অবস্থায় টিকে থাকতে পারবে না। এ সূরাতে বর্ণিত সেদিনকার সেই সর্বগ্রাসী বিপর্যয় এই ইংগিত বহন করছে যে, যখন আসবে সেই ভয়ংকর দিন, তখন বর্তমানের আকাশ, পৃথিবী ও সকল প্রাণীর মধ্যে আজ যে শৃংখলা বিরাজ করছে, পারস্পরিক সম্পর্কের যে ভারসাম্য বিরাজ করছে– যা পরম দয়াময় আল্লাহ তায়ালার সতর্ক ও শৃংখলা বিধানকারীর সৃষ্টি মাঝে, সবকিছুই সেই মহা প্রলয়ের দিনে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। কোনো নিয়ম শৃংখলা থাকবে না। বস্তুসমূহের মধ্যে আজকের বিরাজমান সম্পর্ক সব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেদিন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে যা পূর্ব থেকেই স্থিরীকৃত। আসবে নতুন জীবন ও জগত, যা হবে আজকের জীবন ও জগত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এ সূরার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের অন্তরে অবশ্যম্ভাবী ওই মহাপ্রলয়ের অনুভূতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, যাতে করে তারা পার্থিব জীবন ও তার সুখ সম্পদের প্রতি অধিক গুরুত্ব না দেয়। এই সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে তার তাৎপর্য একমাত্র আল্লাহ

www.pathagar.com

তায়ালাই জানেন। কেয়ামতের ঘটনা হচ্ছে সেই মহা সত্য, যা আমাদের চিন্তা ভাবনা, বুঝ ও জ্ঞানের অনেক উর্ধ্বের জিনিস। এ নিয়ে যতো চিন্তাই আমরা করি না কেন, তা সম্যক উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে আমরা যতো প্রকার ঝড় তুফান ও ভূমিকম্প দেখি বা কল্পনা করি, তার থেকে অনেক অনেক বেশী ভয়ংকর সে অবস্থা। ভীষণ আগ্নেয়গিরি যা শত সহস্র জনপদ ধ্বংস করে দেয়, সমুদ্রের উচ্ছাস যা শহর, নগর, বন্দরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, এসব কিছু থেকেও কেয়ামতের দৃশ্য আরো অনেক বেশী ভয়ংকর। বোমা ফাটার শব্দ, বাজ পড়ার কর্ণবিদারক ধ্বনি এবং ওই ধরনের যতো কিছুর কল্পনা আমরা করি না কেন, কোনোটি দ্বারাই আমরা কেয়ামতের সঠিক অবস্থা বুঝতে পারি না। এমনকি পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত সূর্যের মধ্যে যে বিস্ফোরণ ঘটার অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি, তা বর্তমান অবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়ানক হলেও কেয়ামতের দিন যা সংঘটিত হবে তার তুলনায় এগুলো অতি তুচ্ছ এবং অনেকটা ছেলেখেলার মতো

প্রকৃতপক্ষেই যদি কেউ কেয়ামতের ভয়ংকর অবস্থা বুঝতে চায়, তাহলে যতো প্রলয় এ পর্যন্ত বিশ্বের বুকে ঘটেছে, সেগুলো যদি সে একত্র করতে পারে তাহলে কিছুটা হয়তো এর আন্দায করা যাবে।

সূরা আল এনফেতার

এই সূরাটিতে পূর্ববর্তী সূরা আত্-তাকওয়ীরে আলোচিত একই মহাজাগতিক বিপ্লব সম্পর্কিত আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। তবে এ সূরাটি নিজের এক ভিন্নতর বলয় সৃষ্টি করে একটা সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দান করে, স্বতন্ত্র কতোগুলো পরিমন্ডলের দিকে আসল বক্তব্যকে কেন্দ্রীভূত করে এবং তার অভ্যন্তরেই মানব হৃদয়কে আবর্তিত করে। এ সূরা মানুষের চেতনায় পূর্ববর্তী সূরা থেকে ভিন্নতর প্রকৃতির এক পরশ বুলায়, এটা অত্যন্ত গভীর, শান্ত ও মৃদু। সেই পরশ কিছুটা ভর্ৎসনা ধরনের, আবার পরোক্ষভাবে কিছুটা হুমকি এবং হুশিয়ারীও তার ভেতরে বিদ্যমান।

এজন্য সূরাটিতে সেই বিপ্লবের বিভিন্ন দৃশ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। তবে সূরা তাকওয়ীরের ন্যায় এ বিষয়টি এখানে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়নি। কেননা, ভর্ৎসনার পরিবেশ পরিমন্ডল এখানে অপেক্ষাকৃত মৃদু ও গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং তার প্রভাব বিস্তারের গতিও অপেক্ষাকৃত শ্লথ। সূরার সুর ব্যঞ্জনার প্রভাবও এখানে তদ্রূপ। সুতরাং বলা যায়, মৃদু ভর্ৎসনাই এ সূরার মূল ভাবধারা। কাজেই সূরার সামগ্রিক কাঠামোর সাথে এ বৈশিষ্টটির পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সাযুজ্য রয়েছে।

সূরাটির প্রথম প্যারায় আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, নক্ষত্রমন্ডলীর বিক্ষিপ্ত হয়ে ঝরে পড়া, সমুদ্রের উদ্বেলিত আলোড়িত হওয়া এবং কবর উন্মোচিত হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে। এগুলোকে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেন তা সংঘটিত এবং প্রত্যেক জীব আগে ও পরে কী পাঠিয়েছে, তা সে অবহিত হবেই। এগুলো সবই যেন সেই ভয়াল সময়ের দৃশ্যমান পার্শ্বচিত্র।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্যারায় প্রচ্ছন্ন হুমকি মিশ্রিত ভর্ৎসনার সূচনা করা হয়েছে। যে মানুষ আপন ব্যক্তিসত্তা ও দেহ কাঠামোতে নিরন্তর স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অগণিত অনুগ্রহ লাভ করে থাকে, অথচ সেই অনুগ্রহের যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয় না এবং যে আপন প্রতিপালকের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত নয়, আর তার দেয়া সম্মান, মর্যাদা ও অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞও নয়, সে সব অকৃতজ্ঞ মানুষের প্রতিই এ ভর্ৎসনা উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে, 'হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করলো? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুঠাম করেছেন, সুসমঞ্জস করেছেন, তিনি যেমন চেয়েছেন তেমন আকৃতিতেই তোমাকে গঠন করেছেন।'

তৃতীয় প্যারায় এই অস্বীকৃতি ও অবিশ্বাসের কারণ নির্ণয় করা হয়েছে। সে কারণটি হলো, কর্মফল দিবস তথা হিসাব নিকাশের দিনকে অস্বীকার করা। হিসাব নিকাশের দিনের এ অস্বীকার ও অবিশ্বাস থেকেই সকল ধরনের অপকর্মের উৎপত্তি হয়। এ কারণেই এ হিসাব-নিকাশের কথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে। সেই সাথে এ হিসাব-নিকাশের অবধারিত ফলাফল সম্পর্কেও সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত বিশ্বাস জন্মানো হয়েছে। বলা হয়েছে, না, 'কখনো না, তোমরা তো কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে থাকো। নিসন্দেহে তোমাদের ওপর প্রহরীর মতো নিয়োজিত রয়েছেন সম্মানিত লেখকরা। তোমরা যা করো তা তারা জানে।'

সর্বশেষ প্যারাটিতে হিসাব-নিকাশের দিনটির ভয়াবহতা ও বিশালতা সম্পর্কে এবং সেদিন যে মানুষের কোনো শক্তি-সামর্থ থাকবে না সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। সেদিন একমাত্র আল্লাহই হবেন সর্বময় কর্তা। বলা হয়েছে, 'তুমি জানো বিচার দিবস সম্পর্কে? আবার বলছি, তুমি কি জানো বিচার দিবস সম্পর্কে? সেদিন কোনো প্রাণীরই কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকবে না। সকল ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহর!'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গোটা আমপারায় মানব মনকে বিবিধ পন্থায় ও উপায়ে প্রভাবিত করার এবং তাতে করাঘাত করার যে ধারা প্রবহমান রয়েছে, আলোচ্য সূরাটি সামগ্রিকভাবে সে ধারারই একটি অংশ।

সূরা আল মোতাফফেফীন

এ সূরাটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে জাগরণ ও চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টি করা। ওহীর মাধ্যমে আকাশ থেকে নাযিল হওয়া ইসলামী দাওয়াত বিশ্ববাসী ও আরববাসীর জীবনে যে অভিনব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলো, সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ সূরায় সাধারণভাবে তার পূর্ণাংগ জীবনদর্শন আলোচিত আলোচনা করে। তবে এর পাশাপাশি এতে ইসলামী আন্দোলনের সামনে আবির্ভূত মক্কার জনজীবনের একটি বাস্তব সমস্যাও আলোচিত হয়েছে।

সূরার শুরুতেই মক্কার সমাজ জীবনের এ বাস্তব সমস্যার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে মাপে কমবেশী করা লোকদের কেয়ামতের দিনে ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দেয়া হয়েছে। সূরার শেষেও এ ধরনের অন্য একটি সামাজিক আচরণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

এটি হচ্ছে অপরাধপ্রবণ কাফেরদের পক্ষ থেকে মোমেনদের সাথে বেয়াদবী, অসদাচরণ, চোখ টিপে খারাপ ইংগিত করা বা কটাক্ষ করা, হাসিঠাট্টা ও বিদ্রূপ করা এবং তাদের 'গোমরাহ' বা বিপথগামী বলে আখ্যায়িত করা। পুণ্যবান ও পাপিষ্ঠ এ দুই শ্রেণীর মানুষের অবস্থা বর্ণনা এবং কেয়ামতের দিন উভয় শ্রেণীর পরিণতি বিশ্লেষণ করাও এ সূরার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সূরাটি মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু হয়েছে মাপে কম দেয়া লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মধ্য দিয়ে। বলা হয়েছে, 'যারা (মাপে) কমবেশী করে তাদের জন্যে অত্যন্ত শোচনীয় পরিণতি! যারা কারো কাছ থেকে কিছু মেপে আনলে ঠিকমতো আনে আর মেপে বা ওযন করে কাউকে কিছু দিলে কম দেয়। তারা কি মনে করে না, এক ভয়াবহ দিনে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে, যেদিন মানব জাতি বিশ্বপ্রভুর সামনে দাঁড়াবে।'

সূরার দ্বিতীয় অংশটিতে পাপীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাদেরকে চরম খারাপ পরিণতি ও ধ্বংসের কঠোর হুমকি দিয়ে শাসানো হয়েছে। তাদের অপরাধ ও পাপ কাজ চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। এই অন্ধত্বের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, আর কেয়ামতের দিন তাদের কি প্রতিদান দেয়া হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর কাছ থেকে তাদের ঠিক সেভাবে লুকিয়ে রাখা হবে, যেভাবে পৃথিবীতে তার পাপ তার হৃদয়কে আবদ্ধ করে রেখেছিল– এ কথাও এতে আলোচিত হয়েছে। সেই সাথে কাফেরদের জন্য 'জাহীম' বা জাহান্নামকে চিহ্নিত করা হয়েছে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননার প্রতীক হিসাবে।

বলা হয়েছে, 'কখনো নয়, পাপীদের পুস্তক থাকবে সিজ্জীনে। সিজ্জীন কি তুমি তা জানো? (তা এক) লিখিত গ্রন্থ। সেদিন অস্বীকারকারীদের জন্যে থাকবে .... তারপর তারা জাহান্নামে ঢুকবে। তারপর তাদের বলা হবে যে, তোমরা যে জিনিসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে, এই তো সে জিনিস।' (আয়াত ৭-১৭)

সূরার তৃতীয় অংশে ঠিক এর বিপরীত পুণ্যবান ও সৎকর্মশীলদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আছে তাদের উচ্চতর মর্যাদা ও সুখশান্তিতে পরিপূর্ণ পরকালীন জীবনের বর্ণনা। বলা হয়েছে, তাদের চেহারা থাকবে সতেজ, উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল। বালিশে হেলান দিয়ে তারা পরম সুখে 'রাহীক' তথা সুস্বাদু পানীয় পান করবে। এ অংশটি এক উজ্জ্বল ও প্রাচুর্যময় অংশ। 'শুনে রাখো, পুণ্যবান লোকেরা থাকবে ইল্লিয়্যীনে'। ইল্লিয়্যীন কি তা তুমি জানো? তা এক......বস্তুত এ জিনিসের জন্যই বুদ্ধিমানদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।' (আয়াত ১৮-২৬)

আর শেষাংশে বর্ণনা করা হয়েছে সৎকর্মশীলরা মিথ্যা অহংকারে লিপ্ত পাপীদের পক্ষ থেকে গালাগালি, উপহাস ও বেয়াদবীজনিত যে সকল পরিস্থিতির সম্মুখীণ হতো সে সম্পর্কে। অতপর উভয় শ্রেণী বাস্তবে কি পরিণাম ভোগ করবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই অপাধীরা মোমেনদের উপহাস করতো। তাদের কাছে দিয়ে যাবার সময় তাদের কটাক্ষ করতো, আর আপন পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে

www.pathagar.com

এজন্যে তৃপ্তি অনুভব করতো। মোমেনদের দেখে বলতো, এরা বিভ্রান্ত। অথচ তাদের মোমেনদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে পাঠানো হয়নি। আজ মোমেনরা কাফেরদের উপহাস করবে এবং বালিশে হেলান দিয়ে থাকবে। কাফেররা কি তাদের কৃতকর্মের ফল ছাড়া আর কিছু ভোগ করবে?'

সামগ্রিকভাবে এ সূরা মক্কার দাওয়াতী পরিবেশের একটি দিক তুলে ধরেছে। অপরদিকে সে পরিবেশে বিরাজমান অবস্থার মোকাবেলায় দাওয়াতের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিলো তারও একটা দিক এখানে তুলে ধরা হয়েছে। মানবীয় মন এবং মনস্তত্ত্বের একটা দিকও এখানে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

সূরা আল এনশেকাক্ব

সূরা তাকওয়ীর ও সূরা এনফেতারে এবং তারও পূর্বে সূরা নাবায় যে প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক বিপর্যয়ের বিবরণ দেয়া হয়েছে, এ সূরাও সে ধরনের কিছু বিপর্যয়ের বিবরণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। তবে এখানে এ সূরার বিবরণের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেটি হচ্ছে আল্লাহর সামনে আকাশ ও পৃথিবীর পরিপূর্ণ বিনয়, আনুগত্য ও বশ্যতা সহকারে আত্মসমর্পণ করা। যেমন বলা হচ্ছে, 'আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, নিজ প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হবে এবং এটিই তার কর্তব্য, আর পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা কিছু আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও সে শূন্যগর্ভা হয়ে যাবে। সে তার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হবে এবং এটিই তার করণীয়।'

উপরোক্ত বিনয় বিধৃত ও গুরুগম্ভীর প্রাথমিক অংশটি 'মানুষ'কে সম্বোধন করা, তার মনে তার প্রভুর প্রতি বিনয় ও আনুগত্য জাগ্রত করা, প্রতিপালকের নির্দেশ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং আল্লাহর কাছে তার প্রত্যাবর্তনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে অনুভূতিতে যখন পরম আনুগত্য, বিনয় ও আত্মসমর্পণের প্রেরণা সৃষ্টি করে, তখন তার মনে একই সাথে আল্লাহর কাছে তার অনিবার্য প্রত্যাবর্তনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

অতপর শুরু হয় মানুষকে সম্বোধন, 'হে মানুষ, তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত ...... কারণ তার প্রতিপালক তার ওপর সবিশেষে দৃষ্টি রাখেন।' (আয়াত-৬-১৫)

আর তৃতীয় অংশটিতে এমন কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, যা মানুষের অবচেতন মনে এমনিই সংঘটিত হয়ে থাকে। সে সব দৃশ্যের কিছু আভাস-ইংগিত মানুষ পেয়ে থাকে এবং তার এমন কিছু আলামত বা লক্ষণও থাকে যা সুপরিকল্পিত ও অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে। সেই সাথে এমন কিছু শপথবাক্যও উচ্চারিত হয়েছে, যা দ্বারা প্রতিভাত হয়, কিছু অদৃশ্য নিয়ন্ত্রিত, আল্লাহর পরিকল্পনাসিদ্ধ পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে মানুষের বিবর্তন ঘটে। সেইসব পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা বা তা থেকে অব্যাহতি লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

www.pathagar.com

'শপথ, প্রভাতকালের, শপথ, রাতের এবং রাত যেসব জিনিসকে আচ্ছন্ন করে তার, আরো শপথ, চাঁদের যখন তা পূর্ণ চাঁদে পরিণত হয়, নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করবে।' (আয়াত-১৬-১৯)

এরপর আসছে সূরার শেষাংশ। এতে যারা ঈমান আনে না তাদের সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী দুই অংশে তাদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। আর প্রথমাংশে দেখানো হয়েছে তাদের পরিণতি ও বিশ্বনিখিলের পরিসমাপ্তির দৃশ্য। আর এ বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে, 'তাদের কী হয়েছে যে, ঈমান আনে না এবং তাদের সামনে কোরআন পড়া হলে তারা সাজদা করে না?' সর্বশেষে তাদের সে সব অনিবার্য আপদ মসিবতের কথা বলা হয়েছে, যা কেবল আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তাদের অবধারিত পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যথা, 'বরং কাফেররা অবিশ্বাস করছে, অথচ ....সৎকর্মশীলরা এর ব্যতিক্রম। তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত শুভ প্রতিদান।' (আয়াত-২২-২৫)

সূরা আল এনশেকাক এমন একটি শান্ত ও নিরুত্তাপ সূরা, যার প্রভাব হৃদয়ে খুব সুক্ষভাবে বদ্ধমূল হয়, যার ইংগিত ও নির্দেশনা গুরুগম্ভীর এবং তার এ বৈশিষ্ট্য এমনকি সেই সর্বব্যাপী মহাজাগতিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দৃশ্যাবলীতেও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, যা সূরা আত তাকওয়ীরে একটা উত্তাল পরিবেশে পরিবেশিত হয়েছিলো। দরদমাখা ও স্নেহময় ভংগিতে মানুষকে তত্ত্বজ্ঞান দান করাই এ সূরার মূল সুর। ধীর পদক্ষেপে পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় ও গভীর বুদ্ধিমত্তা সহকারে হৃদয়ংগম করানোই এ সূরার বাচনভংগির বৈশিষ্ট্য। আর 'হে মানুষ' বলে যে সম্বোধন এখানে করা হয়েছে, তাতে ধ্বনিত রয়েছে স্মরণ করানো ও বিবেককে জাগানোর সুর।

সূরাটি তার অংশগুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানসিক বিষয় আলোচনা করে এবং এভাবেই তা মানুষের হৃদয়কে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। সুপরিকল্পিতভাবে সে বার বার এ আবর্তন প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে থাকে। তা সৃষ্টিকুলের আত্মসমর্পণের দৃশ্য থেকে শুরু করে মানুষের মনের অনুভূতি হিসাব-নিকাশ ও কর্মফলের দৃশ্য, প্রকৃতির চলমান অবস্থা ও তার বিভিন্ন দিক পর্যন্ত পরিবেষ্টিত। অতপর এক সময় তা মানুষের মানসিক অনুভূতি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ সব কিছুর পর যারা ঈমান আনে না তাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক আযাবের হুমকি দান ও শাসানো থেথে এবং মোমেনদের অপরিমেয় প্রতিদান সহকারে আযাব থেকে অব্যাহতি দানের সুসংবাদ দান পর্যন্ত এ আবর্তন চলতে থাকে।

এতোসব আবর্তন, দৃশ্যসমূহের পট পরিবর্তন, চেতনার মর্মমূলে সম্বিত জাগিয়ে তোলা ও চিন্তার জগতে সাড়া জাগানোসহ এসব কিছু বর্ণনা এমন একটি ক্ষুদ্র সূরায় চলতে থাকে, যা মাত্র কতিপয় ছত্রেই সমাপ্ত হয়ে যায়। এটা একমাত্র এই বিস্ময়কর গ্রন্থ ছাড়া আর কোথাও কল্পনা করা যায় না। বস্তুত অনেক বড় ও বিস্তৃত আলোচনায় এতোগুলো কথা, এতোগুলো লক্ষ্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয় এবং তাতে এতো বলিষ্ঠতা এবং প্রভাবও সৃষ্টি হয় না। তবে কোরআনের কথা আলাদা। এ কেতাব যে কোনো প্রসংগই সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করে এবং মানুষের মনকে প্রত্যক্ষভাবে খুবই কাছ থেকে সম্বোধন করে। এটা মহাজ্ঞানী ও সবজান্তা আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

সূরা আল বুরূজ

এ ক্ষুদ্র সূরাটি ইসলামী আকীদার তত্ত্ব ও ঈমানী চিন্তাধারার ভিত্তিসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে তুলে ধরেছে। এগুলোর চারদিকে সুদূরপ্রসারী প্রখর জ্যোতি বিকীর্ণ হয়। সে জ্যোতি ঠিকরে পড়ে আয়াতের প্রত্যক্ষ মর্ম ও তত্ত্বের ওপর, এতে প্রতিটি আয়াত, এমন কি কখনো কখনো প্রতিটি শব্দ বিশাল বিশ্বজগতের তত্ত্ব ও তথ্য অনুসন্ধানের জন্যে নিত্য নতুন জানালা খুলে দিতে সক্ষম হয়।

যে বিষয়টি এ সূরায় প্রত্যক্ষভাবে আলোচিত হয়েছে, তা হচ্ছে 'আসহাবুল উখদুদের' ঘটনা। ঘটনাটি হচ্ছে, প্রাচীনকালে ইসলাম গ্রহণকারী একদল মোমেন তাদের শত্রু, এক আল্লাহদ্রোহী দুর্বৃগোষ্ঠীর হাতে নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। কথিত আছে, মোমেনদের এ দলটি হযরত ইসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের মধ্যে যারা খালেস তাওহীদপন্থী ছিলেন তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নির্যাতনকারী আল্লাহদ্রোহী গোষ্ঠীটি যুলুম নিপীড়নের মাধ্যমে তাদের তাদের তাওহীদী আকীদা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে সাবেক শেরেকী আকীদা বিশ্বাসের দিকে ফিরে আসার জন্যে চাপ দিচ্ছিলো, কিন্তু তারা সব কিছু উপেক্ষা করে, তাদের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের আকীদা বিশ্বাসে অটল থাকেন। আল্লাহদ্রোহী গোষ্ঠীটি তখন তাদের জন্যে মাটিতে একটা গর্ত খোঁড়ে এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে মোমেনদের সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মেরে ফেলে।

এই পাশবিক পন্থায় মোমেনদের হত্যার ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্যে ইসলামের শত্রুরা বিপুল সংখ্যক জনতাকে সমবেত করে। সেই জনতার চোখের সামনেই এ লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে! আল্লাহদ্রোহী গোষ্ঠীটি মোমেনদের পুড়িয়ে মারার এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে নারকীয় উল্লাসে মেতে উঠতে চেয়েছিলো।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'চির প্রশংসিত মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর ওপর মোমেনরা কেন ঈমান আনলো তাদের কাছ থেকে অত্যাচারীরা শুধুমাত্র তারই প্রতিশোধ নিয়েছিলো।'

সূরাটি শুরু হয়েছে কয়েকটি শপথ বাক্যের মাধ্যমে। 'বুরুজ সম্বলিত আকাশের শপথ, প্রতিশ্রুত দিবসের শপথ, দর্শকের শপথ এবং যা কিছু পরিদৃষ্ট হয় তার শপথ, গর্তের মালিকরা ধ্বংস হয়ে গেছে।' এখানে আকাশ ও তার বিস্ময়কর বুরুজসমূহের মধ্যে, প্রতিশ্রুত দিবস ও তার অসাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে এ ঘটনা প্রত্যক্ষকারী সমবেত জনতা ও পরিদৃষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। আবার এ সবগুলো আলোচ্য ঘটনার সাথে এবং অগ্নিকুন্ড সৃষ্টিকারী আল্লাহদ্রোহী চক্রের ওপর আল্লাহ তায়ালার প্রতিশোধ গ্রহণের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

এরপর এমন আকস্মিকভাবে সে হৃদয়বিদারক ঘটনাটি তুলে ধরা হয়েছে, যাতে কোনো দীর্ঘ ও বিশদ বিবরণ ছাড়াই আবেগ অনুভূতিতে ঘটনার পৈশাচিক ও বীভৎস রূপটি প্রতিভাত হয়। এখানে আনুষংগিকভাবে এ ধারণাও দেয়া হয়েছে যে, মানুষের

www.pathagar.com

যুলুম-নিপীড়ন যতো কঠিন ও লোমহর্ষকই হোক না কেন, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের স্থান তার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। এ আকীদা ও আদর্শ আগুনের ওপর বিজয়ী হয়, এমনকি স্বয়ং মানুষের জীবনের ওপরও তা প্রাধান্য বিস্তার করে।

সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত এ আদর্শ, যা সর্বকালের সকল প্রজন্মের মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের উৎস। এখানে এ মর্মেও ইংগিত রয়েছে যে, এ হত্যাকান্ডটি কতো মর্মান্তিক ও পৈশাচিক, আর এর পেছনে কতো নীচতা, হীনতা, শঠতা এবং আগ্রাসী ও বিদ্রোহাত্মক মানসিকতা কার্যকর রয়েছে। এর পাশাপাশি মোমেনদের মধ্যে কত নিষ্পাপ মানসিকতা, কতো পবিত্রতা এবং কতো মহত্ত্ব বিরাজমান ছিলো। অভিশাপ তাদের ওপর যারা অগ্নিকুন্ডের পাশে বসে ছিলো, আর তারা মোমেনদের সাথে কি আচরণ করছিলো তা দেখছিলো।'

এরপরই এক এক করে আসছে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ও পর্যালোচনা। ইসলামী দাওয়াত, ইসলামী আকীদা ও মৌলিক ঈমানী চিন্তাধারার সাথে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। পরবর্তী সংক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলোতে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পরের আয়াতে এ মর্মে ইংগিত করা হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর ওপর আল্লাহর সার্বভৌম ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব বিরাজমান। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তাতে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি উপস্থিত থাকেন ও তা প্রত্যক্ষ করেন। 'যার রাজত্ব বিরাজিত আকাশ ও পৃথিবীতে এবং আল্লাহ তায়ালা সব কিছুরই প্রত্যক্ষদর্শী।'

পরবর্তী আয়াতে জাহান্নামের সেই আযাব এবং সেই দহনযন্ত্রনার উল্লেখ করা হয়েছে, যা সীমা লংঘণকারী পাপিষ্ঠ বর্বর লোকদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তার পাশাপাশি বেহেশতের নেয়ামতের বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং তা পাওয়া বিরাট সাফল্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

আদর্শকে নিজের জীবনের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে আগুন ও আগুনে দগ্ধীভূত হওয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মোমেনদের জন্যেই সেই নেয়ামত নির্দিষ্ট রয়েছে।

'নিশ্চয়ই যারা মোমেন নারী ও পুরুষদের ওপর অত্যাচার করেছে এবং তারপর তাওবা করেনি, তাদের জন্যে জাহান্নামের আযাব ও দহন-যন্ত্রণা নির্দিষ্ট রয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে বেহেশত– যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত, আর তাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য।'

সূরাটিতে আল্লাহর কঠোর পাকড়াও সম্পর্কেও হুশিয়ার করা হয়েছে, 'যিনি প্রথম সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টির পুনরাবৃত্তিও তিনিই করেন।'

বস্তুত এটি এমন এক সত্য, যা আলোচ্য ঘটনার ওপর সুদূরপ্রসারী আলোকপাত করে। এরপর আল্লাহর বিভিন্ন গুণ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যার প্রত্যেকটি গুণই সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য বহন করে।

'তিনি ক্ষমাশীল ও স্নেহময়', অপরাধী যতো নৃশংস অপরাধই করুক না কেন, তাওবা করলে তিনি তা ক্ষমা করে দেন, আর তাঁর যে বান্দা তাঁকে অন্য সব কিছুর

www.pathagar.com

ঊর্ধ্বে স্থান দেয় তাদের জন্যে তিনি হলেন স্নেহময়। 'স্নেহ' এখানে আল্লাহর নির্যাতিত বান্দাদের মনের ক্ষত সারানোর ওষুধ তথা প্রবোধ বাক্য।

'তিনি মহান আরশের অধিপতি, যা ইচ্ছা করেন তাই সম্পাদন করেন।'

এ গুণগুলো আল্লাহর নিরংকুশ কর্তৃত্ব, নিরংকুশ ক্ষমতা ও সর্বাত্মক ইচ্ছাশক্তির প্রতীক। এগুলো সবই ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত। এগুলোও ঘটনার ওপর সুদূরপ্রসারী আলোকপাত করে।

এরপর অতি দ্রুতগতিতে আল্লাহদ্রোহী শক্তিসমূহের অতীত কর্মকান্ডের প্রসংগ এসেছে। এ সব আল্লাহদ্রোহী শক্তি যাবতীয় অস্ত্র ও সরঞ্জামে সুসজ্জিত ছিলো।

'তোমার কাছে কি ফেরাউন ও সামুদ এ দুটি বাহিনীর খবর এসেছে?'

বস্তুত এ দুটি শক্তির পতন ও ধ্বংসের ঘটনা আপন আপন প্রকৃতি এবং ফলাফলের দিক থেকে বিভিন্নতার দাবী রাখে। 'উখদুদ' বা পরিখার ঘটনার পাশাপাশি এ ঘটনাও তাৎপর্যমন্ডিত। সর্বশেষে কাফেরদের বর্তমান অবস্থা ও পরিণতি এবং তাদের অজ্ঞাতসারেই যে আল্লাহ তায়ালা তাদের ঘেরাও করে রেখেছেন সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'বরং কাফেররা অস্বীকার করার নীতিতেই অবিচল রয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের আড়াল থেকে ঘেরাও করে ফেলবেন।'

আল কোরআনের সত্যতা, তার মূল ভাষ্য ও তার শাখা প্রশাখার স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। 'বরং এটি হচ্ছে মহান কোরআন, লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত।' এর অর্থ দাঁড়ালো, কোরআন যে সিদ্ধান্ত দেয় সেটাই সর্ববিষয়ে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ সিদ্ধান্ত।

সূরা আত্ তারেক

আমপারার ভূমিকায় আমি বলেছি যে, এ পারার সূরাগুলো মানুষের অনুভূতিতে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে। খুবই জোরদার আঘাত করে এবং সংজ্ঞালুপ্ত ঘুমন্তদের কানে জাগরণের আওয়ায তোলে। এভাবে একই ধরনের চেতনা ও একই ধরনের সম্বিত ফেরানোর উদ্দেশে ক্রমাগত আঘাত ও আওয়ায করতে থাকে। সে বলে, 'জাগো, ওঠো, দেখো, নযর বুলাও, চিন্তা-ভাবনা করো, বিচার-বিবেচনা করো; একজন ইলাহ রয়েছেন, তাঁর একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন রয়েছে, একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা রয়েছে, এক ধরনের পরীক্ষা রয়েছে, সব কিছুরই হিসাব নিকাশ ও জবাবদিহির এবং কঠিন শাস্তি ও পরম শান্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি সুস্পষ্ট নমুনা এ সূরায় লক্ষণীয়। এর ছন্দায়িত বাচনভংগিতে যে বলিষ্ঠতা ও তেজস্বিতা বিদ্যমান তাতে এ সূরার দৃশ্যসমূহ, এর বিশেষ ধরনের সুরেলা ছন্দ, এর শব্দের ঝংকার ও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রেরণাদায়ী সংকেত সব কিছুরই কিছু কিছু অবদান রয়েছে।

সূরার অংকিত দৃশ্যপটে রয়েছে 'তারেক' (রাতে আত্মপ্রকাশকারী জ্যোতিষ্ক), 'সাকেব' (উজ্জ্বল), দাফেক (সবেগে স্খলিত), 'রাজ্বয়ে', (বার বার সংঘটিত বৃষ্টি),

www.pathagar.com

সাদয়ে (বিদারণ)। আর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক প্রাণীর ওপর প্রহরা নিযুক্ত রয়েছে এ আশ্বাসবাণী। যথা, 'প্রত্যেক প্রাণীর ওপর রয়েছে প্রহরী।'

কোনো শক্তি ও সাহায্যকারী নেই– এ মর্মে হুশিয়ারী রয়েছে, 'যেদিন গোপন তত্ত্ব প্রকাশ হবে সেদিন মানুষের কোনো শক্তিও থাকবে না, সাহায্যকারীও থাকবে না।'

কঠোর ও গুরুগম্ভীর বক্তব্য রয়েছে, 'নিশ্চয়ই এ কেতাব চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী বাণী এবং তা নিরর্থক বাণী নয়।' এ বাণীর ভেতরে রয়েছে সম চরিত্রের হুমকি ও শাসানি। 'তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আমিও তাদের সেই ষড় যন্ত্রের মোকাবেলায় কৌশল অবলম্বন করি। অতএব কাফেরদের অবকাশ দাও, অবকাশ দাও কিছু কালের জন্যে।'

সূরাটির বিষয়বস্তু আমপারার অন্যান্য সূরার বিষয়বস্তুর মতোই, যা পারার শুরুতে আমি উল্লেখ করেছি। পারাটির মূল বক্তব্য হচ্ছে, 'একজন ইলাহ রয়েছেন, একটি অদৃশ্য প্রশাসন এখানে সার্বক্ষণিকভাবে চালু রয়েছে, এখানে পরিকল্পনা রয়েছে, পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, পরিণাম রয়েছে, জবাবদিহি ও কর্মফল রয়েছে, ইত্যাদি।'

সূরায় বর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও বাস্তব তথ্যসমূহের চমকপ্রদ ভাষ্যের সাথে এ সূরাটি মিলিয়ে পড়লে ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সূরা আল আ'লা

হযরত আলী (রা.) থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, এ সূরাটি ছিলো রসূল (স.)-এর খুব প্রিয়। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, তিনি দুই ঈদ ও জুময়ার নামায সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া দিয়ে পড়তেন। কখনো কখনো ঈদ ও জুময়া একই দিনে অনুষ্ঠিত হতো এবং তিনি সে ক্ষেত্রে উভয় নামায এ দুই সূরা দিয়ে পড়তেন।

যেহেতু এ সূরাটি সমগ্র বিশ্বজগতকে এবাদাতের স্থান হিসাবে চিহ্নিত করে, তার সর্বত্র বিশ্বপ্রভুর তাসবীহ ও গুণগান ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয় এবং তাকে আল্লাহর প্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণার একটা স্থান হিসাবে তুলে ধরে, তাই রসূল (স.)-এর কাছে এটি প্রিয় হওয়ারই কথা।

'তোমার সর্বোচ্চ প্রভুর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করো, যিনি ....' সূরার এ সুললিত সুদীর্ঘ ছন্দোময় ভাষণ সুদূরপ্রসারী গুণগানের আবহ ছড়িয়ে দেয়।

সূরাটিতে রসূল (স.)-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর মানুষকে ইসলামের বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়া ও তা প্রচার করার দায়িত্ব অর্পণের পর তাঁকে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছেন, 'আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তখন আর তুমি ভুলবে না ....তোমার জন্য তোমার কাজ সহজ করে দেবো.......।' এভাবে আল্লাহ তায়ালা এ কোরআনের জন্য রসূল (স.)-এর মনকে সুরক্ষিত করা এবং তাঁর ঘাড় থেকে এ বিরাট দায়িত্ব সরিয়ে নেয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন, আর তাঁর সকল কাজ এবং এ দাওয়াত প্রচারের কাজ সহজ করে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। এ কারণেও এ সূরা তাঁর কাছে প্রিয় হওয়া স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

এ সূরা ঈমানী চিন্তাধারার সুদৃঢ় স্তম্ভসমূহের বিবরণ বক্ষে ধারণ করে রেখেছে। মহান স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহর একত্ব, তাঁর ওহীর সত্যায়ন এবং আখেরাতের কর্মফল প্রাপ্তির সত্যতা প্রমাণ এ সূরার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এগুলো ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের প্রাথমিক উপাদান। তারপর এ আকীদা তার সুদূরপ্রসারী ও সুপ্রাচীনকাল থেকে বিরাজমান মূলের সাথে সংযুক্ত হয়। যেমন বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই এ বক্তব্য পূর্ববর্তী কেতাবসমূহেও রয়েছে, রয়েছে ইবরাহীম ও মূসার কেতাবেও।' এ আকীদা-বিশ্বাসের যে স্বভাব প্রকৃতি এর মূল প্রচারক রসূল ও তার বহনকারী উম্মতের যে স্বভাব প্রকৃতির চিত্র সূরাটিতে তুলে ধরা হয়েছে, তা হচ্ছে তার উদারতা ও সরলতা।

এ সব কিছুই হচ্ছে সূরার মূল আলোচ্য বিষয় থেকে বিচ্ছুরিত ও তার আওতাধীন। এর বাইরে রয়েছে আরো বহু সুদূরপ্রসারী বিষয়বস্তু, যা একবার অধ্যয়ন শুরু করলেই বুঝা যাবে।

সূরা আল গাশিয়াহ

এ সূরাটি অত্যন্ত গভীর ও প্রশান্ত ভাবের উদ্দীপক কতিপয় সুললিত ছন্দায়িত বাণীর সমষ্টি, যা মানুষকে চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে, একই সাথে মনে আশা ও শংকার উদ্রেক করে এবং আখেরাতের হিসাব-নিকাশের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এ সূরা মানুষের মনকে দুটো ভয়াবহ ময়দানে নিয়ে হাযির করে। একটা হলো আখেরাত, তার বিশাল জগত এবং তার মর্মস্পর্শী দৃশ্য। অপরটি হলো, দৃশ্যমান সৃষ্টিজগতের সুবিশাল ময়দান, তার বিভিন্ন সৃষ্টির ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শন। এরপর তাকে আখেরাতের হিসাব নিকাশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। সেই সাথে আল্লাহর নিরংকুশ আধিপত্য এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার অনিবার্য বাধ্যবাধকতাও স্পষ্ট করে তুলে ধরে। এ সব তত্ত্ব ও তথ্য অত্যন্ত প্রভাবশালী, ভাবগম্ভীর ও কার্যকর ভংগিতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

'তোমার কাছে সেই আচ্ছন্নকারী মহাদুর্যোগের বার্তা পৌঁছেছে কি?' সূরাটি এরূপ ভাষায় শুরু হয়েছে এ জন্যে যে, এ দ্বারা মানুষের মনকে যেন আল্লাহর দিকে ফেরানো এবং বিশ্ব নিখিলে দৃশ্যমান তাঁর নিদর্শনসমূহ, আখেরাতে তাঁর হিসাব গ্রহণ ও সুনিশ্চিত প্রতিফল প্রদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া যায়। সূরার শুরুতে একটা জিজ্ঞাসাবোধক পদও রয়েছে। এ জিজ্ঞাসা আসলে ইতিবাচক বক্তব্য দেয়া ও তার গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর জন্যই। এ দ্বারা এ মর্মে একটি সূক্ষ্ম ইংগিতও করা হচ্ছে যে, আখেরাতের ব্যাপারে সাদামাটাভাবে ইতিবাচক বক্তব্য দেয়া ও স্মৃতিচারণ করা ইতিপূর্বে বহুবার হয়েছে। এখানে কেয়ামতের একটা নতুন নামও দেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে 'আল্ গাশিয়া'। অর্থাৎ সেই মহাবিপদ, যা মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং তার ভয়ংকর মূর্তি ও বিভীষিকাময় দৃশ্য মানুষের হৃদয় মনকে হতবুদ্ধি করে ফেলবে। আমপারায় কেয়ামতের আরো কয়েকটি নাম এসেছে। যথা 'আত্ তা'ম্মা', 'আস্ সা'খখাহ', 'আল গাশিয়া' ও 'আল কারিয়াহ'। এগুলো সবই এই পারার বিভিন্ন বক্তব্যের গতিপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

www.pathagar.com

সূরা আল ফজর

আলোচ্য সূরাটি আমপারার অন্যান্য সূরার মতোই এমন এক হৃদয়স্পর্শী সূরা, যা মানুষকে ঈমান, তাকওয়া ও প্রকৃতির সবকিছু সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার আহ্বান জানায়। শুধু তাই নয়, এ সূরার মধ্যে অন্যান্য সূরার তুলনায় আরও বিশেষ একটি দিক রয়েছে, তা হচ্ছে, এতে অত্যন্ত মনমাতানো ছন্দের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে আলোচ্য বিষয়টাকে এমনভাবে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়েছে যে, এ সুরাটি পাঠকের হৃদয়কে সৎকাজের প্রতি দারুণভাবে উৎসাহিত করে।

এখানে এমন কিছু দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে যেগুলোতে একাধারে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এবং মহাশূন্যলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যের ইংগিত পাওয়া যায়। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে হয়, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে যে একই সুরের মূর্ছনা বর্তমান, সূরাটি একটু খেয়াল করে পড়লেই তা বুঝা যায়। এরশাদ হচ্ছে– 'কসম প্রথম প্রভাতের, দশটি রাতের কসম, কসম জোড় ও বেজোড়ের, আরও কসম নিশীথ রাতের যখন এ রাত সহজ সাবলীল গতিতে অতিক্রান্ত হয়।'

আবার প্রকৃতির মধ্যে এমনও কিছু দৃশ্য ও বিভিন্ন সুরের ঝংকার পাওয়া যায়, যেগুলোর পরস্পরের মধ্যে মিল ও বেমিল দুটোই একসাথে আছে বলে মনে হয়। যেমনটি দেখা যায় পরবর্তী আলোচ্য কঠিন ভীতিকর দৃশ্যের মধ্যে। 'কখনো নয়, (এ পৃথিবী আজ যেমন আছে তেমনী থাকবে না, চিন্তা করা দরকার ওই সময়ের কথা) যখন পৃথিবীতে প্রচন্ড আলোড়ন হবে এবং উপর্যুপরি ভীষণ কম্পনে পৃথিবীর সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। সে সময় তোমার রব সবার দৃষ্টির সামনে হাযির হয়ে সবাইকে দেখা দেবেন। আরও আসবে ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে। সেদিন জাহান্নামকে কাছে এগিয়ে আনা হবে। সেই ভয়ংকর জাহান্নামের দৃশ্য দেখে মানুষ অবশ্যই কিছু শিক্ষা নিতে চাইবে। কিন্তু সেদিন কী-ইবা কাজে লাগবে তার এই ইচ্ছা! বলবে হায় আফসোস, যদি এ দিনের জন্যে আমি জীবদ্দশাতেই কিছু পাথেয় সঞ্চয় করতাম! সে দিন তার আযাব আর কেউ লাঘব করে দেবে না বা দিতে পারবে না এবং যেভাবে অপরাধীদের সেদিন তিনি বেঁধে রাখবেন, সেভাবে আর কেউ কাউকে বাঁধবে না বা বাঁধতে পারবে না।

আরও কিছু দৃশ্য থাকবে সেদিন, যা হবে যেমন মনোহর, তেমনি হবে সন্তোষজনক, আনন্দদায়ক ও প্রশান্তি আনয়নকারী। এসব দৃশ্যের মধ্যে থাকবে চোখে পড়ার মতো অবিচ্ছেদ্য এক সামঞ্জস্য যা দেখা যায় সূরাটির শেষের আয়াতগুলোতে, 'হে প্রশান্ত অন্তর, ফিরে এসো তোমার রবের কাছে সন্তুষ্ট চিত্তে, খুশীমনে। তারপর দাখিল হয়ে যাও আমার (নেককার) বান্দাদের দলে, আর দাখিল হয়ে যাও আমার জান্নাতে।'

সূরাটিতে সে ভীষণ ধ্বংসলীলার বেশি কিছু ইংগিত পাওয়া যায় যা নেমে এসেছিলো অতীতের অনেক অহংকারী জাতির ওপর। এ ধ্বংসাত্মক অবস্থা কখনও

www.pathagar.com

এসেছে মধ্যম ধরনের, আবার কখনও এসেছে অতি ভয়ংকর রূপ নিয়ে। এরশাদ হচ্ছে- 'তুমি কি দেখোনি তোমার রব আদ জাতির সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? তাদেরই এক গোত্র ছিলো ইরাম, তারা ছিলো বড় বড় স্তম্ভবিশিষ্ট দালান কোঠার অধিবাসী বিরাটকায় মানুষ। যাদের মতো শক্তিশালী ও সামর্থবান মানুষ দুনিয়ার আর কোথাও কখনও পয়দা করা হয়নি। তুমি (দেখোনি কি) সামুদ জাতিকে যারা পাথরের পাহাড় পর্বত কেটে কেটে সেই উপত্যকায় ঘরবাড়ী তৈরি করেছিলো?' আবার তাকাও ফেরাউনের দিকে, যে ছিলো বহু মযবুত খুঁটিওয়ালা তাঁবু নির্মাণকারীদের অধিপতি। ফেরাউনের এ লোকজন সারাদেশের সকল শহর বন্দরে সীমালংঘনকারী হিসেবে বিবেচিত হতো। সারা পৃথিবীর মানুষ তাদের চরম অহংকারী ও অত্যাচারী বলে জানতো। সেখানে তারা বহু বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিলো যার ফলে তোমার রব তাদের ওপর আযাবের কষাঘাত (চাবুক) বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই তোমার রব সর্বক্ষণ তাদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।'

এ সূরার মধ্যে এক বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় বেশ কিছু সংখ্যক ওইসব বে-ঈমান লোকের চিন্তা ভাবনা ও তাদের মনগড়া মতবাদের, যারা জীবনের জন্যে এক অভিন্ন মূল্যবোধ গড়ে তুলেছিলো।

এ বিবরণ দিতে গিয়ে এক বিশেষ ভঙ্গিমার অবতারণা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'মানুষের অবস্থা হচ্ছে, যখন তার রব তাকে কোনো পরীক্ষায় ফেলেন, তখন তাকে প্রচুর পরিমাণ সম্মান দেন এবং নানা প্রকার সুখ সম্পদও দান করেন, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তাকে দেয়া সুখ সম্পদ সংকুচিত করে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন।'

এরপর তাদের ওই ধ্যান-ধারণা খন্ডন করে তাদের আসল অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে যা তৎকালীন বিশ্বে বিশেষ মনগড়া মতবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিলো। এ প্রসঙ্গে এখানে দু'ধরনের বর্ণনাভংগি ও রং-রসে ভরা আলোচনার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'যা ভেবেছো তা কখনো নয়, বরং তোমরা এতীমকে কোনো মান-মর্যাদা দাও না এবং ছিন্নমূল ব্যক্তিকে খাওয়ানোর ব্যাপারে কোনো চিন্তা ভাবনা নিজেরা করো না এবং অন্য কাউকে করতে উৎসাহ দাও না। আর এতীমদের মীরাসের মাল সম্পদ তোমরা নির্দয়ভাবে ভক্ষণ করো এবং প্রতিটি সুখ-সম্পদের জিনিসকে গভীরভাবে ভালোবাসো।'

এখানে দেখা যায়, এ শেষের বর্ণনাভংগি এবং তার ছন্দের মধ্যে অবস্থিত চমৎকার সুর ঝংকার তাদের বর্তমান ভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থা ও অনাগত ভবিষ্যতে যে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন- তাদের হতে হবে- এ দুয়ের মধ্যে যেন এক সেতুবন্ধন। এরপর আসছে আর একটি ভয়ংকর দৃশ্যের বর্ণনা। সম্পদের মোহে তারা যতোই ডুবে থাকুক না কেন, কিছুতেই তা চিরদিন থাকবে না। এক সময় উপর্যুপরি আলোড়নে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে সবকিছু।

www.pathagar.com

এই উপস্থাপিত আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, গোটা সূরাই বিভিন্ন বর্ণাঢ্য বর্ণনায় ভরা এবং এ সূরা এক চমৎকার ভংগিতে অতীতের বিভিন্ন সীমালংঘনকারী জনগোষ্ঠীর শাস্তির অবস্থা তুলে ধরে ভবিষ্যতের মানুষের জন্য এক চমৎকার শিক্ষা উপস্থাপন করেছে, আর এ প্রয়োজনে একই কথা বার বার বিভিন্ন ভংগিতে তুলে ধরা হয়েছে এবং এ জন্যে গভীর অর্থব্যঞ্জক কিছু শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যার ফলে পাঠকের মনে আলোচ্য বিষয়ের মর্ম এবং বিভিন্ন দৃশ্যের প্রভাব কার্যকরভাবে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে।

সুতরাং বর্ণনা শৈলীর দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে কোরআনে বর্ণিত সূরাগুলোর এক চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসাবে গোটা কালামে পাকের মধ্যে এ সূরাটি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। সূরাটির সর্বত্রই রয়েছে অতি আকর্ষণীয় সৌন্দর্য, যা যে কোনো পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সূরা আল বালাদ

এ ছোট্ট সূরাটিতে মানব জীবনের বেশ কিছু মৌলিক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যা সূরাটির বাচনভংগির কৌশলে অত্যন্ত জোরালো ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এ ছোট্ট সূরাটিতে সে মৌলিক বিষয়গুলোর এমন চমৎকার সমাবেশ ঘটেছে যা কোরআনে কারীম ছাড়া অন্য কিছুতে সম্ভব নয়। এ অসাধারণ বর্ণনাভংগি হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলোতে অত্যন্ত গভীরভাবে সাড়া জাগায়। সূরাটি শুরু হয়েছে কঠিন শপথ বাণীর সাথে। বলা হচ্ছে, 'কসম এই মহানগরীর, যার এক সম্মানিত বাসিন্দা তুমি। কসম জন্মদাতা বাপের এবং কসম সন্তানের। অবশ্যই আমি (সর্বশক্তিমান আল্লাহ) সৃষ্টি করেছি মানুষকে কষ্টকর কাজের কর্মী হিসাবে।' মহানগরী বলতে এখানে মক্কা শরীফকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে আল্লাহর সম্মানিত ঘর বর্তমান। পৃথিবীতে মানুষের জন্য প্রথম এ ঘরটি তৈরী করা হয়েছে, যা গোটা মানবমন্ডলীর আশ্রয়স্থল এবং নিরাপত্তা বিধানকারী। এখানে এসে তারা তাদের যাবতীয় অস্ত্র সংবরণ করে, ঝগড়া-বিবাদ ভুলে যায়। ভুলে যায় শত্রুতার কথা এবং একে অপরের সাথে শান্তিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে মিলিত হয়। একজন আর এক জনের জন্য সশ্রদ্ধ ও নিবেদিত হয়। এমনি করে এ ঘর এর মধ্যে অবস্থিত গাছপালা, পাখী এবং যা কিছু আছে তা সবই নিরাপদ। তারপর আরো রয়েছে এর মধ্যে ইসমাঈল (আ.)-এর পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর ঘর। তিনি গোটা আরব এবং সকল মুসলমানের পিতা।

সূরা আশ্ শামস

এ ছোট্ট সূরার মধ্যে একটি মাত্র আলোচ্য বিষয়, একটি মাত্র সুরের ঝংকার রয়েছে। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্য থেকে বেশ কয়েকটি সুন্দর ছবি অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভংগিতে সূরাটির শুরুতে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে অন্য যে সব বিষয়ের আলোচনা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে মানব সৃষ্টির রহস্য ও তার প্রকৃতিগত শক্তিনিচয়, তার ঝোঁকপ্রবণতা, তার পছন্দ ও ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারে তার নিজস্ব দায়িত্ব কর্তব্য।

www.pathagar.com

আবার এ সকল বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রকৃতির সকল জিনিসের সাথে এগুলোর যোগাযোগ সম্পর্কে এক বিশদ আলোচনা সূরাটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

এরপর আলোচনা এসেছে সামুদ জাতির ইতিহাস নিয়ে। কিভাবে তারা তাদের রসূলকে মিথ্যাবাদী সাজালো, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত উটনীকে কিভাবে পা কেটে দিয়ে হত্যা করলো, তার পরিণতিতে কিভাবে তাদের ওপর ধ্বংস ও সামগ্রিক অধপতন নেমে এলো, এগুলো সবই ছিলো সে হতভাগাদের ব্যর্থতা ও ধ্বংসের উদাহরণ। যারা পাপাচারী তাদের পাপ কাজ করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা কিছু ঢিল দেন, যার কারণে আরো নিত্য নতুন পাপ কাজে তারা আরো লিপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ্র ভয়-ভীতিকে তারা শিকেয় তুলে রাখে, যেমন এ সূরার প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'অবশ্যই সাফল্য লাভ করলো সে– যে নিজেকে পবিত্র রেখেছে এবং ব্যর্থ হলো সে– যে তার নফসকে কলুষিত করেছে।

'কসম সূর্যের এবং এর উজ্জ্বল আলোর। কসম চাঁদের যখন তা এর পেছনে পেছনে আসে। কসম দিনের, যখন সে (দিনের) উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়। রাতের কসম, যখন রাত তাকে (সূর্যকে) ঢেকে ফেলে, আকাশের কসম এবং তাঁরও কসম, যিনি তা বানিয়েছেন। কসম পৃথিবীর এবং তাঁর যিনি তা বিছিয়ে দিয়েছেন। কসম প্রাণের এবং তাঁর, যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন। তারপর তার মধ্যে দান করেছেন ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্যবোধ, সে-ই সফলকাম হয়েছে যে নিজেকে পবিত্র রেখেছে এবং ব্যর্থ মনোরথ হলো সে, যে তার নফসকে কলুষিত করেছে।'

সূরা আল লায়ল

আলোচ্য সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে বিশ্ব-জগতের মধ্যে অবস্থিত রহস্যসমূহ ও মানব-প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা এবং তার সঠিক কাজ ও তার ফল কী হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞানদান করা। সূরাটির মধ্যে এ সত্য বিভিন্ন কায়দায় চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, 'অবশ্যই, তোমাদের চেষ্টাগুলো বিভিন্নমুখী, এমতাবস্থায় যে দান করলো (সে-ই সাফল্যের পথে চললো), আল্লাহর ভয়ের কারণে বাছবিচার করে চললো এবং ভালো কাজ ও সদ্ব্যবহার (তার কাজের মাধ্যমে) সত্যায়িত করলো.......খরচ করে। (আয়াত ৪-১৬)

এ মহাসত্যের বহিপ্রকাশ ঘটেছে দুভাবে এবং দুদিক থেকে। প্রকৃতি ও স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে দুভাবে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, 'কসম নিশীথ রাতের, যখন তা ঘনীভূত অন্ধকারে (সব কিছুকে) আচ্ছন্ন করে। আর শপথ উজ্জ্বল দিবালোকের, যা আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যায়।' একই আয়াতে দুটি কালের ব্যবহার, 'ইয়াগশা' ভবিষ্যত বা নিত্য বর্তমান এবং 'তাজাল্লা' অতীত– এটা অবশ্যই কিছু তাৎপর্য রাখে। সে সবকিছু– এমনকি মানুষের মনগযকেও আচ্ছন্ন করে, তারা অবশ্যই সফল যারা গাফলতির ঘুম ঝেড়ে-মুছে ফেলে উঠে পড়লো।

www.pathagar.com

কতোই না সৌভাগ্যবান তারা, যেহেতু ঝলমলে দিনের আলোয় তারা খুঁজে নিতে পারলো নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্তু।

সুতরাং এ সময় ও সে সময়–একটি আর একটির পরিপূরক বিধায় উভয় সময়ের কসম খেয়ে এবং দুটি সময়ের জন্য দুই ধরনের কাল ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালা অনাগত মানুষকে বলতে চেয়েছেন, প্রতিনিয়ত আগত অন্ধকারের ঘনঘটার মধ্য থেকে নিশ্চিতভাবে যখনই হেদায়াতের আলোর আভা বিচ্ছুরিত হবে, তখন যতো কষ্টই হোক না কেন গাফলতির চাদর দূরে নিক্ষেপ করে তাকে আলোর পথে আসতে হবে। 'আর কসম সেই মহান সত্তার, যিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারীকে। আর এ বর্ণনা পদ্ধতি কোরআন পাকের মধ্যে বর্ণিত ব্যাখ্যার অতি মনোহর একটি দিক।১

'কসম নিশীথ-রাতের যখন তা আচ্ছন্ন করে। আর কসম দিবাভাগের যখন তা (রাত শেষে) উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয় এবং কসম তাঁর যিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারীকে।'

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা ওই দুটি আয়াতে রাত ও দিন এবং এ দুয়ের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে সেগুলোর কসম খেয়েছেন। 'রাত যখন ঢেকে ফেলে' এবং 'যখন দিন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।' এগুলোতে যে কথাগুলো বিধৃত হয়েছে তা হচ্ছে, রাত যখন বিস্তীর্ণ ধরণীকে অন্ধকারে ঢেকে ফেলে, তার ওপর পর্দা নিক্ষেপ করে তাকে গোপন করে ফেলে, আর দিনের কসম যখন তা উজ্জ্বল হয়, উদ্ভাসিত হয় এবং তার আলোতে সব কিছু আলোকিত হয়।

সুতরাং এ দুটি সময় উন্মুক্ত আকাশের বুকে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় পরস্পর মুখোমুখি হয়, নিজ নিজ চেহারা দেখিয়ে ওরা একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে। দুয়ের মধ্যে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলোও পরস্পর মিলিত হয় এবং তাদের প্রতিক্রিয়াগুলোও এভাবে সামনাসামনি আসে। এমনি করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির সবকিছুকে দুইভাগে ভাগ করে তাদের কসম খাচ্ছেন। 'কসম তার যিনি পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন।' বাক্যটির দুটি অর্থ হতে পারে।

যেটাই গ্রহণ করা হোক না কেন, কোনোটাই অশুদ্ধ হবে না। 'মা' যদি 'মান্' অর্থে আসে তো বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে 'এবং তাঁর কসম যিনি পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন, আর যদি 'মা' (যা কিছু) অর্থে আসে, তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে, সৃষ্টির 'সব কিছুর মধ্যে পুরুষ ও নারী বা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে তাদের কসম।' একথা বলে সূরাটির বাইরে যে কথাগুলো বলা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে সূরাটির অভ্যন্তরে যে কথাগুলো বর্তমান রয়েছে, এ দুয়ের মাঝে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে দেয়া হয়েছে।

১. এ প্রসংগে আরো জানতে হলে দেখুন লেখকের রচিত 'কোরআনের শিল্পগত চিত্র' বইয়ের শৈল্পিক সংগতি (আত তাসওয়ীরুল ফান্নি ফিল কোরআন– 'শৈল্পিক সংগতি' আত্তানাসুকুল ফান্নি ফিল কোরআন।'

www.pathagar.com

সূরা আদ দোহা

এ সূরাটির আলোচ্য বিষয়, বর্ণনাধারা, দৃশ্যসমূহ, অন্তর্নিহিত অর্থ, এর আয়াতগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ছন্দ ও শব্দের চমৎকারিত্বসহ সব কিছু নিয়ে সূরাটি প্রতিটি পাঠকের মনে যেন এক স্নেহ ও মায়া-মমতার পরশ বুলিয়ে দেয়। এমন মধুমাখা শব্দ ও মমতামাখা কথা এতে ব্যবহার করা হয়েছে, মনে হয় যেন প্রভাত বেলার মৃদু সমীরণ প্রেমের সুরভিত বার্তা পৌঁছে পরম প্রেমাস্পদের সাথে বিরহী হৃদয়ের এক যোগসূত্র কায়েম করতে চায়। তা যেন বিনম্র এক মহা শুভ সংবাদের বার্তা বয়ে এনে মন থেকে যাবতীয় দুঃখ বেদনা ও ক্লান্তির ছাপ মুছে দিতে চায়, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও তাঁর রহমতের নিশ্চিত সম্ভাবনা আত্মাকে যেন বার বার দোলা দিয়ে যায়। অনাগত দিনের সাফল্যের আশা তার মনকে যেন ভরে দিতে চায়। রাব্বুল আলামীনের অদৃশ্য হাত তাঁর মহব্বতের অমীয়ধারা আকাংখীদের হৃদয় কন্দরে পরম একটা আবেগ ঢেলে দেয়, আর তাকে কানায় কানায় প্রশান্তিতে ও বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ভরে দিতে চায়।

এ সব কিছুই বলা হয়েছে নবী মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্যে। এসব কিছু তাঁর রব ও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়া, তাঁর কঠিন দিনগুলোর কষ্ট দূর করা এবং তাঁর মনকে নিশ্চিন্ততায় ভরে দিতে গিয়ে পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে আসা এক একটি অমীয় বার্তা। এসব কিছু হচ্ছে তাঁর রহমতের বারিধারার প্রতীক। প্রেমের ডাক, নৈকট্যের স্বাদ এবং ব্যথিত ও শ্রান্ত-ক্লান্ত এবং সমস্যাপীড়িত হৃদয়ের জন্য আদরের এক মৃদু-মধুর দোলা।

রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়, মাঝে মাঝে রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট ওহী আসা বন্ধ থেকেছে এবং জিবরাঈল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাতে বিলম্ব করেছেন। এ সময় মোশরেকরা বিদ্রূপাত্মকভাবে বলেছে, 'মোহাম্মদকে তার রব (প্রতিপালক) পরিত্যাগ করে গেছেন।' এতে তিনি যে দুঃখ পেয়েছেন তা প্রশমনের উদ্দেশে আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটি নাযিল করেন।

পরম প্রেমাস্পদ, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছ থেকে আসা ওহী, জিবরাঈল (আ.)-এর সাক্ষাত এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভই ছিলো রসূল (স.)-এর জন্যে ওই সংকটপূর্ণ জীবনে একমাত্র পাথেয়। অসভ্য জাতির হৃদয়হীন ব্যবহার ও হঠকারিতামূলক অস্বীকৃতির মধ্যে এগুলোই ছিলো তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। প্রায় গোটা সমাজ তাঁকে পরিত্যাগ করলো, নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাঁকে ও তাঁর সংগী-সাথীদের জীবন বিপন্ন করে তুললো। ঈমান গ্রহণের জন্য তাঁর উদাত্ত আহবান যুক্তিহীনভাবে ঠুকরে দিলো এবং সত্যের এ বাতি নিভিয়ে দিতে নানা চক্রান্ত করতে থাকলো। সে কঠিন দিনে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের গভীরতা ও জিবরাঈল (আ.)-এর সান্ত্বনাবাণী রসূল (স.)-এর হৃদয়ে স্নিগ্ধ শান্তি ও সংকল্পের দৃঢ়তা আনতো।

www.pathagar.com

কিন্তু ওহী আসার এ ধারা (সাময়িকভাবে হলেও) যখন থেমে গেলো, তখন রসূল (স.)-এর চলার পথের সকল রসদ যেন ফুরিয়ে গেলো এবং তিনি আল্লাহর মহব্বত থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজেকে বড়ো একাকী অনুভব করতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগলো তিনি এক জনমানবহীন মরুপ্রান্তরে এক শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিক। বান্ধবহারা হয়ে তিনি বড়োই অসহায় বোধ করতে লাগলেন। সকল দিক থেকে তাঁর পথ যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগলো।

এমনই এক নাযুক মুহূর্তে এ সূরাটি নাযিল হলো। প্রিয়তম মালিকের অমীয় সুধায় ভরা প্রিয় বাণী, তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্যের বার্তাবাহী ও সংবাদ তাঁর স্নিগ্ধ ও মধুমাখা আশ্বাস পেয়ে মন আবার সতেজ হয়ে উঠলো। সামাজিক বন্ধন মযবুত করার জন্যে তাঁর প্রয়োজনীয় হেদায়াত এবং অন্তরের প্রশান্তি ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা আনয়নকারী বাক্যের সমাবেশ রয়েছে এ সূরাটিতে। এরশাদ হচ্ছে, 'তোমাকে তোমার রব পরিত্যাগ করেননি, অযত্ন-অবহেলা বা ঘৃণাভরে ছেড়ে দেননি তোমাকে। (জেনে রেখো), অবশ্য অবশ্যই অতীতের থেকে ভবিষ্যত তোমার জন্যে খুবই উজ্জ্বল, আর শীঘ্র তোমার রব তোমাকে এমন কিছু দেবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।' (এটাও তোমার জানা দরকার যে,) তোমার রব ইতিপূর্বেও তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করেননি। তিনি এর আগে কোনো সময় তোমাকে ঘৃণা ভরে ছেড়েও দেননি। কখনও তাঁর রহমত ও পরিচালনা থেকে তোমাকে দূরেও রাখেননি, তোমাকে আশ্রয়হীনও করেননি।

(স্মরণ করে দেখো,) তোমাকে কি তিনি এতীম অবস্থায় পাননি? যে অবস্থায় তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, আর যখন তুমি সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছিলে না সে অবস্থায় তিনিই তোমাকে সে পথের সন্ধান দিয়ে দিলেন। আবার তোমাকে অসচ্ছল অবস্থায় পেলেন, সেখান থেকে তিনি তোমাকে অভাবমুক্ত করলেন।'

এ সব কথার সত্যতা কি তুমি তোমার জীবনে দেখতে পাওনি? তোমার অন্তরের মধ্যে কি একেবারেই এ সকল কথার বাস্তবতা অনুভব করোনি? এসব নেয়ামতের কোনো প্রভাব কি তোমার পরিবেশে দেখোনি? না, না কিছুতেই তোমার রব তোমাকে ছেড়ে দেননি এবং তোমাকে তিনি অবহেলাও করেননি। তোমাকে তোমার সৎগুণাবলী, সততা ও সত্যবাদিতা থেকে কখনও দূরে সরিয়ে দেননি। 'আর স্পষ্ট জেনে নাও, তোমার জন্যে তোমার আগামী দিনগুলো অবশ্যই পূববর্তী দিনগুলো থেকে ভালো।' তখন আরো অনেক বেশী এবং আরো অনেক পূর্ণাংগ জিনিস তুমি লাভ করবে। 'আর শীঘ্র এমন কিছু তোমাকে তিনি দেবেন যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে।'

এ গভীর ও মধুমাখা স্নেহের বাণী শুধু যে আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছে তা-ই নয়, এ কথাগুলোর প্রবল দোলা রসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হৃদয়কে প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করেছে। এর সাথে গোটা পরিবেশ পরিস্থিতি প্রিয়তমের ভালবাসার আবেগভরা মধুর গুঞ্জরণে ভরে গেছে। গোটা বিশ্ব-চরাচরের যত স্থানে এ বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে সেখানেই এ সুরের মূর্ছনা সব কিছুকে যেন মাতিয়ে তুলেছে।

www.pathagar.com

সূরা আল এনশেরাহ

এটি কোরআনের ৯৪ নং সূরা। সূরা আদ দোহার পর পরই এ সূরা নাযিল হয়েছে এবং সত্য বলতে কি এটি যেন সূরা দোহারই পরিপূরক। এ সূরার মধ্যে ফুটে উঠেছে নবী করীম (স.)-এর জন্যে আল্লাহর দরদ ও মহব্বত। পুরো সূরা জুড়ে রয়েছে অতি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে উপস্থাপিত একটি মনোজ্ঞ আলোচনা। এর মধ্যে রসূলের প্রতি আল্লাহর যত্ন ও সজাগ দৃষ্টি রাখা সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স.)-কে অনাগত দিনের সুসংবাদ দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁর সংকট কেটে উঠবে এবং যাবতীয় সমস্যা দূরীভূত হয়ে সহজ ও সুন্দর দিনের দেখা পাওয়া যাবে। সূরাটির মধ্যে সহজ জীবন যাপনের মূল রহস্য ফুটে উঠেছে, আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্কের দৃঢ়তার বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরা আত্ তীন

আলোচ্য সূরাটি এক বুনিয়াদী সত্য পেশ করেছে, আর তা হচ্ছে, মানুষকে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের গঠন-প্রকৃতির মধ্যে যে মযবুতী দান করা হয়েছে, তা ঈমানী জীবন যাপনের মাধ্যমেই প্রকাশ করা সম্ভব। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও আল্লাহর ভয়-ভীতি হৃদয়ে পোষণ করে জীবন যাপন করলেই আল্লাহ তায়ালার বাঞ্ছিত সেই দৃঢ়তা ও মযবুতী আসে। পক্ষান্তরে যখন মানুষ তার স্বাভাবিক প্রকৃতি ও ঈমানী জীবন যাপন থেকে সরে দাঁড়ায়, তখনই তার পতন শুরু হয়, পরিশেষে তার জীবনে চরম অধপতন নেমে আসে।

সূরা আল আলাক্ব

সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে এ সূরার প্রথম অংশ সর্বাগ্রে নাযিল হয়েছে, আর যেসব বর্ণনায় সূরাটির অবশিষ্ট অংশও শুরুর দিকে নাযিল হয়েছে বলে বলা হয়েছে, সেগুলো খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম আহমদ বলেন, পর্যায়ক্রমে আবদুর রাযযাক, মোয়াম্মার, ইবনে যুহরী, ওরওয়া, অবশেষে হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (স.)-এর প্রতি ওহী নাযিল হতে শুরু হওয়ার পূর্বে প্রথম অবস্থা এভাবে এসেছে যে, ঘুমের মধ্যে তাঁকে সত্য স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। ভোর বেলার শুভ্র ও স্বচ্ছ আলোর মতোই তাঁর দেখা স্বপ্নগুলো ছিলো সত্য সঠিক। তারপর তাঁর কাছে একাকিত্ব প্রিয় হয়ে ওঠে এবং তিনি হেরা গুহার নির্জনতায় একাকী ধ্যানমগ্ন থাকতে শুরু করেন। এটাকে সাধারণভাবে তপস্যা নামে অভিহিত করা হয়। স্ত্রী-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েক রাত এ ভাবে তাঁর কাটতে থাকে। এ জন্য কয়েক দিনের মতো কিছু খাদ্য-খাবার তিনি সংগে নিয়ে যেতেন। ফুরিয়ে গেলে আবার খাদিজা (রা.)-এর কাছ থেকে কয়েক দিনের খাবার নিয়ে যেতেন। শেষ পর্যন্ত এ হেরা গুহায়ই একদিন সত্য সমাগত হলো।

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম ওহী নাযিলের ঘটনা

একদিন ফেরেশতা এসে বললেন, 'পড়ো'। তিনি বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' রসূল (স.) বলেন, সেই ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকের সাথে এমন করে চাপ দিলেন যে, আমার দম বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে আবার তিনি বললেন, 'পড়ো'। আবার আমি বললাম, 'আমি পড়তে জানি না।' এরপর তিনি দ্বিতীয় বারের মতো আবারও আমাকে এমনভাবে সজোরে বুকে চেপে ধরলেন যাতে আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তিনি আমাকে ছেড়ে পুনরায় বললেন, 'পড়ো'। আমি আবারও বললাম, 'আমি পড়তে জানি না।' তারপর তিনি তৃতীয় বারের মতো আমাকে ধরে চাপ দিলেন, যাতে আমার দম যেন বেরিয়ে যেতে লাগলো। তারপর বললেন, 'পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিন্ড থেকে, পড়ো এবং তোমার রব অতি সম্মানিত। যিনি শিখিয়েছেন কলমের সাহায্যে, শিখিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।'

তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে খাদিজা (রা.)-এর কাছে ফিরে এলেন। খাদিজা (রা.)-এর কাছে এসে তিনি বললেন, 'কে আছো, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢাকো, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢাকো।' তারপর তিনি তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর ভয়টা দূর হয়ে গেলো। তারপর তিনি বললেন, 'খাদিজা! কী হলো আমার!' একথা বলে আদ্যোপান্ত পুরো ঘটনা তিনি জানালেন। সব শুনে খাদিজা (রা.) বললেন, চিন্তা করবেন না, এ ঘটনা থেকে আপনি সুসংবাদ নিন। আপনি আত্মীয় স্বজনের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্য করেন, মেহমানদারী করেন এবং সত্য পথে থাকতে গিয়ে কেউ বিপদে পড়লে তাকে আপনি সাহায্য করেন।' এসব সান্ত্বনাবাণী শোনানোর পর খাদিজা (রা.) তাঁকে নিয়ে তার আপন চাচাত ভাই ওরাকা ইবনে নওফেল-এর কাছে চলে গেলেন। ওই ব্যক্তি জাহেলিয়াত অবস্থায় সত্য ধর্ম পাওয়ার ইচ্ছায় নাসারা (খৃস্টান) হয়ে গিয়েছিলো। তিনি হিব্রু ভাষায় রচিত ইনজীল কেতাবের আরবী অনুবাদ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং অন্ধ। তাকে খাদিজা (রা.) বললেন, 'হে আমার চাচাত ভাই, আপনার ভাতিজার কথা একটু খেয়াল করে শুনুন।' তিনি বললেন, 'ভাতিজা, কী হয়েছে তোমার?' রসূলুল্লাহ (স.) যা কিছু দেখেছিলেন সব তাকে খুলে বললেন। তখন ওরাকা বললেন, হাঁ, তিনি সেই বিশ্বস্ত ফেরেশতা যিনি মূসার কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন জিবরাঈল (আ.)। আহ্, আফসোস আমার দুর্বল শরীরের। যদি আমার শরীরে শক্তি থাকতো, যদি আমি বেঁচে থাকতাম সে সময়, যখন তোমার জাতি তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে!'

একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'আমাকে কি আমার দেশবাসী বের করে দেবে?' ওরাকা বললেন, 'হাঁ, যে কাজ নিয়ে তুমি এসেছো, অতীতে এ কাজ নিয়ে যারাই এসেছে, তাদের প্রত্যেকের সাথে শত্রুতা করা হয়েছে। আহ্, সে দিনটিতে যদি আমি বেঁচে থাকতাম তাহলে আমি আমার শক্তি দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতাম।

www.pathagar.com

এরপর অল্প কিছু দিনের মধ্যে ওরাকা মারা গেলেন। যুহরী বর্ণিত এ হাদীসটি বোখারী ও মুসলিম রেওয়ায়াত করেছেন।

তাবারীও সঠিক বর্ণনাক্রমে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়র (রা.) বর্ণিত এ হাদীসটি পেশ করেছেন, 'রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন তিনি রেশমী কাপড়ের একটি টুকরা নিয়ে এলেন। এ কাপড়ে কিছু লেখা ছিলো। অথবা সে কাপড়ে মোড়া ছিলো একটি কেতাব। তখন তিনি বললেন, 'পড়ো'। বললাম, 'আমি পড়তে জানি না।' তিনি আমাকে সজোরে বুকে চেপে ধরলেন, এতো জোরে ধরলেন মনে হলো যেন আমি মরে যাবো। তারপর ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বললেন, 'পড়ো'। বললাম, কী পড়ব আমি?' একথা বললাম এ জন্যে যাতে করে তিনি আমার সাথে পুনরায় পূর্বের মতো ব্যবহার না করেন। তখন তিনি বললেন, 'পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন.......মানুষকে শিখিয়েছেন সেই জিনিস যা সে জানতো না।' এ পর্যন্ত পড়ে থামলেন। আল্লাহর রসূল বলেন, 'তখন আমি পড়লাম। তিনিও তখন ক্ষান্ত হলেন এবং আমার থেকে দূরে সরে গেলেন। আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। তখন আমার মনে হচ্ছে, কেউ যেন আমার অন্তরের পাতায় কিছু কথা লিখে দিয়ে গেছে। তিনি বললেন, 'আমি মনে মনে বললাম, আমি কি কবি বা পাগল হয়ে গেলাম! কোরায়শরা আমাকে কি চিরদিন এ কথাই বলবে? আমার দৃঢ় ইচ্ছা জাগলো আমি পাহাড় চূড়ায় গিয়ে উঠি এবং সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে নীচে পড়ে আত্মহত্যা করি! এভাবে আমার সকল জ্বালার সমাপ্তি ঘটুক। এ সব কথা ভেবে আমি গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম এবং পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলাম। পাহাড়ে আরোহণের মাঝপথে পৌছে আকাশ থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম। কেউ বলছিলো, 'হে মোহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রসূল এবং আমি জিবরাঈল। আমি মাথা তুলে আকাশপানে তাকিয়ে দেখি সেখানে জিবরাঈল একজন মানুষের রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর পা দু'টি দিগন্ত বলয়ে পরিব্যাপ্ত।' তিনি বলছেন, 'হে মোহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রসূল, আর আমি হচ্ছি জিবরাঈল।' আমি তখন তার দিকে তাকিয়েই রইলাম। এ অবস্থা আমাকে আমার পূর্ব ইচ্ছা থেকে বিরত রাখলো। আমি সামনে বা পেছনে নড়তে পারছিলাম না। আকাশের দিগন্ত বলয়ের চতুর্দিকে আমি বার বার নযর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলাম, কিন্তু যেদিকেই তাকাচ্ছিলাম সে দিকেই এ একই মূর্তি নযরে পড়ছিলো। এভাবে আমি ওই স্থানে দাঁড়িয়েই রয়ে গেলাম। আমি না সামনে, না পেছনে সরতে পারছিলাম। এমনকি ওই সময় খাদিজা আমার খোঁজে লোক পাঠিয়েও আমার সন্ধান পেলো না। সে লোকেরা মক্কায় ফিরে গিয়ে আমাকে না পাওয়ার কথা জানালো, আর তখনো আমি সে জায়গাতেই ঠায় দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ সময় পরে তিনি অদৃশ্য হলেন আর আমিও ফিরে এলাম আমার পরিবারের কাছে।

ইবনে ইসহাক পর্যায়ক্রমে ওহাব ইবনে কায়সার এবং ওবায়দ-এর বরাত দিয়ে এ হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। আমি নিজেও আজ সে ঘটনার ইতিবৃত্ত সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, যা ইতিহাস ও তাফসীরের কেতাবে বার বার অধ্যয়ন করেছি, কিন্তু মনে হচ্ছিলো ভাসা ভাসা ভাবেই তা পড়েছি। তারপর অন্য কাজে মনোনিবেশ করেছি

www.pathagar.com

অথবা খুব কমই গভীরভাবে খেয়াল দিয়েছি ওই ঘটনার প্রতি। পড়েছি এবং এক সময় তা ভুলে গেছি।

সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

আসলে ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবতার নিরিখে এতো গুরুত্বপূর্ণ যে গুরুত্বের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। ওই গুরুত্ব বুঝার জন্যে আজ পর্যন্ত যতো প্রকার প্রচেষ্টাই করা হয়েছে তা সবই তার প্রয়োজনের তুলনায় কম। ওই ঘটনার মধ্যে এমনও অনেক দিক আছে, যেগুলো সর্বদাই আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়ে গেছে; বরং অতিরঞ্জিত না করে বললেও বলতে হয় প্রকৃতপক্ষে মানব ইতিহাসে এ মুহূর্তের ঘটনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সব থেকে বেশী, যার সাথে অন্য কোনো জিনিসের তুলনাই হতে পারে না।

আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন, কোন্ সে জিনিস যা এই দৃশ্যকে এতো গুরুত্বপূর্ণ করে দিলো। এ ঘটনা সামনে রেখে যে সকল বাস্তব সত্য আমরা উপলব্ধি করি, সেগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে, এ ঘটনা থেকে মহান আল্লাহ তায়ালা যে তাঁর সকল শক্তি ও ক্ষমতাসহ বর্তমান আছেন তার সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি সর্ববিজয়ী, তাঁর শক্তি দিয়ে তিনি তাঁর ইচ্ছাকে সর্বদা কার্যকর করতে পারেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনে তিনি যে সম্পূর্ণ সক্ষম এ ঘটনা তারও সাক্ষ্য বহন করে। তিনি সৃষ্টি নিখিলের একমাত্র বাদশাহ। তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্যই সর্বত্র চলে। অতএব সম্ভ্রম, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র তাঁরই, তিনি মানুষ নামক এ জীবটির প্রতি এক সময় তাঁর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বড়ো মেহেরবানী করে তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে বাছাই করে তার মাথায় খেলাফতের সম্মানজনক তাজ পরিয়ে দিলেন। অথচ তাঁকে বা তাঁর নাম সৃষ্টিকুলের অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বড়ো দয়া করে তিনি এ তুচ্ছ সৃষ্টিকে সম্মানিত করলেন। তিনিই সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তাঁর হেদায়াতের নূর তিনি দিলেন, বানালেন তাকে ওহী ধারণ করার পাত্র এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ তুচ্ছ সৃষ্টিটাকে কাংখিত সম্মান পাওয়ার যোগ্য বানালেন।

এ হচ্ছে এক মহাসত্য। এটা এতো বড়ো সত্য যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এ সত্যের বিভিন্ন দিক মানুষের কাছে তখনই প্রকাশ পায়, যখন সে এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে, আর চিন্তা ভাবনা করলে সে অনুভব করে, চিরস্থায়ী সেই স্বাধীন সার্বভৌম সত্তার পক্ষ থেকেই মানুষকে এ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। মানুষকে এ নেয়ামত দান করায় একথাও সুস্পষ্ট বুঝা গেলো, এ সীমিত, অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল বান্দাকে তিনি কতো গভীরভাবে ভালোবাসেন। যারা আল্লাহ তায়ালার আপন হয়ে যায়, জীবন যাদের আল্লাহ কেন্দ্রিক হয়ে যায়, সেই মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী অনেক ব্যাপক। এমতাবস্থায় মানুষ তার তীব্র এবং প্রিয় অনুভূতির স্বাদও পেতে শুরু করে। বিনম্র চিত্তে, কৃতজ্ঞতাভরে, পরম খুশীর সাথে ও নিবেদিতপ্রাণে মানুষ আল্লাহ তায়ালার এ মহাদান অনুভব করে। সে আল্লাহ তায়ালার কথাগুলোর

www.pathagar.com

গুরুত্ব গভীরভাবে অনুভব করে এবং বাস্তব আনুগত্যের মাধ্যমে সৃষ্টিকুলের সবাই এ কথাগুলোর জবাব দেয়। সৃষ্টিকুলের মধ্যে একমাত্র মানুষই পেয়েছে সেই পবিত্র ওহী, অন্য আর কেউ নয়, যদিও অনেকের থেকে সে দুর্বল।

আলোচ্য ঘটনা কোন বিশেষ জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে? ঘটনাটি মানুষের দৃষ্টিকে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। তাদের জানাচ্ছে, তিনি অতি বড়ো দয়াময়, তিনি পূর্ণ রহমতের মালিক। বড়োই মর্যাদাবান তিনি, অতি বড়ো প্রেমময় তিনি। তিনিই তাঁর নেয়ামত প্রদর্শন করতে পারেন। তিনি তাঁর বাস্তব দান ও মেহেরবানী মানুষকে বিনা কারণে এবং বিনা যুক্তিতেও দিতে পারেন। সীমা সংখ্যাহীন ও এ বিশেষ দান করার ক্ষমতা তাঁর গুণাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আবার মানুষের প্রতি এই ঘটনার হেদায়াত হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যে হেদায়াতের মাধ্যমে তাকে এত বেশী সম্মান দিয়েছেন যার কল্পনাও করা যায় না এবং যার শোকর আদায় করাও তার ক্ষমতার বাইরে। এমনকি সারা যিন্দেগী রুকু-সাজদায় কাটালেও তাঁর শোকর আদায় করা সম্ভব হবে না। আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সর্বদাই তাঁর বান্দার কথা স্মরণে রাখেন এবং সর্বদাই তার দিকে মনোযোগী থাকেন। প্রতিনিয়ত তাঁকে পাওয়ার পথ তিনি বাতলে দিচ্ছেন। মানুষের মধ্য থেকেই তিনি রসূল পাঠিয়েছেন। তার জন্যে বাসস্থান নির্ধারণ করেছেন, যেখানে সৃষ্টির সবাই ভয় ও নিষ্ঠা নিয়ে তাঁর কথামতো চলে।

সমগ্র মানুষের জীবনে এ ভয়ানক বিবর্তন ঘটার যে চিহ্ন বিদ্যমান তা মানব সৃষ্টির গোড়া থেকেই পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। এটা মূলত শুরু হয়েছে মানব ইতিহাসের সূচনাতে। যখন মানুষের বিবেকের শক্তি জাগ্রত হয়েছে, তখন থেকে মানুষ তার লাগাম ছাড়া চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। তখন থেকেই সে তার চিন্তাশক্তি কাজে লাগিয়েছে, সে তার নিজের মূল্য ও কদর বুঝতে পেরেছে। আসলে পৃথিবীতে মান-মর্যাদা, আকর্ষণ বা কুপ্রবৃত্তির চাহিদা দমনই এক্ষেত্রে মূল কথা নয়; বরং বিশ্বাস করা যে, এটা হচ্ছে সর্বময় ক্ষমতার মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার ইশারা ইংগিতে সংঘটিত কাজ।

সৃষ্টির সূচনা থেকেই আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট তদারকিতে মানুষের অন্তর-প্রাণে উন্নতির এ অপ্রতিরোধ্য ভাবধারা জারি রয়েছে এবং এ অনুভূতি নিয়েই তারা নড়াচড়া ও কাজকর্ম করে চলেছে। তারা আশা করেছে, আল্লাহ তায়ালার পরিচালনায় তাদের কর্মকুশলতার হাত আরো দীর্ঘায়িত হতে থাকবে এবং তাদের অগ্রগতির পদক্ষেপগুলো এক পা দু'পা করে এগিয়ে যাবে। এ অগ্রগতির কারণে তাদের ভুল-ভ্রান্তিরও অবসান হতে থাকবে এবং সঠিক কাজের দিকে তারা ধীরে ধীরে এগুতে থাকবে। অগ্রযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে তারা সব সময়ই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ওহী (সরাসরি নির্দেশ) লাভের আশা করেছে। এ ওহী হচ্ছে আসলে তাদের অন্তরেরই প্রতিধ্বনি, অর্থাৎ তাদের যে সব দাবী সৃষ্টি হয়েছে, এই পথনির্দেশনা দানের মাধ্যমে তাদের সে সব দাবী পূরণ

www.pathagar.com

করা হয়েছে। তাদের আল্লাহ তায়ালা ডাক দিয়ে বলেছেন, এটা গ্রহণ করো এবং ওটা পরিত্যাগ করো।

প্রকৃতপক্ষে নবী (স.)-এর তেইশ বছরের জীবনের সময়কাল বিশ্বমানবের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়। এ সময়ের মধ্যে মানুষ এবং ফেরেশতাদের প্রকাশ্য ও সরাসরি যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। এ সময়ের মূল্য ও সঠিক তাৎপর্য তারাই বুঝতে পেরেছিলেন, যারা তাঁর সময়ে বর্তমান ছিলেন এবং ওহীর মাধ্যমে এ যোগাযোগ নিজেরা অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা ওহী শুরু হওয়ার অবস্থা যেমন দেখেছিলেন, তেমনি দেখেছিলেন এর সমাপ্তি পর্যায়ের অবস্থাও। তারা কথা ও কাজের এই সম্মিলনের মিষ্টতার স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্পষ্টভাবেই তারা অনুভব করতেন, আল্লাহ রব্বুল ইযযত কিভাবে তাঁর অদৃশ্য হাত দ্বারা তাদের চলার পথ রচনা করেছেন। তারা তাদের এ পথ-পরিক্রমার করুণ সূচনালগ্ন যেমন দেখেছিলেন, তেমনি দেখেছিলেন ইসলামের বিজয় লাভের গৌরবজনক অবস্থা। এ সময়কাল ছিলো এমন একটি আশ্চর্যজনক, অধ্যায় যার পরিমাপ পৃথিবীর কোনো মাপকাঠি দিয়েই করা সম্ভব হয়, কিন্তু সুবিশাল এ বিশ্বে সময়ের ব্যবধানে যে সব ঘটনা ঘটে, তার একটা থেকে আর একটা যেমন দূর বলে আমরা অন্তরের মধ্যে অনুভব করি, তার থেকেও অনেক অনেক বেশী অনুভব করি এর গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যকার দূরত্বের ব্যবধান। এগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব পৃথিবীর কোনো জিনিসের পারস্পরিক দূরত্ব দিয়ে মাপা যাবে না। এমনকি কোনো একটি আকাশের দূরত্ব আন্দায করেও সেগুলোর দূরত্ব কল্পনা করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে মানুষের মনগড়া মতবাদ ও ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জীবন বিধানের মধ্যে রয়েছে এক আকাশচুম্বী পার্থক্য। জাহেলিয়াতের কার্যকলাপ ও ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যেও অনুরূপ ব্যবধান রয়েছে। এর থেকেও বেশী দূরত্ব বিরাজ করছে সাধারণ মানবতাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ও আল্লাহওয়ালা লোকের মধ্যে।

বরং একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, ওদের মধ্যকার পার্থক্য সৌরজগতের মধ্যে অবস্থিত আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার পার্থক্য থেকেও বেশী। সেই সোনার মানুষরা তাদের জীবদ্দশাতেই ঈমানের স্বাদ বুঝতে পেরেছেন। পেয়েছেন এর মিষ্টতা, বুঝেছেন এর মূল্য। অন্তরের গভীরে প্রিয় নবী (স.)-কে হারানোর ব্যথাও তারা তীব্রভাবে অনুভব করেছেন, বিশেষ করে যখন নশ্বর এ পৃথিবী থেকে পরম প্রেমাস্পদের উদ্দেশে তিনি চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রা.), ওমর (রা.)-কে বললেন, চলো, আমরা উম্মে আয়মান (রা.)-এর সাথে একটু দেখা করে আসি, যেমন করে রসূলুল্লাহ (স.) মাঝে মাঝে তার সাক্ষাৎ করতেন। এরা দু'জন এ মহীয়সী মহিলার কাছে এলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে? আপনি কি জানেন না, রসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ভালো অবস্থা আছেন? তিনি বললেন, অবশ্যই আমি তা জানি, তিনি আল্লাহর কাছে যে খুবই ভালো অবস্থায় আছেন সে বিষয়ে আমার কোনো

www.pathagar.com

সন্দেহ নেই। আমি শুধু কাঁদছি এ জন্যে যে, আকাশ থেকে ওহী আসার পথ বন্ধ হয়ে গেলো। একথা শুনে তারা দু'জনও ডুকরে কেঁদে উঠলেন এবং তিন জনই বহুক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকলেন।

নবী (স.)-কে হারানোর ব্যথার প্রতিক্রিয়া সেদিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একইভাবে চলে আসছে। যতোদিন পৃথিবী বেঁচে থাকবে এবং এর অধিবাসীরা পৃথিবীর ওপরে বিচরণ করতে থাকবে, ততোদিন এই শোকের প্রবাহ একইভাবে চলতে থাকবে।

প্রিয়নবী (স.)-এর আগমনের পর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত ওহীর শিক্ষা লাভ করেই মানুষ এক নতুন জীবন লাভ করেছিলো এবং জীবনের এমন এক নতুন মূল্য তারা খুঁজে পেয়েছিলো যা পৃথিবীর কোনো জিনিস বা কোনো মানুষের পক্ষ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র ওহীর মাধ্যমেই জীবনের এ মূল্য পাওয়া সম্ভব। ব্যক্তিগত কারো ইচ্ছা অথবা জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে এ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন পাওয়া সম্ভব নয়।

ওহীর নযুল শুরু হওয়ার পর ইতিহাসের গতিপথে এমন বিপ্লবাত্মক কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়, যা ইতিপূর্বে কখনও হয়নি এবং এর পরেও আর কখনও হবে না। যেদিন প্রথম জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন ঘটলো, সেদিনকার সেই ঘটনা ছিলো হক ও বাতিল-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী এক অভিনব ও অভূতপূর্ব ঘটনা। পৃথিবীর বুকে এটা এমন এক স্মরণীয় এবং উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ঘটনা, যা আজও স্পষ্টভাবে সর্বত্র বিরাজ করছে। মহাকালের আবর্তন কোনোদিন তা মুছে দিতে পারেনি এবং এমন কোনো দিন আসবে না যখন মানুষ ওই ঘটনা একেবারে ভুলে যাবে। বস্তুতপক্ষে সে ঘটনার কারণে মানুষের বিবেকের মধ্যে সৃষ্টিজগত ও জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে এমন ধ্যান ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কখনও আর হয়নি এবং ভবিষ্যতেও সারা বিশ্বের কোথাও এতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আর ঘটবে না।

এ ঘটনার মধ্যে দিয়েই সর্বশক্তিমান আল্লাহর দেয়া কর্মসূচী পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং বিশ্বমানবের জীবনের প্রতিটি দিক ও বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক সমাধানও তাতে পেশ করা হয়েছিলো, যাতে করে যুক্তির নিরিখেও ইসলাম তার ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পারে। ইসলামী জীবন বিধানের-মধ্যে কোনো গোঁজামিল বা অস্পষ্টতা নেই, কোনো দ্ব্যর্থবোধকতা বা অন্ধ বিশ্বাসের স্থানও এখানে নেই। সত্য সমাগত হওয়ার পর গোমরাহীর পথ যারা এখতিয়ার করে, তা না জানা বা না বুঝার কারণে নয়; বরং সম্পূর্ণ জেনে-বুঝে ইচ্ছা করেই তারা সত্য থেকে দূরে থাকছে।

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনার মাধ্যমে ইতিহাসের যে তুলনাহীন অধ্যায় শুরু হলো, তা পূর্বেকার অধ্যায় থেকে ভিন্ন এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ অধ্যায়ের সূচনার কারণেই পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। নবতর এ যুগান্তকারী ঘটনার আগমন মানবেতিহাসে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তাতে নির্দিষ্ট কোনো জাতি বা এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সারা পৃথিবীতে তার দোলা লেগেছে। এ দোলা লাগার ফলে পূর্ববর্তী মানুষ থেকে

www.pathagar.com

এ অধ্যায়ের মানুষগুলো সম্পূর্ণ নতুন এক রূপ ও চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হলো। পূর্ববর্তী মানুষগুলো কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করতো না এবং বিবেকের ডাকে সাড়া দেয়ারও কোনো প্রয়োজন অনুভব করতো না; কিন্তু বর্তমান অধ্যায়ের মানুষ আখেরাতের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে বিবেকসম্মত কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং যে মহান উপদেশমালা তারা পেলো তার অনুসরণে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করে। নবী (স.)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হওয়ার সে শিক্ষা কোনোক্রমেই তারা ভুলে যায়নি। সর্বতোভাবে এই নতুন শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে গোটা মানবমন্ডলী নতুনভাবে জন্মলাভ করলো। এ ধরনের আমুল পরিবর্তন এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর এমন আন্তরিক অনুসরণ ইতিহাসে এ একটি বারই মাত্র ঘটলো।

এ পর্যন্ত এসে আলোচ্য সূরাটির প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত হলো। সূরাটির বাকি অংশের আলোচনা এখন শুরু হচ্ছে। আমরা সবাই জানি, দ্বিতীয় অধ্যায় নাযিল হয়েছে পরবর্তীকালে। এ অধ্যায়ে আলোচনা এসেছে নবুওতপ্রাপ্তির পরে যে সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলোকে কেন্দ্র করে। ওই সময়ে তাঁর নবী হওয়ার ঘোষণা এসে গেছে। প্রকাশ্যে দাওয়াতী কাজ ও আনুষ্ঠানিক এবাদাত চলছিলো এবং এগুলোর প্রতিক্রিয়ায় মোশরেকদের বিরোধিতাও চলছিলো। তাই এগুলোর দিকে আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইংগিত দিয়েছেন। বলেছেন, 'তুমি কি দেখেছো সে ব্যক্তিকে যে বাধা দিয়েছে সে বান্দাকে যে নামায পড়ছিলো....... ।' কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাযিল হলেও সূরাটির মধ্যে আলোচিত পূর্ব ও পরের অংশগুলোর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। বর্ণনা-পরম্পরা ও উভয় অংশে বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে পরিপূর্ণ মিল থাকায় মনে হয় উভয় অংশ অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সাথে জড়িত।

সূরা আল ক্বাদর

আলোচ্য সূরাতে যে বরকতময় রাতের বর্ণনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে সে মহিমান্বিত রাত যাকে কেন্দ্র করে গোটা সৃষ্টিজগত আনন্দ এবং আল্লাহর প্রেমের সাগরে অবগাহন করে। এ হচ্ছে পৃথিবী ও উর্ধ্ব জগতের মহামিলনের রাত। এ রাতেই রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর প্রথম কোরআন নাযিল হতে শুরু করে। সারা বিশ্ববাসীর জন্যে এ রাত হচ্ছে সব থেকে বেশী আনন্দময় রাত, যার মতো মর্যাদাপূর্ণ আর কোনো রাত কোনো দিন আসেনি। অর্থাৎ এমন মর্যাদাপূর্ণ রাত ইতিহাসের কোনো অধ্যায়েও কখনো আসেনি। এ রাতে সারা বিশ্বের জন্যে হেদায়াতের যে অফুরন্ত ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে শুরু করেছে, তা ইতিপূর্বে কেউ কোনোদিন দেখতে পায়নি। এ রাতের প্রভাব যেভাবে মানুষের জীবনকে আপ্লুত করে, তাদের মধ্যে যে হৃদয়াবেগ সৃষ্টি করে, তার নযির আর কখনও মানুষ দেখেনি। এমন মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব মানুষ আর কখনও অনুভব করেনি। তাই বলা হচ্ছে—

'অবশ্যই আমি নাযিল করেছি এ কেতাব (কোরআনকে) এক মহা মহিমান্বিত রাতে। তুমি কি জানো সে মহিমান্বিত রাতটি কী? সে মহান রাত হচ্ছে এতো মর্যাদাপূর্ণ যে, তা হাজার মাস থেকেও উত্তম এবং মর্যাদাপূর্ণ।'

কোরআনে বর্ণিত এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে এ রাতের মর্যাদা ও গুরুত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ সূরাটি পড়ার সময়েই মনের ওপর এর উজ্জ্বলতা প্রতিভাত হয়।

www.pathagar.com

সূরা আল আ'দিয়াত

ত্বরিত গতিতে প্রভাব বিস্তারকারী, প্রচন্ড শক্তি নিয়ে আঘাতকারী ও উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী পরশ বুলানোর মধ্য দিয়ে এ সূরার অভিযাত্রা। এক স্তর থেকে আর এক স্তরে এ অভিযান অব্যাহত থাকে। কখনো দৌড়, আবার কখনো লাফঝাঁপের আকারে, কখনো হালকাভাবে, কখনো ক্ষিপ্রভাবে এবং কখনো একটানা গতিতে। এভাবে শেষ বাক্যে পৌঁছার পর থেমে যায়, এর শব্দ স্থির হয়ে যায় এর ছায়া শেষ হয়ে যায়, এর বক্তব্য এবং এর ছন্দ মিলিয়ে যায়। ঠিক যেমন কেউ দৌড়াতে দৌড়াতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে মানুষ স্থির ও নিশ্চিত হয়ে যায়।

সূরাটি শুরু হয়েছে হ্রেষাধ্বনি করতে করতে টগবগিয়ে ছুটে চলা ঘোড়ার পায়ের দৃশ্য দিয়ে, যারা নিজেদের পায়ের খুর দিয়ে আগুনের ফুলকি তোলে। যারা অতি প্রত্যূষে আক্রমণ চালায়, যারা ধূলি উড়াতে উড়াতে ধাবমান হয়, আর এভাবে ধাওয়া করতে করতেই অকস্মাৎ ঢুকে পড়ে শত্রু শিবিরে। অতপর তাদের মধ্যে ত্রাস ও আতংক ছড়িয়ে দেয় এবং পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে উদ্বুদ্ধ করে।

এর পর পরই উপস্থাপন করা হয় মানস জগতের দৃশ্য– যা অকৃতজ্ঞতা, অস্বীকৃতি, ঔদ্ধত্য ও প্রচন্ড সংকীর্ণতায় পরিপূর্ণ। এরপর দেখানো হয় কবরবাসীর বিক্ষিপ্ত হওয়ার এবং হৃদয়ের গোপন বিষয় প্রকাশের দৃশ্য।

সবার শেষে উড়ানো ধূলির অবসান এবং অকৃতজ্ঞতা ও সংকীর্ণতার পরিসমাপ্তি ঘটে, পরিসমাপ্তি ঘটে বিক্ষিপ্ত হওয়া ও একত্রিত হওয়ার প্রক্রিয়ার। আর সবার শেষে আল্লাহর কাছে পৌঁছে সব কিছু থেমে যায়। 'নিশ্চয় তাদের প্রতিপালক সেদিন তাদের সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল থাকবেন।'

সূরার সুরেলা ছন্দেও এক ধরনের কঠোরতা ও কর্কশতা, এক ধরনের হৈচৈ ও শোরগোলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ভাষায় এই কর্কশতা কেয়ামতের সময়কার কবরসমূহের বিক্ষিপ্ততাজনিত হৈচৈ ও শোরগোলের পরিবেশের সাথে, বক্ষের গোপন তথ্য প্রচন্ড শক্তির বলে উদঘাটনের সাথে এবং অকৃতজ্ঞতা, অমান্যতা, ঔদ্ধত্য ও সংকীর্ণতার পরিবেশের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহ তায়ালা যেন এ সকল অবস্থার জন্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ উপলক্ষ চাইলেন, তখন অনুরূপ একটা হৈচৈপূর্ণ পরিবেশকেই উপলক্ষ হিসাবে গ্রহণ করেন। হ্রেষা রব সহকারে ধূলি উড়িয়ে পা দিয়ে আগুনের ফুলকি তুলে, আকস্মিকভাবে অতি প্রত্যূষে আক্রমণ চালানো অশ্ববাহিনী সেই কাংখিত পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। চিত্রের সাথে উপলক্ষ এবং উপলক্ষের সাথে চিত্র চমৎকারভাবে মিশে গেছে। (অধিক জানার জন্যে দেখুন 'আত তাসওয়ীরুল ফান্নে ফিল কোরআন')

www.pathagar.com

সূরা আল ক্বারিয়াহ

'আল কারিয়া' মানে কেয়ামত। কোরআনে ব্যবহৃত এর আরও কয়েকটি সমার্থক শব্দ হচ্ছে আত তা'মাহ, আস সাফফাহ, আল হাক্কাহ ও আল্ গাশিয়াহ। 'আল কারিয়া' শব্দটির ভেতরে আঘাতের মর্ম নিহিত। কেননা এ ঘটনা স্বীয় ভয়াবহতা দ্বারা মানব হৃদয়কে আঘাত করে। সমগ্র সূরাটি কেয়ামত তথা তার স্বরূপ, তার ঘটনাবলী ও শেষ পরিণতির বিষয়ে কেন্দ্রীভূত। গোটা সূরা কেয়ামতের একটি দৃশ্য উপস্থাপন করে। এখানে যে দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, তা একটা ভয়াল দৃশ্য। তার লক্ষণ ও প্রতিক্রিয়া মানুষ ও পাহাড়-পর্বতের ওপর বিস্তৃত। মানুষ সংখ্যায় যতোই বেশী হোক, এ ঘটনার পটভূমিতে তাদের ক্ষুদ্র ও নগণ্য মনে হয়। তাদের মনে হবে 'বিক্ষিপ্ত পতংগের' ন্যায়। পতংগ যেমন দায়িত্বহীন ও কান্ডজ্ঞানহীনভাবে ভয়ে দিশাহারা হয়ে নিজের ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়, কোন্ দিকে সে যাবে এবং কোথায় তার গন্তব্য, তা সে জানে না, তেমনি কেয়ামতের দিন মানুষের অবস্থাও তদ্রূপ হবে। আর যে পাহাড়-পর্বত একদিন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, তা হবে ধুনা পশমের ন্যায়। বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে এবং তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। সুতরাং কেয়ামতের সুসমন্বিত দৃশ্য তুলে ধরার জন্যে তাকে 'কারিয়া' নাম দেয়াই সংগত। এ শব্দ মানুষ ও পাহাড়ে বিস্তৃত কেয়ামতের ঘটনার প্রতিক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর এর অন্তর্নিহিত মর্ম মানুষের মন ও ভাবাবেগকে আলোড়িত করে। হিসাব গ্রহণ ও কর্মফল প্রদানের মধ্য দিয়ে দৃশ্যটির যে পরিণতি সাধিত হয়, এটা তারই ভূমিকা। 'কারিয়া! কারিয়া কি?' তুমি কি জানো 'কারিয়া' কি? সূরার শুরুতে কোনো বাক্য সম্পূর্ণ না করে শুধু একটি শব্দ 'আল্ কারিয়াহ' বলার উদ্দেশ্য হলো, এর ভীতি সঞ্চারকারী বিভীষিকাময় বিকট ধ্বনি ঝংকৃত করা।

সূরা আত্ তাকাসুর

এ সূরাটি অত্যন্ত গভীর, ভীতিময় ও গাম্ভীর্যপূর্ণ বক্তব্যে সমৃদ্ধ। মনে হয় যেন একজন সতর্ককারী কোনো উচ্চস্থানে আরোহণ করে সুউচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে ঢেড়া পিটিয়ে সে সব লোককে হুশিয়ার করছে, যারা অলস, উদাসীন, অপরিণামদর্শী, গভীর ঘুমে অচেতন। জাহান্নামের কিনারে পৌছেও চোখ বুঁজে পড়ে আছে এবং তাদের গোটা স্নায়ুমন্ডলী যাদুর প্রভাবে অবশ হয়ে আছে। সতর্ককারী যত জোরে সম্ভব চিৎকার করে তাদের বলছে, 'কবরের সাক্ষাত হওয়া পর্যন্ত বেশী বেশী সম্পদ লাভের প্রতিযোগিতা তোমাদের উদাসীন করে দিয়েছে।'

সূরা আল আসর

মাত্র তিনটি আয়াতের সমাহার এ ক্ষুদ্র সূরাটিতে মানব জীবনের জন্যে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বিদ্যমান। এ জীবন বিধানের রূপরেখা, অবিকল ইসলাম যেমন মানব জীবনের জন্যে হওয়া উচিত বলে প্রত্যাশা করে, তেমনি। অত্যন্ত স্পষ্ট, নিখুঁত

www.pathagar.com

ও সূক্ষ্মভাবে ঈমানী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলোকে তার সর্বব্যাপী ও বিরাট মূলতত্ত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে এ সূরায়। সত্যি বলতে কি, এ সূরাটি তার শেষ আয়াতে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দের মধ্য দিয়ে গোটা ইসলামী শাসনতন্ত্র ও সংবিধান রচনা ও প্রতিষ্ঠিত করেছে, মুসলিম উম্মাহর জাতিসত্তার বর্ণনা দিয়েছে, তার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছে। এটি এমন এক অলৌকিক কীর্তি, যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ সম্পাদন করতে সক্ষম নয়।

যে মহাসত্যক এ সূরা সামগ্রিকভাবে তুলে ধরে, তাহলো সকল যুগে ও সর্বকালে মানব জাতির সমগ্র ইতিহাসে একটিমাত্র জীবন যাপন পদ্ধতি ছিলো এবং আছে, যা লাভজনক ও উপকারী এবং যা মানুষের মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে। যে জীবন যাপন পদ্ধতির সীমারেখা এ সূরায় অংকিত হয়েছে এবং যে জীবন ব্যবস্থার রূপ কাঠামো এ সূরায় দেয়া হয়েছে, সেটিই উল্লিখিত জীবন ব্যবস্থা। এর বাইরে যতো রকমের জীবনাচার ও জীবন পদ্ধতি আছে, তার সবই সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক।

সূরা আল হুমাযাহ

ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক যুগের পরিস্থিতির একটি বাস্তব দিক এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে। আসলে প্রত্যেক সমাজ পরিবেশেই এ ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। এক ধরনের সংকীর্ণমনা ছোটো লোক অনেক সমাজেই দেখা যায়। তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে নিজের প্রতিপত্তি জমাতে চেষ্টা করে। এ জন্যে সে যতো নীচে নামা সম্ভব নামে। তারা ভাবে, সম্পদই হলো জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান পুঁজি। এর চেয়ে আর কোনো মূল্যবান জিনিস নেই। মানবিক, নৈতিক কিংবা সামাজিক মূল্যবোধ সবই অর্থ-সম্পদের সামনে হেয় ও গৌণ। তারা মনে করে, অর্থের মালিক হতে পারলেই সকল মানুষের মান-মর্যাদা ও মূল্যবোধ বিনা হিসাবে তার করতলগত হবে।

সূরা আল ফীল

সূরা ফীলে আখেরী নবী মোহাম্মদ (স.)-এর নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বে অনুষ্ঠিত এক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র আরব ভূখন্ডকে তাঁর সর্বশেষ সুমহান জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করার জন্যে পূর্বাহ্নেই নির্বাচিত করে রেখেছিলেন। এ ঘটনা থেকে আরো ইংগিত পাওয়া যায়, আরব ভূখন্ড থেকেই বিশ্বব্যাপী হেদায়াতের আলো ছড়িয়ে পড়বে এবং জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন করে সত্য কল্যাণের প্রভায় স্নাত হবে গোটা বিশ্ব-নিখিল।

আসহাবে ফীলের ঘটনা

বিভিন্ন রেওয়ায়াতের মাধ্যমে জানা যায়, ইয়েমেনে পারস্য শাসনের অবসানের পর আবরাহা নামক একজন ইথিওপিয়ান (হাবশী) শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

আবরাহা ইয়েমেনে ইথিওপিয়ান শাসকের নামে স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ এক সুবিশাল গির্জা নির্মাণ করে। তার উদ্দেশ্য ছিলো, মক্কার পবিত্র বায়তুল্লাহর পরিবর্তে

www.pathagar.com

আরবসহ সকল দেশের অধিবাসীরা যেন এ গির্জাকেই যেয়ারতের কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করে এবং তীর্থস্থান হিসাবে সবাই যেন এখানেই আসে। সে আরো আশা করেছিলো, এ গির্জা সমগ্র আরবের কেন্দ্রস্থলে অবস্থানের কারণে আরব উপদ্বীপের প্রধান তীর্থকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। আর উত্তর ও দক্ষিণের সকল অধিবাসীই দলে দলে এখানে ছুটে আসুক। রাজার কাছে তার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অনুমোদন কামনা করে সে একটি চিঠিও পাঠায়, কিন্তু আরবদের দৃষ্টি পবিত্র বায়তুল্লাহ পরিত্যাগ করে তার নবনির্মিত গির্জার প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হলো না।

আরবরা নিজেদের হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরসূরি হিসাবে দাবী করতো। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর নির্মিত বায়তুল্লাহকে পবিত্র ঘর হিসাবে এর মর্যাদা ও সম্মান সংরক্ষণ এবং এর ঐতিহ্য ধরে রাখা নিজেদের জন্য অত্যন্ত গৌরবজনক বলে মনে করতো। তারা ইহুদী ও খৃস্টানদের তীর্থভূমির চেয়ে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর হওয়া এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল্লাহর সুউচ্চ গৌরব ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা তাদের পবিত্র দায়িত্ব মনে করতো। বায়তুল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়া বা এর পতন ও বিপর্যয় সাধনের চিন্তা তাদের কাছে ছিলো অকল্পনীয়। তারা সকল আহলে কেতাবের চেয়ে কাবার রক্ষক ও তার প্রতিবেশী হিসাবে নিজেদের অধিক সম্মানের অধিকারী মনে করতো।

এমতাবস্থায় আবরাহা তার নির্মিত গির্জার গুরুত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি না পেয়ে কাবা ঘরের ধ্বংস সাধন, একে ধূলিস্মাৎ করা ও কাবা থেকে লোকদের ফিরিয়ে নেয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। আবরাহা তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ৬০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের অভিযানে রওয়ানা হয়। তার রওয়ানা হওয়ার পর আরবরা এ সংবাদ শুনেও ফেলে। 'যুনফর' নামক এক অভিজাত ইয়েমেনী নেতা আবরাহার এ অভিযান প্রতিরোধ ও বায়তুল্লাহর ধ্বংস থেকে তাকে বিরত রাখার জন্যে তার নিজের গোত্র ও বিভিন্ন গোত্র থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে আবরাহার সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু যুদ্ধে যুনফর ও তার বাহিনী পরাজয় বরণ করে এরং যুনফর বন্দী হয়।

এরপর পথিমধ্যে আরবের দুটি প্রসিদ্ধ গোত্র ও বিপুল সংখ্যক আরবদের সাথে নিয়ে নুফাইল ইবনে হাবীব আল খাসয়ামী আবরাহার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে এ বাহিনীও পরাজিত এবং নুফাইল বন্দী হয়। এমনিভাবে এ সকল খন্ডযুদ্ধে আবরাহার বিজয়ের কারণে আরবদের মনে আরো আতংক সৃষ্টি হয়।

অতপর আবরাহার বাহিনী তায়েফের নিকটবর্তী সাকীফ গোত্রের এলাকায় এলে বনু সাকীফ তাদের দেবতা 'লাত'-এর জন্য নির্মিত মন্দির আবরাহা বাহিনীর হাতে থেকে হেফাযতের জন্যে তাদের সহযোগিতা করে। বনু সাকীফের নেতা আবরাহা বাহিনীকে মক্কার পথ প্রদর্শনের জন্য তার গোত্র থেকে একজন রাহবারও তাদের সাথে দিয়ে দেয়।

আবদুল মোত্তালেবের দৃঢ়তা!

আবরাহা অগ্রসর হয়ে তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থান মুগাম্মাসে অবস্থানকালে 'তেহামা' ও 'কোরায়শ'সহ বিভিন্ন গোত্রের কয়েকশ গৃহপালিত পশু চারণভূমি থেকে

www.pathagar.com

নিয়ে যায়। এ পশুসমূহের মধ্যে আবদুল মোত্তালেব ও বনু হাশেমের দু'শত উটও ছিলো। আবদুল মোত্তালেব ছিলেন কোরায়শদের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি ও গোত্রপতি।

কোরায়শ, কেনানা ও হোযায়ল গোত্রের লোকেরা প্রথমে আবরাহা বাহিনীর মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু এতো বড়ো বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে পরাস্ত হতে হবে মনে করে তারা তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে।১

মক্কায় প্রবেশ করে অবরাহা এ মর্মে দূত পাঠায় যে, সে শুধু কাবা ঘর ধ্বংসের জন্যই এসেছে, যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা তার নেই। সে মক্কাবাসীকে এও জানাতে চায়, কাবার প্রতিরক্ষার জন্যে যদি মক্কাবাসী মোকাবেলায় লিপ্ত না হয়; তাহলে রক্তপাতের কোনো ইচ্ছা তার নেই। আবদুল মোত্তালেব আবরাহার দূতের সাথে আলোচনার পর তাকে জানান, আল্লাহর কসম, আবরাহার সাথে যুদ্ধের কোনো ইচ্ছা এবং শক্তিসামর্থ কোনোটাই আমাদের নেই। এটি আল্লাহর পবিত্র ঘর ও ইবরাহীম (আ.)-এর নির্মিত। আল্লাহই এর রক্ষাকর্তা। কাবা ঘর রক্ষা করতে চাইলে তিনিই তা করবেন। যদি তিনি তাঁর ঘর রক্ষা না করেন, তবে আল্লাহর কসম, প্রতিরোধের কোনো শক্তিই আমাদের নেই। আবরাহার দূতের সাথে আলোচনার পর আবদুল মোত্তালেব নিজেও আবরাহার কাছে যান।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আবদুল মোত্তালেব তৎকালীন সমাজে খুবই প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন সুদর্শন ও সুঠাম দেহের অধিকারী। আবরাহা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। এমনকি তাকে নিচে বসিয়ে নিজে সিংহাসনে বসে থাকাও সমীচীন মনে করেনি। আবরাহা আবদুল মোত্তালেবের সম্মানে সিংহাসন থেকে নেমে বিছানায় বসে পড়ে এবং আবদুল মোত্তালেবকে তার পাশেই বসায়।

তারপর আবরাহা তার দোভাষীর মাধ্যমে জানতে চাইলো, কোরায়শ সরদার আবদুল মোত্তালেবের আগমনের উদ্দেশ্য কী? আবদুল মোত্তালেব বললেন, আমার উট ফিরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। আবদুল মোত্তালেবের কথা শুনে আবরাহা বললো, হে কোরায়শ নেতা। আমি আপনাকে দেখে প্রথম মুগ্ধ অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আমি আপনাকে খুবই প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি বলেই ধারণা করেছি, কিন্তু আপনার কথা আমার সমস্ত ধারণাই পাল্টে দিলো। আপনি আপনার উটের প্রসংগটাই আমার কাছে উত্থাপন করলেন, অথচ আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষদের সম্মানিত ঘর আপনাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্র কাবা ঘরের প্রসংগ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন! যে ঘর ধ্বংস করার জন্য আমি এসেছি, সে প্রসংগে কোনো কথাই আপনি উত্থাপন করলেন না? আবরাহার এ প্রশ্নের জবাবে আবদুল মোত্তালেব বললেন, হে রাজা! আমি উটের মালিক, তাই আমি উটের প্রসংগ উত্থাপন করেছি। কাবার মালিক তো আমি

১. বিভিন্ন তাফসীর থেকে জানা যায়, আবরাহা বাহিনীতে ৬০ হাজার সৈন্য ও ১৩টি হস্তি ছিলো।—সম্পাদক

www.pathagar.com

নই। তাই কাবা রক্ষার দায়িত্বও আমার নয়, কাবা ঘরের যিনি মালিক তিনিই তাঁর ঘর রক্ষা করবেন।

আবরাহা বললো, আমার হাত থেকে কাবা ঘর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মোত্তালেব বললেন, এ ব্যাপারে আপনার সাথে কাবার মালিকের সাথেই বুঝাপড়া হবে। এই আলাপ আলোচনার পর আবরাহা আবদুল মোত্তালেবের উটগুলো ফেরত দেয়।

আবদুল মোত্তালেবের দোয়া

আবদুল মোত্তালেব ফিরে এসে সবার কাছে আদ্যোপান্ত পুরো বিবরণ তুলে ধরলেন। তিনি মক্কাবাসীকে ঘরবাড়ী ছেড়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পর্বত চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেন। মক্কা নগরী থেকে রেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে আবদুল মোত্তালেব আরও কিছু সংখ্যক কোরায়শসহ কাবার দরজায় কণ্ঠলগ্ন হয়ে অশ্রু বিগলিত নয়নে আল্লাহর কাছে দোয়া করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কথিত আছে, আবদুল মোত্তালেব তখন আবেগভরা কণ্ঠে নিম্নোক্ত কবিতাগুচ্ছ আবৃত্তি করছিলেন–

'হে প্রভু! বান্দা তার নিজ ঘর রক্ষা করে
তুমি তোমার ঘর রক্ষা করো।
আগামীকাল যেন তোমার ঘরের ওপর ক্রুশ ও তাদের অভিযান বিজয়ী না হয়।
তুমি যদি আমাদের ও তোমার ঘরকে এমনি ছেড়ে দিতে চাও
তাহলে সেটা হবে তোমার ব্যাপার, তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পারো।'

শেষ পর্যন্ত আবরাহা যখন তার সব সৈন্য ও হস্তিবাহিনী নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের উদ্দেশে রওয়ানা হলো তখন তার হাতিগুলো আকস্মিকভাবে থমকে দাঁড়ায়, সামনে আগানোর জন্যে অনেক চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও হাতিগুলো এক পাও অগ্রসর হলো না।

হাতির এ আচরণ বোখারী শরীফে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (স.)-এর একটি হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে ওমরার উদ্দেশে আল্লাহর রসূল (স.) যখন ১৪০০ সাহাবীকে নিয়ে মদীনা থেকে মক্কায় রওয়ানা হন, তখন হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর আল্লাহর রসূলের উট আর মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, উটগুলো অবাধ্য হয়ে গেছে, ওরা মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। রসূল (স.) বললেন, উট অবাধ্য হয়নি– অবাধ্য হওয়ার জন্য ওদের সৃষ্টি করা হয়নি; বরং হস্তিবাহিনীকে যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে থামিয়ে দেয়া হয়েছিলো সে জায়গাটিই তাদের আটকে দিয়েছে।১

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, মহানবী (স.) মক্কা বিজয়ের দিন দশ হাজার সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা মক্কাকে হস্তিবাহিনী থেকে হেফাযত করেছেন, আর তাঁর রসূলকে ও মোমেনদের বিজয়ী বেশে প্রবেশের সম্মান দান করেছেন। মক্কা নগরীর সম্মান মর্যাদা রক্ষা করা সেদিন যেমনি অপরিহার্য ছিলো,

১. প্রকৃত পক্ষে সে বছর রসূল (স.) মক্কা গিয়ে ওমরাহ করতে পারেননি, হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পর পরের বছর গিয়ে ওমরা করেছেন।–সম্পাদক

www.pathagar.com

আজও তেমনি অপরিহার্য। তোমরা যারা আমার যবান থেকে একথাগুলো শুনছো, তারা যারা এখানে অনুপস্থিত তাদের নিকট অবশ্যই এ কথাগুলো পৌঁছে দিও।'

উল্লিখিত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে হস্তিবাহিনীর ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

আবরাহা বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা

অতপর আল্লাহ তায়ালা শুধু হাতির পা'গুলোই স্তব্ধ করে দিলেন না, বরং আবরাহা সহ পুরো বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্যে পাথরসহ দলে দলে আবাবীল পাখী পাঠালেন। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী মুখে ও পায়ে পাথর নিয়ে আবরাহা বাহিনীর ওপর নিক্ষেপ করতে লাগলো। পাথরের আঘাতে তাদের অবস্থা জন্তু জানোয়ারের চর্বিত ঘাষপাতার মতো হয়ে গেলো। তারা চর্বিতচর্বণে পরিণত হলো। যার বর্ণনা আল কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে।

আবরাহা নিজেও পাথরের আঘাত থেকে বাঁচতে পারেনি। সে তার দলবল নিয়ে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ইয়েমেনের রাজধানী 'সানা'য় গিয়ে পৌঁছে, পরে হৃদয় বিদীর্ণ অবস্থায় সে মারা যায়।

এ ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের বর্ণনা রয়েছে। পাখী এবং পাথরের আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কেও নানা ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

মোট কথা, বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, এক অলৌকিক, অস্বাভাবিক এবং অতি প্রাকৃতিক ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা হস্তিবাহিনীর ধ্বংস সাধন করেন। কেউ কেউ বলেন, পাথরকুচি নিক্ষেপের ফলে এক ধরনের জটিল চর্ম রোগের সৃষ্টি হয়ে শরীরে পচন ধরে তারা মৃত্যুবরণ করে। ওই বছর মক্কায় ভীষণ চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। কেউ কেউ পাখী বলতে মশা মাছি, আর পাথর কুচি বলতে মশা-মাছির ছড়িয়ে দেয়া রোগ জীবাণু বুঝিয়েছেন। কেননা পাখী বলতে বুঝায় যা পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। মশা মাছিও পাখা ছড়িয়ে উড়ে বেড়ায়।

ইমাম মোহাম্মাদ আবদুহু তার লিখিত তাফসীরে লিখেছেন, আবদুল মোত্তালেবের দোয়ার পরদিন ব্যাপকভাবে চর্ম ও খুজলি-পাঁচড়া রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ইকরামা বলেন, হস্তিবাহিনীর এ ঘটনার মাধ্যমে আরব দেশে মহামারী আকারে চর্ম রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ইয়াকুব ইবনে ওতবা বর্ণনা করেন, এ ঘটনার বছরই আরব দেশে চর্মরোগ, খুজলি-পাঁচড়া মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করে। সে এমন ধরনের জটিল ও কষ্টদায়ক চর্ম রোগ, যাতে প্রথম এক ধরনের খুজলির মতো ওঠে, পরে তা পচে গলে চামড়া ঝরে পড়তে থাকে, তার পর খসে পড়া অংশ থেকে রক্ত পুঁজ নির্গত হতে থাকে এবং রুগ্ন ব্যক্তির দেহ ক্ষত-বিক্ষত ও দুর্গন্ধময় হয়ে যায় আর তিলে তিলে যন্ত্রণা ভোগ করে অবশেষে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এমনিভাবে পাথরকুচি নিক্ষেপের ফলে আবরাহা ও তার সেনাবাহিনীর দেহে পচন ধরে। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পালিয়ে যাওয়ার সময় অনেকেই পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করে। আবরাহা ক্ষতবিক্ষত দেহে 'সানায়' উপস্থিত হওয়ার পর মারা যায়। অবশ্য এ ব্যাপারে অধিকাংশের মতে এটিই বিশুদ্ধ মত যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী দ্বারা নিক্ষিপ্ত পাথরকুচি দেহে

www.pathagar.com

পড়ার সাথে সাথে সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং বাতাসের মাধ্যমে বিষাক্ত জীবাণুর সংমিশ্রণে আহত ব্যক্তি বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করে।

কারো কারো মতে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে এ মর্মও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এ পাখীকুল মশা, মাছিও হতে পারে, যারা বিভিন্ন রোগ-জীবাণু বহন করে ঘুরে বেড়ায়। এ সকল জীবাণু পাকা মাটির সাথে মিশ্রিত ছিলো, আর ছোট ছোট পাখীর দল মাটির ক্ষুদ্রকণা জীবাণুসহ হস্তিবাহিনীর ওপর নিক্ষেপ করে। পাখীদের নিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরা থেকে বায়ুমন্ডলীয় প্রবাহের সাথে মানব দেহের লোমকূপে প্রবেশ করে এক মারাত্মক ধরনের ক্ষত ও চর্ম রোগের সৃষ্টি করে। তখন পচন ধরা সেই দেহ ক্ষতবিক্ষত হয় এবং পুঁজ ও রক্ত নির্গত হয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি মারা যায়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ ক্ষুদ্র প্রাণীকুল যুগে যুগে আল্লাহর শক্তিশালী সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালন করে আসছে। আল্লাহদ্রোহীদের বিনাশ সাধনে আজও এদের তৎপর হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহান কুদরতে ক্ষুদ্র পাখীদের দ্বারা শত্রুর বিনাশ সাধন করতে পারেন, 'আসহাবে ফীল'-এর ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এ ঘটনার তাৎপর্য এও হতে পারে, পর্বতচূড়া থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী এসে পাথরকুচি নিক্ষেপের ফলে আবরাহা বাহিনীর ধ্বংস সাধিত হয়। আল্লাহর সৈনিক তো সবাই হতে পারে। সৃষ্টির প্রতিটি পরতে পরতে তাঁরই অস্তিত্বের নিদর্শন বিরাজমান। প্রকৃতি জগতের প্রতিটি অণু-পরামাণু সাক্ষ্য দিচ্ছে আল্লাহ তায়ালা শুধু একজন। সমগ্র সৃষ্টিতে এমন কোনো শক্তি নেই যা আল্লাহর শক্তিকে পরাজিত করতে পারে। বিদ্রোহী আবরাহা তার সকল শক্তি নিয়ে আল্লাহর ঘর ধ্বংস করতে এলে আল্লাহ তায়ালা পাথরকুচিসহ ক্ষুদ্র পাখি প্রেরণ করে আবরাহা ও তার দলবলকে মক্কা নগরীতে প্রবেশের আগেই ধ্বংস করে দেন।

এ ছিলো আল্লাহর এক বড়ো ধরনের অনুগ্রহ, যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাঁর শেষ নবী (স.) ও তাঁর ঘরের এবং হেরেমের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা যদি সে মুহূর্তে তাঁর ঘরের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ না করতেন, তাহলে আবরাহার হস্তিবাহিনী মক্কাবাসীসহ বায়তুল্লাহ ধ্বংস করে দিতো। পুরো ঘটনার এ তাফসীরকেই আমরা নির্ভরযোগ্য, বিশুদ্ধ তাফসীর হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। এছাড়া অপরাপর ব্যাখ্যা নানাবিধ সুনির্দিষ্ট দলীল-প্রমাণ ব্যতীত গ্রহণ করা ও তার বিশুদ্ধতা মেনে নেয়া যায় না, যদিও বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। এখানে আরও লক্ষণীয়, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে সর্বাধিক বিশাল বপুর অধিকারী হাতিকে আল্লাহর ক্ষুদ্র পক্ষীকুল ও পাথরকুচি দ্বারা ধ্বংস সাধনের ব্যাপারটিও সত্যিই বড় অদ্ভুত ও বিস্ময়কর!

আমরা এর কোনো বাস্তব ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না যা মোহাম্মদ আবদুহু তার তাফসীরে পাখীর চঞ্চু, চোখ ও পায়ের মাটির সাথে জীবাণু ছড়িয়ে চর্ম রোগের প্রাদুর্ভাবের মাধ্যমে হস্তিবাহিনীর ধ্বংস হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ ইকরামার রেওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপে হাতি ও আরোহীদের

www.pathagar.com

মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে এবং তাদের দেহ চর্বিত চর্বণের মতো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং সূরার শেষ আয়াতে যাকে 'কা-আসফিম মা'কুল' বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো চর্বিত চর্বণের মতো হয়ে যাওয়া। এ পন্থায়ও আল্লাহর কুদরত উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন।

আল্লাহ তায়ালা যে কোনো পদ্ধতিতে তাঁর ইচ্ছা কার্যকর করতে পারেন। তিনি মানুষের পরিচিত পন্থায় উন্মুক্তভাবেই যদি কোনো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে চান, তবে তা করতে পারেন। অথবা মানুষের অপরিচিত, অকল্পনীয় ও অদৃশ্যভাবে তাঁর নিজের পরিকল্পনা কার্যকর করতে পারেন। তিনি তাঁর ইচ্ছা কার্যকর করার ব্যাপারে সর্বশক্তিমান। তিনি কোনো নিয়মের অধীন নন; বরং তাঁর গৃহীত পন্থাই হলো আসল নিয়ম।

আল্লাহ তায়ালার নিয়ম তো তাই, যা তিনি করেন। আল্লাহর গৃহীত পন্থা মানুষের চির পরিচিত হওয়া, মানুষের শক্তি-সামর্থের অধীন এবং অনুভূত ও বোধগম্য হওয়া মোটেই জরুরী নয়। আল্লাহ তায়ালা যদি চিরাচরিত পদ্ধতির বিপরীত অলৌকিক এবং অতি প্রাকৃতিক পন্থায়ও কোনো কিছু করেন, তবে তাকেই আল্লাহর গৃহীত পন্থা পদ্ধতি হিসাবে মেনে নিতে হবে। যারা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করে না, অথবা যারা বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে এ ঘটনার নানাবিধ ব্যাখ্যা করতে চায়, তাদের কারও মতামত আমরা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারি না।

কোরআন হাদীসের সুস্পষ্ট ওহী দ্বারা ঘটনা বিস্ময়কর ও অলৌকিক বলে প্রমাণিত হয়। অথচ তা মানুষের সমাজে প্রচলিত পরিচিত সাধারণ প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষের সমাজে প্রচলিত, পরিচিত নিয়ম ও ধারণা বহির্ভূত হলেই যে তা আল্লাহর নিয়ম ও সামর্থের বাইরে হবে তা নয়। সূর্যের প্রতিনিয়ত উদয়াস্ত, মানবদেহের অভ্যন্তর থেকে জীবিত মানব শিশু প্রসব, এ সকল ঘটনাও তো মানুষের নিজস্ব শক্তি ও ক্ষমতা বহির্ভূত, অথচ তা মানুষের দৃষ্টিতে চির পরিচিত ও সব সময় তা ঘটছে। তাই আল্লাহ তায়ালা যদি ক্ষুদ্র পাখী ও পাথরকণা দ্বারা কোনো শক্তিধর শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত পর্যদুস্ত করেন, তবে মহাশক্তিমান আল্লাহর জন্য তা একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। তিনি যদি ক্ষুদ্র পাখী ও পাথরকুচি দ্বারা কিংবা মহামারীর মতো ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত করে কোনো বাহিনীর ধ্বংস সাধন করেন, তাঁর জন্য খুবই সহজতর। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে বিস্ময়কর ঘটনার মাধ্যমে মানব সমাজে সাধারণ প্রচলিত নিয়মের বিপরীত পন্থায় তাঁর ঘরের সংরক্ষণ ও তাঁর ঘরের শত্রু বাহিনীর প্রতিরোধকল্পে অলৌকিক পদ্ধতিতে যদি পাখী ও পাথরকুচি দ্বারা শত্রু বাহিনীর দেহ ক্ষতবিক্ষত করে থাকেন, তবে তা আল্লাহর গৃহীত সফল পদক্ষেপ এবং তাঁর জন্যে চেষ্টা খুবই সহজ। এসবই তাঁর অসীম কুদরতের প্রমাণ বহন করে।

ঘটনার তাৎপর্য

আমরা যদি অলৌকিকত্বের কারণে এ ঘটনা গ্রহণ করতে ইতস্তত করি এবং পাখী ও পাথরকুচির আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে নানা ধরনের অভিমত পোষণ করি তবে এর পূর্বেও তো আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের শত্রুদের ও বিভিন্ন নবীদের দাওয়াত অস্বীকার

www.pathagar.com

করার কারণে অনেক অস্ত্রধারীকে অলৌকিক পন্থায় ধ্বংস সাধন করার ঘটনার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই কালামে পাকের মধ্যে। আমরা সে সকল ঘটনা কোন দৃষ্টিতে গ্রহণ করবো? প্রকৃত মানবীয় শক্তি সামর্থের দৃষ্টিতে যা সসীম এবং মানুষের শক্তি সামর্থ বহির্ভূত বলে অনুভূত হয়, অসীম ক্ষমতাবান আল্লাহর পক্ষে তা খুবই স্বাভাবিক ও সহজতর।

আমরা অত্যন্ত সহজভাবেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র ঘরের হেফাযত এবং মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল সংরক্ষণের লক্ষ্যে তাঁর অসীম কুদরতের মাধ্যমে মানবীয় দৃষ্টিতে অলৌকিক পদ্ধতিতে অভিযানকারীদের ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর অসীম ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত ও নবুওত অস্বীকারকারী কোরায়শ সম্প্রদায়কে এ ঘটনা থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের ইংগিত প্রদান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের বিরোধীদের সকল চক্রান্ত ষড়যন্ত্র অনায়াসে ব্যর্থ ও পর্যদুস্ত করে দিতে সক্ষম। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো বড়ো ধরনের প্রস্তুতি, শক্তিশালী কোনো মাধ্যম এবং উপায় উপকরণের প্রয়োজন নেই। সকল যুগের মানুষের সামনে তাঁর কালজয়ী অসীম কুদরতের দৃষ্টান্ত তিনি উপস্থাপন করেছেন।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুওতের দাওয়াতের সূচনালগ্নেই কোরায়শদের চোখে আংগুল দিয়ে আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেন, কি বিস্ময়কর ও অকল্পনীয়ভাবে তিনি তাঁর দ্বীন ও তাঁর ঘরের হেফাযতের জন্য বিরোধী ও চক্রান্তকারী শক্তিকে কতো সামান্য ও ক্ষুদ্র শক্তির মাধ্যমে চিরতরে পরাস্ত করে দিতে পারেন, পরাজিত, চূর্ণবিচূর্ণ, ক্ষতবিক্ষত, নিশ্চিহ্ন ও নাস্তানাবুদ করে দিতে পারেন। তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্যে কোনো পরিচিত পদ্ধতি ও পন্থা গ্রহণ করা তাঁর জন্য জরুরী নয়। তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি এক ও একক শক্তিমান।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা সূরা ফীলের সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে শায়খ আবদুহুর ব্যাখ্যা কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারি না। বিশেষ করে, মহামারী আকারে মাটির সাথে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার ফলে চর্মরোগ সৃষ্টি হয়েছে– এ ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ করা হয় তবে কোরআনে হাকীমে বর্ণিত পাখীদের বয়ে আনা পাথরকুচির আঘাতে সেনাবাহিনীর দেহ ক্ষতবিক্ষত, চূর্ণবিচূর্ণ, হৃদয় দীর্ণবিদীর্ণ ও চর্বিত চর্বণে পরিণত হওয়ার স্পষ্ট বর্ণনা গ্রহণ করা যায় না। অথচ কোরআনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে– 'কা-আসফিম মা'কুল'। এ আয়াতে তাদের দেহ খন্ড-বিখন্ড চূর্ণ বিচূর্ণ ও চর্বিত চর্বণে পরিণত হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইকরামার বর্ণনায় সে বছর প্রথম বারের মতো মক্কায় চর্মরোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট নয়। সূরা 'ফীলে' বর্ণিত আয়াতে আবরাহা ও তার সেনাদলের মধ্যে চর্মরোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার কথাও পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। এমন কি তৎকালে আরবে চর্মরোগ ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপার ঐতিহাসিক বর্ণনায়ও

www.pathagar.com

সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। শায়খ আবদুহু বিষয়টি বৈষয়িক বিশ্লেষণ ও প্রচলিত নিয়মের বিপরীত হওয়ার কারণেই কিছুটা হীনমন্যতাপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। শায়খ মুহাম্মাদ আবদুহু যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন সে প্রতিষ্ঠানটি তথাকথিত আধুনিক প্রগতিবাদীদের বিকৃত চিন্তা থেকে মুক্ত ছিলো না। সে প্রতিষ্ঠানে তথাকথিত যুক্তিবাদকে প্রাধান্য দেয়া হতো। তৎকালে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বিকৃত চিন্তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রাণকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিলো। কোরআন করীমের সব কিছুকে যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করার মানসিকতা ছিলো এ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অন্যতম বৈশিষ্টও। বুদ্ধি ও যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য মনে না হলেই কোরআনের আয়াতসমূহকে ইহুদীদের বানোয়াট গল্প কাহিনীর প্রলেপ চড়িয়ে বানোয়াট ও বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদানের প্রবণতা এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্লাবনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিলো। তৎকালে হাদীস অস্বীকার করার প্রবণতাও কিছু লোকের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আল কোরআনকে বৈষয়িক দর্শন ও তথাকথিত যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সমকালীন বিজয়ী সমাজ দর্শন ও প্রকৃতি দর্শনের ভিত্তিতে তারা কোরআনের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। তাদের চিন্তা স্থূল দৃষ্টি ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে ইসরাইলী ও খৃস্টীয় চিন্তাধারা সংক্রমিত হয়।

প্রত্যেক ব্যাপারে জড়বাদী ব্যাখ্যার মানসিকতার কারণে, শায়খ আবদুহু ও তার দু'জন সেরা ছাত্র শায়খ রশীদ রেজা ও শায়খ আবদুল কাদের মাগরেবী অনেক ক্ষেত্রে অলৌকিক, অতি প্রাকৃতিক স্থূলবুদ্ধি ও জড় দর্শনের বিপরীত ইন্দ্রিয়াতীত অদৃশ্যমান ঘটনাসমূহ অস্বীকার অথবা বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

আল কোরআনের ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাদের এ আত্মরক্ষামূলক মানসিকতা গড়ে ওঠে, আর এ কারণেই উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত চিন্তাবিদরা ইসলামের নবতর ব্যাখ্যা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এমনিভাবে তারা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের এমন ব্যাখ্যা প্রদান করেন যা সংশ্লিষ্ট মূল বক্তব্য ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক যুক্তি-বুদ্ধির আলোকে উপলব্ধি না করা গেলেও কোরআনের বর্ণিত বহু অলৌকিক ঘটনা আল্লাহর অসীম কুদরত ও সর্বশক্তিমান সত্তারই প্রমাণ উপস্থাপন করে।

মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

এ সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে খুবই প্রজ্ঞা ও সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। বিশেষ করে তথাকথিত আধুনিক চিন্তাধারা থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এখানে অত্যন্ত নিখুঁত, নির্ভুল ও নিরাপদ পদ্ধতিতে আল কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের দৃষ্টিভংগিই প্রমাণিত হয়। এ বিস্ময়কর ও অভিনব পদ্ধতিতে আল্লাহর ঘরের হেফাযত ও অলৌকিকভাবে শত্রু নিপাতের ঘটনা উপস্থাপন ও প্রমাণ করাই হচ্ছে আলোচ্য সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

www.pathagar.com

তাই কোরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্যকে প্রচলিত বুদ্ধি-বিবেক ও স্থুল দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করে কোনো বিষয় বুঝে না আসলে তা অস্বীকার করা কিছুতেই আমাদের জন্য বৈধ ও সংগত হতে পারে না। আল্লাহর গৃহীত কার্যক্রম ও পদক্ষেপ সবসময়ই সাধারণ নিয়মের নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করা যায় না। আর কোরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর পদ্ধতিও গ্রহণযোগ্য নয়; বরং আমাদের বুদ্ধি-বিবেক, যোগ্যতা, প্রতিভা ও সাধনাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত ভাষ্য স্বপ্রমাণিত করার জন্যই নিয়োগ ও ব্যয় করা উচিত। এ পদ্ধতিতে আল্লাহর প্রতি আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় ও আমাদের ঈমানী শক্তি আরও মযবুত হতে এবং বৃদ্ধি পেতে পারে। আমাদের চিন্তা ও ভাষা, আমাদের অনুভূতি ও প্রজ্ঞাকে সামষ্টিকভাবে আল্লাহর ভাষ্য প্রমাণিত করার জন্যে নিয়োগ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্থুল বুদ্ধি, যুক্তি, আবেগ ও উচ্ছাসকে আমাদের নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে গ্রহণ না করে ঈমান একীনের বুনিয়াদেই পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হওয়া অপরিহার্য। আল কোরআনের সুস্পষ্ট পরিচ্ছন্ন ভাষ্যের আলোকেই বিশ্ব প্রকৃতির ঘটনাসমূহ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত ঘটনা, মানবিক চিন্তা ও মূল্যবোধ, স্থুল বুদ্ধির পরিবর্তে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কোরআন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান দ্বারা আল কোরআন তথা অসীম কুদরতময় আল্লাহ্ তায়ালার ভাষ্য বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার মানসিকতা কখনও গ্রহণযোগ্য এবং যুক্তিসংগত হতে পারে না। কেননা মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধি বিশ্লেষণ শক্তি ও অভিজ্ঞতা খুবই সীমাবদ্ধ একান্তই সসীম।

মানুষের বুদ্ধি বিবেক যদিও জ্ঞান-সাধনা, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ও ভূমিকার অধিকারী এবং অনেক ক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধি-চিন্তা ও গবেষণা খুবই বিস্ময়কর অবদান রাখে, তথাপি প্রকৃত বিশ্লেষণ, তথ্যানুসন্ধান ও সত্য আবিস্কারের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রেও মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান বারংবার ভুলের সমুদ্রে সাঁতার কাটতে থাকে। মানবীয় বুদ্ধি-বিবেকপ্রসূত অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়েও ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হতে পারে। কেননা মানুষের বুদ্ধি জ্ঞান খুবই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আল্লাহর অসীম জ্ঞানের সাথে মানবীয় জ্ঞানের কোনো প্রকার তুলনা বা উপমাই হতে পারে না।

আল কোরআন প্রদত্ত জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত সে অসীম প্রজ্ঞাময় সত্তার সাথে সম্পৃক্ত, তাই মানুষের জ্ঞান পিপাসা সে অসীম সত্তার প্রস্রবণ থেকে নিসৃত স্বচ্ছ জ্ঞানসুধা দ্বারাই মিটতে পারে। পিপাসাকাতর মানুষ একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত আল কোরআনের আবে হায়াতের পেয়ালা পান করেই অতৃপ্ত হৃদয়ের সকল ক্ষুধা ও পিপাসার জ্বালা নিবারণ করতে পারে। তাই কোরআনে উপস্থাপিত কোনো ঘটনা, তথ্য ও তত্ত্ব মানুষের স্থুল-বুদ্ধি বিবেকের সাথে সংঘাত ও সংঘর্ষশীল মনে করে তাকে অস্বীকার করা বা তার অপব্যাখ্যা করা আল কোরআনের প্রতি বিশ্বাসের দাবীদার কোনো মানুষের পক্ষে কস্মিনকালেও সম্ভব হতে পারে না। বস্তুত কোনো মোমেনেরই এ অধিকার নেই। অথচ স্থুল বুদ্ধি বিবেকের পর্যালোচনায় আল কোরআনের উপস্থাপিত অনেক ঘটনা ও

www.pathagar.com

ভাষ্যকে সংঘাতপূর্ণ মনে করে উপরোল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা প্রদানের অপপ্রয়াস চালিয়েছেন।

তাদের এ সকল ব্যাখ্যা তাদের ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তি ও বিকৃত চিন্তার ফল কিনা সে সম্পর্কে আমি কোনো মন্তব্য করবো না, কিন্তু অজ্ঞাতসারে অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও এসকল ক্ষেত্রে তারা মানুষের বুদ্ধি বিবেককে আল কোরআনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, যুক্তি ও বুদ্ধিকে কোরআনের নিয়ন্ত্রক শক্তির আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

আমরা কোনো মতেই আল কোরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও ভাষ্যের পরিপন্থী এ ধরনের বুদ্ধি এবং যুক্তির আবেগ এবং উচ্ছ্বাস গ্রহণ করতে পারি না। আল কোরআনের সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন বক্তব্য ও ভাষ্যের পরিপন্থী ব্যাখ্যা গ্রহণ করা মোমেনের জন্যে অচিন্তনীয় অকল্পনীয়। আমাদের প্রত্যয়দৃপ্ত সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা কখনো এ ধরনের অপব্যাখ্যা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে না। এ ধরনের প্রবণতাকে প্রশ্রয় প্রদান করা মুসলিম জাতিসত্তার অবলুপ্তি, ইসলামী জীবনবোধ ও চেতনার অপমৃত্যুরই নামান্তর। এ ধরনের মন-মানসিকতা, চিন্তা ও কল্পনা প্রকৃতপক্ষে আল কোরআন পেশকৃত সত্য তথ্য ও ঘটনাগুলো অস্বীকার করার শামিল।

সূরা কোরায়শ

হযরত ইবরাহীম (আ.) পবিত্র কাবা ঘর নির্মাণ করে তা পরিস্কারপরিছন্ন করার পর আল্লাহ তায়ালার দরবারে যে দোয়া করেছিলেন, মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর খলীল ইবরাহীম (আ.)-এর সব দোয়াই কবুল করেছিলেন। তিনি আল্লাহর নিকট এ আরযি পেশ করেছিলেন, 'হে আমার প্রভু! তুমি এ নগরকে নিরাপদ নগরীতে পরিণত করো, আর এর অধিবাসীদের ফলমূল, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য এবং যাবতীয় জীবন ধারণ সামগ্রীর প্রাচুর্য দ্বারা সমৃদ্ধ করো।'

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর প্রিয় খলীলের দোয়া কবুল করে পৃথিবীর সকল রাজা-বাদশাহ ও সকল শক্তিধর এবং অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে এ ঘরকে বরাবর পবিত্র ও মুক্ত রেখেছেন। যারা আশ্রয় গ্রহণ করতে চায় তাদের জন্যে এ ঘরকে নিরাপত্তার কেন্দ্রে পরিণত করেছেন। আর এ ঘরের আশেপাশের প্রতিটি ঘরকেও ভয় ভীতি ও ক্ষতি থেকে তিনি নিরাপদ রেখেছেন। এমন কি এ পবিত্র ঘরের ইযযতের কারণে এর প্রতিবেশীরা শেরেক, কুফুর ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হওয়া এবং এ ঘরের প্রভুর এবাদাত পরিহার করা সত্ত্বেও আল্লাহ সোবাহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর ঘরের মর্যাদার খাতিরে তাদের ক্ষতি ও ভীতি থেকে মুক্ত রেখেছেন।

এমনকি কোরায়শরা এ ঘরের মালিকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এ ঘরে শত শত মূর্তি স্থাপন করা সত্ত্বেও এ ঘরের প্রতিবেশী হওয়ার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলামীন হস্তিবাহিনীর হাত থেকে কোরায়শ ও বায়তুল্লাহকে নিরাপদ রেখেছেন। এর হেফাযত করে এ ঘরের মান-মর্যাদা রক্ষা করেছেন। সূরা ফীলের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কোরআনে হাকীমের অপর আয়াতে এরশাদ করেছেন, 'তোমরা কি দেখোনি? আমি (আল্লাহ) এ হারাম (বায়তুল্লাহ)-কে নিরাপদ করেছি, অথচ এর আশেপাশে মানুষের ওপর ছোবল মারা হয়।'

www.pathagar.com

সূরা আল মাউন

কারো কারো মতে এ সূরা রসূল (স.)-এর মক্কী যিন্দেগীতে ব
কারো কারো মতে মাদানী যিন্দেগীতে অবতীর্ণ হয়েছে। কারো কা
তিন আয়াত মক্কী জীবনে ও পরবর্তী চারটি আয়াত মদীনার জীব
'ফী যিলালিল কোরআন-এর' মতে শেষোক্ত মতটিই গ্রহণযোগ
একই ধরনের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। সূরার মূল প্রতিপাদ্য
করলে এ ধারণাই প্রবলভাবে অনুভূত হয় যে, সূরার সমগ্র আলোচ
সাথে সামঞ্জস্যশীল। এ সূরায় মাদানী জীবনে প্রকাশিত বিভি
সংশোধনের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে।

যেমন মুসলিম উম্মাহর সামষ্টিক জীবনধারায় 'মোনাফেকী', 'ি
উল্লেখ রয়েছে। আর স্বভাবতই এ ধরনের দুর্বলতা ও ব্যাধি মদী
পেয়েছে। মক্কী জীবনে এর প্রকাশ ঘটেনি। এমনকি এ ধরনের
ব্যাধি মক্কী জীবনে পরিচিতিও লাভ করেনি। অথচ প্রথম তিনটি আ
আলোচিত হয়েছে, তা থেকে তা মক্কী জীবনের সাথে বেশী সম্পৃক্ত
কেননা, তাতে আখেরাতে বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাসীদের আ
কথা উল্লেখ হয়েছে। আর পরবর্তী আয়াতে মদীনার জীবনের ত্রি
দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে সামঞ্জস
পূর্ববর্তী তিনটি আয়াত ও পরবর্তী চারটি আয়াত একই সূরা
হয়েছে। এখন আমরা এ সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ও মহান শিক্ষ
অগ্রসর হতে পারি।

সাতটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়াত সম্বলিত এ ছোট্ট সূরাটিতে এক
বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে। ঈমান ও কুফুরের ভিত্তিতে মানুষে
চরিত্রে যে বিরাট পার্থক্য ও ব্যবধান আসে, এ সূরায় সুস্পষ্টভাবে
ইসলামী জীবনদর্শন ও পরকালের শাস্তি এবং পুরস্কারের প্রতি দৃঢ় ব
আচরণে যে সকল কল্যাণধর্মী গুণাবলী সৃষ্টি করে এবং যে সকল ম
বৈশিষ্ট্যকে সুষমামন্ডিত করে তোলে তার বিশদ বর্ণনা এসেছে।
আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসীদের চরিত্র, আচরণ কতো জঘন্য হতে
প্রতি কতো নিষ্ঠুর নির্মম হতে পারে, আবার কপট বিশ্বাসী ও প্রদশ
নিয়ে যারা ভন্ডধার্মিকতা অবলম্বন করে, লোক দেখানো ও লেফা
তারা মানুষের প্রতি কতোটা নির্দয় হয়, কতোটা অসহযোগিতামূ
সকল দিকই এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। সবশেষে রসূল প্রেরা
রব্বুল আলামীন যে কল্যাণধর্মী সহমর্মিতা, সংবেদনশীল
সহযোগিতামূলক শান্তির সমাজ ও রহমতের সমাজ গড়ে তুলতে চ
চিত্র এ ছোট্ট সূরাটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সূরা আল কাওসার

এ সূরা বিশেষভাবে সর্বশেষ রসূল মোহাম্মদ (স.)-কে সম্বোধন করেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরা সূরা 'আদ দোহা' ও সূরা 'আল এনশেরাহ'-এর অনুরূপ। উল্লিখিত দুটি সূরায় রসূলুল্লাহ (স.)-এর উচ্চতর সম্মান মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে।

এ সূরায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর হাবীব রসূলুল্লাহ (স.)-কে পর্যাপ্ত সম্মান, মর্যাদা, নেয়ামত ও কল্যাণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর শত্রুদের শেকড়হীন ও নির্মূল করার হুশিয়ারী দিয়েছেন। প্রিয় নবীকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

মক্কী জীবনে 'দায়ী ইলাল্লাহ' হিসাবে ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক স্তরে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে এ ছোট্ট সূরাটি খুবই শিক্ষণীয় ও তাৎপর্যবহ। এ সূরা ইসলামবিরোধী শক্তির চক্রান্ত চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছে এবং শত্রুদের দেয়া সকল কষ্ট, নির্যাতন, অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ, মোমেনদের সংখ্যা স্বল্পতা সত্ত্বেও দুশমনের সকল নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভের আশ্বাস এবং সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর অপার অনুগ্রহপ্রাপ্তির ইংগিত এ সূরায় নিহিত রয়েছে। সূরায় আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শের কথা বলেছেন। শত্রুদের মোকাবেলা করতে গিয়ে তাদের সকল বিরোধিতার সামনে দৃঢ়তা ও ধৈর্য অবলম্বনের তাগিদ দেয়া হয়েছে। শত্রুদের ভীতিপ্রদ শাস্তি প্রদান, পর্যুদস্ত ও নির্মূল করার হুমকি প্রদর্শন করে ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর সুন্দরতম নেয়ামত ও সুউচ্চ সম্মান দান করার আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে।

এতদসংগে সূরা কাওসারে হেদায়াত, ঈমান ও কল্যাণের প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য, গোমরাহী, অসৎপ্রবণতা, কুফরীর মর্ম ও চূড়ান্ত পরিণামের স্বরূপও উদঘাটিত করা হয়েছে। সাথে সাথে রসূলে আকরাম (স.)-এর প্রতি আল্লাহর অনন্ত অনুগ্রহ, চিরন্তন সম্মান মর্যাদাদানের কথার উল্লেখ রয়েছে। ইসলামের শত্রুদের পর্যুদস্ত ও নির্মূল হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে প্রিয় হাবীবকে শান্ত ও আশ্বস্ত করা হয়েছে। যদিও কাফেররা মনে করতো, স্বল্প সংখ্যক মুসলিম ও আল্লাহর রসূল পর্যুদস্ত পরাজিত হবেন, এ কারণেই রসূলকে তারা শেকড়হীন ও আটকূঁড়ে বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

বর্ণিত আছে, কোরায়শদের জঘন্য ব্যক্তিরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর চরম বিরোধিতা করার উদ্দেশে ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক যুগে রসূলের বিরুদ্ধে মারাত্মক চক্রান্ত ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ দুষ্কৃতকারীরা মানুষকে ইসলামী দাওয়াত থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর বিরুদ্ধে নিকৃষ্ট ধরনের অপবাদ, দুর্নাম, অপপ্রচার চালায়। তাঁকে মানসিক অশান্তি ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করার জন্যই সূরা কাওসার অবতীর্ণ হয়। এ সূরা রসূলুল্লাহ (স.)-কে মানসিক প্রশান্তি দান করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে অনন্ত নেয়ামত, প্রাচুর্য, সীমাহীন চিরন্তন অনুগ্রহ, সম্মান মর্যাদা দানের প্রতিশ্রুতি ও সংবাদ প্রদান করেছেন। সূরাটিতে রসূলের শত্রুদেরকেই পর্যুদস্ত, নির্মূল ও সহায় সম্বলহীন করার হুশিয়ারী প্রদান করা হয়।

www.pathagar.com

সূরা আল কাফেরূন

আরববাসীরা আল্লাহদ্রোহী ছিলো না, অথচ তাদের কেউ আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় ও তাঁর সঠিক গুণাবলী সম্পর্কে জানতো না। তারা আল্লাহর পরমুখাপেক্ষী না হওয়া ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলো না। তারা শেরেক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিলো। তারা তাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও নেক লোকের নামে তৈরী করা মূর্তি ও দেবদেবীদের পূজা অর্চনা আরাধনা করতো, আর বিভিন্ন ফেরেশতার নামে তৈরী করা মূর্তিদের পূজা করতো।

তারা এ ধারণা পোষণ করতো, ফেরেশতাকুল হচ্ছে আল্লাহর মেয়ে। তারা আরো মনে করতো যে, আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা ও ওদের দেবীদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। তারা এ সকল দেবদেবীকে উপ-খোদা মনে করতো। এ কারণে তারা এ সকল কল্পিত দেব-দেবী, মূর্তি ও ইলাহদের বন্দেগী করতো।

এমতাবস্থায় তারা ওই সকল দেব-দেবীর পূজা অর্চনা ও উপাসনা করা মহা শক্তিমান আল্লাহর নৈকট্যলাভের অন্যতম পন্থা এবং মাধ্যম মনে করতো। যেমন কোরআন করীমের অন্য এক আয়াতে তাদের উক্তি সম্পর্কে রয়েছে, 'আমরা মহান আল্লাহ তায়ালার ঘনিষ্ঠ নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্য ছাড়া অপর কোনো উদ্দেশে তাদের বন্দেগী করি না।'

কোরআনুল করীমে আরো উল্লেখ রয়েছে, তারা আসমান ও যমীনের স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করতো এবং সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অনুগত বলে স্বীকার করতো। তারা আরও স্বীকার করতো, আকাশের মেঘমালা থেকে বৃষ্টি নাযিল করে আল্লাহ তায়ালাই তৃষ্ণার্ত যমীনকে তৃপ্ত করেন, মৃত যমীনকে জীবিত, সতেজ ও সবুজ করেন। যেমন আল কোরআনে সূরা আল আনকাবুতের আয়াতে রয়েছে–

'তুমি যদি তাদের প্রশ্ন করো, কে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে? সূর্য ও চন্দ্র কার অনুগত? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালার। তুমি যদি তাদের প্রশ্ন করো, আসমান থেকে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মৃত যমীনকে সজীব করেন কে? নিশ্চয়ই তারা বলবে– আল্লাহ তায়ালা।' (সূরা আল আনকাবুত ৬২-৬৩)

কোনো কথা জোর দিয়ে বলার সময়ে, শপথ বা কসম করার সময়ে তারা বলতো, 'আল্লাহর কসম', তারা দোয়ার সময় বলতো 'হে আল্লাহ'।[১]

অথচ, তারা কাজে-কর্মে, চিন্তা-ভাবনায়, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে, তাদের চাষাবাদ ও উৎপাদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেবদেবী ও মূর্তিদের আল্লাহর শরীক ও অংশীদার মনে করতো। তাদের চতুষ্পদ জন্তু, সন্তান-সন্তুতির কমা বাড়ার ক্ষেত্রেও দেব-দেবী ও মূর্তিদের অংশীদার মনে করতো। তারা তাদের নামে মানত করতো। তাদের কাছে সন্তানপ্রাপ্তি রেযেক বৃদ্ধি ও গৃহপালিত প্রাণী বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতো। তাদের সন্তান-সন্তুতি, উৎপাদিত ফল ফসল, সকল গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে আল্লাহ ও তাদের

১. তারা তাদের সন্তানদের নাম যেমন 'আবদুস শামস– 'সূর্যের গোলাম' রাখতো, তেমনি 'আবদুল্লাহ 'আল্লাহর গোলাম'ও রাখতো।–সম্পাদক

www.pathagar.com

দেবদেবীদের জন্যে অংশ নির্ধারণ করতো। আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অংশ দেবদেবীদের নামে বন্টন করা হতো না, আবার দেবদেবীদের নামে নির্ধারিত অংশ আল্লাহর নামে বন্টন করা ও কোরবানী করা হতো না। এ প্রসংগে আল কোরআনে সূরা আনয়ামে উল্লেখ করা হয়েছে, 'এ লোকেরা তাদের নিজেদের ক্ষেত খামারে উৎপাদিত ফসল থেকে ও গৃহপালিত প্রাণী থেকে আল্লাহর জন্য একটি অংশ নির্ধারিত করেছে। তারা বলে এ হচ্ছে আল্লাহর জন্য। এ সব কিছু তাদের (অমূলক) ধারণা কল্পনামাত্র। (আর তারা বলতো, এ অংশ হচ্ছে) আমাদের শরীকদের (দেবদেবীদের) জন্যে। তারা মনে করতো, তাদের মনগড়া শরীকদের অংশ থেকে আল্লাহর কাছে কিছুই পৌছায় না, অথচ আল্লাহর নামে নির্ধারিত অংশ থেকে তাদের মনগড়া শরীকদের নিকট আবশ্যই কিছু পৌছে দেয়া হয়। কতোই না জঘন্য এদের সিদ্ধান্ত!'

এমনিভাবে কল্পিত দেব-দেবীর অনুভূতি তাদের সন্তান বলি দেয়ার কাজকে কতোই না আকর্ষণীয় করে দিয়েছে, যেন তারা তাদের নিজেদের ধ্বংসে নিমজ্জিত করে এবং তাদের দ্বীনকে তাদের জন্যে সন্দেহজনক বানিয়ে নেয়। আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তবে তারা এমনটি করতো না। কাজেই তাদের তুমি ছেড়ে দাও; তারা তাদের মনগড়া মিথ্যা রটনায় নিমজ্জিত থাকুক। (সূরা আনয়া'ম- ১৩৬-১৩৭)

মক্কার মোশরেকরা মনে করতো, এ প্রাণীকুল, এ ক্ষেতখামার (ফসল) তাদের জন্যে সুসংরক্ষিত! তারা ভাবতো, এগুলো তারাই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে যাদের তারা খাওয়াতে চায়, অথচ এসব বিধি নিষেধ ছিলো তাদের নিজেদের মনগড়া ও কল্পিত। এ ছাড়া এমন কিছু প্রাণী রয়েছে যেগুলোর পিঠে আরোহণ ও মাল বহন করা তারা নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে। আবার এমন কিছু প্রাণী রয়েছে, যাদের ওপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, এসব কিছুই তাদের আল্লাহর নামে বানানো কল্পিত মিথ্যা। আল্লাহ তায়ালা খুব শীঘ্রই তাদেরএ মনগড়া মিথ্যার বিনিময়ে উপযুক্ত প্রতিফল দান করবেন।

আর তারা বলে, এ সকল প্রাণীর গর্ভে যা আছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্যে, আমাদের নারীদের জন্যে তা হারাম, আর যদি গর্ভে অবস্থিত প্রাণী মৃত হয়, তবে তা নারী পুরুষের জন্য উভয়ের জন্যেই হালাল। এ সব উদ্ভট মিথ্যা, যা তারা রচনা করেছে। নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাদের এর প্রতিফল দেবেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।

অবশ্যই তারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, যারা মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে, আর তাদের মনগড়া আইনের মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া রেযেক নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে। আল্লাহর নামে মিথ্যা রটনা করে নিশ্চিতভাবে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। কস্মিনকালেও তারা হেদায়াতপ্রাপ্তদের তালিকাভুক্ত ছিলো না।' (সূরা আনয়া'ম ১৩৮-১৪০)

অথচ এমন সব বিভ্রান্তি, ভ্রষ্টতা ও শেরেকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে বলে বিশ্বাস করতো। তারা আরও মনে করতো, তারা ইহুদী নাসারা তথা আহলে কেতাবদের চেয়ে শ্রেয়। তাদের সাথে বসবাসকারী ইহুদীরা বলে, হযরত ওযায়র (আ.) আল্লাহর পুত্র আর নাসারারা বলে,

www.pathagar.com

ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র। এমতাবস্থায় মক্কার মোশরেকেরা ফেরেশতা এবং দেবদেবী বা জ্বিনের পূজা করতো। তারা মনে করতো, ঈসা (আ.) ও ওযায়ের (আ.)-এর তুলনায় ফেরেশতাকুল, জ্বিনেরা ও দেবদেবীরা আল্লাহ্ তায়ালার বেশী ঘনিষ্ঠ ও নিকটতর। বস্তুত গায়রুল্লাহর এবাদাতে লিপ্ত হওয়াই শেরেক। মোশরেক ও আহলে কেতাব উভয় সম্প্রদায় প্রকাশ্য শেরেকে লিপ্ত ছিলো। শেরেক কোনোটাই উত্তম নয়, শেরেকের মধ্যে কোন কল্যাণই নিহিত নেই। অথচ মোশরেকেরা দেবদেবীদের পূজা করে এ আত্মতৃপ্তি অনুভব করতো যে, তারা কোনো মানুষকে আল্লাহর সাথে শরীক না করে দেবদেবী ও ফেরেশতাদের শরীক করার কারণে তারা অনেক বেশী হোদায়াতপ্রাপ্ত এবং দৃঢ়ভাবে সঠিক ও সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে।

আরবে যখন শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাব হলো, নবুওতের ঘোষণার পর তিনি এ দাবী উত্থাপন করলেন, তাঁর উপস্থাপিত দ্বীন-ই হচ্ছে ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীন, তখন মক্কার মোশরেকেরা বললো, যদি মোহাম্মদ (স.)-এর উপস্থাপিত দ্বীন দ্বীনে ইবরাহীম-ই হয়ে থাকে, তবে আমাদের দ্বীন পরিবর্তনের কোনো যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তাই নেই। কেননা আমরা তো দ্বীনে ইবরাহীমেরই অনুসারী। উপরন্তু তারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এ দাবী ও শর্ত নিয়ে হাযির হলো যে, তুমি যদি দ্বীনে ইবরাহীমের দাওয়াত নিয়েই এসে থাকো তবে তুমি আমাদের দেব-দেবীদের পূজা করো, এদের বন্দেগী ও উপাসনা করো, এদের দুর্ণাম রটনা, অপবাদ দেয়া ও মন্দ বলা বন্ধ করো। যদি তুমি আমাদের দেব-দেবীদের পূজা করো তবে আমরাও তোমার আল্লাহর এবাদাত করবো। তুমি যদি আমাদের ইলাহদের স্বীকৃতি দাও তবে আমরা তোমার আল্লাহকে মেনে চলবো। এমনিভাবে আমাদের মাবুদ ও তোমার মাবুদের এবাদাতের ভিত্তিতে আমরা একটা সমঝোতা, সমন্বয় ও সন্ধিতে উপনীত হতে পারবো। তারা প্রস্তাব উত্থাপন করলো, তুমি আমাদের রীতিনীতি, পদ্ধতি ও আমাদের মাবুদদের পূজা-অর্চনাকে মেনে নাও আমরা তোমার আল্লাহর এবাদাত করবো, তোমার কিছু নিয়মনীতি মেনে চলবো। এভাবে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে সমঝোতার একটা মাঝামাঝি বা নিরপেক্ষ পথ আমরা অবলম্বন করতে পারবো। এভাবে আল্লাহ্ ও গায়রুল্লাহ্র তথা ইসলাম ও জাহেলিয়াতের অভিনব সংমিশ্রণের মাধ্যমে এক উদ্ভট মিলনের প্রস্তাব তারা রসূলের কাছে উত্থাপন করলো। নিজেদের ধারণামতে তারা মনে করতো, তারা নিজ নিজ মাবুদের সাথে এক আল্লাহর স্বীকৃতি দিলে এতে উভয়েরমতই গুরুত্ব লাভ করবে। এভাবে তারা তাদের মাবুদ ও এক আল্লাহর এবাদাতের মধ্যে একটা সমঝোতা ও সমন্বয় সাধনের প্রয়াশ পেয়েছিলো। তারা মনে করতো, এ সমঝোতারও মধ্য দিয়ে এবাদাতের ক্ষেত্রে, জীবন পদ্ধতি, চিন্তা অনুভূতি, ক্রিয়াকান্ড, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মহামিলনের ক্ষেত্রে একটা পথ উন্মোচিত হবে।

আল্লাহ তায়ালা মক্কার মোশরেক পৌত্তলিকদের প্রস্তাবিত ইসলাম ও জাহেলিয়াত তথা তাওহীদ ও শেরেকের অভিনব মিলন, সমঝোতা ও সন্ধির এ উদ্ভট প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে এ সূরা নাযিল করেছেন। এ সূরা কোনো নিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, ইসলাম ও জাহেলিয়াত, তাওহীদ ও শেরেকের মধ্যে মিশ্রণের ভিত্তিতে সন্ধি সমঝোতার সমর্থনে নাযিল করা হয়নি; বরং তাওহীদ, শেরেক, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে আল্লাহ ও গায়রুল্লাহর এবাদাতের মিশ্রণ চিরতরে নিষিদ্ধ করে

www.pathagar.com

দেয়। বাতিলের বিরুদ্ধে হকের সমঝোতার উদ্যোগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেই আল্লাহ তায়ালা সূরা 'কাফেরূন' নাযিল করেছেন। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে সন্ধি সমঝোতা অসম্ভব। আল্লাহ ও গায়রুল্লাহর এবাদাতের মধ্যে মিল সৃষ্টির কোনো উদ্যোগ কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য নয়। এ সূরায় বারংবার এ সিদ্ধান্তের পুনরুল্লেখ ঘোষিত হয়েছে।

কাফেরদের উত্থাপিত সকল প্রস্তাবনা এ সূরার প্রতিটি আয়াতেই দ্ব্যর্থহীনভাবে নাকচ করে দিয়ে বলা হয়েছে, একক ও এককের অধিক সংখ্যার মধ্যে কোনো মিলন সংঘটিত হতে পারে না। তাওহীদ ও শেরেক– এ দু প্রান্তের চিন্তার মধ্যে কোন সমতা, সমঝোতা, সন্ধি যে কোনোমতেই হতে পারে না, তা এ সূরায় স্পষ্টভাবে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরায় তাওহীদ ও শেরেকের সুস্পষ্ট রূপরেখা অংকিত ও চিত্রিত হয়েছে। সর্বশেষ এককের সাথে সংখ্যাধিক্যের সমতা কখনো সম্ভব নয়– এ সত্যই এ সূরায় পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সূরা লাহাব

আবু লাহাব, তার নাম ছিলো আবদুল ওযযা ইবনে আবদুল মোত্তালেব। সে ছিলো প্রিয় নবী (স.)-এর চাচা। প্রভাতকালীন সূর্যের লালিমার মতো উজ্জ্বল ও সুন্দর ছিলো তার মুখমন্ডল–এ কারণে তাকে 'আবু লাহাব' বলা হতো। তার স্ত্রীর নাম ছিলো 'আরদা'। অত্যধিক সুন্দরী হওয়ার কারণে তাকে 'উম্মে জামিল' নামেও ডাকা হতো। তারা ছিলো রসূলুল্লাহ (স.)-এর উপস্থাপিত দাওয়াতের পরম শত্রু ও বিরোধিতাকারী। আবূ লাহাব ও তার স্ত্রীই ছিলো রসূলের সর্বাধিক অত্যাচারী ও যন্ত্রণাদানকারী।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রসিদ্ধ জীবনীকার ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক বলেন, আমার কাছে হোসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি রবিয়া ইবনে ইবাদুদ দায়েলীকে বলতে শুনেছি, আমি ও আমার পিতা একজন সুশ্রী যুবককে সাথে নিয়ে একদিন ভোর বেলা রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সংগী একদল লোকের সাথে পথ অতিক্রম করছিলাম; এমন সময় অপূর্ব সুন্দর চেহারার এক ব্যক্তিকে রসূলের পেছনে দেখতে পেলাম। রসূলুল্লাহ (স.) গোত্রের লোকদের সম্বোধন করে বললেন, 'হে অমুক গোত্রের জনমন্ডলী, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রসূল। আল্লাহ তায়ালা হুকুম করেছেন, তোমরা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করবে, আল্লাহর সাথে কোনো প্রকার শেরেক করবে না, তোমরা আমার রেসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, আমার আনুগত্য করবে। আমি তোমাদের আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দান করবো, যাতে করে আমার ওপর আল্লাহর অর্পিত সে দায়িত্ব সম্পাদন করে যেতে পারি যে দায়িত্বসহ আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহর রসূল যখন তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করলেন, তখন রসূলের পেছন থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, 'হে অমুক গোত্রের জনমন্ডলী, এ ব্যক্তি তোমাদের তোমাদের মাবুদ লাত, ওযযা ও তোমাদের দেবদেবীদের থেকে আলাদা করতে চাচ্ছে। তোমাদের সাথে বনু আকমাস গোত্রের সাথে সংঘাত সংঘর্ষ সৃষ্টি করছে, সে এক অদ্ভুত অভিনব

www.pathagar.com

কথাবার্তা ও ধর্ম নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের পূর্ববর্তী বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও চেতনার বিলুপ্তি সাধন করবে। তোমাদের সতর্ক করছি, তোমরা তার কথায় কর্ণপাত করো না, তার অনুসরণ করো না।' আমি তখন আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে পিতা, (আল্লাহর রসূলের প্রকাশ্য বিরোধিতাকারী) 'এ সুন্দর যুবকটি কে?' পিতা বললেন, 'এ হচ্ছে রসূলুল্লাহ (স.)-এর চাচা আবু লাহাব।' (আহমাদ ও তাবারানী)।

রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর দাওয়াতের বিরোধিতা এবং চক্রান্ত সম্পর্কে আবু লাহাবের এমনি অসংখ্য ঘটনার বিবরণ ও নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিল কর্তৃক রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর পাশবিক নির্যাতন, বিরোধিতা, শত্রুতা ও জঘন্য নির্মম আচরণের বর্ণনা আরওয়া বিনতে হারব ইবনে উমাইয়ার বর্ণনা থেকেও পাওয়া যায়। এ আরওয়া ছিলেন আবু সুফিয়ানের বোন। আবু লাহাব রসূলুল্লাহ (স.)-এর দাওয়াতের সূচনালগ্ন থেকেই প্রচন্ড শত্রুতা ও বিরোধিতার এ জঘন্য তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ইমাম বোখারী (র.) বিশুদ্ধ বর্ণনা সূত্রে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী করীম (স.) বাতহায় গমন করে পর্বত শৃংগে (আবু কোবায়েস পর্বতের ওপর) আরোহণ করেন। সেখানে দাঁড়িয়ে 'ইয়া সাবাহা' বলে উচ্চ স্বরে চীৎকার শুরু করলে কোরায়শরা পর্বতের পাদদেশে সমবেত হয়। আল্লাহর রসূল (স.) সমবেত জনমন্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি যদি তোমাদের বলি, (এ পর্বতের আড়ালে) একদল শত্রু তোমাদের ধ্বংস সাধনের জন্যে ওঁৎ পেতে বসে আছে, তবে কি তোমরা আমার কথা সত্য মনে করবে? তখন সকলেই সমস্বরে বললো, হাঁ, অবশ্যই আমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করবো। (কেননা ইতিপূর্বে আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি)।

তাদের এ জবাবের পর আল্লাহর রসূল (স.) পুনরায় তাদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদের জন্যে একজন সতর্ককারী। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের জন্যে কঠিন আযাব অপেক্ষা করছে। সাথে সাথে আবু লাহাব (রাগত স্বরে রূঢ় কণ্ঠে) বললো, তুমি ধ্বংস হও, এ জন্যেই কি তুমি (চীৎকার করে) আমাদের ডেকেছিলে? রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি আবু লাহাবের রূঢ় আচরণ ও অভিশাপের জবাবে আল্লাহ তায়ালা এ পূর্ণ সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেন। অপর বর্ণনায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর উক্তির পর আবু লাহাব উত্তেজিত হয়ে হাত নাড়িয়ে রসূলকে লক্ষ্য করে বললো, তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হও (সর্বদা তুমি ধ্বংসে পতিত হও), তুমি কি এ উদ্দেশেই আমাদের একত্রিত করেছো? আবু লাহাবের এ উক্তি প্রসংগেই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা লাহাব নাযিল করেছেন। বনু হাশেমের লোকেরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর উপস্থাপিত ইসলামে দীক্ষিত না হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর যে কোনো ধরনের কষ্ট ও নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য আবু তালেবের নেতৃত্বে অংগীকারবদ্ধ হলো এবং তারা সম্মিলিতভাবে রসূলের সাহায্য ও নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে একটি লিখিত চুক্তিনামায়ও স্বাক্ষর করে। রসূলুল্লাহ (স.)-এর দুই কন্যা রোকাইয়া ও উম্মে কুলসুম নবুওত যুগের পূর্বে আবু লাহাবের দুই পুত্র ওত্বা ও ওতাইবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলো। ওহী অবতীর্ণের পর আল্লাহর রসূল (স.) ইসলামের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেই আবু লাহাব তার পুত্রদ্বয়কে রসূল (স.) দুহিতাদের তালাকদানের কড়া নির্দেশ প্রদান করে এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর মতোই রসূলের কন্যাদের সাথেও নিষ্ঠুর আচরণ করে যন্ত্রণা দিতে থাকে।

www.pathagar.com

এভাবে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিল প্রিয়নবী (স.)-এর জাত শত্রুতে পরিণত হয়। সে বিভিন্নভাবে ইসলামী দাওয়াতের বিরোধিতা, প্রতিরোধ ও রসূলের ওপর নির্যাতনমূলক তৎপরতা আরো জোরদার করে।

রসূলের বাসগৃহ ছিলো আবু লাহাবের ঘরের খুবই কাছে, আর এ কারণে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী আল্লাহর রসূলকে নানাভাবে কঠোর যন্ত্রণা ও কষ্ট দিতে থাকে।

কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, কুটনী উম্মে জামিল কাঁটার ডাল বহন করে এনে রসূলের ঘরের দরজায় বিছিয়ে রাখতো। রসূলের চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে যন্ত্রণা ও কষ্ট দেয়ার কারণেই এ সূরায় উম্মে জামিলকে কাঁটাযুক্ত কাঠের বোঝা বহনকারিণী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে অভিশপ্ত আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিলের এ নিষ্ঠুর পাশবিক আচরণ এবং প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণার কারণেই আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রসূলের অভিভাবকত্বের দায়িত্বের ঘোষণা দিয়ে তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং আবু লাহাব দম্পতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা ও ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণীসহ সূরা 'লাহাব' অবতীর্ণ করেন।

সূরা আল এখলাস

সহীহ হাদীসসমূহের ভিত্তিতে এ সূরা কোরআন মজীদের এক-তৃতীয়াংশ। বোখারী শরীফে হযরত আবু সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনায় উল্লেখ আছে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বার বার এ সূরার পুনরাবৃত্তি করতে শুনলেন। তিনি সকাল বেলায় রসূল (স.)-এর দরবারে হাযির হয়ে এ ঘটনা তাঁকে বলেন। তিনি বুঝাতে চাচ্ছিলেন, এতো ছোট্ট একটি সূরা বার বার পড়ার কী প্রয়োজন আছে।

ঘটনা শোনার পর রসূল (স.) বললেন, কসম সেই মহান সত্তার যাঁর হাতে আমার জীবন, এ সূরা হচ্ছে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কেননা, যে একত্ববাদের ঘোষণা আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর কাছে দিয়েছেন এ 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' হচ্ছে সে একত্ববাদেরই মূলকথা। এটি আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা ও মানুষের জন্যে তার জীবন পদ্ধতিও বর্ণনা করে। ইসলামী তত্ত্বকথার বড়ো বড়ো কথাগুলোর মধ্যে এর স্থান অনেক শীর্ষে।

সূরা আল ফালাক্ব

এ সূরা এবং এর পরের সূরাটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক উদাত্ত আহ্বান প্রথমত আল্লাহর নবীর জন্যে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণভাবে সব ঈমানদার মানুষের জন্যে। এ আহ্বান হচ্ছে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার, তাঁর সাহায্যের আশ্রয়ে নিজেকে নিরাপদ করার, সব ভীতিমূলক কাজ থেকে আশ্রয় চেয়ে সঠিকভাবে আল্লাহর কাছে এসে আশ্রয় নেয়ার।

সেই ভীতিকর জিনিস গোপনীয় হোক কিংবা প্রকাশ্য হোক, জানা হোক কিংবা অজানা হোক, সব ধরনের ভীতি থেকে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

এ আহ্বানে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, আবার বিস্তারিতভাবেও বলা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, আশ্রয়ের স্থানটি প্রসারিত করে ধরেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও আদরের সাথে তাদের বলেন– এসো, এদিকে এসো, নিরাপদ জায়গায় এসো, শান্তির জায়গায় এসো, এসো আমার কাছে।

কারণ আমি তোমাদের দুর্বলতা জানি, তার ওপর কিছু লোক রয়েছে যারা তোমাদের শত্রু। তোমাদের চারদিকে রয়েছে ভীতিপ্রদ কিছু কিছু স্থান, তাই তোমরা এদিকে চলে এসো, তোমরা এখানে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। এ কারণেই এ উভয় সূরা শুরু হচ্ছে এভাবে– 'কুল আউ'যু বেরাব্বিল ফালাক্ব, কুল আউ'যু বেরাব্বি ন্নাস। (হে নবী তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই সোবহে সাদেকের স্রষ্টার, হে নবী তুমি বলো আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের, অর্থাৎ আশ্রয় চাওয়া দিয়েই এ সূরা দু'টি শুরু হয়েছে)।

এ সূরা দু'টোর শানে নুযুলের ব্যাপারে যেসব হাদীস ও রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে, তার সব কিছুর সাথে এর মৌলিক উদ্দেশ্যের একটা মিল রয়েছে, যা আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এসব বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, রসূল (স.) এ দুটো সূরা পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন ও মানসিক প্রশান্তি পেয়েছেন।

হযরত আকাবা বিন আমের থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, একদিন আল্লাহর নবী তাকে বলেছেন, তুমি কি জানো না আজ এমন কিছু আয়াত আমার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার মতো কিছু আর আগে কখনো দেখিনি। 'কুল আউযু' বেরাব্বিল ফালাক্ব, কুল আউ'যু বেরাব্বিনাস'। (মুয়াত্তা, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

নাসাঈতে হযরত জাবের (রা.)–এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একদিন রসূল (স.) আমাকে বললেন, 'জাবের, পড়ো। আমি বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার নামে উৎসর্গিত হোক, বলুন কী পড়বো? তিনি আমাকে বললেন, পড়ো 'কুল আউযু বেরাব্বিল ফালাক্ব, কুল আউ'যু বেরাব্বি ন্নাস।' আমি পড়লাম। তিনি বললেন, এগুলো পড়তে থাকো, এরপর এরকম অন্য কোনো জিনিস কখনো আর পড়তে পারবে না।'

হযরত যর বিন হোবায়শ বলেন, আমি একদিন উবাই বিন কা'বকে এ সূরা দু'টোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবুল মানযার, আপনার ভাই ইবনে মাসউদ এমন কথা বলেন যে, এটা নাকি কোরআনের আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি মনে করতেন এটা নাকি শুধু দোয়া ও ওযীফা, এ কারণেই তিনি একে কোরআনের অংশ মনে করেননি।

অতপর তিনি সাহাবাদের সম্মিলিত রায় মেনে নেন এবং একে কোরআনের শামিল বলে মনে করেন। এরপর উবাই বিন কা'ব বললেন, আমি রসূল (স.)-কে একথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমাকে বলা হয়েছে 'কুল' (বলো), আমি বললাম। অতএব আমরাও এভাবেই এগুলো বলি, যেভাবে রসূল (স.) আমাদের বলেছেন। (বোখারী)

www.pathagar.com

অর্থাৎ এখানে কুল (বলো) অর্থ কোরআনের অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত কুল (বলো) শব্দের মতোই । অতএব এ দুটো কোরআনেরই সূরা এবং আলোচ্য হাদীস কয়টি এ সুন্দর কয়টি বিষয়ের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা আমি এখানে আলোচনা করেছি। এ সূরায় আল্লাহ তায়ালা নিজেকে নিজে তাঁর সেই বিশেষ গুণ দিয়ে পেশ করেছেন, যাঁর কাছে এখানে বর্ণিত জিনিসসমূহ থেকে আশ্রয় চাওয়া যায়।

সূরা আন্ নাস

এ সূরায়ও আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে । যিনি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের বাদশাহ, মানুষের মাবুদ। আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে শয়তানের অনিষ্ট থেকে, যে শয়তান মানুষদের কুমন্ত্রণা যোগায়। কুমন্ত্রণা দিয়ে সে পেছনে ফিরে যায়। মাঝখানে কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করে আবার কেটে পড়ে। এ শয়তান মানুষ এবং জ্বিন উভয় দলের মধ্য থেকেই হতে পারে।

এই পানাহ চাওয়ার ব্যাপারে যাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলা হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি প্রতিপালক, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি বাদশাহ, মাবুদ। সাধারণভাবে তাঁর আশ্রয়ই যাবতীয় অনিষ্ট থেকে মানুষদের দূরে রাখে। আবার বিশেষ করে নানা ধরনের কুমন্ত্রণাদানকারী বস্তু যখন নানা ধরনের প্রলোভন দিয়ে মানুষদের খারাপ কাজে নিয়োগ করে, তখন বিশেষভাবে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

'রব' হচ্ছেন সেই পবিত্র সত্তা, যিনি সবকিছু লালন-পালন করেন, সবকিছু, দেখাশোনা করেন, সাহায্য-সহযোগিতা করেন। 'মালিক' বাদশাহ, সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান শাসক। 'ইলাহ' মানে মাবুদ, উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন, সর্বোচ্চ, বিজয়ী, সবকিছুর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী মহান সত্তা। এ গুণাবলী স্মরণ করে আল্লাহর মহান সত্তার কাছ থেকে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। কারণ আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন এ গুণাবলীর একক আধার। অবশ্য এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা, আল্লাহ তায়ালার এসব গুণ কিভাবে মানুষকে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে বাঁচায়, এটা আমাদের জানার উপায়ই বা কতোটুকু? আল্লাহ তায়ালাই তা ভালো জানেন।

আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, একক ক্ষমতাসম্পন্ন মালিক, সবকিছুর ওপর তাঁর ক্ষমতা কার্যকর। সবকিছু তাঁরই হাতে। ন্যায়-অন্যায়, উপকার অপকার, ভালো মন্দ সবকিছুর স্রষ্টাও তিনি। তাই তিনি তাঁর গুণাবলী দিয়ে মানুষকেও যাবতীয় অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারেন।

আগের সূরাটিতে মানুষদের বৈষয়িক কিছু জিনিস থেকে আশ্রয় চাওয়ার, আর এ সূরায় কিছু আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয় থেকে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

www.pathagar.com

মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহ

সূরা আল বাক্বারা	৩৩৩
সূরা আলে ইমরান	৩৪৮
সূরা আন নেসা	৩৬৫
সূরা আল মায়েদা	৩৮৫
সূরা আল আনফাল	৩৯৫
সূরা আত্ তাওবা	৪৫৩
সূরা আর রা'দ	৪৭৩
সূরা আল হাজ্জ	৪৭৭
সূরা আন নূর	৪৮১
সূরা আল আহযাব	৪৮৪
সূরা মোহাম্মদ	৪৯০
সূরা আল ফাতাহ	৪৯৪
সূরা আল হুজুরাত	৫০৯
সূরা আর রাহমান	৫১২
সূরা আল হাদীদ	৫১৪
সূরা আল মোজাদালাহ	৫১৭
সূরা আল হাশর	৫২০
সূরা আল মোমতাহেনা	৫২৪
সূরা আস সাফ	৫৩৩
সূরা আল জুমুয়া	৫৩৫
সূরা আল মোনাফেকুন	৫৩৮
সূরা আত তাগাবুন	৫৪১
সূরা আত তালাক্ব	৫৪২
সূরা আত তাহরীম	৫৫১
সূরা আল বাইয়্যেনাহ	৫৬২
সূরা আয যেলযাল	৫৬৪
সূরা আন নাসর	৫৬৪

www.pathagar.com

সূরা আল বাকারা

হিজরতের অব্যবহিত পর যে কয়টি সূরা নাযিল হয় সূরা 'আল বাকারা' তার অন্যতম। এটি সমগ্র কোরআনের দীর্ঘতম সূরা। সবচাইতে বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, এ সূরার আয়াতগুলো সব ধারাবাহিকভাবে নাযিল হয়নি এবং এ সূরাটি শেষ না হতেই অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ নাযিল হতে শুরু করে। এ সূরার কোনো কোনো আয়াত ও অন্যান্য মাদানী সূরার কোন কোন আয়াতের নাযিল হওয়ার উপলক্ষ সন্ধান করতে গেলে জানা যায় যে, মদীনায় অবতীর্ণ দীর্ঘ সূরাগুলোর সব কয়টির বেলাতেই এ কথা প্রযোজ্য। এ সূরাগুলোর সকল আয়াত একত্রে এবং ধারাবাহিকভাবে নাযিল হয়নি। সাধারণত একটি সূরার প্রাথমিক কিছু আয়াত নাযিল হওয়ার পর তার বাকী আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার আগেই পরবর্তী সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হওয়াকেই মাপকাঠি বলে ধরা হয়–পুরো সূরা নাযিল হওয়াকে নয়। আলোচ্য সূরায় সূদ সংক্রান্ত যে আয়াতগুলো রয়েছে তা নাযিল হয়েছে কোরআন নাযিলের শেষ পর্যায়ে। পক্ষান্তরে একই সূরার প্রথমাংশ হচ্ছে মদীনায় নাযিল হওয়া অংশের সূচনাকালের।

পরে আলাদা ওহীর মাধ্যমে এই বিক্ষিপ্ত আয়াতগুলোকে সংশ্লিষ্ট সূরায় একত্রিত করা হয় এবং তাদের ধারা বিন্যাস করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে তিরমিযী শরীফে একটা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত ওসমান (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি 'আনফালের' মত ছোট সূরা ও 'তাওবার' মত বড় সূরাকে পরপর সাজালেন এবং উভয়ের মধ্যে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখলেন না! উপরন্তু সূরা আনফালকে বড় বড় সাতটা সূরার মধ্যে স্থান দিলেন কিভাবে? হযরত ওসমান (রা.) বললেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সময় সময় এক সাথে একাধিক সূরা নাযিল হতো। এভাবে যখন কোন আয়াত নাযিল হতো তখন তিনি একজন লিখতে জানা লোককে ডেকে বলতেন, অমুক আয়াতটা অমুক অমুক বিষয়ে যে সূরায় আলোচিত হয়েছে তাতে সন্নিবেশিত করো। সূরা 'আনফাল' মদীনার জীবনের প্রথম দিকে এবং 'সূরা আত্ তওবা' শেষের দিকে নাযিল হয়। উভয়ের আলোচ্য বিষয় ছিলো অনেকটা একই রকমের। আমার মনে হয়েছিলো 'আনফাল' বুঝি 'তওবার'ই অংশ। কিন্তু রসূল (স.) 'আনফাল' তওবার' অংশ কিনা তা না বলেই এন্তেকাল করেন। এ জন্যে আমি উভয় সূরাকে পর পর বিন্যস্ত করেছি। কেবল 'বিসমিল্লাহ' লিখিনি এবং সূরাটি সাতটি বড় সূরার মধ্যে শামিল করেছি।

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক সূরায় আয়াতসমূহের বিন্যাস ও সন্নিবেশ স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যক্ষ নির্দেশক্রমেই সম্পন্ন হতো। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কল্যাণমূলক কাজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছিলেন সবচেয়ে

www.pathagar.com

তৎপর। বিশেষত রমযানে যখন তিনি জিবরাইলের সাথে মিলিত হতেন তখনই তিনি কল্যাণের কাজে সবচেয়ে বেশী তৎপর ও সক্রিয় হয়ে উঠতেন। রমযানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি রাত্রেই জিবরাঈল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। এই সময় রসূল তাঁর সামনে কোরআন পেশ করতেন। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এই সময় তিনি ও জিবরাইল পরস্পরে কোরআন অধ্যয়ন করতেন। জিবরাঈলের সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি কল্যাণধর্মী কাজে 'চলন্ত বাতাসের মত' সক্রিয় হয়ে উঠতেন। বস্তুত, এটা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য যে, জিবরাঈল রসূলকে সমগ্র কোরআন পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁরা উভয়ে আয়াতগুলো সংশ্লিষ্ট সূরার মধ্যে সন্নিবেশিত থাকা অবস্থায় কোরআন পড়েছেন।

এ জন্যেই যে ব্যক্তি কোরআনের ছায়াতলে জীবন যাপন করে অর্থাৎ কোরআনকে নিবিষ্টচিত্তে নিয়মিত অধ্যয়ন করে ও তার শিক্ষার প্রভাব আপন জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে সে কোরআনের প্রতিটি সূরার মধ্যে এক একটা অনন্য বৈশিষ্ট লক্ষ্য করে থাকে। সে অনুভব করে যেন প্রত্যেকটা সূরার একটা সজীব ও প্রাণবন্ত সত্তা রয়েছে যা হৃদয়ের লালন ও বিকাশে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে থাকে। সে আরো লক্ষ্য করে যে, প্রত্যেকটা সূরার এক অথবা একাধিক আলোচ্য বিষয় রয়েছে যা একটা সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় বিষয়ের সাথে সংযুক্ত থাকে। তা ছাড়া প্রত্যেকটা সূরার এক একটা বিশেষ পটভূমি রয়েছে। সূরায় আলোচিত সব ক'টি বিষয় সেই পটভূমির আওতাধীন থাকে। অতপর কতিপয় সুনির্দিষ্ট দিক থেকে সেই বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। এক একটা ছন্দগত সুর ব্যঞ্জনাও প্রত্যেক সূরায় লক্ষ্যণীয়। বক্তব্যধারার পটভূমিতে তা যখন ভিন্ন খাতে মোড় নেয় তখন বুঝতে হবে যে, বিশেষ কোনো বক্তব্য উপলক্ষ্যেই তার পরিবর্তন ঘটেছে। কোরআনের সকল সূরারই এ এক সাধারণ বৈশিষ্ট। দীর্ঘ সূরাগুলোর কোনোটাতেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি–সূরা বাকারাতেও নয়।

সূরা বাকারায় বেশ কয়েকটি বিষয় আলোচিত হয়েছে, তবে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় বিষয় এসব কয়টি আলোচ্য বিষয়কেই সংযুক্ত করেছে। আলোচনার দু'টো প্রধান ধারা এই কেন্দ্রীয় বিষয়ের জন্যে গভীরভাবে সন্নিবেশিত ও সম্মিলিত হয়েছে। এই দু'টো প্রধান ধারার একটা হলো মদীনায় অবস্থিত ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের বিরূপ দৃষ্টিভংগী, তার প্রতি তাদের বিরূপ সমালোচনা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন থেকে গড়ে ওঠা ইসলামী সংগঠনের বিরুদ্ধাচরণ। সেই সাথে ইহুদী ও বর্ণচোরা মুসলমান তথা মোনাফেকদের মধ্যে এবং ইহুদী ও মোশরেকদের মধ্যে বিরাজমান সুগভীর ও গাঁটছড়াও এ ধারার আওতাভুক্ত। আলোচনার দ্বিতীয় ধারাটা ইসলামী সংগঠনের আবির্ভাবের সূচনাকালীন অবস্থা এবং মোমেনদেরকে পৃথিবীতে ইসলামী আন্দোলন ও খেলাফতব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গুরু দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এর আগেই সূরা বাকারায় এ দায়িত্ব পালনে বনী ইসরাঈল তথা

www.pathagar.com

ইহুদী-খৃষ্টান জাতিদ্বয়ের ব্যর্থতা, এ ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে দেয়া অংগীকার ভংগ এবং তাওহীদের নিশানবাহী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যথার্থ বংশধর হওয়ার অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর যেসব ভ্রান্ত কার্যকলাপের কারণে বনী ইসরাঈল এত বড় গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে সেগুলো থেকে সংযত ও নিবৃত থাকার জন্যে মুসলিম জনগণকে সাবধান করা হয়েছে। এ দু'টো প্রধান ধারার সংযোগেই গঠিত হয়েছে সূরা বাকারার কেন্দ্রীয় বক্তব্য। এই কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে আবর্তন করেই সূরার অন্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। এসব বিষয়ের পূর্ণাংগ পর্যালোচনা করার সময় কথাটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সূরা বাকারার উক্ত কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সাথে তার আলোচ্য বিষয়গুলো এবং মদীনার প্রথম ইসলামী আন্দোলনের সাথে ইসলামী সংগঠনের জীবনধারা ও তার বাধা-বিপত্তিগুলো যে কতো গভীরভাবে সম্পৃক্ত, সেটা স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার জন্যে আমি এ বাধাগুলোর ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। কেননা শুরুতে এ বাধা-বিপত্তিগুলো মোকাবেলা করার পথনির্দেশ হিসেবেই এই সূরার আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিলো। এই সংগে এ কথাও জানা দরকার যে, চিরদিনই ইসলামী আন্দোলনের কাফেলার এসব বাধা-বিঘ্ন মোকাবেলা করতে হয়েছে। হয়তো সময় সময় তার আকারে-আকৃতিতে কিছুটা পার্থক্য ঘটেছে, কিন্তু বাধা-বিঘ্ন আসা একটা অবধারিত ও চিরন্তন ব্যাপার। এ জন্যে কোরআনের এসব দিকনির্দেশনা ইসলামী আন্দোলনের শাশ্বত ও চিরন্তন সনদে পরিণত হয়েছে যা প্রত্যেক যুগের ও সকল সমস্যা মোকাবেলায় সক্ষম। এসব বাধা-বিঘ্নকে কোরআন মুসলিম জাতির পথের দিশা হিসাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে যা দেখে সে তার দীর্ঘ ও বন্ধুর পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা ও শিক্ষা লাভ করতে পারে। এ পথে সে যত বিরোধ ও শত্রুতার সম্মুখীন হয়, তার বৈশিষ্ট বিচিত্র হলেও প্রকৃতি অভিন্ন। বস্তুত, কোরআনের প্রতিটি বাণীতে এই যে বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয় তা মূলত কোরআনের আলৌকিকত্বেরই আংশিক প্রতিফলন মাত্র।

মদীনায় হিজরতের কারণ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরত কোন অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক ঘটনা ছিলো না। সে জন্যে তাকে আগে থেকেই দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিলো এবং সে জন্যে উপযুক্ত প্রেক্ষাপটও তৈরী করা হয়েছিলো। হিজরতের ঘটনাটা একটা বিশেষ ধরনের পরিস্থিতির অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই দেখা দিয়েছিলো। ইসলামী আন্দোলনকে যে খাতে প্রবাহিত করার পরিকল্পনা আল্লাহ তায়ালা দিয়েছিলেন, তার জন্যে এটা ছিলো একটি অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপ। রসূলের অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক আবু তালেব এবং হযরত খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পর মক্কার ইসলামী আন্দোলনের প্রতি কোরায়শদের আক্রোশ ও বিদ্বেষমূলক আচরণ মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। এ আচরণ এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিলো যে, মক্কায় ও তার আশেপাশে ইসলামী আন্দোলনের কাজ প্রায় বন্ধই করে দিতে হয়েছিলো। এর ফলে বাদবাকী আরবরা ইসলামী আন্দোলনকে এড়িয়ে চলতে

www.pathagar.com

আরম্ভ করে। তারা অপেক্ষা করতে থাকে রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর স্বজনদের এ লড়াই কোথায় গিয়ে গড়ায় তা দেখার জন্যে। কোরায়শদের এই প্রতিরোধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো আবু লাহাব, আবু জেহেল ও আবু সুফিয়ানের মত রসূলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা। সে সময়কার আরব সমাজের গোত্রীয় পরিবেশে আত্মীয়তার বন্ধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, করা সত্ত্বেও তার প্রচারিত আদর্শকে আমল দিতে তারা মোটেই উৎসাহ বোধ করেনি। বিশেষত তাঁর এই আত্মীয়-স্বজনই ছিলো পবিত্র কাবা শরীফের খাদেম ও মোতাওয়াল্লী। বস্তুত, কাবা শরীফের খাদেম ও তত্ত্বাবধায়ক হওয়াটা তখনকার দিনে সমগ্র আরব উপদ্বীপে ধর্মীয় নেতৃত্বের সার্টিফিকেট বলেও বিবেচিত হতো।

এসব কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাওয়াতের কাজ পরিচালনার জন্যে মক্কা ছাড়া এমন কোন ঘাঁটির সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, যেখানে তাঁর আকীদা-বিশ্বাস সংরক্ষিত ও নিরাপদ হবে, স্বাধীন ও নির্বিঘ্ন কাজের পরিবেশ থাকবে। সেখানে ইসলামী আন্দোলন মক্কার অচলাবস্থা থেকে মুক্ত হবে, দাওয়াতের কাজ অব্যাহত গতিতে চলতে পারবে এবং ইসলামে দীক্ষা গ্রহণকারীরা উৎপীড়ন ও অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে।

আমার বিবেচনায় এটাই ছিলো হিজরতের প্রথম ও প্রধান কারণ।

ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার ঘাঁটি হিসেবে মদীনাকে বেছে নেয়ার আগে আরো কয়েক জায়গায় হিজরত করা হয়েছিলো। হিজরত করা হয়েছিলো আবিসিনিয়ায়, সেখানে প্রাথমিক যুগের বিপুলসংখ্যক মুসলমান হিজরত করেন। এই হিজরতকে কেউ কেউ নিছক জান বাঁচানোর হিজরত বলে আখ্যায়িত করে থাকেন; কিন্তু এ অভিমতের সপক্ষে কোন বলিষ্ঠ যুক্তি নেই। এটা যদি সত্য হতো তাহলে মুসলমানদের ভেতরে যারা সবচেয়ে বেশী দুর্বল, সহায় সম্বলহীন ও প্রতিপত্তিহীন, তারাই কেবল হিজরত করতেন। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার ছিলো এর বিপরীত। সমাজের দুর্বলতম শ্রেণী দাসদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিলেন এবং যাদের ওপর সবচেয়ে বেশী নিপীড়ন নির্যাতন চলছিলো তাঁদের কেউ এ হিজরতে অংশগ্রহণ করেননি। বরং ওপর তলার অভিজাত লোকেরাই এই হিজরতে অংশ নেন। অথচ একটা গোত্রপ্রধান সমাজে তাঁদের আভিজাত্য তাদেরকে অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে অনেকাংশেই রেহাই দিতে সক্ষম ছিলো। মোহাজেরদের অধিকাংশই ছিলো কোরায়শ বংশীয়। তাদের মধ্যে ছিলেন আবু তালেবের পুত্র জাফর। আবু তালেব ও তার সাথে বনু হাশেমের তরুণরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফেরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতো। যোবায়ের ইবনুল আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আবু সালামা মাখযুমী ও ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.)ও ছিলেন আবিসিনিয়ার মোহাজেরদের অন্যতম। কিছু সংখ্যক মহিলাও হিজরত করেছিলেন। তারাও মক্কার অভিজাত পরিবারের সদস্যা ছিলেন, যার জন্যে তাদের কখনো অত্যাচারের শিকার হতে হতো না। সম্ভবত এসব মহিলার হিজরতের পেছনে অন্য কিছু কারণও ছিলো। হয়তো বা কোরায়শদের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর অভ্যন্তরে চাঞ্চল্য ও আলোড়ন সৃষ্টি করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। যে সময়

www.pathagar.com

কোরায়শ বংশের সম্ভ্রান্ত সন্তানরা নিজ নিজ আকীদা-বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্যে এবং জাহেলিয়াত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সকল আত্মীয়তার বন্ধনকে অগ্রাহ্য করে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিলো , সে সময় মহিলাদের এ হিজরত গোত্রীয় পরিমন্ডলে সমগ্র কোরায়শ আভিজাত্যকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিচ্ছিলো । বিশেষত হিজরতকারিনীদের মধ্যে যখন ইসলামবিরোধী শিবিরের শীর্ষস্থানীয় নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবার মত মহিলাও ছিলেন। কিন্তু এ সত্তেও আবিসিনিয়ার হিজরত ইসলামী আন্দোলনের জন্যে একটা স্বাধীন অথবা নিদেনপক্ষে একটা নিরাপদ ঘাঁটি সন্ধানের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। বিশেষত আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে যেসব বিবরণ পাওয়া যায় তা যদি এই সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত করা হয় তাহলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য নাজ্জাশী তার সেই ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে সক্ষম হননি শুধুমাত্র প্রজা বিদ্রোহের আশংকায়। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে এ কথা উল্লিখিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে রসূলের তায়েফ গমনও ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার একটা স্বাধীন অথবা কমপক্ষে একটা নিরাপদ ঘাঁটি সন্ধানের উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়েছিলো বলে মনে হয়। কিন্তু বনু ছকীফের নেতারা তাঁকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো। তারা তাদের ভেতরকার নির্বোধ লোকজন ও বালকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় এবং তাঁর প্রতি পাথর ছুঁড়তে বলে দেয়। পাথর মেরে মেরে তারা রসূলুল্লাহর পবিত্র পা দু'খানাকে আহত ও রক্তাক্ত করে দেয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবস্থা বেগতিক দেখে উৎবা ও শায়বা ইবনে রাবিয়ার ফলের বাগানে আশ্রয় নেন। সেখানে আশ্রয় নেবার পূর্ব পর্যন্ত তারা পাথর ছোঁড়া থেকে ক্ষান্ত হয়নি। সেই সময় তার মুখ দিয়ে এই গভীর মিনতিপূর্ণ দোয়া নির্গত হয়,

'হে আল্লাহ! আমি নিজের দুর্বলতা, কৌশলের অপ্রতুলতা ও মানুষের সামনে নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে তোমার কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছি। হে শ্রেষ্ঠ দয়ালু! তুমি দুর্বলদের মালিক, তুমি আমারও মালিক। তুমি কার কাছে আমাকে সঁপে দিচ্ছো? তুমি কি কোনো শত্রুর কাছে আমাকে সঁপে দিচ্ছ যাকে আমার অভিভাবক করে দিয়েছো, অথবা আমাকে আক্রমণকারী কোনো অনাত্মীয়ের কাছে সঁপেছো? আমার ওপর যদি তোমার রাগ না থাকে তাহলে আমি কোনো কিছুরই পরোয়া করি না। তবে তোমার পক্ষ থেকে সর্বাংগীন সুস্থতা আমার জন্যে শ্রেয়। তোমার স্বীয় জ্যোতিতে সকল অন্ধকার আলোকিত হয় এবং যার বদৌলতে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সমস্যা সমাধান হয়, সেই জ্যোতির আশ্রয় প্রার্থনা করি, যেনো তুমি আমার ওপর তোমার ক্রোধ ও অভিসম্পাত না পাঠাও। তুমি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার শরণাপন্ন থাকবো। বস্তুত, তুমি ক্ষমতা না দিলে কারো কোনো কাজের ক্ষমতা হয় না।

এরপর আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আন্দোলনের জন্যে অকল্পনীয়ভাবে অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করে দেন। ফলে প্রথম আকাবা ও দ্বিতীয় আকাবার শপথ অনুষ্ঠিত হয়। এ দু'টো ঘটনার সাথে আমাদের

www.pathagar.com

আলোচ্য সূরার ভূমিকার বিষয়বস্তু ও মদীনায় ইসলামী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে তার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

আকাবার শপথের ঘটনা সংক্ষেপে এরূপ, মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের সময় মদীনার খাযরাজ গোত্রীয় একদল লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তাদের সামনে তিনি নিজেকে ও নিজের দাওয়াতকে তুলে ধরেন এবং আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার কাজে তিনি তাদের কাছে কিছু সহযোগী ও সমর্থক চান। ইতিপূর্বে তারা তাদের প্রতিবেশী ইহুদীদের কাছে প্রায়ই শুনতো যে, একজন নবী আসার সময় সমাগত প্রায়। ইহুদীরা সেই নবীর দোহাই দিয়ে আরবদের ওপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করতো। সেই নবী এলে আরবরা যাতে ইহুদীদের কথামত চলে সে জন্যে তাদেরকে অনুরোধ করতো। খাযরাজ প্রতিনিধিদল যখন হযরতের দাওয়াত শুনলো তখন তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলো, 'আল্লাহর শপথ! এই সেই নবী যার কথা ইহুদীরা আমাদেরকে বলেছিলো। অতএব, এসো আমরা ইহুদীদের আগেই তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করি।' এই বলে তারা রসূলের দাওয়াত গ্রহণ করলো। তারপর বললো, আমরা আমাদের গোত্রকে রেখে এসেছি। অথচ পারস্পরিক শত্রুতা ও দাংগা-ফাসাদে আমাদের গোত্রের জুড়ি নেই। আশা করি আল্লাহ তায়ালা শীঘ্রই আপনাকে তাদের সাথে মিলিত করবেন। এরপর যখন তারা নিজ গোত্রের কাছে ফিরে গেলো, তাদের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। লোকেরা সব শুনে খুশী হলো এবং তারা যে কাজ করে এসেছে তার প্রতি সমর্থন জানালো।

পরবর্তী বছর আওস ও খাযরাজের একটা দল হজ্জ করতে মক্কা গমন করলো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করলো। রসূল (স.) তাদের সাথে ইসলাম শিক্ষা দিতে পারে এমন একজন লোকও সেখানে পাঠিয়ে দিলেন।

এর পরবর্তী বছর আবার আওস ও খাযরাজের একটা বিরাট প্রতিনিধি দল হজ্জ করতে মক্কায় যায় এবং তারাও তাদেরকে শপথ গ্রহণ করাতে অনুরোধ করে। রসূলের চাচা হযরত আব্বাসের উপস্থিতিতে শপথ অনুষ্ঠিত হয়। এ ঘটনাকে ইতিহাসে আকাবার দ্বিতীয় ও বৃহৎ শপথ অনুষ্ঠান বলে অভিহিত করা যায়। এ শপথ অনুষ্ঠান সম্পর্কে হাদীসে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কারজীর বরাতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শপথ গ্রহণের রাতে বলেন, আপনি শপথ গ্রহণকারীদের কাছ থেকে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ও নিজের সম্পর্কে যেমন খুশী অংগীকার গ্রহণ করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তোমাদের কাছ থেকে এ প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি যে তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আমার সম্পর্কে এ প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি যে, তোমরা নিজেদের জানমাল রক্ষার জন্যে যেসব জিনিস প্রতিরোধ করে থাকো, আমার জান মাল রক্ষার জন্যেও সেসব

www.pathagar.com

জিনিস প্রতিরোধ করবে। আবদুল্লাহ বললেন, 'আমরা এই প্রতিজ্ঞা করলে এর বিনিময়ে কী পাবো? রসূল (স.) বললেন, জান্নাত, তখনই সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, ব্যবসা লাভজনক হয়েছে। এ থেকে আমরা পিছু হটবো না কাউকে পিছু হটতেও বলবো না।

এভাবে তারা দৃঢ়তার সাথে ইসলামী আন্দোলনের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে। সেই থেকে মদীনায় ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটতে আরম্ভ করে। একপর্যায়ে মদীনায় এমন একটা পরিবারও রইলো না যেখানে ইসলাম প্রবেশ করেনি। মক্কার মুসলমানরাও এরপর থেকে নিজেদের আকীদা ও ঈমান ছাড়া অন্য সব কিছু ফেলে মদীনায় যেতে লাগলো। সেখানে তাদের যেসব ভাই আগে থেকে বসবাস করছিলো এবং ঈমান এনেছিলো তাদের কাছ থেকে তারা এমন সৌভ্রাতৃত্ব লাভ করলো যার নযির মানবতার ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীককে সংগে নিয়ে হিজরত করলেন। সেখানে তিনি তাঁর সেই নিরাপদ ও স্বাধীন ঘাঁটিটি পেলেন, যার জন্যে তিনি ইতিপূর্বে দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। এ ঘাঁটিতে রসূলের হিজরতের প্রথম দিন থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হলো।

মোমেনদের বৈশিষ্ট্য

প্রথম হিজরতকারী ও হিজরতকারীনীদের সাদর অভ্যর্থনাকারী এসব মোমেনদের সমন্বয়ে মুসলমানদের সেই দলটি গঠিত হলো কোরআন বহু জায়গায় উচ্চকণ্ঠে যাদের প্রশংসা করেছে। এখানে আমরা দেখতে পাই সূরা বাকারা ঈমানের এই বৈশিষ্টসমূহের বিবরণ দিয়েই শুরু হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট খাঁটি ও বিশুদ্ধ মোমেনদের পরিচায়ক, তা যে সময়ের ও যে স্থানেরই হোক না কেন। কিন্তু এই সূরায় মোমেনদের যে দলটি সে সময় মদীনায় উপস্থিত ছিলো বিশেষভাবে তাদের বর্ণনাই প্রথমে দেয়া হয়েছে। এরশাদ করা হয়েছে,

'আলিফ লা-ম-মী-ম' এই (মহান) গ্রন্থ (আল কোরআন), এতে (কোনো) সন্দেহ নেই, এই কেতাব (শুধু) তাদের জন্যেই পথপ্রদর্শক, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, ... এরাই তাদের মালিকের (পক্ষ থেকে আসা) সঠিক পথের ওপর রয়েছে এবং এরাই হচ্ছে সার্থক ও সফলকাম।' (আয়াত ১-৫)

কাফেরদের প্রসংগ

এর অব্যবহিত পরেই আমরা দেখতে পাই কাফেরদের গুণ বৈশিষ্টের বিবরণ। এগুলো হচ্ছে সাধারণভাবে কুফরির চিরন্তন বৈশিষ্ট। কিন্তু আলোচ্য সূরায় প্রত্যক্ষভাবে সেই কাফেরদেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে, যারা তখন ইসলামের বিরোধীতা করছিলো–চাই তারা মক্কার কিংবা মদীনার আশেপাশের কাফেরদের দলে অন্তর্ভুক্ত হোক। এদের সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে,

'আর যারা কুফরী করে, তাদের তুমি সাবধান করো .... আবরণ পড়ে আছে। এই ধরনের লোকদের জন্যে কষ্টদায়ক এক ভীষণ শাস্তি রয়েছে।' (আয়াত ৬-৭)

www.pathagar.com

মোনাফেকদের প্রসংগ

এমনিভাবে সেখানে মোনাফেক তথা বর্ণচোরা মুসলমানদের একটা দলও ছিলো। যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে রসূলকে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছিলো এবং মদীনায় তখন যে অবস্থা বিরাজমান ছিলো সেই সামগ্রিক পরিস্থিতিই ছিলো মোনাফেকদের উদ্ভবের কারণ। মদীনার সে অবস্থার কথা আগেই বলেছি। মক্কায় সে রকম অবস্থা বিরাজমান ছিলো না। মক্কায় ইসলামের কোন রাষ্ট্র ছিলো না, তেমনি শক্তি সামর্থ্য ও ছিলো না। এমনকি এমন জনবলও ছিলো না যা দেখে মক্কাবাসী ভয় পেয়ে মোমেনদের সামনে ইসলামের সপক্ষে ও তাদের পেছনে বিপক্ষে কথা বলার বর্ণচোরা নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজন বোধ করবে। সেখানে ইসলামের অবস্থা ছিলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে ইসলাম ছিলো প্রকাশ্য নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার। ইসলামী দাওয়াত সেখানে সরাসরি প্রত্যাখ্যাত ও উপেক্ষিত ছিলো। সেখানে ইসলামী দলের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান। তাদের আকীদা-বিশ্বাসকে তারা সব কিছুর চেয়ে মূল্যবান মনে করতেন এবং তার জন্যে সব রকমের বিপদাপদকে হাসিমুখে বরণ করে নিতেন। কিন্তু মদীনায় ইসলাম হিসাবে ধরার মতো একটা শক্তিতে পরিণত হয়েছিলো। সেই শক্তিকে মেনে নেয়া ও তাকে কিছু না কিছু তোষামোদ করার প্রয়োজন সবারই হতো। বিশেষত বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিরাট বিজয়ের পর মদীনার বড় বড় গোত্রপতিরা পর্যন্ত প্রকাশ্যে ইসলামী শাসনের প্রশংসা ও তোষামোদ করতে বাধ্য হতো। তাদের আত্মীয় পরিজনরা সবাই যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাই পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত প্রভাব প্রতিপত্তি, পদমর্যাদা এবং স্বার্থ রক্ষার তাগিদে সে দ্বীন গ্রহণের প্রদর্শনী না করে উপায় ছিলো না। এ জাতীয় লোকদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল ছিল অন্যতম। মদীনায় ইসলামের পদার্পণ ঘটার পূর্বে তার গোত্র তাকে রাজা বানিয়ে বরণ করে নেয়ার জন্যে মালা পর্যন্ত তৈরী করে রেখেছিল।

সূরা বাকারার শুরুতে এসব মোনাফেকের চারিত্রিক বৈশিষ্টের সুদীর্ঘ বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই বিবরণের কোন কোন অংশ থেকে বোঝা যায় যে জাহেলী সমাজপতিদের মধ্যে যারা বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো, অথচ তারপরও তারা সাধারণ মানুষের ওপর নিজেদের আধিপত্য অব্যাহত রাখার ইচ্ছা পোষণ করতো সূরা বাকারার প্রথমাংশের আলোচ্য মোনাফেক গোষ্ঠী মূলত তারাই। সূরার দ্বিতীয় রুকুতে তাদের বিবরণ কিভাবে দেয়া হয়েছে তা লক্ষ্যনীয়,

'মানুষদের মাঝে কিছু (লোক) এমনও আছে, যারা (মুখে ঠিকই) বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছি, কিন্তু সত্যিকার অর্থে (এদের কর্মকান্ড দেখলে তুমি বুঝতে পারবে যে) এরা মোটেই ঈমানদার নয়.........।' (আয়াত ৮-২০)

এই 'ব্যাধিগ্রস্ত' মোনাফেকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণের সাথে সাথে আনুষংগিকভাবে তাদের একান্ত আপন লোকদের সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া

www.pathagar.com

যাচ্ছে। সূরার পূর্বাপর প্রসংগ এবং ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা থেকে জানা যায় যে তাদের এই আপন লোক বলতে ইহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এই সূরার পরবর্তী অংশে তাদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের প্রতি ইহুদীদের ভূমিকা কি রকম ছিলো, সে সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

ইহুদীদের ভূমিকা

মদীনায় পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের সাথে ইহুদীরাই প্রথম সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এর কারণ ছিলো একাধিক।

প্রথমত, মদীনা ছিলো ইহুদীদের একটা কেন্দ্রভূমি। আওস ও খাযরাজ নামক নিরক্ষর আরব গোত্রের মধ্যে তারাই ছিলো আসমানী কেতাবে পারদর্শী একমাত্র শিক্ষিত সমাজ। আরব মোশরেকরা সে আহলে কেতাব গোষ্ঠীর ধর্মের প্রতি কোনোপ্রকার আকর্ষণ বোধ না করলেও তাদের কাছে একটা ধর্মগ্রন্থ থাকায় তারা তাদেরকে অন্যদের চেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মনে করতো। তাছাড়া আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও কলহ লেগেই থাকতো বলে ইহুদীরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তারের একটা সুযোগ সব সময়ই পেতো। কিন্তু ইসলামের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সে সুযোগ পুরোপুরি হাতছাড়া হয়ে যায়। কেননা ইসলাম নিজের সংগে একটা গ্রন্থও নিয়ে আসে। সে গ্রন্থ আগেকার সমস্ত আসমানী কেতাবকে সমর্থন করে এবং সেসব গ্রন্থের ওপর নিজেকে অগ্রগণ্য বলে ঘোষণা করে। শুধু কি তাই? আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে লেগে থাকা যে দন্ধ কলহের সূত্র ধরে ইহুদীরা তাদের মধ্যে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা চালাতো, ইসলাম সেই দ্বন্দ্ব কলহের অবসান ঘটায় এবং আওস ও খাযরাজসহ সমগ্র সমাজকে ইসলামী ঐক্যের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করে। এর ফলে তারা মক্কা থেকে আগত মুসলিম মোহাজেরদের পরম বন্ধুতে পরিণত হয়। এমনকি আজও মোহাজেরদের দৃষ্টিতে তারা আনসার নামে পরিচিত। ইসলাম এসব মানুষকে নিয়ে সেই মুসলিম সমাজ গঠন করে যার ভেতরকার পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও সংহতির কোনো তুলনা মানবজাতির ইতিহাসে আগেও দেখা যায়নি, পরেও দেখা যায়নি।

দ্বিতীয়ত, ইহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর মনোনীত জাতি এবং রেসালাত ও আসমানী কেতাবের একচেটিয়া উত্তরাধিকারী বলে ভাবতো। তাই সর্বশেষ নবী তাদের মধ্যেই আসবে বলে তারা আশা করতো। কিন্তু সেই নবী যখন আরবদের মধ্য থেকে আবির্ভাব হলেন তখন তারা ভাবলো যে, তিনি ইহুদীদেরকে তার রেসালাতের দায়িত্বের বাইরে বলে বিবেচনা করবেন এবং কেবল নিরক্ষর আরবদের মধ্যেই তাঁর প্রচার সীমিত রাখবেন। কিন্তু আল্লাহর রসূল তাদের কাছেই প্রথম আল্লাহর কেতাবকে পেশ করে তা মেনে নেয়ার দাওয়াত দিলেন। কেননা মোশরেকদের চেয়ে তারা শেষ নবী সম্পর্কে অধিক ওয়াকেফহাল ছিলো এবং তাঁর দাওয়াতকে গ্রহণ করার যোগ্যতা তাদের মধ্যেই সর্বাধিক থাকার কথা ছিলো। অথচ এতে অন্যায় আভিজাত্যবোধে আক্রান্ত হয়। তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করায় তারা অপমানবোধ করে এবং দাওয়াত পেশ করাকে তারা রসূলের ধৃষ্টতা বলে গন্য করে।

www.pathagar.com

তৃতীয়ত, মহানবী (স.)-এর বিরুদ্ধে তারা তীব্র ঈর্ষায় জর্জরিত ছিলো। এই ঈর্ষার কারণ ছিলো দু'টো। প্রথম কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং তাঁর ওপর কেতাব নাযিল করেছেন। অথচ তারা এর সত্যতায় নিসন্দেহ ছিলো। দ্বিতীয় কারণ এই যে, মদীনার আশেপাশে তাঁর দাওয়াত অতি দ্রুত প্রসার ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো।

এ দু'টো কারণ ছাড়াও তাদের ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসী মনোভাবের আর একটা কারণ ছিলো। সে কারণটা হলো, তারা বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চক্রবৃদ্ধি সুদের মাধ্যমে মদীনার সমাজের ওপর যেভাবে জেঁকে বসেছিলো, তাতে তারা ইসলাম গ্রহণ না করলে সেটা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকা বোধ করছিলো। ইসলাম গ্রহণ করা অথবা সামাজিক আধিপত্য হাতছাড়া করা এর কোনোটাই তাদের মনোপুত ছিলো না। তাদের কাছে এ দু'টোই ছিলো সমান অপ্রিয়।

বস্তুত, সূরা বাকারায় ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইহুদীদের যে শত্রুতামূলক ভূমিকার বিবরণ দেয়া হয়েছে, এগুলোই তার প্রধান কারণ। (বিষয়টি আরো বহু সূরায় আলোচিত হয়েছে) সূরা বাকারায় এ আলোচনা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। আমি এখানে তাদের সেই ভূমিকাসংক্রান্ত কতিপয় আয়াত উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করছি। তারা তাদের নিজ নবী হযরত মূসার সাথে যে আচরণ করেছিলো, আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের প্রতি যে অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছিলো, তাদের কেতাবের যেরূপ বিরুদ্ধাচরণ তারা করেছিলো এবং আল্লাহর সাথে সম্পাদিত অংগীকারকে তারা যেভাবে ভংগ করেছিলো, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর মুসলমানদেরকে তাদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে–

'আর তাদের কাছে তাদের আগে থেকে পাওয়া কেতাবের সমর্থক হয়ে অন্য একখানা কেতাব এমন সময়ে এলো, যার আগে থেকেই তারা কাফেরদের কাছে তার সত্যতা প্রচার করে আসছিলো। এমতাবস্থায় তাদের পূর্ব পরিচিত কেতাব হওয়া সত্তেও তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। এ সব প্রত্যাখ্যানকারীর ওপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ। .... আর যখন তাদেরকে বলা হলো, আল্লাহ তায়ালা যা নাযিল করেছেন তা মেনে নাও, তখন তারা বললো, আমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তা আমরা মানি। আর তার পরে নাযিল হওয়া কেতাবকে তারা প্রত্যাখ্যান করে, ...। ভাবখানা এই যে, তারা সে সম্পর্কে অজ্ঞ। আহলে কেতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা এবং মোশরেকরা আদৌ কামনা করে না যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে কোনো কল্যাণকর জিনিস নাযিল হোক। .... কেতাবপ্রাপ্তদের অনেকেই তোমাদের মোমেন হওয়ার পর ঈর্ষাবশত নিজেদের কাছে সত্য স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়া সত্তেও আবার তোমাদেরকে কাফের বানিয়ে ফেলতে চায়।........ তারা বলে, যারা ইহুদী অথবা খৃস্টান হবে তারা ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এসব তাদের বৃথা আশা মাত্র।....... ইহুদী ও খৃস্টানরা তাদের ধর্মের অনুসরণ না করা পর্যন্ত তোমার ওপর কিছুতেই খুশী হবে না। ....।

www.pathagar.com

কোরআনের মোজেযা

কোরআনের একটা চিরস্থায়ী মোযেজা এই যে, বনী ইসরাঈলের যে চরিত্র বৈশিষ্টের বিবরণ সে দিয়েছে সেটা তাদের সর্বকালের সকল বংশধরদেরই চিরন্তন চরিত্রবৈশিষ্ট। এটা ইসলামের অভ্যুদয়ের আগেও যেমন ছিলো, ইসলামের পরেও আমাদের এ যুগ পর্যন্ত রয়েছে। এ কারণে কোরআনে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর আমলে তাদেরকে ঠিক এমনভাবে সম্বোধন করা হয়েছে যেন তারা স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর উত্তরসূরী নবীদের আমলেরই লোক। অতীতের ইসরাঈলী ও সমসাময়িক ইসরাঈলীদেরকে কোরআন একই বংশধর রূপে বিবেচনা করেছে। কেননা, তাদের ভূমিকা অবিকল তাদের পূর্ব পুরুষদের মতই, আর ইসলাম ও পার্থিব জগত সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভংগী কালের বিরাট ব্যবধান সত্তেও অভিন্ন। আলোচ্য সূরায় হযরত মূসার সময়কার ইহুদীদের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে সহসা মদীনার ইহুদীদের এবং এই উভয় বংশধরের মধ্যবর্তী অন্যান্য সময়কার ইহুদীদের প্রসঙ্গ আলোচনায় যে দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়, তার কারণ এটাই। সে কারণে কোরআনের বক্তব্য ও ভাষণ চিরন্তন ও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। কার্যত, সে মুসলিম জাতির আজকের নীতি ও তাদের প্রতি ইহুদীদের দৃষ্টিভংগি ও আচরণ নিয়েই বক্তব্য রেখেছে। ইহুদীরা ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী আন্দোলনকে আজ যে চোখে দেখছে আগামী কাল যে চোখে দেখবে এবং অতীতে যে চোখে দেখে এসেছে, তার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে, এ জন্যে কোরআনের অপরিবর্তনীয় বক্তব্যকে মুসলিম জাতির প্রতি চিরন্তন হুঁশিয়ারী হিসেবে গন্য করতে হবে। সে হুঁশিয়ারী মুসলিম জাতির সেই চিরস্থায়ী শত্রুদের বিরুদ্ধে যাদের প্রতিটি প্রজন্ম মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিন্ন প্রকৃতির যুদ্ধের মাধ্যমে লড়াই করে গেছে।

মুসলিম উম্মার পুনর্গঠন

ইহুদীদের এই চরিত্র বৈশিষ্ট বর্ণনা এবং মুসলমানদেরকে তাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে বলার সাথে সাথে এ সূরায় মুসলমানদেরকে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। কেননা বনী ইসরাঈল অনেক আগে থেকেই সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং সর্বশেষে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার পথ রোধ করতে সচেষ্ট হয়েছে।

আগেই বলেছি যে, হিজরতের অব্যবহিত পর ইসলামী আন্দোলন যে শ্রেণীর মানুষের আক্রোশের সম্মুখীন হয়েছিলো, তাদের বর্ণনা দিয়েই সূরা বাকারা শুরু হয়েছে। এ প্রসংগে ইহুদী নেতাদের শয়তানরূপে অভিহিত করে তাদের চরিত্র বৈশিষ্টের বিস্তারিত বিবরণও দেয়া হয়েছে। ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের গোটা ইতিহাস জুড়েই এই শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতি লক্ষণীয়। অতপর সূরা বাকারা তার প্রধান দু'টো আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনার গতি শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছে। এর বক্তব্যের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মাঝেও একটা একক সুর যে ধ্বনিত হয়েছে এবং তাতে করে সূরার একটা বিশিষ্টতা যে ফুটে উঠেছে তা সুস্পষ্ট।

www.pathagar.com

নিষ্ঠাবান মুসলমান (মোত্তাকীন), অবিশ্বাসী (কাফের) এবং কপট ও বর্ণচোরা মুসলমান তথা ছদ্মবেশী কাফের (মোনাফেক), এই তিন শ্রেণীর লোক সম্পর্কে সূরায় শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা প্রসংগেই কুচক্রী ইহুদী নেতাদের সম্পর্কেও বক্তব্য রাখা হয়েছে। এরপরই সমগ্র মানবজাতির কাছে আল্লাহর দাসত্ব করা এবং তাঁর রসূলের ওপর নাযিল করা কেতাবের প্রতি ঈমান আনার জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানান হয়েছে। যারা আল্লাহর এই কেতাবের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দিহান তাদেরকে কোরআনের অনুরূপ একটা সূরা রচনা করার জন্যে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। অতপর কাফেদেরকে দোযখের হুমকি এবং মোমেনদের জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এই পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই, কাফেরদের আচরণে কোরআন বিস্ময় প্রকাশ করেছে। কোরআন বলছে–

'তোমরা আল্লাহকে কিভাবে অস্বীকার করবে? অথচ তোমরা প্রথম মৃত ছিলে তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, তিনিই তোমাদের আবার মৃত্যু দেবেন। (সর্বশেষে) তিনিই আবার তোমাদের জীবন দান করবেন এবং এভাবে তোমাদের একদিন তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি এই পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের (ব্যবহারের) জন্যে তৈরী করেছেন.........।' (আয়াত ২৮-২৯)

এখানে মানব জাতির জন্যে সমগ্র জগতের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করার কথা প্রসংগে প্রথম মানব আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি করে পাঠানোর ইতিবৃত্ত আলোচিত হয়েছে!

এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে মানব জাতির সাথে শয়তানের চিরন্তন বৈরীতার কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সব শেষে আল্লাহর বিধানকে সর্বান্তকরণে মেনে নেয়ার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বের শপথ পাঠ সম্পন্ন করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'আমি (তাদের) বললাম, তোমরা সবাই (এবার) এখান থেকে নেমে যাও। (নতুন গন্তব্যস্থলে যাওয়ার পর), অবশ্যই সেখানে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে পথনির্দেশ আসবে। অতপর যে আমার সেই বিধান মেনে চলবে তাদের কোনো ভয় নেই, ...ব না। আর যারা কুফরী করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারা অবশ্যই জাহান্নামের বাসিন্দা হবে, তারা সেখানে থাকবে চিরদিন।' (আয়াত ৩৮-৩৯)

এর পরবর্তী অংশে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে এক দীর্ঘ পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি কিছু কিছু আভাস ইংগিত দিয়ে এসেছি। সে পর্যালোচনায় হযরত মূসার আমল থেকেই যে সব বিকৃতি শঠতা ও কপটতার তারা আশ্রয় নিয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেবার সাথে মাঝে মাঝে তাদেরকে তাদের নিজেদের কেতাবের সমর্থক কোরআনকে মেনে নিতে বলা হয়েছে। সমগ্র 'আলিফ লাম' পারা জুড়ে এ পর্যালোচনা পরিব্যাপ্ত। এ পর্যালোচনা থেকেই বনী ইসরাঈল ইসলাম এবং তার রসূল ও কেতাবকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, তার একটা পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠে। এ থেকে জানা যায় যে, তারাই ছিলো ইসলামকে জেনে শুনে অস্বীকারকারী প্রথম দল। তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করতো। আল্লাহর কালামকে বিকৃত করতো।

www.pathagar.com

নিজেদেরকে মোমেন বলে যাহির করে তারা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতো, কিন্তু নিজেরা পরস্পরে দেখা হলেই পরস্পরকে সাবধান করে দিতো যে মহানবীর নবুওতের সত্যতা সম্পর্কে তারা যে তথ্য জানে তা যেন কেউ মুসলমানদেরকে না জানায়। মুসলমানরা কুফরী অবস্থায় ফিরে যাক এটাই তারা কামনা করতো। এ উদ্দেশ্যে তারা ও খৃষ্টানরা দাবী করতো যে, আসল ও সঠিক পথের অনুসারী তো হচ্ছে তারাই। আর তাদেরকে বাদ দিয়ে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে ওহী নিয়ে আসেন বলে জিবরাঈলের প্রতিও তারা আক্রোশ প্রকাশ করতে কসুর করতো না এবং সব সময় অপেক্ষায় থাকতো যে, কখন মুসলমানদের অকল্যাণ ঘটে। মহানবীর ঘোষিত নির্দেশাবলীতে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির যে কোনো সুযোগেরই তারা সদ্ব্যবহার করতো। তারা মোনাফেকদের অনুপ্রেরণা ও কাফেরদের উৎসাহ যোগাতো।

এ কারণেই সূরা বাকারায় তাদের এসব অপতৎপরতার বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা চালানো হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) ও তাদের অন্যান্য নবীর প্রতি তাদের আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যে আচরণ তাদের সকল প্রজন্মকে একই ধরনের বিকৃত ও জঘন্য প্রকৃতির মানবগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই সমালোচনার উপসংহারে মুসলমানদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের লোকেরা কখনো ঈমান আনবে এ আশা যেন তারা পোষণ না করে। কেননা স্বভাবগতভাবেই তাদের সে ইচ্ছাশক্তি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এখানে তাদের একমাত্র সঠিক পথের অনুসারী হওয়ার মুখোশ উন্মোচন করে চূড়ান্ত রায় দেয়া হয়েছে। তারাই হযরত ইবরাহীমের উত্তরাধিকারী, তাদের এই দাবী খন্ডন করে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ.)-এর সত্যিকার অনুসারী হলো তারা যারা তার নীতি ও বিধান মেনে চলে। সূরায় এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, একদিকে যেমন ইহুদীরা ভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করেছে ও আল্লাহর বিধানকে বিকৃত করেছে এবং আল্লাহর খেলাফতব্যবস্থা পুনর্বহালের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং অপরদিকে হযরত মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর অনুগামীরা এই দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন ও তার বাস্তবায়নের তৎপর হয়েছেন তখন ইবরাহীম (আ.)-এর প্রকৃত উত্তরাধিকার হযরত মোহাম্মদ ও তাঁর অনুগামীদের ওপরই এসে বর্তেছে। সূরায় এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, হযরত মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর অনুগামীদের হাতে খেলাফতের এই উত্তরাধিকার অর্পণ কা'বা শরীফের স্তম্ভ নির্মাণ কালে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর দোয়ারই ফলশ্রুতি। সে দোয়া হলো–

'হে আমাদের মালিক, আমাদের উভয়কেই তুমি তোমার অনুগত মুসলিম বান্দা বানাও। আমাদের পরবর্তী বংশধরদের মাঝ থেকেও তুমি তোমার অনুগত (বান্দা) বানিয়ে দাও। .... হে আমাদের মালিক; (আমাদের) এই বংশের মধ্যে এদের নিজেদের মাঝ থেকে তুমি এমন একজন রাসূল পাঠাও, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে। তাদেরকে তোমার কেতাবের জ্ঞান শিক্ষা দেবে, উপরন্তু সে তাদের পরিচ্ছন্ন করে দেবে। ....।' (আয়াত ১২৮-১২৯)

www.pathagar.com

এই পর্যায়ে এসে মহানবী (স.) ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংগঠনকে লক্ষ্য করে নতুন নির্দেশাবলী জারী করা শুরু হয়েছে। আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বে নিযুক্ত এই সংগঠনটির জীবনযাপনের বুনিয়াদী শিক্ষা দেয়া আরম্ভ হয়েছে এবং সংগঠনের সুনির্দিষ্ট রূপকাঠামো এবং তার চিন্তা ও কর্মের পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়েছে।

ইসলামী সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে নতুন কেবলা নির্ধারণ ছিলো এই পর্যায়ের প্রথম কাজ। সে কেবলা হচ্ছে পবিত্র কা'বা। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-কে এই পবিত্র ঘর নির্মাণের ও তাকে শেরেকের নোংরামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর এবাদাতের জন্যে নির্দিষ্ট করতে আদেশ দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে মনে এই কেবলার দিকে মুখ ফেরানোর আগ্রহ পোষণ করতেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলতেন না।

এরপর মুসলিম সংগঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের মধ্য দিয়ে সূরা সামনে অগ্রসর হয়েছে। চিন্তা ও এবাদাতের প্রণালী এবং পারস্পরিক আচরণ ও লেন-দেনের পদ্ধতি এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মুসলিম জামায়াতকে এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তারা মৃত নয়; বরং তারা চিরঞ্জীব। ভীতি সন্ত্রাস, ক্ষুধা-দারিদ্র ও আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির উদ্দেশ্য মোমেনের অকল্যাণ সাধন করা নয়, বরং তাকে পরীক্ষা করা। যারা এ সব আপদ বিপদে ধৈর্য ধারণ করে তারা আল্লাহর অফুরন্ত করুণা, দয়া ও হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। আর শয়তান মানুষকে দারিদ্রের ভয় দেখিয়ে খারাপ কাজের প্ররোচনা দেয় এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতি দেন। আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মোমেনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর কাফেরদের অভিভাবক হলো আল্লাহদ্রোহী তাগুতীশক্তি। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এই সূরায় মোমেনদের জন্যে খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে কিছু হালাল হারামও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ভালো কাজের বাহ্যিক রূপটাই যে মুখ্য নয়, বরং তার অন্তর্নিহিত রূপটাই যে মুখ্য, সে কথাও এতে বলে দেয়া হয়েছে। অতপর কেসাসের বিধান, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ওসিয়ত বা উইল করা সংক্রান্ত বিধি, রোযা, হজ্জ, বিবাহ, তালাক ও পারিবারিক বিধি, জেহাদের নিয়ম কানুন, সদকা ও সুদ সংক্রান্ত বিধি এবং ধার লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধিমালাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে হযরত মূসার পর বনী ইসরাঈলের প্রসঙ্গ ও হযরত ইবরাহীমের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। তবে প্রথম পারার পরবর্তী অংশে প্রধানত মুসলিম দলের সাংগঠনিক কাঠামো বিনির্মাণ, সংগঠনকে ইসলামী আদর্শে প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর বিধান ও পদ্ধতি অনুসারে খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, তার অস্তিত্বের জন্যে অপরিহার্য সুনির্দিষ্ট আদর্শিক ও চিন্তাগত পদ্ধতি নির্ণয় এবং এত বড় গুরুদায়িত্ব বহনের জন্যে যিনি তাকে মনোনীত করেছেন সেই আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক দৃঢ় করা ও ঘনিষ্ঠ করার জন্যে প্রস্তুত করাই সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

সব শেষে দেখতে পাই সূরার উপসংহারে এর প্রারম্ভিক বিষয়েরই পুনরুক্তি করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা ও দর্শন এবং সকল কেতাব, সকল নবী ও অদৃশ্যের প্রতি মুসলিম জাতির ঈমান আনার ও আনুগত্য করার অপরিহার্যতা বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহর রসূল সেই বিষয়ের ওপরই ঈমান এনেছে, যা তার ওপর তার মালিকের পক্ষ নাযিল করা হয়েছে, আর যারা রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাও সবাই সেই একই বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে। এদের সবাই ....(হে মোমেন ব্যক্তিরা এই বলে তোমরা দোয়া করো) হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, জীবনে চলার পথে কোথায়ও যদি আমরা কোনো ভুল করে বসি, তার জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না, ... আমাদের ওপর তুমি দয়া করো, তুমিই আমাদের (একমাত্র) আশ্রয় দাতা বন্ধু, অবিশ্বাসী কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।' (আয়াত ২৮৫-২৮৬)

এভাবে সূরাটির শেষাংশ ও প্রথমাংশের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় স্থাপিত হয়েছে। গোটা সূরার সকল আলোচ্য বিষয় ও ঈমানের দু'টি গুণ বৈশিষ্টের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

১-২৯ আয়াত তথা প্রথম তিন রুকু জুড়ে বিস্তৃত এই অংশ হচ্ছে কোরআনের এই বিশালকায় ও সর্ববৃহৎ সূরার সূচনা পর্ব। ইহুদীরা ছাড়া অন্য যেসব গোত্র মদীনায় ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে ছিলো এ আয়াতগুলোতে আমরা তাদের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট দেখতে পাই। ইহুদীদের সম্পর্কে অবশ্য এখানে একটি ক্ষুদ্র ইংগিত দেয়া হয়েছে। বস্তুত এই ইংগিতটুকুই যথেষ্ট। তাদেরকে 'মোনাফেকদের প্ররোচক শয়তান' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই আখ্যার ভেতরে তাদের বহুসংখ্যক নিকৃষ্ট স্বভাবের আভাস দেয়া হয়েছে।

এই বৈশিষ্টসমূহ চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে কোরআনের বর্ণনাভংগীর বিচিত্র মহিমা ফুটে উঠেছে। শব্দ এখানে রেখা ও বর্ণের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। বস্তুত শব্দের মাধ্যমেই চিত্র অংকন দ্রুততর হয়ে থাকে। তারপর এসব চিত্র অতি দ্রুত গতিতে সচল হয়ে ওঠে, মনে হয় যেন জীবনের রংগমালায় তা সদা আলোড়িত। সূরার শুরুতে অল্প কয়েকটি বাক্যে তিন ধরনের মানুষের চিত্র ফুটে উঠেছে। এর প্রতিটি শ্রেণী মানবজাতির বিরাট বিরাট গোষ্ঠীর জীবন্ত নমুনাস্বরূপ। এ নমুনা যুগে যুগে ও দেশে দেশে বারংবার আবির্ভূত হয়ে থাকে। ফলে কোনো যুগের, কোনো দেশের, কোনো মানুষই এই তিন শ্রেণীর বাইরে যেতে পারে না। এটাই হচ্ছে কোরআনের মোজেযা।

উক্ত সংক্ষিপ্ত শব্দে ও মুষ্টিমেয় কয়টি আয়াতে এই চিত্র পরিপূর্ণ রূপে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। সে চিত্র শুধু যে স্পষ্ট, তাই নয়, বরং জীবনের স্পন্দনেও স্পন্দিত এবং তার বৈশিষ্টসমূহ চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট। ফলে যত দীর্ঘ ও বিশদ বিবরণ দেয়া হোক না কেন, এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মত এত দ্রুত বোধগম্য, এত সাজানো গোছানো এবং এত শ্রুতিমধুর বর্ণনা আর হয় না।

www.pathagar.com

আয়াতগুলোতে এই তিন ধরনের মানুষের ছবি তুলে ধরার পর সকল মানুষকে প্রথম শ্রেণীর মানুষে পরিণত হবার আহ্বান জানানো হয়েছে। সকলকে আহ্বান জানানো হয়েছে এক আল্লাহর দাসত্বের যিনি একমাত্র স্রষ্টা ও জীবিকা দাতা। তাঁর শরীক ও সমকক্ষ কেউ নেই। আর যারা রসূল (স.)-এর রেসালাত সম্পর্কে এবং তাঁর কাছে কেতাব নাযিল হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে, তারা পারলে এর কোনো সূরার মতো একটি সূরা রচনা করে আনুক। আর তা না পারলে সন্দেহ পোষণের জন্য তাদেরকে কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। মোমেনদের জন্যে যে চিরস্থায়ী সুখের উপকরণ প্রস্তুত রয়েছে তার চিত্র তুলে ধরে তাদের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

এরপর যেসব ইহুদী মোনাফেক কোরআনে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করায় নাক সিটকাতো এবং এই অজুহাতে কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হওয়া গ্রন্থ কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাতো, তাদের জবাব দেয়া হয়েছে। তাদেরকে এই মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, যে আল্লাহ তায়ালা মৃতকে জীবিত ও জীবিতকে মৃত করেন, যিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা সর্বজগতের দক্ষ পরিচালক, যিনি পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে একমাত্র মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করে মানুষকে অনুগৃহীত করেছেন এবং এই বিশাল সাম্রাজ্যে তাকে নিজের খলীফা নিযুক্ত করেছেন, সেই আল্লাহকে তারা কিভাবে অস্বীকার করে এবং কিভাবে তাঁর অবাধ্য হয়?

সূরা আলে ইমরান

আল কোরআন মূলত আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত ও আন্দোলনের দিক নির্দেশক এক মহান গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হচ্ছে দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রাণ ও উৎস। এই গ্রন্থ দাওয়াত ও আন্দোলনের ধারক ও বাহক, প্রহরী ও রক্ষক, ব্যাখ্যাতা ও বিশ্লেষক। এই গ্রন্থ ইসলামী আন্দোলনের গঠনতন্ত্র ও নীতিনির্ধারক। আর সর্বশেষে এই গ্রন্থটি হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের শক্তির উৎস। অনুরূপভাবে ইসলামের আহ্বায়কদের কর্মের উপকরণ, আন্দোলনের পদ্ধতি ও প্রেরণার উৎস।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের ও কোরআনের মাঝে গভীর একটা শূন্যতা থেকে যাবে যদি আমরা এ কথা উপলব্ধি না করি যে, কোরআন একটি জীবন্ত জাতিকে সম্বোধন করছিলো, পৃথিবীতে বাস্তব জাতিসত্ত্বা নিয়ে বিরাজমান একটি জনগোষ্ঠীর সাথে কোরআন কথা বলছিলো। এই জাতির জীবনে সংঘটিত বাস্তব ঘটনাবলীর মোকাবেলা করা হয় এই কোরআনের দিক-নির্দেশনা নিয়ে। এ দিক-নির্দেশনা দিয়েই পরে মানবজাতির গোটা পার্থিব জীবন পরিচালিত হয়েছিলো। এই কোরআনকে সম্বল করেই মানুষের মানসজগতে এবং পৃথিবীর একটি ভূখন্ডে এক বিরাট যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিলো। সে যুদ্ধ গোটা বিশ্বব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন সাধন করেছিলো।

কোরআনের ও আমাদের মাঝে একটি বিরাট অন্তরায় থেকে যাবে যদি আমরা একে নিছক একটি ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে তেলাওয়াত ও শ্রবণ করতে থাকি। যদি মনে

www.pathagar.com

করি যে, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের ঘটনাবলীর সাথে কোরআনের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের বুঝতে হবে যে, এই কোরআন মানবজাতির দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর মোকাবেলা করা ও তাদের পথ-নির্দেশ দেয়ার জন্যই নাযিল হয়েছিলো এবং একসময় তা তাদের যথার্থই পথনির্দেশ দিয়েছিলো। ফলে তা থেকে মানুষের জীবনে সাধারণভাবে এবং মুসলিম জাতির জীবনে বিশেষভাবে এক বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন সত্তার আবির্ভাব ঘটেছিলো।

বস্তুত কোরআনের অলৌকিকত্ব এখানেই নিহিত। একটি সুনির্দিষ্ট জাতির ওপর সুনির্দিষ্ট ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে একটি সুনির্দিষ্ট যুগে নাযিল হয়ে মুসলিম জাতিকে সাথে নিয়ে এক যুগান্তকারী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কোরআন তাদের ও গোটা মানবজাতির ইতিহাসের ধারা আমুল পাল্টে দিয়েছিলো– এটাই হচ্ছে কোরআনের মোজেযা। কিন্তু ইতিহাসের এই ধারা সেই নির্দিষ্ট যুগেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সে ইতিহাসের ধারা প্রত্যেক যুগের চলমান জীবনধারার পাশাপাশি অবস্থান করা, চলমান জীবনধারার মোকাবেলা করা ও তাকে নির্দেশনা দিয়ে পরিচালনা করতেও সক্ষম। এক্ষেত্রে কোরআনের পথনির্দেশ এতোটা কার্যকর ও বাস্তবানুগ, যেন তা চলমান মুসলিম জাতির জীবন ধারার মোকাবেলা করতে তাৎক্ষণিকভাবেই নাযিল হয়েছে। চারপাশে বিরাজমান জাহেলিয়াতের সাথে ও মানুষের ব্যক্তি সত্ত্বার অভ্যন্তরে বিরাজমান প্রকৃতির সাথে লড়াই করার জন্য তা যেন এইমাত্র অবতীর্ণ হয়েছে! আর সে আরবের সেই যঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রান্তরে সেই দিনগুলোতে যে তীব্রতা, তেজস্বিতা ও বাস্তবতার সাথে এই লড়াই পরিচালনা করেছিলো সেই একই তেজস্বিতা ও তীব্রতা নিয়ে এখনো সে লড়াই পরিচালনা করতে সক্ষম।

কোরআন থেকে তার যথার্থ কার্যকর প্রেরণা যদি আমরা অর্জন করতে চাই, কোরআনের মধ্যে যে প্রচন্ড জীবনীশক্তি নিহিত রয়েছে, তা যদি আমরা উপলব্ধি করতে চাই এবং প্রত্যেক যুগের মুসলিম জাতি ও দলের জন্য এতে যে চালিকাশক্তি লুকিয়ে আছে তা যদি আমরা লাভ করতে চাই, তাহলে কোরআন যেভাবে প্রথম মুসলিম দলটিকে সম্বোধন করেছিলো তা আমাদের মনে রাখতে হবে। সেই দলটি জীবনের বাস্তব অংগনে কিভাবে কর্মরত ছিলো, কিভাবে সে মদীনায় ও গোটা আরব উপদ্বীপের ঘটনাবলীর মোকাবেলা করেছিল, কিভাবে সে তার শত্রু ও মিত্রদের সাথে আচরণ করেছিলো এবং কিভাবে সেই জাতির ইচ্ছা আকাংখার মোকাবেলা করেছিলো, সেই ইতিহাস আমাদের জানতে হবে। কিভাবে কোরআন সেসব ঘটনার মোকাবেলা করেছিলো এবং সেই মুসলিম জাতির প্রতিটি পদক্ষেপকে সেই উত্তপ্ত রণাংগনে কিভাবে পরিচালিত করেছিলো, কিভাবে প্রবৃত্তির কু-প্ররোচনা, মক্কা, মদীনা এবং বহির্বিশ্বের সকল শত্রুর চক্রান্তকে কিভাবে প্রতিহত করেছিলো তাও জানতে হবে।

বস্তুত মহানবী (স.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সেই প্রথম ইসলামী সংগঠনের অনুকরণ আমাদের জন্য অপরিহার্য। সেই সংগঠন কিভাবে যথার্থ মানবীয় সংগঠন হিসেবে কাজ করেছে, বাস্তব জীবনে এবং মানবীয় সমস্যাবলীতে কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে, তা আমাদের জানতে ও অনুসরণ করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য করতে হবে

www.pathagar.com

কোরআন তাদের যাবতীয় বিষয়ে এবং তার সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কিভাবে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়েছে। আমাদের দেখতে হবে কিভাবে কোরআন সেই সংগঠনকে হাত ধরে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই অগ্রযাত্রায় সেই সংগঠন কখনো আছাড় খেয়েছে, আবার কখনো উঠে দাঁড়িয়েছে। কখনো একটু বাঁকা পথে, আবার কখনো সোজা পথ ধরে চলেছে। কখনো দুর্বলতা প্রদর্শন করেছে, আবার কখনো প্রচন্ড শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। কখনো আঘাত খেয়ে বেদনাহত হয়ে মুষড়ে পড়েছে, আবার পরক্ষণেই ধৈর্য ধরে তা সামাল দিয়েছে। ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে ধীরে ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়েছে। আর এভাবে প্রতিটি স্তরে তার মধ্যে মানবীয় স্বভাব প্রকৃতিরই স্ফুরণ ঘটেছে। মানবীয় দুর্বলতা অথবা সবলতারও প্রকাশ পেয়েছে।

এভাবে সে সংগঠনটির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, যে বিষয়ে কোরআনের প্রত্যক্ষ সম্বোধনের পাত্র হতো, একং বিষয়ে আমরাও কোরআনের প্রত্যক্ষ সংলাপ ও সম্বোধনের পাত্র। মানুষ হিসেবে আমাদের যা কিছু ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট রয়েছে, যেগুলো আমরা জানি, চিনি ও প্রত্যক্ষ করি, তা কোরআনের আহ্বান ও নির্দেশ গ্রহণ করতে, মেনে চলতে এবং জীবনপথে চলার ব্যাপারে তার নেতৃত্ব দ্বারা উপকৃত হতে পুরোপুরি সক্ষম।

এভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা কোরআনকে এমন এক জীবন্ত গ্রন্থ হিসেবে দেখতে পাবো, যা প্রথম মুসলিম সংগঠনের জীবনকে যেমন পরিচালনা করেছে, তেমনি আমাদের জীবনকেও পরিচালনা করতে সক্ষম। আমরা বুঝতে পারবো যে, কোরআন আজ যেমন আমাদের সাথে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আমরা এও অনুধাবন করবো যে, কোরআন আমাদের বাস্তব সমস্যাবলীর ধরা-ছোঁয়ার বাইরের কোন আবৃত্তিসর্বস্ব বন্দনার শ্লোকমালা নয়, কিংবা তা অতীতে ঘটে যাওয়া মানবজীবনের সাথে সম্পর্কচ্যুত ও প্রভাবহীন কোনো ইতিহাস নয়।

বস্তুত আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান এই প্রাকৃতিক জগতের মতোই কোরআন এক চিরঞ্জীব সত্য। বিশ্বপ্রকৃতি হচ্ছে আল্লাহর দৃশ্যমান গ্রন্থ, আর কোরআন হচ্ছে পাঠ্যগ্রন্থ। এই উভয় গ্রন্থ তাদের প্রণেতা আল্লাহর অস্তিত্বের জীবন্ত সাক্ষী। উভয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মের জন্যই সৃজিত। প্রকৃতি তার সমস্ত গুণবৈশিষ্ট সহকারে সচল এবং নিজের জন্য নির্ধারিত কাজে তৎপর রয়েছে। সূর্য তার নির্ধারিত কক্ষপথে পরিভ্রমণরত এবং নিজস্ব ভূমিকায় কর্মরত। চন্দ্র, পৃথিবী এবং সকল গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্র সৃষ্টির আদি থেকেই আপন দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত। সার্বক্ষিণিক তারা তাদের এই ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে মানুষ আগের মতোই রয়েছে, তাই এই মানুষকে সম্বোধনকারী কোরআনও অপরবর্তিত রয়েছে। মানুষের পরিবেশে ও প্রতিবেশে যতো পরিবর্তনই আসুক না কেন সে নিজে পরিবেশকে যতোই প্রভাবিত করুক বা পরিবেশ দ্বারা যতোই প্রভাবিত হোক, তার জন্মগত ও প্রকৃতিগত স্বভাব-বৈশিষ্টে কোনো পরিবর্তন আসেনি। আর কোরআন তাকে তার এই অপরিবর্তনীয় স্বভাব প্রকৃতি সহকারেই সম্বোধন করে। কোরআনকে মানবজাতির

www.pathagar.com

বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনকে পরিচালিত করার ক্ষমতা দিয়েই রচনা করা হয়েছে। কারণ কোরআন হচ্ছে আল্লাহর সর্বশেষ কেতাব এবং তার স্বভাব প্রকৃতি মহবিশ্বের প্রকৃতির মতোই চিরস্থায়ী, চির সচল ও অপরিবর্তনীয়।

সূর্য সম্পর্কে কেউ যদি বলে যে, এটা একটা প্রাচীন 'রক্ষণশীল' তারকা এবং তার স্থলে একটা নতুন 'প্রগতিশীল' নক্ষত্র প্রয়োজন অথবা মানুষ একটা প্রাচীন ও রক্ষণশীল প্রাণী এবং তার পরিবর্তে পৃথিবীকে গড়ার জন্য নতুন একটা 'প্রগতিশীল' সৃষ্টির প্রয়োজন, তবে এ দু'টো কথা যেমন হাস্যকর, তেমনি আল্লাহর সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআন সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা হাস্যকর ব্যাপার।

আলোচ্য সূরাটি হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত বদর যুদ্ধের পর থেকে নিয়ে হিজরী তৃতীয় বর্ষে সংঘটিত ওহুদ যুদ্ধের সময় পর্যন্ত মদীনার মুসলিম সমাজ জীবনের একটি কর্মচঞ্চল অংশের দৃশ্য তুলে ধরেছে। এই সময়ে তাদের জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলী এবং সে ক্ষেত্রে কোরআনের গৃহীত পদক্ষেপ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সাথে কোরআনের সম্পর্কের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে।

সূরাটির ভাষা এতো শক্তিমান ও বলিষ্ঠ যে, তা যুগের গোটা চালচিত্র, মুসলিম সমাজের জীবনচিত্র এবং এই সময়ে সংঘটিত সমস্ত সংঘাত-সংঘর্ষের দৃশ্যকে পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। সেই সাথে তৎকালীন প্রচ্ছন্ন বিষয়গুলো ও বিভিন্ন রকমের চেতনা ও অনুভূতির গোপনীয়তার বিষয়টিও সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এভাবে এই সময়ের সমগ্র পরিস্থিতিটাকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, পাঠকের কাছে মনে হতে থাকে যেন সে নিজেই সেই ঘটনাবলী ও তৎকালীন মুসলিম সমাজের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। পাঠক যদি চোখ বন্ধ করে, তাহলে আমার ন্যায় তার হৃদয়পটেও ভেসে উঠবে তৎকালীন মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ভেসে উঠবে তাদের চোখ-মুখের বিশেষ অভিব্যক্তি এবং বিবেক ও মনে লুক্কায়িত অনুভূতি, ভেসে উঠবে তাদের চারপাশে ওঁৎ পেতে থাকা শত্রুদের চতুর্মুখী অপতৎপরতার দৃশ্য। কখনো তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটছে কখনো তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটাচ্ছে, কখনো হিংসা ও বিদ্বেষে জলছে, কখনো বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করে তাদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। ওহুদের ময়দানে প্রথমে পরাজিত হয়ে পুনরায় পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। এসব কিছু এবং যুদ্ধকালের অন্য সকল প্রকাশ্য তৎপরতা ও গোপন প্রতিক্রিয়া তার মনের অলিন্দে ভেসে উঠবে। যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত প্রতিহত করতে, সকল অপবাদ ও সংশয় ঘুচাতে, মোমেনদের হৃদয় ও কদমকে শক্ত ও অটল করতে তাদের চিন্তাধারাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা, ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করা ও তা থেকে শিক্ষা তুলে ধরার দৃশ্য ভেসে উঠবে। আবার তারই ভিত্তিতে সঠিক ও অনাবিল দৃষ্টিভংগী গড়ে তোলা, কুচক্রী ও বিশ্বাসঘাতক শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা, কন্টকময় ও পিচ্ছিল পথে তাদেরকে সঠিকভাবে এবং স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও অন্তর্যামী আল্লাহর নির্ভুল জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত করাই যে কোরআন অবতারণার লক্ষ্য সে কথা সবার জানা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এ

www.pathagar.com

সূরার সকল নির্দেশ ও শিক্ষা স্থান কালের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত, নাযিল হওয়াকালীন পরিস্থিতি ও পরিবেশের বাধ্যবাধকতা থেকেও মুক্ত। এ সব নির্দেশ ও শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বা, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মুসলিম সমাজ সংগঠন তথা সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করেই নাযিল হয়েছে। তাই প্রত্যেক যুগেই মনে হয় তা মানবজাতির চলমান ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে তাৎক্ষণিকভাবে নাযিল হয়েছে। আসলে, ভূত ভবিষ্যত ও গোপন-প্রকাশ্য সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত মহান আল্লাহর সূক্ষ্ণ ও নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতেই কোরআন নাযিল হয়েছে বলে সর্বকালেই তা সমকালীন ও চির আধুনিক বলে প্রতীয়মান হয়।

এই কোরআন হচ্ছে সর্বকালের ও সকল স্থানের জন্য উপযোগী ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের গ্রন্থ। সকল প্রজন্মের মুসলিম উম্মাহর জন্য চিরস্থায়ী সংবিধান এবং মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সর্বশেষ পথপ্রদর্শক।

এই সময়ে মুসলিম সমাজ মদীনায় কিছুটা স্থিতিশীলতা লাভ করেছিলো। সূরা বাকারার ভূমিকায় আমরা যে পরিস্থিতির চিত্র এঁকেছি, মুসলমানরা তার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলো।

এ সময়ে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং মুসলমানদেরক আল্লাহ তায়ালা কোরায়শদের ওপর বিজয়ী করেছেন। যে পরিবেশে ও প্রক্রিয়ায় এই বিজয় অর্জিত হয়েছিলো, তাতে এটা একটি অলৌকিক ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হচ্ছিলো। এ কারণে মদীনার খাযরাজ গোত্রের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলকে পর্যন্ত সকল অহমিকা ও অহংকার ভুলে ইসলাম ও তার নবীর প্রতি নমনীয় হতে দেখা গিয়েছিল। সকল ঘৃণা ও উন্নাসিকতা ঝেড়ে ফেলে, সকল হিংসা ও বিদ্বেষ গোপন করে মুসলিম সমাজের সাথে বর্ণচোরা মুসলমান হিসেবে যোগ দিতে বাধ্য হতে হয়েছিলো। সে বলেছিল, ইসলাম এখন দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলের মুসলমানদের সাথে যোগদানের মধ্য দিয়ে মদীনায় মোনাফেকীর বীজ বপিত হয়; বরং মোনাফেকীর বীজ থেকে চারা গজাতে শুরু করে। কেননা; বদরের যুদ্ধের আগেই মদীনায় যখন ইসলামের বিস্তার ঘটে, তখন অনেকে নিজের পরিবার পরিজনদের ইসলাম গ্রহণের কারণে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করতে অপারগ হয়ে মোনাফেক অর্থাৎ কপট ও ভন্ড মুসলমান বনে গিয়েছিলো। ক্রমে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বেশ কিছু লোক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। তারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে জাহির করতে বাধ্য হয়। অথচ ভেতরে ভেতরে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি চরম বৈরিতা ও বিদ্বেষ পোষণ করতো। মুসলমানদের ওপর বিপদ আপদ নেমে আসুক এটা তারা মনে প্রাণে কামনা করতো। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে তারা অনৈক্য ও কোন্দল সৃষ্টি করতো। তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং শক্তি খর্ব হয়, এমন ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করতো। এভাবে তারা তাদের অন্তরের চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করতো এবং সাধ্যমতো মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টায় থাকতো।

www.pathagar.com

এই মোনাফেক তথা ভন্ড মুসলমানরা ইহুদীদেরকে স্বাভাবিকভাবেই মিত্র হিসেবে পেয়েছিলো। ইসলাম, মুসলিম জাতি ও রসূল (স.)-এর প্রতি ইহুদীরা ছিলো মোনাফেকদের চেয়েও বেশী বিদ্বেষী। মদীনার নিরক্ষর আরবদের ওপর তাদের যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, ইসলামের আবির্ভাবের ফলে তা বিপন্ন হয়ে উঠেছিলো। তারা মদীনার 'আওস' ও 'খাযরাজ' গোত্রের মধ্যে কলহ-কোন্দল বাঁধিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতো। আল্লাহর অনুগ্রহে এই দু'টি গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যায় এবং তাদের ঐক্য ইস্পাতের প্রাচীরের মতো অটুট হয়ে যায়। ফলে সেই নোংরা খেল খেলার সুযোগ আর ইহুদীদের হাতে থাকলো না।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ে ইহুদীরা প্রমাদ গুনলো। মুসলমানদের ওপর হিংসায় তারা তেলে বেগুনে জ্বলতে লাগলো। তারা সকল রকমের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির চেষ্টায় লাগলো। তারা যাতে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং নিজেদের আকীদা আদর্শ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে, সে জন্য তারা কুটিল চক্রান্তে মেতে উঠলো।

ইতিমধ্যে বনু কাইনুকার ঘটনার মধ্য দিয়ে ইহুদীদের বৈরিতা একেবারেই স্পষ্ট হয়ে পড়লো। রসূল (স.)-এর মদীনা আগমনের পর তার সাথে তারা যে সব চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল তার কোনো তোয়াক্কা না করেই ইহুদী গোত্র বনু কাইনুকা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে।

বদরের পরাজয়ের কারণে মোশরেকদের অবস্থাও ছিলো এই রকম বেসামাল। উত্তেজনায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো। তারা হিসাব কষে দেখতে লাগলো মোহাম্মদ (স.) ও মুসলিম শিবিরের বিজয়ের ফলাফল কী হতে পারে, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, মান-মর্যাদা এমনকি তাদের অস্তিত্বের ওপর এ বিজয় কী ধরনের হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। এসব বিষয় হিসাব করে দেখার পর তারা এই ধ্বংসাত্মক হুমকি প্রতিহত করার প্রস্তুতি নিতে লাগলো। তারা ভাবলো যে, এই মুহূর্তেই তা প্রতিহত না করলে পরে হয়তো তার গতি কখনো রোধ করা যাবে না।

মুসলিম শিবিরের শত্রুরা একদিকে যেমন দুর্জয় শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিলো, তেমনি মুসলমানদের ওপর তাদের আক্রোশের মাত্রাও ছিলো তুংগে। পক্ষান্তরে মদীনায় মুসলমানদের প্রস্তুতি ছিলো একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের। তাদের মাঝে এমন কিছু লোকও ছিলো, যারা তখনো পরিপক্কতা অর্জন করেনি। তাছাড়া মুসলিম শিবির তখনো এতটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি, যা দ্বারা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বাইরের আগ্রাসন প্রতিহত করা যায়, ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য ও সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি ও পরিবেশ উপলব্ধি করা যায়, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনের বাস্তব কর্মপদ্ধতি ও তার দায় দায়িত্ব অনুধাবন করা যায়।

একদিকে মোনাফেক তথা নামধারী মুসলমানরা সমাজে প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে জেঁকে বসেছিলো। তাদের মধ্যে সবার শীর্ষে ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। তাদের গোত্রীয় বন্ধন তখনো অটুট। এরা মুসলমানদের সমাজে মিলেমিশে একাকার

www.pathagar.com

হয়ে যাওয়ায় মুসলিম সমাজে খানিকটা ফাটল বিরাজ করছিলো এবং তা তাদের মূল্যবোধেও প্রভাব বিস্তার করছিলো। আলোচ্য সূরায় ওহুদ যুদ্ধসংক্রান্ত উক্তিসমূহ পর্যালোচনা করলে এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অনুরূপভাবে মদীনায় ইহুদীদেরও যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো। মদীনার অধিবাসীদের সাথে তাদের আর্থিক লেনদেন ছিলো এবং তাদের সাথে তারা বিভিন্ন রকমের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। তাদের বৈরিতা তেমন স্পষ্ট ছিল না। আর মুসলমানদের মনে এই উপলব্ধি তেমন পরিপক্ক ছিলো না যে, তাদের আকীদা-বিশ্বাসই তাদের সকল চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি, বাসস্থান ও লেনদেনের মূল ভিত্তি। আদর্শের বাইরে কোনো সম্পর্ক ও বন্ধনের যে কোনোই স্থায়িত্ব নেই সে কথাও মুসলমানরা তখনো ভালোমতো বুঝে উঠতে পারেনি। এ কারণেই ইহুদীরা মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে নানাভাবে নাক গলানো, সন্দেহ-সংশয় ও অনৈক্য সৃষ্টি এবং প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাচ্ছিলো। মুসলমানদের কেউ কেউ সরলতার দরুণ ইহুদীদের কথাবার্তা শুনতো ও তা দ্বারা মাঝে মাঝে প্রভাবিত হতো। এমনকি রসূল (স.) ইহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার জন্য কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলে তাঁকে তা থেকে বিরত রাখতেও কেউ কেউ এগিয়ে আসতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। (যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই স্বয়ং নিজে বনু কাইনুকার ব্যাপারে রসূল (স.)-এর কাছে প্রবলভাবে সুপারিশ করেছিল।)

অপরদিকে মুসলমানরা বদর যুদ্ধে সহজতম উপায়ে ও স্বল্পতম ব্যয়ে একটি পরিপূর্ণ ও গৌরবজনক বিজয় অর্জন করেছিলো। মুসলমানরা সংখ্যায় ছিলো মুষ্টিমেয় এবং তাদের সাজ সরঞ্জামেরও ছিল প্রচন্ড অভাব। তা সত্ত্বেও বিপুল অস্ত্রে সজ্জিত বিশাল কোরায়শ বাহিনীর সাথে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তারা বিজয়ী হয়।

মোশরেক বাহিনীর সাথে আল্লাহর বাহিনীর প্রথম দফা যুদ্ধে এ বিজয় ছিল মহান আল্লাহর এক পরিকল্পিত অনুগ্রহের ফল। এর পেছনে যে কী গভীর প্রজ্ঞাময় রহস্য লুক্কায়িত ছিলো, আজ তার কিছুটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। সম্ভবত উদীয়মান ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনকে সেদিনকার সেই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের মুখে টিকিয়ে রাখা, উপরন্তু তার সক্রিয় অস্তিত্ব প্রমাণ করা ও তাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়াই ছিলো এই বিজয় দানের উদ্দেশ্য।

কিন্তু মুসলমানদের মনে এই ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত নীতি এত সহজ ও সরল নয়, আল্লাহর এই নীতি অনুসারে বিজয় কঠোর শর্ত সাপেক্ষ। লোক তৈরী, আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি রক্ষা, প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ, ইসলামের নীতিমালার অণুসরণ, নেতার আনুগত্য ও শৃংখলা, মনের কূ-প্ররোচনা ও রণাংগনের গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি- এ সবই বিজয়ের জন্য অপরিহার্য। ওহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে মুসলমানদেরকে এই বিষয়গুলো শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে। অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও জীবন্তভংগীতে বিষয়টি এ সূরায়

www.pathagar.com

তুলে ধরা হয়েছে। কোন কোন কাজ এই পরাজয়ের কারণ হয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উপদেশ দেয়া হয়েছে।

ওহুদ যুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, এই শিক্ষাটুকু মুসলমানদেরকে অনেক মূল্য দিয়ে অর্জন করতে হয়েছে। তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, হযরত হামযা (রা.)-এর মতো মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বকে হারাতে হয়েছে। এর চেয়েও কঠিন ও মর্মন্তুদ ব্যাপার এই যে, তাদের প্রাণপ্রিয় নবী (স.)-কে পর্যন্ত আহত ও দাঁতভাংগা অবস্থায় পড়ে থাকার মতো হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখতে হয়েছে। রসূল (স.)-এর চোয়ালের ভেতরে শিরোস্ত্রাণের ভাংগা লৌহখন্ড ঢুকে গিয়েছিলো। মুসলমানদের জন্যে এর চেয়ে মর্মস্পর্শী ও মর্মঘাতী ব্যাপার আর কিছুই ছিলো না!

ওহুদ যুদ্ধ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর পর্যালোচনা এই সূরার বিরাট অংশ জুড়ে বিস্তৃত। ইসলামী জীবনাদর্শের সাথে বাতিলের যাতে লেশমাত্রও মিশ্রণ না থাকে, তাওহীদের বিষয়টি যাতে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের উস্কে দেয়া সন্দেহ-সংশয় যাতে বিদূরিত হয়– চাই সে উস্কানি আহলে কেতাব গোষ্ঠীর নিজস্ব আদর্শিক বিভ্রান্তির কারণে হোক অথবা মুসলমানদের মধ্যে আদর্শিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং তার মাধ্যমে তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির কূ-মতলবে ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কানি হোক– সে জন্য নানাবিধ নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

একাধিক বর্ণনা থেকে জানা যায়, ১ থেকে ৮৩ নং আয়াত পর্যন্ত অংশ ইয়ামেনের নাজরান প্রদেশ থেকে আগত খৃষ্টান প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা প্রসংগে নাযিল হয়েছিলো। এই প্রতিনিধি দলটি এসেছিল ৯ম হিজরীতে। তবে আমার কাছে এই আয়াতগুলোর নাযিল হওয়ার সময়কাল নবম হিজরীতে হওয়ার মতটি মেনে নেয়া কষ্টকর। কেননা এ সূরার বর্ণনাভংগী থেকে স্পষ্টতই মনে হয় যে, এটি হিজরতের পরের প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছে। যখন মুসলমানদের সমাজ ছিল শৈশবাবস্থায় এবং ইহুদী ও অন্যান্য বাতিল শক্তির প্রভাব তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের ওপর ছিলো অত্যন্ত প্রবল।

তবে এই আয়াতগুলোর নাজরানী প্রতিনিধি দল উপলক্ষে নাযিল হওয়ার পক্ষের বর্ণনাটি সঠিক হোক বা ভুল হোক, সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে বুঝা যায়, খৃষ্টানদের সন্দেহ সংশয় বিশেষত হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত দ্বিধা-সংশয় নিরসন ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য। ইসলামের খালেস তাওহীদের তত্ত্বটি এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া এ সূরায় খৃষ্টানরা যে আকীদাগত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে এবং তাদেরকে সেই তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, যা তাদের কাছে রক্ষিত অবিকৃত কেতাবে বিধৃত হয়েছে।

সূরার এই অংশটিতে ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে কিছু সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং মদীনার আহলে কেতাবদের চক্রান্ত থেকে মুসলমানদের সাবধান করা হয়েছে।

মোদ্দাকথা এই যে, সূরার প্রায় অর্ধেক জুড়ে বিস্তৃত এই অধ্যায়টি (আয়াত ১-৮৭ আয়াত) ইসলামী আদর্শ এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপে প্রচলিত সমকালীন অন্যান্য বাতিল

www.pathagar.com

মতাদর্শের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের একটি দিক তুলে ধরেছে। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেহাৎ তাত্ত্বিক ও মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত নয়, বরং এটা হচ্ছে সদ্যপ্রসূত মুসলিম সমাজ ও তার বিরুদ্ধে ওঁৎপাতা শত্রুদের মাঝে বেধে যাওয়া সর্বাত্মক যুদ্ধের একটি দিকমাত্র। ইসলামের এই দুশমনরা চতুর্দিক থেকে আসকারা পেয়ে আসছিল। যুদ্ধে তারা সব রকমের অস্ত্র ও ব্যবহার করতো, আর এ ক্ষেত্রে তাদের সর্ব প্রধান অস্ত্র ছিল মুসলমানদেরকে আদর্শিক বিভ্রান্তিতে লিপ্ত করার চেষ্টা। এই আদর্শিক যুদ্ধ মূলত এক চিরস্থায়ী যুদ্ধ, যা আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ ও তার শত্রুদের মধ্যে বিরাজমান রয়েছে। নাস্তিক কাফের গোষ্ঠী, ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ, এরা সবাই চিন্তা-চেতনায় ও চরিত্রে আগে যেমনটি ছিলো, এখনও তেমনি আছে এবং চিরকাল তারা তেমনি থাকবে।

সূরার মূল বক্তব্য অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংঘাত আগে যেমন ছিলো, এখনও তেমনি আছে এবং কোরআনই ইসলামী আন্দোলনের শক্তি ও প্রেরণার উৎস এবং তার চালিকাশক্তি, কোরআনই মুসলিম উম্মাহর চিরন্তন পথপ্রদর্শক। হক ও বাতিলের চলমান সংগ্রামে পরম হিতাকাংখী কোরআনকে উপেক্ষা করা একমাত্র সেই উন্মাদ ও হতচ্ছাড়া ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে যুদ্ধের সময়ে বিজয় অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকে। নিজেকে অথবা জাতিকে প্রতারিত করে চরম শৈথিল্য অথবা অবিমৃশ্যকারিতা দ্বারা মুসলমানদের চিরন্তন ও প্রাচীনতম দুশমনদের সেবাদাসের ভূমিকা পালন করে।

সূরার প্রথম অধ্যায়ে যে আলোচনা ও নির্দেশনাসমূহ রয়েছে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আসমানী কেতাব অমান্যকারী ইহুদী ও খৃষ্টানরা মুসলমান ও ইসলামের প্রতি কী মনোভাব পোষণ করতো। বিশেষত নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে তাদের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

'তিনিই তোমার প্রতি কেতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কেতাবের আসল অংশ, আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা বিভ্রান্তি ছড়ানো ও মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার উদ্দেশ্যে রূপকগুলোর অনুসরণ করে। অথচ সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ জানে না।' (আয়াত ৭)

'তুমি কি তাদেরকে দেখোনি যারা কেতাবের কিছু অংশ পেয়েছে। আল্লাহর কেতাবের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছিল, যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অতপর তাদের একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।' (আয়াত ২৩) 'হে কেতাবধারীরা! কেন তোমরা ইবরাহীমের ব্যাপারে বাদানুবাদ করো অথচ তাওরাত ও ইনজীল তার পরেই নাযিল হয়েছে।' (আয়াত ৬৫) 'কেতাবধারীদের কোনো কোনো দলের আকাংখা, যাতে তারা তোমাদেরকে গোমরাহ করতে পারে।' (আয়াত ৬৯) হে কেতাবধারীরা! কেন তোমরা আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করো? অথচ তোমরাই তার প্রবক্তা।' (আয়াত ৭০) 'হে কেতাবধারীরা! কেন তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার ভেজাল করছো এবং সত্যকে গোপন করছো? অথচ তোমরা তা জানো।' (আয়াত ৭১)

www.pathagar.com

'কেতাবধারীদের একদল বললো, মুসলমানদের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে দিনের প্রথমভাগে মেনে নাও, আর দিনের শেষভাগে অস্বীকার করো, হয়তো তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। .... ' (আয়াত ৭২-৭৩)

'কেতাবধারীদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যার কাছে একটি দিনার গচ্ছিত রাখলেও তা সে ফেরত দেবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। এটা এ জন্য যে, তারা বলেছে, নিরক্ষরদের অধিকার বিনষ্ট করতে আমাদের কোনো দোষ নেই.....।' (আয়াত ৭৫)

'তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কেতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে করো যে, তারা কেতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে, তা মোটেই কেতাবের অংশ নয়। তারা বলে যে, এ সব কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নয়। ....' (আয়াত, ৭৮)

'তুমি বলো, হে কেতাবধারীরা! কেন তোমরা আল্লাহর কেতাব অমান্য করছো, অথচ তোমরা যা কিছু করো, তা আল্লাহর জানা আছে।' (আয়াত ৯৮)

'বলো, হে কেতাবধারীরা! কেন তোমরা আল্লাহর পথে ঈমানদারদেরকে বাধা দান করো? তোমরা তাদের দ্বীনের মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা অনুসন্ধান করো, অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছো।' (আয়াত ৯৯)

'দেখো, তোমরা তাদেরকে ভালোবাসো, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কেতাবই বিশ্বাস করো। যখন তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাত করে তারা বলে হাঁ আমরা তোমাদের কেতাবকে মানি পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের ওপর রোষ বশত আংগুল কামড়ায়।' (আয়াত ১১৯)

'তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহলে তাতে তারা খুশী হয়।' (আয়াত ১২০)

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলমানদের শত্রুরা তাদের সাথে শুধু যে রণাংগণে তরবারি ও বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করতো– তাই নয় এবং তারা শুধু যে তাদের অন্যদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারি দিয়ে লড়াই করতে প্ররোচিত করতো তাও নয়, বরং তাদের সাথে আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শ নিয়েও লড়াই করতা। তাদের মনে নানা রকমের সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করতো।

মূলত আজকের মতো সেকালেও তারা বুঝতো যে, এই মুসলমান জাতিকে আঘাত করতে হলে এভাবেই আঘাত করতে হবে। কেননা, এ জাতি আকীদা ও আদর্শের ব্যাপারে দুর্বল না হলে আর কোনো কিছুতে দুর্বল হবে না! তার আত্মা পরাজিত না হলে সে কখনো পরাজিত হয় না। এ জাতির ঈমান যতক্ষণ মযবুত থাকে, ততক্ষণ তার শত্রুরা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসলিম জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু হলো সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, যে তাদের ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাসকে শিথিল ও নড়বড়ে করে দেয়,

www.pathagar.com

তাদেরকে আল্লাহর পথ ও জীবন পদ্ধতি থেকে হটিয়ে দেয় এবং তাদের শত্রুদের ব্যাপারে প্রতারণা করে এবং শত্রুদের সূক্ষ্ম চক্রান্ত সম্পর্কে তাদের উদাসীন ও বিভ্রান্ত করে।

মুসলিম জাতি ও তার শত্রুদের মধ্যকার প্রথম লড়াই হচ্ছে এই আকীদা বিশ্বাসের লড়াই। এমনকি মুসলমানদের শত্রুরা যখন তাদের অর্থসম্পদ, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চায়, তখনও তারা সর্বপ্রথম তাদের আকীদা-বিশ্বাসকে বিনষ্ট করার চেষ্টা চালায়। কেননা, তারা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে যে, মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস যতোদিন অটল ও অবিকৃত থাকে, ততোদিন তাদের পরাজিত করা যায় না। যতোক্ষণ তারা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের ওপর অবিচল থাকে, ততোদিন তারা তাদের শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত বুঝতে পারে। এ জন্য মুসলিম জাতির শত্রুরা, তাদের ক্রীড়নক ও দালালরা সকল শক্তি দিয়ে চেষ্টা করে তাদেরকে লড়াইর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখতে। তারা জানে, এ কাজটি করতে পারলে এরপর ইচ্ছামতো তাদের শোষণ করা যাবে এবং গোলামীর নিগড়ে আবদ্ধ করা যাবে। কেননা, তাদের আকীদা-বিশ্বাসের দৃঢ়তা তখন আর তাদের পথ আগলে রাখতে পারবে না।

এরপর এই আকীদা ও আদর্শের বিরুদ্ধে শত্রুদের চক্রান্ত ক্রমেই শানিত হবে এবং মুসলমানদেরকে তাদের আকীদা-আদর্শের ব্যাপারে সন্দেহে ফেলে ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্যকে শিথিল করে দেবে। এ কথাই এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, 'কেতাবধারীদের একটি গোষ্ঠী তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিতে আগ্রহী'। বস্তুত এটা হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের স্থায়ী গোপন দুরভিসন্ধি।

এ কারণে কোরআন এই বিষাক্ত অস্ত্রটি ধ্বংস করতে চেয়েছে সবার আগে। সে মুসলিম জাতিকে তার আকীদা ও আদর্শের ওপর দৃঢ় ও অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কেতাবধারীরা তাদের মনে যেসব সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করতো তা দূর করেছে, ইসলামের মহাসত্য তত্ত্বকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে এবং মুসলিম জাতিকে বুঝিয়েছে এই পৃথিবীতে তাদের পরিচয় কী এবং তাদের গুরুত্ব কতোটুকু, আর মানব জাতির ইতিহাসে তাদের আদর্শের ভূমিকা কী। কোরআন তাদেরকে ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক করেছে, শত্রুদের গোপন উদ্দেশ্য এবং নোংরা ফন্দি-ফিকিরের মুখোশ তাদের সামনে উন্মোচন করে দিয়েছে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ ফাঁস করে দিয়েছে। এই বিদ্বেষ ও দুরভিসন্ধির কারণ এই যে, আল্লাহর কাছে মানব ইতিহাসে মুসলিম জাতির অবস্থান অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ।

কোরআন মুসলমানদের কাছে এ সত্যও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে যে, সৃষ্টিজগতে শক্তির ভারসাম্য আসলে কিভাবে নির্ণীত হয়। সে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ইসলামের শত্রুরা আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত দুর্বল ও তুচ্ছ। কেননা, আল্লাহর বিধানকে অমান্য করে এবং নবীদেরকে হত্যা করে তারা গোমরাহ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অতপর আল্লাহ তায়ালা যে মুসলমানদের পক্ষে আছেন, তিনি যে সমগ্র বিশ্ব জগতের শরীকবিহীন

www.pathagar.com

নিরংকুশ ক্ষমতাসম্পন্ন রাজাধিরাজ এবং তিনি সম্প্রতি বদরের ময়দানে কাফেরদের যেমন ধ্বংস করেছেন, তেমনি এই কেতাবধারীরা কাফেরদেরকেও অচিরেই চরম শাস্তি দেবেন। এই হুমকি, হুশিয়ারী ও নির্দেশাবলী নিম্নের আয়াতগুলোতে লক্ষণীয় ঃ

'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তিনি তোমার প্রতি কেতাব নাযিল করেছেন সত্যতার সাথে, যা পূর্ববর্তী কেতাবসমূহকে সমর্থন করে। ইতিপূর্বে নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইনজীল, মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং নাযিল করেছেন হক বাতিল বাছাই করার মাপকাঠি ......।' (আয়াত ২-৫)

'যারা কুফরীতে লিপ্ত, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কখনো তাদের কাজে আসবে না। আর তারা দোযখের কাষ্ঠ হবে।......কাফেরদেরকে বলে দাও, খুব শিগগিরই তোমরা পরাভূত হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সেটা কতোই না নিকৃষ্ট স্থান! নিশ্চয় দু'টো দলের মোকাবেলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিলো। একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের, এরা নিজেদের চোখে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিলো। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি যোগান........।' (আয়াত ১০-১৩)

'নিসন্দেহে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন হচ্ছে একমাত্র ইসলাম। যাদেরকে কেতাব দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতভেদে লিপ্ত হয়েছে শুধুমাত্র বিদ্বেষবশত। ....।' (আয়াত ১৯)

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবন বিধান তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত।' (আয়াত ৮৫)

'বলো, হে আল্লাহ তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দাও, আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। তোমার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।' (আয়াত ২৮)

'মানুষদের মধ্যে ইবরাহীমের নিকটতম সম্পর্কের অধিকারী হলো এই নবী, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তার যথার্থ অনুসরণ করেছে ....।'(আয়াত ৬৮)

'তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোন দ্বীন চায়? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত .....।' (আয়াত, ৮৩)

'হে মোমেনরা! তোমরা যদি কেতাবধারীদের কোনো ফেরকার কথা মানো, তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর কাফেরে পরিণত করবে। তোমরা কেমন করে কাফের হতে পারো, অথচ তোমাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়া হয় এবং তোমাদের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহর রসূল বিদ্যমান। আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, তারা সরল পথের সন্ধান পাবে। .... এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে তাঁর আয়াতগুলো বর্ণনা করেন যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও।' (আয়াত ১০০-১০৩)

www.pathagar.com

'তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী থাকবে। কিতাবধারীরা যদি ঈমান আনতো, তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের মধ্যে কতক মোমেন আছে ঠিকই, তবে অধিকাংশই ফাসেক। ..... ওরা নাফরমানী করেছে এবং সীমালংঘন করেছে।' (আয়াত ১১০-১১৩)

'হে মোমেনরা! তোমরা মোমেনদেরকে ছাড়া আর কাউকে অন্তরংগরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাকলেই তারা খুশী। শত্রুতাজনিত বিদ্বেষ তাদের মুখে ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে আছে তা আরো জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করলাম, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে পারো। দেখো, তোমরাই তাদেরকে ভালোবাসো, কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না। .... আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহলে তারা তাতে আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের চক্রান্তে তোমাদের কোনোই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তাদের সকল কর্মকান্ড আল্লাহর আয়ত্বাধীন।' (আয়াত ১১৮-১২০)

এই দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ অভিযান, যার কতিপয় আয়াত এখানে উদ্ধৃত করলাম, তা থেকে এবং এর অন্যান্য নির্দেশাবলী থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যথা ঃ

১. মদীনার কেতাবধারীরা মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসকে শিথিল করে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কু-মতলবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিলো। এ জন্য তারা যাবতীয় উপায় উপকরণ কাজে লাগাচ্ছিলো।

২. তাদের এই ষড়যন্ত্র মুসলমানদের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এ কারণেই সূরার এই অংশটিতে এ বিষয়ে এতো দীর্ঘ ও বিচিত্র ভাষণের অবতারণা করা হয়েছে।

৩. বহু শতাব্দী পরে আজও আমরা লক্ষ্য করছি যে, সে একই শত্রুগোষ্ঠী ইসলামের দাওয়াত ও দাওয়াতকারীদের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীতে আগ্রাসী তৎপরতার নিয়োজিত রয়েছে। সে কেতাবধারী তথা ইহুদী, খৃষ্টান ও তাদের ক্রীড়নকরা সর্বত্র ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত। এ কারণেই পরম প্রজ্ঞাময় ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা উক্ত শত্রুদের ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত এই জ্ঞানকেই চিরস্থায়ী আলোকবর্তিকা হিসেবে জ্বালিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে পরবর্তী মুসলিম প্রজন্মগুলো তাদের শত্রুদেরকে চিনতে ও তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে পারে।

সূরার দ্বিতীয় অংশটি ওহুদ যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেই সাথে ইসলামী আকীদা ও আদর্শ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য এবং সেই সব তথ্যের ভিত্তিতে মুসলিম সংগঠনকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী এই অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন আবেগ-অনুভূতি ও মানসিক অবস্থাকে এখানে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, তৎকালীন মুসলমানদের অবস্থা এবং তাদের সামষ্টিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের দৃশ্য এখানে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

www.pathagar.com

সূরার প্রথমোক্ত অংশের সাথে এই অংশের সম্পর্ক সুবিদিত ও সুস্পষ্ট। বস্তুত এ দ্বিতীয় অংশটি ইসলামী আদর্শের পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের কাজটিও সম্পন্ন করে। বিশেষত যুদ্ধ বিগ্রহ উপলক্ষে এ কাজটি অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠভাবে আঞ্জাম দেয়া যায়। কেননা এই সময়ে আদর্শিক শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী মানসিক অবস্থা বেশী বিরাজ করে। অনুরূপভাবে পৃথিবীতে সত্যের দাওয়াত দানকারী সংগঠনকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার দৃঢ়তা অর্জনে সাহায্য করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বাস্তব ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে তাকে জয়-পরাজয়ের ব্যাপারে আল্লাহর চিরস্থায়ী নীতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী সংগঠনকে প্রস্তুত করার ব্যাপারে সূরার এই অংশের আলোচনা ও বক্তব্যের অবদান ও গুরুত্ব কতোখানি, সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা এখানে দুরূহ। যেহেতু সে অংশটি চতুর্থ পারায় অবস্থিত, তাই বাদবাকি আলোচনা যথাস্থানে করবো ইনশাআল্লাহ।

ওহুদ যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায়ের পরে সূরার যে পরিশিষ্ট রয়েছে, সেই অংশটির প্রতি এবার একটু দৃষ্টি দেয়া যাক। এ অংশটিকে গোটা সূরার সংক্ষিপ্তসার বলা চলে। এ অংশটির শুরুতে রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টি দেখে শিক্ষা গ্রহণ এবং মোমেনদের হৃদয়ে তা কী অনুভূতি জাগায় সে সংক্রান্ত আলোচনা। এই অনুভূতির ফলে মন থেকে যে দোয়া বেরিয়ে আসে, তা সে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে,

'নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের ক্রমাবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া সকল অবস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে ও বলেঃ হে আমাদের প্রভু, তুমি এই বিশ্ব জগতকে অর্থহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি। অতএব, তুমি আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে মুক্তি দাও।..... হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একজন আহ্বায়ককে ঈমানের জন্য আহ্বান জানাতে শুনেছিলাম যে, তোমাদের প্রভুর ওপর ঈমান আনো। অতপর আমরা ঈমান এনেছি! অতএব হে প্রভূ! আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও, আমাদের সমস্ত গুনাহের কাফফারার ব্যবস্থা করে দাও এবং সৎলোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দাও......।' (আয়াত, ১৯০-৯১)

এ দোয়া আদর্শিক নিষ্ঠা, সরলতা এবং অন্তরের একাগ্রতা ও আল্লাহভীতি ফুটিয়ে তুলেছে।

এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দোয়া কবুলের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মোমেনদের হিজরত, জেহাদ ও আল্লাহর পথে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কষ্ট স্বীকার করার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে,

'অতপর তাদের প্রতিপালক তাদের দোয়া কবুল করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির কোনো কাজই নষ্ট করি না, চাই সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রী হোক। তোমাদের একজন অপরজনের আপন। যারা হিজরত করেছে, আপন

www.pathagar.com

বাড়িঘর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতন ভোগ করেছে, লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে, তাদের সমস্ত গুনাহ আমি অবশ্যই ক্ষমা করবো এবং এমন বেহেশতে আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এটা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান।'

এখানে ওহুদ যুদ্ধ, তার ঘটনাবলী ও প্রতিক্রিয়ার প্রতি ইংগীত দেয়া হয়েছে।

এর পরবর্তী আয়াতে কেতাবধারীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। সূরার প্রথমাংশ জুড়ে তাদের বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছিলো। এখানে তাদের প্রসংগের পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা যে সত্যের অনুসারী তা সকল কেতাবধারী কিন্তু অস্বীকার করে না। তাদের মধ্যে অনেকে এ সত্য স্বীকার করে এবং তার সাক্ষ্যও দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কেতাবধারীদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যারা আল্লাহর প্রতি, তোমাদের প্রতি ও তাদের প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনে, তারা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ এবং আয়াতগুলোকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে না।'

সূরার শেষে মুসলমানদেরকে ঈমান সহকারে ধৈর্য, তাকওয়া, প্রতিরক্ষা ও একাত্মতার আহ্বান জানানো হয়েছে,

'হে ঈমানদাররা! ধৈর্য ধারণ করো, একাত্মতা প্রদর্শন করো এবং প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হও। আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায়, তোমরা সফল হবে।'

এ উপসংহার সূরার সামগ্রিক কাঠামো ও বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ সূরার আরো তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, যার আলোচনা ছাড়া সূরাটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্পন্ন হয় না। এ তিনটি বিষয় সমগ্র সূরায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। প্রথমটি হচ্ছে 'আদ্-দ্বীন' ও 'আল ইসলাম'-এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ।

'আদ্-দ্বীন' এর যে সংজ্ঞা আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন এবং যে রূপ তাঁর ইঙ্গিত ও মনোনীত, তা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সামগ্রিক রূপ নয় বরং এটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বহু পন্থার একটি পন্থা। এটি হচ্ছে সর্বাত্মক ও পূর্ণাংগ তাওহীদের পন্থা। বিশ্ব প্রকৃতিতে বিরাজমান যাবতীয় সৃষ্টি যেমন তার স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তেমনি মানুষও স্বভাবগতভাবেই স্রষ্টার প্রতি বশ্যতা প্রকাশ করে। এই স্রষ্টা ইলাহ বিশ্ব জগতের প্রতিপালক ও রক্ষক যে একই সত্ত্বা এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, সে কথাই এই সূরায় এবং কোরআনের সর্বত্র ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর সৃজন ব্যতীত কোন বস্তু সৃজিত হয় না, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সৃষ্টিজগতকে কেউ নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে না। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার যে 'দ্বীন' গ্রহণ করেন তা হচ্ছে একমাত্র 'ইসলাম'। অর্থাৎ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের কাছে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ এবং জীবনের সকল বিভাগ ও অংগনের জন্য একমাত্র এই উৎস থেকে নির্দেশনা গ্রহণ। আল্লাহর কেতাবের কাছ থেকে যে কোনো সমস্যার সমাধান গ্রহণ করা এবং যে সব রসূলের কাছে আল্লাহর কেতাব নাযিল হয়েছে, তাদেরকে অনুসরণ করা। বস্তুত আল্লাহর দ্বীন মূলত একই দ্বীন এবং এই দ্বীন

www.pathagar.com

হচ্ছে ইসলাম। মনমগযে ও বাস্তব কর্মকান্ডে ইসলামের বাস্তব রূপ ও তাৎপর্য এটাই। এই অর্থে মুসলিম জাতি সর্বযুগের সকল নবীর অনুসারী– যদি তাদের ইসলামের অর্থ হয় আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করে তাঁর দেয়া জীবনবিধানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করা।

বস্তুত উক্ত তাওহীদ সম্বলিত ইসলাম এই সূরার একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এটি সূরার ৩০টিরও বেশী জায়গায় সুস্পষ্ট ভাষায় আলোচিত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে এ বিষয়ের আলোচনার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি,

আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।' (আয়াত ২) 'আল্লাহ, ফেরেশতারা ও জ্ঞানীরা ন্যায়নিষ্ঠার সাথে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই'...... (আয়াত ৮) 'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র ধর্ম' (আয়াত ১৯) তারা যদি তোমার সাথে তর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে বলে দাও, আমি এবং আমার অনুসারীরা একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করলাম ....' (আয়াত ২০)।

'তুমি কি দেখোনি, যারা কেতাবের কিছু অংশ পেয়েছে, তাদেরকে নিজেদের সমস্যার মীমাংসা করার জন্য ডাকা হয়। অতপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় ও উপেক্ষা করে।' (আয়াত ২৩) 'তুমি বলো, তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসলে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ভালোবাসেন।' (আয়াত ৩১)

'বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য করো! .....' (আয়াত ৩২)

'হাওয়ারীরা বললো, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী, ...(আয়াত ৫২-৫৩)

'বলো, হে আহলে কেতাব, এসো আমাদের ও তোমাদের অভিন্ন একটি অভিন্ন কালেমার দিকে। তাহলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো গোলামী করবো না, ... ' (আয়াত ৬৪)

'ইবরাহীম ইহুদীও ছিলো না, খৃস্টানও ছিল না, তবে সে ছিলো একজন একনিষ্ঠ মুসলিম। সে মোশরেক ছিল না।' (আয়াত ৬৭)

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।' (আয়াত ৮৫) ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ আরো বহু আয়াত রয়েছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি এ সূরায় আলোচিত হয়েছে, তা হলো, আপন প্রতিপালকের সাথে মুসলমানদের অবস্থান, তাঁর কাছে তাদের আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশকে গ্রহণ, অনুসরণ ও হুবহু আনুগত্য। এ বিষয়েরও কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি,

'যারা জ্ঞানে পরিপক্ক তারা বলে, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। সব কিছুই আমদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। .....' (আয়াত ৭, ৮, ৯) 'যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও .....' (আয়াত ১৬-১৭) 'হাওয়ারীরা বললো, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, তুমি সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম।' (আয়াত ৫২-৫৩) 'তোমাদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আবির্ভূত করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য

www.pathagar.com

.....' (আয়াত ১১০) 'আহলে কেতাবের মধ্যে অনেকে এমনও আছে, যারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং গভীর রাতে সেজদা করে। ......' (আয়াত ১১৩-১১৪) এমন অনেক নবী ছিলো, যার সাথে বহু সংখ্যক সাথী যুদ্ধ করেছে। কিন্তু আল্লাহর পথে দুঃখকষ্ট ভোগ করার কারণে তারা কখনো দুর্বল হয়নি। মনোবল হারায়নি, হতোদ্যমও হয়নি। ....' (আয়াত ১৪৬-১৪৭)

'যারা আঘাত পেয়েও আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্য থেকে নিষ্ঠাবান ও মোত্তাকীদের জন্য রয়েছে বিরাট পুরস্কার।' (আয়াত ১৭১-১৭২) যারা ওঠা, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে বলে, হে আমাদের প্রভু, তুমি এই সব কিছুকে বৃথা সৃষ্টি করনি। ......' (আয়াত ১৯১-১৯৪)

'কেতাবধারীদের মধ্যে এমনও অনেকে আছে, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে, তাদের ওপর ও তোমাদের ওপর যে বিধান নাযিল হয়েছে তার ওপরও ঈমান আনে এবং আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ থাকে ....' (আয়াত ১৯) ইত্যাকার আরো বহু আয়াত।

তৃতীয় যে বিষয়টি এ সূরায় অনেকখানি স্থান জুড়ে অবস্থান করছে তাহলো, অমুসলিমদের বন্ধুত্ব থেকে সতর্কীকরণ। কাফেরদের হীনতা ও নীচতা তুলে ধরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, যারা জীবনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত করে না, সেই কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও মৈত্রী রেখে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়টির প্রতি আমি ইতিপূর্বেও আভাস দিয়েছি, তবে এর গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে কিছু নমুনা তুলে ধরছি,

'মোমেনদের পক্ষে উচিত নয় মোমেদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা। .....।' (আয়াত ২৮-২৯) 'কেতাবধারীদের একটি গোষ্ঠী তোমাদের বিপথগামী করতে ভালোবাসে ....।' (আয়াত ৬৯) 'হে মোমেনরা! তোমরা যদি আহলে কেতাবের অনুসরণ কর, তাহলে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর তোমাদেরকে পুনরায় কাফেরে পরিণত করবে .....।' (আয়াত ১০০-১০৪)

'হে মোমেনরা! তোমরা কাফেরদের অনসরণ করলে তারা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ......।' (আয়াত ১৪৯-১৫১) 'দেশে দেশে কাফেরদের পরিভ্রমণ তোমাকে যেন প্রতারিত না করে ......।' (আয়াত ১৯৬-১৯৭)

'আহলে কেতাব গোষ্ঠী তোমাদেরকে কিছু উত্যক্ত করা ছাড়া কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে এলে নিজেরাই পরাভূত হবে, অতপর তাদেরকে আর সাহায্য করা হবে না। তারা যেখানেই থাকুক, তাদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে।' (আয়াত ১১১-১১২)

'হে মোমেনরা! তোমরা মোমেনদেরকে ছাড়া আর কাউকে ঘনিষ্ঠভাগে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করার কোন সুযোগই হাতছাড়া করে না। তোমরা দুঃখ কষ্টে জর্জরিত থাক এটাই তারা পছন্দ করে। .....' (আয়াত ১৮)

www.pathagar.com

এই তিনটি আলোচিত বিষয় পরস্পরের পরিপূরক ও পরস্পরের সাথে সমন্বিত। ইসলামী আদর্শ, তাওহীদ-তত্ত্ব, মানব জীবনে তাওহীদ-তত্ত্বের দাবী ও চাহিদা, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মানুষের চেতনা ও অনুভূতি জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে তার অবদান এবং সর্বশেষে আল্লাহর দুশমনদের প্রতি মানুষের একমাত্র সমুচিত ভূমিকার বিশ্লেষণে এই তিনটি বক্তব্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সূরার মূল পাঠ যে আরো বেশী জীবন্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ তা যথাস্থানে দেখা যাবে। মনে রাখতে হবে, এ সূরা একটা যুদ্ধের পরিবেশে নাযিল হয়েছে। এই যুদ্ধ যেমন চলছিল বদরের রণাংগণে, তেমনি চলছিল আদর্শের অংগনে, মানুষের হৃদয়-জগতে। এ কারণেই এর প্রভাব আন্দোলনে, চেতনার জাগৃতিতে এবং উদ্বুদ্ধকরণে এত বেশী জীবন্ত ও বিস্ময়কর।

সূরা আন নেসা

এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আল বাকারার পর এ সূরাটি কোরআনে করীমের সবচেয়ে বড়ো সূরা। নযুলের দিক থেকে এটির স্থান হচ্ছে সূরা আল মোমতাহানার পর। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ সূরার কিছু অংশ অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় নাযিল হয়েছে, আর কিছু অংশ তার পূর্বে ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময় অনুযায়ী সূরার ধারাবাহিকতার বিষয়টি চূড়ান্ত নয়, এ কথাটি আমি প্রথম পারায় সূরা বাকারার ভূমিকার মধ্যে আলোচনা করেছি। কোনো নির্দিষ্ট সূরার পুরো অংশ একই সময় একসাথে নাযিল হয়নি, বরং বিভিন্ন সূরার আয়াতসমূহ অনেক সময় একই সাথে নাযিল হতো। তখন রসূল (স.) ওহী লেখকদের প্রত্যেকটি আয়াতকে তার নির্দিষ্ট সূরার সাথে সংযুক্ত করার নির্দেশ দিতেন। এই ধারার আলোকে একটি সূরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকতো, সূরা সমাপ্ত হতে দির্ঘদিন লাগতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সূরা আল বাকারায় এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা মাদানী যিন্দেগীর প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে, আর কিছু আয়াত এমনও রয়েছে যা রসূল (স.)-এর জীবনের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে।

সূরা আন নেসারও কিছু অংশ সূরা আল মোমতাহানার পর ষষ্ঠ হিজরীতে, আর কিছু অংশ অষ্টম হিজরীতে নাযিল হয়েছে। এ সূরার সিংহভাগ অবশ্য নাযিল হয়েছে হিজরতের প্রথম দিকে। সম্ভবত এ সূরা নাযিল হওয়ার ধারা তৃতীয় হিজরীতে ওহুদ যুদ্ধের পর থেকে শুরু করে অষ্টম হিজরীর পর পর্যন্ত জারি ছিলো, যখন সূরা আল মোমতাহানার শুরু ভাগ নাযিল হয়।

উদাহরণস্বরূপ আমরা এখন ব্যভিচারিণীদের হুকুমসম্বলিত আয়াতটি উল্লেখ করতে পারি।

'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারাই কুকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদের মধ্যে থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করো....।' (আয়াত ১৪)

www.pathagar.com

এটা চূড়ান্ত সত্য যে, এই আয়াতটি সূরা আন নূরের সে আয়াতটির পূর্বে নাযিল হয়েছে যেখানে ব্যভিচারের শাস্তির কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে

'ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ। তাদের প্রত্যেককেই একশতটি বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের কোনো প্রকার অনুকম্পার উদ্রেক না হয় ......শাস্তিদানের সময় ঈমানদার লোকদের একটি দল যেন প্রত্যক্ষ করে।'

সর্বশেষ আয়াতটি পঞ্চম হিজরী (মতান্তরে ৪র্থ হিজরী) 'ইফক' (হযরত আয়েশার ওপর অপবাদ)-এর ঘটনার অব্যবহিত পরে নাযিল হয়েছে। উক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (স.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা আমার কাছ থেকে তাদের সম্পর্কিত আল্লাহর বিধান গ্রহণ করো। আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে যে পন্থা বাতলে দিয়েছেন তা হচ্ছে সে বিধানটি যা সূরা আন নূরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এমন উদাহরণ এই সূরায় অসংখ্য রয়েছে। এগুলো প্রায়ই সার্বিকভাবে তার নাযিল হওয়ার ইতিহাস বর্ণনা করে, আমি সূরা আল বাকারার ভূমিকায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

এ সূরাটি মানবীয় চরিত্রের একটি বিশেষ দিককে চিত্রায়িত করেছে। মুসলিম দলের গঠন, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং এই দল ও সমাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ইসলাম এভাবে চেষ্টা করেছে। এর সাথে এই সূরাটি নতুন ইসলামী সমাজে কোরআনের প্রভাবের দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছে। এই সূরা মানবজাতির সাথে আল্লাহর বিধানের সম্পর্কের ধরন ও স্বভাব বর্ণনা করেছে, আর মানব অস্তিত্বের প্রকৃতি এবং আল্লাহর দেয়া বিধানের আহ্বানে তার সাড়া দেয়ার মানসিকতাকেও চিত্রায়িত করেছে। এই বিধানের ডাকে সাড়া দেয়ার ফলে তার অবস্থান ক্রমান্বয়ে নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরের দিকে অগ্রসর হয়। এ দীর্ঘতম রাস্তা অতিক্রম করতে তাকে লোভলালসা, কামনাবাসনা, ভয়ভীতি ও উৎসাহ উদ্দীপনার ন্যায় বড়ো বড়ো বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যে রাস্তা অত্যন্ত বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ, আর যেখানে ইসলামের শত্রুরা ঘাপটি মেরে বসে আছে।

আমরা ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারা এবং সূরা আলে ইমরানে নিম্নেবর্ণিত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করেছি,

মদীনায় মুসলিম দলের উৎপত্তিকে কেন্দ্র করে যে সকল পরিবেশ পরিস্থিতির অবতারণা হয়েছে, কোরআনে কারীমের তার মুখোমুখি হওয়া, আল্লাহর বিধানের প্রকৃতি বর্ণনা করা এবং এমন গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলো বর্ণনা, যার ওপর ইসলামী দর্শন প্রতিষ্ঠিত, আর এ চিন্তা চেতনা থেকে যে মানদন্ড ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়ে থাকে আল্লাহর যমীনে উক্ত আমানত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ত্যাগ স্বীকার করা, আল্লাহপ্রদত্ত বিধান এবং তারই আলোকে গঠিত দলের শত্রুদের স্বভাব ও প্রকৃতি চিত্রায়িত করার বিষয়টিও আমরা দেখতে পাই। শত্রুদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত থেকে মুসলিম দলকে সতর্ক

www.pathagar.com

করা, তাদের আকীদাবিশ্বাসের বক্রতা এবং তাদের ঘৃণ্য প্রচারনার বর্ণনা করাও এখানে শামিল রয়েছে। যেমনিভাবে আমরা সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের উল্লেখিত বিষয়সমূহ দেখেছি, তেমনিভাবে আমরা এই সূরায় কোরআনে মজীদকে যাবতীয় পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং বাস্তবতার মুখোমুখী দেখতে পাই।

কিন্তু কোরআনে করীমের প্রত্যেকটি সূরার বিশেষ স্বকীয়তা, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে, যার দিকে তার সকল বিষয় নিবদ্ধ থাকে। প্রত্যেক সূরার বিশেষ স্বকীয়তার দাবীর মধ্যে আরও রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের সন্নিবেশ, বিশেষ নিয়মে কেন্দ্রবিন্দুর দিকে তার সমন্বয় সাধন, যাতে তার বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রকাশ এবং যার মাধ্যমে তার স্বকীয়তার পৃথকীকরণ সম্ভব হয়। প্রতিটি জীবন্ত বস্তুর মতো তার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকে আলাদা আলাদা।

আমরা এই সূরার দিকে তাকালে দেখতে পাই এবং উপলব্ধি করি যে, তা একটি জীবন্ত সত্ত্বা, তা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং তার বাস্তবায়নের জন্যে বিভিন্ন পন্থা ও মাধ্যম অবলম্বন করে। সূরার বিভিন্ন শব্দ, আয়াত এবং অনুচ্ছেদসমূহই এর মাধ্যম এবং উপকরণ, যার দ্বারা প্রত্যেকটি সূরা তার উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়। আমরা কোরআনের প্রত্যেকটি সূরার মধ্যে যেমন অনুভব করি, সেভাবে এ সূরার মধ্যেও একটি বিষয় অনুভব করি, আর তা হচ্ছে জীবন্ত সত্ত্বার সাথে তার ডাকে সাড়া দেয়া। সম্প্রীতি ও সহানুভূতির এমন অনুভূতি, যার গুণাবলী পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য সবই পৃথক ও সু নির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনার অধিকারী।

যে জাহেলী সমাজ থেকে মুসলিম সমাজকে আলাদা করে নেয়া হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিশ্চিহ্ন করতে এই সূরা চেষ্টা করছে। সে জাহেলিয়াতের আবর্জনা ও জ াল থেকে তাকে পবিত্র করা এবং মুসলিম সমাজের স্বকীয়তাকে পরিষ্কার করতে সূরা আন নেসা সর্বত্র চেষ্টা করেছে। আল্লাহর বিধানের স্বভাব বর্ণনার মাধ্যমেও তা করা হয়েছে- যার থেকে সে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি হয়েছে। মোশরেক, আহলে কেতাব বিশেষ করে ইহুদী- যারা তার পার্শ্বে লুকিয়ে রয়েছে, তাদের চিহ্নিতকরণ, দুর্বল ঈমানদার ও মোনাফেক চক্রের ঘাপটিমারা শত্রুদের চিহ্নিতকরণ, তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত এবং ঘৃণ্য প্রচারের মুখোশ উন্মোচন করা, তাদের ভ্রান্ত চিন্তা চেতনা, কর্মসূচী ও পদ্ধতি বর্ণনা করাও এর কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। সূরাটি এর সাথে এও বলেছে যে, প্রত্যেকটি বিধানকে এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যা ওপরে বর্ণিত যাবতীয় বিষয়গুলোকে ও নিয়ন্ত্রণ করবে, অতপর এগুলোকে মযবুত ধাঁচে ঢেলে সাজাতে হবে।

আমরা এখানে জাহেলিয়াতের আবর্জনাকে নতুন বিধান ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থায় দেখতে পাই। একইভাবে আমরা জাহেলিয়াতকে দেখতে পাই নতুন জীবন বিধানকে মুছে ফেলার চেষ্টায় সংগ্রামরত। এখানে আমরা আরো অবলোকন করি যে, যুদ্ধের ব্যাপারেও আল্লাহর বিধান এই কোরআনের মাধ্যমে তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট রয়েছে। ভয়াবহতা ও গভীরতার দিক থেকে এ যুদ্ধ দুনিয়ার সাধারণ যুদ্ধ থেকে কোনো অংশেই কম নয়।

www.pathagar.com

আমরা যখন সে সমস্ত জাহেলী আবর্জনার দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি যার কিছু কিছু জিনিস ইসলামী সমাজ জাহেলী সমাজ থেকে বহন করে নিয়ে এসেছে- তখন কখনো কখনো আমাদের বিস্মিত হতে হয়। এমনকি এ সমস্ত আবর্জনা এ সূরাটি নাযিল হওয়ার সময় সে সমাজে দীর্ঘকাল ব্যাপী বিজয়ীর বেশে উপস্থিত ছিলো। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সমস্ত আবর্জনার উপস্থিতি এখনও মুসলিম সমাজে বিদ্যমান।

ইসলামী বিধান মুসলিম দলটিকে যে উঁচুস্থানে উন্নিত করেছে, তার দিকে তাকালে আমাদেরকে বিস্মিত হতে হয়। এ দুর্লভ বিধান মুসলিম জাতিকে সর্ব্বোচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। এ দুর্লভ বিধানের অনুসরণ ছাড়া এ উঁচু আসনে আরোহণ করা মানবজাতির জন্যে কখনো সম্ভব নয়। একমাত্র এই অনুপম জীবনবিধানই মানব অস্তিত্বকে নীচুতা থেকে মুক্তি দিয়ে ধীরে ধীরে নম্রতা, ধৈর্যশীলতা, সহনশীলতার সর্বোচ্চ স্থানে আসীন করাতে সক্ষম।

যে ব্যক্তি মানবজাতির ইতিহাসের এ অনুপম দৃশ্যের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, তার সামনে মহান রেসালাতের জন্যে তৎকালীন আরব উপদ্বীপের লেখাপড়া না জানা এই মূর্খ লোকদের নির্বাচনে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হেকমতের একটি দিক পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। সেখানে তারা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, চরিত্র, চিন্তাচেতনা ও বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল উপায়-উপকরণসহ পূর্ণ জাহেলিয়াতের প্রতিনিধিত্ব করতো, যাতে করে তারা তাদের মাঝে এ বিধানের পরিপূর্ণ প্রভাব জমাতে পারে, যাতে করে তাদের মাঝে অলৌকিক মোজেযা সংঘটিত হওয়ার ধরনটি স্পষ্ট হয়ে যায়, যে মোজেযার প্রদর্শন বিশ্বের অন্য কোনো বিধান ও মতাদর্শের পক্ষেই সম্ভব নয়। মানবজাতি কোথায় ওই বিধানকে খুঁজে পাবে যে বিধান তাকে হাত ধরে বহু উঁচু আসনে বসিয়ে দেবে। সে বিধান হলো একমাত্র আল কোরআন। এ বিধান তার চরিত্র ও মানষিকতা গঠনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে। মানুষ আপন অস্তিত্ব থেকে অন্য কোনো অস্তিত্বে পরিবর্তিত হয় না। তার সকল পরিবর্তন পরিবর্ধন এবং উন্নতি তার জীবনের সাথেই সংযুক্ত হবে, তার স্বভাব ও অস্তিত্বকে পরিবর্তন করবে, কিন্তু কখনো তাকে অন্য সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করবে না। এখানে যা দেখা যায় আসলে এগুলো হচ্ছে বাহ্যিক পরিবর্তন ও উন্নতি মাত্র। এ পরিবর্তন মহাসমুদ্রের তরংগের ন্যায় যা তার মূল জলীয় স্বভাবের কোনো পরিবর্তন করে না, এমনকি তা তার স্থায়ী স্রোত ও গতিতে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। এটি সব সময় স্থায়ী স্বাভাবিক উপায়-উপকরণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

এখানে কোরআনের বক্তব্যসমূহ স্থায়ী মানবীয় অস্তিত্বেরই সম্মুখীন হয়, আর এটা ওই উৎসেরই তৈরী যা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছে। তাই কোরআনের বক্তব্য এখানে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও তার নিত্য নতুন সমস্যারও কোরআন মোকাবেলা করছে। অথচ মানুষ সর্বাবস্থায় তার মৌলিক উপাদানের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

www.pathagar.com

মানুষের মাঝে এ ধরনের প্রস্তুতি ও নমনীয়তা দুটোই রয়েছে। অন্যথায় তার পক্ষে জীবনের বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পর্যায়ের মোকাবেলা করা সম্ভব হতো না। কেননা তার চার পাশে যা আছে সেগুলো কোনোটাই স্থায়ী নয়। এ কারণেই মানবজাতির জন্যে রচিত আল্লাহর এ বিধানের কিছু স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে। তিনিই এ বৈশিষ্ট্যসমূহ তার মাঝে আমানত রেখেছেন এবং তিনি শেষদিন পর্যন্ত তার মধ্যে এগুলো বিদ্যমান রাখবেন।

এমনিভাবেই এ এ কোরআন গোটা মানবজাতিকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়ে সর্বোচ্চ আসন পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। এ কোরআনকে মানুষ কখনো পেছনের দিকে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে না এবং এর কোনো একটিকে নিয়ে সে নীচের দিকেও নেমে আসতে পারবে না।

আমাদের নতুন সমাজটি পুরাতন জাহেলিয়াতের আরব সমাজের মতোই, এটি শিল্পোন্নত সভ্য সমাজ বলে কথিত নতুন জাহেলিয়াতের আমেরিকা ইউরোপের সমাজের মতো নয়। আল্লাহর বিধান এবং কোরআনী ভাষ্যে সব কিছুই রয়েছে এবং পরিণামে তা ওই সত্তার খোঁজ পাবে, যে সত্তা এ স্থান থেকে তাকে ধরে ওপর থেকে আরো ওপরে উঁচু থেকে আরো উঁচু আসনে নিয়ে যাবে, ইসলাম মানব ইতিহাসের কোনো এক জীবন্ত যুগে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে।

আসলে জাহেলী যুগ একটিমাত্র অতীত সময়ের নাম নয়, বরং জাহেলিয়াত হচ্ছে প্রত্যেক এমন যুগ যেখানে মানুষ অন্য মানুষের দাসত্বে নিমজ্জিত হয়। এ বৈশিষ্ট্য বর্তমান বিশ্বের সকল মতাদর্শের মাঝেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত প্রতিটি রাষ্ট্র সমাজব্যবস্থা জাহেলিয়াত ছাড়া কিছু নয়। এখানে মানুষ মতাদর্শ, মানদন্ড, মূল্যবোধ, বিধিবিধান ও রীতি-নীতি আরেক মানুষের কাছ থেকেই গ্রহণ করে থাকে। আর এটাই হচ্ছে যাবতীয় উপাদানসহ পূর্ণ জাহেলিয়াতের নাম। মোদ্দাকথা, জাহেলিয়াতের আসল পরিচয় হচ্ছে মানুষ এখানে আল্লাহর এবাদাত ছেড়ে অন্য মানুষের দাসত্বে মগ্ন হবে।

ইসলাম হচ্ছে একমাত্র জীবনবিধান, যেখানে মানুষ মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকে। এখানে চিন্তা চেতনা, নীতি ও আদর্শ, মানদন্ড, মূল্যবোধ, বিধিবিধান সে গ্রহণ করে স্বয়ং রব্বুল আলামীন থেকে। মুসলমানরা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তাদের মাথা নত করে। তারা একমাত্র আল্লাহর বিধান অনুযায়ীই নিজেদের জীবন পরিচালনা করে।

এটাই হচ্ছে জাহেলিয়াত ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য। এই সূরাটি অতি সূক্ষ্মভাবে এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য রচনা করেছে। যাতে তার মাঝে আর কোনো কোনো সন্দেহ বিদ্যমান না থাকে।

এটা জানা কথা যে, কোরআনে কারীমের প্রত্যেকটি আদেশ নিষেধ জাহেলী সমাজের কোনো না কোনো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হচ্ছিলো। তার মাধ্যমে কোরআন তখনকার সমাজে বিদ্যমান কোনো প্রথাকে বহাল রাখার এবং কোনো

www.pathagar.com

কোনো প্রথাকে রহিত করার চেষ্টা করছিলো। এটা এমনিভাবে সম্পন্ন হয়েছিলো যাতে সাধারণভাবে মৌলিক বিধানের কোনোপ্রকার ক্ষতি সাধিত না হয়। তাই এখানে 'ঘটনার বিশেষ প্রেক্ষিত বড়ো কথা নয়, শব্দের ব্যাপকতাই হচ্ছে ধর্তব্য বিষয়।' উল্লেখ্য যে, কোরআনের বক্তব্য সকল যুগে, সকল ক্ষেত্রে এবং সকল পরিবেশে কাজ করার জন্যে এসেছে, আর এর মাঝেই লুকায়িত আছে কোরআনের মোজেযা। যেসব ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কোরআনের এ বক্তব্য নাযিল হয়েছিলো মানব সম্প্রদায় সে অবস্থাসমূহের বারবার সম্মুখীন হচ্ছে। এই বিধান সেই জাহেলী যুগের মতো বর্তমানেও যে কোনো সমাজকে অতি নীচু স্থান থেকে উদ্ধার করে অতি উঁচু অবস্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম।

অধিকন্তু আমরা কোরআনে কারীমের নির্দেশাবলীর আলোকে জাহেলী সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলোও আমরা জানতে সক্ষম হই, আমরা সেসব নতুন বৈশিষ্ট্যগুলোও জানতে সক্ষম হই, যার মাধ্যমে কোরআনে মাজীদ ইসলামী সমাজ সৃষ্টি করতে চায়।

আমরা এই সূরায় জাহেলী সমাজের ঘৃণ্য কর্মকান্ড দেখতে পাচ্ছি যা থেকে মুসলিম দলকে একবার উদ্ধার করার পর পুনরায় তারা সেই জাহেলিয়াতের মাঝে পড়ে গেছে। তার সাথে আমরা এ সূরায় নতুন কিছু বিষয়ও দেখতে পাচ্ছি যা কোরআন নতুন সমাজ সৃষ্টির কাজে দৃঢ়ভাবে মানুষকে উপহার দিতে চেষ্টা করেছে।

আমরা এমন একটি সমাজ দেখতে পাই, যেখানে অভিভাবকরা এতীম ছেলে বিশেষ করে এতীম মেয়েদের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করছে। যে সমাজে ভালো সম্পদ খারাপ সম্পদের শুধু এ ভয়ে সাথে বদল করা হতো যে, এতীমরা যখন বড়ো হবে তখন তারা তাদের সম্পদ ফিরিয়ে নেবে। ধন সম্পদের মালিক ছোটো ছোটো এতীম মেয়েদেরকে তাদের অভিভাবকরা বিয়ে করার মানসে কিংবা নিজ ছেলেদের সাথে বিয়ে দেয়ার উদ্দ্যেশে ঘরের ভেতরে আটক করে রাখতো। এ কাজটি তাদের প্রতি কোনো আন্তরিকতার বশবর্তী হয়ে নয় বরং তাদের মালিকানাধীন সম্পদ কুক্ষিগত করার হীন উদ্দেশ্যেই করা হতো।

আমরা এমন একটি সমাজ দেখতে পাই, যেখানে শিশু, দুর্বল এবং মহিলাদের ওপর অত্যাচার করা হতো। মীরাসের প্রকৃত অংশ তাদেরকে দেয়া হতো না, বরং অস্ত্র চালাতে সক্ষম শক্তিশালী পুরুষরা, মীরাসের সিংহভাগ নিয়ে নিতো। দুর্বলদের ভাগ্যে নিতান্ত সামান্য কিছু অংশই জুটতো। এদের প্রাপ্ত এ সামান্য সম্পদেরই জন্যে আবার তাদেরকে ঘরে আটক করে রাখা হতো এবং বৃদ্ধ অভিভাবক অথবা অভিভাবকের পুরুষ শিশুর সাথে তাদের বিয়ে দেয়ার জন্যে তাদেরকে বন্দী করে রাখা হতো, আর এটা একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই করা হতো যাতে তাদের সম্পদ হাতছাড়া হয়ে না যায় এবং গরীবদের মাঝে তা বন্টিত না হয়।

এ সূরাতে আমরা এমন একটি সমাজ দেখতে পাই, যে সমাজ নারী জাতির সাথে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে তারা অন্যায় ও অবিচারমূলক আচরণ করেছে, তাদেরকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করেছে। তাদের ক্ষতি সাধনের জন্যে নানাভাবে আটক

www.pathagar.com

করে রেখেছে। অধিকন্তু এ সমাজ যেমনিভাবে পুরুষ জাতিকে সম্পদের উত্তরাধিকার করেছে তেমনিভাবে নারীকে উত্তরাধিকার করেনি। যখন মহিলাদের স্বামী মারা যেতো, তখন তার কাছে আসতো এবং তার ওপর তার কাপড় নিক্ষেপ করতো এবং সে এটা ভালো করেই জানতো যে সে (মহিলা) নিশ্চিতভাবে তারই জন্যে গচ্ছিতা ও রক্ষিতা হয়ে গেলো, সে ইচ্ছা করলে তাকে মোহর ছাড়াই বিয়ে করতে পারে অথবা তাকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে তার মোহর সে কুক্ষিগত করতে পারে কিংবা স্বামী তাকে তালাক দেয়ার পর তাকে অন্যত্র বিয়ে বসা থেকে বলপূর্বক বিরত রেখে তাকে এমন অবস্থায় রাখবে যেখানে তাকে স্ত্রী বুঝা যাবে না, আবার তালাকপ্রাপ্তাও বুঝা যাবে না। টাকা দিয়ে নিজেকে স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে।

আমরা এমন একটি সমাজ এখানে দেখতে পাই, যেখানে নারী জাতির মর্যাদার অধপতনের কারণে পরিবারের বন্ধন নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিলো এবং তার নিয়ম-নীতিতে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো বহুতরো বিশৃংখলা। অধিকন্তু দত্তক ও অভিভাবকত্বের আইন-কানুনে বিশৃংখলা এবং আত্মীয়তা ও বংশ তালিকা বর্ণনার নিয়ম-পদ্ধতির সাথে তার সংঘর্ষও পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। সর্বোপরি সে সমাজে যৌন ও পারিবারিক সম্পর্কে ছিলো সীমাহীন নৈরাজ্য ও হাজারো অনিয়ম। এমনকি সবার সামনে ব্যভিচার, ধর্ষণ, অশ্লীল বাক্য বিনিময় ও অবাধ যৌন মিলনও সেখানে বিদ্যমান ছিলো।

আমরা এমন একটি সমাজ দেখতে পাই, যেখানে সুদভিত্তিক লেনদেন, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করা হতো, মানুষের অধিকার হরণ করা হতো, আমানতের খেয়ানত করা হতো, মানুষের জান ও মালের ওপর আক্রমণ হতো। ন্যায়-ইনসাফ সে সমাজ থেকে মুছে গিয়েছিলো। সে সমাজে লোক দেখানো মান মর্যাদা ও গৌরব অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া ধন সম্পদ ব্যয় করা হতো না। আর এ দানের সম্পদ ধনী ও শক্তিশালীরা যতোটুকু পেতো, অসহায়, গরীব ও দুস্থদের ভাগ্যে সে পরিমাণ জুটতো না।

এগুলো ছিলো জাহেলিয়াতের বৈশিষ্ট্য। সুন্দর করে এ সূরাটি তা বর্ণনা করেছে। এ ছাড়া তদানীন্তন আরব ও আশেপাশের অন্যান্য জাতির মধ্যে জাহেলিয়াতের যে সয়লাব বয়ে যাচ্ছিলো তার বর্ণনা অন্যান্য সূরার মধ্যেও বিস্তারিত রয়েছে।

আবার জাহেলী সমাজ একেবারে মর্যাদা ও গুণাবলীবিহীন কোনো সমাজও ছিলো না-বরং তারও ছিলো অসংখ্য গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই সে সমাজের এক বিরাট অংশ রসূল (স.)-এর রেসালাতকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিলো। জাহেলী সমাজের মহৎ গুণাবলীকে জাহেলিয়াতের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে তারা তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করেছিলো। যদি দ্বীন ইসলামের আগমন না ঘটতো, তাহলে জাহেলিয়াতের মহৎ গুণাবলীসমূহ পাপ ও অপকর্মের স্তূপের নীচে চাপা পড়ে একদিন এমনিই নিঃশেষ হয়ে যেতো। এ নতুন বিধানের আগমন না ঘটলে আরব জাতি বিশ্বমানবতার সামনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই উপস্থাপন করতে সক্ষম হতো না। এ

www.pathagar.com

বিধান জাহেলিয়াতের বিকৃত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধীরে ধীরে মুছে ফেলে তার ওপর ইসলামের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যসমূহ দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে লাগলো এবং ইতস্ততবিক্ষিপ্ত নিঃশেষিত আরব জাতির মহৎ গুণাবলীকে একে একে উদ্ধার করতে লাগলো।

যে জাহেলিয়াতের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্য থেকেই ইসলাম কিছুসংখ্যক লোককে বেছে নিলো। তাদের ভাগ্যে মহান রব্বুল আলামীন কল্যাণ রেখেছেন এবং তাদেরকে মানবজাতির নেতৃত্বের জন্যে তিনি নির্বাচন করেছেন। অতপর ইসলাম তার থেকে একটি ইসলামী দল বের করে আনে, তারপর তাকে দিয়ে একটি ইসলামী সমাজ গঠন করে। সে সমাজ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে, যার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত অন্য কোনো জাতি ইতিপূর্বে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। আজও যদি মুসলিম জাতির মধ্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তারাও পূর্বের ন্যায় বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে সক্ষম হবে।

এই সূরার মাঝে আমরা এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি যা ইসলামী বিধানকে জাহেলিয়াতের জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে। এ বিধান ও পরিবেশ উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের হেফাযত করে এবং তাকে বর্তমান সমাজে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর।

আমরা এ সূরার শুরুতে যে সমস্ত জিনিসের বর্ণনা পাচ্ছি তা হলো, আল্লাহর প্রভুত্ব ও তার তাওহীদের তাৎপর্য, মানুষের পারিবারিক ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য, তদুপরি এ সমস্ত বন্ধনকে মানব চিন্তায় বদ্ধমূল করার দীর্ঘ বর্ণনা এখানে রয়েছে। পারিবারিক বন্ধনকে এর বুনিয়াদ স্থাপন করা, যার ওপর ভিত্তি করে একটি ইসলামী সমাজ পরিচালনা করা যায়, এক কর্তার অধীনে এক পরিবারের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সংহতির মাধ্যমে দুর্বলদের হেফাযত করাও অন্তর্ভুক্ত। এ সমাজকে ব্যভিচার, অত্যাচার এবং ফেতনা থেকে বাঁচানো এবং আল্লাহর প্রভুত্ব এবং মানবতার ঐক্যের ভিত্তিতে মুসলিম পরিবার, মুসলিম সমাজ এবং মানব সমাজকে পরিচালনা করার বিবরণও এতে রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।' (আয়াত ১)

সূরা আন নেসার প্রথম আয়াতে তাৎপর্যকে তুলে ধরা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা ইসলামী চিন্তাচেতনার মূল ধারারই প্রতিনিধিত্ব করছে। এর ওপরই মানুষের সামষ্টিক জীবন প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামী সমাজ পরিচালনার এই স্তম্ভটির ওপর ভিত্তি করে ইসলামী দলের সংহতি ও সহাবস্থান সম্পর্কিত বাস্তব ও ব্যবহারিক কিছু বিধি বিধানও আমরা এই সূরায় দেখতে পাচ্ছি।

এতীমদের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা উক্ত সূরায় অনুপ্রেরণাদানকারী কিছু নির্দেশিকা, ভীতিপ্রদ সতর্কতা ও নির্ধারিত নীতিমালাসম্বলিত বিধিবিধানও দেখতে পাচ্ছি। এরশাদ হচ্ছে,

www.pathagar.com

'এতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও .... নিশ্চয় এটা গুরুতর অপরাধ।' (আয়াত ২)

'এতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নযর রাখো, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে .... অবশ্য আল্লাহ তায়ালাই হিসাব নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।' (আয়াত ৬)

এরশাদ হচ্ছে, 'তাদের ভয় করা উচিত। যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল অক্ষম সন্তান সন্তুতি ছেড়ে গেলে তাদের জন্যে আশংকা করে ....আগুনে প্রবেশ করবে।' (আয়াত ৯-১০)

বিশেষ করে নারী, শিশু, এতীম বালিকা এবং দুর্বল মহিলাদের হেফাযত, মীরাসে তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং জাহেলী রীতি-নীতির বর্বরতা থেকে উদ্ধার করার জন্যে আমরা উক্ত সূরায় অসংখ্য বিধিবিধান ও দৃষ্টান্তসমূহ দেখতে পাই। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'যদি তোমরা আশংকা করো যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে তাদের মধ্যে থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও .... তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে পারো।' (আয়াত ৩-৪)

'পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে ... এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত।' (আয়াত ৭)

'হে ঈমানদাররা, বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকার হওয়া তোমাদের জন্যে মোটেই হালাল নয়.......... এবং নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অংগীকার গ্রহণ করেছে। (আয়াত ১৯-২১)

'লোকেরা তোমার কাছে নারীদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলো আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন ...... আল্লাহ তায়ালা জানেন।' (আয়াত ১২৭)

এখানে এসে নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনামূলক আয়াতসমূহ নাযিল হয়। পরিবারকে গঠন ও সুবিন্যস্ত করা এবং সামাজিক ও বৈবাহিক (দাম্পত্য) জীবনে সাময়িক পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাব থেকে পরিবারের হেফাযতের পূর্ণ ব্যবস্থা করা। এখানে তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ও এতীম বালিকাদের আলোচনা প্রসংগে আরো কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে তা আলাদা কথা... তোমাদের কোনো গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (আয়াত ২২-২৪)

'পুরুষ নারীদের পরিচালক এই কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের একজনকে অপরজনের ওপর মর্যাদা দান করেছেন .... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সমুন্নত মহীয়ান।' (আয়াত ৩৪-৩৫)

www.pathagar.com

'যদি কোনো নারী স্বীয় স্বামীর......আল্লাহ সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়।' (আয়াত ১২৮-১৩০)

দত্তক প্রথা বাতিল করার লক্ষ্যে বংশ সংক্রান্ত বিধি-বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে চুক্তিবদ্ধ কোনো মনিব কিংবা ক্রীতদাস এবং উত্তরাধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কের শৃংখলাবিধান করার জন্যে এ আয়াতগুলো নাযিল করা হয়, তাছাড়া সুদূরপ্রসারী সামাজিক উদ্দেশ্য লক্ষ্য সম্বলিত নির্ধারিত বিধিবিধান নিয়েও এই আয়াতসমূহে আলোচনা করা হয়।

এরশাদ হচ্ছে, 'পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত।' (আয়াত ৭)

'তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এই বিধান দিচ্ছেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান ....।' (আয়াত ১১-১২)

'মানুষ তোমার কাছে জানতে চায়, অতপর তুমি বলে দাও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে 'কালালাহ'-এর মীরাস সংক্রান্ত নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন ......।' (আয়াত ১৭৬)

'পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়রা যা ত্যাগ করে যান সে সবের জন্যেই আমি অভিভাবক নির্ধারণ করে দিয়েছি .... আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেন। (আয়াত ৩৩)

নারী জাতিকে পাপ পংকিলতা থেকে পবিত্র রাখা এবং সমাজকে ব্যভিচার মুক্ত রাখার মানসে আমরা সেখানে শৃংখলার ব্যবস্থা দেখতে পাই। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা কুকর্মে লিপ্ত হবে, তবে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারণ পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব করো ....।' (আয়াত ১৫-১৬)

'আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসদেরকে বিয়ে করবে।

সীমিত করণের উদ্দেশ্যে নয় বরং দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এ থেকে কিছু এখানে কিছু কথা বর্ণনা করবো। সূরার পূর্বাপর প্রসংগে সকল নির্দেশনা ও বিধি বিধান স্ব স্ব স্থানে বর্ণিত হবে।

এরশাদ হচ্ছে, 'যে সম্পদকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জীবনযাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না, বরং তা থেকে খাওয়াও, পরাও এবং ....।' (আয়াত-৫)

'সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন আত্মীয়স্বজন, এতীম ও মেসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিন্তু সদালাপ করো।' (আয়াত ৮)

'হে ঈমানদাররা! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস (ভক্ষণ) করো না .... এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।' (আয়াত ২৯-৩০)

www.pathagar.com

তোমরা আকাংখা করো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একের ওপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন ... নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।' (আয়াত ৩২)

'তোমরা সকলে আল্লাহর বন্দেগী করো, তার সাথে অপর কাউকে শরীক করো না। পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতীম, মেসকীন, প্রতিবেশী.... তার ভাগ্যে খুব খারাপ সংগী জুটেছে। (আয়াত ৩৬-৩৮)

'হে মুসলমানরা! আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমাদের যাবতীয় আমানত তার প্রাপকদের কাছে সোপর্দ করে দাও .... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শোনেন।' (আয়াত ৫৮)

'যে লোক সৎ কাজের জন্যে কোনো সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে .... অথচ শাস্তি দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতাই তিনি রাখেন।' (আয়াত ১৪৮-১৪৯)

পারস্পরিক নিরাপত্তা, করুণা, উপদেশ, মহানুভবতা, আমানত, ইনসাফ, ভালোবাসা ও পবিত্রতার ভিত্তিতে মুসলিম সমাজকে সুবিন্যস্ত করা, উক্ত সমাজ থেকে জাহেলিয়াতের অবশিষ্ট জঞ্জালকে মুছে ফেলা এবং ইসলামী বিধানের নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার মতো বিরাট একটা লক্ষ্য অর্জন করার পাশাপাশি আমরা এখানে অন্য একটি লক্ষ্যও দেখতে পাই। মুসলিম সমাজ জীবনে যার প্রভাব ও গভীরতা উপরোক্ত লক্ষ্যের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এই বিষয়টি হচ্ছে দ্বীনের অর্থ, ঈমানের সংজ্ঞা, ইসলামের শর্ত অনুধাবন করা, সমাজ ও ব্যক্তি জীবনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে এমন সকল নিয়ম-নীতি ও বিধি বিধানের নির্ধারিত অর্থ বুঝা এবং ঈমান ও ইসলামের নির্ধারিত সংজ্ঞার সাথে তার সংযোগ স্থাপন করা।

দ্বীন ইসলাম হচ্ছে মূলত সে জীবনবিধানের নাম যাকে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানবতার জন্যে নির্ধারণ করেছেন এবং দ্বীন হচ্ছে সে আদর্শের নাম যার ওপর গোটা জীবনের সকল কর্মতৎপরতা পরিচালিত হয়, আর এই বিধান রচনার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্যের নাম, কেননা একমাত্র তাঁরই অধিকার রয়েছে আনুগত্য পাওয়ার এবং একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই জীবন বিধান গ্রহণ করা যেতে পারে। সুতরাং মুসলিম সমাজের যেমন বিশেষ চিন্তাভাবনা ও আকীদাবিশ্বাস রয়েছে তেমন তার রয়েছে বিশেষ ধরনের নেতৃত্ব, আর সে নেতৃত্ব হচ্ছে রসূল (স.)-এর আদর্শ এবং আল্লাহর শরীয়ত এই সমাজের উল্লেখিত নেতৃত্বের অধীনতা ও নির্ভরশীলতাই মানুষকে ইসলাম তথা আত্মসমর্পণের গুণ দান করেছে এবং তা থেকেই মুসলিম সমাজের গোড়া পত্তন করেছে। এই বিধানের কাছে নিরংকুশ আত্মসমর্পণ ছাড়া কখনো কেউ পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবে না। এই অধীনতার শর্ত হচ্ছে, কোনো সমস্যার সমাধানের জন্যে একমাত্র আল্লাহর রসূল (স.)-এর ফয়সালায় তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং এই ফয়সালাকে মেনে নিয়ে তাকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

এই মূলনীতিটি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এই সূরার বক্তব্য চূড়ান্তভাবে বিবৃত হয়েছে। এতে কোনো বিতর্ক, কোনো সন্দেহ, অথবা কোনোরূপ জটিলতা ও সংমিশ্রণের

www.pathagar.com

অবকাশ নেই। কারণ এই বক্তব্য এতোই সুস্পষ্ট এবং চূড়ান্ত যে, এতে কোনো বিতর্কের অবকাশই থাকে না।

এই মূলনীতির প্রতিষ্ঠা এই সূরার আরো অসংখ্য বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তার বিস্তারিত পর্যালোচনা স্ব-স্ব স্থানে বিবৃত হবে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তার কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

এই সূরার প্রথম আয়াতসহ অন্যান্য আয়াতে এই মূলনীতি সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হয়েছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে, 'হে মানব সমাজ ... আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।' (আয়াত ১)

'তোমরা আল্লাহর বন্দেগী করো, তার সাথে অপর কাউকে শরীক করো না। (আয়াত ৩৬)

'নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে শেরকের পাপ ক্ষমা করেন না......., আর যে লোক আল্লাহর সাথে শেরক করলো, সে বড়ো অপবাদই আরোপ করলো।' (আয়াত ৪৮)

উল্লেখিত মূলনীতি সুনির্দিষ্টভাবে ও সুনির্ধারিত রূপে নিম্নের আয়াতগুলোতেও বিবৃত হয়েছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা! আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসূলের এবং সেইসব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন ... ।' (আয়াত ৫৯-৬১)

'বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের আদেশ নিষেধ মান্য করা হয়।' (আয়াত ৬৪)

'অতএব, তোমার মালিকের কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতোক্ষণ না তাদের বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক না মানবে.......... এবং হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।' (আয়াত ৬৫)

'যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে (মূলত) আল্লাহরই হুকুম মান্য করলো। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করলো .... তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। ....।' (আয়াত ১১৫)

এভাবেই দ্বীনের অর্থ, ঈমানের সংজ্ঞা, ইসলামের শর্ত, মুসলিম সমাজের নিয়মপদ্ধতি এবং তার জীবনবিধান নির্ধারণ করা হয়। ঈমান শুধু আবেগ ও চিন্তাচেতনার নাম নয়, তদ্রূপ ইসলাম নিছক দোয়া কালাম এবং রোযা নামাযের নামও নয়, বরং এগুলোর পাশাপাশি এবং সর্বাগ্রে হচ্ছে, এমন এক জীবনবিধান যা সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, এমন এক আদর্শ যা মানবজাতিকে সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ করে, এমন এক নেতৃত্ব যার আনুগত্য করা হয়। উল্লেখিত সব কিছু বাদ দিয়ে ঈমান, ইসলাম এবং ইসলামী সমাজ পরিপূর্ণ এবং পূর্ণাংগ হতে পারে না।

এই মূলনীতির স্বীকৃতির ওপর এ সূরায় অসংখ্য নির্দেশনামা বেরিয়ে আসে, আর এর সবগুলো এই মৌলিক মূলনীতিরই শাখা প্রশাখা।

www.pathagar.com

১. সমাজের যাবতীয় সামাজিক নিয়ম-নীতি এই বড়ো মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল এবং তা দ্বীনের অর্থ, ঈমানের সংজ্ঞা এবং ইসলামের শর্তের প্রতিও মুখাপেক্ষী। একথাগুলো ইতিপূর্বের উদাহরণগুলোতে বিবৃত হয়েছে। সুতরাং এটা বলা যায় যে সামাজিক এই নিয়ম নীতিগুলো শুধু নিয়ম-নীতি ও বিধি বিধানের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এগুলো হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অপরিহার্য দাবী, অধিকন্তু আমরা ইতিপূর্বে যে সমস্ত বিধি বিধানের আলোচনা করেছি তাকেও আমরা এই মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল দেখতে পাই এবং এই সত্যটির স্বপক্ষে সুস্পষ্ট বক্তব্যও রয়েছে।

এই সূরার প্রথম আয়াত যা মানব ঐক্যের কথা বর্ণনা করে, মানবজাতিকে আত্মীয়তার বন্ধনের হেফাযতের আহ্বান করে এবং যাকে এই সূরার পরবর্তী সকল বিধিবিধানের জন্যে ভূমিকাস্বরূপ গণ্য করা হয়। তার সূচনা হয়েছে মানবসমাজকে আল্লাহ ভীতির দিকে আহ্বানের মাধ্যমে। যিনি তাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন।

'হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।' (আয়াত ১)

তদ্রূপ তার সমাপ্তিও হয়েছে আল্লাহভীতির প্রতি আহ্বান এবং মানবসমাজকে তাঁর পাহারাদারীর থেকে সতর্ক করার মাধ্যমে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ব্যাপারে সতর্ক রয়েছেন।'

যে সমস্ত আয়াত এতীমদের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি উৎসাহিত করে এবং তাদের সম্পদের ব্যবহারের পদ্ধতি বর্ণনা করে তার সমাপ্তি ঘটেছে হিসাব নিকাশের স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে, 'অবশ্য আল্লাহ তায়ালা হিসেব নেয়ার জন্যে নিজেই যথেষ্ট।'

পরিবারে উত্তরাধিকারের অংশ বন্টন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশাকারে এসেছে,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ করেন। এটা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত অংশ।'

উত্তরাধিকারের বিধি বিধানের সমাপ্তি নিম্নোক্ত পর্যালোচনা ও মন্তব্যের মাধ্যমেই হয়েছে।

'এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, যে কেউ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আদেশ মতো চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন.... সে সেখানে চিরদিন থাকবে, তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।' (আয়াত ১৩)

এর যাবতীয় পারিবারিক বিধিবিধান ও নিয়মনীতি সুবিন্যস্ত করার লক্ষ্যে এ কথাগুলো নাযিল হয়। যেমন 'নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। অতপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করো যাতে আল্লাহ তায়ালা অনেক কল্যাণ রেখেছেন।' (আয়াত ১৯)

'এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রী লোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ..... আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।' (আয়াত ২৪)

www.pathagar.com

'যদি তাতে তারা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায়, ... নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সবার ওপর শ্রেষ্ঠ।'

'তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না।'

পিতামাতা, নিকটাত্মীয়, এতীম মেসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মোসাফের ও নিজের দাস দাসীর প্রতি সৎ ও সদয় ব্যবহারের নির্দেশের পূর্বে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

আর এভাবে সকল বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতি আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাঁরই বিধান থেকে উৎসারিত হয় যার অনুসরণ ও অনুকরণ ও আনুগত্য পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

২. মোমেনদের তাদের এবং তাদের মোমেন দলের আনুগত্য করা উচিত। সুতরাং তারা এমন কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করাবে না, যে মোমেন নয়। মোমেনদের বিধি-বিধান ও আদর্শ ও লক্ষ্যের যে অনুসরণ করে না এবং তাদের নেতৃত্ব থেকে যে নির্দেশাবলী গ্রহণ করে....... যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।' (আয়াত ১১৫-১১৬)

'হে নবী। সে সব, মোনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে .... যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্যে।' (১৩৮-১৩৯)

'হে ঈমানদার লোকেরা! ঈমানদার লোকদেরকে ত্যাগ করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না .... শীঘ্রই ঈমানদারদেরকে মহাপুণ্যদান করবেন।' (আয়াত ১৪৪-১৪৬)

৩. 'দারুল হরব' থেকে মুসলমানদের হিজরত করা ওয়াজেব, অতপর তারা মুসলিম দলের সাথে সে ভূখন্ডে গিয়ে মিলিত হবে যেখানে মুসলমানরা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সহকারে প্রতিষ্ঠিত আছে। তারা মুসলিম নেতৃত্বের পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণ করবে, কুফুরীর পতাকাতলে নয়, অন্যথায় এটাকে মোনাফেকী অথবা কুফুরী নামে আখ্যায়িত করা হবে- যারা নিজের অনিষ্ট করে ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে .... নিজ গৃহ থেকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে হিজরত করার মানসে বের হয়, অতপর ইতিমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে তার প্রতিফল দান করা আল্লাহর যিম্মায় ওয়াজেব হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বাস্তবিকই ক্ষমাকারী ও অতীব অনুগ্রহশীল।' (আয়াত ৮৮, ৮৯, ৯৭ ও ১০০)

৪. মুসলমানরা তাদের দুর্বল মুসলিম ভাইদেরকে উদ্ধারের জন্যে জেহাদ করবে। যারা কুফুরের' ঝান্ডা থেকে মুক্ত হয়ে 'দারুল ইসলাম' এ গিয়ে ইসলামী দলের .... নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।' (আয়াত ৭৫)

এই বিষয়টির পরক্ষণেই আসছে জান-মাল দ্বারা জেহাদে শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করা, জেহাদে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক লোকদের নিন্দা জ্ঞাপন সংক্রান্ত এক বিরাট বর্ণনা। এই বর্ণনাটি বক্ষমান সূরায় এক বিরাট অংশ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে এবং যেখান থেকে এর

www.pathagar.com

সূচনা হয়েছে সেখান থেকে সূরার কোমল কণ্ঠ আস্তে আস্তে দৃঢ় হচ্ছে, তার সুর ধীরে ধীরে উচ্চমার্গে উঠে যাচ্ছে এবং নির্দেশ ও নিন্দার ভাষা আরো কঠোর হয়ে উঠছে।

ধারাবাহিকতার সাথে সূরাব্যাপী উল্লেখিত অভিযানের আলোচনা পর্যালোচনা করতে আমি সক্ষম হইনি। ধারাবাহিকতার বিশেষ গুরুত্ব ও নির্ধারিত কিছু মূল্য রয়েছে। এখানে আমি কয়েকটি উদাহরণ পেশ করবো মাত্র। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা! (শত্রুর) মোকাবেলা করার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থেকো। অতপর সুযোগ ও প্রয়োজন ....আমাদের জন্যে সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।' (আয়াত ৭১-৭৬)

'আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকো, তুমি নিজের সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কোনো ... দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।' (আয়াত ৮৪)

'ঘরে বসে থাকা মুসলমান যাদের কোনা ওযর নেই এবং সে মুসলমান যারা জান ও মাল ... আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও করুণাময়।' (আয়াত ৯৫-৯৬)

'তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হও তারাও তো তোমাদের মতোই হয়েছে .... আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।' (আয়াত ১০৪)

জেহাদের প্রতি উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি মুসলিম শিবির ও অন্যান্য শিবিরের মধ্যে লেনদেন ও আচার-আচরণ সংক্রান্ত কিছু আচরণবিধিও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

মোনাফেকদের মধ্যে থেকে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যক্তিগত কাজ এবং মদীনাবাসীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রবেশ করতো এবং কাজ শেষ করে তারা যখন মদীনা থেকে বের হতো তখন শত্রু শিবিরের বন্ধু হয়েই ফিরে আসতো। মোনাফেকদের ব্যাপারে মুসলমানদের দু'দল ও দু'মতে বিভক্ত হওয়ার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের তোমরাও তেমন কাফের হয়ে যাও। অতএব, তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না.......।' (আয়াত ৮৯-৯১)

'হে ঈমানদাররা! তোমরা যখন আল্লাহর পথে জেহাদের জন্যে বের হবে, তখন বন্ধু ... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাজ কর্মের খবর রাখেন।' (আয়াত ১০১-১০৩)

এই আয়াতসমূহ ইসলামী বিধানে নামাযের গুরুত্ব ও মহত্বেরই পরিচায়ক। আর এ জন্যেই ভয়ের অবস্থায়ও নামায পড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ অবস্থায় নামায পড়ার পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে। একইভাবে এই আয়াতসমূহ মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় ইসলামী বিধান পূর্ণাংগ হওয়ারও পরিচায়ক।

জেহাদের আলোচনার পরক্ষণেই আসছে মোনাফেক ও মদীনার ইহুদীদের সাথে তাদের বন্ধুত্বের বিষয়টি যেখানে তারা আল্লাহর দ্বীন, মুসলিম দল ও মুসলিম নেতৃত্বের সাথে ভয়াবহ প্রতারণা করে, মুসলিম দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটে, ইসলামী মূল্যবোধ ও বিধিবিধানের সাথে ইহুদী মূল্যবোধ ও নিয়ম পদ্ধতির সংমিশ্রণের বিরাট অভিযান

www.pathagar.com

চালায়। জেহাদ প্রসংগে যে সমস্ত আয়াত আমি উল্লেখ করেছি, তার মাঝে মোনাফেকদের বিরুদ্ধে অভিযানেরও কিছু দিক রয়েছে। এখানে আমি এমন কিছু আয়াতের অবতারণা করবো যেগুলো মোনাফেকদের অবস্থা ও গুণাবলী চিত্রায়িত করে এবং তাদের স্বভাব ও প্রচার মাধ্যমের কথাও বর্ণনা করে। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা মুখে মুখে বলে, আমরা তোমার অনুগত, ফরমাবরদার। কিন্তু তোমার কাছ থেকে যখন... সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করতো।' (আয়াত ৮১-৮৩)

'যারা একবার মুসলমান হবার পর পুনরায় কাফের হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে ... আর তোমরা তাদের জন্যে কখনও কোনো সাহায্যকারী পাবে না।' (আয়াত ১৩৭-১৪৫)

এই সূরার জেহাদের ক্ষেত্রসহ অন্যান্য বিষয়ের দিকে যদি তাকাই তাহলে এখানে অঘোষিত একটা যুদ্ধ আমরা দেখতে পাই। আর আহলে কেতাব (বিশেষ করে ইহুদী সম্প্রদায়) ও তাদের মিত্রসমূহের পক্ষ থেকে মুসলিম দল, ইসলামী আকীদা এবং ইসলামী নেতৃত্বকে আক্রমণের মাধ্যমে সেই যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারা এবং সূরা আলে ইমরানেও উল্লেখিত যুদ্ধ ও সংঘাতের আলোচনা দেখেছি। সে সাথে আমরা যদি আল্লাহর বিধানের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, এ বিধান ষড়যন্ত্রকারীদের মাঝেও মুসলিম জাতিকে হাতে হাত ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ ব্যাপারে তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিচ্ছে। ভ্রান্ত পথ ও মত থেকে তাদেরকে সতর্ক করছে এবং তাদের শত্রুদের স্বভাব, শত্রুদের সাথে তাদের যুদ্ধের ধরন এবং যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে এই বিধান মুসলমানদেরকে অবহিত করছে।

কোরআনে করীমের অলৌকিক বাচনভংগী এবং পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষার নিদর্শনের মধ্যে এটাও একটি যে, উল্লেখিত বক্তব্যসমূহ যদিও একটি নির্দিষ্ট যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছিলো, কিন্তু আজও তা একইভাবে বিশ্বের সর্বস্থানের মুসলমান এবং তাদের চিরাচরিত শত্রুদের মাঝে স্থায়ী যুদ্ধের প্রকৃতিকে চিত্রায়িত করছে। আদিকালের মুসলিম শত্রু এবং বর্তমান যুগের মুসলমানদের শত্রুদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। পূর্বের শত্রুতার কারণসমূহ এবং বর্তমানকালের কারণসমূহের মধ্যেও কোনো প্রকার বৈপরীত্য নেই। উপায় উপকরণ এবং মাধ্যমের পরিবর্তন ছাড়া সত্যিকার অর্থে তাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্যের মধ্যে কোনোপ্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা, মুসলিম দলে ফাটল সৃষ্টি করা আজও উদ্দেশ্য লক্ষ্য হয়ে আছে। এর মাধ্যমে তারা চাচ্ছে মুসলমানদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে নিজেদের অধিষ্ঠিত করে মুসলমানদের ভাগ্যে পরিবর্তন সাধন করতে। তাদের ভূমি, ফসল, প্রচেষ্টা এবং শক্তি-সামর্থকে পুরোপুরি দখল করে নিতে। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদেরকে ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত করার মাধ্যমে মর্যাদার আসনে আসীন করার পূর্বে ইহুদীরা এই উভয় গোত্রকে এভাবেই তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিলো।

www.pathagar.com

যেরূপভাবে সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরানে মোশরেক ও মোনাফেকদের সাথে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্থায়ী ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে সেভাবে এই সূরায়ও উক্ত বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। স্ব স্ব স্থানে উক্ত বক্তব্যসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হবে। তবু আমি এখানে এ প্রচন্ড অভিযানের শুধু একটি দিক তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। এরশাদ হচ্ছে,

'হে নবী! তুমি কি ওদের দেখোনি, যারা কেতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, (অথচ) তারা পথভ্রষ্টতা খরিদ করে ... দোযখের জ্বলন্ত আগুনই যথেষ্ট।' (আয়াত ৪৪-৫৫)

'যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবী রসূলদের অমান্য করে এবং যারা চায় যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবী .... তাদের জন্যে তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব।' (আয়াত ১৫১-১৫২)

'তোমার কাছে আহলে কেতাবরা আবেদন জানায় যে, তুমি তাদের ওপর আসমান .... জন্যে তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।' (আয়াত ১৫৩-১৬১)

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কিছু দিক ফুটে উঠেছে। কোরআনে কারীম তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে তার নিন্দা করেছে, এর সাথে এগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তার অসারতাও প্রমাণ করেছে। ইহুদীদের বিরুদ্ধে উল্লেখিত অভিযান, সেখানে তাদেরকে কাফের হিসেবে আখ্যা দান এবং তাদেরকে ইসলামের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মুসলিম দল এ সময় ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের চরম শিকার হয়েছিলো। এর সাথে কোরআন তার পেছনে লুকায়িত ঘৃণ্য উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও কারণসমূহ বর্ণনা করেছে। তাদের ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যাসের দরুণ দীর্ঘ ইতিহাসে তারা কখনো হেদায়াত তথা সৎ পথের সামনে যে আত্মসমর্পণ করেনি সে কথা বর্ণনা করেছে।

মোহাম্মদ (স.)-এর নবুওত ও রেসালাতের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি করা ছিলো ইহুদীদের অভিযানের প্রথম লক্ষ্য, আর তা সম্ভবপর হয়েছে মুসলমানদেরকে তাদের নিরাপত্তা, নেতৃত্ব তথা শক্তিশালী আকীদা থেকে দূরে সরানোর মাধ্যমে। দুশমনদের ষরযন্ত্রের বিরুদ্ধে শীসাঢালা প্রাচীরের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই ইহুদীসহ মুসলিম দলের শত্রুদের অস্থির করে রাখে, অতপর তাদের চিন্তাচেতনা ও চেষ্টাসাধনা নিয়োজিত হয় প্রথম তাদের বন্ধন ছিন্ন করার কাজে, যাতে মুসলমানদের নেতৃত্ব নতুন করে জাহেলিয়াতের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে।

অধিকন্তু আমরা এই সূরায় নবী করীম (স.)-এর রেসালাতের তাৎপর্যের বর্ণনাও দেখতে পাই। এ রেসালাত তখনকার আরববাসী বিশেষ করে বনী ইসরাঈলের কাছে অপরিচিত, নতুন ও আশ্চর্যজনক কিছু ছিলো না, বরং তা ছিলো দলীল প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে ওহী পাঠিয়েছেন এভাবে আগের রসূলদের কাছেও তিনি ওহী পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলের নবীদেরকে যেমনিভাবে নবুওত এবং রাজ্য শাসন করার ক্ষমতা দান করেছিলেন তেমনিভাবে তা

www.pathagar.com

নবী মোহাম্মদ (স.)-কেও দান করেছেন। সুতরাং তাঁর রেসালাত, ক্ষমতা এবং শাসন করার ব্যাপারে অভিনবত্ব কিছু নেই। রেসালাতের ব্যাপারে এসব কিছু অতি পরিচিত ব্যাপার। এক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলের সকল কথাই মিথ্যা ও তাদের যাবতীয় সন্দেহ ভ্রান্ত ও অমূলক। হযরত মূসা (আ.)-এর সাথেও তারা একই আচরণ করেছে। সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি কোনো মুসলমানের গুরুত্বারোপ করা ঠিক নয়।

কোরআনের অসংখ্য আয়াত উল্লেখিত তাৎপর্য বর্ণনা করেছে। এখানে আমি সংক্ষিপ্তাকারে কিছু আয়াতের অবতারণা করছি। স্ব স্ব স্থানে তার বিস্তারিত আলোচনা করবো। যেমন,

'হে মোহাম্মদ, আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি .... আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।' (আয়াত ১৬৩-১৬৮)

'তোমার কাছে আহলে কেতাবরা আবেদন জানায় যে, তুমি তাদের ওপর আসমান থেকে লিখিত .... বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিলো।' (আয়াত ১৫৩-১৫৭)

'নাকি যা কিছু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্যে তারা মানুষকে হিংসা করে.... অতপর তাদের কেউ তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে।' (আয়াত ৫৪-৫৫)

এই সূরায় মুসলিম সমাজের গঠন এবং তাকে জাহেলিয়াতের আবর্জনা থেকে মুক্ত করা, দ্বীনের অর্থ, ঈমানের সংজ্ঞা এবং ইসলামের কতিপয় শর্তের বর্ণনা করা হয়েছে। বিশুদ্ধতা সংক্রান্ত তাদের যাবতীয় সন্দেহ সংশয় ও ভ্রান্ত ধারণা এই সূরা নিরসন করেছে, ঈসা (আ.) ও তার নেক মাতা সংক্রান্ত ইহুদীদের বক্তব্য নিরসনের পর এই সূরা আহলে কেতাব খৃষ্টানদের আকীদার বাড়াবাড়ির কথা বর্ণনা করেছে। একই সাথে এ সূরা আল্লাহর একত্ব, এবাদাতের তাৎপর্য, সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক, মানুষের আয়ুর তাৎপর্য, তাকদীরের সাথে তাঁর সম্পর্ক, আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন তার পরিধি, তাওবার গন্ডি ও তার তাৎপর্য, কাজের নিয়ম-পদ্ধতি ও তার বিনিময় ও প্রতিফল এ জাতীয় বিশ্বাসগত উপাদানের বর্ণনাও এখানেও এসেছে। উল্লেখিত উপাদানগুলোর বর্ণনা এসেছে নিম্নের আয়াতগুলোর মধ্যে। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'জেনে রেখো, আল্লাহর কাছে তাওবা গৃহীত হওয়ার অধিকার তারাই লাভ করতে পারে, যারা ... যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।' (আয়াত ১৭-১৮)

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে সবকিছু পরিষ্কার বর্ণনা করে দিতে চান...।' (আয়াত ২৬-২৮)

'যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে... সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাবো।' (আয়াত ৩১) 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও বিনষ্ট করেন না, আরও যদি তা.... নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সওয়াব দান করেন।' (আয়াত ৪১) 'তুমি কি সে সব লোককে দেখোনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, তোমরা.... সব বিষয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত।' (আয়াত ৭৭-৭৯) 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন না.... সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়ে গেলো। (আয়াত

www.pathagar.com

১১৬) 'শেষ পরিণতি না তোমাদের আকাংখার..... তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।' (আয়াত ১২৩-১২৪) 'তোমাদের আযাব দিয়ে.... সমুচিত মূল্যদানকারী সর্বজ্ঞ।' (আয়াত ১৪৭) 'যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবী রসূলদের অমান্য...... বস্তুত আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, দয়ালু।' (আয়াত ১৫০-১৫২) 'হে আহলে কেতাবরা! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি.... আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তারা কোনো সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না।' (আয়াত ১৭১-১৭৩)

যে নৈতিকতার ওপর মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলো থেকে কিছু কথা এখানে বর্ণনা করবো। এগুলোর দিকে ইতিপূর্বেও ইংগিত করা হয়েছে। আসলে নৈতিক উপাদানই হচ্ছে ইসলামী চিন্তা-চেতনা এবং মুসলিম সমাজ গঠনের মূল বিষয়। এর থেকে জীবনের কোনো দিকই মুক্ত নয়। আমি এখানে জীবনের মূল উপাদান থেকে অনুসৃত কিছু মৌলিক বিষয়ের দিকে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। সাথে সূরার বিষয়বস্তুর দিকে আলোকপাত করবো।

ইসলামী সমাজ মূলত এমন একটি সমাজ যা একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সেখানে আল্লাহর দাসরা অন্য সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে। ইসলামী বিধান ছাড়া বিশ্বের অন্য সকল বিধান নেই এই দাসত্ব কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামী বিধানে দাসত্ব একমাত্র আল্লাহরই জন্যে নির্দিষ্ট, তাতে কোনোপ্রকার অংশীদারিত্ব নেই। যেখানে মানুষ তাঁর কোনো বান্দার গোলামী করে না। এই স্বাধীনতা থেকে মানুষের যাবতীয় মহৎ গুণাবলী এবং নীতি-নৈতিকতার যাত্রা শুরু হয়। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। মহৎ গুণাবলীর চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া। সুতরাং এ চরিত্র সব সময় মোনাফেকী, লোক দেখানো কাজ এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এটা হচ্ছে ইসলামের নীতি নৈতিকতা এবং মুসলিম সমাজের গুণাবলীর প্রধান ভিত্তি।

এ সূরায় প্রধান কয়েকটি ভিত্তির বর্ণনার পাশাপাশি নৈতিক উপাদানের কিছু দিকও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যেগুলোর ওপর মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকে। যথা আমানত, ইনসাফ, অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ না করা, সৎ কাজ, কানাঘুষা ও ষড়যন্ত্র না করা, খারাপ কথা না বলা, উত্তম সালাম দেয়া, ব্যাভিচার বন্ধ করা, নির্লজ্জতা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ করা, দাম্ভিকতা, অহংকার, লোক দেখানো কাজ, কৃপণতা ও হিংসা-বিদ্বেষ না করা। ইসলামী সমাজ আরো কিছু গুণাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, যথা-যিম্মাদারী, সহযোগিতা, সৎ উপদেশ, ক্ষমা, মহানুভবতা, আত্মমর্যাদাবোধ ও মানবতার সাহায্য ও বীরত্ব এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের আনুগত্য করা ইত্যাদি।

অধিকাংশ বক্তব্যই ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা আয়াতের স্ব স্ব স্থানে পেশ করা হবে। আমি এখানে এর সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকেই শুধু আলোকপাত করবো। এ বিষয়টির দিকেই দীর্ঘদিন থেকে মানবতা অধীর আগ্রহে

www.pathagar.com

তাকিয়ে আছে, কিন্তু সেখান পর্যন্ত সে কোনোক্রমেই পৌঁছতে সক্ষম হচ্ছে না, সেই সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছানো তুলনাহীন এই জীবন বিধানের ছায়াতলেই সম্ভব।

যে মুহূর্তে ইহুদী জাতি ইসলাম ও তার নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে কোরআনে কারীম মুসলিম জাতিকে আল্লাহর নিজস্ব দৃষ্টিভংগিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলো। সে জাতি তার আলোকে সর্বোচ্চ চূড়ার দিকে উন্নীত হতে থাকে। কোরআন এক ইহুদীর ঘটনার অবতারণা করে, মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের কথা বলে জাতি ও দেশ নির্বিশেষে তাদের মাঝে নিরংকুশ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং নিরংকুশ আমানতদারী কায়েমের জন্যে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতিকে নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমন আল্লাহ তায়লা এরশাদ করেন,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দাও... কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কেই অবগত।' (আয়াত ৫৮, ১৩৫)

ঘটনাবলী ছিলো এমন যে আনসারদের কোনো এক ব্যক্তির একটি বর্ম চুরি হয়েছিলো, কিন্তু তারা গোত্রীয় ও রক্তের কারণে নিজেদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের না করে একজন ইহুদীর ওপর বর্ম চুরির অপবাদ দিয়ে তার বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহর দরবারে সাক্ষী দিয়েছিলো। তারপর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, রসূল তাদের সাক্ষ্যের আলোকে ইহুদীর ওপর চুরির শাস্তির বিধান জারি করতে এবং প্রকৃত চোরকে মুক্ত করে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়, যাতে সেই মদীনাবাসীদের প্রতি তীব্র তিরস্কার জ্ঞাপন করা হয়েছে, আল্লাহর রসূলকে আশ্রয় দিয়েছিলো এবং তাঁর সাহায্য সহযোগিতা করেছিলো। এই ক্ষোভ ও তিরস্কারের মাধ্যমে অবিচার থেকে ইহুদী ব্যক্তিকে মুক্ত করে তার ওপর ইনসাফ কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ এরা রসূলকে ভীষণভাবে কষ্ট দিতো, তারা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো, রসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকারের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করতো। এখানে সে ব্যক্তিকেও ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করা হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজে ভুল ও অপরাধ করে নির্দোষ লোককে তাতে জড়াতে চেষ্টা করে। সর্বোপরি এখানে নৈতিকতার এক উচ্চ শিখরের দিকে এগিয়ে গিয়ে সেদিকে আরোহনকারী সিঁড়ির দিকে ইংগিতের প্রচ্ছন্ন বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াতগুলো ইহুদী ব্যক্তির কথিত চুরির ঘটনা প্রসংগে নাযিল হয়। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্য কেতাব অবতীর্ণ করেছি.... যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।' (আয়াত ১০৫-১১৬)

সুতরাং ইসলামী বিধান সম্পর্কে এ ছাড়া আর কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না যে, এ হচ্ছে সত্যি অতুলনীয় ও নযীরবিহীন এক বিধান। এটি বিশ্ব মানবতাকে অল্প সময়ের মধ্যে জাহেলিয়াতের গহ্বর থেকে উঠিয়ে উঁচু এবং সর্বোচ্চ শৃংগে আরোহন করাতে সক্ষম।

এই সূরার ভূমিকা, বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগির উল্লেখ আমি এখানেই শেষ করছি।

www.pathagar.com

সূরা আল-মায়েদা

এই মহাগ্রন্থ আল কোরআন রসূল (স.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো এ দ্বারা তিনি একটি জাতিগঠন, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা সমাজনির্মাণ ও মানুষের চরিত্র সংশোধন করবেন। উক্ত সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়, উক্ত রাষ্ট্র ও জাতির সাথে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র ও জাতির সম্পর্ক কিরূপ হবে তা নির্ধারণ এবং এই সব কিছুকে একটি শক্তিশালী যোগসূত্র, কেন্দ্র ও উৎস তথা ইসলামের সাথে সংযুক্ত করবেন। ইসলামের এই প্রকৃত স্বরূপটি আল্লাহর কাছে সুপরিচিত ছিলো এবং মুসলমানরা যখন যথার্থ 'মুসলমান' ছিলো, তখন তাদের কাছেও তা সুপরিচিত ছিলো।

এ কারণেই পূর্ববর্তী তিনটি দীর্ঘ সূরার মতো এ সূরাতেও আমরা নানা রকমের আলোচ্য বিষয়ের সমাবেশ দেখতে পাই। এই সব কয়টি বিষয়ের মূল উদ্দেশ হলো, এমন একটি বিশেষ আদর্শের ভিত্তিতে একটি সমাজ গঠন করা, যার মূল কথা, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সার্বভৌম ও একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন ইলাহ ও রব। তিনিই মানুষের জীবন যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় আইন, বিধান, নিয়মনীতি ও মূল্যবোধের একক ও অদ্বিতীয় উৎস।

এতে আমরা আরো যে বিষয়টি দেখতে পাই তা হচ্ছে মানুষের বিশ্বাসকে পৌত্তলিকতার কুসংস্কার ও আহলে কেতাবের বিভ্রান্তি থেকে পবিত্রকরণের চেষ্টা। সেই সাথে মুসলিম জাতিকে তাদের প্রকৃত পরিচয়, তাদের যথোচিত ভূমিকা, এই কাজ সম্পাদনের পদ্ধতি এবং এই পথে বিদ্যমান বাধা বিপত্তি বিপদাপদ এবং শত্রুদের পাতা ষড়যন্ত্র জালের বিবরণ। এর পাশাপাশি এতে বর্ণনা করা হয়েছে বিভিন্ন এবাদতের বিধান, যা মোমেনের আত্মাকে পবিত্র করে এবং তাকে তার প্রতিপালকের সাথে যুক্ত করে। এতে আরো আছে সামষ্টিক জীবনের সেই সব আইন কানুন, যা তার সামাজিক সম্পর্ককে সুশৃংখল হতে সাহায্য করে, রয়েছে আন্তর্জাতিক বিধিবিধান, যা অন্যদের সাথে তার সম্পর্ককে সুসমন্বিত করে, রয়েছে সেই সব আইন কানুন, যা কয়েক প্রকারের খাদ্য পানীয়কে ও বিবাহকে এবং কিছু কাজকর্মকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করে। এই সব কিছু একই সূরায় এমনভাবে পরিবেশিত হয়েছে যে, তা আল্লাহর দ্বীনকে যেভাবে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন এবং মুসলমানরা যখন যথার্থ মুসলমান ছিলো তখন তারা যেভাবে তাকে বুঝেছে, ঠিক সেইভাবে তুলে ধরে।

এছাড়া কোরআন এই সূরায় যেভাবে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে এবং ইতিপূর্বে সূরা 'আলে ইমরান' ও 'আন নেসাতে'ও যেভাবে আলোচনা করেছে, তা দ্বারা নিছক আনুষংগিকভাবেই যে এটা বুঝা যায় তা নয়; বরং এই দুটি সূরায় এবং কোরআনের অন্যান্য সূরায় এই বিষয়গুলো আলোচনার মধ্য দিয়ে কোরআন প্রত্যক্ষভাবে ও জোর দিয়েই একথা ব্যক্ত করে যে, এই সব বিধান মিলিয়েই আল্লাহর 'দ্বীন', এই সব বিধানকে মেনে নেয়ার নামই হচ্ছে 'ঈমান' এবং এই সব

www.pathagar.com

বিধানের আলোকে ফয়সালা করার নামই হচ্ছে 'ইসলাম'। আর যারা এই সমস্ত বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না, তারা কাফের, তারা যালেম--- এবং তারা ফাসেক।

এই গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিটাই এই সূরার আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে, আর এর পাশাপাশি যে চিন্তাধারার ওপর এই মূলনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকেও পরিশুদ্ধ করা হয়েছে।

এই সূরার আয়াতগুলোতে কিভাবে উল্লেখিত মূলনীতি দুটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে এবং কিভাবে একটির ওপর স্বাভাবিকভাবে ও যুক্তিসম্মতভাবে অপরটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা একটু সবিস্তারে আলোচনা করা সংগত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

কোরআনের আলোচনা যে মূল বক্তব্যটির ওপর ভিত্তি করে শুরু হয়েছে তা হলো, আল্লাহর বিধান অনুসারে বিচার-ফয়সালা ও কাজ করার নামই 'ইসলাম' এবং আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে কিছু জিনিস হালাল ও কিছু জিনিস হারাম ঘোষণা করে যে বিধান দিয়েছেন তারই নাম 'আদ্-দ্বীন'। আর আল্লাহই একমাত্র 'ইলাহ' অর্থাৎ মাবুদ ও আইনদাতা ও শাসক হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে আর কেউ অংশীদার নেই, তিনি একমাত্র স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্মে তাঁর সাথে আর কেউ অংশীদার নেই এবং তিনিই সারা বিশ্বের একমাত্র মালিক ও অধিপতি, তার মালিকানায় ও আধিপত্যে আর কেউ অংশীদার নেই। তাই এ কথা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ও অকাট্যভাবে সত্য যে, আল্লাহর বিধান ব্যতীত কোনো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া ও বিচার ফয়সালা করা যাবে না। কেননা যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং মালিক, একমাত্র তিনিই স্বীয় মালিকানাধীন সৃষ্টির জন্যে এমন বিধান দেয়ার একচ্ছত্র অধিকার রাখেন যা তাঁর পছন্দনীয় ও মনোপূত।

আপন মালিকানাধীন পরিমন্ডলে আইন জারী করার অধিকার একমাত্র তাঁরই। একমাত্র তাঁরই আইন চালু হবে এবং একমাত্র তাঁরই হুকুম সর্বত্র বাস্তবায়িত হতে হবে এবং অন্য কারো আনুগত্য না-ফরমানী ও কুফরীতে পরিগণিত হবে। তাঁর প্রতি বিশ্বাসী বা মোমেন তাদেরকেই বলা যাবে, যারা তাঁর নির্ধারিত আকীদায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর মনোপূত জীবনপদ্ধতি মেনে চলে ইসলামের অনুষ্ঠানাদি পালনের মাধ্যমে এবং তাঁরই আইন অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর এবাদাত করে, আনুষ্ঠানিকতা ও আইনের মধ্যে বিন্দুমাত্র ভেদাভেদ ও বৈষম্য করে না। কেননা এই দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। যে আল্লাহর রাজত্বে ও তাঁর বান্দাদের ওপর তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্যে ও কর্তৃত্বে আর কারো অংশীদারিত্ব নেই। আর এভাবে আল্লাহকে মানার নামই হলো 'আদ-দ্বীন' তথা ইসলাম। এই ইসলামই ছিলো সকল নবীর দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা। এটাই আল্লাহর দ্বীন। এ ছাড়া আর কোনো দ্বীন তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এ জন্যেই সূরাটির মধ্যে মাঝে মাঝেই আল্লাহর একত্বকে সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সব রকমের শেরেক, ত্রিত্ববাদ এবং আল্লাহর গুণাবলীতে অন্য কারো

www.pathagar.com

অংশ থাকার ধারণাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ১৫ নং আয়াত থেকে ২০ নং আয়াত পর্যন্ত এবং ৭২ নং আয়াত থেকে ৭৩ নং আয়াত পর্যন্ত লক্ষণীয়। ......

আর যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন মাবুদ ও মনিব, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা এবং তিনিই একমাত্র মালিক, সুতরাং তিনিই আইন প্রণয়নের একমাত্র ক্ষমতা ও এখতিয়ারসম্পন্ন, হালাল হারাম নির্ধারণের একমাত্র অধিকারী এবং তিনিই একমাত্র আনুগত্য লাভের অধিকার রাখেন। অনুরূপভাবে তাঁর বান্দারা যাবতীয় আনুষ্ঠানিক এবাদত উপাসনা একমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যেই নিবেদন করবে। এ সব কিছুর ব্যাপারে তিনি নিজের বান্দাদের অংগীকার গ্রহণ করেছেন। তাই বান্দাদের কাছে তিনি দাবী জানান যে, তাঁর সাথে করা এ সকল অংগীকার যেন তারা পূর্ণ করে। সেই সাথে তিনি তাদেরকে এই অংগীকার ভংগ করার পরিণতি সম্পর্কেও সতর্ক করেন, যেমন পরিণতি বনী ইসরাইলের হয়েছিলো,

'হে মোমেনরা! তোমরা অংগীকারসমূহ পূর্ণ কর'..... (আয়াত ১)

'হে মোমেনরা ! তোমরা অবমাননা করো না আল্লাহর নিদর্শনের ...' (আয়াত ২)

'স্মরণ করো! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা এবং যে অংগীকারে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছেন, তার কথা........ (আয়াত ৭ ও ৮)

'আল্লাহ বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলেন....(আয়াত ১২, ১৩ ও ১৪)

সূরাটিতে শরীয়তের বেশ কয়েক প্রকারের আহকাম তথা বিধান বর্ণিত হয়েছে। যেমন, যবাই ও শিকার করা জীবজন্তু, এহরামের অবস্থায় ও মাসজিদুল হারামে অবস্থান কালীন সময়ের কার্যকলাপ এবং বিয়েশাদীর মধ্যে কোনটি হালাল ও কোনটি হারাম, পবিত্রতা অর্জন ও নামায, ন্যায় বিচার, চুরি ডাকাতির শাস্তি, ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মদ, জুয়া, ভাগ্য গণনা, লটারী, এহরাম অবস্থায় শিকার করার কাফফারা এবং শপথ ভংগ করার কাফফারা, মৃত্যু ঘনিয়ে আসার সময় ওসীয়ত করা, রকমারি গবাদি পশু ও কেসাস সংক্রান্ত বিধান। এভাবে সূরাটিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে পূর্ববর্তী নবীদের ওপর নাযিল করা শরীয়তের বিধান শেষ নবীর ওপর নাযিলকৃত বিধানের সাথে কোনো বাধা ও বিরোধ ছাড়া অবলীলাক্রমে মিলিত হয়েছে।

শরীয়তের এই সকল রকমারি বিধি বিধানের পাশাপাশি মৌলিক নির্দেশ এসেছে আল্লাহর আইন ও বিধি-বিধানের আনুগত্য করার, আর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে আল্লাহর অনুমোদন ব্যতিরেকে মনগড়াভাবে কোনো জিনিসকে হালাল বা হারাম করার বিরুদ্ধে। অতপর দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এটাই আল্লাহর সেই দ্বীন, যাকে তিনি তাঁর ঈমানদার বান্দাদের জন্যে মনোনীত করেছেন। যেমন,

'হে মোমেনরা, আল্লাহর নিদর্শনের অবমাননা করো না......।'•

www.pathagar.com

'হে মোমেনরা, আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে সব পবিত্র জিনিসকে হালাল করেছেন তা হারাম করো না এবং সীমা অতিক্রম করো না.....'

'আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো ও সাবধান থাকো.....'

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, ... আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম....'

সূরাটি আনুগত্য করা ও হালাল হারামের বিধান মেনে চলার কেবল নীতিগত নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছে যে, আল্লাহর নাযিল করা বিধান মান্য করতেই হবে এবং এ ব্যাপারে অন্য কারো বিধান মানা যাবে না। এর অন্যথা করা হলে সেটা হবে কুফরী, সেটা হবে যুলুম এবং সেটা হবে ফাসেকী কাজ। এখানে এক নাগাড়ে কঠোর আদেশমালা জারী হয়েছে। সূরার ৪১ নং আয়াত থেকে ৫০ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখুন।.....

এখানে সূরার মূল বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে যায়। সেটি এই যে, স্রষ্টা যখন একজন তখন বিধানদাতা, আইনদাতা ও শাসনকর্তাও সেই একই সত্ত্বা। স্বভাবতই আল্লাহর আইনই একমাত্র আইন, তাঁর বিধানই একমাত্র বিধান, তাঁর শরীয়তই একমাত্র শরীয়ত। একমাত্র আল্লাহর নাযিল করা বিধানেরই আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে। একমাত্র তাঁর নাযিল করা ওহীর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। এটাই ঈমানের দাবী এবং এটাই ইসলাম। এই হচ্ছে আল্লাহর সেই দ্বীনের মূলকথা, যার ওপর তিনি তার সর্বকালের সকল বান্দার অংগীকার গ্রহণ করেছেন। এই দ্বীন নিয়েই আল্লাহর সকল রসূল এসেছেন এবং মোহাম্মদ (স.)-এর উম্মত ও পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতদের জন্যে এই একই দ্বীন নির্ধারিত।

'আল্লাহর দ্বীন' যে শুধুমাত্র আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা-শাসন ও নির্দেশ জারী করার নাম, সে ব্যাপারে কোনো ভিন্ন মতের অবকাশ মাত্র নেই। কেননা এই দ্বীনই আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভুত্ব, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা এবং একমাত্র ইলাহ হওয়ার প্রতীক।

সুতরাং 'আল্লাহর দ্বীন' এবং 'আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা, শাসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশ জারী করা' একেবারেই অভিন্ন জিনিস এবং একটি অপরটির অনিবার্য ফলশ্রুতি। এর একটি কারণ এই যে, আল্লাহর নাযিল করা বিধান যে কোনো মানবরচিত বিধান, আইন, বা বিধি ব্যবস্থার চেয়ে উত্তম। তবে এটি তার একমাত্র কারণ নয় এবং প্রধান কারণও নয়। একমাত্র কারণ ও প্রধান কারণ এই যে, গোটা জীবান একমাত্র আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ইলাহ হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব। আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় অর্থে এটাই প্রকৃত ইসলাম। ইসলামের আভিধানিক অর্থ হলো আত্মসমর্পণ। আর এর পারিভাষিক অর্থ হলো আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ, তাঁর নিরংকুশ ও শর্তহীন আনুগত্য, তাঁর সাথে অন্য কারো ইলাহত্বের দাবী নাকচ ও বাতিল করা, ইলাহহীয়াতের সর্ব

www.pathagar.com

প্রধান বৈশিষ্ট্য সার্বভৌম ক্ষমতা অন্য কারো হতে পারে না– তা ঘোষণা করা এবং তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর আইন ছাড়া অন্য কারো আইন মানতে বাধ্য করার অধিকার আর কারো থাকতে পারে একথা অস্বীকার করা।

এই উভয় অর্থে পরিপূর্ণ ইসলামের বাস্তবায়নের জন্য এটা যথেষ্ট নয় যে, মানবজাতি নিজেদের জন্যে আল্লাহর আইনের অনুরূপ আইন রচনা করে নেবে, এমনকি হুবহু আল্লাহর আইন জারী করাও যথেষ্ট নয়, যদি তাতে নিজেদের প্রতীক যুক্ত করে, যদি তাকে আল্লাহর আইন বলে ঘোষণা না দেয় এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তাঁরই নামে তা জারী না করে। কেননা একমাত্র এভাবেই বান্দার শাসন ও সার্বভৌমত্বের দাবী অস্বীকার করার শর্ত পূরণ হওয়া সম্ভব। সুতরাং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ক্ষমতা ও শক্তি প্রয়োগ করা দোষণীয় নয় বরং তা ঈমানের অপরিহার্য্য দাবী।

বস্তুত, আল্লাহর দ্বীন ও আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা ও শাসনের এই অভিন্নতা, অনিবার্যতা ও অবিচ্ছেদ্যতাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সূরার এই উক্তিগুলোতে, 'যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা করে না, তারা কাফের ....তারা যালেম........ তারা ফাসেক।' কারণ যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা ও শাসন করে না, তারা মুখে না করলেও নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারাই জানিয়ে দেয় যে, তারা আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে মানে না। আর বাস্তব কার্যকলাপ দ্বারা যে কথা প্রকাশ পায়, তা মুখের কথার চেয়েও শক্তিশালী। এ জন্যেই কোরআন তাদেরকে কাফের, যালেম ও ফাসেক বলে আখ্যায়িত করেছে। কেননা তারা যখন আল্লাহর আইন মানতে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ অনুমোদন করেননি এমন সব আইন প্রবর্তন করে, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে অমান্য করে এবং তার পরিবর্তে নিজেদেরকে ইলাহ বলে ঘোষণা করে।

সমগ্র সূরায় এই অর্থেই ইসলামকে আল্লাহর দ্বীন হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং সর্বত্র এই অর্থের ওপর ভিত্তি করেই বক্তব্য রাখা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, চিন্তা ও বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি, জাহেলিয়াতে নিমজ্জিতদের ও কেতাবধারীদের বিকৃত ধারণা ও বিশ্বাসের বিবরণ, 'আদ-দ্বীনের' প্রকৃত মর্ম বিশ্লেষণ হালাল ও হারাম সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ জানা, তা মান্য করা, ও কোনো রূপ পরিবর্তন ও বিকৃতি ছাড়া হুবহু আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাসনের নামই যে 'আদ দ্বীন' বা 'আল ইসলাম', তার বিবরণ এ সূরার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এ ছাড়াও এর আরো কয়েকটি আলোচ্য বিষয় রয়েছে। সেই বিষয়গুলো হচ্ছে, মুসলিম জাতির মর্যাদা, পৃথিবীতে তার প্রকৃত ভূমিকা, তার শত্রুদের সাথে তার নীতি ও আচরণ, তার শত্রুদের মুখোশ উন্মোচন, তাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের বিভ্রান্তির বর্ণনা এবং মুসলিম

www.pathagar.com

জাতির বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা ও চক্রান্ত, যার বিরুদ্ধে স্বয়ং কোরআন মুসলিম জাতির পক্ষে সংগ্রামরত এবং যার বিবরণে ইতিপূর্বেকার তিনটে বড় বড় সূরা সোচ্চার।

মুসলিম জাতির কাছে যে আসমানী কেতাব রয়েছে, তা মানব জাতির কাছে প্রেরিত আল্লাহর সর্বশেষ কেতাব। মূল আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শের দিক দিয়ে তা পূর্ববর্তী আসমানী কেতাবের সমর্থক হলেও সর্বশেষ কেতাব হিসাবে পূর্ববর্তী কেতাবের চেয়ে অগ্রগণ্য। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত যে শরীয়াত মনোনীত করেছেন, তার চূড়ান্ত দলীল এই আল কোরান। এতে পূর্ববর্তী কেতাবধারীদের শরীয়াতের যে সব বিধি বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো এই উম্মতের জন্যে আল্লাহর শরীয়াতের বিধি হিসাবে কার্যকর থাকবে। আর যে সব বিধি বাতিল করা হয়েছে, তা বাতিল, অচল ও অকার্যকর থাকবে, যদিও তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া একটি কেতাবে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনবিধান হিসাবে মনোনীত করলাম।'

'তোমার ওপর আমি কেতাবকে সত্যের বাহন হিসাবে তার পূর্ববর্তী কেতাবের সমর্থক হিসাবে এবং তার চেয়ে অগ্রগণ্য হিসাবে নাযিল করেছি।'

এ জন্যে মুসলিম জাতির অবস্থান ও ভূমিকা হলো, তারা মানবজাতির পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। পৃথিবীতে কোনোরূপ বিদ্বেষ, বৈষম্য, স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব ছাড়া এবং জনগণের সর্বাত্মক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই তার দায়িত্ব। দায়িত্বশীল মাত্রেরই স্বভাবসুলভ দায়িত্ব হলো। অন্যেরা যতোই বিপথগামী ও প্রবৃত্তির খেয়ালখুশীর হাতে বন্দী হোক না কেন, এদেরকে তা দ্বারা বিন্দু মাত্রও প্রভাবিত হওয়া চলবে না, জনগনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া কিংবা কারো মনস্তুষ্টির জন্যে আল্লাহর বিধান থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হওয়া চলবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কোনো গোষ্ঠী কর্তৃক তোমাদেরকে মাসজিদুল হারামে যেতে বাধা দেয়ার দরুন তাদের প্রতি বিদ্বেষবশত অন্যায় আচরণ করো না। কল্যাণ ও খোদাভীতির কাজে পরস্পরের সহযোগিতা করো। যুলুম ও গুনাহর কাজে সহযোগিতা করো না.......।'

'হে মোমেনরা! তোমরা আল্লাহর জন্যে ন্যায় বিধানের সাক্ষী ও প্রতিষ্ঠাতা হয়ে যাও' .... 'তাদের মধ্যে আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে ফয়সালা করে দাও ......।'

আর যেহেতু এই উম্মাত সকল নবী ও রসূলের দায়িত্বের উত্তরাধিকারী, বিশেষভাবে শেষ নবীর কাজ অব্যাহত রাখার দায়িত্ব তার কাঁধে ন্যস্ত এবং আল্লাহর এই সর্বশেষ দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও মানবজাতির অভিভাবক হিসাবে কাজ করা তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত, তাই যারা এই দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান ও তার প্রতি কুফরী করে এবং তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করে, তাদের সাথে তার কখনো বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত না। তার বন্ধুত্ব হবে শুধু আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে। কেননা মুসলিম উম্মাহ

www.pathagar.com

একটি আদর্শবাদী জাতিবর্ণ, বংশ, ভূমি ও জাহেলিয়াতের উত্তরাধিকারী ভিত্তিক জাতি নয়। সে আল্লাহর সর্বশেষ দ্বীন, আকীদা ও আদর্শের অনুসারী জাতি। এই আদর্শই তার ঐক্য ও সংহতির একমাত্র ভিত্তি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আজ কাফেররা হতাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে নয়, আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত করে দিলাম ....।'

'হে মোমেনরা! ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করো না' ......

'তোমাদের বন্ধু তো শুধু আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনরা.........।'

'যারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপ করে, তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না....।'

'হে মোমেনরা! তোমরা নিজেদেরকে সংরক্ষণ করো। তোমরা যদি সুপথগামী হও, তবে বিপথগামীরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মাহর শত্রুরা ইসলামেরও শত্রু, আল্লাহর বিধানের শত্রু। তারা সত্যকে দেখতে চায় না এবং সত্যের বিরুদ্ধে শত্রুতাকে তারা ত্যাগ করতেও ইচ্ছুক নয়। মুসলিম উম্মাহর উচিত তাদেরকে সঠিকভাবে চেনা, শেষ নবী ও আল্লাহর অন্যান্য রসূলদের সাথে ও খোদ ইসলামের সাথে তাদের কী আচরণ ছিলো, তা ভালো করে জানা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন , 'আল্লাহ বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে ১২ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন ....। (আয়াত ১২ থেকে ১৪)

স্মরণ করো, যখন মূসা তাঁর জাতিকে বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো ..... (আয়াত ২০ থেকে ২৫)

'এই কারণই বনী ইসরাইলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা বা দুনিয়ায় ধ্বংসসাত্মক কাজের কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করলো, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো.....।' (আয়াত ৩২) 'হে রসূল, যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়, তারা যেন তোমার দুঃখের কারণ না হয় ....।' (আয়াত ৪১ থেকে ৪২) 'বলো, হে আহলে কেতাব, তোমরা ....।' (আয়াত ৫৯ থেকে ৬৪) 'বলো, হে আহলে কেতাব ......। (আয়াত ৬৮ থেকে ৭১) 'বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছিলো, তারা অভিশপ্ত হয়েছিলো......। (আয়াত ৭৮ থেকে ৮২)

মুসলিম জাতির শত্রুদের মুখোশ উন্মোচনকারী এই বিবরণ, বিশেষত মোশরেক ও ইহুদী গোষ্ঠীকে প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা এবং মাঝে মাঝে মোনাফেক ও খৃষ্টানদেরও উল্লেখ থেকে আমরা এই সূরায় আলোচিত আরো একটি বিষয়ের আভাস পাই। সে বিষয়টি হচ্ছে, তৎকালীন মদীনায় অবস্থানকারী মুসলিম দলটি এবং মুসলিম জাতি তার সমগ্র ইতিহাস জুড়ে তার বিভিন্ন শত্রুশিবিরের প্রতি কিরূপ নীতি অবলম্বন করেছে।

www.pathagar.com

এবার সূরাটি মদীনায় মুসলমানদের জীবনের কোন্ সময়টিতে নাযিল হয়েছিলো সে সময়টির কথা আলোচনা করা যাক।

বহু সংখ্যক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এই সূরা সূরা আল ফাতহের পরে নাযিল হয়েছে। আর সূরা আল ফাত্হ সম্পর্কে এ কথা সুবিদিত যে, তা ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়াতে নাযিল হয়েছিলো। এ সব রেওয়ায়াতের কোনো কোনোটাতে একথাও বলা হয়েছে যে, সূরার তৃতীয় আয়াত ব্যতীত সমগ্র সূরা এক সাথেই নাযিল হয়েছে। 'আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম.....' উক্তি সম্বলিত তৃতীয় আয়াতটি ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় নাযিল হয়েছিলো।

কিন্তু রসূল (স.)-এর জীবনেতিহাস ও তাঁর জীবদ্দশায় সংঘটিত ঘটনাবলীর সাথে মিলিয়ে সূরাটিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, সমগ্র সূরা, সূরাটি আল-ফাত্হ তথা হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে নাযিল হয়েছে বলে কথিত বর্ণনাটি তো সঠিক নয়ই, উপরন্তু বদরের যুদ্ধের সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনা থেকে অকাট্যভাবে জানা যায় যে, এই সূরার বনী ইসরাইল ও হযরত মূসা সংক্রান্ত আয়াতগুলো ২য় হিজরীতে সংঘটিত বদরের যুদ্ধের আগে মুসলমানদের কাছে পরিচিত ছিলো। এক বর্ণনা মতে হযরত সা'দ বিন মায়ায এবং অপর বর্ণনা মতে হযরত মিকদাদ বিন আমর রসূল (স.)-কে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রসূল। আমরা কোনো অবস্থাতেই আপনাকে সেই কথা বলবো না, যা মূসা (আ.)-এর সংগীরা মূসা (আ.)-কে বলেছিলো, হে মূসা, আপনি ও আপনার প্রতিপালক গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে রইলাম।.........

সূরার বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন থেকে এও জানা যায় যে, এই সূরার ইহুদীদের সম্পর্কে মন্তব্যসম্বলিত আয়াত ক'টি যখন নাযিল হয়, তখন মদীনায়, এমনকি মুসলমানদের ওপরও ইহুদীদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো, আর একারণেই তাদের মুখোশ খুলে দেয়া ও ষড়যন্ত্র বানচাল করার জন্যে এই বিবরণ নাযিল হওয়া আবশ্যক হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু খন্দক যুদ্ধের পর বনু কুরায়যা অবরোধের ঘটনার ফলশ্রুতিতে সেই প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব হয়। তিনটি শক্তিশালী ইহুদী গোত্র বনু নযীর, বনু কুরায়যা ও বনু কায়নুকার অস্তিত্ব থেকে মদীনা মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং হোদায়বিয়ার পর এমন কিছু ঘটেনি, যাতে তাদের প্রতি এতো গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তা ছাড়া তাদের মুসলিমবিরোধী চক্রান্ত ও কোরায়শদের সাথে যোগসাজশ ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর তাদের সাথে মুসলমানদের সমঝোতা ও আপোসের আর কোনো অবকাশ ছিলো না। কাজেই রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহর এই উক্তিটি, 'মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যতীত, তাদের দিক থেকে তুমি অনবরতই একটা না একটা চক্রান্তের খবর পেতে থাকবে।' অবশ্যই হোদায়বিয়ার পূর্ববর্তী কোনো সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে। অনুরূপভাবে যে আয়াতে ইহুদীদের আনীত বিবাদের মীমাংসা করে দেয়া অথবা তা এড়িয়ে যাওয়ার মধ্য থেকে যে কোনো একটি পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে আয়াতও ওই সময়ের পূর্বে নাযিল হওয়ার কথা।

www.pathagar.com

এ সব যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে এই মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হয় যে, সূরা মায়েদার প্রথম দিককার অংশটি এবং তার পরবর্তী কিছু কিছু অংশ সূরা আল ফাতহের পর নাযিল হয়েছে, আর কিছু কিছু অংশ নাযিল হয়েছে তারও আগে। পক্ষান্তরে 'আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম' এই ঘোষণা সম্বলিত তৃতীয় আয়াতটি যে এর অনেক পরে দশম হিজরীতে নাযিল হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি এ আয়াতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতানুসারে কোরআনের সর্বশেষ আয়াত। মোদ্দা কথা এই যে, সমগ্র সূরা মায়েদা এক সাথে নাযিল হয়নি এবং যে বর্ণনায় এ কথা বলা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারা, সূরা আলে ইমরান ও সূরা আন নেসার ভূমিকায় আমি যেমন বলেছি, তেমনি এখানেও বলছি যে, কোরআন মুসলমানদের পক্ষে তাদের ও তাদের আদর্শের শত্রুদের, বিশেষত ইহুদী ও মোশরেকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই চালিয়েছে, সেই সাথে মোমেনদের মনমগযে ইসলামের সঠিক ধারণা ও চেতনা বদ্ধমূল করেছে এবং আইন প্রণয়ন ও নির্দেশাবলী জারী করার মাধ্যমে ইসলামী সমাজকে সুসংগঠিত ও সুসংহত করেছে।

এ সূরায় ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভগুলো সংহত করার ব্যাপারে যে কাজ করা হয়েছে তা এই যে, তাওহীদবিশ্বাসকে সর্ব প্রকারের কলুষ ও আবিলতা থেকে মুক্ত করা হয়েছে, 'আদদ্বীন' এর মর্ম ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, আদদ্বীন অর্থ হলো জীবন যাপনের পথ, পদ্ধতি ও প্রণালী। একমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবনপদ্ধতি অনুসারে বিচার ফয়সালা করা, শাসন করা ও জীবনের সকল ব্যাপারে শুধু আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করাই হচ্ছে ঈমান ও ইসলাম। এ ছাড়া আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদের দাবী পূর্ণ বাস্তবায়িত হতে পারে না। বস্তুত, তাওহীদ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকেই ইলাহ বা মাবুদ বা উপাস্য মেনে নেয়া। আর ইলাহের অন্যতম গুণ বৈশিষ্ট্য হলো সার্বভৌমত্ব, মানুষের জন্যে জীবনবিধান রচনা করার ব্যাপারে একক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া। আমি আগেই বলেছি যে, আলোচ্য সূরা এই বিষয়টির ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে।

আমার উপরোক্ত আলোচনায় পূর্ববর্তী বড় সূরাত্রয়ের সাথে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরার অনেকটা মিল পরিলক্ষিত হলেও প্রত্যেকটি সূরার আলোচনার ধারা, বর্ণনাভংগি, প্রেক্ষাপট ও আবহ স্বতন্ত্র। ফলে প্রতিটি সূরার এক একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

এ সূরার বর্ণনাভংগির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, এতে সব কিছু কঠোর ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আকারে ঘোষিত হয়েছে, চাই তা শরীয়তের হুকুম ও বিধিসমূহের বেলায়ই হোক কিংবা নির্দেশাবলী ও তাত্ত্বিক বক্তব্যের বেলায়ই হোক। আইন ও বিধির ক্ষেত্রে তো এ ধরনের কঠোর ভাষা প্রয়োগই স্বাভাবিক। কিন্তু নির্দেশ ও তত্ত্বের আলোচনায় অন্যান্য সূরায় উদার ভাষা ব্যবহৃত হলেও এ সূরায় ব্যবহৃত হয়েছে কড়া ভাষা। সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

www.pathagar.com

সূরার এই সার্বিক ভূমিকা শেষ করার আগে এর তৃতীয় আয়াতের বক্তব্য নিয়ে কিছু আলোচনা না করে পারছি না। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকেই তোমাদের জন্যে একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসাবে সানন্দে মনোনীত করলাম।'

এ উক্তি একদিকে যেমন মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যে এবং তাদের সকল সম্পর্ক-বন্ধন ও স্বার্থের জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত চূড়ান্ত বিধানের দিকনির্দেশনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিশ্বাসগত, এবাদতগত ও আইনগত সকল খুঁটিনাটি বিষয়সহ সমগ্র ইসলামের চিরস্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। এতে আর কখনো কোনো পরিবর্তন বা রদবদলের অবকাশ নেই। কেননা ইসলাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। তার ভেতরে কোনো অসম্পূর্ণতা নেই। এর ভেতরে কোনো পরিবর্তন বা সংশোধনের অর্থ দাঁড়ায় গোটা ইসলামকে অস্বীকার করা। কেননা এ দ্বারা আল্লাহর ঘোষিত ইসলামের পরিপূর্ণতা অস্বীকৃত হয়। আর এই অস্বীকৃতি যে সুস্পষ্ট কুফরী, তাতে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই।

এ আয়াতটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, ইসলাম সর্বকালের চিরস্থায়ী জীবনব্যবস্থা। ইসলামই আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ ধর্ম। এটি সর্বকালের জন্যে আল্লাহর মনোনীত আইন, বিধান বা শরীয়ত। এক এক যুগের জন্যে এক এক ধর্ম এবং এক এক শরীয়ত নয়, বরং সর্বকালের জন্যে এটাই একমাত্র শরীয়ত। এটা সর্বশেষ, চূড়ান্ত ও পূর্ণাংগ বিধান। এতে যদি কেউ পরিবর্তন ও সংশোধন আনতে চায়, তবে তার উচিত ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করা। কেননা ইসলাম অপরিবর্তনীয়। আর যদি সে অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করে, তবে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা অবলম্বন করে, তবে তা কখনো গ্রাহ্য হবে না।' আকীদা বিশ্বাস, এবাদত উপাসনা ও যাবতীয় দৈনন্দিন কার্যকলাপের বিস্তারিত বিধানসম্বলিত এই খোদায়ী জীবনব্যবস্থা জীবনের সকল তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং জীবনের উন্নতি অগ্রগতিকে তরান্বিত করবে।

এই খোদায়ী বিধানের আওতায় জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করার অর্থ এটা নয় যে, এর কোনো মূলনীতি বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিধি থেকে জীবন বিচ্ছিন্ন থাকবে। এর অর্থ এই যে, এই বিধান স্বভাবতই জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত রাখে এবং তার কোনো মূলনীতি বা বিধি লংঘন না করেই উন্নতির পথ সুগম করে। এ বিধান রচনা করার সময় এই উন্নতি ও অগ্রগতিকে নিশ্চিত করেই তা রচনা করা হয়েছিলো। কেননা আল্লাহ তায়ালা যখন এটিকে তার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রূপ দিয়ে রচনা করেন এবং তাকে পূর্ণতা দান ও মানবজাতির দ্বীন হিসাবে মনোনীত করার ঘোষণা দেন, তখন তাঁর অজানা ছিলো না যে, ভবিষ্যতে মানুষের কত নতুন নতুন চাহিদা ও প্রয়োজন দেখা দেবে। সেই সব চাহিদা ও প্রয়োজনের দাবী কত বেশী ও রকমারি হবে এবং দুনিয়ার কত উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হবে। এ সব যখন আল্লাহর অজানা ছিলো

www.pathagar.com

না, তখন তাঁর রচিত বিধানে এ সমস্ত প্রয়োজনের দাবী পূরণের নিশ্চয়তা থাকা স্বভাবতই অবধারিত। যে ব্যক্তি মনে করে যে, ইসলামে পার্থিব উন্নতি ও অগ্রগিতর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই এবং পার্থিব চাহিদা ও প্রয়োজনের দাবী পূরণের নিশ্চয়তা নেই, সে আসলে স্বয়ং আল্লাহরই ক্ষমতা, বিচক্ষণতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার যথাযথ মূল্যায়ন করেনি।

সূরার আলোচ্য বিষয়ের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এখানেই শেষ করছি।

সূরা আল আনফাল

দু'টি মক্কী সূরা আনয়াম ও আরাফের পর এবার আমরা পুনরায় মদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর দিকে ফিরে আসছি। ইতিপূর্বে আমরা আল বাকারা, আলে ইমরান, আন নেসা ও আল মায়েদা এই ক'টি মাদানী সূরার তাফসীর করে এসেছি। তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনে আমরা কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে এসেছি- কোরআন নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা নয়। কেননা নাযিল হওয়ার কালগত ধারাবাহিকতার ব্যাপারে এখন আমাদের পক্ষে কোনো কিছু নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র এক একটি অংশকে দেখিয়ে সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে যে, এটুকু মক্কী এবং এটুকু মাদানী। এতে সামান্য কিছু মতভেদ থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যেক আয়াত, আয়াত সমষ্টি বা সূরার অবতারণের সময় চিহ্নিত করে, নিশ্চিতভাবে কালগত ধারাবাহিকতা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। আমরা এ ক্ষেত্রে আজও কোনো অকাট্য তথ্য উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। তবে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা কিছু কিছু আয়াত সম্পর্কে জানা যায় যে, সেটা মক্কী যুগের আয়াত, না মাদানী যুগের। যদিও কোরআনের আয়াত ও সূরাগুলোর নাযিল হওয়ার কালগত ধারাবহিকতা জানবার চেষ্টা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে করে ইসলামী আন্দোলনের গতিধারা, স্তরসমূহ ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভেও সহায়তা পাওয়া যায়, কিন্তু এই ধারাবাহিকতার ব্যাপারে নিশ্চয়তার অভাব থাকায় এ কাজটা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। এজন্যে আমি এই তাফসীরে কোরআনের সূরাগুলোকে ওসমানী কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসারে সাজানোই ভালো মনে করেছি, সেই সাথে মোটামুটিভাবে ও অধিকতর বিশ্বস্ত সূত্রের ভিত্তিতে প্রত্যেক সূরার ঐতিহাসিক পটভূমি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। এভাবে আমি আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তত্ত্ব ও তথ্য সংক্ষেপে ও অধিকতর নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুসারে বিবৃত করেছি।

অধিকতর নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুসারে আলোচ্য সূরা আনফাল সূরা বাকারার পরে বৃহত্তর বদর যুদ্ধের সময় অর্থাৎ হিজরতের উনিশ মাস পরে দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে নাযিল হয়। তবে সূরা বাকারার পরেই যে এটি নাযিল হয়েছে এটা কোনো চূড়ান্ত তথ্য নয়। কেননা সূরা বাকারা এক সাথে নাযিল হয়নি। এর কিছু অংশ মাদানী যুগের প্রথম ভাগে এবং কিছু অংশ শেষ ভাগে নাযিল হয়েছে। এই শেষ ভাগ ও প্রথম ভাগের মাঝে প্রায় নয়টি বছর রয়েছে। সূরা আনফাল যে এই সময়ের ভেতরেই নাযিল

www.pathagar.com

হয়েছে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সূরা বাকারা এই সূরার আগে ও পরে কিছু কিছু করে নাযিল হয়েছে। তাই সূরা আনফাল বাকারার পরে নাযিল হওয়ার অর্থ এই যে, বাকারার প্রথমাংশের পরে নাযিল হয়েছে।

কোনো কোনো রেওয়ায়াত অনুসারে সূরা আনফালের ৩০ নং থেকে ৩৬ নং আয়াত পর্যন্ত অংশটি মক্কী যুগের। এগুলো হচ্ছে,

'যখন কাফের তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকায় তোমাকে বন্দী করা, হত্যা করা অথবা বের করে দেয়ার জন্যে......... (আয়াত ৩০-৩৬)

যারা এ আয়াতগুলোকে মক্কী বলেছেন, তারা সম্ভবত এ আয়াতগুলোতে মক্কায় সংঘটিত ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখেই তা বলেছেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়। কেননা বহু মাদানী যুগের আয়াতে হিজরতের পূর্বে মক্কায় সংঘটিত ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে। এমনকি এই সূরার ২৬ নং আয়াতে স্পষ্টতই মক্কী যুগের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে,

'স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ও দুর্বল ছিলে ....'

অনুরূপভাবে ৩৬ নং আয়াতে বদর যুদ্ধের পরে মোশরেক কর্তৃক ওহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতিকল্পে অর্থ ব্যয়ের উল্লেখ রয়েছে। যেমন,

'নিশ্চয় কাফেররা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফেরানোর জন্যে অর্থ-কড়ি ব্যয় করে.........'

যে সকল বর্ণনায় এসব আয়াতকে মক্কী আয়াত বলা হয়েছে, সে সব বর্ণনায় এসব আয়াতের শানে নুযুল বা নাযিল হওয়ার উপলক্ষ হিসাবে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা আপত্তিকর। বলা হয়েছে যে, আবু তালেব রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমার জাতি তোমার ব্যাপারে কি সলাপরামর্শ করছে?' রসূল (স.) বললেন, 'ওরা আমাকে জাদু করতে, হত্যা করতে অথবা বের করে দিতে চায়।' আবু তালেব বললেন, 'তোমাকে এ কথা কে বলেছে? রসূল (স.) বললেন, 'আমার প্রতিপালক'। আবু তালেব বললেন, হাঁ, ওই প্রতিপালক তো তোমারই প্রতিপালক। তাঁর কাছে তুমি সদুপদেশ চাও। রসূল (স.) বললেন, 'আমি তাঁর কাছে সদুপদেশ চাইবো কেন? বরং তিনিই আমাকে সদুপদেশ দেবেন।' এই সময় নাযিল হয় 'স্মরণ করো, যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো আটক রাখা, হত্যা করা অথবা বহিষ্কার করার জন্যে....' (আয়াত ৩০)

ইবনে কাসীর এই বর্ণনার উল্লেখ করেছেন এবং এর ওপর আপত্তি জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, এখানে আবু তালেবের উল্লেখ শুধু বিস্ময়করই নয়, বরং অগ্রহণযোগ্যও। কেননা এ আয়াত মাদানী যুগের। তাছাড়া এই ষড়যন্ত্রের ঘটনা, কোরায়শদের এই ষড়যন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং রসূল (স.)-কে গ্রেফতার, হত্যা কিংবা বহিষ্কারের সলাপরামর্শ হয়েছিলো শুধু হিজরতের রাতে। আর এটা হয়েছিলো আবু তালেবের মৃত্যুর প্রায় তিন বছর পর। যে আবু তালেব তাঁকে সাহায্য সংরক্ষণ এবং তাঁর যাবতীয় দায়ভার বহন করছিলেন, তার মৃত্যুর পরই কোরায়শদের এতোটা ক্ষমতা ও ধৃষ্টতা জন্মেছিলো– তার আগে নয়।

www.pathagar.com

ইবনে ইসহাক কোরায়শদের সারা রাত জেগে এই ও সলাপরামর্শ সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের শেষে তিনি বলেন, 'এই সময়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মক্কা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। অতপর তিনি মদীনায় পৌছার পর আল্লাহ সূরা আনফাল নাযিল করেন। এতে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দেয়া তাঁর নেয়ামত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই বলে, 'স্মরণ করো, যখন কাফেররা তোমাকে আটক, হত্যা বা বহিষ্কার করার জন্যে ষড়যন্ত্র করছিলো। তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ কৌশলী।'

এই হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। এটিই এই আয়াতের পূর্বাপর সেই সকল আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে ও মোমেনদেরকে ইতিপূর্বে কৃত সকল অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করা, আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়া এবং যুদ্ধের দিন ময়দান থেকে না পালিয়ে অবিচল থাকার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এভাবে সূরার অন্য সকল আলোচিত বিষয়ের সাথেও এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর সমগ্র সূরার মতো এই আয়াতগুলো মাদানী আয়াত– এই বক্তব্যই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

যা হোক, সূরা আনফালের নাযিল হওয়া সংক্রান্ত রেওয়াতগুলোতে এই সব সমস্যা থাকার কারণে আমরা এই তাফসীরে হযরত ওসমানের সংকলিত কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করাই অগ্রগণ্য মনে করেছি– কোরআন নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা নয়। এই সাথে নাযিল হওয়ার কারণ বা উপলক্ষ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ও যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করেছি।

এই সূরাটা নাযিল হয়েছে বৃহত্তর বদর যুদ্ধ প্রসংগে। আর এই যুদ্ধের কারণ এবং ইসলামী আন্দোলন ও মানবজাতির ইতিহাসে তার যে প্রভাব দেখা দিয়েছে, তার নিরিখে বলা যায়, বদর যুদ্ধ ইসলামী আন্দোলন ও মানবেতিহাসের পথের একটা বিরাট মাইলফলক।

আল্লাহ তায়ালা বদর যুদ্ধের দিনকে 'হক ও বাতিলের বিভক্তি ও দুই পক্ষের সংঘর্ষের দিন' নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর শুধু ইহকালে নয় এবং শুধু ইহকালীন জীবনেই নয়, বরং আখেরাতেও এটা হকপন্থী ও বাতিলপন্থী– এ দুই গোষ্ঠীকে পৃথক করে দিয়েছে। যেমন বদর যুদ্ধ উপলক্ষে নাযিল হওয়া সূরা আল হজ্জের ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এই দুই বিবদমান পক্ষ তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। যারা কুফরী করেছে, তাদের (পরানোর) জন্যে জাহান্নামের আগুন থেকে কিছু কাপড় কাটা হবে ....।'

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতগুলো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মোমেন ও কাফেরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর শুধু তাদের যুদ্ধ সম্পর্কেই নয় এবং তাদের পার্থিব জীবনে বিভক্ত হয়ে থাকা সম্পর্কেই নয়, বরং তাদের অনন্তকালের জীবন সম্পর্কেও এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। ওই দিনটির দৃশ্য তুলে ধরা ও তার মূল্যায়ন সম্পর্কে

www.pathagar.com

আল্লাহর এ ঘোষণাই যথেষ্ট। পরবর্তীতে এই ঘটনা এবং তার কারণ ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করার সময় আমি এই ঘটনার গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করবো।

বদর যুদ্ধের গুরুত্ব ও বিশালত্ব যতোই হোক, এর সুদূরপ্রসারী ফলাফলের মূল্যায়ন ততোক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতোক্ষণ আমরা এ যুদ্ধের সত্যিকার প্রকৃতি ও পরিচয় না জানবো। যতোক্ষণ এ যুদ্ধকে 'ইসলামী জেহাদের' একটা ঘটনা হিসাবে না দেখবো এবং এই জেহাদের প্রেরণার উৎসসমূহ ও তার উদ্দেশ্যসমূহ না বুঝবো। আবার এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বুঝতে হলে আমাদেরকে সর্বাগ্রে জানতে হবে ইসলামের প্রকৃত পরিচয়।

ইমাম ইবনে কাইয়েম স্বীয় গ্রন্থ 'যাদুল মা'য়াদ' এ ইসলামের জেহাদ শীর্ষক বিষয়টির সার সংক্ষেপ একটি অধ্যায় তুলে ধরেছেন। এই অধ্যায়টির শিরোনাম দিয়েছেন, 'রসূল (স.)-এর নবুওত লাভ থেকে শুরু করে ইন্তেকাল পর্যন্ত কাফের ও মোনাফেকদের ব্যাপারে অনুসৃত নীতি।' এই অধ্যায়ে তিনি বলেন, 'মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম তাঁর কাছে যে ওহী নাযিল করেন তা ছিলো এই যে, তিনি যেন তাঁর সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে পাঠ করেন। এটি ছিলো তাঁর নবুওতের সূচনা। এ সময় তিনি শুধু তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে পাঠ করার নির্দেশ দেন। এ সময় তাঁকে তা বা প্রচারের কোনো আদেশ দেননি। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ওপর নাযিল করা হয়, 'হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো এবং সতর্ক করো।' সুতরাং 'ইকরা' বা পাঠ করো বলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবী বানালেন, 'আর হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো এবং সতর্ক করো' বলে তাঁকে রসূল পদে উন্নীত করলেন। অতপর পর্যায়ক্রমে তিনি তাঁর নিকটতম আত্মীয়দেরকে, তাঁর গোত্রকে, প্রতিবেশী আরবদেরকে, সমগ্র আরব জাতিকে, অতপর সমগ্র বিশ্ববাসীকে সতর্ক করলেন। এভাবে তাঁর নবুওতের পর তিনি দশ বছরেরও অধিক সময় কোনো লড়াই বা জিযিয়া কর আরোপ ছাড়াই শুধু দাওয়াতের কাজ করে কাটালেন। এই সময়ে তাঁকে কোনো অস্ত্র ধারণ থেকে বিরত থাকা, ধৈর্য ধারণ করা ও ক্ষমা করার আদেশ দেয়া হয়েছিলো। আর হিজরত করার পর প্রথমে তাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো শুধু যারা তাঁর ওপর আক্রমণ চালায় তাদের বিরুদ্ধে, আর যারা তাঁর ওপর আক্রমণ করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়া হলো। অতপর তাঁকে সকল মোশরেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হলো। যাতে সমস্ত আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো আইন ও হুকুম মান্য করা না হয়।

অতপর জেহাদের নির্দেশ দেয়ার পর তাঁর কাছে কাফেররা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হলো, ১. যাদের সাথে আপোষ ও সন্ধির নীতি অবলম্বন করা হবে। ২. যাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে এবং ৩. যাদেরকে সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা দানের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হবে। প্রথম শ্রেণীটার সাথে করা সন্ধি চুক্তি তাঁকে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হলো। যতোক্ষণ তারা চুক্তি মেনে চলে, ততোক্ষণ মুসলমানদেরও তা মেনে চলতে

www.pathagar.com

হবে। কিন্তু যখন তাদের পক্ষ থেকে চুক্তি লংঘণের আশংকা দেখা দেবে, তখন মুসলমানরা চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করবে। কিন্তু চুক্তি লংঘরণর সুনির্দিষ্ট তথ্য না জানা পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে না। যারা চুক্তি লংঘন করেছে, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

সূরা তাওবা নাযিল করার মাধ্যমে এই তিন প্রকারের কাফেরদের সকলের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। আহলে কেতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা মুসলমানদের শত্রু, তারা ইসলাম গ্রহণ কিংবা জিযিয়া কর প্রদান না করলে মুসলমানদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়। কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ও তাদের ওপর কঠোরতা আরোপের আদেশ দেয়া হয়েছে। রসূল (স.) কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রশক্তি এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে বাকশক্তি ও যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জেহাদ করলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে কাফেরদের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিল করার আদেশ দিলেন এবং তাদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন। প্রথমত, যারা চুক্তি লংঘন করেছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি তাদের সাথে লড়াই করলেন ও তাদেরকে পরাজিত করলেন। দ্বিতীয়ত, যাদের সাথে মুসলমানদের নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি রয়েছে, কিন্তু তারা চুক্তি লংঘনও করেনি এবং মুসলমানদের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রমণও চালায়নি, তাদের সাথে কৃত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তৃতীয় যাদের সাথে মুসলমানদের কোনো চুক্তি ছিলো না কিংবা মেয়াদহীন চুক্তি ছিলো এবং তারা রসূল (স.) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়নি। এই শ্রেণীর লোকদেরকে চার মাস সময় দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। এই চার মাস অতিবাহিত হলে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রসূল (স.) চুক্তি লংঘনকারীদেরকে হত্যা করলেন। যাদের সাথে চুক্তি ছিলো না কিংবা চুক্তির কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ ছিলো না, তাদেরকে চার মাস সময় দিলেন। আর চুক্তি মান্যকারীর সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন। এই সব লোক ইসলাম গ্রহণ করলো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কুফরীর ওপর অবিচল থাকলো না। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত থাকার অংগীকারে আবদ্ধ অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করলেন।

এভাবে সূরা তাওবা নাযিল হবার পর রসূল (স.)-এর কাছে তিন শ্রেণীর কাফের অবশিষ্ট রইলো ১. যুদ্ধরত, ২. চুক্তিবদ্ধ এবং ৩. ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত। অতপর চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের ভাগ্য মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত হলো। ইসলামের আওতায় এরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত ও বিদ্রোহী। যারা বিদ্রোহী, তারা রসূল (স.)-কে ভয় পেতো। এভাবে গোটা দুনিয়ার মানুষ তিন রকমের দাঁড়ালো- মুসলমান, নিরাপদ আপোষকামী অমুসলিম এবং ভীরু বিদ্রোহী। মোনাফেকদের ব্যাপারে তাঁর নীতি ছিলো এই যে, আপাতদৃষ্টিতে তাদেরকে যেমন দেখা যায়, তেমনিই বিবেচনা করা, তাদের মনের অবস্থা আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা

www.pathagar.com

তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা, তাদেরকে এড়িয়ে চলা, তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ ও কঠোর নীতি অবলম্বন, হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দ্বারা তাদের মন জয় করা, তাদের জানাযা না পড়া এবং তাদের কবর যেয়ারত না করা। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আরও জানিয়েছিলেন যে, কোনো মোনাফেকের জন্যে তিনি ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন না। এই ছিলো দুশমন কাফের ও মোনাফেকদের প্রতি রসূল (স.)-এর নীতি।'

ইসলামে জেহাদের বিভিন্ন স্তরের বিধানসম্বলিত দীর্ঘ আলোচনার এই চমৎকার সারসংক্ষেপ থেকে ইসলামের আন্দোলন পদ্ধতির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য জানা গেলো, যা বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। কিন্তু আমি এ তাফসীরে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করবো!

প্রথম বৈশিষ্ট্য, জীবনপদ্ধতির বাস্তবমুখিতাই ইসলামের পয়লা বৈশিষ্ট্য। এটা মানবসমাজের বিদ্যমান একটা বাস্তব অবস্থার মোকাবেলা করে এবং পৃথিবীতে ইসলামের অস্তিত্বকে সংরক্ষণ করার জন্যে সম্ভাব্য যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করে। ইসলাম জাহেলী মতবাদ ও আদর্শের মোকাবেলা করে। এই জাহেলী মতাদর্শের ভিত্তিতে বহু রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং বস্তুগত শক্তিতে বলীয়ান বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান সেগুলোকে সমর্থন ও সাহায্য করে। এ জন্যে ইসলাম এই গোটা বাস্তব অবস্থাটারই মোকাবেলা করে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে। একদিকে আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণার সংশোধনকল্পে দাওয়াত ও প্রচারমূলক কাজের মাধ্যমে এবং অপরদিকে জাহেলী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উচ্ছেদকল্পে জেহাদের মাধ্যমে এর মোকাবেলা করে। কেননা এই রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগনকে বলপ্রয়োগ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্য প্রভুদের গোলামে পরিণত করে। বস্তুগত শক্তির মোকাবেলায় কেবল প্রচার ও দাওয়াতের মধ্যে এ আন্দোলনের তৎপরতা সীমাবদ্ধ থাকে না। অনুরূপভাবে তা মানুষের বিবেকের ওপর কোনো বস্তুগত বলও প্রয়োগ করে না। ইসলামের জীবনপদ্ধতিতে ওই দুটো জিনিসই সমান গুরুত্বসম্পন্ন।

ইসলামের জীবনপদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এর আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবমুখিতা। এ হচ্ছে ধাপে ধাপে অগ্রসরমান একটা আন্দোলন। এর প্রত্যেকটি ধাপের দাবী ও বাস্তব প্রয়োজন পূরণের উপকরণাদি এর হাতে রয়েছে। প্রতিটি ধাপ এমন যে, তা স্বয়ংক্রিয়াভাবে পরবর্তী ধাপ পর্যন্ত আন্দোলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ইসলাম শুধুমাত্র মতবাদ ও মতাদর্শ দ্বারা বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করে না। অনুরূপভাবে তা প্রেক্ষাপটহীন যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে বিপর্যয়ও সৃষ্টি করে না। বরং তা পর্যায়ক্রমিকভাবে সুষ্ঠুভাবে প্রতিটি স্তর অতিক্রম করে। যারা কোরআনের ইসলামের জেহাদ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর এই পর্যায়ক্রমিকতা ও ধারাবাহিকতার বৈশিষ্ট্যকে হিসাবে ধরে না এবং ইসলাম যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় ও এর প্রতিটি ধাপের সাথে যে কোরআনের আয়াতসমূহের সম্পর্ক রয়েছে তা উপলব্ধি করে না, তারা

www.pathagar.com

মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয় এবং আয়াতগুলোর ভুল অর্থ করে তা থেকে জেহাদের নামে এমন সব পদ্ধিতি বের করে, যা আদৌ ওই আয়াতগুলোর বক্তব্য নয়। এরূপ হওয়ার কারণ হলো, তারা কোরআনের প্রতিটি উক্তিকে অন্যান্য উক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একমাত্র ও সর্বশেষ উক্তি মনে করে। তাদের ধারণা যে, ওই আয়াতেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ নীতিমালা ব্যক্ত করা হয়েছে।

আর একটি শ্রেণী রয়েছে যারা বিরাজমান শোচনীয় পরিস্থিতি ও পরিবেশের চাপের কাছে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরাজিত হয়ে মুসলমানদের নতুন প্রজন্মকে বলে যে, ইসলাম শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যে জেহাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। এভাবে তারা পৃথিবী থেকে সকল আল্লাহাবিমুখ শাসনের অবসান ঘটানো এবং সকল মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধু আল্লাহর গোলামে পরিণত করার মহান দায়িত্ব থেকে ইসলামকে অব্যাহতি দিয়ে ইসলামের একটা 'উপকার' সাধন করলেন বলে মনে করেন। বস্তুত ইসলাম কাউকে তার আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। কিন্তু মানুষ যাতে তার আকীদা বিশ্বাস স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারে, সে জন্যে যমীনে বিদ্যমান স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চায়। এই শাসন ব্যবস্থাকে জিযিয়া দিতে ও ইসলামের অধীনতা বরণ করতে সে বাধ্য করে, যাতে মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে ইসলামকে গ্রহনের ফয়সালা করতে পারে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলামের চিরস্থায়ী আন্দোলন ও তার নিত্য নতুন উপায় উপকরণ ইসলামকে কখনো তার স্থায়ী ও শাশ্বত নীতিমালা ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে না। প্রথম থেকেই এ আন্দোলন শুধু কোরায়শদেরকে নয় এবং শুধু আরবদেরকে নয়, বরং সমগ্র মানব জাতিকে। এক আল্লাহর এবাদাত ও আনুগত্য করতে এবং আল্লাহর বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। এই মূলনীতির ব্যাপারে তার কোনো আপোষ নেই।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, মুসলমানদের সাথে সকল অমুসলমানের সম্পর্ক আইনানুগভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে 'যাদুল মায়াদ' থেকে ইতিপূর্বে উদ্ধৃত নির্দেশিকার আলোকে। সেই নির্দেশিকা এই যে, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা অথবা অন্ততপক্ষে নমনীয় হওয়া তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা, তাঁর এবাদাত ও আনুগত্যে কাউকে কোনোভাবে বাধা না দেয়া এবং সবাইকে ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান নিশ্চিত করা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের কর্তব্য। কোনো মানুষ নিজে ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক এ ব্যাপারে সে পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু সে যদি অন্য কাউকে বাধা দেয়, তবে ইসলাম তা বরদাশত করে না। যে ব্যক্তি অন্যকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেবে, ইসলাম তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করবে, যতোক্ষণ না সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অথবা বাধা দান থেকে বিরত হয় ও বশ্যতা স্বীকার করে।

যে সব লেখক পাশ্চাত্যের কাছে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরাজিত বিধায় 'ইসলামের জেহাদ' শুধুমাত্র আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমিত এই বলে ইসলামকে 'দোষমুক্ত' করার চেষ্টায় নিয়োজিত, তারা বিশ্বাসের ব্যাপারে বল প্রয়োগ না করা এবং

www.pathagar.com

মানুষের ইসলাম গ্রহণে বাধা দানকারী রাজনৈতিক শক্তিকে উৎখাত করা– ইসলামের এই দুটো নীতির পার্থক্য বুঝতে পারেনি, বরং এই দুটোর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। যে শক্তি মানুষকে জোরপূর্বক মানুষের গোলামী করতে বাধ্য করে এবং মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয়, সেই শক্তিকে উৎখাত করা ও মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বল প্রয়োগ না করা– এই উভয়টির মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই এবং তালগোল পাকানোর কোনো অবকাশ নেই। আসলে এ দুটো নীতির মোদ্দা কথা হলো, ইসলাম মানুষকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দানকে নিশ্চিত করতে চায়। সে নিজেও তার ওপর বলপ্রয়োগ করে না, অন্যকেও বল প্রয়োগ করতে দিতে চায় না। এভাবে তালগোল পাকানোর কারণেই তারা ইসলামের জেহাদকে 'প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের' মধ্যে সীমিত করে ফেলে। অথচ ইসলামের জেহাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এ যুগের মানুষদের মধ্যে যে সব উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়, যে সব উপকরণ এসব যুদ্ধ বিগ্রহকে উস্কে দেয়, তার সাথে ইসলামের জেহাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। ইসলামী জেহাদের কারণ খোদ ইসলামের অভ্যন্তরেই খুঁজে দেখতে হবে, খুঁজে দেখতে হবে ইসলাম পৃথিবীতে কী ভূমিকা পালন করতে এসেছে, কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় ইসলামকে ও রসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন।

সমগ্র বিশ্বজগতে আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সার্বভৌম শাসক, আইনদাতা, প্রভু ও প্রতিপালক– এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে মানুষের এবং নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মানুষের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। আল্লাহকে সর্ব জগতের প্রতিপালক ঘোষণা করার অর্থ হলো মানুষের সার্বভৌমত্বকে খতম করা এবং সকল মানবরচিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণা কর। অন্য কথায় বলা যায়, ইসলাম মানুষের খোদায়ীর অবসান ঘটাতে চায়। আর যেখানে শাসনের সর্বোচ্চ ও সর্বময় ক্ষমতা মানুষের হাতে এবং মানুষই তার সকল ক্ষমতার উৎস, সেখানে মানুষই মানুষের খোদা হয়ে বসে আছে বলে ইসলাম মনে করে। কেননা সেখানে মানুষ মানুষের ওপর সর্বময় প্রভুত্ব চালানোর কারণে সে আল্লাহর বিকল্প প্রভু ও খোদা হয়ে বসে। ইসলামের পক্ষ থেকে 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই' এই ঘোষণা দানের অর্থ হলো অবৈধভাবে আল্লাহর ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া প্রভুত্ব আল্লাহকেই ফেরত দেয়া। যারা এটিকে অবৈধভাবে হস্তগত করে মানুষের ইলাহ হয়ে বসে নিজেদের মনগড়া আইন দ্বারা মানুষকে শাসন করে, তারা কার্যত মানুষের ইলাহের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং জনগণ তাদের গোলামে পরিণত হয়। ইসলাম এই অন্যায় প্রভুত্ব ও অবৈধ গোলামী খতম করতে চায়। সে চায় পৃথিবীতে মানুষের রচিত আইন উৎখাত করে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে। কোরআনের ভাষায়,

'তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি আকাশেও ইলাহ এবং পৃথিবীতেও ইলাহ। 'শাসন ও বিচার ফয়সালার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই, তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো গোলামী করো না। এটাই সঠিক দ্বীন।'

www.pathagar.com

'বলো, হে আহলে কেতাব, এসো, আমরা এমন এক কথার ওপর একমত হই, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো যেন এবাদাত ও গোলামী না করি, তার সাথে অন্যকে শরীক না করি এবং আমরা একে অপরকে আল্লাহর বিকল্প প্রভু হিসাবে গ্রহণ না করি .....।'

পৃথিবীতে ইসলামী রাষ্ট্র এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না যে, কতিপয় নির্দিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তি কোনো দেশের সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার মালিক হয়ে বসলো, যেমনটি খৃষ্টীয় গীর্জা শাসিত রাষ্ট্রে হতো, অথবা থিওক্রাসি বা পবিত্র খোদায়ী শাসনের নামে এমন লোকদের শাসন কায়েম করা হলো, যারা দেবতাদের প্রতিনিধি বা মুখপাত্র। বরঞ্চ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় কেবল তখনই, যখন আল্লাহর আইনের নিরংকুশ শাসন কায়েম হয় এবং আল্লাহর আইন অনুযায়ী সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়।

আর পৃথিবীতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, অনৈসলামী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ, আল্লাহর আইনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা ও মানবরচিত আইন বাতিল করা– এসব কাজ কেবল বক্তৃতা বিবৃতি ও প্রচার দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না। কেননা বান্দাদের ওপর জোরপূর্বক নিজেদের প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়া ও আল্লাহর ক্ষমতাকে জবরদখলকারী লোকেরা শুধু বক্তৃতা শুনে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবে না। তা যদি হতো, তবে পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে নবীদের কাছে এর চেয়ে সহজ পন্থা আর কিছু ছিলো না। কিন্তু নবীদের ইতিহাস এবং আল্লাহর এই দ্বীনের ইতিহাস যুগ যুগ কাল ধরে যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে এসেছে, তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

আল্লাহকে সারাবিশ্ব জগতের একমাত্র সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন মনিব ঘোষণার মধ্য দিয়ে মানুষকে অন্য সকল দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়ার এই সার্বজনীন ঘোষণা কোনো তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও নেতিবাচক ঘোষণা ছিলো না। এটা ছিলো বাস্তব, ইতিবাচক ও আন্দোলনগত ঘোষণা। তাই প্রচার ও বক্তৃতার পাশাপাশি এর একটা আন্দোলন ও সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করাও জরুরী। এতে করে তা মানব জাতির বাস্তব অবস্থার সকল দিকের সাথে উপযুক্ত উপায় উপকরণ নিয়ে মিলিত ও সমন্বিত হতে পারবে।

পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য সমস্ত কর্তৃত্বের নাগপাশ থেকে মুক্তকারী আদর্শ হিসাবে ইসলাম যখন মানবসমাজের মুখোমুখি হয়, তখন তা একদিকে যেমন তাত্ত্বিক ও আদর্শিক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়, তেমনি সম্মুখীন হয় বস্তুগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শ্রেণীগত ও প্রজাতিগত বাধা বিপত্তিরও। উপরন্তু বিকৃত আকীদা বিশ্বাসও তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই সব বাধা বিপত্তি মিলিত হয়ে একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে।

বক্তৃতা বিবৃতি ও প্রচার দ্বারা যেখানে বাতিল আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারার মোকাবেলা করা হয়, সেখানে আন্দোলন ও সংগ্রাম দ্বারা সেই বস্তুগত বাধা বিপত্তির মোকাবেলা করা হয় যা জাহেলী উপাদানসমূহের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার আকারে বিদ্যমান। এই প্রচার ও আন্দোলন একত্রে গোটা সমাজব্যবস্থার আমুল ও পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। আর সমগ্র পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতিকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দান করার

www.pathagar.com

জন্যে এই উভয় জিনিস অর্থাৎ প্রচার ও আন্দোলন অপরিহার্য। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এর পুনরাবৃত্তি করা জরুরী মনে হচ্ছে।

আল্লাহর এই দ্বীন ইসলাম শুধু আরব জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর আলোচ্য বিষয় হলো গোটা মানব জাতি এবং এর কর্মক্ষেত্র হলো গোটা পৃথিবী। আল্লাহ তায়ালা শুধু আরবদের আল্লাহ নন, এমনকি তিনি শুধু মুসলমানদেরও আল্লাহ নন। তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু, মনিব, রব ও খোদা তথা 'রব্বুল আলামীন'। ইসলাম চায় গোটা বিশ্বজগতকে আল্লাহর একমাত্র অনুগত বানাতে। আর ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যের গোলামীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও মারাত্মক রূপ হলো, মানুষ কর্তৃক মানুষের তৈরী আইনের আনুগত্য করা। এটা সেই এবাদাত, যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে করা যায় না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইনের আনুগত্য করে, সে আল্লাহর দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যায়, চাই সে যতোই আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী বলে নিজেকে জাহির করুক। রসূল (স.) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, কারো আইন ও হুকুমের অনুসরণই এবাদাত। এ ধরনের এবাদাত আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে করার দরুনই ইহুদী ও খৃষ্টানরা মোশরেক হয়ে গেছে। কেননা তারা এক আল্লাহর হুকুম ও আইনের আনুগত্য করার পরিবর্তে অন্যদের আনুগত্য করেছে– যাদের আনুগত্য করতে আল্লাহ তায়ালা হুকুম দেননি।

তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জাহেলী যুগে খৃষ্টধর্ম গ্রহণকারী আদী ইবনে হাতেমকে যখন রসূল (স.) ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন তিনি সিরিয়ায় পালিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে তার বোন ও গোত্রের আরো কিছু লোক বন্দী হলো। রসূল (স.) তার বোনকে অনুগ্রহপূর্বক মুক্ত করে দিলে তিনি তার ভাইয়ের কাছে গিয়ে তাকে রসূল (স.)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। সহসা মদীনায় তার আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়লো। আদী গলায় একটা রূপোর ক্রুশ ঝুলিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন রসূল (স.) এ আয়াত পড়ছিলেন, ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের ধর্মীয় পন্ডিতদেরকে ও সংসার বিরাগীদেরকে আল্লাহর বিকল্প 'রব' বা প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছিলো।' আদি বলেন, আমি বললাম, তারা তো তাদের এবাদাত করে না। রসূল (স.) বললেন, 'অবশ্যই করে। ঐ পন্ডিতরা ও দরবেশরা তাদের জন্যে হালাল জিনিসকে হারাম করে এবং হারাম জিনিসকে হালাল করে এবং সাধারণ ইহুদী ও খৃষ্টানরা তার অনুসরণ করে। এই অনুসরণেরই নাম হচ্ছে এবাদাত।'

এখানে আল্লাহর উক্তির যে ব্যাখ্যা রসূল (স.) করেছেন, তা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, কারো আইন ও হুকুমের নিশর্ত আনুগত্য করাও এমন এবাদাত, যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। এরূপ আনুগত্যই একজন কর্তৃক আর একজনকে আল্লাহর বিকল্প প্রভু রূপে গ্রহণ করার শামিল। এ জিনিসটার উচ্ছেদের উদ্দেশ্যেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। পৃথিবীতে আল্লাহর গোলামী ছাড়া আর সব রকমের গোলামী থেকে মানুষকে স্বাধীন করাই ইসলামের উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

এ জন্যে বক্তৃতা ও আন্দোলনের মাধ্যমে ওই স্বাধীনতা ঘোষণার বিপরীত পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে পাল্টে দেয়া এবং সে সব রাজনৈতিক শক্তির ওপর আঘাত হানা ছাড়া ইসলামের উপায়ান্তর নেই, যারা মানুষকে মানবরচিত আইন মানতে বাধ্য করে এবং মানুষকে স্বাধীনভাবে ইসলামী আইন অনুযায়ী জীবনযাপন করতে দেয় না। এরপর ইসলাম এমন এক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যা জাহেলী বিজয়ী শক্তিকে উৎখাত করার পর মুক্তির আন্দোলনকে কার্যকরভাবে চালু হবার সুযোগ দেয়।

ইসলাম কখনো তার আকীদা ও আদর্শ গ্রহণে মানুষকে বাধ্য করতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু ইসলাম শুধু একটা আকীদা বিশ্বাসই নয়। বরং আগেই বলেছি যে, ইসলাম মানুষকে সৃষ্টির গোলামী থেকে মুক্তি দান সম্বলিত একটা সর্বাত্মক ও সর্বজনীন ঘোষণা। এর সর্বপ্রথম লক্ষ্য মানুষের ওপর মানুষের সার্বভৌম ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব পরিচালনা এবং মানুষ কর্তৃক মানুষের গোলামী করার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিলোপ সাধন। এই লক্ষ্য অর্জনের পর এবং জনগণের ওপর থেকে রাজনৈতিক চাপ অপসারণ ও তাদের মনমগযের কাছে সত্য ও মিথ্যার পরিষ্কার ও স্বচ্ছ বিবরণ দেয়ার পর ইসলাম তাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় যেন তারা স্বেচ্ছায় তাদের মনোনীত আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এই স্বাধীনতার অর্থ এমন কোনো লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতা নয়, যার ভিত্তিতে মানুষ তার প্রবৃত্তিকে নিজের খোদা বানিয়ে বসবে, একে অপরের গোলামী করতে শুরু করবে এবং একে অপরকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করবে। পৃথিবীতে শাসনব্যবস্থার ভিত্তিমূল এক আল্লাহর দাসত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং একমাত্র আল্লাহর আইন অনুসারেই তাকে চলতে হবে। এরূপ একটা শাসন ব্যবস্থার আওতায় জনগণ যে কোনো আকীদা তথা ধর্ম অবলম্বন করার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। এতে করে ওই সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক আনুগত্য পুরোপুরিভাবে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত থাকবে। মনে রাখা দরকার যে, 'দ্বীন' শব্দের অর্থ 'আকীদা' শব্দের অর্থ থেকে ব্যাপকতর। 'দ্বীন' হচ্ছে সামষ্টিক পরিচালনা ও শাসনব্যবস্থা। ইসলামে এটা আকীদা ও আদর্শের তথা ধর্মের আলোকেই পরিচালিত হয়। কিন্তু এটা আকীদার চেয়ে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি অনুগত থেকেও বিভিন্ন ব্যক্তি ও দল ইসলামের আকীদাকে গ্রহণ নাও করতে পারে। অর্থাৎ অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত থেকেও নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত ও আকীদা বিশ্বাস বজায় রাখতে পারে।

ইসলামের যে চরিত্র ও স্বভাব প্রকৃতি ওপরে বর্ণনা করা হলো, তা যে ব্যক্তি উপলব্ধি করে, তার পক্ষে এটাও অনুধাবন করা সহজ হয়ে যায় যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্যে সশস্ত্র যুদ্ধ ও প্রচারণা যুদ্ধ দুটোই অপরিহার্য। সে একথাও হৃদয়ংগম করতে পারবে যে, ইসলামের জেহাদ নিছক 'প্রতিরক্ষা যুদ্ধ' নয়, যেমন মানসিকভাবে পরাজিত লোকেরা প্রাচ্যবাদীদের রাজনৈতিক চাপ ও শঠতাপূর্ণ আক্রমণের মুখে

www.pathagar.com

ইসলামের জেহাদী আন্দোলনকে চিত্রিত করে থাকে। আসলে এ আন্দোলন ছিলো পৃথিবীতে মানুষের পূর্ণাংগ স্বাধীনতা ও মুক্তির পর্যায়ক্রমিক আন্দোলন।

আর যদি ইসলামের জেহাদী আন্দোলনকে প্রতিরক্ষামূলক আন্দোলন নামে আখ্যায়িত করা একান্তই জরুরী হয়ে পড়ে, তাহলে 'প্রতিরক্ষা' শব্দটার অর্থ পরিবর্তন করতে হবে এবং বলতে হবে যে, প্রতিরক্ষা বলতে বুঝায়, 'জাহেলী সমাজে অর্থনৈতিক, শ্রেণীগত ও জাতিগত বৈষম্যভিত্তিক রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা থেকে বেঁচে থাকা এবং মানব রচিত বিভিন্ন মতবাদ আকারে মানুষের স্বাধীনতাকে খর্বকারী শক্তির হাত থেকে মানুষকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করা।

'প্রতিরক্ষা' শব্দটির এই ব্যাপকতর বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি পৃথিবীতে ইসলামের জেহাদী অভিযাত্রাই বা কী কী কারণে সংঘটিত হয় এবং ইসলামের প্রকৃত পরিচয়ই বা কী। বস্তুত ইসলাম হচ্ছে এমন একটা সর্বজনীন ঘোষণা, যা দ্বারা মানুষের গোলামী থেকে মানুষের মুক্তি, বিশ্বব্যাপি মানুষের মনগড়া আইন ও বিধান দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান এবং আল্লাহর আইনের নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে যারা বর্তমান যুগে প্রচলিত প্রতিরক্ষা যুদ্ধের সংকীর্ণ অর্থের আলোকে ইসলামী জেহাদকে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ বলতে চায় এবং এ কথাও বলতে চায় যে, তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রে ওপর থেকে প্রতিবেশী দেশগুলোর আগ্রাসন প্রতিহত করাই ইসলামী জেহাদের সংঘাতময় ঘটনাবলীর উদ্দেশ্য ছিলো, তাদের এই চেষ্টা ইসলামের প্রকৃত পরিচয় যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারারই ফল। উপরন্তু এটা ইসলামের জেহাদের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের শঠতাপূর্ণ আক্রমন ও চলমান পরিস্থিতির চাপের সামনে পরাজয় বরণেরও ফল।

ভেবে দেখুন তো হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমানের যদি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য কর্তৃক আরব উপদ্বীপ আক্রান্ত হওয়ার আশংকা নাও থাকতো, তাহলেও কি তাঁরা ইসলামের দাওয়াতকে পৃথিবীর কোণে কোণে পৌছানোর চেষ্টা না করে চুপচাপ ঘরে বসে থাকতেন? আর এই দাওয়াতের পথে যখন সব রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, শ্রেণীগত ও বর্ণগত বাস্তব বাধা-বিপত্তি রয়েছে, তখন সেই সব বাধা বিপত্তি দূর করার সংগ্রাম ছাড়া কিভাবে এ দাওয়াতকে দিকে দিকে তারা ছড়িয়ে দিতেন?

বস্তুত যে দাওয়াত সারা পৃথিবীতে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তার সামনে এই সব বাস্তব বাধাবিপত্তি উপস্থিত হলে তাকে শুধু প্রচার ও বক্তৃতা বিবৃতির জোরে দূর করার চিন্তা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। জনগণ যদি এ দাওয়াতকে গ্রহণ বা বর্জনে স্বাধীন থাকতো, তাহলে এটা যথেষ্ট হতো। জনগণকে স্বাধীনভাবে বুঝানো যেতো এবং তারাও সব রকম চাপ ও প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। এরূপ ক্ষেত্রে 'লা ইকরাহা ফি দ্বীন' অর্থাৎ 'ইসলামে বল প্রয়োগের অবকাশ নেই' কথাটা যথার্থ। কিন্তু সেই সব বাস্তব বাধা যখন

www.pathagar.com

বিদ্যমান, তখন সবার আগে ঐ বাধাকে অপসারণ করা অপরিহার্য। যাতে শৃংখলমুক্ত পরিবেশে স্বাধীনভাবে মানুষকে বুঝানো যায়।

দাওয়াতের উদ্দেশ্য যখন বিদ্যমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মানুষকে কার্যকরভাবে মুক্ত করা এবং নিছক তাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রচারণা নয়, তখন দাওয়াতের সাফল্যের জন্যেই জেহাদ অপরিহার্য– চাই মুসলিম আবাসভূমি প্রতিবেশীদের আগ্রাসনের আশংকা থেকে মুক্ত থাক বা না থাক। কেননা ইসলাম যখন শান্তির অন্বেষণে ব্যাপৃত, তখন সে শুধু ইসলামী আকীদাবিশ্বাস অবলম্বনকারীদের আবাসভূমির নিরাপত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ সস্তা শান্তি চায় না। সে এমন শান্তি চায়, যার ফলে পৃথিবীতে শুধু আল্লাহর আইন ও বিধানের নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্যই চলবে, অন্য কিছু নয়। ইসলামের জেহাদী আন্দোলন আল্লাহর আদেশ বলে চালু হবার পর তা সর্বশেষে যে পর্যায়ে উপনীত হয়, সেটাই প্রকৃত বিবেচ্য বিষয়– মধ্যবর্তী বা প্রাথমিক স্তর নয়। ইমাম ইবনুল কাইয়েম এই সর্বশেষ স্তর সম্পর্কে বলেন, 'সূরা আত তাওবা নাযিল হবার পর রসূল (স.)-এর সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে কাফেররা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়– (১) যারা তাঁর সাথে যুদ্ধরত, (২) যারা তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং (৩) যারা ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে বশ্যতা স্বীকারকারী। এরপর চুক্তিবদ্ধ ও সন্ধিবদ্ধদের ভাগ্য ন্যস্ত হয় ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে। ফলে কাফেররা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হলো, যুদ্ধরত ও বশ্যতা স্বীকারকারী বা যিম্মী তথা অমুসলিম নাগরিক। আর যারা যুদ্ধরত ছিলো, তারা রসূল (স.) তথা ইসলামী রাষ্ট্রের ভয়ে ভীত হয়ে রইলো। এভাবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মোট তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হলো মুসলিম, বশ্যতা স্বীকারকারী অমুসলিম এবং যুদ্ধরত কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত। এ তিনটি শ্রেণীর যে পৃথক পৃথক অবস্থান ও ভূমিকা, তা ইসলামের স্বভাব প্রকৃতি ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিরাজমান পরিস্থিতির চাপের মুখে ও ধড়িবাজ প্রাচ্যবিদদের শঠতাপূর্ণ আক্রমণের মুখে যারা পরাজিত, তারা এ বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি।

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে মক্কায় ও হিজরতের পর মদীনায় প্রথম দিকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছেন। তিনি মুসলমানদেরকে বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের হাত যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে সংযত রাখ এবং নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও।' অতপর আরেক পর্যায়ে তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'যাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়, তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যুদ্ধ করার। কেননা তারা মযলুম। ...... (সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১) এরপর অনুমতি থেকে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে তাদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হলো শুধু প্রথম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে। যারা প্রথম আক্রমণ চালায়নি, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। বলা হলো, 'যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাদের সাথে যুদ্ধ করো।' এরপর হুকুম এলো, সমগ্র মোশরেক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। 'এবং সকল মোশরেকের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।' আরো বলা হলো, 'যে সব আহলে কেতাব আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহ তায়ালা

www.pathagar.com

ও তাঁর রসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে নিষিদ্ধ মানে না এবং সত্য দ্বীনের আনুগত্য করে না, তারা যতোক্ষণ না অবনত মস্তকে স্বহস্তে জিযিয়া দেবে, ততোক্ষণ তাদের সাথে লড়াই করো।' সুতরাং ইমাম ইবনুল কাইয়েমের মতানুসারে যুদ্ধ প্রথমে ছিলো নিষিদ্ধ, তারপর অনুমোদিত, তারপর প্রথম আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ফরয এবং সর্বশেষে আক্রমণকারী ও অনাক্রমণকারী নির্বিশেষে সকল মোশরেকের বিরুদ্ধে ফরয হলো।'

কোরআন ও হাদীসে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের দীর্ঘস্থায়ী জেহাদী ঘটনাগুলোতে জেহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে এতো অকাট্য বক্তব্য রয়েছে যে, এর উপস্থিতিতে ইসলামী জেহাদসংক্রান্ত সেই সব অপব্যাখ্যা মোটেই হৃদয়গ্রাহী হয় না, যা চলমান পরিস্থিতির চাপে ও কুচক্রী প্রাচ্যবাদীদের আগ্রাসনের মুখে মানসিকভাবে পরাজিত বিশ্লেষকরা দিয়ে থাকে।

জেহাদসংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ এবং জেহাদের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা ও অধ্যয়ন করার পর কোনো সুস্থ মস্তিষ্কধারী মানুষ এ মত পোষণ করতে পারবে না যে, ইসলামে জেহাদ কেবল বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে ও নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে করতে হয় এবং আত্মরক্ষার ও সীমান্ত রক্ষার মধ্যেই তাকে সীমিত রাখতে হয়।

জেহাদের অনুমতি দানকারী উপরোক্ত তিনটি আয়াতের দ্বিতীয়টিতেই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, পার্থিব জীবনের একটা চিরন্তন স্বাভাবিক মূলনীতি এই যে, পৃথিবী থেকে অশান্তি ও নৈরাজ্য দূর করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা এক মানুষের সাহায্যে আরেক মানুষকে প্রতিহত করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহ তায়ালা যদি মানুষের মধ্য থেকে একজনের সাহায্যে আরেকজনকে প্রতিহত না করতেন, তাহলে বহু মসজিদ, মন্দির ও গীর্জা ধ্বংস হয়ে যেতো। ....'

সুতরাং এটা কোনো অস্থায়ী ব্যবস্থা নয়, বরং চিরস্থায়ী ব্যবস্থা। পৃথিবীতে হক ও বাতিলের সহাবস্থান যে অসম্ভব সেটা একটা শাশ্বত সত্য। ইসলাম যখনই সমগ্র বিশ্বে আল্লাহর একক ও সর্বময় প্রভুত্ব কায়েম করার কথা ঘোষণা করবে, তখনই পৃথিবীতে যারা আল্লাহর ক্ষমতাকে অবৈধভাবে হস্তগত করেছে, তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেবে এবং কখনো তার সাথে আপোষ করবে না। ইসলাম মানুষকে ওই অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য থেকে মুক্ত করার জন্যে প্রত্যক্ষ নির্দেশ দেয়, প্রয়োজনে তাদেরকে ধ্বংস করার নীতি অব্যাহত রাখে। পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কখনো বন্ধ হয় না।

মক্কায় মুসলমানদেরকে সশস্ত্র জেহাদ থেকে নিবৃত্ত করার পেছনে সংগত কারণ ছিলো। কেননা মক্কায় প্রচারের স্বাধীনতা ছিলো। বনু হাশেম গোত্রের সংঘবদ্ধ তরবারিগুলো রসূল (স.)-এর জন্যে এতোটুকু নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছিলো, যাতে তিনি খোলাখুলিভাবে সবাইকে এই দাওয়াতের বাণী শুনাতে ও বুঝাতে পারেন। সেখানে এমন কোনো সুসংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছিলো না, যা

www.pathagar.com

তাঁকে ইসলাম প্রচার করা থেকে বা জনগণকে তা শ্রবণ থেকে বিরত রাখতে পারে। কাজেই এ পর্যায়ে শক্তি প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন ছিলো না। এ ছাড়া এই স্তরে আরো কিছু কারণ ছিলো, যা আমি সূরা নেসার ৭৭ নং আয়াতের তাফসীর প্রসংগে উল্লেখ করেছি। অকারণ কলেবর বৃদ্ধি এড়ানোর লক্ষ্যে এখানে তা আর উল্লেখ করলামনা। উৎসাহী পাঠকদেরকে অনুগ্রহপূর্বক সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ওদিকে মদীনায় হিজরতের পরের প্রথম দিককার সময়টিও সশস্ত্র লড়াই-এর উপযোগী ছিলো না। মদীনার অধিবাসী ইহুদীদের সাথে এবং মদীনার ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মোশরেকদের সাথে রসূল (স.) যে সব চুক্তি সম্পাদন করেন, তা ছিলো ওই স্তরেরই একটা স্বভাবজাত উপাদান এবং সশস্ত্র লড়াই থেকে মুসলমানদের বিরত থাকাই ছিলো তার লক্ষ্য।

এর প্রথম কারণ হলো, সেখানে প্রচারের সুযোগ অবশিষ্ট ছিলো। এমন কোনো রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সেখানে ছিলো না, যা প্রচারে বাধা দেয় এবং জনসাধারণের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সেখানকার সকল অধিবাসী নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় রসূল (স.)-এর নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছিলো। চুক্তিতে এই মর্মে সুস্পষ্ট অংগীকার লিখিত ছিলো যে, কোনো মদীনাবাসী রসূল (স.)-এর অনুমতি ব্যতিরেকে কারো সাথে কোনো সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করবে না, কোনো যুদ্ধ বাধাবে না এবং কোনো বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না। মদীনায় প্রকৃত ক্ষমতা যে মুসলিম নেতৃত্বেরই হাতে নিবদ্ধ ছিলো, তা সবাই জানতো। সুতরাং দাওয়াতের সুযোগ ছিলো অবারিত ও উন্মুক্ত এবং মানুষের যে কোনো মত, পথ ও বিশ্বাস অবলম্বনের পথে কোনো বাধা ছিলো না।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রসূল (স.) এই পর্যায়ে একান্তভাবে শুধু কোরায়শদের প্রতি মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলেন। কেননা তাদের ইসলামবিরোধিতাই আরবের অন্যান্য গোত্রের জন্যেও ইসলামে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিলো, যারা কোরায়শ গোত্রের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের পরিণতি কী দাঁড়ায় তা দেখার জন্যে প্রতীক্ষারত ছিলো। এ জন্যে রসূল (স.) ছোটো ছোটো 'সামরিক অভিযান' পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। হিজরতের ৭ম মাসে পবিত্র রমযানে হযরত হামযা (রা.)-এর নেতৃত্বে তিনি প্রথম 'ক্ষুদ্র সামরিক অভিযান' প্রেরণ করেন।

এরপর ক্রমাগত ছোট ছোট সামরিক অভিযান প্রেরণের পালা চলতে থাকে নবম মাসে, ত্রয়োদশ মাসে, ষোড়শ মাসে এবং আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে সপ্তদশ মাসে। এই শেষোক্ত সামরিক অভিযানটি প্রথমবারের মতো সশস্ত্র সংঘর্ষ ও হত্যাকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। এ হত্যাকান্ড নিষিদ্ধ মাসে সংঘটিত হওয়ার কারণে তা নিয়ে সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়!

'তোমার কাছে তারা নিষিদ্ধ মাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা নিদারুণ অপরাধ বটে। তবে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে জোরপূর্বক

www.pathagar.com

ফিরিয়ে রাখা...... তো আরো বড় অপরাধ। আর মানুষকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে রাখার ফেৎনা হত্যাকান্ড ঘটানোর চেয়েও মারাত্মক অপরাধ। ......' (আয়াত ২১৭)

এরপর ওই বছরেরেই রমযান মাসে সংঘটিত হয় বদরের ভয়াবহ যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধ নিয়েই নাযিল হয়েছে আলোচ্য সূরা আনফাল।

এই সময়কার পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করলে এ কথা বলার কোনোই অবকাশ থাকে না যে, প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে আত্মরক্ষাই ছিলো ইসলামী আন্দোলনের মূলনীতি, যেমনটি পরিস্থিতির চাপে ও কুচক্রী ওরিয়েন্টালিস্টদের আগ্রাসী অপপ্রচারের মুখে পরাজিত মানসিকতাধারীরা বলে থাকে।

ইসলামের সম্প্রসারণমুখী অগ্রাভিযানের পেছনে যারা নিছক প্রতিরক্ষামূলক কার্যকারণ অনুসন্ধান করে থাকেন, তারা নিশ্চিতভাবে প্রাচ্যবাদীদের তাত্ত্বিক আগ্রাসনের শিকার। এ তাত্ত্বিক আগ্রাসন দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা এমন এক সময়ে চালাচ্ছে যখন মুসলমানদের কোনো শক্তি সামর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তি তো নেই-ই, এমনকি সত্যিকার অর্থে ইসলামও তাদের মধ্যে নেই। তবে সেই সব ভাগ্যবান লোকের কথা স্বতন্ত্র, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এরূপ অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন এবং যারা পৃথিবীতে মানবজাতিকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য ছাড়া আর সকল কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ইসলামের উদার আহবানকে বাস্তবায়িত করতে বাস্তবে কাজ শুরু করেছে। এ সব ভাগ্যবান মানুষ ইসলামের জেহাদ সংক্রান্ত বিধানের পেছনে আত্মরক্ষার ওজুহাত খোঁজার পরিবর্তে নৈতিক কারণ অন্বেষণ করে থাকেন।

ইসলামের প্রতিষ্ঠার পেছনে পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে যে নৈতিক কারণসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার চেয়ে বেশী আর কোনো নৈতিক কারণ অনুসন্ধানের আবশ্যকতা নেই।

'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং নির্যাতিত নারী পুরুষ ও শিশুদের মুক্তির জন্যে লড়াই করো না? ....(সূরা আন নেসা আয়াত ৭৪, ৭৫ ও ৭৬)

'........ তাদের সাথে সেই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও যখন আর কোনো ফেতনা তথা অরাজকতা ও যুলুম অবশিষ্ট থাকবে না এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীন জয়ী হবে। (সূরা আনফাল, আয়াত ৩৮, ৩৯ ও ৪০ এবং সূরা তাওবার আয়াত ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩২)

এ আয়াতগুলোতে পৃথিবীতে আল্লাহর সর্বময় প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, মানবজীবনে আল্লাহর আইন ও বিধান বাস্তবায়ন, শয়তান ও তার রীতিনীতির উচ্ছেদ এবং মানুষকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধকারী মানুষের কর্তৃত্ব উৎখাতের পক্ষে অকাট্য যুক্তি আলোচিত হয়েছে। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলা হয়েছে যে, মানব জাতি শুধু আল্লাহর গোলাম, আর কারো নয়। তাই আল্লাহর আর কোনো বান্দার এ অধিকার নেই যে, নিজের শক্তি বলে তাদের ওপর নিজের মনগড়া আইন জারী করে। এই সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত হবার পর মানুষ আল্লাহর

www.pathagar.com

দ্বীনকে গ্রহণ করবে কি করবে না, সে ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। মানুষের গোলামী বর্জনের মাধ্যমেই সে আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব ও সর্বাত্মক আনুগত্যের প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছে।

এগুলো হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহর দাসদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহর একক দাসত্বের বন্ধনে অবদ্ধ করার পক্ষের যুক্তি। এ যুক্তির পরে অন্য কিছুর প্রয়োজন থাকে না। এ যুক্তিগুলো মুসলিম বীরদের মনেও উৎকীর্ণ ছিলো। তাই তাদের কেউ 'কী কারণে জেহাদে এসেছো' এ প্রশ্নের সম্মুখীন হলে এ কথা কখনো বলেননি যে, আমাদের দেশ বিদেশী আক্রমণের হুমকির সম্মুখীন, কিংবা মুসলমানদের ওপর রোমক ও পারসিকদের আগ্রাসন প্রতিহত করতে অথবা আমাদের দেশের সীমানা সম্প্রসারণ ও গনিমতের সম্পদ লাভের জন্যে এসেছি।

কাদেসিয়ার যুদ্ধে পারসিক বাহিনীর অধিনায়ক রুস্তম যখন রাবী ইবন আমের, হোযায়ফা ইবনে মুহসান এবং মুগীরা ইবনে শো'বাকে এক নাগাড়ে তিন দিন যাবত পালাক্রমে জিজ্ঞাসাবাদ করেন যে, কী উদ্দেশ্যে তোমরা এসেছো, তখন তারা যে জবাব দিয়েছিলেন, প্রত্যেক মুসলিম বীরই সে রকম জওয়াব দিতো। ওই তিন জনের জওয়াব ছিলো, 'আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন যেন আমরা তাঁর বান্দাদেরকে বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর বান্দা হবার আহ্বান জানাই, পৃথিবীর সংকীর্ণ পরিসর থেকে আখেরাতের বিস্তীর্ণ পরিসরে নিয়ে যাই ইসলামের ইনসাফের দাবী প্রতিষ্ঠিত করি। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির কাছে তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন। যে ব্যক্তি আমাদের এই দাওয়াতকে গ্রহণ করবে, আমরা তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করবো এবং তার ভূমি তার হাতে সোপর্দ করে দেবো। আর যে অস্বীকার করবে, তার সাথে যুদ্ধ করবো, যতোক্ষণ না বিজয়ী হই অথবা জান্নাতে যাই।'

বস্তুত ইসলামের স্বভাব প্রকৃতিতে এবং মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন পর্যায়ে অনুসরণের জন্যে বিদ্যমান তার বাস্তব বিধানে তার একটা মৌলিক ও স্বতন্ত্র ইতিবাচক যুক্তি রয়েছে। কোনো মুসলিম দেশ বা তার অধিবাসীদের ওপর কোনো দিক থেকে আগ্রাসনের ঝুঁকি না থাকলেও ওই মৌলিক যুক্তি প্রথম থেকেই বহাল রয়েছে। ইসলামী বিধানের প্রকৃতিতেই এ যুক্তি নিহিত রয়েছে এবং মানবসমাজে বিরাজমান বাস্তব সমস্যার সমাধানে এর স্বাভাবিক কার্যকারিতা বিদ্যমান। সুতরাং শুধু সাময়িক আত্মরক্ষার প্রয়োজনের মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়।

একজন মুসলমানের জন্যে যে কোনো পার্থিব স্বার্থের প্রলোভনমুক্ত হয়ে শুধু ওইসব নৈতিক মূল্যবোধের খাতিরে 'আল্লাহর পথে' জেহাদ করার উদ্দেশ্যে নিজের জান ও মাল বাজি রেখে বেরিয়ে পড়া নিসন্দেহে এক মহান ব্রত। এর জন্যে তার অন্য কোনো যুক্তির প্রয়োজন নেই।

একজন মুসলমান রণাঙ্গনে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগে নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে, কামনা বাসনার বিরুদ্ধে, নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে, বৃহত্তর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকে। ইসলামের পরিচয় ব্যতীত অন্য যে কোনো পরিচয়ের বিরুদ্ধে আল্লাহর

www.pathagar.com

দাসত্ব ব্যতীত অন্য যে কোনো দাসত্বের বিরুদ্ধে এবং আল্লাহর অধিকারকে জবরদখলকারী তাগুতী শক্তিসমূহকে উৎখাত করে পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর আইন প্রচলনের উদ্দেশ্যে সে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

পক্ষান্তরে যারা শুধুমাত্র 'মুসলিম আবাসভূমি' রক্ষার জন্যে ইসলামী জেহাদের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন, তারা 'ইসলামী আদর্শ ও বিধান'কে উপেক্ষা করেন এবং তাকে 'আবাসভূমি'র চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। অথচ এ ধারণা ইসলামের দৃষ্টিভংগির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ ধারণা ইসলামী চেতনা ও অনুভূতির সাথে বেমানান ও বেখাপ্পা। আসলে আকীদা বিশ্বাসও তা থেকে উদ্ভূত জীবনবিধান এবং এই জীবনবিধানের অনুসারী মানবগোষ্ঠীই হলো ইসলামী চেতনার কাছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। নিছক ভূমির কোনো গুরুত্ব ইসলামে নেই। ইসলামী চিন্তা চেতনায় ভূমির যদি কোনো মূল্য থেকে থাকে, তবে সেটা ওই ভূমিতে আল্লাহর বিধান কতোটা কার্যকর আছে তার ভিত্তিতেই। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়িত থাকলেই ওই ভূমি হবে 'দারুল ইসলাম' বা ইসলামের দেশ। ইসলামী আকীদা ও আদর্শের লালন ক্ষেত্র এবং ওই ভূমি থেকেই সূচনা হবে মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করনের অভিযাত্রার।

একথা সত্য যে, 'দরুল ইসলাম'কে রক্ষা করলে মুসলমানদেরই রক্ষা করা হয়। কিন্তু সেটা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। মুসলিম আবাসভূমিকে রক্ষা করা ইসলামী জেহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। ওটা শুধু ওই ভূমিতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যম মাত্র। আল্লাহর রাজত্বকে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার সংগ্রাম পরিচালনার ঘাঁটি হলেই ওই ভূমি ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যবান– অন্যথায় নয়। ইসলামের মূল প্রতিপাদ্য হলো মানুষ এবং ভূমি হলো তার বিশাল কর্মক্ষেত্র মাত্র।

আগেই বলেছি যে, পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার যে কোনো চেষ্টা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, সমাজ ব্যবস্থার পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। ইসলাম এই সব প্রতিবন্ধকতা সর্বশক্তি দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে চায়, যাতে সে জনগণের বিবেকের কাছে অবাধে নিজের বক্তব্য রাখতে পারে। এজন্যে সর্বপ্রথম সে জনগণকে বস্তুগত বাধাবিপত্তি থেকে মুক্ত করে এবং তারপর তাকে যে কোনো মত ও পথ গ্রহণের স্বাধীনতা প্রদান করে।

ইসলামের জেহাদ তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবাদীরা যে আগ্রাসী অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, তা দ্বারা আমাদের বিভ্রান্ত বা ভীত হওয়া উচিত নয়। বিশ্ব শক্তির মাপকাঠিতে প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে আমাদের এতোটা ঘাবড়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয় যে, আমরা ইসলামের জেহাদ নীতির জন্যে ইসলামের স্বভাববিরোধী কিছু নৈতিক যুক্তির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হব এবং তাকে সাময়িক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করবো।

ইসলামের ঐতিহাসিক বাস্তবতার কথা বিবেচনায় রেখে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এর স্বভাব প্রকৃতিতে এবং এর বাস্তব জীবনবিধানেই জেহাদের আবশ্যকতা সুপ্ত রয়েছে এবং এ আবশ্যকতাকে সাময়িক আত্মরক্ষার আবশ্যকতার সাথে মিলিয়ে জগাখিচুড়ি করা যায় না। এ কথা সত্য বটে যে, আগ্রাসন

www.pathagar.com

পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করে ইসলামের উপায় থাকে না। কেননা পৃথিবীতে আল্লাহর সর্বময় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার গোলামী থেকে মুক্তিদানের সংকল্প প্রকাশের মাধ্যমে ইসলাম যদি নিজের অস্তিত্বের ঘোষণাও দেয় এবং বাস্তব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে তাহলে পৃথিবীতে ইসলামের এরূপ অস্তিত্বের বিদ্যমানতাও সমকালীন জাহেলিয়াত বরদাশত করতে পারে না, মানুষ কর্তৃক মানুষের দাসত্বের নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমকালীন জাহেলী সমাজ ব্যবস্থা এ ধরনের ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে যে উঠে পড়ে লেগে যাবে, তা অবধারিত। কেননা এটা জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই প্রয়োজন। আর এমতাবস্থায় নতুন ইসলামী সমাজের পক্ষে নিজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করে গত্যন্তর থাকে না।

এটা একটা অনিবার্য ব্যাপার। ইসলামের জন্মের সাথেই এর জন্ম হয়ে থাকে। ইসলামের ঘাড়ে এ যুদ্ধ অবধারিতভাবেই চেপে বসে। সে ইচ্ছা না করলেও এ যুদ্ধে তাকে লিপ্ত হতেই হয়। এ হচ্ছে এমন দুটো সত্ত্বার স্বাভাবিক সংঘাত, মুহূর্তের জন্যেও যাদের সহাবস্থান সম্ভব নয়।

এ সবই সত্য কথা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তার ওপর চাপিয়ে দেয়া প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে।

তবে এখানে এর চেয়েও অধিকতর মৌলিক একটা সত্য নিহিত রয়েছে। সেটি এই যে, পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের গোলামী থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সামনে এগিয়ে যাওয়া ইসলামের অস্তিত্বের একটা স্বভাবগত দাবী। এই অগ্রাভিযানে সে কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা মানতে পারে না এবং কোনো বর্ণ বা বংশগত জাতিসত্ত্বার মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না। নিজেকে এভাবে সীমিত গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে সে পৃথিবীর অন্য অধিবাসীদের মানুষের ঘৃণ্য গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হতে দিতে পারে না।

ইসলামের শত্রুদের জীবনে কখনো এমন সময় আসাও বিচিত্র নয় যখন সে ইসলামের ওপর আগ্রাসী আক্রমণ না চালানোকেই হয়তো অগ্রাধিকার দেবে। ইসলাম যদি তাদেরকে তাদের আঞ্চলিক সীমার ভেতরে মানবরচিত আইন চালাতে দেয় এবং তাদেরকে তার আকীদা ও আদর্শের দাওয়াত না দেয়, তাহলে এমন একটা অনাক্রমণের নীতি মেনে চলতে বাতিল শক্তি কোনো এক সময় রাযী হয়েও যেতে পারে। কিন্তু ইসলাম কোনো অবস্থাতেই তাকে এই ছাড় দিতে বা তার সাথে আপোষ করতে পারে না যতোক্ষণ না সে ইসলামের আধিপত্যের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে কর দিতে প্রস্তুত হবে এবং এভাবে কোনো বাধা বিঘ্ন ছাড়াই সেখানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর পথ উন্মুক্ত করে দেবে।

এটা ইসলামের শুধু স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য নয়, বরং মানবজাতিকে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য সকলের গোলামী থেকে মুক্ত করার শাশ্বত ঘোষণা দাতা হিসাবে এটা তার কর্তব্যও বটে।

www.pathagar.com

ইসলামী জেহাদের সপক্ষে অকাট্য যুক্তি কেবল তখনই স্পষ্টভাবে ও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যাবে যখন এ কথা হৃদয়ংগম করা হবে যে, ইসলাম সমগ্র মানব জাতির জন্যে আল্লাহর রচিত জীবন বিধান– কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠী বিশেষের জন্যেও নয় এবং শ্রেণী বা গোষ্ঠী বিশেষ কর্তৃক রচিতও নয়। আমরা জেহাদের বহিরাগত কারণ অনুসন্ধানে তখনই ব্যাপৃত হয়ে থাকি, যখন উপরোক্ত ধারণা আমাদের চেতনা থেকে লুপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এই মহা সত্যটি স্মরণ রাখে, তার পক্ষে ইসলামী জেহাদের অন্য কোনো যুক্তি অন্বেষণ করা সম্ভব নয়।

ধারণা করা যেতে পারে যে, ইসলাম স্বেচ্ছায় না হলেও বাধ্য হয়ে একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলো। কেননা অন্যান্য জাহেলী সমাজের উপস্থিতিতে তার অস্তিত্বই তাদের জন্যে যথেষ্ট উস্কানি বহন করতো এবং তারা তার ওপর আক্রমণ না করেই ছাড়তো না। আবার এমনও ধারণা করা যেতে পারে যে, ইসলাম নিজেই প্রথমে লড়াইয়ের সক্রিয় উদ্যোগ না নিয়ে পারেনি। প্রাথমিক বিবেচনায় এই দুই ধারণার মধ্যে তেমন বড় কোনো পার্থক্য নেই। কেননা উভয় অবস্থায়ই সে অনিবার্যভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। কিন্তু দুই ধারণার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় তা ইসলামের চেতনায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করে।

ইসলামকে দু'ভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমত তা এমন এক ঐশী জীবনব্যবস্থা, যা পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহকে সর্বময় প্রভু এবং মানবজাতিকে একমাত্র তাঁরই গোলাম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছে। আর এই জীবন ব্যবস্থাকে সে এমন একটা বাস্তব মানবীয় সামাজিক অবকাঠামোতে রূপান্তরিত করতে চায়, যার ভেতরে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ শুধু আল্লাহর গোলাম হবে এবং কোনো মানুষের গোলাম হবে না। তাই ওই সামাজিক অবকাঠামোতে আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনো আইন কার্যকর হবে না। যদি এই বিবেচনাটাই সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়, তা হলে ইসলাম নিশ্চয়ই তার পথ থেকে সকল বাধা দূর করার অধিকার রাখে, যাতে সে বিনা বাধায় মানুষের কাছে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে। তার এ কাজে দেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে বাধা আসুক অথবা সামাজিক পর্যায় থেকে বাধা আসুক, সে বাধাকে গুঁড়িয়ে দেয়ার ন্যায্য অধিকার তার রয়েছে। দ্বিতীয়ত, তা একটা নির্দিষ্ট ভূখন্ডের স্থানীয় ব্যবস্থা। সে ক্ষেত্রে তার শুধু তার সীমার অভ্যন্তরে বসে যে কোনো বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের অধিকার থাকে। উল্লিখিত দুটো ধারণারই প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। ইসলাম যদিও উভয় অবস্থাতেই জেহাদ করবে। কিন্তু এই জেহাদের প্রেরণা, উদ্দেশ্য ও ফলাফল দুই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠীর বা কোনো নির্দিষ্ট ভূখন্ডের জীবনব্যবস্থা নয়, বরং বিশ্বপ্রভু আল্লাহর রচিত এ জীবনব্যবস্থা গোটা বিশ্বের জন্যে। তাই প্রথমে সক্রিয় হয়ে মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্নকারী সকল সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বাধা বিপত্তি অপসারণের অধিকার ইসলামের রয়েছে। অবশ্য সে তার আকীদা বিশ্বাসকে গ্রহণ করার জন্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কারো ওপর চাপ সৃষ্টি করে না। সে শুধু

www.pathagar.com

এতোটুকুই ছাড় দিয়ে থাকে- এর চেয়ে বেশী নয়। যে সমস্ত সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-ব্যবস্থা জনগণের ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে এবং মানুষকে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধা দেয়, এধরণের সকল দূর করা তার শুধু ন্যায্য অধিকারই নয় বরং তার ওপর অর্পিত অপরিহার্য্য দায়িত্ব।

মানুষকে আল্লাহর গোলামদের গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর বান্দায় পরিণত করা ইসলামের ন্যায় সংগত অধিকার। কেননা সূচনাতেই সে যে আল্লাহকে সারা বিশ্ব জগতের একমাত্র রব ও প্রতিপালক বলে ঘোষণা করেছে এবং সকল মানুষকে স্বাধীনতা দানের সংকল্প ব্যক্ত করেছে, সেই সংকল্প বাস্তবায়নের একমাত্র উপায় হলো মানুষকে আল্লাহর বান্দায় পরিণত করার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ। আর মানুষকে আল্লাহর বান্দায় পরিণত করা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতা ব্যতীত কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়- ইসলামের দৃষ্টিতেও নয়, বাস্তবতার দৃষ্টিতেও নয়। কারণ একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই আল্লাহর সেই আইন চালু হয়ে থাকে, যা তিনি তাঁর সকল বান্দার উপযোগী করে রচনা করেছেন। শাসক শাসিত, সাদা কালো, ধনী গরীব সকলের জন্যে ইসলামের একই আইন কার্যকর হয় অথচ ইসলাম ছাড়া অন্যান্য বিধি ব্যবস্থায় মানুষ তারই মতো সমমর্যাদার অধিকারী মানুষের গোলামী করে থাকে।

ইসলাম শুধু একটা অকীদা-বিশ্বাস বা মতবাদ নয় যে, তা কোনো প্রচার মাধ্যম দ্বারা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়াই যথেষ্ট হবে। ইসলাম হচ্ছে একটা পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এ জীবনব্যবস্থা এমন একটা আন্দোলনমুখী সুসংগঠিত সমাজের আকারে আত্মপ্রকাশ করে, যা সকল মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতা দানের জন্যে সক্রিয় অভিযান চালায়। ইসলামী সমাজ ছাড়া অন্যান্য সমাজ ইসলামকে এমন সুযোগ দেয় না যাতে সে তার বিধান অনুসারে এ সব সমাজের লোকদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারে। তাই মানুষের স্বাধীনতার পথের বাধা এই সব সমাজব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করা ইসলামের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এটাই হলো, 'সমস্ত আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার' প্রকৃত মর্মার্থ। এতে করে আল্লাহর কোনো বান্দার প্রতি অন্য বান্দাদের নিশর্ত আনুগত্য থাকবে না, যেমনটি থাকে মানবরচিত জীবনব্যবস্থায়। সমকালীন যে সমস্ত ইসলামী গবেষক বর্তমান বিজয়ী বাতিল সমাজ ব্যবস্থা ও কুচক্রী প্রাচ্যবাদীদের দুরভিসন্ধিমূলক অপপ্রচারণার প্রভাবের কাছে পরাজিত, তারা ওই সত্যটি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। কারণ প্রাচ্যবাদীরা ইসলামকে এমন একটা আন্দোলন হিসাবে চিত্রিত করেছে, যা তরবারির জোরে মানুষকে তার আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। অথচ ওই সকল ঘৃণ্য প্রাচ্যবাদী ভালোভাবেই জানে যে, তাদের ওই কথা সত্য নয়। তবু তারা এভাবে ইসলামী জেহাদের উদ্দীপনার উৎসগুলোকে বিকৃত করার চেষ্টা করে। আর এরই প্রভাবে ইসলামের দুর্নামের ভয়ে ভীত হয়ে এক শ্রেণীর মুসলিম বুদ্ধিজীবী এই অভিযোগ খন্ডন করার প্রয়াসে আত্মরক্ষামূলক যুক্তির আশ্রয় নেয়। অথচ তারা ইসলামের স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে তার দায়িত্ব ও অধিকারের কথা ভুলে যায়।

www.pathagar.com

পরাজিত মানসিকতাসম্পন্ন গবেষকদের চিন্তাধারার ওপর 'ধর্মের' প্রকৃতি সম্পর্কে যে পাশ্চাত্য ধারণাটা সওয়ার হয়ে আছে তা এই যে, ধর্ম হলো নিছক অন্তরে বিদ্যমান ব্যক্তিগত আকীদা বিশ্বাস। এর সাথে জীবনের বাস্তব কর্মক্ষেত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই ধর্মের জন্যে জেহাদের আবশ্যকতার কথা বললেই তারা মনে করে, জনগণের বিবেকের ওপর ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে বল প্রয়োগে চাপিয়ে দেয়ার কথাই বলা হচ্ছে। অথচ ইসলামের আসল ব্যাপার মোটেই তা নয়। আসল ব্যাপার হলো ইসলামের জন্যে যে জেহাদ, তা হচ্ছে ইসলামের আইন ও বিধি-ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জেহাদ বা সংগ্রাম। কিন্তু ইসলামের মূল আকীদা-বিশ্বাস চাপিয়ে দেয়ার জন্যে কোনো জেহাদ বা সংগ্রাম করতে বলা হয়নি। আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করা বা না করা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তবে এই স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে এমন কোনো উপাদান থেকে থাকলে তা অপসারণের জন্যে সে প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেটা ওই পর্যন্তই। স্বাধীনতা ক্ষুণ্নকারী উপাদান দূর হওয়ার পর সে মানুষের বিবেককে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। সুতরাং ধর্ম সংক্রান্ত পাশ্চাত্যের ও ইসলামের ধ্যান ধারণায় মৌলিক পার্থক্য রয়েছে এবং এর ইসলামী চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা ও অভিনব।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিয়োজিত মুসলিম সমাজকে আল্লাহ তায়ালা যদি কিছু কালের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে বিরত রাখেন, তাহলে সেটা নীতিগত নয়; বরং কৌশলগত ব্যাপার বলে পরিগণিত হবে। সেটা হবে আন্দোলনের চলমান স্তরের দাবী ও চাহিদার ব্যাপার মাত্র, আদর্শ ও আকীদাগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার নয়। এই সুস্পষ্ট নীতিগত বিশ্লেষণের আলোকে ইতিহাসের নিত্য নতুন স্তরে আমরা কোরআনের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে পারি। এসব বক্তব্যের আলোকে ইসলামী আন্দোলনের সুদীর্ঘ ও অপরিবর্তনীয় মূলনীতির সাধারণ দাবী ও নির্দিষ্ট স্তরের সাময়িক দাবী একেবারেই স্বতন্ত্র। এ দুই দাবীকে মিলিয়ে একাকার করে ফেলার কোনো অবকাশ নেই।

এরপর ইসলামী জেহাদের প্রকৃতি ও ইসলামী জীবন বিধানের প্রকৃতি সম্পর্কে আরো কিছু কথা অবশিষ্ট থেকে যায়। এ ব্যাপারে আমাদেরকে অত্যন্ত মূল্যবান ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপহার দিয়েছেন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর 'আল্লাহর পথে জেহাদ' শীর্ষক পুস্তিকায়। এই পুস্তিকা থেকে আমাদের একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইসলামী আন্দোলনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে নির্ভুল ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভে আগ্রহী পাঠকদের জন্যে এ উদ্বৃতিগুলো অত্যন্ত জরুরী। সাইয়েদ মওদূদী বলেন,

'সাধারণত ইংরেজী ভাষায় জেহাদ শব্দের অনুবাদ 'হোলি ওয়ার' বা পবিত্র যুদ্ধ করা ইংরেজদের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু দীর্ঘকাল যাবত এ শব্দটির এমন অবাঞ্ছিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে যে, এটা এখন উন্মত্ততা, 'হিংস্রতা', 'রক্তপাত' ও 'অসভ্যপনার' প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে। এ শব্দটা শোনার সাথে সাথে শ্রোতার কল্পনার দৃষ্টিতে এমন এক ভয়াবহ দৃশ্য ভেসে ওঠে যেন ধর্মোন্মাদদের একটা দল

রক্ত-পিপাসু চোখে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে দিতে ধেয়ে আসছে আর কাফেরদের পাওয়া মাত্র গ্রেফতার করে তাদের ঘাড়ে তলোয়ার রেখে বলছে, 'কলেমা পড়, নতুবা এখনই তোর মস্তক ছেদন করা হবে। মতলববাজ লেখকরা শঠতার সাথে আমাদের এরূপ চিত্র এঁকেছে এবং তার সাথে মন্তব্য জুড়ে দিয়েছে যে, 'এ জাতির ইতিহাস থেকে রক্তের গন্ধ আসে।'

'বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আমাদের এ চিত্র যারা এঁকেছে, তারা নিজেরাই বিগত কয়েক শতাব্দীকাল যাবত মারাত্মক নোংরা যুদ্ধে (Unholy war) লিপ্ত রয়েছে। তাদের চরিত্র এতো জঘন্য ও বীভৎস যে, তারা সম্পদ ও শক্তির লোভে সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দস্যুর ন্যায় সারা পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা সর্বত্র ব্যবসায়ের বাজার, কাঁচামাল, উপনিবেশ স্থাপনের অঞ্চল ও মূল্যবান দ্রব্যাদির খনি সন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছে। লালসার আগুনের ইন্ধন সংগ্রহ করে তাকে চির প্রজ্বলিত রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের এ যুদ্ধ আল্লাহর পথে নয়, বরং উদরের পথে। লালসা ও লোভের পংকিল পথেই তাদের সকল চেষ্টা নিয়োজিত। ....'

'তাদের এ কীর্তিকলাপ তো আধুনিক যুগের। সাম্প্রতিক কালের প্রত্যেকটি দিন ও রাতে সভ্য জগতের অধিবাসীদের চোখের সামনেই তাদের হীন কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা এক কথায় পৃথিবীর একটি অংশও এই লালসা পংকিল যুদ্ধলিপসু জাতির নিষ্ঠুর আক্রমণের আঘাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। তথাপি তারা আমাদের চিত্র এতো বিভীষিকাময় করে এঁকেছে যে, তাদের নিজস্ব কদর্য চিত্র তার অন্তরালে ঢাকা পড়ে গেছে।'

'পক্ষান্তরে আমাদের সরলতা বড়ই মর্মান্তিক। শত্রুপক্ষ কর্তৃক আমাদের চিত্র দেখে আমরা এতোদূর ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি যে, তার পশ্চাতে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্বয়ং চিত্র নির্মাতাদের চেহারাটা দেখার কথা পর্যন্ত আমরা একদম ভুলে গেছি। আমরা বরং কাতর কন্ঠে ও অনুতাপের সাথে বলতে শুরু করেছি যে, 'হুযুর, যুদ্ধ ও প্রাণনাশের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তো বৌদ্ধ ভিক্ষু, পাদ্রী ও দরবেশদের ন্যায় শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রচারক মাত্র। নির্দিষ্ট কয়েকটা বিশ্বাসের প্রতিবাদ এবং তদস্থলে অপর কয়েকটা আকীদা-বিশ্বাসের প্রচার ও লোকদেরকে তা মানার আবেদন জানানোই আমাদের কাজ। তরবারির সাথে তো আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ হয়তো আমরা কখনো কখনো অন্যদের আগ্রাসনের শিকার হওয়ার কারণে নিয়ে ফেলেছি। তবে সে সব তো অনেক দিন আগের কথা। এখন আমরা তাও বাদ দিয়েছি। এমনকি আপনাদের যাতে অস্বস্তি দূর হয় ও শান্তিতে ঘুমাতে পারেন, সেজন্যে জেহাদকে আমরা সরকারীভাবে বাতিল করে দিয়েছি। এখন. শুধু মুখ ও লেখনীর মধ্যেই ধর্ম প্রচারকে সীমিত রেখেছি। কামান, বন্দুক ও গোলাবারুদ ব্যবহার তো আপনাদের কাজ। মুখ ও কলম প্রয়োগই আমাদের একমাত্র উপায়।'

www.pathagar.com

'শুধু রাজনৈতিক কূটকৌশলের পরিণামেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সে সব কারণে আল্লাহর পথে জেহাদের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করা কেবল অমুসলমানই নয় বরং মুসলমানদের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় ব্যাপারটা যাচাই করলে তাতে দুটি প্রধান ও মৌলিক ভুল ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম ভুল ধারণা এই যে, ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের ন্যায়, সাধারণত যে অর্থে ধর্ম শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তদনুযায়ী নিছক একটা ধর্ম বলে মনে করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় ভুল ধারণা এই যে, মুসলমানদেরকে অন্যান্য জাতির ন্যায় সাধারণত যে অর্থে জাতি শব্দটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে তদনুযায়ী নিছক একটা জাতি মনে করা হয়েছে।'

'এই দুটো ভ্রান্ত ধারণা শুধু জেহাদের ব্যাপারটাই নয়, বরং গোটা ইসলামের রূপকেই পরিবর্তিত ও বিকৃত করে দিয়েছে এবং অনেকের জন্যে ইসলামী জেহাদের তাৎপর্য অনুধাবন করার পথ বাধাগ্রস্ত করে দিয়েছে। এমনকি পৃথিবীতে মুসলমানদের স্থান ও মর্যাদাও সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট করে ফেলেছে।'

'সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী ধর্ম বলতে কতকগুলো আকীদা-বিশ্বাস ও কয়েকটা এবাদাত অনুষ্ঠানের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু বুঝা যায় না। এ অর্থের দিক দিয়ে ধর্ম নিসন্দেহে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। এমতাবস্থায় যে কোনো আকীদা মনে স্থান দেয়া, মন যার এবাদাত করতে ইচ্ছুক তারই এবাদাত করা, যেভাবে ইচ্ছা তাকে ডাকা ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যেক ব্যক্তিই লাভ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট ধর্মের জন্যে খুব বেশী দরদ ও প্রেম বোধ করলে পৃথিবী ব্যাপী নিজ আকীদার প্রচার করা এবং অন্যান্য আকীদাপন্থীদের সাথে বিতর্ক ও বাহাস করার অধিকারও তার রয়েছে। এতোটুকু কাজের জন্যে অস্ত্র ধারণ করার কী প্রয়োজন থাকতে পারে? লোকদেরকে মারধোর করে তো কোনো আকীদার প্রতি বিশ্বাস জন্মানো যায় না।

'বস্তুত ইসলামকে যদি সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী একটা 'ধর্ম' হিসেবেই মেনে নেয়া হয় এবং ইসলাম যদি আসলেই তাই হয়, তাহলে বাস্তবিকপক্ষে জেহাদের সমর্থনে কোনো সংগত যুক্তিই পেশ করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে 'জাতি' বলতে সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট এমন একটা জনসমষ্টিকে (A homogeneous group of men) বুঝায়, যারা কয়েকটা মৌলিক ব্যাপারে অংশীদার হওয়ার কারণে একত্রিত এবং অন্যান্য সমষ্টি থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ অর্থের দিক দিয়ে যে মানব সমষ্টি একটা জাতির মর্যাদা পাবে, তাদের পক্ষে তরবারি ধারণ তথা সশস্ত্র সংগ্রাম করার মাত্র দুটো কারণই থাকতে পারে। এক, তাদের ন্যায়সংগত অধিকার হরণ করার জন্যে কেউ তাদের ওপর আক্রমণ করলে। দুই, তারা নিজেরাই অপরের ন্যায়সংগত অধিকার কেড়ে নেয়ার জন্যে আক্রমণ করতে চাইলে। প্রথম অবস্থায় তরবারি ধারণের কিছু না কিছু নৈতিক বৈধতা রয়েছে, যদিও কোনো কোনো শান্তিবাদীর দৃষ্টিতে এটাও অন্যায় ও অবৈধ। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাটাকে চরম ডিক্টেটর ছাড়া আর কেউ বৈধ বলে দাবী করতে পারে না। এমনকি আমেরিকা ও বৃটেনের ন্যায় বিশাল সাম্রাজ্যের কূটনীতিকরাও একে সংগত বলার ধৃষ্টতা দেখাবে না।'

www.pathagar.com

'সুতরাং ইসলাম যদি নিছক একটা ধর্ম হয়ে থাকে এবং মুসলমান যদি নিছক একটা জাতি হয়, তবে জেহাদ কিছুতেই সর্বোত্তম এবাদাত হতে পারে না। বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তার অর্থহীনতা ও অযৌক্তিকতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আসলে ইসলাম কোনো ধর্ম নয় এবং মুসলমানও প্রচলিত অর্থে নিছক কোনো জাতির নাম নয়। ইসলাম একটা বিপ্লবী মতাদর্শ। সমগ্র পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে তার নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী নতুন করে তা ঢেলে গঠন করাই ইসলামের চরম ও পরম লক্ষ্য। আর মুসলমান একটা আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দল বিশেষ (International Revolutionary party)। ইসলামের বাঞ্ছিত কার্যসূচী বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সংঘবদ্ধ করা হয়েছে। আর এ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যে ইসলামী দলের বিপ্লবী চেষ্টা সাধনা ও চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগের (Revolutionary struggle) নামই জেহাদ।'

'অন্যান্য বিপ্লবী মতাদর্শের ন্যায় ইসলামও সাধারণভাবে প্রচলিত শব্দ পরিত্যাগ করে নিজস্ব একটা পরিভাষা ব্যবহার করেছে। ফলে তার বিপ্লবী ধারণা প্রচলিত সাধারণ ধারণা হতে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। জেহাদ শব্দটাও এই বিশেষ পরিভাষার অন্যতম। 'হারব' (যুদ্ধ) বা এই অর্থবোধক অন্য কোনো আরবী শব্দ ইসলাম স্বতপ্রবৃত্ত হয়েই ব্যবহার করেনি। এর পরিবর্তে সে ব্যবহার করেছে 'জেহাদ' শব্দটা। এটা সংগ্রামের সমার্থক, বরং এর আধিক্যের অর্থ জ্ঞাপক। কিন্তু পুরনো ও সাধারণ প্রচলিত শব্দ ত্যাগ করে এই নতুন শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো। এর একমাত্র উত্তর হলো, ব্যক্তি কিংবা দলসমূহের পংকিল স্বার্থ উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও সাম্রাজ্যগুলো যে সব যুদ্ধ ও গণহত্যা চালিয়েছে, যুদ্ধ শব্দটা সেটাই বুঝাবার জন্যে চিরদিন ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এ সব যুদ্ধের লক্ষ্য হয়ে থাকে ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধি। কিন্তু ইসলামের যুদ্ধ এ ধরনের নয় বলে গোড়াতেই এ শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। বিশেষ কোনো জাতির লাভ বা ক্ষতি সাধন এর লক্ষ্য নয়। দেশের ওপর কোন শাসকের শাসন চলবে সে বিষয়েও তার ভ্রুক্ষেপ নেই। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে শুধু মানবতার কল্যাণ সাধন। এই কল্যাণের জন্যে ইসলাম একটা বিশেষ আদর্শ ও বাস্তব কর্মসূচী পেশ করেছে। এই নীতি ও মতাদর্শের বিপরীত যেখানেই যে শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, ইসলাম তাকেই নির্মূল করতে চায়– তা যে জাতি বা দেশেই হোক না কেন। ইসলাম তার নিজস্ব আদর্শ ও কর্মসূচী অনুযায়ী নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কে তার পতাকা বহন করছে, আর কার শাসন ও কর্তৃত্বের ওপর তার চরম আঘাত পড়ে, সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। ইসলাম চায় গোটা পৃথিবী, পৃথিবীর কোনো অংশ নয়। কিন্তু বিশেষ কোনো জাতি বা বহু জাতির হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অন্য কোনো বিশেষ জাতির হাতে তুলে দেয়া ইসলামের লক্ষ্য নয়। এর একমাত্র লক্ষ্য হলো, গোটা মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্যে সৃষ্টিকুলের একচ্ছত্র অধিপতির পক্ষ থেকে প্রদত্ত যে জীবনবিধান রয়েছে– যার নাম ইসলাম– তার দ্বারা সমগ্র

www.pathagar.com

বিশ্বমানবকে পরিতৃপ্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ করতে হবে। এই মহান উদ্দেশ্যে বিপ্লব সৃষ্টির অনুকূলে ইসলাম সমগ্র কার্যকর শক্তিকেই প্রয়োগ করতে চায়। এভাবে সমস্ত শক্তি প্রয়োগের সমষ্টিগত নামই হচ্ছে জেহাদ। মুখের ভাষা ও লেখনীর সাহায্যে মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগিতে পরিবর্তন সাধন এবং তার মধ্যে অন্তর্বিপ্লব সৃষ্টি করাকেও জেহাদ বলা যায়। অস্ত্রশক্তি প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠিত বাতিল জীবনব্যবস্থাকে নির্মূল করে নবতর সুবিচারমূলক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাকেও জেহাদ বলা হয়। এই পথে ধনসম্পদ ব্যয় ও শারীরিক শক্তি-সামর্থ নিয়োগ করাও জেহাদ।

'কিন্তু ইসলামের জেহাদ কোনো উদ্দেশ্যহীন জেহাদ নয়। এ জেহাদ হবে শুধু আল্লাহর পথে। 'আল্লাহর পথে' কথাটা এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ শব্দ দুটো ইসলামের বিশেষ পরিভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য 'আল্লাহর পথে' কথাটা দ্বারা অনেকের মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তারা মনে করেছে যে, মানুষকে জোরপূর্বক ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসে দীক্ষিত করাই বুঝি আল্লাহর পথে জেহাদ। সংকীর্ণমনা লোকেরা 'আল্লাহর পথে' কথাটার এই বিকৃত অর্থই গ্রহণ করেছে। কারণ এ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ তাদের মনে স্থান পায়নি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ এতো ব্যাপক যে, তা তাদের ধারণা-কল্পনারও অতীত।'

'কোনো ব্যক্তি কিংবা দল যখন রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিপ্লব সাধন অথবা ইসলামী মতাদর্শ অনুযায়ী নব বিধান প্রণয়ন করতে অগ্রসর হবে, তখন তার এই প্রচেষ্টায় ও আত্মদানে ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ তার লক্ষ্য হতে পারবে না– এটাই ইসলামের 'আল্লাহর পথে জেহাদে'র মর্মার্থ। 'তাগূতী শক্তিকে বিতাড়িত করে সে নিজে যেন আরেক তাগূতী শক্তি সাজার ইচ্ছা পোষণ না করে। নিজের জন্যে ধন সম্পদ, খ্যাতি, মান সম্মান, কোনো কিছু লাভ করাই যেন তার চেষ্টা-শ্রমের মূল লক্ষ্য না হয়। তার সমস্ত ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে মানবসমাজে এক ইনসাফপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা। কোরআনে সূরা নেসার ৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ঈমানদার লোকেরা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর কাফেররা লড়াই করে তাগুত তথা আল্লাহদ্রোহী শক্তির পথে।'

'হে মানুষ, তোমাদের প্রতিপালকের দাসত্ব করো– যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন'

সূরা বাকারার এই ২৯ নং আয়াতে ইসলামের বিপ্লবী আহ্বান ফুটে উঠেছে। এখানে ইসলাম শ্রমিক, কৃষক, জমিদার কিংবা কারখানার মালিক অথবা এ ধরনের কোনো বিশেষ শ্রেণীকে আহ্বান জানায়নি, বরং সমস্ত মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে। ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসাবেই আহ্বান জানায়। এর নির্দেশ শুধু এতোটুকু যে, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্যে লিপ্ত থেকে থাকো, তবে তা পরিত্যাগ করো। তোমাদের নিজেদের মধ্যে প্রভুত্ব লাভের মোহ থেকে থাকলে তাও দূর করো। কারণ আইন কানুন রচনার অধিকার দাবী করে অন্য লোককে নিজের দাস বানানোর কিংবা কাউকে নিজের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করার

www.pathagar.com

কোনো অধিকারই তোমাদের কারো নেই। তোমাদের সকলকে একই আল্লাহর দাসত্ব কবুল করতে হবে। আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে তোমাদের সকলকে একই স্তর ও শ্রেণীভুক্ত হতে হবে, কোনো রকম দম্ভ বা বড়াই করা চলবে না। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে,

'এসো, তোমরা ও আমরা এমন একটা কথায় একমত হই, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমভাবে গ্রহণযোগ্য। সেটা এই যে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করবো না। প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে কাউকে আল্লাহর অংশীদার মনে করবো না, এবং আমরা একে অপরকে প্রভু হিসাবেও মানবো না।' (আলে ইমরান, আয়াত ৬৪)

স্পষ্টতই এটা বিশ্বব্যাপী সর্বাত্মক এক মহাবিপ্লবের আহ্বান। ইসলাম আরো ঘোষণা করেছে, 'হুকুম দেয়া বা প্রভুত্ব করার অধিকার আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো থাকতে পারে না।'

বস্তুত কোনো মানুষ নিজেই অন্য মানুষের শাসক ও নিয়ামক হতে পারে না, নিজের ইচ্ছামতো কোনো কাজের নির্দেশ দেয়া বা কোনো কাজ থেকে নিষেধ করার কোনো অধিকার কারো নেই। কারণ কোনো মানুষকে সার্বভৌম প্রভু ও স্বাধীনভাবে আদেশ নিষেধ জারী করার অধিকারী মনে করাই হচ্ছে সকল বিপর্যয়েরমুল উৎস।

'ইসলামের তাওহীদ ও এক আল্লাহর এবাদাতের আহ্বান অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসের ন্যায় নিছক ধর্মীয় আমন্ত্রণই নয়। বরং এটা একটা সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের ডাক। সমাজে যারা ধর্মের ক্ষেত্রে পুরোহিত, রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজা বাদশাহ, শাসক, নেতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহাজন, জমিদার ও ইজারাদার সেজে জনগণকে নিজেদের গোলামে পরিণত করেছে, তাদের প্রত্যেকের ওপরই ইসলামের এই বিপ্লবী দাওয়াতের প্রত্যক্ষ ও প্রচন্ড আঘাত পড়ে। কারণ তারা কোথাও প্রকাশ্যভাবে খোদা হয়ে বসেছে, আর কোথাও নিজেদের জন্মগত কিংবা শ্রেণীগত অধিকারের ভিত্তিতে জনগণের আনুগত্য লাভের দাবী করছে। তারা স্পষ্ট ভাষায় বলে থাকে, 'আমি ছাড়া তোমাদের কোনো প্রভু নেই।' 'আমি তোমাদের সর্বোচ্চ রব।' 'জীবন মৃত্যুর আমিই হর্তাকর্তা। 'আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী আর কে আছে! আবার কোথাও এরা জনগণের অজ্ঞতা ও মূর্খতা আপন স্বার্থে ব্যবহার করার জন্যে কৃত্রিম মাবুদের মূর্তি বানিয়ে নিয়েছে। এই সবের আড়ালে তারা জনগণের ওপর নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। অতএব কুফর, শিরক ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ইসলামের দাওয়াত এবং এক আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতির জন্যে ইসলামের প্রচারমূলক কার্যক্রম সরাসরিভাবেই সমসাময়িক সরকার, সরকার সমর্থক কিংবা সরকার আশ্রিত শ্রেণীসমূহের স্বার্থের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। এই কারণে যখনই কোনো নবী 'হে আমার জাতি, একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব স্বীকার কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো প্রভু ও মাবুদ নেই' বলে আহ্বান জানিয়েছেন। সমসাময়িক আধিপত্যবাদী শ্রেণী তখন প্রবল শক্তি সহকারে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়েছে। কারণ এ দাওয়াত নিছক কোনো অতি প্রাকৃতিক ধর্মতাত্ত্বিক

www.pathagar.com

ব্যাপারের বিশ্লেষণ ছিলো না, বরং তা ছিলো এক সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের উদাত্ত আহ্বান। এ আহ্বান কর্ণগোচর হওয়ার সাথে সাথে প্রবল রাজনৈতিক আলোড়নের আভাস পাওয়া যেতো।'

'ইসলাম নিছক একটা ধর্মবিশ্বাস এবং কতকগুলো এবাদাত অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র নয়। মূলত ইসলাম এক পরিপূর্ণ ও ব্যাপক জীবনব্যবস্থা। বিশ্ববাসীর জীবনক্ষেত্র থেকে সকল প্রকার অত্যাচার-শোষণ ও অন্যায় নিয়ম নীতির মূলোৎপাটন করে। তদস্থলে এক পূর্ণাংগ সংস্কারমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করাই তার একমাত্র লক্ষ্য।

'এই ভাংগাগড়া ও বিপ্লব সংশোধনের জন্যে ইসলাম বিশেষ কোনো জাতিকে আহ্বান জানায় না। তার আহ্বান সমগ্র মানবতার প্রতি, গোটা মানবজাতি এমনকি স্বয়ং যালেম, শোষক ও দুর্নীতিপরায়ণ জাতি ও শ্রেণীসমূহের প্রতি এবং রাজা বাদশাহ, সমাজপতি ও নেতৃবৃন্দের প্রতি। সবাইকে ইসলাম তার এই বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানায়। সবার প্রতিই তার বক্তব্য এই যে, সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত সীমার মধ্যেই জীবনযাপন ও যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করো। তোমরা সত্য ও সুবিচারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই তোমাদের জীবনে সর্বাংগীন শান্তি ও নিরাপত্তা সূচিত হবে। এই ক্ষেত্রে কোনো মানুষের সাথে ইসলামের শক্রতা নেই। ইসলামের শক্রতা শুধু যুলুমের সাথে, বিপর্যয় ও বিশৃংখলার সাথে এবং অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতার সাথে। আর আল্লাহর নির্ধারিত স্বাভাবিক ব্যবস্থা অনুযায়ী যা একজনের প্রাপ্য নয়, তা লাভ করার জন্যে কেউ চেষ্টা করলে তার সাথেও ইসলামের শক্রতা রয়েছে।'

'এই আহ্বান যারাই গ্রহণ করবে তারা যে কোনো জাতির, বংশের, শ্রেণীর বা দেশেরই লোক হোক না কেন, তারা সকলেই সমান অধিকার ও সমান মর্যাদার ভিত্তিতে ইসলামী দল ও সমাজের সদস্য রূপে গণ্য হবে এবং এভাবে এরাই সেই আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দলে রূপান্তরিত হবে, যাকে কোরআন 'আল্লাহর দল' নামে আখ্যায়িত করেছে এবং যার অন্য নাম হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ।'

'এ দলটি গঠিত হয়েই স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে জেহাদ শুরু করে দেয়। এ দলের বর্তমান থাকাটাই অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চূর্ণ করা এবং তার পরিবর্তে এক সুবিচারপূর্ণ ও ভারসাম্যযুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করা অপরিহার্য সাব্যস্ত করে। এই দল যদি রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিববর্তন সাধন এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা না করে, তবে তার অস্তিত্ব লাভের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ এর অন্য কোনো উদ্দেশ্য তো আদৌ ছিলো না। আর এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে জেহাদ ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। কোরআনের ভাষায় এই দলের অস্তিত্ব লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, 'তোমরা সেই সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ ও ন্যায় কাজের জন্যেই লোকদেরকে নির্দেশ দাও। আর নিষিদ্ধ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল থাকো।' (আল ইমরান, আয়াত ১১০)

www.pathagar.com

এটাকে কোনো ধর্ম প্রচারক ও অরাজনৈতিক মিশনারী দল মনে করা কারো উচিত নয়। মূলত এটা আল্লাহর সেনাবাহিনী। পৃথিবী থেকে যুলুম, শোষণ, অশান্তি, চরিত্রহীনতা, দুর্নীতি ও সকল প্রকার আল্লাহদ্রোহিতাকে বলপূর্বক নির্মূল করা সত্য ও ইনসাফের পতাকা সমুন্নত করা, মানব জাতির ওপর সাক্ষী হওয়া, সকল অহংকারী ও খোদাদ্রোহীর মূলোৎপাটন এবং ধনী গরীব, আপন পর সবার কল্যাণ বিধানের যোগ্য একটা ন্যায়পরায়ণ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই তার কাজ। এই বিষয়ের দিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত কটিতে,

'তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও যতোদিন না অশান্তি ও বিপর্যয় চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষ একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করার সুযোগ পায়।' (আনফাল- ৩৮)

'তোমরা যদি এ দায়িত্ব পালন না করো, তবে সারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, ধ্বংস ও ভাংগন ব্যাপক আকার ধারণ করবে।' (আনফাল- ৭৩)

'আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে জীবনযাপনের নির্ভুল পন্থা এবং সত্য অনুসরণের সঠিক ব্যবস্থাসহ প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি প্রচলিত সকল প্রকার আনুগত্য অনুসরণ চূর্ণ করে দিয়ে সত্য অনুসরণের এই ব্যবস্থাকে অন্য সব কিছুর ওপর জয়ী করে দেন.......।' (তাওবা- ৩৩)

অতএব রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করা ছাড়া এই দলের জন্যে অন্য কোনো উপায় থাকতে পারে না। কারণ বিপর্যয়মূলক সমাজব্যবস্থা আসলে একটা ভারসাম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থার সমর্থন ও সহযোগিতার ফলেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে কোনো সুস্থ, নির্ভুল ও কল্যাণময় সমাজ ব্যবস্থাই কায়েম হতে পারে না, যতোক্ষণ না রাষ্ট্রব্যবস্থা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নৈরাজ্যবাদী ও অসৎ লোকদের হাত থেকে সৎ ও সংস্কারবাদীদের হাতে ন্যস্ত হবে।'

ইসলামের কাংখিত বিশ্ব সংস্কারের কথা বাদ দিলেও, রাষ্ট্রব্যবস্থাপনা যখন বিপরীত আদর্শবাদীদের কুক্ষিগত থাকে, তখন এই আল্লাহর দলের সদস্যদের পক্ষে নিজের সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করাও আদৌ সম্ভব নয়। একটা দল যেখানে বিশেষ কোনো জীবনব্যবস্থাকে সত্য ও কল্যাণকর বলে মনে করে, সেখানে কোনো বিপরীত ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কিছুতেই জীবন যাপন করা যেতে পারে না। ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকায় বাস করে কোনো কমিউনিস্টের পক্ষে কমিউনিজমের পূর্ণ আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্রশক্তির প্রবল চাপে সেখানকার পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা আপনা থেকেই তার ওপর কার্যকরী হবে। অনুরূপভাবে একজন মুসলমানও অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে থেকে কিছুতেই ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারবে না। কারণ যে সব আইন বিধানকে সে বাতিল মনে করে, যে সব কর খাযনাকে সে অন্যায়, অসংগত ও অত্যাচারমূলক মনে করে, যে ধরনের আচার আচরণ ও বিধি ব্যবস্থাকে সে খারাপ ও ধ্বংসাত্মক বিবেচনা করে এবং যে

www.pathagar.com

ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি তার দৃষ্টিতে মারাত্মক, তার প্রত্যেকটি তার নিজের ঘর বাড়ী ও সন্তান সন্ততির ওপর প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে। তার আক্রমণ থেকে সে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। কাজেই বিশেষ কোনো আদর্শ ও আকীদায় বিশ্বাসী লোকেরা স্বভাবত বিরোধী আদর্শের শাসন নির্মূল করে তাদের নিজেদের আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হতে বাধ্য। তা না করলে তারা নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করার কোনো সুযোগ পাবে না। কেউ এই চেষ্টা না করলে কিংবা এর প্রতি অবজ্ঞা দেখালে নিশ্চয়ই মনে করতে হবে যে, মূলত কোনো আদর্শের প্রতিই তার বিশ্বাস নেই। সে বিশ্বাসের দাবী করলেও তার সে দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। এ প্রসংগেই আল্লাহ্ সূরা তওবার ৪৩, ৪৪ ও ৪৫ নং আয়াতে বলেন,

'হে নবী, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, তুমি লোকদের জেহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দিলে কেন! ওটা সমীচীন হয়নি। (জেহাদই এমন একটা মাপকাঠি,) যা দ্বারা তোমাদের খাঁটি ঈমানদার ও মিথ্যা ঈমানদারদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রমাণিত হতে পারে। যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তারা জানমাল দ্বারা জেহাদ করার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে তোমার নিকট কখনো আবেদন করবে না। যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না, একমাত্র তারাই এই জেহাদের কর্তব্য থেকে বিরত থাকার অনুমতি চাইতে পারে।'

পবিত্র কোরআনের চেয়ে সত্য ও অকাট্য সাক্ষ্য আর কে দিতে পারে? সূরা তাওবার এ আয়াত কয়টিতে কোরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে যে, মুসলমান হয়েও যে ব্যক্তি জেহাদের আহ্বানে সাড়া দেয় না, আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্যে জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করে না, নিজের গৃহীত বিধান ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম করে না, সে আল্লাহ ও আখেরাতে অবিশ্বাসী ও সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' .....

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামী জেহাদের মূল উদ্দেশ্য। বিশেষ কোনো দেশ কিংবা কয়েকটি মাত্র দেশেই নয়, বরং সমগ্র দুনিয়ায় ইসলাম এই সর্বাত্মক বিপ্লব সৃষ্টি করতে চায়। এই মুসলিম দলটি নির্দিষ্ট কোনো ভূখন্ড আকড়ে বসে থাকবেনা, পৃথিবীর যে ভূখন্ডে সম্ভব হবে হিজরতের মাধ্যমে সেখানে গিয়ে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে। মনে রাখতে হবে বিশ্ব বিপ্লব (World Revolution) সৃষ্টি করাই তাদের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ লক্ষ্য। বস্তুত যে বিপ্লবী দল জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে গোটা মানবতার কল্যাণের জন্যে চেষ্টা করবে, তার মূল লক্ষ্য ও কার্যক্রম বিশেষ কোনো জাতি কিংবা ভূখন্ডভিত্তিক হতে পারেনা। পবিত্র কোরআনের কোনো আইন কোনো দেশের চতুসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। বরং বিপ্লবের স্বাভাবিক প্রবণতায়ই তা এক বিশ্ববিপ্লবের রূপ ধারণ করে। সত্য কখনো ভৌগোলিক সীমারেখা স্বীকার করে না। কোনো নদী কিংবা পর্বতের এক দিকে যা সত্য, অপরদিকেও তা সত্য রূপে স্বীকৃতি পাবে। এটাই সত্যের চিরন্তন

www.pathagar.com

দাবী। মানবজাতির কোনো একটি অংশকেও এই সত্য থেকে বঞ্চিত করা যায় না। মানুষ যেখানেই যুলুম নিপীড়নের শিকার, সেখানেই তাদের মুক্তি নিশ্চিত করার জন্যে উপনীত হওয়া সত্যের কর্তব্য। পবিত্র কোরআনে সূরা নেসার ৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ এ কথাই বলেছেন,

'তোমাদের কী হয়েছে যে, সেই সব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের সাহায্যার্থে তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো না, যারা দুর্বল বলে নির্যাতিত হচ্ছে এবং যারা এই বলে প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ! এই যালেম অধ্যুষিত জনপদ থেকে আমাদের মুক্তি দাও।'

এতদ্ব্যতীত জাতীয় ও আঞ্চলিক বিভাগ সত্ত্বেও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এতো ব্যাপক যে, এর ফলে কোনো একটি রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ কোনো আদর্শ অনুযায়ী পূর্ণরূপে চলা সম্ভব হয় না, যতোক্ষণ না প্রতিবেশী দেশসমূহেও অনুরূপ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব মানবজাতির পূর্ণাংগ সংস্কার সাধন এবং আদর্শভিত্তিক আত্মরক্ষার জন্যে একটি মাত্র দেশে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষান্ত না হওয়া, বরং শক্তি ও সামর্থ অনুসারে উক্ত রাষ্ট্রকে আরো সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করাই একটি ইসলামী দলের প্রধানতম কর্তব্য। তারা একদিকে ইসলামের বিপ্লবী মতবাদ প্রচার করবে এবং সকল দেশের অধিবাসীকে তা গ্রহণ করার আহ্বান জানাবে। অপরদিকে তাদের শক্তি-সামর্থ থাকলে অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে তার মূলোচ্ছেদ করবে এবং তার পরিবর্তে ইসলামের সর্বাত্মক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে, যা ন্যায় বিচার ও ইনসাফ নিশ্চিত করে এবং যার ভিত্তি শাশ্বত ও চিরস্থায়ী।'

হযরত নবী করীম (স.) এবং তাঁর পরে খোলাফায়ে রাশেদীন এই পন্থায়ই কাজ করেছেন। তাঁরা আরব দেশ থেকেই এই বিপ্লব শুরু করেন। অতপর ইসলামের সূর্য সেখান থেকে সারা বিশ্বে আলোক ছড়ায়। রসূল (স.) পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের রাষ্ট্রনায়ক ও জনগণকে ইসলামের বিপ্লবী আদর্শ ও নীতি গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। ঐসব দেশের শাসকগোষ্ঠী ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের এই আহ্বানে সম্মত হলে তারা মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর এতে অসম্মত হলে রসূল (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদীন তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি রোম ও ইরান এই দুই দুর্ধর্ষ দাম্ভিক অনৈসলামী সাম্রাজ্যের ওপর একই সাথে আক্রমণ শুরু করেন এবং হযরত ওমরের সময় তা সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। তাঁর আমলে ওই সকল সাম্রাজ্য ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।'

ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রকৃতি ও তাৎপর্য, ইসলামের বিধান ও জেহাদের ক্ষেত্রে তার পরিকল্পনা ও তার স্তরভেদ সংক্রান্ত উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে আমরা বদর যুদ্ধের মূল্যায়নে অগ্রসর হতে পারি, যাকে আল্লাহ 'ইয়াওমুল ফোরকান' অর্থাৎ হক ও বাতিলের মাঝে প্রভেদ সৃষ্টিকারী দিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ বর্ণনার ভিত্তিতে আমরা সূরা আনফালেরও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লাভ করতে পারি। কেননা এ সূরা এই যুদ্ধ প্রসংগেই নাযিল হয়েছে।

www.pathagar.com

আগেই বলেছি যে, বদর যুদ্ধ ইসলামী জেহাদের প্রথম ঘটনা ছিলো না। এর আগে কয়েকটা ছোটখাটো সমরাভিযান পরিচালিত হয়েছে, যার একটিতেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে পরিচালিত এই সমরাভিযানটি হিজরতের সপ্তদশ মাসের মাথায় রজব মাসে সংঘটিত হয়। ইসলামী জেহাদের যে মূলনীতি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তদনুসারেই এই সব ক'টি সমরাভিযান পরিচালিত হয়। এর সব কটি যদিও কোরায়শদের লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়েছিলো, যারা রসূল (স.) ও মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছিলো এবং জাহেলী যুগে ও ইসলামী যুগে আল্লাহর ঘরের মর্যাদাও যথাযথভাবে রক্ষা করছিলো না, কিন্তু শুধু কোরায়শদের প্রতিশোধ গ্রহণই এসব অভিযানের আসল লক্ষ্য ছিলো না। আসল লক্ষ্য ছিলো ইসলামের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দান যে, সে পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গোলাম হয়ে থাকতে দেবে না, বরং সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহর দাসদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে ছাড়বে, পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করবে এবং যে সব তাগুতী শক্তি মানুষকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিলো, তাদের আধিপত্য খতম করে ছাড়বে। কোরায়শরা ছিলো সে সময়কার তাগুতী শক্তি, যারা আরব উপদ্বীপের মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করতে সক্রিয়ভাবে বাধা দিয়ে আসছিলো। কাজেই এই তাগুতকে পরাভূত না করে ইসলামের গত্যন্তর ছিলো না। তা ছাড়া মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে আগ্রাসনের ঝুঁকিমুক্ত করাও ছিলো এর অন্যতম লক্ষ্য। তবে এই স্থানীয় কারণগুলো বর্ণনা করার সময় আমাদেরকে সর্বদাই ইসলামের এই মূল প্রকৃতি ও পরিকল্পনার কথা মনে রাখতে হবে যে, সে পৃথিবীতে এমন কোনো আল্লাহদ্রোহী তাগুতী শক্তির অস্তিত্ব কোনো অবস্থাতেই সহ্য করে না, যা আল্লাহর ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বকে কুক্ষিগত করে এবং তার প্রভুত্ব ও আইনের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে।

সূরা আল আনফালের আলোচনাটি উপস্থাপন করার পূর্বে আমি (বৃহত্তম যুদ্ধ) বদরের ঘটনাবলী আপনাদের সামনে পেশ করবো। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই এই সূরাটি নাযিল হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেন এই সূরার নুযুলের পটভূমি ও পরিবেশ সম্পর্কে অবগত হতে পারি এবং তার সাথে এই সূরার বিভিন্ন বক্তব্যের লক্ষ্য, বিভিন্ন ঘটনাবলীর আলোকে তার বাস্তবতা এবং সাথে সাথে ওই ঘটনাবলীর আলোকে সঠিক দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারি। কারণ শুধু শাব্দিক অর্থ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আল কোরআনের সঠিক অর্থ পুরোপুরি হৃদয়ংগম করা সম্ভব নয়, বরং তাকে হৃদয়ংগম করার জন্যে ঐতিহাসিক পটভূমি জানা থাকা আবশ্যক। যদিও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর চেয়ে তার পরিধি ও প্রভাব অধিকতর স্থায়ী। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোকেই আল কোরআন এই বিরাট দিগন্তটি উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবেই আল কোরআনের স্থায়ী প্রভাব এবং চলমান কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী হবে। যারা একমাত্র দ্বীন 'আল ইসলামের' অনুসরণ করে এবং এই সূরার আয়াতসমূহ যাদের ব্যাপারে প্রথমবারের মত নাযিল হয়েছে, তাদের মতো একই ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতির

www.pathagar.com

সম্মুখীন হয় তারাই এর তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। আর যারা যুদ্ধের মাঠে না গিয়ে ঘরের নিভৃত কোণে বসে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আল কোরআনকে হৃদয়ংগম করতে চায়, তাদের সামনে ওই কোরআনের রহস্য কোনোদিনও উন্মোচিত হবে না। তাদের পেছনে বসে থাকা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না।

ইবনে ইসহাক বলেন, রসূল (স.)-এর কাছে মদীনায় এ সংবাদ এসে পৌছলো যে, আবু সুফিয়ান বিন হারব একটি বৃহৎ বাণিজ্য কাফেলাসহ বাণিজ্যিক পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এই বাণিজ্যে মক্কার সমস্ত কোরায়শই অংশীদার। ইবনে– আকাবার বর্ণনা অনুযায়ী মক্কায় এমন কোনো কোরায়শ নারী বা পুরুষ ছিলো না যার অংশ এ কাফেলায় ছিলো না, অর্থাৎ এটা ছিলো কোরায়শদের একটি সম্মিলিত ব্যবসা। এই কাফেলায় কোরায়শ গোত্রের ত্রিশ বা চল্লিশ জন ঘোড়সওয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

ইবনে ইসহাক মোহাম্মদ বিন মুসলিম আল যুহরী, আসিম বিন ওমর বিন কাতাদাহ, আবদুল্লাহ বিন আবী বকর এবং ইয়াযিদ বিন রুমানের সূত্রে অপরাপর বর্ণনাকারী– তাঁরা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। ইবনে ইসহাক বলেন, উপরোক্ত সকলেই বদর যুদ্ধের কিছু কিছু অংশ আমাকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তাদের সম্মিলিত বর্ণনা ছিল নিম্নরূপ-

যখন রসূল (স.)-এর কাছে মদীনায় এ সংবাদ এসে পৌছলো যে, আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্য কাফেলাসহ পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে এ বলে একত্র করতে লাগলেন যে, দেখো, এ হচ্ছে কোরায়শের বাণিজ্যিক কাফেলা। এতে তাদের বাণিজ্যিক পণ্য সামগ্রী মজুদ রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করো। আশা করা যায় আল্লাহ পাক এ বাণিজ্য কাফেলা থেকে তোমাদের জন্যে কিছু গনীমতের মালের ব্যবস্থা করে দেবেন। অতপর তারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর ডাকে সাড়া দিলো। কিছু সংখ্যক লোক অস্ত্রশস্ত্রসহ আর কিছু সংখ্যক লোক অস্ত্র ছাড়াই রওয়ানা দিলো। কারণ তারা ধারণা করেনি যে, রসূলুল্লাহ (স.) কোনো যুদ্ধের মুখোমুখি হবেন। ইবনুল কাইয়্যেমের 'যাদুল মায়া'দ' এবং মাকরেযীর 'আমতা উল আসমা' গ্রন্থে এসেছে যে, স্বয়ং হুযুর (স.)ও সবার ওপর এ জেহাদে অংশ গ্রহণ করাকে বাধ্যতামূলক সাব্যস্ত করেননি বরং তিনি বললেন, যাদের কাছে সওয়ারীর ব্যবস্থা আছে, তারা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করে। তাতে অনেকেই যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু রসূল (স.) এতে পীড়াপীড়ি করলেন না। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম বলেন, বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা তিনশ তের কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশী ছিলো। তন্মধ্যে মোহাজেরদের সংখ্যা ছিলো ছিয়াশি জন। আওস গোত্রের একষট্টি জন। আর খাযরাজ গোত্রের ছিলো একশত সত্তর জন। খাযরাজ গোত্রের তুলনায় আওস গোত্রের উপস্থিতি ছিলো নগণ্য। যদিও আওস গোত্রের লোকেরা তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, শৌর্যবীর্যের অধিকারী এবং যুদ্ধের মাঠে অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিতে সক্ষম।

www.pathagar.com

রসূলে কারীম (স.) -এর নির্দেশ হঠাৎ এসেছিলো। তাতে হুকুম ছিলো যে, যাদের কাছে সওয়ারীর ব্যবস্থা আছে, তারা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করে। তাতে অনেকেই যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকে। আর যারা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলো, কিন্তু তাদের সওয়ারী সাথে ছিলো না– ছিলো গ্রাম এলাকায়, তাঁরা গ্রাম থেকে সওয়ারী এনে পরে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি চাইলো। কিন্তু এতোটা অপেক্ষা করার মতো সময় তখন ছিলো না। তাই নির্দেশ হলো যাঁদের কাছে এ মুহূর্তে সওয়ারী মওজুদ রয়েছে এবং জেহাদে যেতে চায়, তারাই শুধু এখন যাবে। বাইরে থেকে সওয়ারী এনে নেবার মতো এখন সময় নেই। কাজেই হুযুর (স.)-এর সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই তৈরী হতে পারলো। বস্তুত কিছু লোক এই জেহাদে অংশ গ্রহণের আদৌ ইচ্ছাই করেনি, তার কারণ মহানবী (স.) এতে অংশগ্রহণ করা সবার জন্যে বাধ্যতামুলক করেননি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিলো যে, এটা তো একটা বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র। কোনো যুদ্ধের বাহিনী নয় যে, এর মোকাবেলা করার জন্যে রসূলে কারীম (স.) এবং তাঁর সঙ্গীদের খুব বেশী পরিমাণ সৈন্য কিংবা মোজাহেদের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেননি।

যেহেতু পণ্য সামগ্রী ছিলো বেশী এবং রক্ষীর সংখ্যা ছিলো কম, আর পূর্বের শত্রুতার কারণে মুসলমানদের কোনো শক্তিশালী দলের তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার আশংকা ছিলো প্রবল, তাই কাফেলার সরদার আবু সুফিয়ান হেজাযের কাছে পৌছেই বিভিন্ন পথিকের কাছে রাস্তার খোঁজখবর নিতে লাগলো। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাকে সংবাদ দিলো যে, মোহাম্মদ (স.) তাঁর লোকজন নিয়ে তাদের এ কাফেলার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আবু সুফিয়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলো। যখন কাফেলাটি হেজাযের সীমানায় পৌছলো, তখন সে এক বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম ব্যক্তি দম্‌দম্ ইবনে আমরকে কুড়ি মেসকাল সোনা দিয়ে এ ব্যাপারে রাযী করালো যে, সে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে চড়ে যথাশীঘ্র মক্কা মোকাররমায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌছে দেবে যে, তাদের কাফেলা মোহাম্মদ ও তাঁর সাথীদের আক্রমণের আশংকার সম্মুখীন।

আল্লামা মাকরেযী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইমতাউল আসমা'-তে লিখেন, দমদম ইবনে আমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী বিপদের ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার উষ্ট্রীর নাক কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় পোশাকের সামনের এবং পেছনের অংশ ছিঁড়ে ফেললো এবং হাওদাটিকে উল্টোভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দিলো এবং এ বলে চিৎকার করতে লাগলো, 'হে কোরায়শ সম্প্রদায়, হে লুই ইবনে গালিবের বংশধর! তোমরা তোমাদের বাণিজ্য কাফেলার (যাতে খুশবু ও আতর সুগন্ধি জাতীয় দ্রব্য ও বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ মওজুদ রয়েছে। খবর শোনো! আবু সুফিয়ানের সাথে তোমাদের যে সম্পদ আছে, মোহাম্মদ তাঁর সংগী সাথীদের নিয়ে তার পেছনে ধাওয়া করেছে। তোমাদের তা পাবার আশা নেই। সাহায্যের জন্যে চলো, দৌড়াও, সাহায্যের জন্যে দৌড়াও, চলো।'

www.pathagar.com

এ ঘোষণা ছিলো সেকালের একটি ঘোর বিপদের ঘোষণা। যখন সে এভাবে মক্কায় এসে ঢুকলো, তখন গোটা মক্কা নগরীতে হৈচৈ পড়ে গেলো। সাজ সাজ রব উঠলো। সমস্ত কোরায়শ লোকেরা প্রতিরোধের জন্যে তৈরী হয়ে গেলো। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারলো তারা নিজেরা এতে অংশগ্রহণ করলো, আর যারা কোনো কারণে অপারগ ছিলো, তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করতে থাকলো। এভাবে মাত্র দুই অথবা তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কোরায়শ বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলো। তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, তারা দুর্বলদেরকে সাহায্য করলো। তাদের মধ্য হতে সোইয়ল বিন 'আমর, যুমআ' বিন আল আসওয়াদ, তুয়াইমা বিন আ'দী, হানযালা বিন আবী সুফিয়ান এবং আমর বিন আবী সুফিয়ান মানুষদেরকে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্যে উৎসাহিত করতে থাকলো। সোহায়ল দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, হে গালিব সন্তানরা, তোমরা মোহাম্মদ এবং ইয়াছরবের অধিবাসী বাপ দাদার ধর্মচ্যুত মুসলমানদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেবে যে, তারা তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলার পণ্য সামগ্রী লুট পাট করে নিয়ে যাবে? তারপর সে বললো, তোমাদের মধ্য থেকে যে সম্পদের প্রত্যাশী সম্পদ তার জন্যে প্রস্তুত। আর যে শক্তির প্রত্যাশী শক্তিও তার জন্যে অপেক্ষা করছে। অতপর উমাইয়া বিন আবিস সালত কবিতার কয়েকটি চরণের মাধ্যমে গালিব গোত্রের প্রশংসা করলো। নওফল বিন মোয়াবিয়া আদদাইলী কোরায়শ গোত্রের শক্তিধর ব্যক্তিদের কাছে গেলো এবং তাদেরকে ওই সমস্ত ব্যক্তিকে সওয়ারী এবং রাহ-খরচ দেয়ার জন্যে বললো, যারা যুদ্ধের জন্যে বের হবে। অতপর আবদুল্লাহ বিন আবী রবীয়া' দাঁড়িয়ে বললো, এই নাও পাঁচশত দীনার– যাকে খুশী তাকে দিতে পারো। নওফল বিন মোয়াবিয়া হুওয়াইতিব বিন আবদুল ওযযা থেকে দুই বা তিনশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) গ্রহণ করলো। যার দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র এবং সওয়ারী খরিদ করলো। তুয়াইমা বিন আ'দী বিশটি উষ্ট্রী বোঝাই করে রসদ দিলো। আর উষ্ট্রীর আরোহীদের পরিবার পরিজনদের খরচ বাবত আর্থিক এবং বৈষয়িক সাহায্য করলো। এমনিভাবে কোরায়শ বংশের মধ্য থেকে যারা যুদ্ধে যেতে অপারগতা প্রকাশ করলো, তারা তাদের পরিবর্তে অন্যদেরকে পাঠালো। অতপর তারা দলবল নিয়ে আবু লাহাবের কাছে গেলো। কিন্তু আবু লাহাব নিজে যেতে অথবা তার পরিবর্তে কাউকে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালো। কথিত আছে যে, আবু লাহাব তার পরিবর্তে আল আস বিন হিশাম বিন আলমুগীরাকে পাঠিয়েছিলো। যার কাছে তার কিছু পাওনা ছিলো, যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে সে তার পাওনা ক্ষমা করে দিয়েছিলো। অপরদিকে আদ্দাস নামক জনৈক ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না বের হওয়ার জন্যে রবীয়া'র পুত্রদ্বয় শায়বা এবং ওতবা এবং আস বিন মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজকে তিরস্কার করলো। উল্লেখ্য, আদ্দাস হচ্ছে সেই খৃষ্টান বালক, যাকে উতবা এবং রবীআ' এক ছড়া আংগুর দিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে পাঠিয়েছিলো– যখন তিনি তায়েফ এসেছিলেন। কিন্তু তায়েফবাসী তখন তাঁর সাথে খুবই খারাপ আচরণ করেছিলো। এমনকি তারা রসূলের পেছনে নির্বোধ এবং শিশুদেরকে লেলিয়ে দিয়েছিলো, যারা রসূলের ওপর পাথর

www.pathagar.com

মারতে মারতে তাঁর দু'পা মুবারক রক্তাক্ত করে ফেলেছিলো. অবশেষে তিনি ওতবা এবং শায়বার বাগানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রসূলের এ অবস্থা দেখে আদ্দাসের মনে দাগ কাটলো। এমনকি সে তাঁর দু'হাত এবং দু'পা মোবারকে চুমু খেতে লাগলো।

উমাইয়া বিন খালফ যুদ্ধে বের হতে অস্বীকৃতি জানালে উকবা বিন আবী মুয়ীত এবং আবু জাহল বের না হওয়ার কারণে তাকে তিরস্কার করলো। তখন সে তাদেরকে সম্বোধন করে বললো, তোমরা আমার জন্যে এ উপত্যকার বড় উটটি খরিদ করো। তাই তারা তিনশত দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়ে বনী কুশাইর গোত্রের একটি উত্তম উট ক্রয় করলো এবং সে তার নিজের পরিবর্তে উটটি পাঠালো। যুদ্ধের পর মুসলমানরা গনীমতের মাল হিসাবে এটাও পেয়েছিলো। অন্যদিকে যুদ্ধের যাওয়ার ক্ষেত্রে হারিছ বিন 'আমিরের চেয়ে অধিক অনিচ্ছুক আর কেউ ছিলো না, দম্‌দম্‌ বিন আমর একবার স্বপ্নে দেখলো যে, মক্কা উপত্যকার ওপরে নীচে সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এদিকে আতিকা বিনত আবদুল মোত্তালেবও অনুরূপ স্বপ্ন দেখলো। যাতে কোরায়শ গোত্রের প্রত্যেক ঘরে হত্যা ও রক্তের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো। ফলে যুক্তিবাদী কিছু লোক যুদ্ধের মাঠে যেতে অপছন্দ করলো। আর কিছু সংখ্যক লোক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো। তাদের মধ্য থেকে সর্বাধিক দেরীতে যারা যুদ্ধের মাঠে গিয়েছিলো, তারা হচ্ছে, হারিছ বিন আমের, উমাইয়া বিন খালফ, ওতবা বিন রবীয়া, শায়বা বিন রবীয়া, হাকীম বিন হিযাম, আবুল বুখতরী বিন হিশাম, আলী বিন উমাইয়া বিন খালফ এবং আল আস বিন মুনাব্বেহ। এই দেরীর জন্য আবু জাহল ও আরো কয়েকজন মিলে তাদেরকে ভর্ৎসনা করেছিলো। অতপর সকলেই যাত্রার সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করলো। কোরায়শরা নর্তকী ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বের হলো। তারা প্রত্যেক মনযিলে গানের আসর বসাতো এবং উট যবেহ করতো। এ যুদ্ধে কোরায়শ বাহিনীর যোদ্ধা ছিলো ৯৫০ জন। তন্মধ্যে একশত ছিলো বর্মধারী ঘোড়সওয়ার। এছাড়া পদাতিক বাহিনীর অনেকের কাছেই বর্ম ছিলো। তাদের উটের সংখ্যা ছিলো সাত শত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহর এরশাদ হচ্ছে নিম্নরূপ,

'আর তোমরা এমন লোকদের মতো আচরণ করো না, যারা অহংকার করতে করতে ও লোকদেরকে নিজেদের মাহাত্ম্য দেখাতে দেখাতে ঘর থেকে বের হয়েছে.........।'

কোরায়শরা রণ সাজে সজ্জিত হয়ে পূর্ণ আড়ম্বর ও জাঁক জমকের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা হলো। নিজেদের কাফেলাকে শুধু নিরাপদে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসাই তাদের কাজ ছিলো না, বরং এই সংগে তারা নিত্য দিনের এ আশংকা ও আতংকবোধকে চিরতরে খতম করে দিতে চাচ্ছিলো। তারা চাচ্ছিলো মোহাম্মদ ও তাঁর দলবলকে খতম করে দিতে– যারা বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমণ করতে এসেছিলো। মদীনায় এ বিরোধী শক্তির নতুন সংযোজনকে তারা গুঁড়িয়ে দিতে এবং আশপাশের গোত্রগুলোকে এতোদূর সন্ত্রস্ত করে তুলতে চাচ্ছিলো যাতে করে ভবিষ্যতে এ বাণিজ্য পথটি তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যায়। কারণ মোহাম্মদ বাহিনী ইতিপূর্বে আমর

www.pathagar.com

বিন আলহাদরামী এবং তার সাথের কাফেলার ওপর আক্রমণ করেছিলো, আর ওটা ছিলো 'সারিয়্যাতু আবদিল্লাহ বিন জাহশ'।

আবু সুফিয়ান তার বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। তার সাথে ছিলো সত্তরজন দেহরক্ষী। ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুসারে প্রহরীর সংখ্যা ছিলো ত্রিশজন। তন্মধ্যে মাখরামা বিন নওফল এবং আমর বিন আল-আ'স অন্যতম। তাদের বাণিজ্য কাফেলায় উট ছিলো এক হাজার, যেগুলো পণ্য সামগ্রী বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলো। কোরায়শ বাহিনীর আগমনে বিলম্ব দেখে মদীনার কাছে পৌছে যখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো, আবু সুফিয়ান তার কাফেলা নিয়ে বদর ময়দানে পৌছে মহানবী ও সাহাবায়ে কেরামের পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মদীনার পথ পরিত্যাগ করে নদীর তীর ধরে অতিক্রম করতে লাগলো। বদরকে তাদের বামে রেখে তারা দ্রুতগতিতে সামনের দিকে চললো। অপরদিকে কোরায়শ বাহিনী জাঁক জমকের সাথে মক্কা থেকে মদীনার পানে আসতে লাগলো। পথিমধ্যে কায়স বিন ইমরুল কায়স নামক জনৈক ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের পক্ষ হতে কোরায়শ বাহিনীর কাছে এসে বললো, যেহেতু বাণিজ্য কাফেলা মুসলমানদের আক্রমণ হতে বেঁচে গেছে সুতরাং মদীনাবাসীদের সাথে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয়ে মক্কায় ফিরে যাওয়াই ভালো। ইতিমধ্যে তারা জুহফা নামক স্থানে এসে পৌছলো। তারা সেখান থেকে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালো। প্রতি উত্তরে আবু জাহল বললো, খোদার শপথ, বদরের ময়দানে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয়ে আমরা কখনো ফিরে যাবো না। আমরা তিন ভাগে বিভক্ত হবো। একদল উট যবাই করবে, দ্বিতীয় দল খাওয়াবে। আর তৃতীয় দল শরাব পান করাবে। অন্যদিকে নর্তকী ও গায়িকারা নেচে গেয়ে আমাদেরকে আনন্দ দেবে। এ ঘটনার পর গোটা আরববাসী চিরদিন আমাদেরকে ভয় পাবে এবং স্মরণ রাখবে। সংবাদ বাহক কায়স আবু সুফিয়ানের কাছে এসে সকল ঘটনার বিবরণ শুনালো। তখন আবু সুফিয়ান আক্ষেপ করে বললো, এটা 'আমর বিন হিশাম তথা আবু জাহলের কাজ। যেহেতু আবু জাহল নেতা সেজে এসেছে, সেহেতু সে যুদ্ধ ছাড়া ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ করছে। এটা তার সীমালংঘন ছাড়া আর কিছুই নয়। সব ক্ষেত্রেই সীমালংঘন ত্রুটি ও অশুভ লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত। আবু সুফিয়ান বললো, যদি মোহাম্মদ বাহিনী কোরায়শ বাহিনীর মুখোমুখি হয়, তবে আমরা নিশ্চিত পর্যুদস্ত হবো।'

ইবনে ইসহাক বলেন, আল আখনাস বিন শুরাইক বিন আমর বিন ওহাব আছ ছাকাফী– যে বনী যুহরার মিত্র ছিলো– বনী যুহরা সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললো, হে বনী যুহরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ধন সম্পদ ও পণ্য সামগ্রী হেফাযত করেছেন এবং তোমাদের নেতা মাখরামা বিন নওফলকে মুক্ত করেছেন। তোমরা তো তোমাদের নেতা ও পণ্য সামগ্রীকে বাঁচাবার জন্যেই এসেছিলে! সুতরাং তোমরা বাড়ি ফিরে যাও, অনর্থক যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা আবু জাহলের মতো বলো না যে, বনী যুহরা ও কোরায়শ গোত্রের কেউ জীবিত থাকতে আমরা যুদ্ধ না করে ঘরে ফিরবো না। এ যুদ্ধে বনী আদী গোত্রের কেউ অংশগ্রহণ করেনি। 'ইমতাউল আসমা' গ্রন্থে

www.pathagar.com

এসেছে যে, তু'মা বিন আ'দী বিশ উট বোঝাই রসদ দিয়ে কোরায়শ বাহিনীকে সাহায্য করেছিলো। শুধু তাই নয়, সে কোরায়শ বাহিনীর পরিবার পরিজনকেও সাহায্য করেছিলো। তালেব বিন আবী তালেব এবং কোরায়শ গোত্রের কিছু লোকের মাঝে পূর্ব থেকেই যোগ সাজশ ছিলো। কোরায়শ বাহিনীর লোকজন বললো, হে বনী হাশেম, আমরা ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারি যে, যদি তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধের জন্যে বেরও হও, তথাপি তোমাদের মন থাকবে মোহাম্মদের সাথে। অতএব, তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে মক্কায় ফিরে চলে এসেছিলো তন্মধ্যে তালেবও ছিলো।

ইবনে ইসহাক বলেন, রমযান মাসের প্রথমদিকে রসূল (স.) সাহাবীদের নিয়ে বের হলেন। তখন রসূলের সাথীদের উটের সংখ্যা ছিলো ৭০। তারা পালাক্রমে এ উটগুলোতে আরোহণ করতো। রসূল (স.), আলী বিন আবি তালিব ও মারছাদ বিন আবী মারছাদ আল গুনাবী একটি উটের ওপর পালাক্রমে চড়তো। হামযা বিন আবদুল মোত্তালিব, যায়দ বিন হারিছা, আবু কাব্শা এবং রসূলের বাদিনী আনেসা একটি উটের ওপর পালাক্রমে আরোহণ করতো। আবু বকর, ওমর এবং আবদুর রহমান বিন আওফ অপর আরেকটি উটে আরোহণ করতো।

আল্লামা মাকরেযী 'ইমতাউল আসমা' নামক গ্রন্থে বলেন, রসূলে মাকবুল (স.) যাত্রা করে যখন বদর নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তাঁর কাছে কোরায়শদের গতিপথ এবং বাণিজ্যিক কাফেলার রাস্তা পরিবর্তনের সংবাদ আসলো। এ সংবাদ গোটা অবস্থার মোড় পাল্টে দিলো। তখন রসূলে কারীম (স.) সঙ্গী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কিনা। হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মোকাবেলা করার মতো শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা তো এমন কোনো উদ্দেশ্য নিয়েও আসিনি। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং রসূলের নির্দেশ পালনের জন্যে নিজেকে নিবেদন করলেন। তারপর হযরত ফারুকে আযম (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালন ও জেহাদের জন্য প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করলেন। তিনি তার বক্তৃতায় বললেন, আল্লাহর শপথ, এটা কোরায়শ গোত্রের মান সম্মানের প্রশ্ন। খোদার কসম, তারা সম্মানের ভূষণে ভূষিত হওয়ার পর কখনো অপমানিত হয়নি। তারা কুফরী অবলম্বন করার পর পুনরায় ঈমান আনেনি। তারা মৃত্যুপণ তোমাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। কখনও তাদের ইযযত সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত হতে দেবে না। সুতরাং হে আল্লাহর রসূল, যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আমরা আপনার সাথে আছি। অতপর মেকদাদ বিন আমর (রা.) উঠে নিবেদন করলেন,

'ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহর কসম, আমরা আপনাকে এমন উত্তর দিবো না, যা বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ.) কে দিয়েছিলো। তারা বলেছিলো, যান, আপনি ও আপনার রব গিয়ে লড়াই করুন, আমরা এখানেই বসে থাকলাম। সে সত্ত্বার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি

www.pathagar.com

আমাদের আবিসিনিয়ার 'বার্কুল গিমাদ' নামক স্থানে নিয়ে যান, তবু আমরা জেহাদ করার জন্যে আপনার সাথে যাবো।' মহানবী (স.) হযরত মেকদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দোয়া করেন। কিন্তু তখনো আনসারদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিলো না। আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিলো যে, হুযুরে আকরাম (স.)-এর সাথে আনসারদের যে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো যেহেতু তা ছিলো মদীনার অভ্যন্তরের জন্যে, তারা মদীনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না, সুতরাং মহানবী (স.) সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেন, বন্ধুরা! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যে, আমরা এই জেহাদে মদীনার বাইরে এগিয়ে যাবো কিনা? এই সম্বোধনের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসাররা। হযরত সা'দ ইবনে মো'য়ায আনসারী (রা) হুযুর (স.)-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি কি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তখন সা'দ ইবনে মো'য়ায (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, সম্ভবত আপনি এক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে আল্লাহর পক্ষ হতে তার বিপরীত নির্দেশ এসেছে। আপনি বাণিজ্যিক কাফেলার আক্রমণের জন্যে বের হয়েছিলেন, কিন্তু নির্দেশ এসেছে কোরায়শ বাহিনীর মুখোমুখি হতে। তারপর তিনি বললেন,

'ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান করছি যে, আপনি যা কিছু বলেন তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যে কোনো অবস্থায় আপনার আনুগত্য করবো। অতএব, আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। সেই সত্ত্বার কসম, যিনি আপনাকে দ্বীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের মধ্য হতে কোনো একটি লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবে না। আপনি যদি কালই আমাদেরকে শত্রুর সম্মুখীন করে দেন, তবু আমাদের মনে এতোটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করাবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহর নামে আমাদেরকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান।'

অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে যে, সা'দ বিন মো'য়ায বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা আমাদের পশ্চাতে এমন ও অনেক লোক রেখে এসেছি, যারা আমাদের চেয়ে বেশী আপনাকে ভালোবাসে এবং আপনার অনুগত। কিন্তু তারা মনে করে আপনি বাণিজ্যিক কাফেলার জন্যে বের হয়েছেন। আমরা আপনার জন্যে একটি আসন তৈরী করবো, যাতে আপনি থাকবেন এবং তার পার্শ্বেই আপনার সওয়ারীসমূহ বেঁধে প্রস্তুত রাখবো। তারপর আমরা শত্রুর মুখোমুখি হবো। যদি আল্লাহ তায়ালা শত্রুর ওপর বিজয়দানে আমাদেরকে সম্মান ও ইযযত দান করেন আর এটাই আমাদের কামনা বাসনা। অন্যথায় সওয়ারীর ওপর আরোহণ করে আপনি আমাদের সাথে মিলিত হবেন। নবী কারীম (স.) তাঁকে বললেন, তুমি উত্তম কথা বলছো! তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ কায়ালা কি এর চেয়েও মংগলজনক কিছু করতে পারেন না? উল্লেখিত বক্তব্য শুনে

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ (স.) অত্যন্ত খুশী হলেন এবং কাফেলাকে হুকুম করলেন আল্লাহর নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দাও যে, আমাদের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, এ দুটি দলের মধ্যে একটির ওপর আমাদের বিজয় হবে। দু'টি বলতে একটি হল আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা, আর অপরটি হলো মক্কা থেকে আগত সৈন্য বাহিনী। অতপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি যেন মোশরেকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি!

এ আলোচনা ও বক্তৃতার পর সাহাবায়ে কেরামের কাছে এ বিষয়টি দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, তারা বাণিজ্য কাফেলার পরিবর্তে এখন কোরায়শ সেনাদলের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। আর বাণিজ্য কাফেলা ইতিমধ্যে তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। সুতরাং তারা রসূলের ওয়াদা মোতাবেক আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের জন্যে আশাবাদী হয়ে উঠলো। রসূল (স.) তখন তিনটি পতাকা তিন ব্যক্তির হাতে দিলেন। একটি বহন করবে মোসায়ব বিন 'ওমাইর। অপর দু'টির মাঝে একটি আলীর হাতে। আর তৃতীয়টি সা'দ বিন মোয়াযের হাতে। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন অস্ত্র উঁচু করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। উল্লেখ্য, রসূল মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় পতাকা উত্তোলন করা ছাড়াই বের হয়েছিলেন।

রমযান মাসের সতের তারিখ জুমুয়া'র রাত্রিতে এশার নামাযের সময় হুযুর (স.) বদরের কাছে পৌঁছলেন। অতপর তিনি হযরত আলী, যোবাইর, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং বুস্‌বুস্‌ বিন আমরকে পানির সন্ধানে পাঠালেন এবং যুরাইব (যরব শব্দের তাসগীর (ক্ষুদ্রতাবোধক শব্দ) যুরাইব পাথরে পরিপূর্ণ প্রশস্ত ছোট পাহাড়ের নাম)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন যে, তার কাছে কুলাইবের কাছে পানির সন্ধান পাবে। সত্যিই তারা সেখানে পানি বহনকারী অসংখ্য উট ও পানি বিতরণকারী কোরায়শ বংশের অনেক লোককে দেখতে পেলো। সাধারণ লোকেরা যুদ্ধের আশঙ্কায় আগে থেকেই সেখান থেকে পালিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে উজাইরত ছিলো, সে কোরায়শদের কাছে এসে বললো, হে গালিব সন্তান, তোমাদের সামনে আবু কাবশার সন্তান (অর্থাৎ মোহাম্মদ (স.) এবং তাঁর সাথীরা,) যারা তোমাদের সাকী তথা তোমাদের পানি পান করানোর লোকদেরকে ধরে নিয়ে গেছে। এ সংবাদ শুনে কোরায়শ সেনাবাহিনীতে উত্তেজনা সৃষ্টি হলো এবং তারা এ কাজকে অপছন্দ করলো। সে রাতে বৃষ্টি হলো। আবু ইয়াসার নামক একজন সাহাবা ওবায়দা বিন সাঈদ বিন আসকে সেই রাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। অপরদিকে মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাযের ক্রীতদাস এবং উমাইয়া বিন খালফের ক্রীতদাস আবু রাফে' ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। আবু ইয়াসার সকলকে নিয়ে রসূল (স.)-এর দরবারে উপস্থিত হলো। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। তারা এসে বললো, আমরা কোরায়শদের সাকী। তারা আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে তাদেরকে পানি পান করাবার জন্যে। সাহাবায়ে কেরাম তাদের এ জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে তাদেরকে মারধর করলো। তখন তারা বললো, আমরা আবু সুফিয়ানের লোক। আমরা তার বাণিজ্য কাফেলার সাথে এসেছি। এ জবাব শুনে সাহাবারা তাদেরকে প্রহার করা থেকে বিরত রইলো। ইতিমধ্যে রসূল

www.pathagar.com

(স.) নামায শেষ করে সালাম ফিরিয়ে সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, যখন তারা সত্য বললো, তখন তোমরা তাদেরকে প্রহার করেছো। আর যখন মিথ্যা বললো, তখন তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দিলে? অতপর রসূল (স.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, টিলার পেছনে কোরায়শ বাহিনী অবস্থান করছে। তারা প্রত্যহ নয়টি বা দশটি উট যবেহ করে। তারা রসূল (স.)-কে আরো অবহিত করলো, কারা কারা মক্কা থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে এসেছে, তাদের কথা শুনে রসূল (স.) বললেন, কোরায়শ বাহিনীর সংখ্যা নয় শত থেকে এক হাজার। তিনি সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলোকে তোমাদের সামনে নিক্ষেপ করেছে।

রসূলুল্লাহ (স.) অবতরণের স্থান সম্পর্কে সাহাবাদের পরামর্শ চাইলেন। তখন হাব্বাব বিন মুন্‌যের আল জামুহ বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি আমাদেরকে কূপের নিম্নদেশের সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে চলুন। কারণ আমি সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি, কূপ ও সম্প্রদায় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি। সেখানে একটি অতি পুরাতন কূপ রয়েছে, যার পানি অধিক মিষ্টি। তাতে পর্যাপ্ত পানি বিদ্যমান। তার পার্শ্বে গর্ত খনন করে ডোবা তৈরী করবো। যার থেকে বাটি দিয়ে সহজেই পানি উঠিয়ে পান করবো এবং কোরায়শ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বো। আর এ কূপ ছাড়া বাকী সমস্ত কূপ বন্ধ করে দেবো। একথা শুনে রসূল (স.) বললেন, হে হাব্বাব, তুমি সঠিক পরামর্শ দিয়েছো ইবনে ইসহাক সূত্রে ইবনে হিশামের বর্ণনায় এসেছে, হাব্বাব বিন আল মুনযির বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, এটা কি আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত স্থান? যার সামনে বা পেছনে যাওয়ার কোনো অধিকার আমাদের নেই! না, এটা আপনার বুদ্ধি-প্রসূত চিন্তার ফসল? আর যুদ্ধ তো প্রতারণা হতে পারে না। জবাবে রসূল (স.) বললেন, এটা আমার স্বীয় চিন্তার ফসল আর যুদ্ধ প্রতারণা বৈ আর কিছুই নয়। তখন হাব্বাব বললেন, হে আল্লাহর রসূল, এটা আমাদের অবতরণের সঠিক স্থান নয়। তারপর তিনি তার দৃষ্টিতে সঠিক পরামর্শ দিলেন। এ কথা শুনে রসূল (স.) বসা থেকে দাঁড়ালেন এবং কুলাইবে বদর (বদর প্রান্তরের কূপ)-এর কাছে গিয়ে অবতরণ করলেন। সেখানে তিনি রাত্রি যাপন করলেন এবং খেজুর গাছের শিকড়মুখী হয়ে নামায পড়লেন। ওইটা ছিলো জুময়ার রাত্রি এবং রমযান মাসের সতের তারিখ। তিনি হাব্বাবের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ওই রাতে আল্লাহর নির্দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলো। এতে মুসলমানরা পরিতৃপ্ত হলো। যেহেতু তাদের শিবিরের মাটি বেলে মাটি ছিলো, সুতরাং বৃষ্টির পর চলাফেরা করতে কোনো প্রকার অসুবিধা হলো না। পক্ষান্তরে এ বৃষ্টির দরুন কোরায়শ বাহিনী মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হলো। তাদের শিবিরের মাটি ছিলো আঁটাল। তাদের জন্যে চলাফেরা করা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকি তারা তাদের শিবিরকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করতে পারছিলো না। কারণ তাদের মাঝখানে ছিল বালুর পাহাড় সদৃশ এক স্তূপ। এ বৃষ্টি মুসলমানদের জন্যে নেয়ামত ও শক্তির উৎস ছিলো। পক্ষান্তরে মোশরেকদের জন্যে এটা কঠিন পরীক্ষা ও শাস্তির কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলো। এই বৃষ্টির দরুন ওই রাতে ক্লান্ত শ্রান্ত মুসলমানদের প্রচন্ড তন্দ্রা এসেছিলো, যার

www.pathagar.com

ফলশ্রুতিতে তারা আরামের নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়েছিলো। তারা গভীর ঘুমে এমন অচেতন হয়ে পড়েছিলো যে, তাদের কেউ তার পার্শ্বে কি হচ্ছে তা অনুভব করতে পারছিলো না। ওই রাত্রে 'রেফায়া বিন রাফে' বিন মালেকের স্বপ্নদোষ হয়েছিলো। তিনি শেষ রাত্রিতে ফরয গোসল করেছিলেন। ওই রাতে রসূলে কারীম (স.) মোশরেকদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্যে আম্মার বিন ইয়াসের এবং আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে পাঠিয়েছিলেন। তারা ঘুরে এসে রসূলকে অবহিত করলেন যে, তারা ভীত সন্ত্রস্ত ও আতংকিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছে, কারণ আকাশ তাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করেছে।

রসূল (স.) যে কূপের পার্শ্বে অবতরণ করেছিলেন সেখানে খেজুরের ডালা দিয়ে তাঁর জন্যে একটি আসন তৈরী করা হলো। সা'দ বিন মো'য়ায সে আসনের ফটকে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে প্রহরী হিসাবে দাঁড়ালেন। রসূল (স.) যুদ্ধের স্থানে গেলেন এবং তাঁর সাথীদের সামনে তিনি কোরায়শ গোত্রের কাফের ও মোশরেকদের এক এক করে অসংখ্য মস্তক বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা শুনালেন এবং নাম ধরে বলতে লাগলেন এটা অমুকের মস্তক বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্থান আর ওটা অমুকের মৃত্যুর স্থান। রসূল (স.) যার মৃত্যুর স্থান যেখানে নির্ধারণ করেছিলেন, তাদের মধ্য হতে কেউ নির্ধারিত স্থান অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। তারপর রসূল (স.) মুসলমানদের সারি পূণর্বিন্যাস করে তিনি ও আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাদের আসনে প্রবেশ করলেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, রাতের প্রচুর বৃষ্টিতে কোরায়শরা প্রস্থানে বাধ্য হয়েছিল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে তারা পুনরায় ফিরে আসলো। অতপর যখন রসূল (স.) এদেরকে বালির স্তূপ হতে উপত্যকার দিকে লক্ষ্যবস্তু স্থির করতে দেখলেন, তখন তিনি আল্লাহর সামনে দোয়া করার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন। অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে ও কান্না বিজড়িত স্বরে তিনি দোয়া করতে থাকলেন, 'হে আল্লাহ! এই যে কোরায়শরা এসেছে, তাদের সকল ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা নিয়ে তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে। হে আল্লাহ! এখন তোমার সেই সাহায্য এসে যাওয়া দরকার, যার ওয়াদা তুমি আমার সাথে করেছিলে। হে আল্লাহ! যদি আজ এ মুষ্টিমেয় দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এ পৃথিবীতে আর কোথাও তোমার এবাদাত করার মতো কেউ থাকবে না। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ধ্বংস করো।' রসূল (স.) এ দোয়া করছেন এমন সময় তিনি ওতবা বিন রবীয়াকে একদল লোকবেষ্টিত লাল উটের ওপর আরোহিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, যদি ওই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালো লোক থেকে থাকে। তবে সে হচ্ছে লাল উটের অধিকারী। যদি তারা তার অনুসরণ করে, তবে তারা সৎপথ পাবে।

খুফাফ বিন আয়মা বিন রাহদা আল গিফারী বা তার পিতা আয়না বিন রাহদা আল গিফারী কোরায়শদের কাছে হাদিয়া স্বরূপ কিছু যবেহ করা জানোয়ার দিয়ে তার পুত্রকে একথা বলে পাঠালো যে, যদি তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ও জনবলের সাহায্য চাও, তবে আমরা তার জন্যে প্রস্তুত। খুফাফ বললো, কোরায়শরা এই বলে তার ছেলেকে তার কাছে ফেরত পাঠালো যে, তোমার এ সুন্দর প্রস্তাব আমাদের কাছে সাদরে গৃহীত

www.pathagar.com

হয়েছে। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ। জীবনের শপথ, যদি এমন হয় যে, আমরা মানুষের সাথে লড়াই করতে যাচ্ছি, তাহলে এক্ষেত্রে কোনো দুর্বলতার সুযোগ নেই। আর মোহাম্মদের ধারণানুসারে যদি আল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসে থাকি, তাহলে এটা স্বতসিদ্ধ কথা যে, তাঁর সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

যখন উভয় পক্ষ যুদ্ধের মাঠে অবতরণ করলো, তখন কোরায়শদের কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ (স.)-এর ডোবায় অবতরণ করে পানি পান করতে লাগলো। তাদের মধ্যে হাকীম বিন হেযামও ছিলো। সাহাবারা এতে আপত্তি করতে চাইলে রসূল (স.) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও। যারা এ ডোবা থেকে পানি পান করবে, তারাই যুদ্ধের মাঠে মৃত্যু বরণ করবে। কিন্তু হাকীম বিন হেযাম তার ব্যতিক্রম। তাকে হত্যা করা হবে না। তিনি পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সত্যিকার মুসলমানে পরিণত হয়েছিলেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, আমার পিতা ইসহাক বিন ইয়াসার এবং অপরাপর কয়েকজন পন্ডিত ব্যক্তি আনসারের কতক মাশায়েখ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, পরিবেশ শান্ত হওয়ার পর কোরায়শ বাহিনী ওমায়র বিন ওয়াহাব আল জুমাহীকে মোহাম্মদের সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যা নিরূপণের জন্যে পাঠালো। সে ঘোড়ায় চড়ে মুসলিম শিবিরের চতুর্পার্শ্বে ঘুরে গিয়ে রিপোর্ট পেশ করলো যে, মুসলমানদের সংখ্যা তিনশতের কিছু কম বা বেশী। অতপর সে বললো যে, আমাকে একটু সুযোগ দাও, আমি ভালো করে দেখে আসি যে, তাদের কিছু জনবল এবং রসদ লুক্কায়িত আছে কিনা। এরপর সে সেই উপত্যকায় দূর দূরান্ত ঘুরে এসে পুনরায় রিপোর্ট পেশ করলো যে, আমি কিছুই পাইনি, হে কোরায়শ সম্প্রদায়! আমি দেখছি যে, বিপদ মৃত্যুকে বয়ে নিয়ে আসছে। মদীনার মাটি ভয়ংকর মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছে। মুসলমানরা এমন সম্প্রদায়, যাদের কাছে তরবারি ছাড়া আত্মরক্ষামূলক কিছু নেই। এক্ষেত্রে আমার অভিমত হচ্ছে যদি তোমরা তাদের একজনকে হত্যা করো। তবে তারাও তোমাদের একজনকে হত্যা করবে। আর যদি তারা তোমাদের সমান সংখ্যক লোক হত্যা করে, তাহলে তোমাদের বেঁচে থাকার কী অর্থ হতে পারে? সুতরাং তোমরা এখনো বিষয়টি ভালো করে চিন্তা ভাবনা করে দেখো।

হাকীম ইবনে হেযাম এ কথা শুনে কোরায়শ বাহিনীর নেতাদের কাছে গেলো। প্রথমে সে ওতবা ইবনে রবীয়াকে গিয়ে বললো, 'হে ওয়ালীদের পিতা! আপনি কোরায়শ গোত্রের একজন মান্যবর প্রবীণ নেতা। আপনাকে সবাই মানে। আপনি কি এমন একটা কাজ করতে রাযী হবেন, যা করলে আপনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন? সে বললো, হাকীম, তুমি কী বলতে চাচ্ছো? হাকীম বললো, আপনি কোরায়শ বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আপনার মিত্র আমর ইবনে হাযরামীর হত্যাকান্ডের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার দায়িত্ব নিন। 'ওতবা বললো, হাঁ আমি তা করতে রাযী। এ ব্যাপারে আমি তোমার অনুরোধ রাখতে প্রস্তুত। হাযরামী আমার মিত্র এবং রক্তের মূল্য আদায় করার এবং তার সম্পদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার দায়িত্ব আমার। তুমি বরং আবু জাহলের

www.pathagar.com

কাছে যাও। আমি মনে করি, কোরায়শের বিনা যুদ্ধে ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্নে সে ছাড়া আর কেউই বিরোধিতা করবে না। এরপর 'ওতবা দাঁড়িয়ে কোরায়শ বাহিনীর উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ভাষণ দিলো,

আল্লাহর কসম! হে কোরায়শ দল! মোহাম্মদ ও তাঁর সংগী-সাথীদের সাথে লড়াই করে তোমাদের কোনো লাভ হবে না। আজ যদি তোমরা তাকে হত্যা করতেও সক্ষম হও, তারপরও তোমাদের ভেতরে কোনো সদ্ভাব বজায় থাকবে না। একজন আর একজনের মুখ দেখাকে পছন্দ করবে না। কেননা, সে তার চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই কিংবা অন্য কোনো না কোনো আত্মীয়ের হত্যাকারী বলে চিহ্নিত হবে। সুতরাং চলো আমরা ফিরে যাই এবং মোহাম্মদ এবং তাঁর সহচরদের পথ থেকে সরে দাঁড়াই। তাদের ব্যাপারটা তোমরা আরব জনগণের ওপর ছেড়ে দাও, যদি তারা তাঁকে হত্যা করে, তাহলে তো তোমাদের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে। আর তা না হলে মোহাম্মদের কাছে আমরা অন্তত নির্দোষ থাকবো।'

হাকীম বলেন, তারপর আমি আবু জাহলের কাছে গেলাম এবং দেখলাম যে, সে তার বর্ম সিন্দুক থেকে বের করে পরিষ্কার করছে। সে তাকে বললো, 'হে আবুল হাকাম! (এটা আবু জাহলের একটি উপনাম) 'ওতবা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। এরপর আমি ওতবা আমাকে যা বলেছিলো, তা তাকে জানালাম। আবু জাহল বললো, আল্লাহর শপথ! ওতবার জাদুবিদ্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং ভয়ে তার ফুসফুস ফুলে উঠেছে। তার মাথা তখন থেকে খারাপ হয়ে গেছে, যখন সে মোহাম্মদ এবং তার সংগীদের দেখেছে। আল্লাহর কসম! এটা কখনো হতে পারে না। যতোক্ষণ আল্লাহ তায়ালা আমাদের ও মোহাম্মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা না করে দেন, ততোক্ষণ আমরা ফিরে যাবো না। ওতবা যা বলেছে, ওটা তার মনের কথা নয়। যেহেতু মোহাম্মদ ও তাঁর অনুচররা সংখ্যায় খুব নগণ্য এবং তাদের ভেতরে তার ছেলেও রয়েছে। যুদ্ধ হলে তার ছেলের জীবন বিপন্ন হবে ভেবে সে এ ধরনের কথা বলেছে। এরপর আবু জাহল নিহত আমর ইবনে হাযরামীর ভাই আমের ইবনে হাযরামীর কাছে খবর পাঠালো যে, তোমার মিত্র ওতবা কোরায়শ বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তোমার ভাইয়ের হত্যার বদলার ব্যাপারটা তোমার নাগালের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং তুমি উঠো এবং ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিশ্রুতির কথা কোরায়শ বাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দাও।'

'আমের ইবনে হাযরামী উঠে দাঁড়ালো এবং তার ভাইয়ের হত্যার ঘটনা বর্ণনা করার পর সে হায় আমর, হায় আমর বলে চীৎকার করতে লাগলো। সংগে সংগে যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি হলো এবং সন্ধির সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলো। তারা যে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে মক্কা থেকে বের হয়েছিলো, তার জন্যে তারা সবাই প্রস্তুত হয়ে গেলো। ফলে, ওতবার শুভ উদ্যোগ নস্যাৎ হয়ে গেলো।

ওতবা যখন আবু জাহলের এ উক্তি শুনলো যে, 'ওতবার মাথা খাবাপ হয়ে গেছে', তখন সে বললো, অচিরেই সে ভীরু জানতে পারবে, আমার মাথা খারাপ হয়েছে, না

www.pathagar.com

তার মাথা খারাপ হয়েছে। এরপর উতবা তার মাথায় পরিধানের জন্যে লৌহ শিরস্ত্রাণ খোঁজ করলো। কিন্তু তার মাথা বড় ছিলো, গোটা সেনাদলের মধ্যে খোঁজ করেও তার মাথায় পরিধানের মতো কোনো লৌহ শিরস্ত্রাণ পাওয়া গেলো না। ফলে, সে তার মাথায় চাদর বেঁধে নিলো।

ইবনে ইসহাক বলেন, আস্ওয়াদ ইবনে আবদুল আসাদ আল-মাখযুমী ছিলো কোরায়শ বংশের একজন দুশ্চিরত্র ও গুন্ডা স্বভাবের লোক। সে বের হয়ে বললো, আল্লাহর কসম। আমি অবশ্যই মুসলমানদের ডোবা থেকে পানি পান করবো, কিংবা তা ভেংগে ফেলবো। আর প্রয়োজন হলে এর জন্যে মরেও যাবো। এই বলে সে ময়দানে নামলে হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেব (রা.) তার দিকে অগ্রসর হলেন। যখন তারা মুখোমুখি হলেন, তখন হামযা (রা.) আসওয়াদের পায়ে তরবারির আঘাত হানলেন। এতে তাঁর পা কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এ সময় সে হাউযের কাছেই ছিলো। সে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো এবং তার পা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। যা সবেগে তার সাথীদের গায়ে গিয়ে পড়তে লাগলো। এরপর সে হামাগুড়ি দিয়ে হাউযের দিকে এগুলো এবং নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্যে হাউযের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। হামযা (রা.) তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং হাউযের মধ্যেই তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করলেন।

এরপর ময়দানে অবতীর্ণ হলো ওতবা ইবনে রবীয়া, তার ভাই শায়বা ও ছেলে ওলীদ তার সংগে এলো। কোরায়শ বাহিনীর ব্যূহ ছেড়ে সামনে গিয়ে সে হুংকার ছেড়ে খন্ড যুদ্ধের আহবান জানালে আনসারদের মধ্য হতে তিনজন যুবক আওফ, মুয়াওয়েয ইবনে হারেছ এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তাদের মোকাবেলায় এগিয়ে গেলেন। কোরায়শ যোদ্ধারা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কারা? জবাবে তাঁরা বললেন, আমরা আনসার। তারা বললো, তোমাদের দিয়ে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। (ইবনে ইসহাক বলেন, ওতবা আনসার যুবকদের সম্বোধন করে বললো, সম্মানিত প্রতিপক্ষ কোথায়। আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের চাই।) তারপর তাদের একজন চিৎকার করে বললো, হে মোহাম্মদ, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা আমাদের সমকক্ষ, তাদেরকে পাঠাও। তখন রসূল (স.) ওবায়দা ইবনে হারেছ, হামযা ও আলী (রা.)-কে তাদের মোকাবেলায় যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা গিয়ে নিজ নিজ পরিচয় দিলে প্রতিপক্ষ খুশী হয়ে বললো, ঠিক আছে। এবার মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিপক্ষ মিলে গেছে। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে সবচাইতে বয়স্ক মোজাহেদ ওবায়দা থাকলেন ওতবা ইবনে রবীয়ার বিরুদ্ধে, হামযা শায়বার বিরুদ্ধে এবং আলী ওয়ালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। হামযা শায়বাকে এবং আলী ওয়ালীদকে পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ দিলেন না। প্রথম আঘাতেই তাদের হত্যা করলেন। আর 'ওবায়দা ও ওতবা উভয়ে একটি করে আঘাত বিনিময় করে, একে অপরকে আহত করলেন। কিন্তু একে অপরকে পুরোপুরি কাবু করতে সক্ষম হলেন না। পক্ষান্তরে হামযা ও আলী তাদের প্রতিপক্ষকে কাবু করার পর 'উবায়দার সাহায্যে দ্রুত ছুটে গিয়ে, নিজ নিজ তরবারির

www.pathagar.com

আঘাতে ওতবাকে হত্যা করলেন। এরপর ওবায়দাকে আহতাবস্থায় তারা কাঁধে তুলে নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে পৌঁছে দিলেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, এরপর উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হলো এবং একদল অপর দলের মুখোমুখি হলো। ইতিপূর্বে রসূলুল্লাহ (স.) সাহাবাদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত তারা যেন আক্রমণ না করে। তিনি এও বলেন, কোরায়শ পক্ষ তোমাদের ঘিরে ফেললে তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে হটিয়ে দিও। রসূলুল্লাহ (স.) এ সময় মুসলিম বাহিনীকে সারিবদ্ধ করে আবু বকর সিদ্দীকসহ তাঁর আসনে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি আল্লাহর ওয়াদা করা সাহায্য নাযিলের জন্যে কায়মনোবাক্যে দো'য়া করতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা পরওয়ারদেগার! তুমি যদি আজ এ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে ফেলো, তবে এ যমীনে তোমার এবাদাত করার মত কেউ থাকবে না, রসূলের এ কান্না বিজড়িত কণ্ঠ ও ফরিয়াদ শুনে আবু বকর (রা.) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার দোয়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছে গেছে। আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন।

আল্লামা মাকরেযীর 'ইমতাউল আসমা' নামক গ্রন্থে এসেছে যে, একদা আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রসূলুল্লাহ (স.)-এর দরবারে এ বলে নিবেদন করলেন যে, ইয়া রসূলাল্লাহ আমি আপনাকে এ মর্মে পরামর্শ দিচ্ছি (অথচ রসূল (স.) অধিকতর মহৎ ও জ্ঞানী, যার পরামর্শের কোনো প্রয়োজন নেই) যে, আল্লাহকে তাঁর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি মহাজ্ঞানী এবং অদৃশ্য সম্পর্কেও পুরোপুরি অবহিত আছেন। তিনি মহীয়ান ও গরীয়ান। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে সম্বোধন করে বললেন, হে ইবনে রাওয়াহা! আমি কি আল্লাহকে তাঁর ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেবো না? নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

ইবনে ইসহাক বলেন, আসনে বসা অবস্থায় রসূলুল্লাহ (স.) তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এরপর তিনি জাগ্রত হয়ে বলেন, 'হে আবু বকর, সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। এই তো জিবরীল, তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন। আর তাঁর ঘোড়ার সামনের দাঁতগুলো ধূলাময়লাযুক্ত।'

এ সময় কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি তীর এসে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর আযাদ করা গোলামের শরীরে বিদ্ধ হয়। ফলে তিনি শহীদ হন। ইনি হলেন বদর যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম শহীদ। এরপর আদী ইবনে নাজ্জার গোত্রের হারেছা ইবনে সুরাকা নামক সাহাবীর প্রতি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। এ সময় তিনি হাউযের পানি পান করছিলেন। নিক্ষিপ্ত তীর তার গলায় বিদ্ধ হলে তিনিও শাহাদত বরণ করেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (স.) মোজাহেদ বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাদের যুদ্ধের জন্যে অনুপ্রাণিত করে বললেন, 'ওই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মোহাম্মদের জীবন। আজ যে ব্যক্তি কাফেরদের বিরুদ্ধে সবরের সংগে,

www.pathagar.com

সাওয়াবের প্রত্যাশায় যুদ্ধ করবে এবং সামনে অগ্রসর হবে, কোনো অবস্থায় পিছু হটবে না, এমতাবস্থায় যদি সে শহীদ হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' এ সময় বনু সালামা গোত্রের ওমায়র ইবনুল হুমাম (রা.) হাতে কয়েকটি খোরমা নিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কথা শুনেই বললেন, বাহ্! বাহ্! কি চমৎকার! আমি দেখছি যে, আমার এবং জান্নাতের মাঝে এতোটুকু ব্যবধান রয়েছে যে, আমি কাফেরদের হাতে শহীদ হয়ে যাই। রাবী বলেন, এই বলেই তিনি তার হাত থেকে খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তরবারি নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং শহীদ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, 'আসেম বিন ওমর বিন কাতাদা আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আওফ ইবনুল হারেছ-যার মায়ের নাম আফরা- যুদ্ধের ময়দানে এক পর্যায়ে রসূলে কারীম (স.)-এর খেদমতে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার ওপর কোন কাজে বেশী খুশী হন? তিনি বললেন, যখন সে বর্মহীন হয়ে তার দুশমনদের ওপর সর্বাত্মকভাবে আক্রমণ করে। একথা শুনে তিনি তার শরীর থেকে বর্ম খুলে ফেলে দিলেন। এরপর তার তরবারী নিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান।

ইবনে ইসহাক বলেন, মোহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয্-যুহরী বনী যুহরার মিত্র আবদুল্লাহ ইবনে ছা'লাবা ইবনে সাঈর আল-উযরী থেকে আমাকে বর্ণনা করে শুনান যে, তিনি একদা মোহাম্মদ বিন মুসলিমকে এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করে শুনান যে, যখন মুসলিম ও কোরায়শ বাহিনী একে অপরের মুখোমুখি হয়ে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হলো, তখন আবু জাহল ইবনে হিশাম নিম্নরূপ দোয়া করলো, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে এবং আমাদের কাছে এক অজানা ধর্ম এবং নতুন (দ্বীন) জীবনবিধান নিয়ে এসেছে, তাকে তুমি আজ সকালে ধ্বংস করে দাও। এর দ্বারা আবু জাহল বিজয় কামনা করেছিলো।

ইবনে ইসহাক বলেন, অতপর রসূলুল্লাহ (স.) এক মুষ্টি বালুকা কণা ও কাঁকর নিয়ে কোরায়শদের প্রতি মুখ করে বললেন, 'শাহাতিল উজুহ' (ওদের মুখ বিকৃত হয়ে যাক/ওদের চেহারা কুৎসিত হোক) এই দো'য়া পড়ে বালিতে দম দিয়ে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং সাহাবীদের প্রতি নির্দেশ দিলেন, জোর হামলা চালাও। অল্পক্ষণের মধ্যেই কোরায়শ বাহিনীর চরম পরাজয় ঘটলো। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের হাতে বড় বড় কোরায়শ নেতাদের হত্যা করালেন এবং তাদের অনেক নেতাকে বন্দী করালেন। যখন মুসলিম মোজাহেদরা কাফেরদের বন্দী করছিলেন, তখন রসূল (স.) আসনে অবস্থান করছিলেন। এ সময় সা'দ ইবনে মো'আয (রা.) একদল আনসার সাহাবী নিয়ে উন্মুক্ত তরবারি হাতে আসনের সামনে পাহারা দিচ্ছিলেন। মুসলিম মোজাহেদদের কাফেরদের বন্দী করতে দেখে সা'দ ইবনে মো'য়ায (রা.)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টি ফুটে উঠলো। রসূলাল্লাহ (স.) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে সা'দ, আল্লাহর কসম! আমার মনে হচ্ছে, মুসলিম মোজাহেদদের এ কাজে তুমি খুশী নও।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ! এটা ইসলাম ও কুফরের মাঝে প্রথম যুদ্ধ, যাতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন। আজ মোশরেকদের খতম করার প্রথম সুযোগ আল্লাহ তায়ালা দিয়েছিলেন। আজ ওদের বন্দী করার চেয়ে বেশী হত্যা করাই ছিলো আমার কাছে পছন্দনীয় কাজ?

ইবনে ইসহাক বলেন, আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মা'বাদ তাঁর কিছু পরিবার পরিজন থেকে– তারা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করে আমাকে শুনান যে, নবী করীম (স.) তাঁর সাথীদের সম্বোধন করে সেদিন বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, বনী হাশেমসহ অন্যান্য গোত্রের কিছু সংখ্যক লোককে কোরায়শ নেতারা জোর যবরদস্তি করে যুদ্ধে নিয়ে এসেছে। আমাদের সাথে যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা তাদের ছিলো না। কাজেই বনু হাশেমের কেউ তোমাদের সামনে পড়লে তাকে হত্যা করো না। আবুল বুহতরী ইবনে হেশাম ইবনে হারেছ ইবনে আসাদকে কেউ পেলে হত্যা করো না। কেননা, তাকে যবরদস্তি করে যুদ্ধে আনা হয়েছে। আর আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব কারো সামনে পড়লে তাকেও হত্যা করো না। কেননা, তাকেও জোর করে যুদ্ধে আনা হয়েছে। এ কথা শুনে মুসলিম বাহিনীর আবু হোযায়ফা (রা.) বললেন, আমরা আমাদের বাপ-ভাই, পুত্র ও আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করবো, আর আব্বাসকে কেন ছেড়ে দেবো? আল্লাহর কসম! আমার সামনে পড়লে আমি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করবোই। এ সংবাদ রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে পৌছলে তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবকে সম্বোধন করে বললেন, ওহে আবু হাফস। আল্লাহর রসূলের চাচার ওপর কি তরবারি চালানো যায়? 'ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেই। আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চিত যে, আবু হোযায়ফা মোনাফেক হয়ে গেছে। এ ঘটনার জন্যে পরবর্তীকালে আবু হোযায়ফা প্রায়ই আফসোস করে বলতেন, বদর যুদ্ধের দিন আমার ওই কথাটা বলার জন্যে কি শাস্তি হয়, তাই ভেবে আমি সদা ভীতসন্ত্রস্ত ও শংকিত থাকতাম এবং মনে করতাম একমাত্র শাহাদতের পেয়ালা পান করাই আমার উক্তির কাফফারা হতে পারে। পরবর্তীকালে মুরতাদদের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

ইবনে ইসহাক বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) আবুল বোখতরীকে একারণে হত্যা করতে নিষেধ করছিলেন যে, সে রসূলুল্লাহ (স.)-এর মক্কায় থাকাকালে তাঁর বিরোধিতায় অন্যদের তুলনায় অধিক সংযত ছিলো। সে রসূল (স.)-কে কষ্ট দিতো না। আর তার থেকে এমন কোনো কাজ প্রকাশ পায়নি, যা রসূলুল্লাহ অপছন্দ করতেন। আর বনু হাশেম ও বনু মোত্তালেবকে আবু তালেবের গিরি সংকটে অন্তরীণ রেখে যে নির্দেশনামা কোরায়শ নেতারা জারী করেছিলো, সে নির্দেশনামা ছিন্নকারী নেতাদের মধ্যে আবুল বোখতরী ছিলো অন্যতম। অবশ্য বন্দী হতে অস্বীকৃতি জানাবার দরুন পরবর্তীতে তাকে হত্যা করা হয়।

ইবনে ইসহাক বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুয যোবায়র তার পিতা আব্বাদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'উমাইয়া ইবনে খালফ মক্কায়

আমার বন্ধু ছিলো। আমি মুসলমান হওয়ার পর যখন আমার আগের নাম 'আবদ আমর বদলে আবদুর রহমান রাখলাম, তখন উমাইয়া আমাকে বললো, তুমি তোমার বাপ মার রাখা নামটা বাদ দিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বললো, আমি 'রহমান' কে জানিনা। কাজেই তুমি তোমার এমন একটা নাম রাখো, যে নামে আমি তোমাকে ডাকতে পারি। তোমার অবস্থা এই যে, আমি যদি তোমাকে তোমার আগের নামে ডাকি, তবে সে ডাকে তুমি সাড়া দেও না। আর আমার অবস্থা এই যে, তোমাকে আমি এমন নামে ডাকতে প্রস্তুত নই, যে নামের সাথে আমার পরিচয় নেই। আবদুর রহমান (রা.) বলেন, বস্তুত সে যখন আমাকে আব্দ আমর বলে ডাকতো, তখন সে ডাকে আমি সাড়া দিতাম না। এরপর আমি তাকে বললাম, হে আবু আলী। তোমার পছন্দ মতো একটা নাম নির্ধারণ করে নাও। তখন সে বললো, তা হলে তোমার নাম হলো 'আবদ ইলাহ। তখন আমি বললাম, ঠিক আছে। এরপর যখনই তাঁর পাশ দিয়ে যেতাম, তখন সে বলতো, হে 'আব্দ ইলাহ। আমি তার এ ডাকে সাড়া দিতাম এবং তার সাথে কথা বলতাম। বদরের যুদ্ধের দিন আমি যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সে তার ছেলে আলী ইবনে উমাইয়ার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলো। এ সময় আমার সাথে কয়েকটি লৌহবর্ম ছিলো। যা আমি নিহত শত্রু থেকে পেয়েছিলাম। এগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় সে আমাকে দেখে আব্দ আমর বলে ডাক দিলে আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। তখন সে আমাকে বললো, তুমি আমার ব্যাপারে কী চিন্তা করছো? তোমার সংগে যে বর্মগুলো আছে তার চাইতে আমি তোমার জন্যে উত্তম নই? আমি বললাম, হাঁ, আল্লাহর কসম। এতো খুশীর কথা। তখন বর্ম ফেলে দিয়ে উমাইয়া এবং তার ছেলের হাত ধরলাম। তখন সে বললো, আজকের দিনের মতো আর কোনো দিন আমি দেখিনি। তোমাদের কি দুগ্ধবতী উটনীর প্রয়োজন নেই? আবদুর রহমান (রা.) বলেন, এরপর আমি এদের দু'জনকে নিয়ে চললাম। এসময় উমাইয়া ইবনে খালফ আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ওই ব্যক্তি কে, যে তার বুকে উট পাখির পালক লাগিয়ে রেখেছে? আমি বললাম, তিনি হলেন, হামযা ইবন আবদুল মোত্তালেব (রা.)। তখন সে বললো, এতো সেই ব্যক্তি, যে আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। আবদুর রহমান বলেন, আল্লাহর কসম। এরপর আমি তাদের উভয়কে যখন টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ বেলাল (রা.) তাকে আমার সংগে দেখলেন। আর এ ছিলো সে ব্যক্তি, যে বেলালকে ইসলাম পরিত্যাগ করার জন্যে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতো। তাকে মরুভূমিতে নিয়ে যেতো এবং তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে বুকের ওপর পাথর-চাপা দিয়ে রেখে বলতো, তুমি এ অবস্থায় থাকবে, নয় মোহাম্মদের দ্বীন পরিত্যাগ করবে। এ সময় বেলাল 'আহাদ' 'আহাদ' বলতেন। অর্থাৎ তিনি 'আল্লাহ এক' বলে চিৎকার করতেন। যখন বেলাল (রা.) তাকে দেখলেন, তখন তিনি বলে উঠলেন, এই তো কুফরীর মূল হোতা উমাইয়া ইবনে খালফ। সে বেঁচে গেলে আমার বাঁচা অর্থহীন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলেন, আমি বললাম, হে বেলাল! তুমি আমার বন্দীদ্বয় সম্পর্কে এরূপ বলছো? তখন বেলাল (রা.) বললেন, 'সে বেঁচে গেলে আমার বাঁচার কোনো অর্থ হয় না।'

www.pathagar.com

এরপর বেলাল (রা.) উচ্চেস্বরে চিৎকার করে বললেন, হে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারীরা। এই তো কুফরীর মূল নায়ক উমাইয়া ইবনে খালফ। সে বেঁচে গেলে আমার বাঁচা অর্থহীন। আবদুর রহমান (রা.) বলেন, এরপর লোকেরা আমাদের ঘিরে ফেললো। আর আমি উমাইয়াকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম। ইতিমধ্যে একজন মোজাহেদ তার তরবারি বের করে উমাইয়ার ছেলের পায়ে আঘাত করলে সে পড়ে গেলো। তা দেখে উমাইয়া এমন জোরে চিৎকার করলো যে, আমি অমন চিৎকার আর কখনো শুনিনি। আমি বললাম, উমাইয়া তুমি নিজের কথা ভাবো। তোমার নিস্তার নেই। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আর রক্ষা করতে পারবো না। অবশেষে লোকেরা তাদের উভয়কে তরবারির আঘাতে টুকরো টুকরো করে ফেলে। পরে আবদুর রহমান (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বেললের ওপর রহম করুন। আমি বর্ম ফেলে দিয়ে যাকে গ্রেফতার করলাম, তাকে সে হত্যা করলো।

ইবনে ইসহাক বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) যখন দুশমনদের মোকাবেলা থেকে মুক্ত হলেন, তখন তিনি নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আবু জাহল ইবনে হেশামকে অনুসন্ধান করতে বললেন। যুদ্ধের ময়দানে যে মুসলিম সৈনিকের সাথে সর্বপ্রথম আবু জাহলের সাক্ষাত হয়, তিনি হলেন বনু সালামার মোয়ায ইবনে আমর ইবনে জামুহ। তিনি বলেন, আবু জাহলের যখন খোঁজাখুঁজি হচ্ছিলো, তখন আমি শুনলাম, সে একটি ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে আছে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, যেভাবেই হোক তাকে খুঁজে বের করবোই। আমি যখন তার কাছে পৌছলাম, তখন তার ওপর আক্রমণ চালিয়ে তার পা কেটে ফেললাম। তখন তার ছেলে ইকরামা আমাকে আঘাত করে আমার হাত কেটে ফেললো। হাতখানা কেবল চামড়ার সাথে ঝুলছিলো। এতে আমার যুদ্ধ করতে অসুবিধা হচ্ছিলো। অগত্যা ঝুলন্ত হাতখানা পা দিয়ে চেপে ধরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললাম। ইবনে ইসহাক বলেন, এই বীর মোজাহেদ হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মো'য়ায বলেন, এরপর মোয়াওয়ায ইবন আরেক এসে আর এক আঘাত করে আবু জাহলকে ধরাশায়ী করলো। মোয়াওয়ায (রা.) পরে লড়াই করে বদরেই শহীদ হন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি যখন আবু জাহলকে ময়দানে শায়িত দেখলাম, তখনো সে বেঁচে ছিলো। সে আমাকে মক্কায় অপদস্থ করেছিলো। আমি তার ঘাড়ে পা দিয়ে চেপে ধরলাম এবং বললাম, 'হে আল্লাহর দুশমন। আল্লাহ তায়ালা তোকে অপদস্থ করেছেন তো? সে বললো, যাকে তোমরা প্রায় হত্যা করেছো, তার আর অপদস্থ হবার প্রশ্ন আসে কি? আমাকে বলো, আজ কাদের জয় হচ্ছে? আমি বললাম, 'জয় হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের।' ইবনে ইসহাক বলেন, ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আবু জাহল মৃত্যুর পূর্বে আমাকে বলেছিলো, হে মেষের রাখাল! তুই অনেক দুর্লভ মর্যাদা লাভ করেছিস। তিনি বলেন, তারপর আমি তার মাথা কেটে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (স.)! এই যে আল্লাহর দুশমন আবু জাহলের মাথা! রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, সত্যি? আমি বললাম,

www.pathagar.com

আল্লাহর কসম! সত্যি। এরপর তার মাথাটা রসূলাল্লাহ (স.)-এর সামনে রেখে দিলাম। তিনি তা দেখে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করলেন।

ইবনে হিশাম বলেন, 'ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) একবার সাঈদ ইবনে আস (রা.)-কে বললেন– যখন তিনি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন– মনে হয়, তোমার মনে এরূপ ধারণা বিদ্যমান যে, আমি তোমার পিতা আসকে হত্যা করেছি। যদি তা করে থাকতাম, তবে সে জন্যে তোমার কাছে কোনোরূপ ওযর পেশ করতাম না। আসলে আমি আমার মামা 'আস ইবনে মুগীরাকে হত্যা করেছিলাম। তোমার আব্বাও আমার সামনে পড়েছিলো। তবে সে ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মতো আমার দিকে এগিয়ে আসায় আমি দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়ি। এরপর তাকে তার চাচাতো ভাই আলী (রা.) হত্যা করেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, ইয়াযীদ ইবনে রুমান ওরওয়া ইবনে যোবায়র সূত্রে আয়েশা (রা.) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এরপর রসূল (স.)-এর নির্দেশ মতো নিহত মোশরেকদের বদর কূপে নিক্ষেপ করা হলো। তবে উমাইয়া ইবনে খালফের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা হলো না। কেননা, তার লাশ তার বর্মের মধ্যে ফুলে-ফেঁপে আটকে গিয়েছিলো। সাহাবীরা তার লাশ বের করার জন্যে চেষ্টা করলে তার গোশত ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগলো। এ অবস্থা দেখে তাঁরা তাকে যেমন ছিলো তেমনভাবে রেখে মাটি ও পাথর চাপা দিলেন। কূপের মধ্যে লাশগুলো নিক্ষেপ করার পর রসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে বললেন, হে কূপের অধিবাসীরা! তোমাদের রব তোমাদের জন্যে যা ওয়াদা করেছিলেন, তা কি তোমরা সত্য পেয়েছো? আমার সংগে আমার রব যা ওয়াদা করেছিলেন, তা আমি সত্য পেয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সাহাবীরা বলেন, ইয়া রসূল (স.)! আপনি কি মৃতদের সাথে কথা বলছেন? তখন তিনি তাদের বললেন, তারা এতক্ষণে ভালোভাবে জেনেছে যে, তাদের রব তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা সত্য।

ইবনে ইসহাক বলেন, রসূল (স.) যখন মোশরেকদের লাশ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন, তখন উতবা ইবনে রবী'য়ার লাশ টেনে কূপের কাছে আনা হলো। এ সময় রসূল (স.) তার ছেলে আবু হোযায়ফার (যিনি ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন) মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, সে মর্মাহত এবং তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। তখন নবী (স.) বললেন, সম্ভবত তোমার পিতার অবস্থা দেখে তোমার অন্তরে কিছু ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আমার পিতার কুফরী ও হত্যার ব্যাপারে কখনো দুঃখিত হয়নি। তবে আমি আমার পিতাকে যথেষ্ট জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সহিষ্ণু এবং উন্নত গুণের অধিকারী বলে জানতাম। সে জন্যে আশা করেছিলাম যে, এসব গুণ বৈশিষ্ট্য আমার পিতাকে একদিন ইসলামের পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি যখন দেখলাম যে, এসব গুণ বৈশিষ্ট্য আমার পিতাকে ইসলামের পথে আনলো না। শেষ পর্যন্ত কুফরী নিয়েই তার মৃত্যু তাই আমার মনের আশা পূর্ণ না হওয়ায় আমি

www.pathagar.com

মর্মাহত হয়েছি। একথায় রসূল (স.) হোযায়ফার কল্যাণের জন্যে দো'য়া করলেন এবং তার প্রশংসা করলেন।

এরপর রসূল (স.) সৈন্যদের মধ্যে যে গনীমতের মাল ছিলো তা একত্রিত করার নির্দেশ দিলেন। তখন তা একত্রিত করা হলো। গনীমতের মালের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। যারা ওই সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন, তারা বললেন, এ সম্পদ আমাদের প্রাপ্য। যারা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা বললেন, এগুলো আমাদের পাওনা। আল্লাহর কসম! আমরা যদি যুদ্ধ না করতাম, তাহলে তোমরা এগুলো সংগ্রহ করার সুযোগই পেতে না। যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় আমরা তোমাদের সাথে গনীমত কুড়ানোর কাজে যোগ দিতে পারিনি। আর তোমরা এগুলো সংগ্রহ করতে পেরেছো। শত্রুরা ভিন্ন পথ দিয়ে এসে রসূল (স.)-এর ওপর হামলা করতে পারে, এই আশংকায় যারা তাঁর পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন, তারা বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা আমাদের চেয়ে এর বেশী হকদার নও। শত্রুকে আমরা বাগে পেয়েছিলাম এবং আমরা তাদের হত্যা করতে পারতাম। আল্লাহর কসম! আমরা বিনা বাধায় গনীমতের মাল লাভের সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু শত্রুরা নতুন করে রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর আক্রমণ চালাতে পারে, এই আশংকায় আমরা তাঁর পাহারায় নিয়োজিত ছিলাম। সুতরাং এই সম্পদে তোমাদের অধিকার আমাদের চেয়ে বেশী নয়।'

ইবনে ইসহাক বলেন, গনীমত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেন, আমরা যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, তাদের মধ্যে মালে গনীমত নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। আমাদের মতবিরোধ কিছুটা খারাপ পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলো। তখন আল্লাহ তায়ালা তা আমাদের হাত থেকে নিয়ে তাঁর রসূলের হাতে সমর্পণ করেন। আর রসূল (স.) তা সমস্ত মুসলমানের সমভাবে বন্টন করে দেন। এ সম্পর্কে সূরা আনফালের প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়।

ইবনে ইসহাক বলেন, মদীনায় পৌছে রসূল (স.) যুদ্ধবন্দীদের সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং বলেন, তোমরা কয়েদীদের সাথে ভালো ব্যবহারের কথা স্মরণ রাখবে। রাবী বলেন, সাহাবী মোসায়ব ইবনে ওমায়র (রা.)-এর সহোদর ভাই আবু আযীয ইবনে ওমায়র ইবনে হাশেম বন্দীদের মধ্যে ছিলো। আবু আযীয বলেন, এসময় আমার ভাই মোসায়ব আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তখন একজন আনসার সাহাবী আমাকে বন্দী করে রেখেছিলো। আমার ভাই আনসারকে বলেন, একে শক্ত করে বেঁধে রাখো, এর মা বিত্তশালী। সে ফিদয়া দিয়ে একে ছাড়িয়ে নেবে। আবু আযীয আরো বলেন, বদর প্রান্তর থেকে বন্দী হয়ে আসার সময় আমি আনসারদের সংগে ছিলাম। তারা রসূল (স.)-এর নির্দেশ মতো খাবার সময় আমাকে রুটি খেতে দিতো, অথচ নিজেরা শুধু একটু খেজুর খেতো। তিনি আরো বলেন, আমি লজ্জায় রুটি তাদের ফিরিয়ে দিতাম, কিন্তু তারা তা স্পর্শ না করে তা আমার কাছে ফেরত পাঠাতেন।

www.pathagar.com

ইবনে হিশাম বলেন, আবু আযীয ছিলো নযর ইবনে হারেছের পরেই কোরায়শ বাহিনীর পতাকাবাহী সেনাধ্যক্ষ। মোসায়ব (রা.) যখন তার ভাই আবু আযীযকে বন্দী করে আনয়নকারী আনসার সাহাবী আবু ইয়াসার (রা.)-কে শক্ত করে তার হাত বাঁধার জন্যে বলেন, তখন সে মোসায়ব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে, হে আমার ভাই, আমার ব্যাপারে এরূপ করার কি নির্দেশ পেয়েছেন? তখন মোসায়ব (রা.) বলেন, তুমি আমার ভাই নও, সে আমার ভাই।

এরপর আবু আযীযের মা মুসলমানদের কাছে জানতে চায় যে, কতো অধিক ফিদ্‌য়ার বিনিময়ে কোরায়শ বন্দীকে ছাড়া হচ্ছে? তখন তাকে বলা হলো, চার হাজার দিরহাম, সে অনুযায়ী তার মা চার হাজার দিরহাম ফিদয়া স্বরূপ পাঠিয়ে তাকে মুক্ত করে নেয়।

উল্লেখিত বদর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সূরা আনফাল অবতীর্ণ হয়েছে, যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যথাসাধ্য আমি পূর্বে করেছি। সূরা আনফাল নাযেল হয়েছে নিম্নের কারণগুলোকে সামনে রেখে,

১. বদর যুদ্ধের বাহ্যিক ঘটনাবলী বর্ণনা করা।

২. বাহ্যিক ঘটনাবলীর পশ্চাতে আল্লাহর সুনিপুণ কুদরতের কথা বলা।

৩. উক্ত ঘটনাবলী ও তার পরবর্তী ঘটনাসমূহের আলোকে গোটা মানবইতিহাসের ধারায় আল্লাহর কুদরত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনাকে উন্মোচন করা।

আল্লাহ তায়ালা বদর যুদ্ধের ঘটনাবলী কোরআনে হাকীমে সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধের বিভিন্ন দিকের বিস্তারিত বর্ণনা আমরা এই সূরার বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় পাবো। এখানে আমি এই সূরার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

বদর যুদ্ধের মাঝে একটি বিশেষ ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। যা যুদ্ধের গতিপথ সম্পর্কে আলোকপাত করে। ওই বিশেষ ঘটনাটি ইবনে ইসহাক ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, তাদের মধ্যে মালে গনীমত নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তা খারাপ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো। তখন আল্লাহ তা আমাদের হাত থেকে নিয়ে তাঁর রসূলের হাতে সমর্পণ করেন, আর রসূল (স.) তা সমস্ত মুসলমানের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেন। এ সম্পর্কে সূরা আনফালের প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়।

এই ঘটনাটি সূরার সূচনা এবং তার গতিপথের প্রতি আলোকপাত করে।

বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত সামান্য মালে গনীমত নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ তায়ালা তার বন্টনের দায়িত্ব রসূলে করীম (স.)-এর হাতে ন্যস্ত করেন। কেয়ামত পর্যন্ত মানবইতিহাসে এ জাতীয় যতো ঘটনা ঘটবে, সকল ঘটনার জন্যে এটাকে একটি অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে পেশ করেছেন। যার থেকে যুগে যুগে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করবে। আল্লাহ তায়ালা এ ঘটনার মাধ্যমে শুধু সাহাবায়ে কেরাম নয়, বরং পরবর্তীতে এ ধরাতে আগমনকারী গোটা মানবতাকে এক বিরাট বিষয় শিক্ষা

www.pathagar.com

দিতে চেয়েছেন। আর তা হচ্ছে বদর যুদ্ধের ঘটনাটি শুধু গনীমতের মাল-সামগ্রী প্রাপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা তার চেয়ে অনেক বড় ও ব্যাপক। আল্লাহ পাক বদর যুদ্ধের দিনের নামকরণ করেছেন 'ফয়সালা ও মীমাংসার দিন' করে। কারণ, এ দিনে মুসলমান এবং কোরায়শ বাহিনী একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলো। এদিনে হক ও বাতেল, সত্য ও অসত্য, ন্যায় ও অন্যায় এবং ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা এ যুদ্ধের মাধ্যমে মোমেনদেরকে আরো শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে, এ যুদ্ধের প্রত্যেকটি ছোটো বড়ো পদক্ষেপ তাঁরই পরিচালনায় ও নিয়ন্ত্রণে সম্পাদিত হয়েছে। আর তার পেছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো, যা একমাত্র তিনিই ভালো করে জানেন। সুতরাং এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, বদর যুদ্ধে বিজয় এবং তার পরবর্তী বৃহৎ ঘটনাবলীতে মোমেনদের ভূমিকাই মুখ্য এবং তারাই কৃতিত্বের একমাত্র দাবীদার। কারণ আল্লাহর সাহায্য যদি তাদের সহায়ক না হতো, তবে এ বিজয় তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। আল্লাহ তায়ালা বদরের ঘটনার মাধ্যমে মোমেনদেরকে চমৎকার পরীক্ষা করেছিলেন।

বদর যুদ্ধে যে সকল মোমেন মোজাহেদ রসূলের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের ইচ্ছা ছিলো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমণ করে বিজয়ী হওয়া। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো তারা কোরায়শ বাহিনীর মুখোমুখি হোক। এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের ইচ্ছা এবং তাঁর ইচ্ছার মধ্যকার ব্যবধানের পরিধি নিরূপণ করেছেন।

সূরা আনফালের সূচনা হয়েছে মালে গনীমত সম্পর্কে মোমেনদের প্রশ্নের মাধ্যমে, এতে আল্লাহর হুকুম বর্ণনা করা, ফয়সালার জন্যে মালে গনীমতকে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (স.)-এর হাতে হাতে সমর্পণ করা, 'ওবাদা ইবন সামেত (রা.)-এর বর্ণনানুসারে মালে গনীমত সম্পর্কে মোমেনদের মতবিরোধ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছার পর তাদেরকে আল্লাহভীতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নেয়ার আহ্বান করার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে এই সূরার শুরু হয়েছে মোমেনদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করা, তাদের ঈমানের দাবী স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তাদের সামনে এমন একটি চিত্র অংকন করা, যার মাধ্যমে তাদের অন্তর ও হৃদয় কেঁপে ওঠে। (আয়াত ১-৪)

অতপর আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন নিজেদের ব্যাপারে তাদের এবং তাঁর সিদ্ধান্ত। এ দুই সিদ্ধান্তের মাঝে পার্থক্য এবং তাদের জন্যে তাঁর সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছার পেছনের কী হেকমত লুকিয়ে আছে সে সম্পর্কে তাদেরকে সম্যক ধারণা দেয়া। (আয়াত ৫-৮)

নিম্নের আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আরো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর পক্ষ থেকে যুদ্ধের মাঠে ফেরেশতা নাযিলের মাধ্যমে তাদের সাহায্য দান, পরবর্তীতে মোশরেক বাহিনীর ওপর তাদের বিজয় দান এবং পরকালে তাঁর কাছে তাদের প্রতিদানপ্রাপ্তি সম্পর্কে। (আয়াত ৯-১৪)

www.pathagar.com

সামনের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ পাক বর্ণনা করেন যে, পুরো যুদ্ধটি তাঁর পরিচালনা, নেতৃত্ব, নির্দেশনা, সাহায্য, নিরূপণ ও নির্ধারণেই সম্পাদিত হয়েছে। এ যুদ্ধটি তাঁর জন্যে এবং তাঁরই পথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারপর তিনি মুসলিম আনফাল তথা গনীমতের মাল সামান বন্টনের দায়িত্ব তাঁর এবং তাঁর প্রিয় হাবীব মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহের হাতে নিয়ে নিলেন। যেহেতু তাঁর পক্ষে সরাসরি বন্টন সম্ভব নয়, সেহেতু সে দায়িত্বটি রসূলের ওপরই পুরোপুরি বর্তালো। তারপর তিনি ঘোষণা করলেন যে, যেহেতু মালে গনীমত বন্টনের মূল দায়িত্ব একমাত্র তাঁর হাতেই অর্পিত, সেহেতু তিনি যদি তার থেকে মুসলিম মোজাহেদদের মাঝে বন্টন করে দেন, তবে তা তাঁর পক্ষ হতে তাদের জন্যে করুণা এবং এহসান হিসাবেই গণ্য হবে। অনুরূপভাবে তিনি তাদেরকে যাবতীয় মালে গনীমত ও তার লোভ লালসা থেকে মুক্ত করেন, যাতে তাদের জেহাদ আল্লাহর পথে এবং একমাত্র তাঁরই জন্যে নিবেদিত হয়। উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন নিম্নের আয়াতগুলোতে পাওয়া যাবে। (আয়াত ১৭, ১৮, ২৬ এবং ৪০-৪৪)

আর যেহেতু মোমেনদের প্রত্যেকটি যুদ্ধই আল্লাহ্ পাকের পরিচালনা, নেতৃত্ব, নির্দেশনা, সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণেই সম্পাদিত হয় এবং এ যুদ্ধ তাঁরই জন্যে ও তাঁরই পথে অনুষ্ঠিত হয়, সেহেতু এই সূরার মধ্যে যুদ্ধের মাঠে স্থির থাকা, ধৈর্যের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, এর জন্যে প্রস্তুতি নেয়া এবং এতে আল্লাহ্ পাককে অভিভাবক মেনে আশ্বস্ত হওয়ার জন্যে মোমেনদের প্রতি আহবান এসেছে অনুরূপভাবে নির্দেশ এসেছে যুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সন্তান সন্ততি এবং ধন-সম্পদ থেকে সতর্ক থাকার জন্যে। যুদ্ধের নিয়মশৃংখলা মেনে চলা এবং দম্ভভরে লৌকিকতার প্রদর্শনের জন্যে যুদ্ধের মাঠে না আসা সম্পর্কে সতর্কতা। সাথে সাথে মোমেনদেরকে জেহাদের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং উৎসাহিত করার জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (আয়াত ১৫, ১৬, ২৪, ২৭, ২৮, ৪৫-৪৭, ৬০, ৬৫)

যুদ্ধের মাঠে ধীর স্থির ও অটুট থাকার একাধিক নির্দেশ বর্ণনার সাথে কোরআনে কারীম আকীদার বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক এবং তার সাথে প্রত্যেক বিষয়, প্রত্যেক নির্দেশ এবং প্রত্যেক নির্দেশনাকে সেই আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি প্রত্যাবর্তন করানোর বিষয়টিও স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে। সুতরাং আল্লাহ পাকের নির্দেশসমূহ শূন্যের মাঝে ঝুলন্ত থাকবে না। বরং তা সুস্পষ্ট অটুট গভীর মূলের ওপরে গেঁথে দেয়া হবে। এর কয়েকটি দিক নিম্নে বর্ণিত হলো,

ক. মালে গনীমত সম্পর্কিত বিষয়ে মোমেনদেরকে তাকওয়া অবলম্বন, আল্লাহর স্মরণে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠা এবং ঈমানকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন। (আয়াত ১-৪)।

খ. যুদ্ধের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মোমেন মোজাহেদদেরকে আল্লাহর নিরূপণ, নির্ধারণ, পরিচালনা এবং যুদ্ধের সকল স্তরে আল্লাহর তাকদীর ও তদবীরের প্রতি প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

www.pathagar.com

'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তোমরা উপত্যকার এ প্রান্তে ছিলে আর তারা ছিলো সে প্রান্তে। অথচ কাফেলা তোমাদের থেকে নীচে নেমে গিয়েছিলো, যদি আগে ভাগেই তোমাদের ও তাদের মধ্যে মোকাবেলার চুক্তি হয়ে থাকতো, তাহলে তোমরা অবশ্য এ সময় পাশ কাটিয়ে যেতে। কিন্তু যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা এ জন্যে ঘটেছিলো যে, আল্লাহ্ যে বিষয়ের ফয়সালা করে ফেলেছিলেন, তা তিনি কার্যকর করবেনই।'

গ. যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও ফলাফলের ক্ষেত্রে মুসলিম মোজাহেদদেরকে একমাত্র আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতার প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (আয়াত ১৭)

ঘ. যুদ্ধের মাঠে ধীর স্থির ও অটুট থাকার ক্ষেত্রে তাদেরকে আস্থাবান হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের জন্যে আল্লাহর পছন্দসই জীবন, তাদের এবং অন্তরের মধ্যকার প্রতিবন্ধকতার ওপর তাঁর ক্ষমতা এবং যারা তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থাবান তাদের সাহায্যের তাঁর যিম্মাদারী ও প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করানো হয়েছে। (আয়াত ২৪, ৪৫)

ঙ. যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদেরকে নিম্নোক্ত নির্দেশগুলো দেয়া হয়েছে,

'হে ঈমানদাররা! এ কাফেরদের সাথে এমনভাবে যুদ্ধ করো যেন গোমরাহী ও বিশৃংখলা নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।' শত্রুদেরকে ভালভাবে পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত কোনো নবীর পক্ষে বন্দীদের রাখা শোভনীয় নয়।' (আয়াত ৭-৮)

চ. মুসলিম সমাজ এবং এ সমাজ ও অন্যান্য সমাজের মাঝে সম্পর্ক কায়েম এবং সুবিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে আকীদা বিশ্বাসকে মূল মাপকাঠি ও বিচার্য বিষয় হিসাবে ধরা হয়। আর এই মানদন্ডের ভিত্তিতেই সম্পর্কের প্রাধান্য দেয়া হয় এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। (আয়াত ৭২-৭৫)

এ সূরার আলোচনায় আকীদা বিশ্বাসের বিষয়টির পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহর পথে জেহাদ, তার ঈমানী ও আন্দোলনগত মূল্য বর্ণনা, অনুরূপভাবে এ জেহাদকে ব্যক্তিগত যাবতীয় ক্রটি থেকে মুক্ত করা এবং একে এর বিষয়কেন্দ্রিক সুউচ্চ যুক্তিসমূহ প্রদান করা, যার আলোকে আল্লাহর পথে মোজাহেদরা পূর্ণ আস্থা, প্রশান্তি ও উচ্চতা সহকারে চিরকাল জেহাদ করে যাবে। এটাই এই সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। (আয়াত ১৫-১৬, ৫৫-৫৭, ৬০, ৬৫, ৬৭, ৭৪)

সবশেষে এ কথা বলতে হচ্ছে যে, এই সূরা মুসলিম দল, জনগোষ্ঠী ও সমাজের সম্পর্ককে আকীদা বিশ্বাসের এক দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। আগে আমি তা বর্ণনা করেছি। সাথে সাথে এ সূরা এর নাযিলের সময় পর্যন্ত যুদ্ধে এবং শান্তিতে অমুসলিমদের সাথে আচরণ, লেনদেন এবং সম্পর্কের বিধিবিধানও বর্ণনা করেছে।

www.pathagar.com

উপরন্তু এ সূরা মালে গনীমতের হুকুম আহকাম এবং চুক্তির রীতিনীতি বর্ণনা করেছে। এ সূরা তার বিভিন্ন আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মুসলমান ও অমুসলমানের সম্পর্ক সুবিন্যস্ত করার মূলধারা এবং সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানের প্রতি আলোকপাত করেছে। যার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হলো।

'হে নবী, লোকেরা তোমার কাছে গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে? বলে দাও, এ গনীমতের মাল তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের।' (আয়াত ১৫-১৬, ২১,২৪, ২৭,৩৮-৩৯)

'আর তোমরা জেনো রাখো, তোমরা যা কিছু গনীমতের মাল লাভ করেছো, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ, তাঁর রসূল, আত্মীয়স্বজন, এতীম, মেসকীন ও মোসাফেরদের জন্যে নির্ধারিত।' (৪৫-৪৭,৫৫-৬২,৬৪-৬৬,৬৭-৭১,৭২-৭৫)

ওপরে যা কিছু আমি বর্ণনা করলাম তো সূরা আনফালের মূল বিষয়াদির সার সংক্ষেপ। যদিও সুরাটি বদর যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছে, তথাপি আমরা মুসলিম সমাজের প্রশিক্ষণ এবং তাকে বিশ্বমানবতার নেতৃত্বের জন্যে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কোরআনী বিধানের একটি দিক এর মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারি। পাশাপাশি আমরা মানবজীবনে যা অহরহ ঘটছে, তার মমার্থ ও মাহাত্মের প্রতি দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিভংগিও ও উপলব্ধি করতে পারি, যার মাধ্যমে এসব বিষয়ে একটা বিশুদ্ধ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হবে।

বদর যুদ্ধ হচ্ছে ইসলামের প্রথম বৃহৎ যুদ্ধ। যাতে মুসলমানরা তাদের চিরশত্রু মোশরেকদের মুখোমুখি হয়েছিলো এবং তাদেরকে অপমানজনকভাবে পরাস্ত করেছিলো। মুসলমানরা প্রকৃতপক্ষে এ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে মদীনা থেকে বের হয়নি। সত্যিকার অর্থে তারা বের হয়েছিলো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে আক্রমণ করার জন্যে। যারা মুসলিম মোহাজেরদেরকে তাদের ঘর বাড়ী ও সহায় সম্পদ থেকে বিতাড়িত করেছিলো। মুসলমানরা কোরায়শের বাণিজ্য কাফেলা থেকে যে মালে গনীমত প্রাপ্তির আশা করেছিলো আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে তা চাননি। বরং তিনি চেয়েছিলেন কাফেরদের বাণিজ্য কাফেলা মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে যাক। আর মুসলমানরা কোরায়শ বাহিনীর মুখোমুখি হোক, যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর অনুসারীদের ওপর নির্মম ও নির্যাতন চালিয়েছিলো। যারা মক্কাতে রসূলের দাওয়াতী মিশনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলো এবং বিশ্বনবীকে এ দুনিয়া থেকে চির বিদায় করে দেয়ার জন্যে ষড়যন্ত্রও করেছিলো।

রব্বুল 'আলামীন চেয়েছিলেন যে, বদরের যুদ্ধটি হক ও বাতিলের মাঝে পাথর্ক্যকারী, ইসলামী ইতিহাসের ফয়সালা প্রদানকারী এবং সর্বোপরি মানবইতিহাসের এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় একটি মীমাংসাকারী ঘটনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হোক। আল্লাহ তায়ালা এটাও চেয়েছিলেন যে, মানুষের নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যাতে তারা নিজেদের কল্যাণ নিহিত আছে বলে মনে করে, তার মাঝে এবং তাদের জন্যে গৃহীত

www.pathagar.com

মালিকের সিদ্ধান্তের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হোক। যদিও মানুষ তথা মোমেন মোজাহেদরা প্রথমে সেই সিদ্ধান্তকে অপছন্দ করেছিলো। অনুরূপভাবে আল্লাহর এটাও ইচ্ছা ছিলো যে, মুসলিম মোজাহেদরা জয় পরাজয়ের কারণসমূহ জানুক এবং তাকে চিহ্নিত করুক এবং যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান কালীন সময়ে এ জয় পরাজয়ের কারণ ও উপায় উপকরণগুলো তারা তাদের মালিকের কাছ থেকে সরাসরি গ্রহণ করুক।

আলোচ্য সূরা এ বিশাল বাস্তবতা, সমৃদ্ধ তথ্য ও মর্মার্থের পাশাপাশি যেমন আল্লাহ প্রদত্ত দিক নির্দেশনা সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে, তেমনি যুদ্ধ-শান্তি, মালে গনীমত, বন্দী, অংগীকার ও চুক্তির বিভিন্ন বিধান ও নিয়মাবলী এবং জয়পরাজয়ের কারণ, উপায় উপকরণ ও উপাদানসমুহকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আর এসব কিছু এ সূরায় আল্লাহ পাকের বিশেষ বর্ণনাভঙ্গিতে সাজানো হয়েছে। যা আকীদাগত চিন্তা চেতনাকে উৎপন্ন, সৃষ্টি ও জাগ্রত করে এবং তাকে মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড ও কার্যকলাপের প্রধান ও সর্ববৃহৎ চালিকাশক্তি হিসাবে নির্ধারণ করে দেয়। আর এটাই হচ্ছে বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপন এবং দিক-নির্দেশনার ক্ষেত্রে কোরআনী বিধানের বৈশিষ্ট্য।

সাথে সাথে এ সূরা যুদ্ধের বিভিন্ন দৃশ্য যুদ্ধপূর্ব, যুদ্ধ চলাকালীন এবং যুদ্ধ পরবর্তী মানবঅন্তরের রকমারি গতি, আবেগ ও উচ্ছাসের দৃশ্যকে অন্তর্গত করে। এসব জীবন্ত দৃশ্য মানবীয় আবেগ অনুভূতিতে যুদ্ধ সম্পর্কিত অবস্থা, তার প্রভাব, কার্যকারিতা, আকার আকৃতি, চিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে এমনভাবে উপস্থিত করে এবং তাকে জাগিয়ে তোলে, যেন কোরআনুল হাকীমের পাঠকরা আজও সে দৃশ্যসমূহ সরাসরি দেখছে এবং তার ডাকে তারা গভীরভাবে সাড়া দিচ্ছে।

এ সূরা প্রাসঙ্গিকভাবে রসূলের জীবন এবং সাহাবায়ে কেরামের মক্কী জীবনের বিভিন্ন চিত্র উপস্থাপন করেছে। যখন তাদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য এবং তারা ছিলো অসহায় ও দুর্বল এবং তারা সদা সর্বদা আশংকা করতো তাদেরকে খতম করে দেয়া হবে। এই প্রাসংগিক অবতারণা এ জন্যে করা হয়েছে যাতে তারা বিজয়ের মুহূর্তে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা করুণা ও কৃপাকে স্মরণ করতে পারে। সাথে সাথে তারা এটাও ভালো করে জানতে পারে যে, নিশ্চয়ই তাদেরকে আল্লাহ পাকের খাস সাহায্য করা হবে। আর এটা হচ্ছে সে দ্বীনের জন্যেই, যাকে তারা স্বীয় মাল সম্পদ এবং জীবনের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছিলো। পাশাপাশি এ সূরা রসূলের হিজরতের পূর্বের এবং পরের মোশরেকদের জীবনের কিছু দৃশ্য ও চিত্র প্রাসংগিক বর্ণনা করেছে। এই সূরায় তাদের পূর্ববর্তী কাফের নেতা ফেরআউন এবং তাদের পূর্বের অন্যান্য লোকদের পরিণামের কিছু নমুনা ও দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর চিরন্তন বিধানকে তাঁর যমীনে প্রতিষ্ঠিত করা। তা হচ্ছে তাঁর বন্ধুদেরকে এ যমীনে বিজয় দান করা এবং তাঁর শত্রুদেরকে এখানেই ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। এ বিধানের ব্যতিক্রম কখনো ঘটে না।

ওপরে আমি যা বর্ণনা করলাম, তা হচ্ছে এ সূরার আলোচ্য বিষয় ও এর বৈশিষ্ট্য, যা একটার সাথে আরেকটা অংগাংগিভাবে সম্পৃক্ত।

www.pathagar.com

সূরা আত্ তাওবা

এ সূরাটি কোরআনের সর্বশেষ সূরা না হলেও সর্বশেষে নাযিল হওয়া অংশের অন্যতম।[১] এ জন্যে এতে মুসলিম ও অমুসলিম জাতিগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে সর্বশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মুসলিম সমাজের বিন্যাস, তার মান ও মর্যাদা নির্ধারণ, মুসলমানদের প্রতিটি শ্রেণী[২] ও গোষ্ঠীর অবস্থা চিহ্নিতকরণ, মুসলিম সমাজের সার্বিক অবস্থা এবং এর প্রতিটি দল ও গোষ্ঠীর বাস্তব অবস্থার সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট বিবরণও।

এ দিক দিয়ে সূরাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতি, স্তর ও কর্মসূচীর বিবরণের দিক দিয়ে এটি গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী সূরায় বর্ণিত আহকাম ও বিধিসমূহের সাথে এ সূরায় বর্ণিত আহকাম ও বিধিসমূহের তুলনামূলক পর্যলোচনা করলে ইসলামী বিধানের নমনীয়তা ও কঠোরতার পরিমাণ আঁচ করা যায়। এই পর্যালোচনা না করলে আহকাম ও বিধিসমূহের তারতম্য নির্ণয় করা যাবে না, বরং সবই একাকার হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে, যে সকল আয়াতে নির্দিষ্ট স্তরের জন্যে প্রয়োজনীয় বিধান দেয়া হয়, সেই আয়াতগুলোকে যখন স্থগিত করা হয়, তার বিধানকে যখন চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়, অতপর এই সব চূড়ান্ত বিধান সম্বলিত আয়াতগুলোকে ওই সকল সাময়িক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্যে যখন নতুনভাবে ব্যাখ্যা পেশ করা হয়, বিশেষত, ইসলামী জেহাদ ও মুসলিম জাতির সাথে অমুসলিম জাতিসমূহের সম্পর্কের বিষয়ে, তখনও আইন ও বিধিসমূহ অস্পষ্ট ও একাকার হয়ে যায়। আমি আশা করি, এই ভুমিকা ও বিভিন্ন স্থানের ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ সব অস্পষ্টতা ও জটিলতা দূর করার জন্যে আল্লাহ আমাকে তাওফীক দেবেন।

সূরার আয়াতগুলোর যথাযথ পর্যালোচনা, সূরার বিভিন্ন অংশের নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের পর্যালোচনা এবং রসূল (স.)-এর জীবনে ইতিহাসের ঘটনাবলীর অধ্যয়ন থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সূরাটা নবম হিজরী সনে পুরাপুরিভাবে নাযিল হয়েছে। তবে এটা ঠিক যে, এটা এক সাথে নাযিল হয়নি। যদিও আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না নবম হিজরীর কোন কোন সময়ে এই সূরার কোন কোন অংশ নাযিল হয়েছে। তবে এ কথাটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সূরাটা তিন পর্যায়ে নাযিল হয়েছিলো। প্রথম অংশটা এই রজব মাসে তাবুক অভিযানের পূর্বে। দ্বিতীয় অংশ তাবুক অভিযানের প্রস্তুতিকালে ও অভিযান চলাকালে এবং শেষাংশ তাবুক

---

১. সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে সূরা আন-নাসর হচ্ছে সর্বশেষ নাযিল হওয়া পূর্ণাংগ সূরা।

২. এখানে যে শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা আমি ইদানীং যে সংকীর্ণ অর্থে সামাজিক শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তাকে বুঝাচ্ছি না। এ হচ্ছে সে সব শ্রেণী, যারা নিছক ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যেমন মোহাজের, আনসার বদরযোদ্ধা, বায়আতুর রেদওয়ানে অংশ গ্রহণকারীরা, মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ, ইসলামের জন্য জেহাদ ও অর্থ ব্যয়কারীরা এবং মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ, ইসলামের জন্য জেহাদ ও অর্থ ব্যয়কারীরা, মোনাফেক গোষ্ঠী ও জেহাদ পালানো গোষ্ঠী ইত্যাদি।

www.pathagar.com

থেকে ফেরার পর নাযিল হয়। তবে সূরার প্রথম থেকে ২৮ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাযিল হয় নবম হিজরীর হজ্জের প্রাক্কালে যিলকদ অথবা যিলহজ্জ মাসে। সংক্ষেপে এতটুকুই আমরা জোর দিয়ে বলা যায়।

প্রথম আয়াত থেকে ২৮নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত সূরার প্রথমাংশে মুসলমানদের তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে আরব উপদীপের তাবত মোশরেকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং এই সম্পর্কচ্ছেদের বাস্তব, ঐতিহাসিক ও আকীদাগত সম্পর্কের কারণ কোরআনের প্রভাবশালী ও শক্তিশালী বাচনভংগিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বাচন ভংগির নমুনাগুলো লক্ষ্য করুন প্রথম আয়াত থেকে ২নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত। যথা,

'সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই মোশরেকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে.... হে মোমেনরা, মোশরেকরা অপবিত্র, কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের ধারে-কাছেও আসতে না পারে। আর তোমরা যদি দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ অচিরেই তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ বলে ধনী বানিয়ে দেবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।'

আমাদের উদ্ধৃত এ আয়াতগুলোর মধ্যে যে কোরআনী বাচনভংগি পরিদৃষ্ট হয়, তা থেকে স্পষ্ট যে, বিভিন্ন কারণে এ সময়ে মুসলমানরা সমগ্র আরবের সকল মোশরেকের সাথে একযোগে সম্পর্কচ্ছেদের মতো গুরুতর পদক্ষেপ নিতে ভয় ও সংকোচ বোধ করছিলো। এ কারণগুলো কী কী, তা আমি অচিরেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।

সূরার দ্বিতীয় অংশে আহলে কেতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে ইসলামী রাষ্টের সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং তার সেই সব ঐতিহাসিক আদর্শিক ও বাস্তব কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা এই সম্পর্কচ্ছেদকে অনিবার্য করে তুলেছিলো। সেই সাথে ইসলামের আসল ও চিরস্থায়ী রূপ কী, আহলে কেতাবের কাছে আল্লাহর যে বিধান নাযিল করেছিলেন তা থেকে তারা কিভাবে বিপথগামী হয়ে গেছে, তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২৯নং আয়াত থেকে ৩৫নং আয়াত পর্যন্ত এ অংশটি বিস্তৃত। যথা,

'আহলে কেতাবের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তাকে হারাম করে না এবং আল্লাহর সত্য দ্বীনের অনুগত হয় না, তারা যতোক্ষণ নতশিরে জিযিয়া প্রদান না করে, ততক্ষণ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। ....'

কোরআনের বাচনভংগি থেকে এই অংশে এটাও ফুটে উঠেছে যে, সমগ্র আহলে কেতাব বা তাদের সংখ্যাগুরু অংশের সাথে লড়াই চালানোর ব্যাপারে মুসলমানরা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও ভীতিতে আক্রান্ত ছিলো। এ ভয়ভীতি ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিশেষ কারণ ছিলো এই যে, এই যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ছিলো রোম সাম্রাজ্য এবং সিরিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত তাদের আরবীয় খৃষ্টান মিত্ররা। ভয় ভীতি ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের জন্যে এই একটা কারণই যথেষ্ট। কেননা আরব উপদ্বীপের লোকদের কাছে রোম সাম্রাজ্যের দোর্দন্ড

www.pathagar.com

প্রতাপ সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানা ছিলো। তবে আয়াতের বক্তব্য শুধু খৃষ্টানদের জন্যে নির্দিষ্ট নয়, বরং বর্ণিত লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী সকল আহলে কেতাবকে লক্ষ্য করেই তা বলা হয়েছে। আগামীতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করবো।

তৃতীয় অংশে, পর্বে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়ার পর যারা অলসতা ও দুর্বলতাবশত পশ্চাদমুখী হয়েছে এবং যুদ্ধে যায়নি, তাদের সমালোচনা শুরু হয়েছে। এ সব লোকের সবাই যে মোনাফেক নয়, তা পরবর্তীতে জানা যাবে। তবে এই সব যুদ্ধ বিগ্রহ যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিলো তা আমি আগামীতে কারণসহ ব্যাখ্যা করবো। যেমন আল্লাহ বলেন,

'হে মোমেনরা, তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমাদেরকে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলে তোমরা মাটির সাথে লেগে গেলে? ..... (আয়াত ৩৮ থেকে ৪১)

এ পর্বে যে সব হুমকি, ধমকি ও শাসানিমূলক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, মুসলমানদেরকে যেভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কোনো মানুষের পক্ষ থেকে কিছু মাত্র সাহায্য না আসা সত্তেও মক্কা থেকে বিতাড়িত হবার পর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে সাহায্য করেছেন এবং যেভাবে কঠোরতম ভাষায় হুকুম দেয়া হয়েছে যে, হালকা সাজে বা ভারী সাজে যেভাবেই থাকো লড়াইতে চলে যাও। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ সময়ে যুদ্ধে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিলো এবং অনেকে তা থেকে পিছু হটছিলো। ভয় পাচ্ছিলো ও দ্বিধান্বিত হচ্ছিলো। যার কারণে এতো কঠোর ভাষা, এতো হুমকি, এতো ধমক ও এতো পেছনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ও এতো কড়া আদেশ দিতে হয়েছে।

এরপর আসবে সূরার চতুর্থ পর্ব। এটি সবচেয়ে দীর্ঘ এবং সূরার অর্ধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে বিস্তৃত। এ পর্বে মোনাফেকদের সমালোচনা ও ভর্ৎসনা, মুসলিম সমাজে তাদের অপতৎপরতার নিন্দা ও তিরস্কার, তাদের মানসিক ও বাস্তব অবস্থার বিবরণ, তাবুক অভিযানের পূর্বে, পরে ও মাঝখানে তাদের অবস্থান ও কর্মকান্ডের বিবরণ, জেহাদ থেকে তাদের পিছু হটার ছল ছুঁতো, ওযর বাহানা ও দুরভিসন্ধির স্বরূপ উদঘাটন, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, ভুল বুঝাবুঝি ও কাপুরুষতার বিস্তার ঘটানো এবং রসূল (স.) ও নিষ্ঠাবান মোমেনদের নানাভাবে কষ্ট দেয়া ও উত্ত্যক্ত করার বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মোনাফেকদের চক্রান্ত থেকে নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। মুসলমানদের ও মোনাফেকদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করানো হয়েছে এবং মুসলমান ও মোনাফেকদেরকে তাদের কার্যকলাপ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পর্বটাই আসলে সূরার প্রধান অংশ। এ অংশটি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, মক্কা বিজয়ের আগে যে মোনাফেকীর ব্যাধি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো, তা মক্কা বিজয়ের পর কিভাবে মুসলিম সমাজে ফিরে এলো। পরবর্তীতে আমি এর কারণ ব্যাখ্যা করবো। এই পর্বটি পুরোপুরি ভাবে তুলে ধরা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কেবল বিভিন্ন আয়াত বা আয়াতাংশের উল্লেখ করে মোনাফেকীর চরিত্র ও প্রকৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

www.pathagar.com

'সহজলভ্য স্বার্থ ও স্বল্প দূরবর্তী সফর হলে ওরা তোমার অনুসরণ করতো ....'

'তাদের যদি তোমাদের সাথে যাওয়ার ইচ্ছা থাকতো, তবে তারা সে জন্যে সম্বল যোগাড় করতো। তারা যদি তোমাদের সাথে যেতো, তবে তারা তোমাদের মধ্যে কেবল সন্দেহ সংশয় ও বিভ্রান্তিই বাড়াতো, ... তোমাদেরকে বিপথগামী করার চেষ্টা করতো এবং তাদের মধ্যে অনেক গুপ্তচর রয়েছে। .... ইতিপূর্বেও তারা অনেক বিপর্যয় ঘটিয়েছে এবং তোমার অনেক জিনিসকে ওলট পালট করে দিয়েছে ....

'কেউ কেউ বলে, আমাকে ঘরে বসে থাকার অনুমতি দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না। ওরা তো ফেতনার মধ্যেই পড়ে আছে। তোমার বিপদ হলেই ওরা খুশী। তোমার সুখ হলে ওরা দুঃখ পায়।'

'ওরা কসম খেয়ে বলে, ওরা তোমাদের লোক। আসলে ওরা তোমাদের লোক নয়। তারা ভীরু কাপুরুষের দল। আশ্রয় নেয়ার জায়গা পেলেই তারা সেদিকে গিয়ে আশ্রয় নিতো।'

'তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার সদকার ব্যাপারে তোমার কুৎসা রটায়। তবে তাদেরকে কিছু দিলেই তারা খুশী। না দিলেই বেজার।'

'তাদের কেউ কেউ নবীকে এই বলে কষ্ট দেয় যে, উনি যা শোনেন তাই বিশ্বাস করেন। তুমি বলো, তিনি সদুদ্দেশ্যপ্রবণ সরল বিশ্বাসী, আল্লাহর ওপরও বিশ্বাসী, মোমেনদেরও বিশ্বাস করেন।'

'তারা তোমাদেরকে খুশী করার জন্যে ঘনঘন শপথ করে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে খুশী করাই বৃহত্তর কর্তব্য।.........'

'মোনাফেকরা ভয় পায় যে, তাদের মনের কথা ফাঁস করে দিয়ে কোনো সূরা নাযিল হয় কিনা। বলো, (যতো খুশী) ঠাট্টা করতে থাকো। আল্লাহ তোমাদের ঠাট্টা ফাঁস করে........।'

'তোমরা আর ছলচাতুরী করো না। ঈমান আনার পর তোমরা কুফরী করেছো।'

'মোনাফেক নারী ও পুরুষরা পরস্পরের মিত্র। অসৎ কাজ করতে আদেশ ও সৎ কাজ করতে নিষেধ করে, কার্পণ্য করে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। তাই তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন।'

'হে নবী! কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো এবং তাদের ওপর কঠোরতা প্রয়োগ করো। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম ....তারা কসম খেয়ে বলে, এমন কথা বলেনি। অথচ তারা কুফরী কথা বলেছে। ইসলামের পরে তারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে এবং তারা যা করতে চেয়েছিলো তা পারেনি। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল তাদেরকে অভাবশূন্য করে দিয়েছেন বলেই তারা এতোটা আস্কারা পেয়েছে। তারা তাওবা করলে সেটা তাদের জন্যে ভালো হবে। নচেত দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে' ....তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে ওয়াদা করে যে, আল্লাহ

www.pathagar.com

সম্পদ দিলে আমরা অবশ্যই দান করবো। অতপর যখন আল্লাহ সম্পদ দিলেন। অমনি কৃপণতা করলো। ....এই ওয়াদাখেলাপি ও মিথ্যাচারের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাদের মনে মোনাফেকী ঢুকিয়ে দিলেন। ......

'স্বেচ্ছায় দানকারী মোমেনদেরকে এবং কায়িক পরিশ্রম ছাড়া আর কিছু যারা করতে সক্ষম নয় তাদেরকে তারা টিটকারি দেয় ও নিন্দা করে। আল্লাহই তাদেরকে টিটকারি দিয়েছেন এবং তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা চাও বা না চাও, তুমি সত্তর বার ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ ক্ষমা করবেন না......।'

'যারা রসূল (স.)-এর সাথে না গিয়ে পিছিয়ে থেকেছে, আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করা অপছন্দ করেছে এবং লোকদেরকে বলেছে যে, তোমরা এমন গরমে সফরে যেয়ো না, তারা খুবই আনন্দিত। বলো, জাহান্নামের আগুন আরো বেশী গরম। যদি তারা বুঝতো।...........'

এই সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মোনাফেকরা এ সময়ে মুসলমানদেরকে উত্যক্ত করা, বিপথগামী করা ও নানা রকমের মিথ্যাচার ও ধোকাবাজি ছাড়া তাদেরকে বিপর্যস্ত করার অনেক চেষ্টা চালাচ্ছিলো। সেই সাথে এটাও বুঝা যায় যে, মুসলমানদের সামাজিক ব্যবস্থায়ও সমন্বয়ের অভাব এবং কিছু বিশৃংখলা ছিলো, বিশেষত, 'তোমাদের মধ্যে তাদের গুপ্তচর রয়েছে' এই আয়াতাংশ দ্বারা এটা বেশ পরিষ্কার। অনুরূপভাবে, মোনাফেকদের জানাযা নামায পড়তে ও তাদের জন্যে ক্ষমা চাইতে কঠোর ভাবে নিষেধ করা দ্বারাও এটা বুঝা যায়। এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো মক্কা বিজয়ের পর ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণের কারণে। সময়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণের কারণে এমন অনেক লোক মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়ে, যাদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল হয়নি এবং যাদের চরিত্রেও ইসলামের ছাপ পড়েনি। এ সময়ে মুসলমানদের সমাজে যে রকমারি শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সমাগম ঘটে, তাদের ব্যাপারে আলোচনার পর আমি এই সামাজিক বিশৃংখলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

সূরার পঞ্চম অংশটি এই শ্রেণী বিন্যাসের ওপর আলোকপাত করে। এই অংশ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলামী সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান আনসার ও মোহাজেররা ছাড়া তাদের চারপাশে আরো কিছু দল ও শ্রেণী ছিলো। যেমন বেদুইনরা। তাদের ভেতরে নিষ্ঠাবান মোমেন, মোনাফেক ও দুর্বল মোমেন ছিলো। এদের মধ্যে মদীনাবাসী মোনাফেকও ছিলো। অনুরূপ আরেকটি দল এমন ছিলো যাদের মধ্যে সৎ কাজ ও অসৎ কাজের মিশ্রণ ঘটেছিলো এবং যাদের চরিত্রে ইসলামের মযবুত প্রভাব ছিলো না এবং তাদের ইসলামের প্রতি তেমন গভীর আকর্ষণ ছিলো না। আরো একটা দল ছিলো, যাদের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানতো না। তাদের পরিণাম কি হবে তা আল্লাহই জানেন। আরো একটা দল ছিলো, যারা ইসলামের নামে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। কোরআন এ সব দল ও শ্রেণী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছে। মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে এদের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে, তা জানিয়ে দিয়েছে এবং রসূল (স.) ও একনিষ্ঠ মুসলমানদেরকে এদের

www.pathagar.com

প্রত্যেকের সাথে আচরণের কী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, তা শিখিয়েছে। ৯৭নং আয়াত থেকে ১১০নং আয়াত পর্যন্ত এই অংশটি বিস্তৃত।

এসব আয়াত থেকে মুলমানদের মধ্যে রকমারি দলের বিদ্যমানতা ও তাদের ঈমানের স্তরভেদ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে জানা যায় যে, এই সমাজে মক্কা বিজয়ের পরে কতটা বিশৃংখলা ঢুকে গিয়েছিলো, যা বিজয়ের আগে হয় একেবারেই ছিলো না অথবা নাম মাত্র ছিলো।

৬ষ্ঠ পর্ব বা অংশে আল্লাহর সাথে মোমেনদের জেহাদের অংগীকার এবং এই জেহাদের স্বরূপ ও পরিধি এবং মদীনাবাসী ও তার আশপাশের বেদুইনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, মদীনাবাসীর জন্যে এটা বৈদ্ধ নয় যে, তারা আল্লার রসূল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং রসূলুলুল্লাহর জীবন রক্ষার বিষয়ে উদাসীন হয়ে কেবল নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত হবে। এ অংশে মোনাফেক ও মোশরেকদের সাথে মোমেনদের সম্পর্কচ্ছেদের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ অংশের এক পর্যায়ে এমন কয়েকজন মোমেনের যুদ্ধে অনুপস্থিতির ঘটনা ও তার শাস্তি বিধানের ঘটনা বর্ণনা হয়েছে, যারা মোনাফেক নয়, খাঁটি মোমেন ছিলেন। এই সাথে মোনাফেকদের অবস্থাও তুলে ধরা হয়েছে এবং কোরআনের প্রতি তাদের আনুগত্যহীনতার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ অংশটি ১১১নং থেকে ১২৭নং আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত।

উপসংহারে রসূল (স.)-এর গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ১২৮ ও ১২৯ নং আয়াতদ্বয় দ্রষ্টব্য।

সূরার তাফসীরের পূর্বে ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সূরার আয়াতসমূহের উদ্ধৃতি অনেক বেশী দিয়েছি ইচ্ছাকৃতভাবেই। কেননা এই সূরাটা মক্কা বিজয়ের পরবর্তী ইসলামী সমাজের পূর্ণাংগ চিত্র তুলে ধরে এরা এবং সাংগঠনিক বিন্যাস কেমন ছিলো, তা ব্যাখ্যা করে। এই চিত্র থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী সমাজের বিভিন্ন ঈমানী স্তরে অবস্থিত মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা শৃংখলা ও সমন্বয়ের অভাব ছিলো। অনুরূপভাবে, কিছুটা স্বার্থপরতা, লোভ, ঈমানী দুর্বলতা, কপটতা, কর্তব্য পালনে দ্বিধা ও শৈথিল্য, মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যকার সম্পর্কের সঠিক ধারণার অভাব এবং আদর্শের ভিত্তিতে পরিপূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের অভাব এ অংশ থেকে পরিষ্কার ফুটে ওঠে। অবশ্য মোহাজের ও আনসারদের পরিপূর্ণ একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার চিত্রও সুস্পষ্ট। কিন্তু এই দুই পুণ্যবান গোষ্ঠী ছাড়া অন্য সকল শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয়, শৃংখলা, নিষ্ঠা ও পরিপক্কতার যে অভাব ছিলো, তা সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে।

আগেই বলেছি যে, এই পরিস্থিতির উদ্ভবের একমাত্র কারণ ছিলো ইসলামের পূর্ণাংগ প্রশিক্ষণ পায়নি এবং ইসলামের আলোকে চরিত্র গঠিত হয়নি এমন ধরনের লোকদের মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে ও পাইকারী হারে ইসলাম গ্রহণ। তবে ওই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকে মক্কা বিজয়ের পূর্বের ও পরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট না জেনে

www.pathagar.com

সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব নয়। এখানে এই প্রেক্ষাপর্বটা যতো সংক্ষেপে সম্ভব আলোচনা করার চেষ্টা করবো। ওই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের তাৎপর্য ও মর্ম কী দাঁড়ায় এবং এতদসংক্রান্ত আয়াতসমূহের মর্মার্থ বা কী, সে সম্পর্কে আলোচনা করার আগেই প্রেক্ষাপট তুলে ধরবো।

এ কথা সবার জানা যে, ইসলামী আন্দোলন মক্কায় অত্যন্ত কঠিন ও প্রতিকূল পরিবেশে জন্ম নিয়েছিলো। জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত সাধারণ আরব জনগণ ও কোরায়শরা তখনো কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' তে নিহিত প্রকৃত বিপদটাকে উপলব্ধি করতে পারেনি। তখনো তারা বুঝতে পারেনি যে, ওই কলেমা পৃথিবীর এমন প্রতিটি শক্তির বিরুদ্ধে চরম ও সর্বাত্মক বিদ্রোহ ও বিপ্লব করার আহ্বান জানায়, যা আল্লাহর অনুমোদিত ও সমর্থিত নয় এবং প্রত্যেক খোদাদ্রোহী শক্তিকে উৎখাত করে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণের আহ্বান জানায়। বিশেষত এই দাওয়াতের ফলে রসূল (স.)-এর নেতৃত্বে যে নতুন বিপ্লবী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, যা প্রথম দিন থেকেই আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের আনুগত্য, কোরায়শদের জাহেলী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহ ও প্রতিষ্ঠিত জাহেলী সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাতের সংকল্প গ্রহণ করেছে, তার দিক থেকে সম্ভাব্য বিপদাশংকা সম্পর্কেও মক্কার জাহেলী সমাজ শুরুতে যথাযথভাবে সচেতন ছিলো না।

অবশেষে যখন ইসলামী দাওয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করলো, তখন এই নতুন দাওয়াতের বিরুদ্ধে এই দাওয়াতের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ নতুন সমাজের বিরুদ্ধে এবং নতুন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে দিলো। শুধু প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধ নয়, আরো যতো রকমের নির্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচার, ষড়যন্ত্র, ছল চাতুরী তাদের সাধ্যে কুলাতো, তার সবই চালাতে লাগলো। যে কোনো একটি প্রাণী নিজের মৃত্যুর আশংকা দেখা দিলে সেই আশংকা থেকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করে দেয়, আরবের জাহেলী সমাজ ব্যবস্থা ঠিক তেমনিভাবে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষার নিমিত্ত সর্বাত্মক চেষ্টা তৎপরতা শুরু করে দিয়েছিলো। বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার জন্যে যখনই কোনো দাওয়াত এমন কোনো জাহেলী সমাজের দেয়া হয়, যা আল্লাহর এক দাসদের ওপর অপর দাসদের প্রভুত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তখন এরূপ যুদ্ধ ও সংঘর্ষ বেধে যাওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিশেষত যখন এই দাওয়াতের ভিত্তিতে নতুন কোনো বিপ্লবী সমাজ ও সংগঠন গড়ে ওঠে, নতুন কোনো নেতৃত্ব তার পরিচালনার ভার হাতে নেয় এবং সেই নয়া সমাজ ব্যবস্থা প্রাচীন জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তখন এই যুদ্ধ ও সংঘাত বাধা একেবারেই অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। (সূরা আনফালের শেষ দিককার আয়াতগুলো সংক্রান্ত আলোচনা দেখুন)

এরূপ পরিস্থিতিতেই নয়া ইসলামী সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সর্ব প্রকারের অত্যাচার নির্যাতন ও বিপদ মুসীবতের সম্মুখীন হয়, এমনকি এই নির্যাতন নিপীড়ন প্রায়শ রক্তপাত পর্যন্ত গড়ায়। এ জন্যে সে দিন 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' এই

www.pathagar.com

কলেমায় সাক্ষ্যদান করতে, নতুন ইসলামী সমাজের সদস্য হতে এবং তার নয়া নেতৃত্বের আনুগত্য করতে শুধুমাত্র এমন লোকেরাই এগিয়ে আসতো, যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর পথে বিসর্জন দেয়ার সংকল্প নিতো এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিষ্ঠুরতম অত্যাচার, নির্যাতন, ক্ষুধা, অভাব, নির্বাসন, মৃত্যু ও বিপর্যয়কে বরদাশত করতে প্রস্তুত থাকতো।

এভাবে আরব সমাজের উৎকৃষ্টতম ও বলিষ্ঠতম লোকগুলোর সমন্বয়ে ইসলামের ভিত্তি গড়ে ওঠে। যে সব লোক এ ধরনের চাপ ও অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি, তারা ইসলাম ত্যাগ করে জাহেলিয়াতে ফিরে গিয়েছিলো। অবশ্য এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম ছিলো। কেননা ইসলাম গ্রহণের আগেই সবার কাছে এ বিষয়টা পরিষ্কার ও সুবিদিত থাকতো। তাই জাহেলিয়াত ছেড়ে ইসলাম গ্রহণের বিপজ্জনক ও কণ্টকাকীর্ণ পথ কেবলমাত্র বিশিষ্ট ও বিরল চরিত্রের লোকেরাই অবলম্বন করতো।

এ ধরনের বিরল চরিত্রের লোকদেরকে আল্লাহ প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ও মোহাজের রূপে বাছাই করেছিলেন যাতে তারা প্রথমে মক্কায় ও পরে মদীনায় ইসলামের অটুট ভিত্তি গড়ে তোলে। মদীনায় তাদের সাথে যে আনসাররা যুক্ত হয়েছিলেন, তারা যদিও মোহাজেরদের ন্যায় কঠিন নির্যাতনে ভোগেননি, কিন্তু আকাবায় রসূল (স.)-এর সাথে সম্পাদিত তাদের বায়আত বা চুক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা ইসলামের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল আসল উপাদান দ্বারাই গঠিত ছিলেন। ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা আকাবার রাত্রিতে রসূল (স.)-কে বললেন, 'আপনার প্রতিপালকের জন্যে ও আপনার জন্যে আমাদের ওপর যে শর্তই আরোপ করতে চান, করুন।' রসূল (স.) বললেন, 'আমার প্রতিপালকের জন্যে এই শর্ত আরোপ করছি যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আমার জন্যে এই শর্ত আরোপ করছি যে, তোমরা তোমাদের প্রাণ ও সহায় সম্পদকে যে সব জিনিস থেকে রক্ষা করে থাক, আমাকেও সে সব জিনিস থেকে রক্ষা করবে।' সমবেত সবাই বললো, 'এটা যখন আমরা করবো, তখন আমাদের কী লাভ হবে?' রসূল (স.) বললেন, 'জান্নাত'। তখন সবাই বললো, এটা লাভজনক চুক্তি। এ চুক্তি থেকে আমরা কখনো কাউকে সরাবোও না, নিজেরাও সরবো না।'

রসূল (স.)-এর সাথে চুক্তি সম্পাদনকারী এই আনসারগণ এর বিনিময়ে জান্নাত ছাড়া আর কিছুই চাইতেন না। তারা এই বলে চুক্তির প্রতি দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন যে, আমরা এই চুক্তি থেকে নিজেরাও সরবো না এবং রসূল (স.)-কেও সরাবো না। তারা জানতেন যে, তারা কোনো সহজ জিনিসের ওপর চুক্তি সম্পাদন করছেন না। বরং তারা নিশ্চিত ছিলেন যে, কোরায়শরা তাদের বিরুদ্ধে ওঁৎ পেতে আছে, সমগ্র আরব জাতি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং এরপর তারা মদীনায় ও সমগ্র আরবের কোথাও জাহেলিয়াতের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন না।

www.pathagar.com

ইবনে কাসীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ 'আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতে লিখেছেন যে, ইমাম আহমদ হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন, 'রসূল (স.) মক্কায় দশ বছর এভাবে কাটান যে, বাড়ীতে বাড়ীতে, উকায ও মাজান্নার বাজারে এবং হজ্জের মওসুমে লোকজনের সাথে দেখা করতেন ও বলতেন, 'কে আমাকে আশ্রয় দেবে, কে আমাকে সাহায্য করবে, যাতে আমি আমার প্রতিপালকের বার্তা তার কাছে পৌঁছে দিতে পারি এবং সে জান্নাতের অধিকারী হবে?' অথচ তাঁকে সাহায্য করে ও আশ্রয় দেয় এমন একজনকেও পাচ্ছিলেন না। এমন কি সুদূর ইয়ামান বা মুদার থেকেও কেউ মক্কায় এলে তাঁর গোত্র ও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা সেই ব্যক্তির পিছু নিতো এবং বলতো, 'সাবধান, কোরায়শ বংশের এ যুবকটা যেন তোমাকে আকৃষ্ট না করে। রসূল (স.) তাদের লোকজনদের মধ্যে একটু ঘোরাফেরা করলেই তারা তাঁর দিকে আংগুল দিয়ে ইংগিত করে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ ইয়াসরিব থেকে আমাদেরকে তাঁর কাছে পাঠালেন। আমরা তাকে সমর্থন ও আশ্রয় দিলাম। এরপর ইয়াসরিববাসী যেয়ে যেয়ে একে একে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। এ ধরনের প্রত্যেককে তিনি কোরআন পড়ে শোনাতেন। আর সে নিজ পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যেতো এবং তার ইসলাম গ্রহণের ফলে সবাই ইসলাম গ্রহণ করতো। এভাবে মদীনার আনসারদের মধ্যে এমন একটি পরিবারও অবশিষ্ট রইলো না, যে পরিবারে প্রকাশ্যে একাধিক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেনি। এরপর মদীনার মুসলমানরা পরামর্শ করা শুরু করলো। সবার প্রশ্ন একটাই, মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে প্রাণ ভয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে আমরা রসূল (স.)-কে আর কতদিন একাকী থাকতে দেবো? একদিন আমাদের মধ্য থেকে ৭০ জন (১) হজ্জের মওসুমে রসূল (স.)-এর সাথে দেখা করতে গেলাম। আমরা পাহাড়ের ভেতরে তাঁর সাথে দেখা করার সময় ও স্থান নির্ধারণ করলাম। অতপর একজন দু'জন করে যেতে যেতে সবাই একত্রে তার কাছে সমবেত হলাম। তারপর আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'হে রসূল! আমরা কোন বিষয়ে আপনার কাছে অংগীকার দেব?' তিনি বললেন, 'তোমরা অংগীকার করবে যে, ব্যস্ততা কিংবা অবসর এবং অভাব কিংবা প্রাচূর্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম শুনবে ও আনুগত্য করবে। সৎ কাজের আদেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকতে গিয়ে কারো নিন্দা সমালোচনার ভয় করবে না। আমি যখন তোমাদের কাছে আসবো, তখন আমাকে সাহায্য করবে এবং তোমরা নিজেদেরকে, স্ত্রীদেরকে ও সন্তানদেরকে যেভাবে সংরক্ষণ কর আমাকেও সেই ভাবে সংরক্ষণ করবে, এটা করলে তোমাদের জন্যে জান্নাত নির্ধারিত থাকবে।' এরপর আমরা রসূলের কাছে এগিয়ে গেলাম। আমাদের ৭০ জনের মধ্যে আমার পরেই কনিষ্ঠতম ব্যক্তি আসয়াদ বিন যুরারা রসূল (স.)-এর হাত ধরে বসলো। আসয়াদ বললো, 'হে ইয়াসরিববাসী! তাড়াহুড়ো করো না। আমরা তাঁকে আল্লাহর রসূল হিসাবে বিশ্বাস করেছি বলেই তার কাছে এসেছি। আজ তাকে এখান থেকে বের করে নেয়ার অর্থ দাঁড়াবে সমগ্র আরব জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দেয়া এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের হত্যার ঝুঁকি গ্রহণ। তোমরা যদি

www.pathagar.com

এ সবের ওপর ধৈর্যধারণ করতে পার তাহলে তাঁকে গ্রহণ করো। এর প্রতিদান তোমরা আল্লাহর কাছে পাবে। আর যদি ভয় পাও, তা হলে তাঁকে ছেড়ে দাও এবং তা স্পষ্ট করে বলে দাও। এটা আল্লাহর কাছে তোমাদের সাফাই দেয়ার সর্বোত্তম ব্যবস্থা।' সবাই বললো, 'হে আসয়াদ! তুমি একটু থামো আল্লাহর কসম, আমরা এই অংগীকারকে কখনো ত্যাগ করবো না এবং তা কখনো লংঘনও করবো না। এরপর আমরা তার কাছে এগিয়ে গেলাম এবং অংগীকার করলাম। তিনি আমাদের অংগীকার নিলেন ও শর্ত আরোপ করলেন এবং তার বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা দিলেন। (আহমদ, বায়হাকী ও বাযযার)

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, আনসাররা সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এই অংগীকারের দায় দায়িত্ব কী কী। তারা এও জানতেন যে, এই সব অংগীকারের বিনিময়ে তারা দুনিয়ায় কিছুই পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাননি, এমনকি বিজয়ও নয়। এর বিনিময়ে জান্নাত ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে বলে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি, তা তারা জানতেন। তা সত্তেও তারা এই অংগীকারের প্রতি এতো একনিষ্ঠ ও তা রক্ষার জন্যে এতো ব্যাকুল ছিলেন। সুতরাং একই ধরনের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ লাভকারী প্রথম ঈমান আনয়নকারী মোহাজেরদের সাথে সাথে এই আনসাররাও যে মদীনার প্রথম যুগের ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি বলে পরিগণিত হবেন, সেটা ছিলো অবধারিত।

তবে মদীনার ইসলামী সমাজে এই নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধতা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। মদীনায় ইসলাম বিজয়ী হয়েছিলো ও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো। ফলে অনেক লোক, বিশেষত নিজ নিজ গোত্রে যারা প্রভাবশালী, তারা তাদের পদমর্যাদা বজায় রাখার জন্যে তাদের গোত্রের সাধারণ মানুষদের সাথে সাযুজ্য রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলো। বদরযুদ্ধের পর এই জাতীয় লোকদের মেধ্য শীর্ষস্থানীয় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল খোলাখুলি বলে ফেললা, 'এ জিনিসটা (ইসলাম) এখন প্রাধান্য লাভ করলো।' অতপর সে কপটতা ও ভন্ডামির আশ্রয় নিয়ে নিজেকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করলো। এ ছাড়া মোনাফেক না হয়েও ইসলামের ব্যাপক প্রসারের কারণে অন্যদের দেখাদেখিও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। অথচ ইসলামকে তারা যথাযথভাবে বোঝেওনি এবং তাদের চরিত্রে ইসলামের ছাপও তেমন পড়েনি। এর ফলে মদীনার ইসলামী সমাজে ঈমানের স্তরভেদের দরুন কিছুটা বিশৃংখলা ও অসমতা দেখা দেয়।

এই সব নতুন ঈমান আনয়নকারীদের জন্যে রসূল (স.)-এর নেতৃত্বে কোরআন এক অভূতপূর্ব প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সে নয়া ইসলামী সমাজে ঈমানী ও নৈতিক দিক দিয়ে বিভিন্ন স্তরের মোমেনদের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টির চেষ্টা করে।

আমরা যখন নাযিল হওয়ার কালগত ধারাবাহিকতার আলোকে মদীনায় নাযিল হওয়া সূরাগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেই, তখন মুসলিম সমাজের বিবিধ স্তরের ওইসব

www.pathagar.com

মুসলমানকে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে বিরাট চেষ্টা দেখতে পাই। বিশেষত, কোরায়শ ও ইহুদীদের পক্ষ থেকে সকল গোত্রের ওপর প্রহরা বসানো, বাধা দান ও কুটিল ষড়যন্ত্র চালানো সত্তেও এ ধরনের লোকদের ইসলাম গ্রহণ অব্যাহত থাকায় এই প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়ের কাজের প্রয়োজন আরো বেড়ে যেতে থাকে এবং এক মুহূর্তও এ কাজে শৈথিল্য, উদাসীনতা প্রদর্শনের অবকাশ ছিলো না।

এই সমস্ত চেষ্টা সত্তেও মাঝে মাঝে, বিশেষত কষ্টকর পরিস্থিতিতে ঈমানী দুর্বলতা, মোনাফেকী, দ্বিধাসংশয়, অর্থ ও শারীরিক শ্রম দানে কার্পণ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অংশ গ্রহণে ভয় ভীতি ও অনীহার লক্ষণ প্রকাশ পেতো। বিশেষত অমুসলিম নিকটাত্মীয়ের সাথে মুসলমানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আকীদা ও আদর্শের অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হতো। কোরআনের শুরু থেকেই এক নাগাড়ে কয়েকটি সূরায় এই সমস্ত লক্ষণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং আল্লাহর মনোনীত পন্থায় তা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ধরনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আয়াত হলো, সূরা আনফালের ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং আয়াত, সূরা আল ইমরানের ৭, ৮ ও ৯ নং আয়াত সূরা আল হাশরের ১১, ১২ ও ১৩নং আয়াত ও সূরা আল আহযাবের ৯ থেকে ১৪ নং আয়াত, সূরা নিসার ৭১, ৭২ ও ৭৩নং আয়াত, সূরা নিসার ৭৭ ও ৭৮নং আয়াত, সূরা মুহাম্মদের ৩৬, ৩৭ ও ৩৮নং আয়াত, সূরা মুজাদালার ১৪ থেকে ২২ নং আয়াত, সূরা মায়েদা ৫১, ৫২ ও ৫৩নং আয়াত এবং সূরা মুমতাহিনার ১ থেকে ৪নং আয়াত।

বিভিন্ন সূরা থেকে এই দশটা নমুনা তুলে দেয়াই আমি যথেষ্ট মনে করছি। মুসলিম সমাজে যে ঈমানী ও চারিত্রিক দুর্বলতাগুলোর লক্ষণ পরিলক্ষিত হতো, এ আয়াতগুলোতে তার উল্লেখ করা ও প্রতিকারের পন্থা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামী সমাজে নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের ব্যাপকভাবে প্রবেশের ফলে এই পরিস্থিতির উদ্ভব অনিবার্য ও স্বাভাবিক ছিলো। এতো বিপুল সংখ্যক নতুন মুসলমানকে যথাযথ ও ক্রমাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশোধন, একীভূতকরণ ও প্রথম যুগের খাঁটি মোমেনদের সাথে তাদের সমন্বয় সাধন কিছুটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ছিলো।

তবে সামগ্রীকভাবে মদীনার ইসলামী সমাজ বিশুদ্ধই ছিলো। কেননা তা প্রধানত প্রাথমিক যুগের মোহাজের ও আনসার নামে পরিচিত খাঁটি ও বিশুদ্ধ মোমেনদের ওপরই নির্ভরশীল ছিলো। ওই সব মোহাজের ও আনসারের মধ্যে সমন্বয় ও একাত্মতার কোনো ঘাটতি ছিলো না, এমনকি নবাগতদের শৈথিল্য, সমন্বয়হীনতা ও অন্যান্য ক্রটিও তাদের মধ্যে কোনো কমতি দেখা দেয়নি।

ক্রমান্বয়ে এই নবাগতদের ক্রটি সংশোধিত হতে থেকেছে, পরিশুদ্ধি, পবিত্রতা, সমন্বয় ও একাত্মতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দুর্বল ঈমানধারী, মোনাফেক, সন্দেহ সংশয়ে দোদুল্যমান, ভীরু ও অমুসলিম আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের আকীদা ও আদর্শে অস্পষ্টতার প্রশ্রয়দানকারীদের সংখ্যা ক্রমেই কমে এসেছে। কমতে কমতে মক্কা বিজয়ের সময় ইসলামী সমাজ সামগ্রিকভাবে মোহাজের ও আনসারদের সাথে সমন্বয় ও একাত্মতার মাধ্যমে তাদের মানের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলো।

www.pathagar.com

আল্লাহর মনোনীত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি তাদেরকে যে মানে পৌছে দিতে চেয়েছিলো, তারা প্রায় সেই মানেই পৌঁছে গিয়েছিলো।

এতদসত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, আদর্শগত আন্দোলনের প্রভাবেই মোমেনদের উৎকর্ষ ও পরিপক্কতার মানে কিছু না কিছু তারতম্য ছিলো। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ত্যাগ, তিতিক্ষা, অবিচলতা ও আপোসহীনতা, অগ্নিপরীক্ষায় কৃতকার্যতা ও প্রাথমিক যুগের মোমেন হওয়া ইত্যাদির কারণে মোমেনদের বিভিন্ন গোষ্ঠী বিশিষ্টতা লাভ করেছিলো। যেমন মোহাজের ও আনসাররা প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হিসাবে, তাদের মধ্য থেকে আবার এক গোষ্ঠী বদরযোদ্ধা হিসাবে, একটা গোষ্ঠী হোদায়বিআয় বায়য়াতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী হিসাবে এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বের

ত্যাগী মোজাহেদ ও পরের ত্যাগী মোজাহেদরা মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে বিশিষ্ট হয়েছিলেন।

এবার সংক্ষেপে এই সূরার প্রধান প্রধান আলোচিত বিষয়, বিশেষত মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক সংক্রান্ত চূড়ান্ত বিধিমালা তুলে ধরছি। বস্তুত এ সূরায় যে বিধি বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে সর্বশেষ নাযিল হওয়া বিধান এবং তা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আন্দোলনী ধারারও সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা ও পদ্ধতি।

নবম পারায় সূরা আনফালের ভূমিকায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রকৃতি ও স্বভাব সম্পর্কে আমি কিছু জরুরী কথা বলে এসেছি। এই সূরায় বিধৃত সর্বশেষ বিধি বিধানকে বুঝার জন্যে ওই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন মনে হচ্ছে। যদিও এতে 'ফী যিলালিল কোরআনের'ই কিছু বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি হবে, কিন্তু সূরা তাওবার আয়াতগুলোকে বুঝার জন্যে তা খুবই জরুরী। আনফালের ভূমিকার ওই অংশটি নিম্নরূপ

'ইমাম ইবনুল কাইয়েম স্বীয় গ্রন্থ 'যাদুল মায়াদে'র একটি অধ্যায়ে ইসলামের জেহাদ সংক্রান্ত বিধানের চমৎকার সার নির্যাস তুলে ধরেছেন। তিনি ওই অধ্যায়টার শিরোনাম দিয়েছেন।

'নবুওত থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত কাফের ও মোনাফেকদের ব্যাপারে অনুসৃত নীতি।' এই অধ্যায়ে তিনি বলেন, 'মহান আল্লাহ সর্ব প্রথম তাঁর কাছে যে ওহী নাযিল করেন তা ছিলো এই যে, তিনি যেন তাঁর সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে পাঠ করেন। এটি ছিলো তাঁর নবুয়তের সূচনা। এ সময় তিনি শুধু তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে পাঠ করার নির্দেশ দেন। এ সময় তাঁকে তাবলীগ বা প্রচারের কোনো আদেশ দেননি। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ওপর নাযিল করা হয়, 'হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো এবং সতর্ক করো।' সুতরাং ইকরা' বা পাঠ করো বলে আল্লাহ তাঁকে নবী বানালেন, 'আর হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো এবং সতর্ক করো' বলে তাঁকে রসূল পদে উন্নীত করলেন। অতপর তিনি তাঁর নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করলেন, তাঁর গোত্রকে সতর্ক করলেন, প্রতিবেশী আরবদেরকে সতর্ক করলেন, সমগ্র আরব জাতিকে সতর্ক করলেন, সমগ্র বিশ্ববাসীকে সতর্ক করলেন। এভাবে তাঁর নবুওতের পর তিনি দশ বছরেরও অধিক সময় কোনো লড়াই

www.pathagar.com

বা জিযিয়া করো আরোপ ছাড়াই শুধু দাওয়াতের কাজ করে কাটালেন। এই সময়ে তাঁকে কোনো অস্ত্র ধারণ থেকে বিরত থাকা, ধৈর্য ধারণ করা ও ক্ষমা করার আদেশ দেয়া হয়েছিলো। অতপর তাঁকে হিজরত করার ও যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো। প্রথমে তাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো শুধু যারা তাঁর ওপর আক্রমণ চালায় তাদের বিরুদ্ধে, আর যারা তাঁর ওপর আক্রমণ করে না এবং দূরে সরে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়া হলো। অতপর তাঁকে সকল মোশরেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হলো। যাতে সমস্ত আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন ও হুকুম মান্য করা না হয়।

অতপর জেহাদের নির্দেশ দেয়ার পর কাফেররা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হলো– ১. যাদের সাথে আপোস ও সন্ধির নীতি অবলম্বন করা হবে। ২. যাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে এবং ৩. যাদেরকে সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা দানের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হবে। প্রথম শ্রেণীটার সাথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তি তাঁকে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হলো। যতোক্ষণ তারা চুক্তি মেনে চলে, ততোক্ষণ মুসলমানদেরও তা মেনে চলতে হবে। কিন্তু যখন তাদের পক্ষ থেকে চুক্তি লংঘনের আশংকা দেখা দেবে, তখন মুসলমানরা চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করবে। কিন্তু তারা চুক্তি লংঘন করা শুরু করেছে এমন সুনির্দিষ্ট তথ্য না জানা পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে না। যারা চুক্তি লংঘন করেছে, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

সূরা তাওবা নাযিল করার মাধ্যমে এই তিন প্রকারের কাফেরদের সকলের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। আহলে কেতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা মুসলমানদের শত্রু, তারা ইসলাম গ্রহণ কিংবা জিযিয়া করো প্রদান না করলে মুসলমানদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়। কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ও তাদের ওপর কঠোরতা আরোপের আদেশ দেয়া হয়েছে। রসূল (স.) কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রশক্তি এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে বাকশক্তি ও যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জেহাদ করলেন। আল্লাহ তাঁকে কাফেরদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল করার আদেশ দিলেন এবং তাদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন। প্রথমত, যারা চুক্তি লংঘন করেছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি তাদের সাথে লড়াই করলেন ও তাদেরকে পরাজিত করলেন। দ্বিতীয়ত, যাদের সাথে মুসলমানদের নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি রয়েছে, কিন্তু তারা চুক্তি লংঘনও করেনি এবং মুসলমানদের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রমণও চালায়নি। তাদের সাথে কৃত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তৃতীয় যাদের সাথে মুসলমানদের কোনো চুক্তি ছিলো না কিংবা মেয়াদহীন চুক্তি ছিলো এবং তারা রসূল (স.) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়নি। এই শ্রেণীর লোকদেরকে চার মাস সময় দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। এই চার মাস অতিবাহিত হলে তাদেরকে

www.pathagar.com

হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রসূল (স.) চুক্তি লংঘনকারীদেরকে হত্যা করলেন। যাদের সাথে চুক্তি ছিলো না কিংবা চুক্তির কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ ছিলো না, তাদেরকে তিনি চার মাস সময় দিলেন। আর চুক্তি মান্যকারীর সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন। এই সব লোক ইসলাম গ্রহণ করলো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কুফরীর ওপর অবিচল থাকলো না। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত থাকার অংগীকারে আবদ্ধ অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করলেন।

এভাবে সূরা তাওবা নাযিল হবার পর রসূল (স.)-এর সামনে তিন শ্রেণীর কাফের অবশিষ্ট রইলো, যারা যুদ্ধরত, যারা চুক্তিবদ্ধ এবং যারা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত। অতপর চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের ভাগ্য মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত হলো। ইসলামের আওতায় এরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হলো- ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত ও বিদ্রোহী। যারা বিদ্রোহী, তারা রসূল (স.)-কে ভয় পেতো। এভাবে গোটা দুনিয়ার মানুষ তিন রকমের দাঁড়ালো- মুসলমান, নিরাপদ আপোসকামী অমুসলিম এবং ভীরু বিদ্রোহী। মোনাফেকদের ব্যাপারে তাঁর নীতি ছিলো এই যে, আপাতদৃষ্টিতে তাদেরকে যেমন দেখা যায়, তেমনিই বিবেচনা করা, তাদের মনের অবস্থা আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা, তাদেরকে এড়িয়ে চলা, তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ ও কঠোর নীতি অবলম্বন, হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দ্বারা তাদের মন জয় করা, তাদের জানাযা না পড়া এবং তাদের কবর যিয়ারত না করা। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এরূপ আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, কোনো মোনাফেকের জন্যে তিনি ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। এই ছিলো রসূল, ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন কাফের ও মোনাফেকদের প্রতি রসূল (স.)-এর নীতি।'

ইসলামে জেহাদের বিভিন্ন স্তরের বিধান সম্বলিত দীর্ঘ আলোচনার এই চমৎকার সারসংক্ষেপ থেকে ইসলামের আন্দোলন পদ্ধতির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য জানা গেলো, যা বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। কিন্তু আমি এ তাফসীরে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করবো!

প্রথম বৈশিষ্ট্য, জীবন পদ্ধতির বাস্তবমুখিতাই ইসলামের পয়লা বৈশিষ্ট্য। এটা মানব সমাজের বিদ্যমান একটা বাস্তব অবস্থার মোকাবেলা করে এবং পৃথিবীতে ইসলামের অস্তিত্বকে সংরক্ষণ করার জন্যে সম্ভাব্য যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করে। ইসলাম জাহেলী মতবাদ ও আদর্শের মোকাবেলা করে। এই জাহেলী মতবাদ ও মতাদর্শের ভিত্তিতে বহু বাস্তব রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং বস্তুগত শক্তিতে বলীয়ান বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান সেগুলোকে সমর্থন ও সাহায্য করে। এ জন্যে ইসলাম এই গোটা বাস্তব অবস্থাটারই মোকাবেলা করে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে। একদিকে আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণার সংশোধনকল্পে দাওয়াত ও প্রচারমূলক কাজের মাধ্যমে এবং অপরদিকে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উচ্ছেদকল্পে শক্তি প্রয়োগ ও জেহাদের মাধ্যমে এর মোকাবেলা করে। কেননা এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রচার ও

www.pathagar.com

দাওয়াতের মাধ্যমে জনগণের ধারণা বিশ্বাস সংশোধনে বাধা দেয়, তাদেরকে বলপ্রয়োগ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে নতি স্বীকার করায় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য প্রভুদের গোলামে পরিণত করে। বস্তুগত শক্তির মোকাবেলায় কেবল প্রচার ও দাওয়াতের মধ্যে এ আন্দোলনের তৎপরতা সীমাবদ্ধ থাকে না। অনুরূপভাবে তা মানুষের বিবেকের ওপর কোনো বস্তুগত বলও প্রয়োগ করে না। ইসলামের জীবন পদ্ধতিতে ওই দুটো জিনিসই সমান গুরুত্বসম্পন্ন। মোট কথা, ইসলামের যাবতীয় তৎপরতার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহর বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধু আল্লাহর অনুগত বান্দায় পরিণত করা। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে আরো আলোচনা করা হবে।

ইসলামের জীবন পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এর আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবমুখিতা। এ হচ্ছে ধাপে ধাপে অগ্রসরমান একটা আন্দোলন। এর প্রত্যেকটি ধাপের দাবী ও বাস্তব প্রয়োজন পূরণের উপকরণাদি এর হাতে রয়েছে। প্রতিটি ধাপ এমন যে, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী ধাপ পর্যন্ত আন্দোলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ইসলাম শুধুমাত্র মতবাদ ও মতাদর্শ দ্বারা বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করে না। অনুরূপভাবে তা নিষ্ক্রিয় উপকরণাদি দ্বারাও বিরাজমান পরিস্থিতি ও পরিবেশের মোকাবেলা করে না। যারা কোরআনের আয়াতগুলোকে ইসলামের জেহাদ সংক্রান্ত বিধান প্রমাণ করার কাজে ব্যবহার করে, কিন্তু এই পর্যায়ক্রমিকতা ও ধারাবাহিকতার বৈশিষ্ট্যকে হিসাবে ধরে না এবং ইসলাম যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় ও এর প্রতিটি ধাপের সাথে যে কোরআনের আয়াতসমূহের সম্পর্ক রয়েছে তা উপলব্ধি করে না, তারা মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয় এবং আয়াতগুলোর ভুল অর্থ করে তা থেকে এমন সব মতবাদ ও মতাদর্শ বের করে, যা আদৌ ওই আয়াতগুলোর বক্তব্য নয়। এরূপ হওয়ার কারণ হলো, তারা কোরআনের প্রতিটি উক্তিকে অন্যান্য উক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একমাত্র ও সর্বশেষ উক্তি মনে করে। তাদের ধারণা যে, ওই আয়াতেই ইসলামের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ নীতিমালা ব্যক্ত করা হয়েছে। তারা বিরাজমান শোচনীয় পরিস্থিতি ও পরিবেশের চাপের কাছে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরাজিত হয়ে মুসলমানদের নতুন প্রজন্মকে বলে যে, ইসলাম শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যে জেহাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। এভাবে তারা পৃথিবী থেকে সকল আল্লাহ বিরোধী শাসনের অবসান ঘটানো এবং সকল মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধু আল্লাহর গোলামে পরিণত করার মহান দায়িত্ব থেকে ইসলামকে অব্যাহতি দিয়ে ইসলামের একটা উপকার সাধন করলেন বলে মনে করেন। বস্তুত ইসলাম কাউকে তার আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। কিন্তু মানুষ যাতে তার আকীদা বিশ্বাস স্বাধীনভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে, সে জন্যে যমীনে বিদ্যমান স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস অথবা পরাভূত করতে চায়। এই শাসন ব্যবস্থাকে জিযিয়া দিতে ও ইসলামের অধীনতা বরণ করতে সে বাধ্য করে, যাতে মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে ইসলামকে গ্রহণ বা বর্জনের ফয়সালা করতে পারে।

www.pathagar.com

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলামের চিরস্থায়ী আন্দোলন ও তার নিত্য নতুন উপায় উপকরণ ইসলামকে কখনো তার স্থায়ী ও শাশ্বত নীতিমালা ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে না। প্রথম থেকেই এ আন্দোলন শুধু কোরায়শদেরকে নয় এবং শুধু আরবদেরকে নয়, বরং সমগ্র মানব জাতিকে একই মূলনীতি ও একই লক্ষ্যের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। এক আল্লাহর এবাদাত ও আনুগত্য করা এবং আল্লাহর বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। এই মূলনীতির ব্যাপারে তার কোনো আপোস নেই। অতপর সে এই মূলনীতিকে পর্যায়ক্রমে ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত করে, যেমন দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসংগে আমি বলে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, মুসলমানদের সাথে সকল অমুসলমানের সম্পর্ক আইনানুগভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে 'যাদুল মায়াদ' থেকে ইতিপূর্বে উদ্ধৃত নির্দেশিকার আলোকে। সেই নির্দেশিকা এই যে, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা অথবা অন্তত পক্ষে নমনীয় হওয়া, তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা, তাঁর এবাদাত ও আনুগত্যে কাউকে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উপকরণাদি দ্বারা বাধা না দেয়া এবং সবাইকে ইসলাম গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান নিশ্চিত করা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের কর্তব্য। কোনো মানুষ নিজে ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক এ ব্যাপারে সে পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু সে যদি অন্য কাউকে বাধা দেয়, তবে ইসলাম তা বরদাশত করে না। যে ব্যক্তি অন্যকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেবে, ইসলাম তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করবে, যতোক্ষণ না সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অথবা বাধা দান থেকে বিরত হয় ও বশ্যতা স্বীকার করে।

ইবনুল কাইয়্যেমের সে আলোচনার আলোকে আমরা এই সূরায় বর্ণিত চূড়ান্ত বিধানগুলোর যৌক্তিকতা বুঝতে পারি। এ বিধানগুলোর মধ্যে রয়েছে মোশরেকদের সাথে সম্পাতি সকল চুক্তি আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে বাতিল ঘোষণা। যাদের সাথে মেয়াদী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো, কিন্তু তারা চুক্তি ভংগ করেনি এবং কোনো শত্রুকে মুসলমানদের ওপর উস্কে দেয়নি বা লেলিয়ে দেয়নি, তাদেরকে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দানের নির্দেশ। অনুরূপভাবে যাদের সাথে মেয়াদবিহীন চুক্তি ছিলো, কিন্তু তারা চুক্তি লংঘন করেনি, কাউকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে বা উস্কে দেয়নি এবং যাদের সাথে কোনো চুক্তিই ছিলো না এই উভয় শ্রেণীর মোশরেকদেরকে চার মাস সময় দানের নির্দেশ, আর চুক্তি লংঘনকারীদের চুক্তি বাতিল করা, তাদেরকে চারমাস নিরাপদে চলাফেরার অবকাশ দান এবং এরপর তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে হত্যা করা, অবরোধ করা ও নিরাপদে চলাফেলার সুযোগ না দেয়ার নির্দেশ। অনুরূপভাবে এ থেকে আমরা আল্লাহর প্রকৃত বিধান থেকে বিপথগামী আহলে কেতাবের সাথে তারা যতোক্ষণ সর্বান্তকরণে বশ্যতা স্বীকার পূর্বক জিযিয়া না দেয়, ততোক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশের যৌক্তিতা বুঝতে পারি, যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারি কাফের ও মোশরেকদের ওপর একই সাথে জেহাদ করার, মোনাফেকদের মৃতদের ওপর জানাযার নামায না পড়া ও তাদের কবর যিয়ারত না করার নির্দেশেরও। এই সমস্ত হুকুম বা

www.pathagar.com

বিধি ইতিপূর্বে নাযিল করা অন্য সকল বিধির পরিবর্তনকারী ও সংশোধনকারী। এই পরিবর্তন ও সংশোধনের যৌক্তিকতাও ইমাম ইবনুল কাইয়েমের ওই আলোচনার আলোকে বুঝা সহজ হয়েছে বলে মনে হয়।

এখানে এই সব পরিববর্তিত বিধি বা পরিবর্তনের পূর্বেকার বিধি নিয়ে বিশদ আলোচনা করার অবকাশ নেই। ইনশা আল্লাহ।

তবে সংক্ষেপে শুধু এতোটুকু বলবো যে, পূর্ববর্তী ওই সব বিধি সূরা তাওবার বিধি দ্বারা রহিত হয়ে যায়নি যে, পরবর্তী কালের কোনো সময়ে ও কোনো পরিস্থিতিতেই মুসলিম উম্মাহ ওগুলোকে কার্যকর করতে পারবে না। কেননা ইসলামী আন্দোলন স্থান, কাল ও পাত্রভেদে যে সব বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকে, স্বাধীন ইজতেহাদ তথা বিচার বিবেচনার মাধ্যমে সেই বাস্তব পরিস্থিতির আলোকেই স্থির করা হবে, কোনো স্থান, কাল বা অবস্থার কোন বিধান অপেক্ষাকৃত মানানসই হবে, সূরা তাওবার বিধান, না পূর্ববর্তী বিধান। তবে সর্বশেষ বিধানের কথা কখনো ভুলে যাওয়া যাবে না। কেননা এ বিধান কার্যকরী করার মত পরিস্থিতি যদি মুসলমানদের আবার কখনো হয়, তখন মোশরেক বা আহলে কেতাব যাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হোক, এই বিধান প্রয়োগ করা হবে।

আজ কাল যে নামধারী মুসলিম প্রজন্মটি আমাদের সামনে রয়েছে, তাদের বাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এবং ইসলামের মৌল জেহাদ তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবাদী জাহেলিয়াত চক্রের আক্রমণাত্মক নিন্দা সমালোচনার মুখে দিশেহারা হয়ে যে মুসলমানরা পরাজিত মানসিকতা লালন করছে, তারা কোরআনের সময়োচিত বিধানসমূহের এমন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে! যাতে মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব খতম করা, সকল মানুষকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের দিকে ফিরিয়ে নেয়া এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মানবরচিত আইন বিধানের আনুগত্য করতে বাধ্য করে এমন রাষ্ট্র, সরকার ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা সকল তাগূতী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্যে যে ইসলামী আন্দোলন চলছে, তা থেকে পালানোর আশ্রয়স্থল খুঁজে পাওয়া যায়।

এ জন্যেই তাদেরকে প্রায়ই বলতে দেখি যে, আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন, 'কাফেররা সন্ধি করতে চাইলে তুমিও সন্ধি করো', 'যারা তোমাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে লড়াই করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ীঘর থেকে বের করে দেয় না, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার ও সুবিচার করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না,' 'যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো...। আহলে কেতাব সম্পর্কে বলেন, 'বলো, হে আহলে কেতাব, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সর্বসম্মত এ কথাটার দিকে এসো যে, আল্লাহ ছাড়া কারো এবাদাত করবো না, ...'

এসব আয়াত থেকে তো বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের ভেতর বা বাইরে থেকে তার অধিবাসীদের ওপর আক্রমণে উদ্যত হয়েছে, এমন লোকদের সাথে ছাড়া ইসলাম আর কারো সাথে যুদ্ধ করতে বলে না। রসূল (স.) তো হোদায়বিয়াতে মোশরেকদের সাথেও চুক্তি করেছেন এবং মদীনার ইহুদী ও মোশরেকদের সাথেও শান্তি চুক্তি

www.pathagar.com

করেছেন। অর্থাৎ তারা তাদের পরাজিত মানসিকতা দ্বারা এ সবের এই অর্থই বুঝে থাকে যে, পৃথিবীর তাবত মানুষের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই, তারা আল্লাহ ছাড়া যার ইচ্ছে তার পূজা উপাসনা করে বেড়াক তাতে তার কিছু এসে যায় না। সে তার নিজ রাষ্ট্রীয় সীমানায় শান্তিতে থাকতে পারলেই হলো। এটা আসলে ইসলাম ও আল্লাহ উভয়ের সম্পর্কেই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ ও হীনমন্যতার নামান্তর। মুসলমানদের বিরাজমান শোচনীয় অবস্থা দেখে এবং বিশ্বের পরাক্রান্ত ও ইসলাম বিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর দাপটের সামনে নিজেকে শক্তিহীন ও অসহায় ভেবে লালন করা পরাজিতসুলভ মানসিকতা থেকেই মূলত এই হীনমন্যতার উৎপত্তি।

বিশ্বের এই সব পরাক্রান্ত শক্তির কাছে মানসিকভাবে তাদের এই পরাজয়ের দায় যদি তারা ইসলামের ওপর না চাপাতো, তাহলেও ব্যাপারটা তেমন গুরুতর মনে হতো না। মূলত তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকার কারণেই যে তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে এসেছে, তা যদি তারা বুঝতো, তা হলে সমস্যাটার সমাধান হয়তো সহজ হতো। কিন্তু তারা তো তাদের নিজেদের পরাজয়ের সমস্ত দায়দায়িত্ব আল্লাহর নিষ্কলংক ও নির্ভেজাল দ্বীনের ওপর চাপিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর!

কোরআনের যে আয়াতগুলোর দোহাই দিয়ে তারা নিজেদের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করে, সেগুলো একটা নির্দিষ্ট স্তর ও নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট। এই নির্দিষ্ট পরিস্থিতি মুসলিম উম্মাহর জীবনে বারবার বারবার আসতে পারে। যখন এ ধরনের পরিস্থিতি আসবে, তখন ওই সব আয়াতই বাস্তবায়িত হবে। কেননা ওই পরিস্থিতি দ্বারাই বুঝা যাবে যে, ওই আয়াতের বিধান দ্বারাই অনুরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করা হয়েছিলো। তাই ওই আয়াত এ ধরনের পরিস্থিতিতেই প্রযোজ্য। তবে এর অর্থ এ নয়, এটাই শেষ কথা ও চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং এটাই ইসলামের শেষ গন্তব্য এর অর্থ শুধু এই যে, নিজের অবস্থার পরিবর্তনে ও পথের বাধা অপসারণে মুসলিম উম্মাহকে অব্যাহতভাবে কাজ করে যেতে হবে, যাতে করে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ সূরায় যে চূড়ান্ত বিধিসমূহ নাযিল হয়েছে তা বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হয়। এ সূরা এমন পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিলো, যা পূর্ববর্তী সূরাগুলোর নাযিল হওয়ার সময় বিরাজমান ছিলো না। মোশরেকদের সম্পর্কে কোরআনের সর্বশেষ বিধান সূরা তাওবার প্রথম কয়েকটি আয়াতে বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যে সব মোশরেকের সাথে তোমাদের চুক্তি ছিলো,তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আর কোনো সম্পর্ক নেই .... (আয়াত ১-৬)

আহলে কেতাব সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আহলে কেতাবের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না, আল্লাহ ও রসূল যে সব জিনিস হারাম করেছেন তা হারাম করে না ...... তারা নতশিরে নিজ হাতে জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।' (তাওবা ২৯)

একথা সত্য আজকের যুগে মুসলমানরা সূরা তাওবার এই সব নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়। সাময়িকভাবে হলেও তারা অক্ষম। আর আল্লাহ কাউকে ক্ষমতার

www.pathagar.com

বাইরে কিছু করার দায়িত্ব দেন না। তাদের জন্যে এতোটুকু সুযোগ রাখা হয়েছে যে, এ সব চূড়ান্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তারা এ সূরার পূর্ববর্তী অন্যান্য সূরার বিধান অনুযায়ী কাজ করতে পারবে। তবে তাদের জন্যে এটা কোনো অবস্থাতেই বৈধ হবে না যে, পূর্ববর্তী স্তরের বিধানের সাথে সমন্বিত করার জন্যে সূরা তাওবার চরম স্তরের এই নির্দেশগুলোর অর্থই পাল্টে ফেলবে। তাদের নিজেদের দুর্বলতাকে আল্লাহর চির উন্নতশির ইসলামের ওপর চাপিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকা তাদের কর্তব্য। ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম এই ওজুহাতে তাকে বিকৃত করা ও তাকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করা থেকে সাবধান থাকা উচিত ও আল্লাহকে ভয় করা উচিত। নিসন্দেহে ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। তবে সেটা এই শর্তে যে, সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদাতে লিপ্ত থাকতে দেয়া হবে না এবং সমগ্র মানবজাতিকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে।

পৃথিবীতে মানুষ যে সব ধর্ম, মতবাদ বা আইন কানুন অনুসরণ করে তার সব যদি মানুষের তৈরী ধর্ম, মতবাদ বা আইন কানুন হয়, তাহলে প্রত্যেক ধর্ম, মতবাদ বা আইনের আওতায়, যতোক্ষণ একে অপরের ওপর আগ্রাসন বা বাড়াবাড়ি না করে, ততোক্ষণ শান্তিতে ও নিরাপদে থাকা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মানবরচিত বিধানের অধিকার এভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে যে, তারা সবাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে এবং একে অপরকে উৎখাত করার চেষ্টা করবে না।

কিন্তু যখন পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান ও মানবরচিত বিধান দু'টোই থাকবে, তখন পুরো পরিস্থিতিটা মৌলিকভাবে ভিন্নতর হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের অধিকার থাকবে আল্লাহদ্রোহীদের বাধাবিপত্তি চূর্ন করে, মানুষকে মানুষের আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং তাদেরকে তাদের পছন্দমত আদর্শ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দান করার।

পরাজিত মানসিকতাধারীরা, যারা সারা দুনিয়ার মানবজাতিকে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য প্রভুর দাসত্ব থেকে মুক্ত করার ইসলামী লক্ষ্যে কাজ করতে সংকোচ বোধ করার কারণে কোরআনের আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা ও অর্থ বিকৃত করে, তারা এ সত্যটা ভুলে যায়। তারা ভুলে যায় যে, আল্লাহর বিধান যেখানে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বকেই অনুমোদন করে, সেখানে বান্দার দাসত্ব অনুমোদনকারী মানবরচিত বিধানগুলোর সাথে তার সংঘাত স্বভাবতই অনিবার্য।

বস্তুত ইসলামে যে সর্বাত্মক জেহাদের বিধান দেয়া হয়েছে, সেটা আল্লাহর বিধানের স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত দাবী এবং এটাই তার অন্যতম যুক্তি। সুতরাং ওই সকল পরাজিত মানসিকতাধারী ও হীনমন্যতাভোগী লোকদের বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করা উচিত। এতে আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে সবলতা ও দৃঢ়তা দান করবেন এবং আল্লাহভীরু বান্দাদেরকে তিনি হক ও বাতিলের মধ্যে বাছবিচারের ক্ষমতা দানের যে ওয়াদা করেছেন, তাও হয়তো দিতে পারেন।

www.pathagar.com

সর্বশেষ কথা এই যে, এ সূরার শুরুতে অন্যান্য সূরার মতো 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা হয়নি। কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন 'মাসহাফে ওসমানী' এভাবেই সংকলিত হয়েছে। তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, 'আমি ওসমান বিন আফফান (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, সূরা আনফাল তো 'মাসানী' (যে সব সূরা একেবারে ক্ষুদ্রও নয় আবার তার আয়াত সংখ্যা একশো আয়াতের কম)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং সূরা তাওবার আয়াত সংখ্যা একশোর ওপরে। আপনি কোন্ কারণে এ দুটো সূরাকে পাশাপাশি লিখলেন এবং এদের মাঝে বিসমিল্লাহ ....' লিখলেন না! আবার এ দুটোকে বৃহত্তম সাতটা সূরারও অন্তর্ভুক্ত করলেন? উসমান (রা.) বললেন, রসূল (স.) যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন, তখন তাঁর ওপর বড় বড় সূরা নাযিল হতো। যখনই কোনো ওহী নাযিল হতো, অমনি কোনো না কোনো লেখককে ডেকে বলতেন, 'এই আয়াতটাকে অমুক সূরার অনুর্ভুক্ত করো।' সূরা আনফাল মদীনার জীবনের প্রথম দিককার এবং সূরা তাওবা কোরআনের শেষের দিককার সূরা। সূরা তাওবার বক্তব্য সূরা আনফালের বক্তব্যেরই মতো এবং আমি ভেবেছি যে, এ সূরা ওই সূরারই অন্তর্ভুক্ত। রসূল (স.) এ বিষয়টা আমাদেরকে জানানোর আগেই ইন্তেকাল করেন। এ জন্যেই দুটোকে পাশাপাশি রেখেছি, দুটোর মধ্যে 'বিসমিল্লাহ ....' লিখিনি এবং দুটোকে বড় বড় সাতটা সূরার অন্তর্ভুক্ত করেছি।'

সূরা দুটোকে 'বিসমিল্লাহ........' ছাড়া পাশাপাশি রাখার ব্যাখ্যা নিয়ে যতো হাদীস এসেছে, তন্মধ্যে এ হাদীসটাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এ হাদীসটা থেকে আমরা এ তথ্যও জানতে পারছি যে, রসূল (স.) জীবদ্দশায় প্রতিটি আয়াতকে যে সূরায় যে ধারাক্রম অনুসারে সাজাতে আদেশ দিতেন, সেই সূরায় সেইভাবেই তা সাজানো হতো। আমরা এও জানতে পারছি যে, একই সময়ে একাধিক সূরা খোলা রাখা হতো। যখন কোনো আয়াত কোনো নতুন কোনো আয়াত নাযিল হতো, তখন রসূল (স.) তাকে নির্দিষ্ট সূরায় যথাস্থানে লিখে দিতে বলতেন। সুতরাং প্রতিটি সূরার কত সংখ্যক আয়াত হবে এবং কোন আয়াত বা সূরার আগে-পরে কোন্ আয়াত বা সূরা বসবে, সেটা তাঁরই নির্দেশে স্থির হতো এবং এর প্রতিটি নির্দেশই হতো সুচিন্তিত ও বিজ্ঞান সম্মত।

বিভিন্ন সূরার ভূমিকায় আমরা প্রমাণ করেছি এবং লক্ষ্য করেছি যে, প্রত্যেক সূরারই একটা বিশিষ্ট সত্ত্বা থাকে, সেই বিশিষ্ট সত্ত্বাকে চিহ্নিতকারী কিছু নির্দিষ্ট প্রতীকও থাকে এবং নির্দিষ্ট একটা পরিমন্ডলও থাকে। তা ছাড়া ওই একই সূরায় ওই বিশিষ্ট সত্ত্বাকে ফুটিয়ে তোলা ও ওই সব প্রতীককে চিহ্নিত করার জন্যে স্বতন্ত্র কিছু বাচনভংগিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সম্ভবত উপরোক্ত প্যারায় ও তার পূর্ববর্তী ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসটাতে এ বৈশিষ্ট্যটার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

সূরা আর রা'দ

আমি অনেক সময় পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আমার সীমিত মানবীয় বিশ্লেষণ ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহর কালামকে স্পর্শ করতে ভয় পাই। বিশেষত এই সূরাটা সূরা আনয়ামের মত জ্বালাময়ী হওয়ার কারণে নিজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে এটিকে স্পর্শ করতে আমার ভয়ই লাগে।

তথাপি আমি নিরুপায়। আমরা এমন একটা প্রজন্মের সদস্য, যাদের কাছে কোরআনের বক্তব্য, তার উপস্থাপিত জীবন বিধান এবং তার মেযাজ ও স্বভাব প্রকৃতি বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে পেশ করা একান্ত জরুরী। কেননা কোরআন যে পরিবেশে নাযিল হয়েছিলো, এ প্রজন্মের মানুষ তা থেকে বহু দূরে অবস্থিত। যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে কোরআন নাযিল হয়েছিলো তা রয়েছে তাদের নাগালের বাইরে। তাদের চেতনা ও অনুভূতিতে কোরআনের প্রকৃত মর্মার্থ অনেকটা অস্বচ্ছ ও ঝাঁপসা হয়ে এসেছে এবং তার পরিভাষাগুলোর প্রকৃত অর্থও তাদের দৃষ্টিতে বিকৃত হয়ে গেছে। একদিকে কোরআন ও তার আলোয় উদ্ভাসিত ইসলামী পরিবেশ থেকে এ প্রজন্মের দূরত্ব এভাবে বেড়ে চলেছে, অপরদিকে যে জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করতে কোরআন নাযিল হয়েছিলো, তার সাথে তার অন্তরংগতা শুধু বাড়ছেই না; বরং সে সেই জাহেলিয়াতের মধ্যেই নিমজ্জিত আছে। যে প্রজন্মের কাছে কোরআন সরাসরি নাযিল হয়েছিলো, তাদের সাথে বর্তমান প্রজন্মের আরো একটা বড় পার্থক্য এই যে, ওই প্রজন্ম কোরআনকে সাথে নিয়ে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো, কিন্তু এ প্রজন্ম সে ধরনের লড়াই করে না। অথচ এ লড়াই ও সক্রিয় বিরোধিতা ছাড়া কোরআনের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ঘরের কোণে বসে এ কোরআনের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ংগম করা যায় না। জাহেলিয়াত উৎখাত ও কোরআনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সংগ্রাম করে এমন মর্দে মোমেন ছাড়া আর কেউ কোরআনের প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে কখনো সক্ষম হয় না।

এসব কারণেই কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গেলেই ভয়ে আমার মন দুরু দুরু করে, আর হাত কাঁপে।

আমার চেতনায় ও উপলব্ধিতে কোরআন যে ভাবের উজ্জীবন ঘটায় এবং যে প্রেরণা সঞ্চারিত করে, তা যথাযথভাবে ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এ কারণেই কোরআন থেকে যা বুঝি আর জনগণকে যা বুঝাই, তাতে সব সময় বিরাট একটা ব্যবধান থেকে যাচ্ছে বলে আমি অনুভব করি।

আমি এখন আমাদের এই প্রজন্ম ও যে প্রজন্ম কোরআনকে সরাসরি গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য গভীরভাবে উপলব্ধি করি। কোরআন তাদের প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করেছিলো এবং এর ভাব, উদ্দেশ্য, ইশারা ইংগিত ইত্যাদি সব কিছুই তারা সরাসরিভাবে কোরআন থেকে গ্রহণ করেছিলো। তাই তারা এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলো সরাসরিভাবে। তারা জাহেলিয়াতের মোকাবেলায় কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

করার সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়েছিলো। এভাবেই সীমাবদ্ধ পার্থিব জীবনে তারা সেই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলো, যা অলৌকিক ঘটনার মতো প্রতীয়মান হয়েছিলো। তারা নিজ দেশে, তাদের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশে এবং পরিশেষে সমগ্র বিশ্বের চিন্তা, কর্ম, মূল্যবোধ ও ভাবাবেগের জগতে এক সর্বাত্মক বিপ্লব সংঘটিত করেছিলো। এমনকি বিশ্ব ইতিহাসের গতি পর্যন্ত তারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে পেরেছিলো এবং সারা বিশ্ব ও বিশ্ববাসীকে আল্লাহর বিধানের আওতায় নিয়ে এসেছিলো।

তাদের এই বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটতো সরাসরি কোরআনের শক্তি ও প্রেরণার উৎস থেকে। আর কোরআনেরই চেতনা ও মূল্যবোধ অনুসারে তারা নিজেদের গড়ে তুলতো।

কিন্তু আজ আমরা জীবন, জগত, মূল্যবোধ ও সমাজ সভ্যতা সম্পর্কে মানুষের মতামত এবং ধ্যান ধারণা অনুসারে নিজেদের গড়ে তুলি। অক্ষম ও নশ্বর মানুষেরা কে বলে ও কে কি ধারণা পোষণ করে, আমরা তার অনুসরণ করি।

এরপর আমরা এ সব মানবীয় চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের দিকে দৃষ্টি দেই। কোরআন নাযিল হওয়ার সময়কার সেই প্রজন্মের জীবনে ও পারিপার্শ্বিক জগতে সংঘটিত বিপ্লবের দিকে এবং তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করি এ সব চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের আলোকে। ফলে ওই বিপ্লবের প্রেরণা, কারণ ও ফলাফল নির্ণয়ে ভুল করি। কেননা তারা ছিলো কোরআনের উপাদানে তৈরী এক অপূর্ব সৃষ্টি। তারা মানব রচিত মতবাদ ও মানবীয় চিন্তাধারা দ্বারা তৈরী ছিলো না। তাই তাদের কর্মকান্ড ও অবদানকে মানবীয় চিন্তাধারা এবং মূল্যবোধ দ্বারা ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।

আমি 'ফী যিলালিল কোরআন' পাঠকদের সতর্ক করছি, এই তাফসীর পাঠ করেই যেন তারা কোরআনের উদ্দেশ্য সাধন করে ফেলেছেন বলে মনে না করেন। এটা তারা পড়বেন শুধু এজন্যে যে, এ দ্বারা তারা আসল কোরআনের কাছাকাছি চলে যেতে পারবেন এবং আসল কোরআন আয়ত্তে এনে তার ছায়া (যিলাল) থেকে মুক্তি লাভ করবেন। এ জন্যে নয় যে, আসল কোরআনের পরিবর্তে শুধু কোরআনের ছায়ার নীচেই (যিলালিল কোরআন) চিরকাল বসে থাকবেন। আসল কোরআনের সন্ধান পেতে হলে তাদের অবশ্যই কোরআনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়িত করতে হবে এবং কোরআনের নেতৃত্বে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

সূরা আর রা'দের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে এই ক'টা প্রাসংগিক কথা না বলে পারলাম না। সূরা আররা'দ কতোবার পড়েছি তার হিসেবও আমার কাছে নেই। তথাপি যখনই পড়ি, মনে হয় যেন নতুন পড়ছি। আসলে কোরআনের এটাই বৈশিষ্ট্য। আপনি কোরআনের প্রতি যতোখানি মনোযোগ দেবেন, কোরআন আপনাকে সেই অনুপাতেই তার আভ্যন্তরীণ সম্পদ বিতরণ করবে। যতোবার আপনি খোলা মন নিয়ে কোরআন অধ্যয়ন করবেন, ততোবারই সে আপনাকে নিজের আলো, ঔজ্জ্বল্য, প্রেরণা ও উদ্দীপনা প্রদান করবে। প্রতিবারই আপনার কাছে তা নতুন প্রতীয়মান হবে, যেন সবেমাত্রই তার সাক্ষাত পেলেন এবং ইতিপূর্বে পড়েনওনি, শোনেনওনি এবং তা নিয়ে কোনো তৎপরতা চালাননি।'

www.pathagar.com

সূরা আর রা'দ একটা বিস্ময়কর সূরা। এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র একই সুর। একই ছন্দ ও একই গতি লক্ষণীয়, যা মানুষের মনমগয ও চেতনাকে বিচিত্র ধরনের আকার আকৃতি, ছায়া, দৃশ্য ও প্রেরণা দিয়ে ভরে তোলে, যা মানবসত্তাকে চারদিক থেকে এমনভাবে ঘিরে ধরে যে, সে নিজেকে রকমারি দৃশ্য, আকৃতি, আবেগ, অনুভূতি ও উপলব্ধির এক বিরাট সমাবেশের মধ্যে উপস্থিত দেখতে পায়। এ সব দৃশ্য মানুষের মনকে ভিন্ন ভিন্ন জগতে ও ভিন্ন ভিন্ন যুগে টেনে নিয়ে যায়। তাকে করে তোলে জাগ্রত, সচেতন, বুদ্ধিমান এবং চারপাশে বিরাজমান দৃশ্যাবলী ও উদ্দীপনাময় ঘটনাবলীর প্রতি সংবেদনশীল।

এ সূরার ভাষা ও বর্ণনাকে ভাষা ও বর্ণনা না বলে হাতুড়ির আঘাত, ধাক্কা ও ঝাঁকুনি বলাই সমীচীন। এর দৃশ্যাবলী, চিত্রাবলী, গীতিময়তা এবং অনুভূতিতে প্রচ্ছন্ন তরংগ সৃষ্টিকারী যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা বাক্যগুলোর নিরিখে বলা যায়, এটা একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী সূরা।

অন্য সব মক্কী সূরার মত এর প্রধান আলোচ্য বিষয়ও আকীদা-বিশ্বাস। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহই একমাত্র ইলাহ বা মাবুদ এবং আল্লাহই একমাত্র রব বা প্রভু। তাই দুনিয়া আখেরাত উভয় জায়গায় একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য ও দাসত্ব করতে হবে। সাথে সাথে ওহী, আখেরাত ও অন্যান্য অদৃশ্য তত্ত্বেও বিশ্বাস করতে হবে।

কিন্তু এই একক বিষয়টাও সব মক্কী ও মাদানী সূরায় একই পদ্ধতিতে বারংবার উপস্থাপিত হয়নি; বরং প্রতিবার নতুন নতুন ভংগিতে এবং নতুন উদ্দীপনা ও প্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে উপস্থাপিত হয়েছে।

এ সব আলোচ্য বিষয়কে এরূপ নিরুত্তাপ ও ঠান্ডাভাবে তুলে ধরা হয়নি যে, কয়েকটা শব্দের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত করা হলো এবং শেষ হয়ে গেলো, যেমন অন্যান্য মানবরচিত মনস্তাত্ত্বিক বিষয় তুলে ধরা হয়; বরং এগুলোকে একটা বিশেষ প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা হয়। সেই প্রেক্ষাপট হলো আজব সামগ্রীতে পরিপূর্ণ এ বিচিত্র বিশ্বজগত। এসব আজব ও বিস্ময়কর সামগ্রী হলো আলোচিত তত্ত্বসমূহের প্রমাণ এবং মানুষের উন্মুক্ত ও প্রাজ্ঞ উপলব্ধির সহায়ক নিদর্শন। এ সব অদ্ভুত ও বিচিত্র উপাদানের কোনো সীমা পরিসীমা নেই এবং এগুলো কখনো পুরনো হয় না; বরং এগুলো চির নতুন ও চির নবীন থাকে। কেননা এগুলো প্রতিদিন নতুন নতুন তথ্য উদঘাটন করে, আর অতীতে উদঘাটিত তথ্যকেও নবোদঘাটিত তথ্যের আলোকে নতুন বলে মনে হয়। তাই সূরার আলোচিত এ বিষয়গুলো বিশ্বজগতের বিচিত্র ও চির নতুন সামগ্রীর মেলায় চিরঞ্জীব থেকে যায়।

এ সূরা মানুষের মনকে বিশ্বের বিভিন্ন পরিমন্ডলে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় এবং তার কাছে সমগ্র বিশ্বজগতকে তার বিভিন্ন চমকপ্রদ দৃশ্য সহকারে তুলে ধরে। তুলে ধরে স্তম্ভহীন আকাশকে, সুনির্দিষ্ট মেয়াদের গতিপথে প্রদক্ষিণরত সূর্য ও চাঁদকে, পালাক্রমে আসা রাত ও দিনকে, তুলে ধরে অটল অনড় পর্বত ও প্রবহমান নদীনালা, ফল ও ফুলের বাগান, শস্য খামার, বিচিত্র রং আকৃতি ও স্বাদের খেজুরের বাগান, পাশাপাশি

www.pathagar.com

অবস্থানরত একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত ক্ষেত খামার, আশানিরাশা মিশ্রিত মেঘের বিদ্যুতের ঝলকানি, আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগানরত মেঘের গর্জন, বিনীত ভীত ফেরেশতা, মৃত্যু সম্ভাবনাময় বজ্রপাত, ভারি মেঘমালা, প্রবল বৃষ্টি, পানিরাশির ওপরের ফেনা এবং তার নীচে বিদ্যমান মানুষের উপকারী উপাদান ইত্যাদি সমন্বিত এই মহাবিশ্বকে।

অতপর মানুষের মন যেদিকেই রওনা হয়, এ সূরা তাকে সেদিকেই ধাওয়া করে। ধাওয়া করে তাকে সাবধান করে দেয়, আল্লাহর সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক জ্ঞানের আওতার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। প্রত্যেক পলাতক, অগন্তুক, প্রকাশ্যে চলাচলকারী ও গোপনে চলাচলকারী কেউই সে জ্ঞানকে ফাঁকি দিতে পারে না। প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীর মনের কথা পর্যন্ত তিনি জানেন। যে অদৃশ্য রহস্য কেউ জানে না, আল্লাহ তা জানেন। এমনকি গর্ভবতীর গর্ভে কী লুকিয়ে আছে এবং জরায়ুর অভ্যন্তরে সন্তান বাড়ছে না জরায়ু থেকে বের হচ্ছে তাও তিনি জানেন।

মহাবিশ্বের গোপন ও প্রকাশ্য বৃহৎ শক্তির প্রকৃত অবস্থাকে এ সূরা মানুষের উপলব্ধির কাছাকাছি নিয়ে আসে, তা সে যতোই সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল হোক, দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হোক। মানুষের কল্পনাশক্তির আয়ত্তাধীন এই বিষয়গুলো এতো ভয়ংকর যে, তা ভাবতেও হৃদয় কাঁপে। অত্যন্ত জীবন্ত, গতিশীল ও প্রভাবশালী দৃশ্যাবলীর আকারে এর বহু উদাহরণ বিদ্যমান। যেমন কেয়ামতের দৃশ্য, আযাব ও সুখের দৃশ্য, উভয় ক্ষেত্রে মানুষের মনের প্রতিক্রিয়া, অতীত জাতিগুলোর ধ্বংস থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং তাদের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বক্তব্যসমূহ ইত্যাদি।

এ হলো সূরার বিষয়বস্তু এবং তার মহাজাগতিক পরিমন্ডল সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এ ছাড়া এর বিস্ময়কর বাচনভংগিগত বৈশিষ্ট্য তো রয়েছেই। সুতরাং যে প্রেক্ষাপটে এ সূরার বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তা হলো প্রাকৃতিক জগত এবং প্রকৃতিতে ও মানব সত্ত্বায় বিদ্যমান তার বিস্ময়কর দৃশ্যাবলীর প্রেক্ষাপট। এর একটা বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতি রয়েছে।

সেই পরিস্থিতি কিছু পরস্পর বিরোধী দৃশ্যাবলীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছে। যেমন আকাশ, পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য এবং রাত ও দিন। এ ছাড়া নানাবিধ বস্তু ও তার ছায়া, বড় বড় পাহাড় পর্বত ও নদীনালা, ক্ষয়িষ্ণু ফেনা ও স্থিতিশীল পানি, পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অধিকারী ভূখন্ডসমূহ, সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন খেজুরের বাগান ইত্যাদি। তাই এসব পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্য সূরার সকল জিনিসে গতিতে, গুণবৈশিষ্ট্যে ও ফলাফলে সমভাবে চালু রয়েছে। এতে করে সূরার অদৃশ্য ও তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর বিরোধের সাথে দৃশ্যমান ও বস্তুগত বিষয়গুলোর বিরোধে সমন্বয় ঘটবে এবং সামগ্রিক সমন্বয় বিরাজ করবে। এ জন্যে আল্লাহর আরশের ওপর অধিষ্ঠানের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে সূর্য চন্দ্রের বশীভূতকরণকে (প্রথমটি তাত্ত্বিক ও দ্বিতীয়টি বস্তুগত), জরায়ু থেকে সন্তান বের হওয়ার বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে জরায়ুর ভেতরে বিকাশ লাভ করাকে (প্রথমটা দৃশ্যমান ও দ্বিতীয়টা অদৃশ্য), যে ব্যক্তি

www.pathagar.com

প্রকাশ্যভাবে কথা বলে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে গোপনে কথা বলে তার বিপরীতে (একটা দৃশ্যমান ও অপরটা অদৃশ্য), আকাশের বিদ্যুৎ চমকানিতে যে ভয় পায় তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে আশান্বিত হয় তার বিপরীতে, যে রাতের আঁধারে গুপ্তভাবে চলাচল করে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে দিনদুপুরে প্রকাশ্যে চলে তার বিপরীতে, বজ্রের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠকে উল্লেখ করা হয়েছে ফেরেশতাদের ভয়ভীতি সহকারে তাসবীহ পাঠের বিপরীতে, আল্লাহর পক্ষে হকের দাওয়াতকে উল্লেখ করা হয়েছে শরীকদের পক্ষে বাতিলের দাওয়াতের বিপরীতে, উল্লেখ করা হয়েছে জ্ঞানী ব্যক্তিকে অন্ধের বিপরীতে, আহলে কেতাবের মধ্য থেকে যারা কোরআন পেয়ে আনন্দিত তাদের উল্লেখ করা হয়েছে কোরআনের অংশবিশেষ অস্বীকারকারীদের বিপরীতে এবং আল্লাহর কেতাবকে হুবহু মান্য করার বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে তার অংশবিশেষ বিকৃত করাকে। এভাবে দৃশ্যমান জিনিস ও তৎপরতাকে অদৃশ্য তত্ত্বসমূহের বিপরীতে উল্লেখ করার মাধ্যমে বাচনভংগিতে সার্বিক সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

বাচনভংগিতে সমন্বয় সৃষ্টির আরো একটা উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, যেহেতু আকাশ ও পৃথিবী, সূর্য ও চাঁদ, বিদ্যুৎ ও বজ্র, বজ্র ও বৃষ্টি, জীবন ও উদ্ভিদ ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের অংশ বিশেষ, তাই সেই প্রসংগে উল্লেখ করা হয়েছে জরায়ুতে প্রচ্ছন্ন প্রাণীসমূহকে এবং তারই সাথে আলোচিত হয়েছে জরায়ু থেকে বহির্গত ও জরায়ুতে বিকাশমান প্রাণী সত্তাকে। আর জরায়ু থেকে সন্তানের বহির্গমন ও তার অভ্যন্তরে সন্তানের বিকাশকে সমন্বিত করা হয়েছে নদ নদী খাল বিলে পানির প্রবাহ ও উদ্ভিদের জন্মের সাথে। নিসন্দেহে এটা কোরআনের অতি চমকপ্রদ বাচনিক সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত।

যেসব কারণে আমি সূরা রা'দ ও অনুরূপ কয়েকটি সূরার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভয়ে প্রকম্পিত হই এবং আমার সীমিত মানবীয় বিশ্লেষণ ক্ষমতা দিয়ে তা স্পর্শ করতে শংকিত হই, এ হচ্ছে তার একটা কারণ।

তবে নতুন প্রজন্মের চাহিদা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যাখ্যা ও তাফসীরের দায়িত্ব আমাকে পালন করতেই হচ্ছে। কেননা এ প্রজন্ম কোরআনী পরিবেশে জীবন যাপনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তাই আল্লাহর সাহায্য কামনা করে এই বন্ধুর পথে অগ্রসর হলাম। আল্লাহ যেন আমার সহায় হন।

সূরা আল হাজ্জ

এ সূরার আয়াতগুলোর বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এ সূরাটা মক্কী ও মাদানী মিশ্রিত। বিশেষত যুদ্ধের অনুমতি দান সম্বলিত আয়াতগুলো অর্থাৎ ৩৮-৪১ নং আয়াত এবং সমান প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত অর্থাৎ ৬০ নং আয়াত সুনিশ্চিতভাবে মাদানী। কেননা মুসলমানদেরকে যুদ্ধ ও খুনের বদলায় খুনের অনুমতি হিজরতের পরে ছাড়া দেয়া হয়নি। হিজরতের পরে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

হবার পরেই এই অনুমতি দেয়া হয়। হিজরতের আগে যখন একদল মদীনাবাসী মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন তারা রসূল (স.)-এর কাছে মিনার অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ করা ও তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি চাইলো। রসূল (স.) বললেন, 'আমাকে এর আদেশ দেয়া হয়নি।' পরে যখন মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হলো, তখন আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের ওপর থেকে মোশরেকদের অত্যাচার ও নির্যাতন প্রতিহত করা, ঈমানের স্বাধীনতা রক্ষা করা ও মুসলমানদের এবাদাত করার অধিকার রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করার বিধান জারী করলেন।

মক্কী সূরাগুলোর ন্যায় আল্লাহর একত্ব, কেয়ামতের ভয় জন্মানো, পরকালের সত্যতা প্রতিষ্ঠা, শেরক খন্ডন, কেয়ামতের দৃশ্যাবলী এবং প্রকৃতির রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনাবলী ইত্যাদি এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এর পাশাপাশি যুদ্ধের অনুমতি দান, ইসলামী এবাদাত ও পবিত্র স্থানগুলো সংরক্ষণ, আগ্রাসন প্রতিরোধকারীর জন্যে আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহর পথে জেহাদের আদেশের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।

সূরার সার্বিক প্রেক্ষাপটে যে ভাবধারাটা সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, সেটা হচ্ছে শক্তি, তেজোদ্দীপ্ততা, দুর্ধর্ষতা, আতংক, সংঘাত, সতর্কীকরণ, ভীতি প্রদর্শন, আল্লাহভীতির প্রেরণা সৃষ্টি ও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধকরণের ভাবধারা।

এই ভাবধারা বিভিন্ন দৃশ্য ও উদাহরণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। তন্মধ্যে কেয়ামতের দৃশ্যটা এক ভয়াবহ, লোমহর্ষক ও সংঘাতময় দৃশ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে মানব জাতি, তোমাদের রবকে ভয় করো। নিশ্চয় কেয়ামতের কম্পন এক ভয়াবহ ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে, সেদিন প্রত্যেক দুধমাতা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত ঘটবে........।' (আয়াত ১-২)

অনুরূপ আযাবের দৃশ্যের মধ্য দিয়েও এ ভাবধারা ফুটে উঠেছে। যেমন, 'যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে আগুনের পোশাক পরানো হবে, তাদের মাথার ওপর দিয়ে এমন গরম পানি ঢালা হবে, যার দরুন তাদের পেটের নাড়িভুড়ি ও শরীরের চামড়া গলে যাবে। (আয়াত ১৯-২২)

আল্লাহর সাথে যারা শরীক করে তাদের উদাহরণের মধ্য দিয়েও এ ভাবধারার প্রতিফলন ঘটেছে। যথা,

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে ছিকে পড়লো। তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো........।' (আয়াত ৩১)

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে হতাশ হয়, তার আচরণের উদাহরণ দেয়া হয়েছে এভাবে,

'যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ তায়ালা রসূলকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে কখনো সাহায্য করবেন না, সে যেন আকাশ পর্যন্ত একটা রশি টানিয়ে নেয়, তারপর তা কেটে দেয়। অতপর সে যেন ভেবে দেখে তার এ কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কিনা।' (আয়াত ১৫)

www.pathagar.com

আর যেসব নগরবাসীকে তাদের অত্যাচার অনাচারের কারণে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, তাদের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে ৪৫ নং আয়াতে।

এসব ভীতিপ্রদ দৃশ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন আদেশ ও বিধি নিষেধ, শক্তি দ্বারা প্রতিরোধের যৌক্তিকতা, সাহায্য ও বিজয়ের আশ্বাস এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও তথাকথিত শরীকদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে সূরার বিভিন্ন জায়গায়। প্রথমে আদেশ ও বিধি নিষেধ জারী করা হয়েছে এভাবে,

'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে– যাদের ওপর আক্রমণ করা হয়। (আয়াত ৩৯-৪১)

দ্বিতীয় পর্যায়ে তথাকথিত শরীকদের অক্ষমতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে,

'হে মানব জাতি, একটা উদাহরণ দেয়া হয়েছে শোনো। তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের উপাসনা করো, তারা একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না......। (আয়াত ৭৩, ৭৪)

আর এই দুই বিষয়ের মাঝখানে রয়েছে তাকওয়া, আল্লাহভীতি ও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশাবলী, যেমন

'হে মানব সকল, তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মর্যাদা দান করে, তার সে কাজ অন্তরের আল্লাহভীতির অন্তর্ভুক্ত।'....... 'অতএব তোমাদের মাবুদ একই মাবুদ, তার কাছেই আত্মসমর্পণ করো। সুসংবাদ দাও সেই অনুগতদেরকে, যাদের সামনে আল্লাহর প্রসংগ আলোচিত হলে তাদের মন ভয়ে কেঁপে ওঠে ..... (কোরবানীর জন্তুর) গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, আল্লাহর কাছে পৌঁছে শুধু তোমাদের ভয়।'

এছাড়াও রয়েছে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর পর্যালোচনা, কেয়ামতের বিভিন্ন দৃশ্য, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের বৃত্তান্ত, আরো রয়েছে বিভিন্ন উদাহরণ, শিক্ষামূলক, বর্ণনামূলক ও মননশীল পর্যালোচনা। এ সবের উদ্দেশ্য হলো পাঠক শ্রোতার মনমগযে ঈমান, আল্লাহভীতি, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের প্রেরণা সৃষ্টি করা। এই হলো সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট ও বৈশিষ্ট্য।

সমগ্র সূরাটাকে মোটামুটিভাবে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম অধ্যায়টা শুরু হয়েছে আল্লাহকে ও কেয়ামতের ভয়াবহ ভূমিকম্প ও অন্যান্য বিভীষিকাময় দৃশ্যাবলীকে ভয় করার জন্যে সমগ্র মানব জাতিকে সর্বাত্মক আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে। তারপর এই ভীতির পটভূমিতে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে না জেনে শুনে তর্ক করার সমালোচনা করা হয়েছে। নিন্দা করা হয়েছে সেই অভিশপ্ত শয়তানের অনুসরণের যার অনুসরণে বিপথগামিতা অনিবার্য।

তারপর মাতৃগর্ভে মানব ভ্রুণের পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর ও বিবর্তন এবং উদ্ভিদের জীবন সম্পর্কে পর্যালোচনা করে তা দ্বারা আখেরাতের প্রমাণ দেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রাণীর মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণ করা হয়েছে। আর আবহমান কাল ব্যাপী বিরাজিত এই পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের সাথে আল্লাহর মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা, তাঁর অসীম

www.pathagar.com

ক্ষমতা, কেয়ামতের অনিবার্যতা, কবর থেকে মানুষের জীবিত হয়ে পুনরুত্থানের মাঝে গভীর সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এ সবই চিরন্তন রীতি, শাশ্বত সত্য এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। অতপর বিশ্ব প্রকৃতির অভ্যন্তরে আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের এতো প্রমাণ থাকা সত্তেও কোনো যুক্তি-প্রমাণ ও জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহকে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। সমালোচনা করা হয়েছে পার্থিব লাভ ক্ষতির নিরীখে আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের। বিপদ মুসিবতে পড়লেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো আশ্রয় গ্রহণ ও সাহায্য প্রার্থনা করার এবং আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে হতাশ হওয়ার। এই অধ্যায়টার সমাপ্তি টানা হয়েছে ও সমালোচনা করা হয়েছে। এই বলে যে, বিপথগামিতা ও সুপথগামিতা আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ এবং বিবিধ রকমের আকীদা বিশ্বাস অবলম্বনকারীদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালাই কেয়ামতের দিন নিষ্পত্তি করে দেবেন। এই পর্যায়ে কাফেরদের কঠিন শাস্তি ও মোমেনদের বিপুল নিয়ামতের কথাও তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তির সাথে সাথে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা করা হচ্ছে। যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে ও মাসজিদুল হারাম থেকে জনগণকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তাদের সম্পর্কেই আলোচনা এসেছে এ অধ্যায়ের শুরুতে। এই মাসজিদুল হারামকে আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষের জন্যে তৈরী করেছেন, চাই এর স্থায়ী অধিবাসী হোক বা অস্থায়ী অধিবাসী হোক। এই প্রসংগে তিনি কাবাঘর নির্মাণ, কাবাঘরকে তাওহীদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা ও শেরকের নোংরামি থেকে পবিত্র করার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন। হজ্জের কিছু বিধি আলোচনা করার পর অন্তরে আল্লাহভীতি জাগিয়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেননা এটাই হলো মূল উদ্দেশ্য আর এই অধ্যায়টার উপসংহার টানা হয়েছে একমাত্র আল্লাহকে হুকুমদাতা প্রভু মেনে নেয়ার 'অপরাধে' মোমেনদের ওপর আগ্রাসন চালানো হলে তা প্রতিহত করার জন্যে লড়াই করার অনুমতি দানের মাধ্যমে।

তৃতীয় অধ্যায়টার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পূর্ববর্তী যুগের কাফেরদের পক্ষ থেকে নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের কিছু নমুনা ও তাদের ধ্বংসের কাহিনী। এগুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্য ইসলামের দাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহর চিরাচরিত নীতি বর্ণনা করা, ক্রমগত বিরোধিতা ও উপেক্ষায় বিব্রত রসূল (স.) ও মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দান ও চূড়ান্ত বিজয়ের আশ্বাস দান। অনুরূপভাবে দাওয়াতের বিভিন্ন পর্যায়ে নবী ও রসূলের বিরুদ্ধে শয়তানের নানা ধরনের কুটিল ষড়যন্ত্র, তাদেরকে দাওয়াতের পথে টিকে থাকার জন্যে আল্লাহর সাহায্য। তাঁর আয়াতগুলোকে অবিকৃতভাবে বহাল রাখার পদক্ষেপও এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, যাতে মোমেনদের ঈমান দৃঢ় হয় এবং দুর্বল ঈমানের অধিকারীরা ও অহংকারীরা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।

সর্বশেষ অধ্যায়টাতে আলোচিত হয়েছে আগ্রাসন ও অত্যাচারের শিকার সংগ্রামরত মুসলমানদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতির উল্লেখের অব্যবহিত পরই প্রকৃতির জগতে মহান আল্লাহর অসীম শক্তির যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে

www.pathagar.com

রয়েছে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর এরই পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে মোশরেকদের উপাসিত দেব-দেবীর অক্ষমতার কথা। অতপর এক আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর পথে যথাযথভাবে জেহাদ করা। একমাত্র আল্লাহকেই সর্বাবস্থায় আঁকড়ে ধরা এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আমল থেকে যে আকীদা ও আদর্শের প্রতি তারা অনুগত রয়েছে তার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে তৎপর হওয়ার জোরদার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে এই অধ্যায় ও সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

সূরা আন নূর

এটি পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরীর মধ্যে অবতীর্ণ সূরা।

'এক এমন সূরা যা আমিই নাযিল করেছি এবং এর মধ্যে বর্ণিত সুস্পষ্ট আয়াতগুলোর মাধ্যমে আমার বিধানগুলোকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছি, যাতে করে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো ......তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবন ধারণ সামগ্রী। (আয়াত ১-২৬)

এ সূরাটির নাম রাখা হয়েছে নূর– আলো বা আলোকবর্তিকা......এখানে শুভ্র সমুজ্জল, আলোক বর্তিকা সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে, যার সম্পর্ক রয়েছে স্বয়ং আল্লাহর নিজ অস্তিত্বের সাথে, এই সূরারই এক আয়াতে যেমন রয়েছে 'আল্লাহ তায়ালাই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর 'নূর'। এ আলোর প্রভা ও প্রকাশ অবশ্যই আলোকিত অন্তর ও আত্মাগুলোকে প্রভাবিত করে, এ প্রভাবসমূহ অতপর মানুষের মধ্যে আদব শৃংখলা ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত চরিত্র আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই কথাগুলোই হচ্ছে এ সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয়। তাই দেখা যায়, সমগ্র সূরাটি জুড়ে রয়েছে সেই সব শিক্ষা, যা ব্যক্তি থেকে নিয়ে পরিবার পর্যন্ত একটা সমাজ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শিক্ষার আলোকেই অন্তর আলোকিত হয়, জীবন সমুজ্জল হয়। গোটা বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে যে আলোকমালা রয়েছে তার সাথে একাত্ম হয়ে গিয়ে মানবাত্মাগুলোকে স্নিগ্ধ পবিত্র আলো দান করে, এ আলোই মানুষের অন্তরসমূহে প্রবিষ্ট হয় এবং এটা বিবেকের মধ্যেও প্রতিফলিত হয় । এসব কিছুই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সুবিশাল আলোক বর্তিকা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে।

সূরাটি শুরু হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ও অকাট্য এক ঘোষণার সাথে, যার মধ্যে সূরার মধ্যে বর্ণিত আলোচ্য বিষয়সমূহের পূর্বাভাস এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নির্দেশাবলী, তাঁর দেয়া সীমারেখাগুলো ও বাধ্যতামূলক কাজগুলোর বর্ণনা–সবই স্থান পেয়েছে। আরো বর্ণিত হয়েছে জীবনের নিয়ম-শৃংখলা ও চারিত্রিক মূলনীতিগুলো।

এরশাদ হচ্ছে,

'এটি এমন এক সূরা যা আমি নাযিল করেছি এবং এর মধ্যে বর্ণিত বিধানগুলোকে ফরয করে দিয়েছি। আরো আমি নাযিল করেছি এর মধ্যে সুস্পষ্ট আয়াতগুলোকে, যাতে করে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।' ......

www.pathagar.com

অতপর এ সূরাটির প্রারম্ভিক কথাতে কিছু চারিত্রিক বলিষ্ঠতা গড়ে তোলার জন্যে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় আল কোরআনের দৃষ্টিভংগি ব্যক্ত হয়েছে, মানুষের জীবনে শান্তি সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্যে চরিত্র বল কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাও জানিয়েছে। ইসলামী আকীদাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে এর প্রয়োজন কত বেশী এবং মানব জীবনের জন্যে যে চিন্তাধারা ইসলাম দিয়েছে তার মধ্যে এর স্থান কতো উঁচু তাও বলা হয়েছে।

মূল যে বিষয়টিকে ঘিরে সূরাটির আলোচ্য বিষয়গুলো আবর্তিত হয়েছে তা হচ্ছে মানুষকে সত্যিকারে ভালো মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। এর জন্যে এর উপায় উপাদানকে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে এবং এর সীমানাগুলোকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। মানুষের আবেগ অনুভূতি ও মনুষ্য হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যে প্রেম প্রণয়ের বীজ নিহিত রেখেছেন তারও যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়েছে, এসব সুচারু বৃত্তিগুলোও জানানো হয়েছে। এগুলো যে আল্লাহর আলো ও তাঁর নিদর্শনসমূহের দান এবং এগুলোর সাথেই যে রয়েছে এসব হৃদয়াবেগের নিবিড় সম্পর্ক তাও বলা হয়েছে। আল্লাহর এসব নিদর্শন সারা বিশ্বব্যাপী এবং মানুষের গোটা জীবন জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এ আয়াতগুলোতে কঠোরতা ও শিথিলতা যাই প্রদর্শন করা হয়েছে, সে সবের লক্ষ্য একটিই, আর তা হচ্ছে মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান করা, তাদের চেতনা ও আবেগ-অনুভূতিকে সন্নিহিত করা, জীবনকে সুন্দর করার লক্ষ্যে চারিত্রিক মাপকাঠির এতোটা উন্নয়ন করা যেন জীবনের সব কিছুর ওপর এর প্রভাব পড়ে ও আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নূরের সাথে এর একটা সংযোগ সাধিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এক নিয়ম শৃংখলা গড়ে ওঠে, বাড়ীঘর ও পরিবারের মধ্যে সুস্থ ও সুন্দর ব্যবস্থা রক্ষিত হয়, দল ও দলীয় নেতৃত্ব সবাই যেন আল্লাহর ওপর ঈমানের মূল উৎস থেকে জীবনের সুমধুর রস গ্রহণ করতে পারে, সবশেষে সেই কেন্দ্রীয় নূরের সাথে সবাই গিয়ে মিলিত হয়, এটা মূলত আল্লাহ রব্বুল ইযযতেরই নূর। এই নূরই সব কিছুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে সব কিছুকে আলোকিত করে, সমুজ্জ্বল করে ও পবিত্র বানায়। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রশিক্ষণ আসে সেই প্রথম এবং সেই একই নূর থেকে, যা গোটা ভুবন, আকাশ, ভূমন্ডল ও বিশ্ব প্রকৃতির সব কিছুকে আলোকিত করে রেখেছে, সকল অন্ধকার অপসারিত করেছে, অন্তর ও বিবেকের মধ্যস্থিত পুঞ্জীভূত আবর্জনা থেকে মানুষকে ও সকল প্রাণকে পবিত্র করেছে।

সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, মানুষ গড়ার প্রোগ্রাম। তার আলোচনাকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে,

এক. এ অধ্যায়ে যেনার ওপর প্রথম ও চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ক শাস্তির বিধান সম্পর্কেও ঘোষণা দেয়া হয়েছে। চরম ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়েছে এ জঘন্য অপরাধের প্রতি এবং মুসলিম জামায়াত থেকে যেনাকারীদেরকে একঘরে করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলিম জামায়াতের সাথে তাদের কোনো

www.pathagar.com

সম্পর্ক রাখা হয়নি, ওরাও মুসলিম জামায়াতের কেউ নয় বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর সূরাটিতে পাথর মেরে হত্যা করার হুকুম জারি করা হয়েছে এবং এই কঠোরতার কারণও জানানো হয়েছে। তারপর স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে লানত পাঠানোর অবস্থায় তাদেরকে পৃথক হওয়া থেকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। এরপর মিথ্যা দোষারোপ (ইফক)-এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে.....আর এ অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, নষ্ট পুরুষ নষ্ট মেয়ের জন্যে এবং নষ্ট মেয়ে নষ্ট পুরুষের জন্যে, অপরদিকে চরিত্রবান পুরুষ এর উপযোগী চরিত্রবতী স্ত্রী লোক এবং চরিত্রবতী স্ত্রী লোক চরিত্রবান পুরুষের জন্যে উপযোগী, অর্থাৎ যারা যেমন তাদের সম্পর্কও তাদের মতন মানুষের সাথেই হতে পারে।

দুই. এ পর্যায়ে এসব অপরাধজনক কাজ ও ব্যবহার থেকে বাঁচার উপায়গুলো বিবৃত হয়েছে, এখানে সে সব লোকদেরকেও সমাজচ্যুত করতে বলা হয়েছে, যারা মানুষকে অন্যায় কাজে প্ররোচিত করে বা কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বদনাম করে। তারপর ভদ্রজনদের বসতবাড়ীতে যেসব নিয়ম শৃংখলা মেনে চলা প্রয়োজন সেগুলো বলতে গিয়ে প্রথমে গৃহবাসীকে সালাম দানের অভ্যাস গড়ে তোলার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তারপর হুকুম দেয়া হয়েছে দৃষ্টিকে নিম্নগামী রাখার জন্যে এবং নিষেধ করা হয়েছে মোহাররম পুরুষদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে। এরপর বালেগ বালেগা ছেলেমেয়েদের যথাশীঘ্র পাত্রস্থ করার জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে যুবতী মেয়েদেরকে দেহপসরিনী হওয়ার কাজে এগিয়ে দেয়া থেকে। এ সবই হচ্ছে মনে মগযে ও দৈহিক দিক দিয়ে সচ্চরিত্রের অধিকারী থাকার জন্যে রক্ষাকবচ। এসব উপায় অবলম্বন করার মাধ্যমে পশু প্রবণতা থেকে রক্ষা পেতে পারে, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে আর একটি দিক পাশব প্রবৃত্তি ঘুমন্ত অবস্থায় সব সময়েই থাকে। একটু সুযোগ বা উস্কানি পেলেই সেটা জেগে উঠে। এই পশু-বৃত্তিকে দাবিয়ে রাখার জন্যে এবং সকল উস্কানির মোকাবেলা করার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল সতকর্তা অবলম্বন করার শিক্ষা আলোচ্য অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

তিন. সকল নিয়ম শৃংখলার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে, অতপর এ সবকে আল্লাহর নূরের সাথে সম্পর্কিত বলে জানানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যে ঘরে এসব নিয়ম শৃংখলা বর্তমান আছে সে ঘর আল্লাহর ঘর হিসাবেই আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে। অপরদিকে যারা কুফরী করবে, মানবে না আল্লাহর দেয়া নিয়ম শৃংখলা তাদের সৎকাজগুলো মিথ্যা মায়া-মরীচিকার মতো চাকচিক্যময় হবে, অথবা সেগুলো এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন, যেন মনে হয় অন্ধকারের স্তরগুলো একের পর আর একটি পরতে পরতে সাজানো। এরপর, দেখানো হয়েছে কিভাবে দিগন্তব্যাপী ছড়ানো রয়েছে আল্লাহর নূর। সকল সৃষ্টির মধ্যে আনুগত্য পাওয়া যায়, সব কিছুকে আল্লাহর দেয়া নিয়ম অনুযায়ী চলতে দেখা যায়, আসলে এ সব কিছুই হচ্ছে আল্লাহর নূরের বহিপ্রকাশ। সে সুদূর নীল আকাশে মৃদুমন্দ গতিতে মেঘমালার সন্তরণ, রাত্রি দিনের আনাগোনা এবং সকল জীবজন্তু পানি থেকে পয়দা হওয়ার বাস্তবতা, তারপর একই

www.pathagar.com

পানি থেকে পয়দা হওয়া সত্তেও বিভিন্নরূপ ও কর্মক্ষমতার অধিকারী হওয়া, বিভিন্ন পেশায় বিভক্ত হওয়া, বিভিন্ন শ্রেণীতে ও দলে নিয়োজিত হওয়া, যা নিয়ত প্রত্যেক দর্শক ও সকল দৃষ্টির সামনে ভাসছে– এসব কিছুও মূলত সে মহান আল্লাহরই নূরের বহিপ্রকাশ।

চার. এখানে আলোচনা হয়েছে মোনাফেকদের সম্পর্কে। রসূল (স.)-এর সাথে আদব রক্ষা করে চলাকে সবার জন্যে ওয়াজেব করে দেয়া সত্তেও মোনাফেকরা একথা মানতো না– যদিও তারা মুসলমানদের মধ্যে মিলে মিশে থাকতো ও নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতো। বাহ্যিক কাজ কর্ম ও আনুষ্ঠানিক এবাদাত (যেমন নামায রোযা ইত্যাদি) দ্বারা নিজেদেরকে মুসলমান সমাজের লোক বলে বুঝানোর চেষ্টা করতো। তাদের সামনে খাঁটি মোমেনদের আদব কায়দা ও সঠিক আনুগত্যের চিত্র তুলে তাদেরকে এসব শৃংখলা মেনে চলতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। তাদেরকে আল্লাহর এ ওয়াদাও শোনানো হচ্ছে যে, যদি খাঁটিভাবে তারা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য করে তাহলে তারা আল্লাহর খলীফা হিসাবে দুনিয়ায় বাস করবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় দুনিয়ায় বিভিন্ন ক্ষমতার আসনে তাদেরকে সমাসীন করা হবে, কাফেরদের ওপরও তাদেরকে বিজয়ী করা হবে।

এরপর আসছে পঞ্চম পর্যায়, এর মধ্যে নিজেদের বাড়ীর বাইরে, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের বাড়ীতে প্রবেশের জন্যে অনুমতি চাওয়া ও মেহমানদারী করার আদব শেখানো হয়েছে। মুসলিম জামায়াতের লোকেরা সবাই এক পরিবারের লোক এই হিসাবে তাদের বাড়ীতে প্রবেশের নিয়ম শৃংখলার তালীমও দেয়া হয়েছে।

এরপর একথার ঘোষণার সাথে সূরাটি শেষ করা হচ্ছে যে, আকাশ মন্ডলী এবং পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিকারী ও মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীন, তাঁর জ্ঞান সবাইকে ঘিরে রেখেছে। তার জানা আছে , ওদের মধ্যে কে ধ্বংস হবে আর কে নিষ্ঠার সাথে তাঁর দিকে রুজু করবে, তাদের সকল ব্যাপারের জ্ঞানই তাঁর কাছে আছে– তিনিই সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। আসুন, এবারে আমরা বিস্তারিত আলোচনার দিকে এগিয়ে যাই।

সূরা আল আহযাব

এই সূরাটা বদর যুদ্ধের পর থেকে হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত সময়কার মদীনার মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করে এবং তাদের জীবনধারার একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। এ সময়ে তারা যেসব ঘটনা-দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন এবং এই নবীন ইসলামী রাষ্ট্র যে সামাজিক আচরণবিধি গড়ে তোলে, সূরায় তার উল্লেখ রয়েছে।

অবশ্য এইসব ঘটনা ও আচরণবিধি সংক্রান্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ক্ষুদ্র কলেবরের এবং সূরার একটা সীমিত অংশ জুড়ে এর অবস্থান। এতে ঘটনাবলী ও আচরণ বিধিগুলোকে ইসলামের প্রধান মূলনীতির সাথে যুক্ত করা হয়েছে। সেই প্রধান মূলনীতি হলো, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর নির্ধারিত ভাগ্য

www.pathagar.com

অম্লান বদনে মেনে নেয়া। সূরার প্রথম চার আয়াতে এ মূলনীতি দুটো প্রতিফলিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সূরার প্রথমভাগে সামাজিক আচরণ বিধি সংক্রান্ত মন্তব্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। এ মন্তব্য রয়েছে ৬, ৭ ও ৮ নং আয়াতে। 'আহযাব' তথা খন্দক যুদ্ধের দিন যেসব মুসলমান পালিয়ে গিয়েছিলো তাদের আচরণ সংক্রান্ত মন্তব্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। এখান থেকেই সূরার নামকরণ হয়েছে 'আহযাব'। এ মন্তব্য রয়েছে ১৬ ও ১৭ নং আয়াতে। অনুরূপভাবে জাহেলী যুগের প্রচলিত রীতিপ্রথার পরিপন্থী নতুন সামাজিক আচরণবিধি সম্পর্কে এ মন্তব্যটাতেও মূলনীতিদ্বয়েরই অভিব্যক্তি ঘটেছে,

'কোনো ঈমানদার নারী ও পুরুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে ফায়সালা করার পর সেই ব্যাপারে সে নিজের খেয়াল খুশী মতো কাজ করবে।' সর্বশেষে এর প্রতিফলন ঘটেছে সূরার শেষভাগের ৭২ নং আয়াতের গুরুগম্ভীর ঘোষণায়।

মদিনার মুসলমানদের জীবনের এই অংশটার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে ইসলামী স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণগুলো এই সময়েই ফুটে উঠেছিলো। তবে সেটা একদিকে যেমন স্থীতিশীল হয়নি, তেমনি তা সর্বময় কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সফল হয়নি, যেমনটি হয়েছিলো মক্কা বিজয়ের পর।

সূরাটাতে মুসলিম সমাজের পুনর্গঠন, ইসলামী চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলোকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে স্থীতিশীল ও প্রসারিত করা এবং ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাস ও আইন কানুন যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও আচার অনুষ্ঠানের সংস্কার, সংশোধন, উচ্ছেদ সাধন ও সঠিক পরিবেশকে নতুন ইসলামী বিধিব্যবস্থার আওতাধীন করার কথাও ঘোষিত হয়েছে।

এইসব বিষয় আলোচনার প্রেক্ষাপটে আহযাব যুদ্ধও বনু কোরায়যার যুদ্ধে কাফের, মোনাফেক ও ইহুদী গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকাও আলোচিত হয়েছে। দেখানো হয়েছে, কিভাবে তারা মুসলমানদের ভেতরে থেকে ষড়যন্ত্র করে এবং তাতে মুসলমানদের কতো ক্ষতি হয়– এরপর আলোচিত হয়েছে মুসলমানদের ঈমান, চরিত্র, আদব আখলাক, পরিবার ও নারী সমাজের বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্ত।

সূরায় এইসব সামাজিক বিধিব্যবস্থা, এই দুই যুদ্ধ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনার মধ্যকার যোগসূত্র হলো কাফের মোনাফেক ও ইহুদীদের নীতির সাথে এগুলোর সংশ্লিষ্টতা এবং মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্যে কাফের, মোনাফেক ও ইহুদীদের অপচেষ্টা, চাই সে অপচেষ্টা সামরিক আক্রমণ চালানো এবং পরাজয় মেনে নেয়ার কূ-মন্ত্রণা দেয়ার মাধ্যমে হোক অথবা সামাজিক ও নৈতিক অধপতন ঘটানোর মাধ্যমে হোক। এ ছাড়া মুসলমানদের জীবনে যুদ্ধ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের যে প্রভাব পড়ে, তার কারণে কিছু কিছু সামাজিক বিধিব্যবস্থায় সংস্কার সাধন অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং সেগুলোকে যুদ্ধ ও যুদ্ধলব্ধ গনিমতের প্রভাবে মুসলিম সমাজে সৃষ্ট নতুন পরিস্থিতির আলোকে পুনর্বিন্যস্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই পটভূমিতেও সূরায় নতুন বিধিব্যবস্থার সংযোজন ঘটেছে।

www.pathagar.com

এসব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে সূরার আলোচিত বিষয়গুলোতে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য থাকলেও ঐক্য, সংহতি ও সমন্বয় বহাল রয়েছে। সূরায় বর্ণিত ঘটনাবলী ও বিধিব্যবস্থার কালগত ঐক্য এগুলোকেই সুসমন্বিত করে।

সূরাটা শুরু হয়েছে আল্লাহর প্রতি রসূল (স.)-এর ভয় সৃষ্টি, কাফের ও মোনাফেকদের অনুসরণ না করা, একমাত্র ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর পাঠানো নির্দেশাবলীর অনুসরণ করা এবং শুধু তাঁর ওপর নির্ভর করার আদেশদানের মাধ্যমে। এভাবে শুরু হওয়ার কারণে সূরায় আলোচিত সমুদয় ঘটনাবলী ও বিধিব্যবস্থার সংযোগ সেই প্রধান মূলনীতির সাথে প্রতিষ্ঠিত হলো, যার ওপর ইসলামের যাবতীয় সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং নৈতিক বিধানের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে। সেই প্রধান মূলনীতিটা হলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের আন্তরিক উপলব্ধি, তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের কাছে শর্তহীন আত্মসমর্পণ, তাঁর মনোনীত বিধানের অনুসরণ এবং তাঁর সাহায্যকে যথেষ্ট মনে করা ও নিশ্চিন্ত হওয়া। শুরুর কিছু পরই সমাজে প্রচলিত কিছু রীতি ও প্রথা সম্পর্কে সঠিক ও চূড়ান্ত ফায়সালা ঘোষিত হয়। এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম তথ্য সম্বলিত একটা বাস্তব উক্তি উচ্চারিত হয়,

'আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের জন্যে দুটো হৃদয় তৈরী করেননি।' এ দ্বারা এই মর্মে ইংগিত দেয়া হচ্ছে যে, মানুষ একই সময়ে একাধিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে, কিংবা একাধিক বিধান অনুসরণ করতে পারে না। তা করতে গেলে তাকে নির্ঘাত মোনাফেকী করতে হবে। তার যখন একটার বেশী হৃদয় নেই, তখন তাকে অবশ্যই একমাত্র মা'বুদ আল্লাহর অনুগত হতে হবে, একমাত্র বিধান ইসলামের অনুসারী হতে হবে এবং এ ছাড়া আর যতো পথ, পন্থানিয়ম, বিধি, রীতিনীতি, প্রথা ও পদ্ধতি আছে, তা যতোই প্রিয় হোক বর্জন করতে হবে।

এ কারণেই 'যেহারের' প্রথাটা বিলোপের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যেহার হলো জাহেলী যুগের একটা ন্যক্কারজনক প্রথা। স্বামী রেগে গেলে স্ত্রীকে বলতো, 'তুই আমার মায়ের মতো' যাতে সে মায়ের মতোই তার জন্যে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে সমস্ত স্ত্রীর সাথে তোমরা যেহার করো, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মা বানাননি।' অর্থাৎ এ কথাটা নিছক মুখ দিয়েই বলা হয়, আসলে এর পেছনে কোনো সত্য নেই। স্ত্রী স্ত্রীই থেকে যায়। শুধু এই কথাটার কারণেই সে মা হয়ে যায় না।১

এরপর এই বলে পালক পুত্র গ্রহণের প্রথা ও সেই প্রথা থেকে উদ্ভূত অন্যান্য সামাজিক, রীতি-নীতি উচ্ছেদ করা হয়ছে, 'তোমাদের পালক পুত্রদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পুত্র বানাননি।' সুতরাং এখন থেকে তারা আর উত্তরাধিকারী হবে না এবং এই পালকপুত্র গ্রহণের অন্যান্য ফলাফলও কার্যকর হবে না। এরপর সকল মুসলমানদের জন্যে রসূল (স.)-এর সার্বিক অভিভাবকত্ব বহাল থেকে যাবে বা বহাল

১. এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, সেটা পরবর্তীতে এই আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করবো।

www.pathagar.com

করা হবে। আর এই অভিভাকত্ব তাদের নিজেদের অভিভাবকত্বের ওপর অগ্রগণ্য হবে। রসূল (স.)-এর এই অভিভাকত্ব সর্বসাধারণ মুসলমানদের সাথে রসূলসহধর্মিনীদের আদর্শগত মাতৃত্বের সম্পর্কের মতোই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মুসলমানদের জন্যে রসূল (স.) তাদের নিজেদের চেয়ে উত্তম অভিভাবক, আর তাঁর স্ত্রীরা তাদের মাতা।' অতপর হিজরতের প্রথম দিকে আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গঠন করা হয়েছিলো সেই ভ্রাতৃত্বের ফলাফলও বাতিল করা হয়েছে এবং উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়কে স্বাভাবিক আত্মীয়তার সাথেই সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহর কেতাবে মুসলমান ও মোহাজেরদের চেয়ে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রাই পরস্পরের অভিভাকত্বের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য।' এর মধ্য দিয়েই কোরআন স্বাভাবিক আত্মীয়তার ভিত্তির ওপর মুসলমানদের সমাজব্যবস্থা পুনর্গঠিত করেছে।

ইসলামের বিধান ও আল্লাহর ফায়সালা থেকে উৎসারিত এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এই বলে মন্তব্য করা হয়েছে যে, এটাই আল্লাহর প্রাচীন কেতাবে লেখা রয়েছে এবং নবীদের কাছ থেকে বিশেষত তাঁদের মধ্য থেকে অধিকতর মর্যাদাবান নবীদের কাছ থেকে এটাই বাস্তবায়িত করার অংগীকার নেয়া হয়েছে। মূলত আইন কানুন ও মুল্যবোধের ক্ষেত্রে মন্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, এসব আইন কানুন ও মুল্যবোধকে মানুষের মনমগজে বদ্ধমূল করা।

এই হচ্ছে প্রথম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের ওপর ইসলামের শত্রুদের সর্বাত্মক ও ঐক্যবদ্ধ আক্রমণজনিত খন্দক যুদ্ধকে নস্যাত করে দিয়ে যে অনুগ্রহ করেন, তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এরপর খন্দক যুদ্ধের দুটো ঘটনা ও বনু কোরায়যার ঘটনার প্রাণবন্ত দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে এমনভাবে যে, অন্তরের সুপ্ত অনুভূতি, প্রকাশ্য তৎপরতা এবং দল ও ব্যক্তির মধ্যকার সংলাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোর দৃশ্য অংকনের সময় বিভিন্ন নির্দেশাবলীকে যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। আর বিভিন্ন ঘটনাবলীর ওপর যে মন্তব্যগুলো করা হয়েছে, সেগুলো করা হয়েছে কোরআনের স্থায়ী নিয়ম অনুসারে।

পবিত্র কোরআন চরিত্র গঠন, মূল্যবোধ ও মানদন্ড নিরুপণ এবং যে চিন্তাধারাকে সে সমাজে বিজয়ী ও আধিপত্যশীল দেখতে চায়, সেই চিন্তাধারার বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ঘটনাকে উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে, সেইসব ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে কোরআনের একটা স্বতন্ত্র পদ্ধতি রয়েছে। কোরআনের এই পদ্ধতিটা হলো, সে সংঘটিত ঘটনাটাকে হুবহু বর্ণনা করবে, সেই সাথে প্রকাশ্য ও সুপ্ত অনুভূতিও তুলে ধরবে, অতপর তার তথ্যাবলী এমনভাবে উদঘাটন করবে যে তার যাবতীয় গুপ্ত দিক প্রকাশিত হবে। তারপর মুসলমানদেরকে যা ঘটেছে সে সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্ত জানাবে। তাতে যদি কিছু ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা থেকে থাকে, তবে তার সমালোচনা করবে। আর সুষ্ঠু ও নির্ভুল কিছু থাকলে তার প্রশংসা করবে, ভুল ভ্রান্তি থাকলে তার

www.pathagar.com

সংশোধনের জন্যে এবং সুষ্ঠু ও উত্তম কিছু থাকলে তার বিকাশ বৃদ্ধির জন্যে জোর নির্দেশ দেয়া হবে। আর এই সবকিছুকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্ধারিত ভাগ্যলিপি, তাঁর ইচ্ছা, কাজ, নির্ভুল বিধান, স্বভাব প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ও শক্তিগুলোর সাথে যুক্ত ও সমন্বিত করেছেন।

এভাবে আমরা দেখতে পাই, খন্দকের যুদ্ধের বিবরণ শুরু হয়েছে, 'হে ঈমানদাররা, তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যখন তোমাদের কাছে শত্রু সেনারা এলো। আমি তখনই তাদের কাছে বাতাস ও তোমরা কখনো দেখোনি এমন বাহিনী পাঠালাম।.........' (আয়াত ৯) এর মাঝখানে রয়েছে, বলো, তোমাদের পালানোতে কোনো লাভ হবে না ....।' (আয়াত ১৬-১৭) 'তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে ....। (আয়াত ২১) এবং সবার শেষে 'সত্যনিষ্ঠদেরকে যেনো আল্লাহ তাদের সত্যনিষ্ঠার জন্যে পুরস্কার দিতে পারেন ....।' (আয়াত ২৪)

এরই পাশাপাশি যুদ্ধে যোগদান সম্পর্কে সত্যনিষ্ঠ মোমেনদের মনোভাব এবং মনোব্যাধিতে আক্রান্ত মোনাফেকদের মনোভাব এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সেই মনোভাবের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ মূল্যবোধগুলো আলাদা আলাদা হয়ে বাছাই হয়ে যায়। যেমন 'মোনাফেক ও মনোব্যাধিতে আক্রান্তরা বলে যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল আমাদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়।' ...... মোমেনরা যখন আক্রমণকারী সেনাদলগুলোকে দেখলো, তখন বললো, আমাদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাতো এটাই। এতে তাদের প্রত্যয় ও আত্মসমর্পণ কেবল বেড়েই যায়। অতপর অকাট্য ফায়সালা ও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ঘোষণা করা হয়েছে। 'আর আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে তাদের আক্রোশ সহকারেই ফেরত পাঠালেন। তারা এক বিন্দুও লাভবান হতে পারলো না। মোমেনদের যুদ্ধের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। তিনি মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী।'

এরপর রসূল (স.)-এর কতিপয় স্ত্রীর প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। বিতাড়িত ইহুদী গোষ্ঠী বনু কোরায়যার পরিত্যক্ত সম্পদ ও ইতিপূর্বেকার যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সুবাদে রসূল (স.) ও মুসলমানদেরকে আল্লাহ তায়ালা যখন বিপুল সম্পদের অধিকারী করলেন, তখন রসূল (স.)-এর এই ক'জন স্ত্রী তাঁদের খোরপোষের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেয়ার দাবী জানালেন। এই দাবীর জবাবে তাদেরকে দুনিয়ার সহায় সম্পদ, আরাম আয়েশ ও বিলাস ব্যসন অথবা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সুখ শান্তি-এই দুটোর যে কোনো একটা বেছে নেয়ার আহ্বান জানানো হলো। তাঁরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের সুখ শন্তিকেই বেছে নিলেন। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের চোখে সম্মানজনক এই স্থানকে পার্থিব সহায় সম্পদের ওপরে অগ্রাধিকার দিলেন। এরপর সকল মুসলিম নারী ও পুরুষের উত্তম প্রতিদানের আরো বর্ণনা দিয়ে তৃতীয় অধ্যায় শেষ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে রসূল (স.)-এর মুক্ত গোলাম যায়েদ বিন হারেসার সাথে রসূল (স.)-এর ফুফাতো বোন যয়নব বিনতে জাহাশের বিয়ে সম্পর্কে

www.pathagar.com

অস্পষ্ট আভাস। এ অধ্যায়ে এ বিষয়টাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, মুসলিম নারী ও পুরুষদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার ক্ষমতা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। মুসলিম নারী পুরুষদের হাতে কোনো ক্ষমতা নেই এবং কোনো অধিকার নেই। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু পরিচালনা করেন এবং মোমেন মাত্রেরই তার কাছে পূর্ণাংগভাবে আত্মসমর্পণ করা কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল যখন কোনো ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন, তখন কোনো মুসলিম নারী ও পুরুষের নিজেদের ব্যাপারে কোনো নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকে না।' .... (আয়াত ৩৬)

এরপর বিয়ে ও তালাকের ঘটনা ও পালকপুত্র গ্রহণের ফলাফল বাতিল করা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পালকপুত্র গ্রহণের ফলাফল বাতিল করার জন্যে স্বয়ং রসূল (স.) কে দিয়েই এমন একটা কাজ করানো হয়, যা সেই পরিবেশে অন্য কারো দ্বারা সম্ভব হতো না। কেননা সেকালের আরবীয় সমাজে এই প্রথার বিরোধিতা করা খুবই দুরূহ ছিলো। তাই পরীক্ষাটা এসে পড়লো রসূল (স.) -এর ওপরেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অতপর যায়েদ যখন তাকে (যয়নবকে) পরিত্যাগ করলো, তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম .....' (আয়াত ৩৭)

এ প্রসংগে রসূলের (স.)-এর সাথে সকল মুসলমানের সম্পর্কটা কী ধরনের তা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, 'মোহাম্মদ (স.) তোমাদের কারো পিতা নয়, তিনি কেবল আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী।' .... (আয়াত ৪০) সবার শেষে রসূল (স.) ও তাঁর সাথী মুসলমানদেরকে কিছু নির্দেশ দেয়ার মধ্য দিয়ে এ অধ্যায় শেষ করা হয়েছে,

'কাফের ও মোনাফেকদের অনুসরণ করো না' .... (আয়াত ৪৮)

পঞ্চম অধ্যায় শুরু হয়েছে যেসব স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয় তাদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান বর্ণনার মধ্য দিয়ে। তারপর রসূল (স.)-এর দাম্পত্য জীবনকে সুশৃংখল করা হয়েছে। মুসলিম নারীদের মধ্যে কাকে কাকে তার বিয়ে করা বৈধ এবং কাকে কাকে বিয়ে করা অবৈধ, তাও বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর রসূল (স.) ও তাঁর স্ত্রীদের বাড়ীর সাথে মুসলমানরা রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় ও ইন্তেকালের পরে কিভাবে সম্পর্ক রাখবে। পিতা, পুত্র, ভাই, ভাতিজা, দাসদের ছাড়া আর সবার সাথে পর্দা করা এবং রসূল (স.)-কে যারা নানাভাবে কষ্ট দেয় তাদের শাস্তি ও দুনিয়া আখেরাতে অভিশাপ লাভের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। এসব থেকে বুঝা যায় যে, মোনাফেকরা এ জাতীয় অনেক অপকর্মই করতো।

এ প্রসংগে উপসংহারে রসূল (স.)-এর স্ত্রীরা, কন্যা ও দাসীদেরকে সারা দেহ চাদর দিয়ে ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে তাদেরকে চেনা যাবে এবং উত্ত্যক্ত করা হবে না। উপসংহারে আরো হুমকি দেয়া হয়েছে যে, মোনাফেক ও গুজব রটনাকারীদের ওপর রসূল (স.)-কে ক্ষমতাশালী করা হবে এবং বনু কাইনুকা ও বনু নযীরের মতো তাদেরকেও মদিনা থেকে বিতাড়িত করা হবে অথবা বনু কোরায়যার

www.pathagar.com

মতো খতম করে দেয়া হবে। এসব কথা থেকে বুঝা যায় যে, এই গোষ্ঠীগুলো মদিনার মুসলমানদেরকে নানা ন্যক্কারজনক পন্থায় কষ্ট দিতো।

৬ষ্ঠ ও সর্বশেষ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, লোকেরা কেয়ামত কবে হবে-এই মর্মে প্রশ্ন করে। তার জবাবে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের ব্যাপারে সমস্ত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই রাখেন। এরপর কেয়ামতের একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখানো হয়েছে ৬৬ নং আয়াতে এবং ৬৭ ও ৬৮ নং আয়াতে তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে তাদের কঠোর প্রতিশোধ স্পৃহা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা তারাই তাদেরকে আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে বিপথগামী করেছে।

অতপর সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে এমন একটা বক্তব্য দেয়ার মাধ্যমে যা গভীর তাৎপর্যবহ।

'আমি এই আমানতকে আকাশ ও পৃথিবীর সামনে রেখেছিলোাম কিন্তু তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করলো .... ' (আয়াত ৭২-৭৩)

এ থেকে জানা যায় যে, মানবজাতির ঘাড়ে যে দায়িত্বের বোঝা চাপানো হয়েছে বিশেষত মুসলমানদের ঘাড়ে তা কতো বড়ো। মুসলিম উম্মাহ একাই এই গুরুদায়িত্ব বহন করছে। এ দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী আকীদা ও আদর্শ এবং তার ওপর টিকে থাকার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব উপলব্ধি করার দাওয়াত দিতে হবে এবং এর ওপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। নিজেদের ওপর ও সারা পৃথিবীতে এ আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হবে। এ আহ্বান সমগ্র সূরার বিষয়বস্তুর সাথে তার পটভূমির সাথে সংগতিপূর্ণ। এ বিধান সমগ্র মুসলিম জাতিকে তার মূল আদর্শের ওপর পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

সূরা মোহাম্মদ

এই সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। এ সূরার আরেক নাম সূরা 'আল কেতাল'। এই নামটিই সূরার আসল নাম। কারণ এর আলোচ্য বিষয়ই কেতাল বা যুদ্ধ। যুদ্ধই এর প্রধান উপাদান। যুদ্ধই এর বক্তব্য এবং যুদ্ধই এর মূল সুর।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় যে যুদ্ধ তা এর সূচনা থেকেই স্পষ্ট। আক্রমণাত্মক ভাষায় কাফেরদের পরিচয় দান এবং সম্মানজনক ভাষায় মোমেনদের পরিচয় দানের মাধ্যমে সূরার শুরুতেই কাফেরদেরকে আল্লাহর দুশমন ও মোমেনদেরকে আল্লাহর বন্ধু হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে। এভাবে সূরার শুরু থেকেই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর মূল্যায়নে উভয় গোষ্ঠীর এই পরিচয়ই হচ্ছে চিরন্তন ও শাশ্বত। অন্য কথায় বলা চলে যে, সূরার প্রথম শব্দ থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'যারা কুফরি করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সমস্ত সৎ কাজগুলোকে বিনষ্ট করে দিয়েছেন। আর যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে এবং বিশেষত মোহাম্মদের ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে, তার প্রতি ঈমান এনেছে– ..... আল্লাহ তায়ালা তাদের সকল পাপ মোচন করে দিয়েছেন এবং তাদের মনকে পরিশুদ্ধ করে দিয়েছেন ....।' (আয়াত ১-৩)

www.pathagar.com

কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণার পর মোমেনদের দ্ব্যর্থহীনভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে। এ আদেশ দেয়া হয়েছে অত্যন্ত দৃপ্ত অথচ সুললিত ছন্দময় কণ্ঠে। সেই সাথে রণাঙ্গনে সর্বাত্মক লড়াই ও হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর আটক যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কী করণীয়, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়েছে,

'যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তখন তাদেরকে হত্যা করবে। যখন তোমরা তাদেরকে পুরোপুরি পরাভূত করবে, তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেলবে... ।' (আয়াত ৭)

এই সাথে কাফেরদেরকে কঠোর হুমকি দেয়া হয়েছে, আর মোমেনদের জন্যে ঘোষিত হয়েছে আল্লাহর সর্বাত্মক সাহায্য ও অভিভাবকত্বের আশ্বাস। আরো ঘোষিত হয়েছে যে, কাফেরদেরকে চরম লাঞ্ছনা, ধ্বংস ও অসহায় অবস্থায় নিক্ষেপ করা হবে,

'তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে না? করলে দেখতে পেতো তাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের কী শোচনীয় পরণতি হয়েছে..... ।' (আয়াত, ১০-১১)

অনুরূপভাবে রসূল (স.)-কে যে মক্কা নগরী বহিষ্কার করেছিলো তাকেও হুমকি দেয়া হয়েছে, 'যে নগরী তোমাকে বহিষ্কার করেছিলো, তার চেয়েও শক্তিশালী অনেক নগরী ছিলো। আমি সেগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছি। সেগুলো কোনো সাহায্যকারী ছিলো না। (আয়াত ১৩)

এরপর ঈমান ও কুফরী সম্পর্কে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে কাফেরদের অবস্থা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে উল্লেখিত হুমকি উচ্চারণের পর আলোচনা সামনে এগিয়ে চলে। মোমেনের পবিত্র হালাল জীবিকা উপভোগ করা ও কাফেরের পশুর মতো মজাদার খাদ্য খাওয়ার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য, তা উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহমান। আর কাফেররা কেবল ভোগ করে এবং পশুর মতো খাওয়া দাওয়া করে। দোযখই তাদের বাসস্থান।' ... (আয়াত ১২)

তারপর মোমেনরা জান্নাতে যে সকল মজাদার খাদ্য ও পানীয় উপভোগ করবে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে খাঁটি ও নির্মল পানীয়, স্বাদ বিকৃত হয়নি এমন দুধ, মজাদার মদ এবং স্বচ্ছ ও নির্মল মধু। আর এসব তারা বহমান নদী খালের আকারে পাবে। সেই সাথে তারা উপভোগ করবে রকমারি ফলমূল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমার ন্যায় মহাদানও। এসব বলার পর জিজ্ঞেস করা হয়েছে, 'যে সব মোমেন ও সৎকর্মশীল বান্দা এসব নেয়ামত উপভোগ করবে তারা কি দোযখে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী ও দোযখের গরম পানি খেয়ে নাড়িভুড়ি ছিন্ন হয়ে যাওয়া কাফেরদের মতো?'

কাফের ও মোমেনদের সম্পর্কে এই সুস্পষ্ট বিবরণ দেয়ার পর মোনাফেকদের নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এসব মোনাফেক ও ইহুদীরা মদীনায় নবগঠিত

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজের জন্যে এমন হুমকি হয়ে বিরাজ করছিলো যে, তা একই সময়ে মক্কায় ও তার আশপাশে অবস্থানকারী মোশরেকদের হুমকির চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিলো না। সূরায় উল্লেখিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই সূরার সময়কাল ছিলো বদর যুদ্ধের পরে ও খন্দক যুদ্ধের আগে– যখন ইহুদীদের শক্তি ও প্রতাপ ক্রমে খর্ব ও মোনাফেকদের কেন্দ্র ক্রমে দুর্বল হয়ে আসছিলো। (সূরা আহযাবে আমি এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি।)

এ সূরায় মোনাফেকদের সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তাতে প্রথম থেকেই যুদ্ধ ও আক্রমণের দামামা বাজানো হয়েছে, কাফেররা কিভাবে রসূল (স.)–এর কথা শোনা এড়িয়ে চলতো, মোনাফেকরা তাঁর মজলিসে বসেও তাঁর কথা বুঝতে চেষ্টা করতো না– তা এ আলোচনায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, সবশেষে বলা হয়েছে, তাদের বিপথগামিতা ও কুফরির কারণে তাদের মনের ওপর সিল মেরে দেয়া হয়েছে, 'তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যে, তোমার কথা শোনে, কিন্তু তোমার কাছ থেকে বের হয়েই জ্ঞানীজনদেরকে জিজ্ঞেস করে, মোহাম্মদ এই মাত্র কী বললো?..........।' (আয়াত ১৬)

এরপর তাদেরকে কেয়ামতের হুশিয়ারী জানানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সেদিন তাদের সম্বিত ফিরে আসার কোনোই সম্ভাবনা থাকবে না। 'তবে কি তারা কেয়ামতের অপেক্ষায় রয়েছে যা তাদের কাছে হঠাৎ এসে পড়বে? তার আলামতগুলো তো এসেই গেছে......?'

এরপর মোনাফেক ও দুর্বল মোমেনদের সেই কাপুরুষতা ও অস্থিরতার বিবরণ দেয়া হয়েছে, যে দুর্বলতা যুদ্ধের আদেশ দেয়ার সময় কিছু কিছু দেখিয়েছিলো,

'মোমেনরা' বলে থাকে একটা সূরা নাযিল হয় না কেন? কিন্তু যখনই একটা অকাট্য সূরা নাযিল হয় এবং তাতে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়, অমনি তুমি দেখতে পাও যে, যাদের মনে ব্যাধি রয়েছে, তারা তোমার দিকে মৃত্যুভয়ে সংজ্ঞা হারানো লোকের মতো তাকায়।....'

এরপর পরবর্তী তিনটি আয়াতে তাদেরকে আল্লাহর অনুগত হওয়া, সত্যাশ্রয়ী হওয়া ও ঈমানের ওপর স্থিতিশীল হওয়ার জন্যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের হীনতা ও নীচতার নিন্দা করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ও অভিসম্পাত দেয়া হয়েছে,

'অতএব তাদের জন্যে উত্তম হলো আনুগত্য ও ভালো কথা বলা।......তাদেরকে তো আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত দিয়েছেন এবং বধির ও অন্ধ করে দিয়েছেন। (আয়াত ২১-২৩)

এরপর তাদের শয়তানের বন্ধুত্ব গ্রহণ ও ইহুদীদের সাথে দহরম মহরম পাতিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার কঠোর নিন্দা করা হয়েছে। তারা যে মুসলিম সমাজের সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে রাখে, অথচ তারা সে সমাজের সদস্য নয়। সেই সমাজের সামনে তাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে অপমানিত করে দেয়া এবং সেই

www.pathagar.com

অপমানিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করানোর হুমকিও দেয়া হয়েছে। এই সমাজে বসবাস করেও তারা সেই সমাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তেও লিপ্ত। একথাই বলা হয়েছে ২৫ থেকে ৩১ নং আয়াতে,

'নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সত্য পথ পরিষ্কার হওয়ার পরও তা থেকে পিছিয়ে যায়, শয়তান তাদের এ কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। ...'

তৃতীয় ও শেষ পর্বে কোরায়শ বংশীয় কাফের ও ইহুদীদের প্রসংগ পুনরায় আলোচিত হয়েছে এবং এই দুই গোষ্ঠীর কঠোর নিন্দা করা হয়েছে, 'সত্য পথের সন্ধান পাওয়ার পর যারা কুফরী করেছে, অন্যদেরকে সত্য দ্বীন গ্রহণে বাধা দিয়েছে ...... তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তাদের সৎকর্মগুলোকে অচিরেই বাতিল করে দেবেন।'

এ পর্বে মোমেনদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের (ভুলভ্রান্তির কারণে) তাদের ওপরও যেন তাদের শত্রুদের ওপরে আপতিত শাস্তির মতো কোনো শাস্তি নেমে না আসে। বলা হয়েছে, হে মোমেনরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের কৃত সৎকর্মগুলোকে নষ্ট করো না।' সেই সাথে অমুসলিমদের আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের মুখে নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তা বহাল রাখার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমরা ভগ্ন হৃদয় হয়ো না। গায়ে পড়ে কাফেরদের সাথে আপোষ করতে যেওনা। কেননা শেষপর্যন্ত তোমরাই বিজয়ী হবে এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথেই রয়েছেন..... ।'

এই অংশে আরো একটা বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং তা হচ্ছে, দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় খুবই তুচ্ছ এবং দুনিয়ার ওপর সব সময় আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে দুনিয়ার সকল সহায় সম্পদকে বর্জন করতে হবে সে কথা বলা হয়নি। কেননা আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং তিনি যদি তাদেরকে আল্লাহর পথে আরো বেশী সম্পদ ব্যয় করতে পীড়াপীড়ি করেন, তাহলে তারা মনে কতো সংকীর্ণতা ও কষ্ট অনুভব করবে, তা তিনি ভালো করেই জানেন। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন..... আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের (সকল) সম্পদ চেয়ে পীড়াপীড়ি করেন, তাহলে তোমরা কার্পণ্য করবে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হিংসা বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন।'

সূরার শেষ আয়াতে এই বলে মুসলমানদেরকে হুমকি দেয়া হয়েছে যে, তারা যদি আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ে কার্পণ্য করে, তিনি তাদের জায়গায় অন্য কোনো জাতির উত্থান ঘটাবেন

'তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। কিন্তু ..... তোমরা যদি ব্যয় করতে না চাও, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোনো জাতিকে নিয়ে আসবেন...... ।' (আয়াত ৩৮)

এভাবে সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক নাগাড়ে কেবল যুদ্ধের দামামা বেজে চলেছে। এর সর্বত্রই যুদ্ধের পরিবেশ, ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। এর প্রত্যেকটা

www.pathagar.com

আয়াতেই বলতে গেলে যুদ্ধের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। সূরার শুরু থেকেই প্রত্যেকটা আয়াতের শেষে এমনভাবে শব্দ চয়ন করা হয়েছে যেন প্রত্যেকটাই এক একটা ভারী ক্ষেপণাস্ত্র। যেমন- আ'মালাহুম, বা'লাহুম, আমছালাহুম, আহওয়াআহুম, আখবারাকুম। এমনকি আয়াত শেষের যে শব্দগুলো অপেক্ষাকৃত হালকা, সেগুলোও শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা তরবারীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন, আওয়ারাহা, আমছালাহা ইত্যাদি। তাছাড়া এখানে শব্দের ঝংকারে যে ধরনের কঠোরতা রয়েছে, শব্দ দ্বারা যে চিত্র অংকন করা হয়েছে, তাহলো, 'তোমরা যখন কাফেরদের মোকাবেলায় আসবে তখন তাদের গর্দান মারবে।' আর হত্যা ও গ্রেফতারীকেও ভয়াবহ করে চিত্রিত করা হয়েছে, 'যখন তোমরা ভালোমতো তাদের রক্তপাত সম্পন্ন করবে, তখন শক্ত করে তাদের বেঁধে ফেলো।' অনুরূপভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে যে বদদোয়া করা হয়েছে তাও করা হয়েছে ভয়ংকর নিষ্ঠুরতাবোধক শব্দ দিয়ে। যেমন, 'যারা কুফরী করেছে তারা নিপাত যাক এবং তাদের সৎ কাজগুলো বিনষ্ট হয়ে যাক।' অতীতের কাফেরদের ধ্বংসের বিবরণটাও দেয়া হয়েছে এমন ভাষায় যা শাব্দিক ও ভাব উভয় দিক দিয়েই ভয়াবহ। যেমন, 'আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করে দিন এবং কাফেরদের জন্যেও অনুরূপ।' আর দোযখের আযাবের ছবিটা এখানে কিভাবে তুলে ধরা হয়েছে দেখুন, 'তাদেরকে গরম পানি খাওয়ানো হবে। ফলে সে পানি তাদের নাড়িভুড়িকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে।' মোনাফেকদের ভীরুতা ও কাপুরুষতার দৃশ্যও দেখানো হয়েছে এভাবে, 'তারা তোমার দিকে তাকায় মৃত্যুর ভয়ে বেহুশ হয়ে যাওয়া ব্যক্তির মতো।' এমনকি জেহাদ থেকে পিঠটান দেয়ার বিরুদ্ধে মোমেনদেরকে প্রদত্ত হুশিয়ারীও এসেছে কঠোরতম ও চূড়ান্ত ভাষায়, 'যদি তোমরা পিঠটান দাও, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতিকে আনবেন, যারা তোমাদের মতো হবে না।' (আয়াত ৩৮)

সূরা আল ফাতাহ

এই সূরাটা মাদানী। হিজরতের ষষ্ঠ বছরে হোদায়বিয়ার সন্ধির পর এটি নাযিল হয়। এতে হোদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই সময়ে মুসলমানদের ও তাদের আশপাশের অবস্থা কেমন ছিলো, তাও এতে তুলে ধরা হয়েছে। সূরা মোহাম্মাদ কোরআনের ধারাক্রম অনুসারে এই সূরার পূর্বে থাকলেও এই দুই সূরার নাযিল হওয়ার মাঝে প্রায় তিন বছরের ব্যবধান ছিলো। এই তিন বছরে সার্বিক দিক থেকে মদীনার মুসলমানদের অবস্থায় বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিলো। এই পরিবর্তন যেমন সূচিত হয়েছিলো মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনে, তেমনি সূচিত হয়েছিলো তাদের শত্রুদের জীবনেও। অনুরূপভাবে মুসলমানদের মানসিক অবস্থা, ঈমানী দৃঢ়তা ও সুগভীর পরিপক্ক ঈমানের ওপর টিকে থাকার ক্ষেত্রেও তাদের পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছিলো।

সূরা ও তার পটভূমি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করার আগে যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে, তার বিবরণ দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

www.pathagar.com

এতে করে পুনরায় সেই পরিস্থিতি ও পরিবেশ আমাদের সামনে ভেসে উঠবে, যা কোরআন নাযিল হবার সময়ে তৎকালীন মুসলমানরা প্রত্যক্ষ করেছিলো।

একদিন রসূল (স.) স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি স্বয়ং ও তাঁর সাথে অন্যান্য মুসলমানরা কেউবা চুল কামিয়ে কেউবা চুল ছেটে পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করছেন। অথচ হিজরতের পর থেকেই মোশরেকরা তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিচ্ছিলো না। এমনকি যে নিষিদ্ধ মাসগুলোকে জাহেলী যুগের আরবরাও সম্মান করতো, যে নিষিদ্ধ মাসগুলোতে তারা অস্ত্র সংবরণ করতো এবং মাসজিদুল হারামে প্রবেশে কাউকে বাধা দেয়া ঘোরতর অন্যায় বলে মনে করতো, সেই নিষিদ্ধ মাসগুলোতেও তারা মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিত না। অথচ তারা এই মাসগুলোকে এতোই সম্মান করতো যে, নিজ বংশের কোনো নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ থেকেও তারা বিরত থাকতো। এমনকি এই মাসগুলোতে কেউ তার পিতা বা ভাইয়ের হত্যাকারীকে দেখলেও তার ওপর তরবারী তুলতোনা। অথচ মুসলমানদের ব্যাপারে তারা তাদের এই অটুট ঐতিহ্যকেও লংঘন করলো এবং হিজরতের পরবর্তী পুরো দু'টা বছর রসূল (স.) ও মুসলমানদেরকে পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করতে দিলো না। হিজরতের ৬ষ্ঠ বছরে পদার্পণ করার পর রসূল (স.) এই স্বপ্নটা দেখলেন। যখন তিনি মুসলমানদেরকে এই স্বপ্নের কথা জানালেন তখন তারা একে একটা শুভ লক্ষণ মনে করে খুশী হলো।

হোদায়বিয়ার ঘটনা সম্পর্কে ইবনে হিশামের বর্ণনা সবচেয়ে পূর্ণাংগ ও বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরে। সার্বিক বিচারে ইমাম বোখারী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম ইবনে হাযমের 'জাওয়ামিউস্ সীরাত' গ্রন্থে উদ্ধৃত বর্ণনার সাথে এ বর্ণনার হুবহু মিল রয়েছে।

ইবনে ইসহাক বলেন, 'অতপর রসূল (স.) রমযান ও শওয়াল মাস মদীনায় অবস্থান করলেন। (বনু মুসতালিকের যুদ্ধ ও তারপর হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাসংক্রান্ত ঘটনার পর) যিলকদ মাসে তিনি ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। যুদ্ধের কোনো ইচ্ছাই তাঁর ছিলো না। তিনি মদীনার আশপাশের আরব ও মরুচারী বেদুইনদেরকেও তাঁর সাথে যেতে উদ্বুদ্ধ করলেন। কারণ তিনি আশংকা করছিলেন যে, কোরায়শ তার সাথে পূর্বেকার মতোই আচরণ করবে, তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইবে অথবা তাকে কাবা শরীফে প্রবেশে বাধা দেবে। বেদুইনদের অনেকেই তাঁর সাথে যাত্রা করতে প্রস্তুত হলো না। অগত্যা রসূল (স.) তাঁর সাথী মোহাজের, আনসার ও তাঁর সাথে যোগদানকারী আরবদেরকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। সাথে কোরবানীর জন্তুও হাঁকিয়ে নিয়ে চললেন ও ওমরার এহরাম বাঁধলেন, যাতে মক্কাবাসী তাঁর যুদ্ধের ইচ্ছা নেই ভেবে আশ্বস্ত ও নিরাপদ বোধ করে এবং নিশ্চিত হয় যে, তিনি শুধু কা'বা শরীফের যেয়ারত ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই এসেছেন।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা সংখ্যায় ছিলাম চৌদ্দশো।

যুহরী বলেন, রসূল (স.) যাত্রা করে যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হলেন, তখন তার সাথে বিশর বিন সুফিয়ান আল কাবী সাক্ষাত করলো। সে বললো,

www.pathagar.com

হে রসূল! কোরায়শ আপনার যাত্রার খবর পেয়ে গেছে। খবর পেয়ে তারা সদলবলে বেরিয়েছে। এমনকি তাদের সাথে গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীনী মহিলারাও বেরিয়ে এসেছে। সবাই বাঘের চামড়া পরেছে এবং যী তুবাতে যাত্রা বিরতি করেছে। তারা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আপনাদেরকে কখনো মক্কায় ঢুকতে দেবে না। খালেদ বিন ওলীদ তাদের অধিনায়ক হয়ে আসছে। তারা কুরাউল গামীমে পৌঁছে গেছে। (উসফান থেকে আট মাইল সামনে অবস্থিত জায়গার নাম) রসূল (স.) এ কথা শুনে বললেন, ধিক কোরায়শকে! যুদ্ধ তাদেরকে গিলে খেয়ে ফেলেছে। আমাকে সমগ্র আরব জাতির সাথে একটা বুঝাপড়া করতে দিলে তাদের অসুবিধা কোথায়? আরবরা যদি আমাকে খতম করে দেয়, তাহলে তো তারা যা চায় সেটাই হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর আমাকে বিজয়ী করেন, তাহলে তারা দলে দলে ইসলামে যোগদান করবে। আর তা না হলে তারা আমার সাথে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করবে। তাহলে কোরায়শের ভাবনাটা কি? আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন তার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়েই যাবো–যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আমাকে বিজয়ী করেন অথবা আমার এই গর্দান থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর তিনি বললেন, এখানে এমন কে আছে, যে আমাদেরকে এমন পথে মক্কায় নিয়ে যেতে পারে মক্কাবাসীরা যেপথ দিয়ে আসছে তার থেকে ভিন্ন?

ইবনে ইসহাক বলেন, বনু আসলাম গোত্রের একজন বললো, হে আল্লাহর রসূল, আমি পারবো আপনাদেরকে সে রকম একটা পথ দিয়ে নিয়ে যেতে। অতপর সে মুসলমানদেরকে একটা দুর্গম প্রস্তরময় পাবর্ত্য পথ ধরে নিয়ে চললো। এ পথ ধরে চলা মুসলমানদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ছিলো। এক সময়ে তারা এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে সমভূমিতে উপনীত হলো। রসূল (স.) মুসলমানদেরকে বললেন, তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তওবা করি। তারা তৎক্ষণাত তা বললো। তখন রসূল (স.) বললেন, বনী ইসলাঈলকেও এই কথার সমার্থক 'হিততাতুন' বলতে বলা হয়েছিলো, কিন্তু তারা তা বলেনি।

ইবনে শিহাব আয যুহরী বলেন, এরপর রসূল (স.) জনগণকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা হিম্‌যের ভেতর দিয়ে মিরারের সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে মক্কার নিম্নাঞ্চলের হোদায়বিয়ার সমভূমি অভিমুখে এগিয়ে যাও। (মক্কার অদূরে একটা গ্রামের নাম হোদায়বিয়া) এরপর মুসলমানরা সেই পথ ধরে এগিয়ে চললো। কোরায়শ বাহিনী যখন মুসলমানদের পথের উড়ন্ত ধুলো দেখতে পেয়ে বুঝলো যে, তারা যে পথ দিয়ে যাচ্ছে, মুসলমানরা তা থেকে ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা ত্বরিতগতিতে কোরায়শের কাছে ফিরে গেলো। এদিকে রসূল (স.) তার দলবল নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তারা মিরারের পাহাড়ের কাছে যেতেই রসূল (স.)-এর উটনীটা শুয়ে পড়লো, তা দেখে মুসলমানদের অনেকেই বলে উঠলো, উটনীটা গোয়ার্তুমি শুরু করেছে। রসূল (স.) বললেন, গোয়ার্তুমি করছে না এবং এটা তার স্বভাবও নয়। আসলে আবরাহার হস্তি বাহিনী মক্কায় প্রবেশে যে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলো, এ

www.pathagar.com

উটনীটা সেই একই বাধার সম্মুখীন। আজ কোরায়শ আমাকে রক্তসম্পর্ক বজায় রাখার দাবী জানিয়ে যে প্রস্তাবই দেবে, আমি তা মেনে নেবো। (বোখারীর বর্ণনা অনুসারে রসূল (স.) বললেন, যে আল্লাহ তায়ালার হাতে আমার জীবন তার শপথ, আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন সাপেক্ষে কোরায়শ আমার কাছে যে দাবীই জানাবে আমি তা মেনে নেব।) তারপর রসূল (স.) মুসলমানদেরকে বললেন, তোমরা এখানে যাত্রাবিরতি করো। তাঁকে বলা হলো, হে রসূলুল্লাহ! এই প্রান্তরে পানি নেই। রসূল (স.) নিজের একটি তীর বের করে জনৈক সাহাবীকে দিলেন। সে সাহাবী তৎক্ষণাত সামান্য বৃষ্টির পানি ধারণকারী একটা নীচু জায়গায় তীরটা গেড়ে দিতেই তা পানিতে ভরে উঠলো।

এভাবে রসূল (স.) নিশ্চিন্ত হলে, তখন তার কাছে বুদাইল বিন ওয়ারকা খাযায়ীর নেতৃত্বে বনু খাযায়া গোত্রের একটা প্রতিনিধি দল এসে রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলো, তিনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? রসূল (স.) তাদেরকে জানালেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি, কেবল কা'বা শরীফ যেয়ারত করতে এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এসেছেন। তারপর তিনি বিশর বিন সুফিয়ান আল কা'বীকে যা বলেছিলেন, একইরকম কথা তাদেরকেও বললেন। তারপর এই প্রতিনিধি দল কোরায়শের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, হে কোরায়শ, তোমরা মোহাম্মদের ব্যাপারে বড় তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছ। আসলে মোহাম্মদ যুদ্ধ করতে আসেনি। সে এসেছে কা'বা যেয়ারত করতে। কিন্তু কোরায়শ তাদের কথায় কর্ণপাত করলো না। তারা বরং খাযায়ীদেরকেই পক্ষপাতিত্বের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে বললো, আল্লাহ তায়ালার কসম, যদি যুদ্ধ করার ইচ্ছা নিয়ে নাও এসে থাকে, তবুও সে আমাদের শহরে জোর করে ঢুকতে পারবে না এবং আরবরা আমাদের সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারুক তা আমরা কিছুতেই হতে দেবো না।

খাযায়া গোত্রের কাফের ও মুসলমান নির্বিশেষে সবাই রসূল (স.)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল ও শুভাকাংখী ছিলো। মক্কায় যা কিছুই ঘটতো, তা তারা রসূল (স.)-এর কাছে গোপন করতো না। খাযায়ী প্রতিনিধি দলের পর কোরায়শ বনু আমের বিন লুয়াই গোত্রের মুকারেয বিন হাফসাকে রসূল (স.)-এর কাছে পাঠালো। তাকে আসতে দেখে রসূল (স.) দূর থেকেই বললেন, এক বিশ্বাসঘাতক আসছে। তখন তিনি বুদাইল ও তার সাথীদেরকে যা বলেছিলেন তাকেও তাই বললেন। সে কোরায়শের কাছে ফিরে গিয়ে রসূল (স.) যা জানিয়েছেন তা জানালো। এরপর কোরায়শ হুলায়স বিন আলকামাকে রসূল (স.)-এর কাছে পাঠালো। সে আহাবিশ নামক মরু অঞ্চলীয় গোত্রের সরদার ছিলো.। এই গোত্রটি বনু হারেস গোত্রের একটা শাখা। তাকে আসতে দেখে রসূল (স.) বললেন, এই লোকটি একজন ধর্মানুরাগী ব্যক্তি। ওকে তোমরা আমাদের কোরবানীর জন্য নিয়ে আসা পশুগুলোকে দেখিয়ে দাও। সে যখন কোরবানীর পশুগুলোকে মাঠে চরে বেড়াতে দেখলো এবং এও দেখলো যে, দীর্ঘদিন আটক থাকার কারণে পশুগুলোর দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে পশম ঝরে গেছে, তখন সে

www.pathagar.com

রসূল (স.)–এর কাছে না এসেই কোরায়শের কাছে ফিরে গেলো। কেননা যে দৃশ্য সে দেখেছে, তাতে সে বুঝেছে যে, যথার্থই তিনি কা'বার যেয়ারত করতে এসেছেন। সে যখন কোরায়শকে এ কথা বললো, তখন কোরায়শ বললো, 'তুমি একজন বেদুঈণ। এ বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই।'

ইবনে ইসহাক বলেন, কোরায়শ নেতাদের মুখ থেকে এ কথা শুনে হুলায়স রেগে গিয়ে বললো, হে কোরায়শ জনতা, তোমাদের সাথে আমাদের যে মৈত্রী চুক্তি হয়েছিলো, তার ভেতরে এ বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত ছিলো না যে, ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ঘরের প্রতি সম্মান জানাতে আসে, তাকে কি তা থেকে প্রতিহত করা হবে? হুলায়সের জন্ম মৃত্যু যার হাতে, সেই আল্লাহ তায়ালার কসম, তোমরা যদি মোহাম্মদ যে উদ্দেশ্যে এসেছে, তা তাকে করতে না দাও, তাহলে আমি সমস্ত আহাবিশীদেরকে নিয়ে চলে যাবো। একথা শুনে কোরায়শ নেতারা বললো, 'হে হুলায়স, আমরা যা পছন্দ করি, তা করতে আমাদেরকে বাধা দিও না।'

যুহরী বলেন, এরপর কোরায়শ রসূল (স.)–এর কাছে পাঠালো বনু সাকীফ গোত্রের নেতা ওরওয়া বিন মাসউদ সাকাফীকে। সে বললো, শোনো কোরায়শ, আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা যাকেই মোহাম্মাদের কাছে পাঠাচ্ছ, সে ফিরে এলে তাকে তোমরা অনেক ভর্ৎসনা করছো ও কটু কথা বলছো। তোমরা তো জানো, আমি তোমাদের সন্তান এবং তোমরা আমার বাবা। (তার মা কোরায়শের শাখা বনু আব্দুশ শামসের মেয়ে ছিলো) তোমাদের ওপর কী বিপদ এসেছে, তা আমি শুনেছি। সে জন্যে আমার গোত্রের যারা আমার অনুগত তাদেরকে সমবেত করেছি এবং তোমাদেরকে সান্ত্বনা দিতে এসেছি।' কোরায়শ বললো, তুমি ঠিকই বলেছো, আমরা তোমার ওপর কোনো দোষারোপ করিনি। তারপর সে রসূল (স.)–এর কাছে গিয়ে তাঁর সামনেই বসলো। তারপর বললো, হে মোহাম্মাদ, তুমি তো বিরাট একদল মানুষ জমায়েত করে তোমারই গোত্রের লোকদেরকে ধ্বংস করার জন্য নিয়ে এসেছো, তাই না? তবে শুনে রাখো, কোরায়শ তোমাকে যুদ্ধে হারাতে তাদের সন্তানসম্ভবা নারী ও দুধ খাওয়ানো মায়েদেরকে পর্যন্ত সাথে নিয়ে বাঘের চামড়া পরে বেরিয়ে এসেছে। তারা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তোমাকে কোনো ক্রমেই বলপ্রয়োগে মক্কায় ঢুকতে দেবে না। আল্লাহ তায়ালার কসম, হয়তো আগামীকাল আমিও তাদের সাথে থাকবো এবং তোমার কাছে তাদের উপস্থিতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে। একথা বলার সময় হযরত আবু বকর (রা.), রসূল (স.)–এর পেছনে বসেছিলেন। তিনি তাকে ধমক দিয়ে বললেন, আমরা কি রসূল (স.)–কে পর্যুদস্থ হতে দেবো? ওরওয়া বললো, হে মোহাম্মাদ এ লোকটি কে? তিনি বললেন, এ হচ্ছে ইবনে আবি কোহাফা। সে বললো, আল্লাহ তায়ালার কসম, আমার যদি তোমার সাহায্যের প্রয়োজন না হতো, তাহলে আমি এর প্রতিশোধ নিতাম। সেই প্রয়োজনের কারণে এটা সহ্য করলাম। এরপর সে রসূল (স.)–এর দাঁড়ি বিলি দিতে দিতে তাঁর সাথে কথা বলতে লাগলো। ওদিকে হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা.)তখন লৌহ শিরস্ত্রান পরে রসূল (স.)–এর মাথার

www.pathagar.com

কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সে যখনই তাঁর দাঁড়ি বিলি দিচ্ছিলো, তখনই তিনি তার হাতে আঘাত করছিলেন আর বলছিলেন, রসূল (স.)–এর মুখ থেকে তোমার হাত সরাও। নচেত এই অস্ত্র দিয়ে ওটা সরানো হবে।' ওরওয়া বললো, ধিক তোমাকে। তুমি কতো কর্কশভাষী! রসূল (স.) মুচকি হাসলেন, তখন ওরওয়া বললো, হে মোহাম্মদ, এ ব্যক্তি কে? রসূল (স.) বললেন, এ তোমার ভাতিজা মুগীরা ইবনে শোবা। সে বললো, ওহে বিশ্বাসঘাতক! মাত্র সেদিনও তো আমি তোমার মলমূত্র পরিষ্কার করেছি।'

ইবনে হিশাম বলেন, ওরওয়া তার এই কথা দ্বারা যা বুঝাচ্ছিলো তা হলো, কোনো এক বিরোধ নিয়ে মুগীরা ইসলাম গ্রহণের আগে বনু মালেক বিন সাকীফের ১৩ জনকে হত্যা করেছিলেন। এতো বনু মালেক ও মুগীরার পক্ষ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। ওরওয়া দশটা দিয়ত (রক্তপণ) দিয়ে এই উত্তেজনা প্রশমিত করেছিলো ও বিবাদ মিটিয়ে দিয়েছিলো।

ইবনে ইসহাক আরো বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেছেন, রসূল (স.) পূর্ববর্তীদেরকে যা যা বলেছিলেন, ওরওয়াকেও অবিকল তাই বললেন। তাকে জানালেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি। এরপর সে কোরায়শের কাছে ফিরে গেলো। সে দেখে গিয়েছিলো যে রসূল (স.) ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি এবং তিনি থুথু ফেললে তাঁর থুথু নেয়ার জন্য তার শিষ্যরা কিভাবে পাল্লা দেয়। তার চুল পড়লেও তা নেয়ার জন্যে ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়। সে কোরায়শকে গিয়ে বললো, ওহে কোরায়শ! আমি এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি যার রাজ্যে পারস্য, আবিসিনিয়া ও রোমের সম্রাটের মতো দোর্দন্ড ক্ষমতাশালী ও প্রতাপশালী। আল্লাহ তায়ালার কসম, মোহাম্মাদের সাথীরা তার যেমন আনুগত্য করে, তেমন কোনো রাজাকেও তার প্রজাদের আনুগত্য পেতে দেখিনি। আমি নিশ্চত যে, মোহাম্মাদের সাথীরা কোনো অবস্থাতেই তাকে কারো হাতে সমর্পণ করবে না। এখন তোমরা ভেবে দেখো কী করবে।

ইবনে ইসহাক বলেন, রসূল (স.) তাঁর উদ্দেশ্য জানানোর জন্যে খাররাশ বিন উমাহইয়া খাযায়ীকে নিজের উটে চড়িয়ে মক্কায় কোরায়শের কাছে পাঠালেন, কিন্তু রসূলের সেই উটটাকে তারা হত্যা করলো। তারা খাররাশকেও হত্যা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আহাবিশীয়রা তা করতে দেয়নি, বরং তাকে রসূল (স.) কাছে ফিরে আসতে দিয়েছিলো।

ইবনে ইসহাক আরো বলেন, কোরায়শ চল্লিশ বা পঞ্চাশ জনের একটা দলকে রসূল (স.)–এর বাহিনীর পাশ দিয়ে চক্কর দিতে ও সাহাবীদের কোনো একজনকে ধরে নিতে পাঠিয়েছিলো। কিন্তু তারা সবাই গ্রেফতার হয়ে রসূল (স.)–এর কাছে নীত হয়। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন ও ছেড়ে দেন। অথচ তারা রসূল (স.)–এর বাহিনীকে লক্ষ করে পাথর ও তীর ছুঁড়েছিলো।

এরপর তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবকে ডাকলেন এবং তাকে মক্কায় পাঠিয়ে কোরায়শ নেতৃবৃন্দকে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য অবহিত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন।

www.pathagar.com

ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি কোরায়শদের পক্ষ থেকে আমার জীবনাশংকা বোধ করছি। আমার গোত্র বনু আদির এমন কোনো লোক মক্কায় নেই যারা আমার পক্ষ নেবে। তাছাড়া কোরায়শের বিরুদ্ধে আমি যে কট্টর শত্রুতার মনোভাব পোষণ করি, তা তারা জানে। তবে আমার চেয়েও কোরায়শদের ওপর বেশী প্রভাবশালী একজনের সন্ধান আপনাকে দিতে পারি। তিনি হচ্ছেন হযরত ওসমান ইবনে আফফান। অগত্যা রসূল (স.) হযরত ওসমানকে আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কোরায়শ নেতার কাছে এই বার্তা দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি কোনো যুদ্ধ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নয়, বরং পবিত্র কা'বার যেয়ারত ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে এসেছেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, অতপর হযরত ওসমান (রা.) মক্কা চলে গেলেন। সেখানে আব্বান বিন সাঈদ ইবনুল আস তার সাথে সাক্ষাত করলো এবং তাকে আশ্রয় দিলো। হযরত ওসমান (রা.) তার কাছে রসূল (স.)-এর বার্তা পৌঁছালেন। বার্তা পৌঁছানোর পর তারা হযরত ওসমানকে বললো, তুমি যদি কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে চাও, তাওয়াফ করো। তিনি বললেন, রসূল (স.) তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি করবো না। অতপর কোরায়শ হযরত ওসমানকে আটক করলো। ওদিকে রসূল (স.)-এর কাছে খবর পৌঁছলো যে, হযরত ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক বাইয়াতুর রেদোয়ান ও হোদায়বিয়ার সন্ধি

ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত ওসমান নিহত হয়েছেন এই মর্মে খবর পেয়ে রসূল (স.) বললেন, 'মোশরেকদের সাথে লড়াই না করে আমরা এ স্থান ত্যাগ করবো না।' অতপর রসূল (স.) সকল মুসলমানকে বাইয়াত (অংগীকার) করার আহবান জানালেন। এটাই ছিলো গাছের নীচে বসে সম্পাদিত 'বাইয়াতুর রেদওয়ান' বা 'আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইয়াত।' এ আয়াত সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের মন্তব্য ছিলো এই যে, রসূল (স.) মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার বাইয়াত করিয়েছেন। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলতেন, রসূল (স.) মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার বাইয়াত নয়, বরং আমরা যেন পালিয়ে না যাই সে জন্যে বাইয়াত করিয়েছেন। এই বাইয়াতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একমাত্র বনু সালমা গোত্রের সদস্য জাদ্দ বিন কায়েস ছাড়া আর কেউ রসূল (স.)-কে ছেড়ে পিছিয়ে যায়নি। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলতেন, আল্লাহর কসম, আমি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, জাদ্দ বিন কায়েস নিজেকে তার উটের বগলের সাথে লেপ্টে রেখে জনসাধারণের দৃষ্টির আড়াল হয়ে কোথাও চলে গেলো। তারপর রসূল (স.)-এর কাছে এসে জানালো যে, হযরত ওসমানের ব্যাপারে যা প্রচারিত হয়েছে, তা মিথ্যে।

ইবনে হিশাম বলেন, রসূল (স.) হযরত ওসমানের জন্য হাতের ওপর হাত রেখে বাইয়াত নিয়েছিলেন।

ইবনে ইসহাক যুহরীর বরাত দিয়ে বলেন, এরপর কোরায়শ বনু আমের গোত্রের সোহায়েল বিন আমরকে পাঠালো। তাকে তারা বললো, তুমি মোহাম্মাদের কাছে গিয়ে

www.pathagar.com

সন্ধি চুক্তি করো। এই সন্ধিতে একথা থাকা চাই যে, মোহাম্মদ এ বছর অবশ্যই হোদায়বিয়া থেকে মদীনায় ফিরে যাবে। কেনন্য আল্লাহ তায়ালার কসম, আমরা থাকতে মোহাম্মাদ জোরপূর্বক মক্কায় ঢুকেছে একথা আরবরা বলাবলি করবে সেটা আমরা কখনো হতে দেব না। অতপর সোহায়েল রসূল (স.)-এর কাছে এলো। রসূল (স.) তাকে দেখেই বললেন, কোরায়শ যখন এই ব্যক্তিকে পাঠিয়েছে, তখন সন্ধীর উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছে। সোহায়েল রসূল (স.)-এর কাছে এসে দীর্ঘ আলোচনা চালালো। অতপর উভয়ের মধ্যে চুক্তির সিদ্ধান্ত হলো।

যখন সন্ধির প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো এবং চুক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকলো না, তখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ভীষণ লম্ফঝম্ফ শুরু করলেন। তিনি প্রথমে হযরত আবু বকরের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন,

ওমরঃ হে আবু বকর, তিনি কি আল্লাহর রসূল নন?

আবু বকরঃ অবশ্যই।

ওমরঃ আমরা কি মুসলমান নই?

আবু বকরঃ অবশ্যই।

ওমরঃ ওরা কি মোশরেক নয়?

আব বকরঃ অবশ্যই।

ওমরঃ তাহলে কিসের জন্যে আজ আমরা দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিসর্জন দিচ্ছি?

আবু বকরঃ হে ওমর, রসূলের আদেশ মেনে চলো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর রসূল।

ওমরঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর রসূল।

তারপর তিনি রসূল (স.)-এর কাছে এসে বললেন,

ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি কি আল্লাহর রসূল নন?

রসূলুল্লাহ (স.)ঃ হাঁ।

ওমরঃ আমরা কি মুসলমান নই?

রসূলুল্লাহ (স.)ঃ হাঁ।

ওমরঃ ওরা কি মোশরেক নয়?

রসূলুল্লাহ (স.)ঃ হাঁ।

ওমরঃ তাহলে আমরা কিসের জন্যে আজ দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিসর্জন দিচ্ছি?

রসূলুল্লাহ (স.)ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও রসূল। আমি কোনোক্রমেই আল্লাহ তায়ালার আদেশ লংঘন করতে পারবো না। তিনি আমাকে কখনো ধ্বংস করবেন না।

www.pathagar.com

ইবনে ইসহাক বলেন, পরবর্তী জীবনে হযরত ওমর (রা.) বলতেন, আমি সদকা দেয়া, নামায পড়া, রোযা রাখা ও দাস মুক্ত করা অব্যাহত রেখেছি, যাতে আমার সে দিনের আচরণের পাপ মোচন হয় এবং ভালো হবে মনে করে যে কথা বলেছি তার গুনাহ যেন মাফ হয়।

এরপর রসূল (স.) হযরত আলী ইবনে তালেব (রা.)-কে বললেন, লেখো, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।' কিন্তু সোহায়েল বললো, এটা আমি মানি না। লেখো, বিসমিকা আল্লাহুম্মা। (অর্থাৎ তোমার নামে হে আল্লাহ) রসূল (স.) বললেন, ঠিক আছে, বিসমিকা আল্লাহুম্মা লেখো। হযরত আলী (রা.) তাই লিখলেন। পুনরায় তিনি বললেন, লেখো, 'এ হচ্ছে সোহায়েল ইবনে আমরের সাথে আল্লাহ তায়ালার রসূল মোহাম্মাদের সম্পাদিত চুক্তি।' সোহায়েল বললো, আমি যদি তোমাকে আল্লাহর রসূল বলে স্বীকারই করতাম, তাহলে তো তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম না। শুধু তোমার নাম ও তোমার বাবার নাম লেখো। অগত্যা রসূল (স.) হযরত আলী (রা.)-কে বললেন, লেখো, 'এ হচ্ছে সোহায়েল ইবনে আমরের সাথে মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর সম্পাদিত সন্ধি চুক্তি। তারা উভয়ে জনগণকে দশ বছরের জন্যে যুদ্ধ থেকে নিরাপত্তা দানের পক্ষে চুক্তি সম্পাদন করেছেন। এই সময়ে জনগণ নিরাপদে থাকবে। একে অপরের ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে। কোরায়শ থেকে যে কেউ মোহাম্মদের কাছে আসবে, তাকে কোরায়শের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর মোহাম্মদের কাছ থেকে যে কেউ কোরায়শের কাছে আসবে, তাকে কোরায়শ মোহাম্মদের কাছে ফেরত দেবে না। আমাদের ভেতরে একটা অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। একপক্ষ অপরপক্ষের ওপর আক্রমণও করবে না, কেউ কারো সম্পদ অপহরণও করবে না এবং কেউ কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করবেনা। যে ব্যক্তি মোহাম্মদের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে চাইবে, হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি কোরায়শের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে চাইবে, হতে পারবে। এক পর্যায়ে বনু খাযায়া গোত্রটি মোহাম্মদ (স.)-এর চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো। এবার তুমি মোহাম্মদ (স.) আমাদের কাছ থেকে ফিরে যাবে, 'মক্কায় প্রবেশ করবে না। আগামী বছর আমরা মক্কা থেকে বেরিয়ে যাবো এবং তুমি তোমার সাথীদেরকে নিয়ে প্রবেশ করবে, মক্কায় তিন দিন থাকবে, তোমাদের সাথে কোষবদ্ধ তরবারী থাকবে। তরবারী ছাড়া প্রবেশ করবে না।'

রসূল (স.) ও সোহায়েলের সামনে এই চুক্তি লেখা চলছে এমতাবস্থায় সোহায়েলের ছেলে আবু জান্দাল শেকলবদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত হলো। সে রসূল (স.)-এর কাছে পালিয়ে এসেছিলো। এ সময়ে রসূলের সাহাবীদের মানসিক অবস্থা ছিলো খুবই নাযুক। রসূলের স্বপ্নের কারণে তারা মক্কা বিজয় নিশ্চিত জেনেই মদীনা থেকে বেরিয়েছিলো। পরে যখন তারা সন্ধি হওয়া ও ওমরা না করেই ফিরে যাওয়ার বিষয়টিও বুঝতে পারলো । আরো কয়েকটা অসহনীয় ব্যাপার রসূল (স.)-কে সহ্য করতে দেখলো, তখন মুসলমানদের মন এতো খারাপ হয়ে গেলো যে, সে অবস্থাটা

www.pathagar.com

তাদের কাছে মৃত্যুতুল্য মনে হচ্ছিলো। সোহায়েল আবু জান্দালকে দেখা মাত্রই তার দিকে ছুটে গিয়ে তার কলার টেনে ধরে চপেটাঘাত করলো তারপর সে বললো, হে মোহাম্মদ, সে আসার আগেই তোমার ও আমার মাঝে বিষয়টার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। রসূল (স.) বললেন, তোমার কথা সত্য। তারপর সোহায়েল আবু জান্দালকে কলার ধরে সজোরে টেনে মক্কায় নিয়ে যেতে লাগলো। আবু জান্দাল উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'ওহে মুসলমান ভাইয়েরা আমাকে কি মোশরেকদের কাছে ফেরত পাঠানো হচ্ছে? ওরা তো আমাকে নির্যাতন করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করবে। এ অবস্থা দেখে মুসলমানদের মনের দুঃখ ও যন্ত্রণা আরো বেড়ে গেলো। রসূল (স.) বললেন, 'হে আবু জান্দাল, ধৈর্যধারণ করো ও ঈমানের দৃঢ়তা বজায় রাখো। মনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য ও তোমার দুর্বল সাথীদের জন্যে অচিরেই মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। আমরা মোশরেকদের সাথে একটা আপোস রফা করেছি এবং সে ব্যাপারে আমরা পরস্পরের সাথে আল্লাহর নামে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। আমরা তাদের সাথে ওয়াদাখেলাপী করতে পারি না।' ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এগিয়ে গিয়ে আবু জান্দালের সাথে সাথে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে ওমর নিজের তরবারীর মুঠো আবু জান্দালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'হে আবু জান্দাল, ধৈর্যধারণ করো। ওরা মোশরেক। ওদের রক্ত কুকুরের রক্তের সমান।' ওমর (রা.) বলেন, 'আমি আশা করেছিলাম যে, সে তরবারী তুলে নিয়ে তার বাবাকে আঘাত করবে।' কিন্তু লোকটা তার বাবার প্রতি দুর্বলতা দেখালো এবং চুক্তিটা কার্যকরী হয়ে গেলো।

চুক্তিটা লেখা সম্পন্ন হলে মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক ও অমুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে সাক্ষী করা হলো। এই সাক্ষীরা হলেন, আবু বকর সিদ্দীক, ওমর ইবনুল খাত্তাব, আব্দুর রহমান বিন আওফ, আব্দুল্লাহ বিন সোহায়েল বিন আমর, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, মাহমুদ বিন মাসলামা, মুকাররায বিন হাফস (তিনি তখনো মোশরেক ছিলেন) ইবনে আবি তালেব। হযরত আলী (রা.) ছিলেন চুক্তিপত্রের লেখক।

যুহরী বলেন, চুক্তিপত্র লেখা শেষ হলে রসূল (স.) তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, 'তোমরা এখন ওঠো, কোরবানী করে মাথার চুল কামাও।' যুহরী বলেন, রসূল (স.)-এর আদেশে সাড়া দিয়ে কেউ উঠল না। ফলে রসূল (স.) তাঁর আদেশ তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপরও কেউ উদ্যোগী হলো না দেখে রসূল (স.) হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর কাছে গেলেন। সাহাবীদের পক্ষ থেকে তিনি যে আচরণ প্রত্যক্ষ করেছেন তা তাকে জানালেন। উম্মে সালমা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি চান সবাই কোরবানী করুক? যদি চান- তাহলে তাদের কারো সাথে আর একটা কথাও না বলে নিজের উট কোরবানী করে ফেলুন এবং আপনার চুল কামানেওয়ালাকে ডেকে আনুন, সে আপনার চুল কামিয়ে দিক।' রসূল (স.) তৎক্ষণাত বেরিয়ে গেলেন, কাউকে কিছু না বলে কোরবানীর কাজটা নিজ হাতেই সমাধা করলেন এবং চুল কামানেওয়ালাকে ডাকলেন। সে তাঁর চুল কামিয়ে দিলো। সাহাবীরা যখন এটা

www.pathagar.com

দেখলেন, তখন তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন, কোরবানী করলেন এবং তারা একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। তাদের মানসিক অবস্থা তখনো এমন ছিলো যে, তারা মনের দুঃখে ও ক্ষোভে (একে অপরের চুল কামাতে গিয়ে) একে অপরকে হত্যা করে বসতে পারেন, এমন আশংকা দেখা দিয়েছিলো।

ইবনে ইসহাক বলেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির দিনে কিছু মুসলমান চুল কামায় এবং মুসলমান চুল ছোট করে ছাঁটেন। এরপর রসূল (স.) বললেন, 'যারা চুল কামিয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা রহমত করুন।' সাহাবীরা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (স.) যারা চুল ছেটেছে? তিনি বললেন, যারা চুল কামিয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা রহমত করুন। সাহাবীরা আবারো বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (স.), যারা চুল ছেঁটেছে? তিনি বললেন, যারা চুল কামিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর রহমত করুন। তৃতীয়বার যখন সাহাবীরা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, যারা চুল কামিয়েছে? তিনি বললেন, যারা চুল ছেঁটেছে তাদের ওপরও আল্লাহ তায়ালা রহমত করুন। তারা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (স.), আপনি যারা চুল কামিয়েছে, তাদের জন্যে যারা চুল ছেটেছে তাদের চেয়ে বেশী রহমত কামনা করলেন কেন? রসূল (স.) বললেন, তারা সন্দেহ করেনি। (অর্থাৎ হোদায়বিয়ার সন্ধির যথার্থতা সম্পর্কে তারা সন্দেহ করেনি)

সূরা ফাতাহর নাযিল শুরু

যুহরী বললেন, অতপর রসূলুল্লাহ (স.) যাত্রা শুরু করলেন। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে পৌছুলে সূরা 'আল ফাতাহ'নাযিল হলো।

ইমাম আহমদ মুজাম্মা বিন হারিসা আনসারী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (মুজাম্মা) বলেছেন, আমরা হোদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলাম। যখন সেখান থেকে যাত্রা করলাম, লোকেরা তাদের উটগুলোকে জোরে জোরে হাকাতে শুরু করলো। তা দেখে অন্যরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, ব্যাপার কি? ওরা এ রকম করছে কেন? বলা হলো, রসূল (স.)-এর কাছে ওহী এসেছে। একথা শুনে আমরা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ছুটলাম। দেখলাম, কারাউল গামীমে রসূল (স.) তাঁর বাহন জন্তুটির ওপর বসে আছেন। মুসলমানরা তার চারপাশে সমবেত হলো। তিনি তাদের সামনে পাঠ করলেন, 'ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবীনা .... ('আমি তোমাকে একটা সুস্পষ্ট বিজয়ে ভূষিত করেছি।' এ সময় জনৈক সাহাবী বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, ওটা কি বিজয়?' তিনি বললেন, 'হাঁ, আল্লাহর কসম, ওটা বিজয়।'

ইমাম আহমদ আরো বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন, আমরা একটা সফরে রসূল (স.)-এর সাথে ছিলাম। তখন তাকে একটা কথা তিনবার জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে কোনো জবাব দিলেন না। আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, ওহে খাত্তাবের ছেলে, তোর মরণ হোক, তুই রসূলুল্লাহ (স.)-কে তিনবার জিজ্ঞেস করলি তিনি একবারও জবাব দিলেন না! তারপর আমি আমার উটের পিঠে চড়ে বসলাম, উটকে তাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, আমার সম্পর্কে কোনো আয়াত নাযিল হয় কিনা। হঠাৎ দেখলাম,

www.pathagar.com

একজন আমাকে ডাকছে। আমি ভাবলাম, হয়তো আমার সম্পর্কে কিছু নাযিল হয়েছে। আমি ফিরে এলাম। তখন রসূল (স.) বললেন, গতকাল আমার ওপর এমন একটা সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার কাছে সমগ্র পৃথিবী ও তার যাবতীয় ধন সম্পদের চেয়ে প্রিয়। তা হচ্ছে সূরা আল ফাতাহ। রসূল (স.) সূরার প্রথম দু'টি আয়াত পড়লেন। (বোখারী, তিরমিযী, নাসায়ী)

এই হলো সেই পটভূমি, যার মধ্যে এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এ পটভূমিতে রসূল (স.) আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সিদ্ধান্তকে নিশ্চিন্ত মনে ও নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। ফলে তিনি শুধু এই ওহীভীত্তিক ইচ্ছা ছাড়া আর কোনো ইচ্ছায় ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হননি। অন্য সকল ইচ্ছা ও আকাংখাকে তিনি ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। পরবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপে ও প্রতিটি উদ্যোগে তিনি এই ঐশী সিদ্ধান্ত দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তা থেকে কারো প্ররোচনা তাকে ফেরাতে পারেনি, তাই সে প্ররোরচনা মোশরেকদের পক্ষ থেকে আসুক অথবা তার সেসব সাহাবীর পক্ষ থেকে আসুক, যাদের মন মোশরেকদের ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবী দাওয়া মেনে নেয়ায়, সন্তুষ্টি হতে পারেনি। পরে আল্লাহ তায়ালা তাদের মনে প্রশান্তি ও স্থিরতা এনে দিয়েছেন। আর এর ফলে তারা সন্তোষ, প্রত্যয় ও আন্তরিকতাপূর্ণ আনুগত্যের পথে ফিরে এসে তাদের সেই ভাইদের সমান্তরালে এসে দাঁড়িয়েছেন, যারা প্রথম থেকেই একনিষ্ঠ আনুগত্যের ওপর অবিচল ছিলেন। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যার আত্মা এক মুহূর্তের জন্যও রসূল (স.)-এর আত্মার সাথে প্রত্যক্ষ ও আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ও যোগাযোগ হারায়নি। এ জন্যই তাঁর মন মগয সব সময়ই স্থির ও শান্ত ছিলো এবং কখনো তা শান্তি ও স্থিরতা থেকে বঞ্চিত হয়নি।

এ কারণে সূরার শুরুতে রসূল (স.)-এর জন্যে এমন সুসংবাদ এসেছে, যা পেয়ে তার হৃদয় সুগভীর তৃপ্তি ও আনন্দে বিভোর হয়েছে, বলা হয়েছে, 'আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয়ে ভূষিত করেছি। যাতে আল্লাহ তায়ালা তোমার আগের সমস্ত গুনাহ মার্জনা করেন।' (আয়াত-১- ৩)

অনুরূপভাবে, সূরার প্রথম ভাগেই মোমেনদেরকে শান্তি ও স্থিরতা প্রদান করে অনুগ্রহপ্রাপ্ত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ঈমান আনয়নে তাদের অগ্রণী ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। তাদেরকে ক্ষমা ও সওয়াবের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহর সেনাবাহিনী দ্বারা সাহায্য করার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। (আয়াত ৪, ৫) সেই সাথে মোশরেক ও মোনাফেকদের জন্যে নির্ধারিত আযাব ও গযবের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। (আয়াত ৬)

এরপর রসূল (স.)-এর বাইয়াত গ্রহণের উল্লেখ এবং সেই বায়াতকে স্বয়ং আল্লাহর বাইয়াত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এভাবে মোমেনদের মনকে সরাসরি সেই আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ও অক্ষয়। (আয়াত ৭- ৮-৯-১০)

আবার হোদায়বিয়ায় মোমেনদের অবস্থা প্রসংগে আলোচনা সম্পূর্ণ করার আগেই বাইয়াত ও তা লংঘন প্রসংগে বেদুইনদের বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। তারা যেসব

www.pathagar.com

ওযর বাহানা করে বাড়ী থেকে বের হয়নি। সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি যে খারাপ ধারণা ছিলো, তা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। তারা রসূল (স.) ও তাঁর সাথী মোমেনদের জন্যে যে খারাপ পরিণতির প্রত্যাশা করতো, তাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং রসূল (স.)-কে তাদের ব্যাপারে ভবিষ্যতে কি ধরনের নীতি অবলম্বন করা উচিত, সে ব্যাপারেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এসব নির্দেশ এমনভাবে দেয়া হয়েছে, যা দ্বারা মোমেনদের দৃঢ়তা ও যারা অভিযানে বের হয়নি, তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এও প্রকাশ পায় যে, যারা ঈমানের দুর্বলতার কারণে পিছিয়ে থাকে ও অভিযানে রসূল (স.)-এর সাথে আসেনি, তারা গনিমত ও বিজয়ের লোভে লালায়িত। (আয়াত ১১ থেকে ১৭ পর্যন্ত এ আলোচনা বিস্তৃত)

এই প্রসংগে যারা অভিযানে বের হয়নি এবং জেহাদে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে অব্যাহতি দানের স্বপক্ষে একটিমাত্র গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসংগত ওযরের উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি হলো,

'অন্ধের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, খঞ্জের ওপর কোনো বাধ্যকতা নেই এবং রোগীর ওপরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।' (আয়াত-১৭)

এই দৃষ্টি আকর্ষণী বক্তব্যের পর পুনরায় মোমেনদের ও তাদের মানসিক দ্বিধাদ্বন্ধের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। এ আলোচনার সবটাই আল্লাহর সন্তুষ্টি, স্বচ্ছতা ও সম্মান প্রদর্শন মূলক। এতে একনিষ্ঠ ও দৃঢ় ঈমানধারী ও আত্মোৎসর্গিত মোমেনদেরকে যাবতীয় আশ্বাস বানী শোনানো হয়েছে। এ আলোচনায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই প্রিয় বান্দাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, তাদেরকে নানা রকমের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাদের ঈমানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার জন্যে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছেন। তাদেরকে জানিয়েছেন যে, তারা যখন গাছের নীচে বসে বাইয়াত গ্রহণ করছিলো। তখন তিনি তাদের কাছেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাদের মনের কথা জানেন, তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। ভবিষ্যতে তাদের জন্যে সাহায্য বিজয় ও গনিমত বরাদ্দ করেছেন এবং এর সব কিছুকেই তিনি সৃষ্টি জগতের শাশ্বত নিয়ম ও বিধির সাথে সমন্বিত করেছেন। সমগ্র সৃষ্টিজগতের অবস্থান এই বিধানেরই পক্ষে। সমগ্র সৃষ্টি এর পক্ষে সাক্ষ দিচ্ছে এবং এর পরতে পরতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে সেই বিরাট ও বিরল ঘটনা। (আয়াত ১৮ পর্যন্ত এ আলোচনা বিস্তৃতি)

সূরার শেষাংশে আল্লাহর প্রিয় সেই মহান মানবগোষ্ঠীর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, যা তাওরাত ও ইঞ্জিলেও লিপিবদ্ধ রয়েছে। তারপর সবার শেষে তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়েছে। (আয়াত ২৯ দ্রষ্টব্য)

এভাবে সূরার সমগ্র ভাষা খুবই স্পষ্ট প্রাঞ্জল ও বোধগম্য হয়ে উঠেছে। সমগ্র সূরার বিষয়বস্তু তার অবতরণের প্রেক্ষাপটেই সীমাবদ্ধ। কোরআনের সুনির্দিষ্ট শৈল্পিক ভংগীতে এই পটভূমিকে সবচেয়ে জোরদারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোরআন কোনো ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করে না। তবে

www.pathagar.com

তা থেকে যথার্থ শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ এবং একটা একক ঘটনাকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মূলনীতির আওতায় প্রয়োজনীয় অংশটুকু তুলে ধরে। বিশেষ ঘটনাকে সংযুক্ত করে সাধারণ প্রাকৃতিক বিধানের সাথে, আর এক অসাধারণ পন্থা ও পদ্ধতিতে মানুষের মনকে সম্বোধন করে।

পূর্বের সূরার সাথে এই সূরার মিল

সূরার মূল পাঠ তার প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ এবং কোরআনের সংকলনী ধারাবাহিকতায় এ সূরাটিকে পূর্বেকার সূরা মোহাম্মদের সাথে তুলনা করলে বুঝা যায়, এ দুই সূরার নাযিল হওয়ার মধ্যবর্তী তিন বছরে মুসলমানদের স্বভাব চরিত্রে, আচরণে, অবস্থানে এবং আদর্শিক ও নৈতিক মানে কতো গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তনই দুই সূরার নাযিল হওয়ার সময়ের পার্থক্য ও ব্যবধান স্পষ্ট করে তুলে ধরে। এ দু'টি সূরার তুলনা করলে এও জানা যায় যে, পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ও রসূল (স.)-এর নির্ভুল ও নিখুঁত প্রশিক্ষণ মহানবী ও কোরআনের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠো এই সৌভাগ্যশালী মানব গোষ্ঠীটির নৈতিক মানের কতো উৎকর্ষ সাধন করেছে এবং এর ফলে সুদীর্ঘ কালের মানবেতিহাসে কতো অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে।

আসলে সূরা 'আল ফাতাহ'-এর নাযিল হওয়ার পটভূমি ও শিক্ষা থেকে আমাদের চোখের সামনে এমন একটা দলের ভাবমূর্তি ভেসে ওঠে, যাদের মন মগযে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের উপলব্ধি যথাযথ পরিপক্কতা লাভ করেছে। যাদের ঈমানী মান প্রায় উঁচু পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যাদের মন ও বিবেক ইসলামের অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণে পরিপূর্ণ সন্তোষ ও ব্যকুলতা সহকারে সম্মত হয়েছে। জান ও মালের ঝুঁকি নিয়ে হলেও এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে তাদেরকে আর কোনো প্রেরণা ও উৎসাহ যোগানোর প্রয়োজন হয় না। বরঞ্চ যাদের আবেগ উদ্দীপনা ও জযবাকে নিয়ন্ত্রণ করা, তেজস্বীতা ও দুঃসাহসিকতাকে সীমার ভেতরে সামাল দিয়ে রাখা, কখনো কখনো শান্তি ও আপোসের স্বার্থে লাগাম টেনে ধরার প্রয়োজন পড়ে।

এ সূরা যখন নাযিল হয়, তখন মুসলমানরা এতোটা অনগ্রসর ছিলো না যে, তাদেরকে (সূরা মোহাম্মদের) এ কথা বলার দরকার হবে, 'তোমরা যখন শান্তির দিকে আহ্বান জানাচ্ছ, তোমরাই যখন শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাদেরই সাথে রয়েছেন, তখন দুর্বলতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করো না, আল্লাহ তায়ালা কখনো তোমাদের নেক কাজগুলোকে বাতিল করবেন না। তাদেরকে (সূরা মোহাম্মদের) এ কথাও বলার আবশ্যকতা ছিলো না যে, 'তোমরাই তো সে সব লোক, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয়, অতপর তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করে ... আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে চলে যাও, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরিবর্তে অন্য এমন এক দলকে নিয়ে আসবেন, যারা তোমাদের মতো হবে না।'

এ সময়ে মুসলমানদেরকে শহীদদের দৃষ্টান্ত ও আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে যে উচ্চ মর্যাদা বরাদ্দ করে রেখেছেন, তার উল্লেখ করে জেহাদের প্রেরণায় উজ্জীবিত

www.pathagar.com

করারও প্রয়োজন ছিলো না। প্রয়োজন ছিলো না সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করার যৌক্তিকতা ও কল্যাণকর দিকগুলো বর্ণনা করার, যেমনি সূরা মোহাম্মদে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'লড়াইয়ের এ নির্দেশ রইলো। আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তবে তোমাদের পক্ষ হতে নিজেই প্রতিশোধ নিতেন। কিন্তু তোমাদের কতককে দিয়ে কতককে পরীক্ষা করার জন্যেই এ নির্দেশ দিয়েছেন ......।'

এ সূরায় বরঞ্চ আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের মনে যে স্বস্তি ও স্থিরতা নাযিল করেছেন, তা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়। এর উদ্দেশ্য হলো, তাদের আবেগ উত্তেজনাকে প্রশমিত করা এবং তাদের মনকে আল্লাহর হুকুম মানানো, আপোস মীমাংসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর রসূলের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতাকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে প্রস্তুত করা। এর পাশাপাশি সূরার শেষভাগে গাছের নীচে বসে বাইয়াত গ্রহণকারীদের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টিরও বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সূরার শেষ ভাগে রসূল (স.) ও তার সাথীদের এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয়েছে!

অবশ্য এ সূরার একটা আয়াতে বাইয়াতের শর্তাবলী পূরণ ও তার লংঘনের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা তোমার কাছে বাইয়াত করে, তারা আল্লাহর কাছেই বায়াত করে। তাদের হাতের ওপর রয়েছে আল্লাহর হাত। আর যে ব্যক্তি তা লংঘন করে, সে নিজের ক্ষতির জন্যই লংঘন করে। ...' তবে লক্ষণীয় যে, এখানে বাইয়াত গ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও বায়াতের উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইংগিতই অপেক্ষাকৃত প্রবল। বাইয়াতের লংঘন বিষয়ক কথাবার্তা বেদুইনদের পশ্চাদপসারণের প্রসংগেই এসেছে। অনুরূপভাবে মোনাফেক নারী পুরুষদের ব্যাপারেও সংক্ষিপ্ত আভাস দেয়া হয়েছে, যা এই গোষ্ঠীর ঈমানী দুর্বলতার বিপরিতে মদীনার মুসলমানদের ঈমানী পরিপক্কতার প্রমাণ বহন করে। মোটকথা, এটা এতো সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা সূরা মোহাম্মদের মোনাফেক সংক্রান্ত আলোচনার ন্যায় গুরুত্ব লাভ করেনি। সেখানে মোনাফেকদের ও তাদের মিত্র গোষ্ঠী ইহুদীদের বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। এদিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, এটা মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ পর্যায়ে যে মানসিক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তার সাথে সামঞ্জস্যশীল একটা বহির্মুখী অগ্রগতি।

এ সূরার আয়াত ও পটভূমিতে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, এ সময়ে মুসলমানদের শক্তি ও প্রতিপত্তি মোশরেকদের সমপর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এতে ভবিষ্যতে সকল ধর্ম ও মতাদর্শের ওপর ইসলামের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে। এসব কিছু থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এ দুই সূরার নাযিল হবার মধ্যবর্তী মেয়াদে মুসলমানরা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো।

মধ্যবর্তী এই সময়টাতে মুসলমানদের মনোবলে, সামষ্টিক অবস্থায় এবং পারিপার্শিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সুস্পষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছিলো। পবিত্র কোরআনে নবীজীবনের যে ইতিবৃত্ত আলোচিত হয়েছে, তা অধ্যয়ন করলে এ অগ্রগতি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। এ অগ্রগতি অত্যন্ত মূল্যবান। এর দ্বারা মুসলিম জাতি

www.pathagar.com

কোরআনের শিক্ষা ও নবীর প্রশিক্ষণ দ্বারা কতো লাভবান হয়েছিলো এবং তা তাদের জীবনে কতোবড় বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার ও পরিবর্তন সাধন করেছিলো তা বুঝা যায়। এই অগ্রগতি থেকে বুঝা যায়, যারা মানবীয় সংগঠনে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে, তারা কিভাবে অটুট মনোবল বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সংগঠনে কিছু লোকেরা দুর্বলতা, অপরিপক্কতা, অতীতের জড়তা ও পশ্চাদপদতা, পার্থিব স্বার্থের মোহ এবং রক্ত মাংসের সৃষ্ট দুর্বলতা দেখে তারা ঘাবড়ে যায় না এবং তাদের মনোবল ভেংগে যায় না। সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে এসব উপসর্গ খুবই শক্তিশালী ও প্রবল থাকে। কিন্তু অব্যাহত চেষ্টা সাধনা, বিচক্ষণতা এবং ধৈর্যের সাথে প্রতিকার ও নিরাময়ের চেষ্টা চালালে অবশ্যই পরিস্থিতির উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। ক্রমাগত দুর্ভোগ পোহানো এই উন্নতি ও অগ্রগতিকে আরো নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করে। এতে করে প্রশিক্ষণ ও দিক নির্দেশনা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং যাবতীয় দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। মন উচ্চতর মার্গে উন্নীত হতে থাকে এবং আলোকিত পরিবেশে আল্লাহর নূরের সাক্ষাৎ পায়। কেননা আমাদের জন্যে আল্লাহর নবীর জীবনে রয়েছে সুন্দর আদর্শ এবং কোরআনের বিধানে রয়েছে নির্ভুল ও সোজা সরল পথ।

সূরা আল হুজুরাত

মাত্র আঠারোটি আয়াতে সমাপ্ত এই সূরাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও আইনগত বিধি-বিধানের বেশ কিছু প্রধান প্রধান তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে বিশ্বজগত এবং মানুষ সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে। সেই তথ্যগুলো মানুষের মনমগযে এক সুদূরপ্রসারী দিগন্ত তুলে ধরে, মানুষের হৃদয়ে গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বকে উদ্ভাসিত করে। বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার নিয়ম-বিধি, বিকাশ ও পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর আইন ও বিধানের বহু মূলনীতি এতে আলোচিত হয়েছে। এ সব মূল্যবান বিষয় আলোচনার ফলে সূরাটির আকৃতি তার আয়াত সংখ্যার তুলনায় শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূরাটি আমাদের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা গবেষণার আহবান জানায়।

সর্বপ্রথম যে বিষয়টি এই সূরা অধ্যয়নের সময় পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে তা এই যে, এটি একটি পূর্ণাংগ মহৎ, উদার, পরিচ্ছন্ন ও নির্মল সমাজের বৈশিষ্টসমূহ চিহ্নিত করে। যে স্বতন্ত্র বিধি-বিধান, নীতিমালা ও রীতিনীতির ভিত্তিতে এই সমাজটি গড়ে ওঠে, যে বিধিমালা এ সমাজের স্থিতি, প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে, সেই বিধিমালা ও নীতিমালা এই সূরায় আলোচিত হয়েছে। এ সমাজ শুধু সমাজ নয়, একটি স্বতন্ত্র জগত বা একটি স্বতন্ত্র বিশ্ব। এ বিশ্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে ও আল্লাহর উদ্যোগেই আবির্ভূত এবং আল্লাহরই অনুগত। এ জগত ও এ সমাজের অধিবাসীদের হৃদয় নির্মল, আবেগ-অনুভূতি পরিচ্ছন্ন এবং ভাষা ও ব্যক্তিগত জীবন পবিত্র ও সংযত। এ সমাজের মানুষ আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, রসূল (স.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আত্মসম্মান সম্পর্কে সচেতন, অন্যের সম্মান ও মর্যাদার রক্ষক এবং নিজের চিন্তায় ও চালচলনে

নিয়মানুবর্তী। সেই সাথে এ সমাজ স্বীয় শৃংখলা রক্ষায় ও স্বীয় অস্তিত্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত-করণে নিজস্ব আইন-কানুনের অনুসারী যা উপরোক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি থেকেই উদ্ভূত। ফলে এ সমাজের ভেতর ও বাইর পরস্পরে সুসমন্বিত, এর আইন-কানুন ও আবেগ-অনুভূতি পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এর বিধিসমূহ ভারসাম্যপূর্ণ এবং এর চেতনা-অনুভূতি ও বাস্তব পদক্ষেপ পরস্পরে একাত্ম। এরূপ পরিপূর্ণ সমন্বয় ও একাত্মতা সহকারে এ সমাজ আল্লাহর প্রতি অনুরাগী ও আল্লাহর দিকে অগ্রসরমান। এ সমাজের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ শুধুমাত্র বিবেকের স্বতস্ফূর্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা-আবেগ-অনুভূতির পরিচ্ছন্নতার ওপর নির্ভরশীল নয়। অনুরূপ তা শুধুমাত্র আইন, শাসন ও ব্যবস্থাপনার ওপরও নির্ভরশীল নয়। বরং উভয়টির সুষ্ঠু সমন্বয়ের ওপরই নির্ভরশীল। এ সমাজ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চেতনা ও সাধনা অথবা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ম-বিধি ও পদক্ষেপসমূহের ভিত্তিতে গঠিত হয় না ও টিকে থাকে না। বরং এ সমাজে রাষ্ট্রের সাহায্যে ব্যক্তি ও ব্যক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ই পূর্ণ সহযোগিতা ও সহমর্মিতার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ।

এ সমাজ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর আদব ও সম্মান রক্ষার্থে আল্লাহ তায়ালা ও আল্লাহর বাণীর বাহক রসূল (স.)-এর সামনে বান্দার তৎপরতাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তার দৃষ্টান্ত এ সূরার প্রথম আয়াতেই লক্ষণীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মোমেনরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সামনে আগ বাড়িয়ে কিছু করো না। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সাবধান হও। আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন ও জানেন।' অর্থাৎ কোনো আদেশ বা নিষেধ জারী করার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের সীমা অতিক্রম করা কোনো মোমেন বান্দার পক্ষে সংগত নয়। কোনো রায় দান বা ফয়সালা ঘোষণার বেলায়ও তাঁর সামনে অনাহূতভাবে স্ব-উদ্যোগে কোনো প্রস্তাব পেশ করা বৈধ নয়। তিনি যা আদেশ করেন বা যা থেকে বিরত থাকতে বলেন, তা লংঘন করাও বৈধ নয়। আল্লাহর মোকাবেলায় নিজের কোনো মত বা ইচ্ছা পোষণ করাও জায়েয নেই। আল্লাহর ভয়, লজ্জা ও আদব তথা সম্মানের তাগিদেই এই অগ্রণী হওয়ার মনোভাব তাকে ত্যাগ করতে হবে। শুধু এখানেই শেষ নয়, রসূল (স.)-এর সাথে কথাবার্তা বলার সময়ও বিশেষ আদব মেনে চলতে হবে। যেমন দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মোমেনরা! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর চড়িয়ে দিও না।...... পাছে তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সৎ কাজগুলো বাতিল হয়ে না যায়। .... আল্লাহ তায়ালা দয়াশীল ও ক্ষমাশীল।'

এ সমাজের আরো একটা বৈশিষ্ট এই যে, এ সমাজের কারো কথা ও কাজ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তার উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া জরুরী। আর এই নীতিও আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর রসূলের কাছ থেকে পথ-নির্দেশ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্ভূত। এ ছাড়া আল্লাহর রসূলের সামনে আগ বাড়িয়ে কোনো কাজ না করা এবং কোনো অনাহূত প্রস্তাব না দেয়ার বাধ্যবাধকতা তো রয়েছেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মোমেনরা, কোনো ফাসেক ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে, তাহলে তার তদন্ত করো ও নিশ্চিত হও...... ।'

www.pathagar.com

এই সমাজে যে সব কলহ, কোন্দল সংঘটিত হয় এবং যার মীমাংসা না করলে সমাজে বিভেদ-বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে, তার প্রতিকার ও প্রতিরোধের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কার্যকর ব্যবস্থা বিদ্যমান। যে পদক্ষেপ দ্বারা এই সব কলহ-কোন্দলের প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা হয়, তার ভিত্তি হলো মোমেনদের মধ্যকার সৌভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার ও মীমাংসার নীতি এবং আল্লাহভীতি ও আল্লাহর সন্তোষ কামনা করার নীতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, মোমেনদের দুই দল যদি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের বিবাদ মিটিয়ে দাও .... ।'

এ সমাজে পরস্পরের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যে কিছু মনস্তাত্ত্বিক রীতিনীতি রয়েছে। পরস্পরের সাথে আচরণেরও কিছু নীতিমালা রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'হে মোমেনরা! কোনো গোষ্ঠীর উচিত নয় অপর কোনো গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্রূপ করা ...... ।'

এ সমাজ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও পরিচ্ছন্ন মনোভাব পোষণকারী। এখানে প্রত্যেকের সম্মান নিরাপদ। কেউ কারো অসাক্ষাতে নিন্দা করে না, কেউ নিছক ধারণার বশে কাউকে অভিযুক্ত করে না, কারো নিরাপত্তা, সম্মান ও ব্যক্তি স্বাধীনতা একেবারেই ক্ষুণ্ন হয় না। এরশাদ হচ্ছে, 'হে মোমেনরা, তোমরা বেশী ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো .... ।'

এ সমাজে মানব জাতির ঐক্যের পূর্ণাংগ ও পরিপক্ব ধারণা বিদ্যমান এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নিখুঁত ও নির্মল মানদন্ড নির্দিষ্ট রয়েছে, যা দিয়ে সে সকল মানুষের মূল্যায়ন করে এবং বহু জাতিক মানব সমাজকে এক জাতিতে পরিণত করে। এরশাদ হয়েছে, 'হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি....... আল্লাহর চোখে তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে সৎ ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিই সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি।'

উল্লেখিত নির্মল, নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন ও মহৎ সমাজের বড় বড় বৈশিষ্টের উল্লেখ করার পর সূরাটি এবার ঈমানের আলামতসমূহ নির্দেশ করছে। আর এই ঈমানের নামেই মোমেনদেরকে উল্লিখিত সমাজ গঠনের ডাক দেয়া হয়েছে। এজন্যে কয়েকবারই 'হে মোমেনরা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সম্বোধন প্রত্যেক মোমেনের কাছে এতো প্রিয় যে, এর কারণে তার কাছে ইসলামের জন্যে যে কোনো কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা সহজ হযে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বেদুইনরা বলেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি ....আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ে জ্ঞানী।'

সবার শেষে সূরায় যে জিনিসটি তুলে ধরা হয়েছে, তা এই যে, ঈমান আল্লাহর একটা বিরাট বড় অনুগ্রহ, যারা এর যোগ্য, তিনি তাদেরকেই এই অনুগ্রহ দান করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, বলে কৃতিত্বের দাবী করে। তুমি বলে দাও, ... বরং আল্লাহ যে তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখিয়েছেন সে জন্যে তিনিই কৃতিত্বের দাবীদার ...... ।'

www.pathagar.com

সূরার দ্বিতীয় যে বৈশিষ্টটি সূরাটি অধ্যয়ন ও এর আনুষংগিক ঘটনাবলী পর্যালোচনাকালে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা এই যে, কোরআনের নির্দেশাবলীর মধ্য দিয়ে এবং রসূল (স.)-এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই মহৎ সমাজ গঠনের জন্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ও অপ্রতিহতভাবে অত্যন্ত জোরদার ও আপোসহীন চেষ্টা চালানো হয়েছে। এ সমাজ পৃথিবীতে এক সময় আবির্ভূত হয়েছিলো এবং চালু ছিলো। সুতরাং ইসলামের কাংখিত এই সমাজ ও এই বিশ্ব কোনো অবাস্তব আকাশ কুসুম কল্পনা নয়।

ইতিহাসের কোনো এক যুগে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শ সমাজটি আকস্মিকভাবে ও রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং তা পর্যায়ক্রমে স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন একটি গাছের বীজ সুনির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রম করার পর বিরাট গাছে পরিণত হয়। এ জন্যে গাছের পেছনে অনেক দীর্ঘ পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালনের প্রয়োজন হয়। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজটি প্রতিষ্ঠিত হতেও বহু দিনের ধৈর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা এই সমাজকে তার আমানত বহনের জন্যে মনোনীত করেছিলেন এবং তার মাধ্যমে পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেছিলেন। সেই যুগের সেই প্রজন্মের মধ্যে এ কাজের যোগ্যতা নিহিত ছিলো এবং সেই সময়কার পরিস্থিতি ও পরিবেশে এ কাজ সুসম্পন্ন করার ক্ষমতা তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছিলেন। এ সব উপাদানের সম্মিলন ঘটার কারণেই সেই অতুলনীয় সমাজটি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলো।

সূরা আর রাহমান

এই মক্কী সূরার একটা বিশেষ বাচনভংগি লক্ষ্য করা যায়।[১] মহাবিশ্বের মুক্ত অংগনে এটি একটি সার্বজনীন ঘোষণা এবং আল্লাহর অতুলনীয় নেয়ামতরাজির একটি পরিচিতি বিশেষ। আল্লাহর এই নেয়ামতরাজি যে জিনিসগুলোর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে, তা হচ্ছে তাঁর চমকপ্রদ ও অনিন্দ্য সুন্দর সৃষ্টি নৈপুণ্য, তাঁর নতুন নতুন ও অভিনব সৃষ্টি বৈচিত্র্য, তাঁর অব্যাহত ও অফুরন্ত অবদানসমূহ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক স্বীয় সৃষ্টিজগতকে পরিচালনা এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের তাঁর প্রতি সবিনয় আনুগত্য ও অভিনিবেশ। এই সূরায় গোটা বিশ্বজগতকে জ্বিন ও মানুষ এই দুই জাতির ওপর সাক্ষী রাখা হয়েছে, এই দুই জাতিকে সমভাবে এই সূরায় সম্বোধন করা হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বজগতের সম্মুখে প্রকাশ্যে বার বার প্রতিটি নেয়ামত বা অবদানের বিবরণ দেয়ার পর জ্বিন ও মানুষ উভয়কে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নেয়ামতগুলো অস্বীকার করার স্পর্ধা তাদের আছে কিনা। আল্লাহর এই নেয়ামতসমূহ চ্যালেঞ্জের আওতায় শুধু যে গোটা সৃষ্টিজগত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা নয়; বরং আখেরাতও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

---

১. কেউ কেউ একে মদীনায় অবতীর্ণ এবং কেউ কেউ মক্কায় অবতীর্ণ সূরা মনে করেন। আমি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার মতটিকে অগ্রগণ্য করে করি। কারণ সূরাটির বাচনভংগি ও ভাষাগত বিন্যাসে মক্কী সূরার লক্ষণ সুস্পষ্ট। সামান্য পার্থক্য বাদ দিলে এর শাব্দিক বিন্যাস সূরা আর রাদের মতো।

www.pathagar.com

সূরার গোটা কাঠামোতে, এর তাৎপর্যময় বিরতিতে এবং উচ্চতর ও সুদূরপ্রসারী ধনাত্মক বিস্তৃতিতে উক্ত ঘোষণার সুর ঝংকৃত। ঘোষণা ও পরিচিতি দানের সুর মূর্তমান হয়ে ওঠেছে সূরাটির আলোড়ন সৃষ্টিকারী সূচনাতেও। একটি মাত্র শব্দ 'আর রাহমান' দিয়ে এমন ভংগিতে সূরাটির সূচনা করা হয়েছে যে, শ্রোতা এর পরবর্তী বক্তব্য শোনার জন্যে ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করতে থাকে। 'আর রাহমান' একটি মাত্র শব্দ, যার অর্থের মধ্যে রয়েছে দয়া, কৃপা ও করুণা, আর যার ধ্বনিতে রয়েছে ঘোষণার সুর। এই সূচনার পরেই সমগ্র সূরা জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে আল্লাহর দয়া ও কৃপার বিবরণ এবং দয়াময়ের নেয়ামত ও অবদানসমূহের উপস্থাপনা।

আল্লাহর এই নেয়ামতসমূহের বিবরণ শুরু হয়েছে কোরআন শিক্ষাদানের উল্লেখের মধ্য দিয়ে। এভাবে কোরআন শিক্ষাদানকে মানব জাতির ওপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় দান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমনকি এটিকে স্বয়ং মানুষের সৃষ্টি এবং তাকে বাকশক্তি ও বিশ্লেষণ শক্তি প্রদানেরও আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআনের শিক্ষাদানজনিত অবদানের পরই উল্লেখ করা হয়েছে মানব সৃষ্টি ও মানুষকে সবচেয়ে বড় মানবীয় গুণ বাকশক্তি ও বিশ্লেষণ শক্তি প্রদানের বিষয়টি। এরপর একে একে এসেছে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, তরুলতা, সুউচ্চ আকাশ, সুপ্রতিষ্ঠিত দাঁড়িপাল্লা, পৃথিবী ও তার পৃষ্ঠে উৎপন্ন ফল, ফুল, খেজুর ও ফসলাদি, জ্বিন, মানুষ, দুই উদয়াচল, দুই অস্তাচল, দুই সমুদ্র, যার মাঝখানে অলংঘনীয় ব্যবধান রয়েছে, সমুদ্রের মধ্য থেকে নির্গত মূল্যবান রত্নরাজি এবং তার ওপর দিয়ে চলাচলকারী নৌযানসমূহের বিবরণ।

এ সব প্রধান প্রধান নিদর্শনের উল্লেখের পর উপস্থাপিত হয়েছে এই গোটা সৃষ্টির সার্বিক ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার দৃশ্য। আর গোটা সৃষ্টির ধ্বংসের পর চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী মহান স্রষ্টা আল্লাহর অম্লান অক্ষয় সত্ত্বাকে দেখানো হয়েছে। তাঁরই স্বাধীন সার্বভৌম ইচ্ছার কাছে গোটা সৃষ্টি বিনয়াবনত ও আত্মসমর্পিত।

সমগ্র সৃষ্টিজগতের চূড়ান্ত ধ্বংস ও স্রষ্টার চিরঞ্জীব চির অক্ষয় থাকার বিবরণ দেয়ার পর জ্বিন ও মানব জাতিকে লক্ষ্য করে উচ্চারিত হয়েছে ভীতিপ্রদ হুমকি ও মহাজাগতিক চ্যালেঞ্জ।

'ওহে দুই জাতি (জ্বিন ও মানব), অচিরেই আমি তোমাদের জন্যে একাগ্রচিত্ত হয়ে যাবো, ... হে জ্বিন ও মানব জাতি, তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমারেখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়ে থাকো, তবে অতিক্রম করো। বিশেষ ক্ষমতা ব্যতীত কখনো অতিক্রম করতে পারবে না।'

এরপর থেকে দেখানো হয়েছে সৃষ্টিজগতের ধ্বংস তথা কেয়ামতের দৃশ্য। একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের আকারে তা দেখানো হয়েছে। আকাশের দৃশ্যকে একটি লাল তরল পদার্থের আকারে তুলে ধরা হয়েছে। দেখানো হয়েছে অপরাধীদের আযাবের দৃশ্য এবং অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে আল্লাহভীরুদের উত্তম প্রতিদানের। অবশেষে এই বলে নেয়ামতের বিবরণের উপসংহার টানা হয়েছে, 'তোমার মহামহিম ও মহাপরাক্রমশালী প্রভুর নাম কল্যাণময় হোক।'

www.pathagar.com

গোটা সূরাই যে বিশাল সৃষ্টির উন্মুক্ত প্রান্তরে আল্লাহর নেয়ামতসমূহের বিবরণ ও ঘোষণা স্বরূপ, তা আগেই বলেছি। মহান আল্লাহর সুউচ্চ দরবার থেকেই এ ঘোষণা এসেছে। এ ঘোষণায় গোটা সৃষ্টিজগত প্রতিধ্বনিত হয় এবং সৃষ্টিজগতের সকল প্রাণী ও বস্তু তা প্রত্যক্ষ করে থাকে।

সূরা আল হাদীদ

এই সূরাটি সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতিকে আহবান জানায় যে, যে ইসলামের প্রতি সে ঈমান এনেছে, তা যেন তার নিজ জীবনে পরিপূর্ণরূপে ও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করে। মহান আল্লাহর আহবানে যে মহাসত্যের প্রতি সে একাগ্র ও একনিষ্ঠভাবে সাড়া দিয়েছে, তার পথে সে যেন আর কোনো কার্পণ্য না করে এবং কোনো বাধাবিপত্তি না মানে। জান হোক বা মাল হোক, অন্তর্দ্বন্দ্ব হোক বা মনের কোণে লুকানো কোনো চিন্তা ভাবনা হোক, কোনো কিছুই যেন তার আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে না পারে। আল্লাহর এই দ্বীন হচ্ছে সেই মহাসত্য, যা পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষকে আল্লাহর অনুগত বান্দায় পরিণত করে। আল্লাহর মানদন্ডই তার মানদন্ড হয়ে যায় এবং যে মূল্যবোধ দ্বারা সে গৌরব বোধ করে এবং যে মূল্যবোধ অর্জন করার জন্যে সে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তা হয় আল্লাহর নির্ধারিত মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধই তার দাঁড়িপাল্লায় সব সময় ভারী হয়ে থাকে। এই মহাসত্যই মানুষের মন মগযে আল্লাহর অস্তিত্ব উৎকীর্ণ করে দেয়। ফলে তার মন আল্লাহর স্মরণে বিগলিত ও প্রকম্পিত হয় এবং তা আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণের পথে সকল বাধা ডিংগাতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে।

এই মহাসত্যের ভিত্তিতেই এ সূরা মুসলিম জাতিকে আল্লাহর পথে জান ও মাল উৎসর্গ করার আহবান জানায়। যথা, 'তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন তা ব্যয় করো। .... তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।'

অনুরূপভাবে এই সত্যের আলোকেই মুসলিম জাতিকে আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হবার এবং আল্লাহ তায়ালা যে সত্য নাযিল করেছেন তার প্রতি অনুগত হবার আহবান জানায়। যাতে ঈমানের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট বিনয় ও আনুগত্য তাকে আল্লাহর পথে জান-মাল ব্যয়ে অনুপ্রাণিত করতে পারে। যেমন বলা হয়েছে, 'মোমেনদের কাছে সেই সময়টি কি আসেনি, যখন আল্লাহর স্মরণে তাদের মন বিগলিত ও বিনয়ী হবে ....?'

অনুরূপভাবে এ সূরায় সত্যের দাঁড়িপাল্লায় একদিকে দুনিয়ার মূল্যবোধ, অপরদিকে আখেরাতের মূল্যবোধকে রেখে কোন্‌টি অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য তা বেছে নেয়ার জন্যে এবং যেটি চিরস্থায়ী তা গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, 'জেনে রেখো, দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা, সাজসজ্জা, পারস্পরিক দম্ভ, ধনজনের

www.pathagar.com

আধিক্যের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয় ... আল্লাহ তায়ালা বিপুল অনুগ্রহের অধিকারী।'

সূরার বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, যদিও এতে ইসলামের চিরন্তন ও সাধারণ দাওয়াতই প্রতিফলিত হয়েছে, তথাপি এর পাশাপাশি এতে এই সূরার অবতরণকালীন সময়কার মদীনার মুসলিম সমাজের বাস্তব অবস্থা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। হিজরী ৪র্থ বছর থেকে শুরু করে মক্কা বিজয়ের পরবর্তী সময় পর্যন্তকার অবস্থা এই আলোচনার আওতাধীন।

এই সমাজে একদিকে ছিলো আনসার এবং মোহাজেরদের ন্যায় তেজোদ্দীপ্ত মুসলমানদের দল, যারা নিজেদের জীবনে ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং সকল লোভ লালসা ও বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সর্বাত্মক আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে জান ও মাল আল্লাহর পথে বিসর্জন দিয়ে মানবেতিহাসের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

অপরদিকে এই অতুলনীয় মানবগোষ্ঠীর পাশাপাশি এমন একটি গোষ্ঠীও মুসলিম সমাজে বিদ্যমান ছিলো, যাদের ঈমান অতোটা উন্নত, উৎকৃষ্ট ও একনিষ্ঠ পর্যায়ের ছিলো না। বিশেষত মক্কা বিজয়ের পর যখন ইসলামের ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে, তখন মুসলিম সমাজে এমন একটি গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিলো, যারা ঈমানের মহাসত্যকে ঠিক সেইভাবে উপলব্ধি করেনি এবং সেভাবে আপন জীবনে বাস্তবায়িত করেনি যেমন করেছিলো বিজয় পূর্বকালে ঈমান আনয়নকারী একনিষ্ঠ মুসলমানরা।

বিজয়োত্তর কালের এই মুসলমানদের পক্ষে আল্লাহর পথে জান ও মালের ত্যাগ স্বীকার করা অত্যন্ত কঠিন ছিলো এবং পার্থিব জীবনের রূপসৌন্দর্যের মোহ তাদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করতো। ফলে তারা দুনিয়ার আকর্ষণ ও প্রলোভনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারতো না।

সূরা হাদীদ এই গোষ্ঠীটিকে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত করে ঈমানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার প্রেরণা যোগায়। ঈমানের এই পর্যায়ে উন্নীত হলে দুনিয়ার মোহ কাউকে আপন বেড়াজালে আটকে রাখতে পারে না এবং কোনো বাধাই তার অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না।

এই উভয় গোষ্ঠী থেকে পৃথক আরো একটা গোষ্ঠী ছিলো মদীনায়। তারা হচ্ছে মোনাফেক গোষ্ঠী। এরা চিহ্নিত ছিলো না। মুসলমানদের সাথে মিলে-মিশে থাকতো। বিশেষত ইসলামের বিজয় লাভের পর তারা গা ঢাকা দিতে বাধ্য হলো। অথচ তাদের মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। যথারীতি তাদের মন ছিলো দোমুখো। তারা ছিলো সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাবাদী আর মুসলমানদের দুর্যোগ দুর্বিপাক প্রত্যাশী। কেয়ামতের দিন যখন এরা চিহ্নিত ও পৃথক হতে বাধ্য হবে এবং গা ঢাকা দেয়ার আর কোনো সুযোগ পাবে না, তখন তাদের কী পরিণতি হবে, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে পর পর তিনটি আয়াতে, 'যেদিন তুমি মোমেন পুরুষ ও নারীদের দেখবে তাদের জ্যোতি তাদের সামনে দিয়ে ও ডান দিক দিয়ে ছুটতে থাকবে ....।'

www.pathagar.com

এ ছাড়া যে ইহুদী ও খৃষ্টান জনগোষ্ঠী তখনো আরব উপদ্বীপে অবশিষ্ট ছিলো, তাদের প্রতিও এই সূরায় ইংগিত করা হয়েছে। তাদের তৎকালীন ভূমিকা, আচরণ ও হালচালের কথা এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। আর এ আয়াতে মোমেনদের তাদের মতো না হওয়ার জন্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে তাদের নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ ইংগিত খুব সম্ভবত ইহুদীদের প্রতি। সূরার শেষের দিকে একটি আয়াতে খৃষ্টানদের কথাও আলোচিত হয়েছে এবং বৈরাগ্যবাদসহ তাদের বিভিন্ন ভ্রান্ত নীতির সমালোচনা করা হয়েছে।

যেহেতু সূরার সর্বপ্রধান কেন্দ্রীয় বক্তব্য হৃদয়ে ঈমান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঈমান থেকে উদ্ভূত বিনয়, আল্লাহভীতি, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ত্যাগ তিতিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ সংক্রান্ত, তাই সে সময়ে মুসলিম সমাজে বিরাজমান অপেক্ষাকৃত কম পরিপক্ক মোমেনদের মনে ঈমান মযবুত করার লক্ষ্যে সূরায় ক্রমাগত আলোচনা চালানো হয়েছে। বস্তুত এ ধরনের লোকেরা শুধু যে মদীনার মুসলমানদের মধ্যেই ছিলো তা নয়; বরং সকল যুগের মুসলিম সমাজেই থাকে। এ আলোচনা এমন ও কার্যকর বাচনভংগিতে করা হয়েছে, যা মক্কী সূরার বাচনভংগির সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যা মন মগযকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

বিশেষভাবে সূরার সূচনাই করা হয়েছে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভংগিতে। এতে আল্লাহর কতিপয় গুণ মানব হৃদয়ের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এ সব গুণ বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহর একক অস্তিত্ব ও সমগ্র বিশ্বচরাচরে তাঁর নিরংকুশ সার্বভৌম এবং কর্তৃত্বের পরিচয় দিয়ে মানুষকে তার প্রতি একাগ্র ও একনিষ্ঠ বানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর মানুষের মনের অভ্যন্তরে লুকানো গুপ্তভেদও যে আল্লাহ তায়ালা জানেন, সে কথা ব্যক্ত করে তার প্রতি সকল প্রাণী ও জড় বস্তুর আনুগত্য এবং তার এবাদাত উপাসনা করার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। সূরার শুরু থেকে একাদিক্রমে ছয়টি আয়াত জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে আল্লাহর এই পরিচিতি ও গুণাবলীর বর্ণনা। যথা, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই গুণগান করে চলেছে আল্লাহর এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত মহা কুশলী। .... এবং তিনি মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকানো বিষয়ও অবগত।'

সূরার সূচনাতেই এরূপ বক্তব্য থাকা হৃদয়কে ভীত সন্ত্রস্ত ও প্রকম্পিত করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। অনুরূপভাবে, এটা মানুষের মনে আল্লাহর প্রতি একাগ্রচিত্ত হওয়া এবং তার জন্যে জান মালের ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধা সংকোচ ও কার্পণ্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট, কিন্তু সূরার পরবর্তী আয়াতসমূহে প্রচুর আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য রয়েছে। এ সব উদ্দীপনা ও প্রেরণা সঞ্চারকারী বক্তব্য উপরোক্ত উদাত্ত আহবানের মাঝে মাঝে এসেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তা উক্ত আহবানকে জোরদার করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোমেনদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরে এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডানে দৌড়াতে থাকবে।' অনুরূপভাবে আরেকটি আয়াতে দুনিয়ার জীবন ও তার সহায় সম্পদকে আখেরাত ও তার বড় বড় ঘটনাবলীর সামনে নিতান্ত তুচ্ছ নগণ্য করে তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে আরেক জায়গায় অদৃষ্ট সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে। এ বক্তব্য রেখে মানুষের মনকে সেই অদৃষ্টের দিকে আবর্তিত করা হয়েছে, যা সৃষ্টি জগতের সব কিছুর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'পৃথিবীতে এবং তোমাদের ওপর যে বিপদ আপদই আসুক, তা পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। .... আল্লাহ তায়ালা অভাবশূন্য স্বতপ্রশংসিত।' এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর পথে থাকা ও চলা অবস্থায় মানুষের ওপর ভালো বা মন্দ যাই আসুক, তার মন যেন স্থির অবিচল থাকে। খারাপ অবস্থায় বিমর্ষ এবং ভালো অবস্থায় যেন দাম্ভিক না হয়। মানুষের জীবনে সুখ দুঃখ যাই আসুক, সে যেন কোনো কারণ, পরিস্থিতি বা দুর্ঘটনাকে আল্লাহর সাথে অংশীদার না বানিয়ে বসে। কেননা, সব কিছুর ওপর আল্লাহর হাত রয়েছে, সে কথা বিশ্বাস করতে হবে।

সূরাটি স্বীয় আলোচ্য বিষয় নিয়ে দুই পর্যায়ে আলোচনা করেছে। প্রথমটি আমরা এ ভূমিকার শুরুতে উল্লেখ করেছি। আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে সূরার মাঝে বক্তব্য এসেছে, কিন্তু এই দুটো বিষয়ই পরস্পরে সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যশীল।

সূরা আল মোজাদালাহ

আমরা এই গোটা সূরাসহ বলতে গেলে প্রায় এই সমগ্র পারাটার মাঝেই মাদানী সমাজে রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত ঘটনাবলীর সাক্ষাৎ পাই। দেখতে পাই সদ্যোজাত মুসলিম দলটিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, শুধু এই ছোট পৃথিবীতেই নয়; বরং সমগ্র বিশ্বনিখিলে তার সেই ভূমিকা পালনের জন্যে কিভাবে তাকে গড়ে তোলা হচ্ছে, যে ভূমিকা আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন। এটা আসলেই এক বিরাট ভূমিকা। এই দলটির হৃদয়ে মানবজীবন সম্পর্কে যে পূর্ণাংগ ও সর্বব্যাপী ধারণা জন্মে তা থেকেই এই ভূমিকা পালন করা শুরু হয়। জীবন সম্পর্কে এই পূর্ণাংগ ও সর্বব্যাপী ধারণা এই দলটি অতপর সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়, যাতে করে সমগ্র মানব জাতির জন্যে এ ধারণার ভিত্তিতে একটা পূর্ণাংগ জীবন ও চরিত্র গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়। সুতরাং এই ভূমিকাটা এতো বড় যে, তার জন্যে একটা পূর্ণাংগ প্রস্তুতির প্রয়োজন।

যে মুসলিম দলটিকে মহান আল্লাহ এই বিরাট ভূমিকা পালনের জন্যে তৈরী করছিলেন, সে দলটির লোকগুলো অন্যান্য মানুষের মতো মানুষই ছিলো। তাদের মধ্যে একদল ছিলো সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী মোহাজের ও আনসার, যাদের ঈমান পরিপক্বতা অর্জন করেছিলো, নতুন আকীদা ও আদর্শের ব্যাপারে তাদের ধারণা পূর্ণতা লাভ করেছিলো, এর জন্যে তাদের অন্তরও একনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলো। তাদের নিজেদের সত্ত্বা ও মহাবিশ্বের বিশাল সত্ত্বার সাথে প্রকৃত পরিচয় তারা জানতে পেরেছিলো। এভাবে তারা সৃষ্টিজগতে আল্লাহর পরিকল্পনার একটি অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। তাদের মন মগযে এ ব্যাপারে কোনো বক্রতা ছিলো না, তাদের গৃহীত কোনো পদক্ষেপই মহান আল্লাহর পরিকল্পনার বাইরে গৃহীত হতো না এবং তাদের

www.pathagar.com

অন্তরে এমন কোনো চিন্তা বা ইচ্ছাও জন্ম নিতো না, যা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়। এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াতে তাদের সম্পর্কে যে ধরনের বিবরণ দেয়া হয়েছে তারা আসলে সে রকমই ছিলো,

'তুমি আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাসী কোনো গোষ্ঠীকে আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলের বিরোধী কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসে এমন দেখতে পাবে না, এমনকি সে যদি তাদের মা বাবা, ছেলে মেয়ে, ভাই বোন অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন হয় তবুও নয়। তারা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ঈমান অংকন করে দিয়েছেন ....।' (শেষ আয়াত)

কিন্তু ঈমান আনয়নে অগ্রণী এসব লোক পরবর্তীকালের ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনগোষ্ঠীর তুলনায় ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়, বিশেষত ইসলাম একটা শক্তিতে পরিণত হবার পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সময়ে এটা বেশী লক্ষ্য করা গেছে। এ সময়ে এমন লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে, যারা ইসলামী শিক্ষাও যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করেনি এবং ইসলামী পরিবেশে দীর্ঘকাল জীবন যাপনও করেনি। কিছু কিছু মোনাফেক শ্রেণীর লোকও এই সময়ে ইসলামে প্রবেশ করে, যাদের অন্তরে ইসলাম অতোটা শেকড় গাড়েনি, যতোটা শেকড় গেড়েছিলো স্বার্থপ্রীতি, নিরাপত্তাপ্রীতি, সুযোগসন্ধানী মানসিকতা। মুসলিম শিবির ও তৎকালীন শক্তিশালী মোশরেক ও ইহুদী গোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্কে দোদুল্যমানতা, স্থীতিহীনতা ও নমনীয়তা সৃষ্টির কুমতলব যতোটা মযবুত ছিলো তাদের ঈমান ততোটা মযবুত ছিলো না।

সমগ্র সৃষ্টিজগতে এই মুসলিম জাতির জন্যে যে ভূমিকা নির্ধারিত হয়েছিলো, সে ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রস্তুত করা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে প্রয়োজন ছিলো বহুমুখী চেষ্টা সাধনার, সুদীর্ঘ ধৈর্যের এবং ছোট বড়ো প্রত্যেক সমস্যার সঠিক সমাধানের। এ উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিলো মানুষ গড়া ও চরিত্র গড়ার সেই বিরাট আন্দোলন, যা ইসলাম ও রসূল (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এ আন্দোলন সেসব চরিত্রবান মানুষ গড়ে তুলেছিলো, যারা ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, যারা আল্লাহর বিধান বুঝবে ও বাস্তবায়িত করতে পারবে। যারা তাকে পৃথিবীর সর্বত্র বাস্তবায়িত করবে, একে শুধু বই পুস্তকের পাতায় সীমাবদ্ধ রাখবে না, কিংবা তা নিয়ে শুধু গলাবাজি করেই ক্ষান্ত হবে না।

এই সূরাসহ সমগ্র পারা জুড়ে আমরা সেই বহুমুখী চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রামের কিছু নমুনা দেখতে পাই। দেখতে পাই সেই মহান মানুষগুলোকে তৈরী করা ও বিভিন্ন রকমের ঘটনা, আদত অভ্যাস, রীতি নীতি, আবেগ উচ্ছ্বাস ও ঝোঁকপ্রবণতা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোরআনের পদ্ধতি। আর ইসলামের নানান রকমের শত্রু মোশরেক, ইহুদী ও মোনাফেকদের সাথে ইসলামের যে দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব সংঘাত চলে আসছে, তারও কিছু অংশ আমরা এখানে দেখতে পাই।

বিশেষত এই সূরায় আমরা সদ্য আবির্ভূত মুসলমান দলটির প্রতি মহান আল্লাহর অসাধারণ কৃপা ও যত্নের একটা প্রতিফলন দেখতে পাই। মনে হয়, আল্লাহ তায়ালা

www.pathagar.com

স্বয়ং তাকে চোখে চোখে রেখে গড়ে তুলেছেন, নিজের বিধানের আলোকে তাকে প্রতিপালন করেছেন, তার মনমগযে এরূপ চেতনা ও অনুভূতির সৃষ্টি করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তার ছোটো বড়ো গোপন প্রকাশ্য সকল ব্যাপারে সর্বদা তার সাথে সাথে রয়েছেন, তাকে তার শত্রুদের গোপন ও প্রকাশ্য সকল চক্রান্ত থেকে রক্ষা করে চলেছেন, তার স্বভাব চরিত্র, আদত অভ্যাস ও ঐতিহ্যকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যাতে তারা গোটা পৃথিবীতে আল্লাহর পতাকা উত্তোলনের যোগ্য হয়।

এ কারণেই অত্যন্ত চমকপ্রদ ভংগিতে সূরাটার সূচনা হয়েছে। মূলত এ সময়টা ছিলো মানবেতিহাসের একটা বিরল যুগ। এ যুগে মহান আল্লাহ কর্তৃক পৃথিবীর অধিবাসীদের সাথে প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতভাবে সংযোগ রক্ষা করা এবং একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীর দৈনন্দিন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের একটা উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা শুনেছেন সেই মহিলার কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো ও আল্লাহর কাছে অভিযোগ পেশ করেছিলো...... নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।' (আয়াত-১)

এখানে আমরা দেখতে পাই, মহান আল্লাহ তায়ালা একটা নগণ্য দরিদ্র ও সাধারণ ক্ষুদ্র পরিবারের একটি সমস্যা আল্লাহর সরাসরি সমাধান করছেন। মহিলাটি রসূল (স.)-এর সাথে কথা বলার সময় আল্লাহ তায়ালা তা শুনেছেন। অথচ তার কাছে থেকেও হযরত আয়শা (রা.) তা শুনতে পাচ্ছিলেন না! এটা আসলে এমন এক দৃশ্য, যা আল্লাহর উপস্থিতি, নৈকট্য, স্নেহ ও অভিভাবকত্বের অনুভূতি দিয়ে হৃদয়কে পরিপ্লুত করে দেয়।

এর পরেই খুব জোরের সাথে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর আশ্রয় লাভকারী মুসলমানদের চরম শত্রু। তাদের ওপর ইহকালেও থাকবে আল্লাহর আক্রোশ ও অভিশাপ, আর পরকালেও তারা অপমানজনক শাস্তি পাবে। তারা নিজেরা তাদের অপকর্ম ও পপাচার ভুলে গিয়েছিলো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা গুনে গুনে লিখে রেখেছেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তো সব কিছুই দেখেন।

তারপর প্রত্যেক গোপন পরামর্শের সময়েও যে আল্লাহ তায়ালা সেখানে উপস্থিত থাকেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা মনে করে যে, সেখানে তারা ছাড়া কেউ নেই। অথচ তারা যেখানেই থাকে, আল্লাহ তায়ালা সেখানেই তাদের সাথে থাকেন। 'অতপর তিনি কেয়ামতের দিন তাদের জানিয়ে দেবেন তারা কী করেছে। আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই জানেন।' বস্তুত এ আয়াতেও এমন দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যা আল্লাহর অস্তিত্ব, সার্বক্ষণিক উপস্থিতি, তদারকী ও খবরদারী সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলে।

এই হুশিয়ারী আসলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্তদের বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ। এ দ্বারা তাদের মনে উদ্বেগ ও ভীতির সঞ্চার করা হয়েছে। তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের গোপন দুরভিসন্ধি ফাঁস হয়ে গেছে। আল্লাহর

www.pathagar.com

চোখকে তারা ফাঁকি দিতে পারেনি। পাপকার্য, যুলুম অত্যাচার, রসূল (স.)-এর অবাধ্যতার লক্ষ্যে তাদের সমস্ত গোপন তৎপরতা ও পরিকল্পনা আল্লাহ লিখে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা এসবের জন্যে তাদের পাকড়াও করবেন ও শাস্তি দেবেন। তিনি মুসলমানদের নিষেধ করেছেন, তারা যেন ভালো কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে গোপন সলাপরামর্শ না করে।

এরপর এই মোমেনদের প্রশিক্ষণ দেয়া অব্যাহত রাখা হয়েছে, রসূল (স.)-এর বৈঠকে, অন্যান্য এলেম ও যেকেরের বৈঠকে তাদের ভদ্রতা, সুশীলতা ও আনুগত্যের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে রসূল (স.)-এর সাথে কথা বলা ও প্রশ্ন করার আদবও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গাম্ভীর্য ও সম্মান বজায় রাখার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

এরপরও সূরার অবশিষ্টাংশ হচ্ছে ইহুদীদের সাথে দহরম-মহরম পাতানো ও তাদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র পাকানো মোনাফেকদের সাথে সংশ্লিষ্ট। বলা হয়েছে যে, তারা তাদের মোনাফেকী ও অপতপরতাকে মিথ্যাচার ও মিথ্যা শপথের মাধ্যমে রসূল (স.) ও মুসলমানদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। আখেরাতেও তারা মিথ্যা কথা ও মিথ্যা শপথের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে কিন্তু তা উভয়ক্ষেত্রেই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং হবে। সেই সাথে এ কথাও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সর্বাপেক্ষা অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে লিখে দেবেন। তিনি এও লিখে রাখবেন যে, তিনি ও তাঁর রসূলরাই বিজয়ী হবেন। এ কথা দ্বারা মূলত মোনাফেকদের অপমানিত করা হয়েছে। কেননা কোনো কোনো মুসলমান তাদের মর্যাদাশালী মনে করতো। তাই তারা তাদের সাথে কিছুটা সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করতো। অথচ মুসলমানদের একমাত্র আল্লাহর অভিভাবকত্ব দ্বারা সম্মানিত ও শক্তিমান বোধ করা উচিত। আল্লাহর প্রিয় বান্দা এই মুসলমানদের আল্লাহর প্রহরাধীন থাকতে পেরে নিশ্চিন্ত থাকার গুরুত্ব কতো তা তারা উপলব্ধি করে না। সূরার শেষাংশে আল্লাহর দল হিসেবে মুসলমানদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয়েছে। এ ভাবমূর্তি হচ্ছে সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী মোহাজের ও আনসারদের। তাদের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে শেষ আয়াতটিতে–

'তুমি দেখতে পাবে না আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী কোনো গোষ্ঠী আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের বিরোধী কোনো লোকের সাথে প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখে........।'

সূরা আল হাশর

এই সূরাটা নাযিল হয়েছিলো ৪র্থ হিজরীতে বনু নযীরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বনু নযীর ছিলো একটা ইহুদী গোত্র। বনু নযীরের ঘটনাটা কেন কিভাবে ঘটলো এবং এরপর মুসলমানরা তাদের মোকাবেলায় কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলো এ সূরায় তাঁর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোরআনের বর্ণনাভংগিতেই এ বিষয়গুলোর বিবরণ দেয়া হয়েছে। অতপর ঘটনাবলী ও তার প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানদের গৃহীত ব্যবস্থাবলীর ওপর

www.pathagar.com

কোরআনের সেই নির্দিষ্ট ভংগিতে বিস্তারিত পর্যালোচনাও পেশ করা হয়েছে। ঘটনা ও ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশনাগুলো সুন্দর পর্যালোচনার মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের সেই দলটিকে কোরআন এভাবে প্রাণবন্ত প্রশিক্ষণ দিতো।

সূরার মূল আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে আমরা সেই ঘটনার কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরবো, যার প্রসংগে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। এভাবে আমরা এখানে কোরআনের উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবো। দেখতে পাবো, যে ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে এটা নাযিল হয়েছে তার অন্তরালে কী সুদূরপ্রসারী কার্যকারণ সক্রিয় ছিলো। এভাবে ঘটনাবলীর তাৎপর্যের চেয়েও ব্যাপকতর ও প্রশস্ততর পরিমন্ডলে তার বিস্তৃতি কতো দূর তা নিয়ে কোরআনের আলোচনার বিশিষ্ট ধরন ও রীতি আমরা হৃদয়ংগম করতে পারবো।

বনূ নযীরের ঘটনাটা চতুর্থ হিজরী সনে ওহুদ যুদ্ধের পরে ও খন্দক যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায়, একদিন রসূল (স.) হযরত আবু বকর, ওমর ও আলী (রা.)-সহ দশ জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে বনু নযীরের পল্লীতে গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাদের অনুরোধ করেন যে, তাঁর মদীনায় আগমনের সূচনাতে তাঁর সাথে বনু নযীরের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো, সে অনুসারে তারা যেন নিহত ব্যক্তিদের দিয়াতে (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) অংশগ্রহণ করে। বনু নযীর রসূল (স.)-এর আগমনকে বাহ্যত স্বাগত জানায় এবং তাদের ওপর যে দায়দায়িত্ব বর্তে তা পালনের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু এর পাশাপাশি তারা গোপনে রসূল (স.) ও তাঁর সাথীদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটে। তিনি যখন তাদের একজনের বাড়ীর প্রাচীরের পাশে বসে ছিলেন, তখন তারা পরস্পরকে বলে, এই ব্যক্তিকে তোমরা এমন সুবিধাজনক অবস্থায় আর কখনো পাবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ এই প্রাচীর সন্নিহিত বাড়ীটির ছাড়ের ওপর ওঠে গিয়ে ওর ওপর বড়ো এক পাথর ছুঁড়ে মারুক এবং আমাদের তার কবল থেকে রেহাই দিক। আমর বিন জাহশ এই দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং বললো, হাঁ, এ কাজটা আমি করবো। তারপর সে ছাদের ওপর উঠলো। ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্রের বিষয়টি তৎক্ষণাত রসূল (স.)-কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হলো। সংগে সংগে তিনি একটা জরুরী কাজ সেরে আসার ভান করে স্থান ত্যাগ করলেন। তিনি তাঁর সাথীদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। এদিকে তাঁর ফিরতে অনেক দেরী হচ্ছে বলে সাথীরাও তাঁর সন্ধানে ইহুদী পল্লী থেকে বেরিয়ে গেলেন। পরে তারা জানতে পারলো যে, রসূল (স.) মদীনায় প্রবেশ করেছেন।

বনূ নযীরের বিশ্বাসঘাতকতা ও মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভংগের বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পর রসূল (স.) বনু নযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। ইতিপূর্বে বনু নযীরের নেতা কাব ইবনে আশরাফ রসূল (স.)-কে নিন্দা করে এবং তাঁকে হত্যা করার জন্যে তার শত্রুদের উস্কানি দিয়ে কবিতা লিখেছিলো। তাছাড়া একথাও লোক মুখে প্রচারিত হয়েছিলো যে, রসূল (স.)-এর সাথে বনু নযীরের পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতার চুক্তি থাকা সত্ত্বেও বনু নযীরের লোকেরা দলে দলে

www.pathagar.com

গিয়ে কোরায়শ কাফেরদের সাথে যোগাযোগ ও সলাপরামর্শ করছে। রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা ও গাঁটছড়া বাঁধাই ছিলো এই যোগাযোগের উদ্দেশ্য। এসব কারণে রসূল (স.) মোহাম্মদ বিন মাসলামাকে অনুমতি দিলেন কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার, অনুমতি পেয়ে মোহাম্মদ বিন মাসলামা তাকে হত্যা করে ফেললেন।

বনু নযীরের মহল্লায় যখন রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো, তখন তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা ছাড়া রসূল (স.)-এর আর কোনো উপায়ান্তর থাকলো না। কেননা ইসলামের একটা মূলনীতি হলো, 'কোনো দলের পক্ষ থেকে যদি তুমি বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা করো, তাহলে চুক্তিটা তাদের ওপর একইভাবে ছুঁড়ে মারো। আল্লাহ তায়ালা বিশ্বাসঘাতকদের ভালোবাসেন না।' (সূরা আত তাওবা)

রসূল (স.) যথারীতি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বনু নযীরের মহল্লা অবরোধ করলেন। তাদের তিনি তিন দিনের– মতান্তরে দশ দিনের চরম পত্র দিলেন যেন এই সময়ের মধ্যে তারা তাদের মহল্লা ছেড়ে চলে যায়। তিনি তাদেরকে তাদের অস্থাবর সম্পত্তি সাথে নিয়ে যাওয়া এবং ক্ষেতখামার ও বাগানগুলোর দেখাশুনার জন্যে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, কিন্তু মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল তাদের কাছে দূত পাঠিয়ে প্ররোচনা দিলো যেন তারা রসূলের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে তাকে প্রতিরোধ করে। সে তাদের আশ্বাস দিলো যে, তোমরা অবিচল অনড় থাকো। আমরা তোমাদের কখনো অসহায় ছেড়ে দেবো না। তোমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলে আমরা তোমাদের পক্ষে লড়বো, আর তোমাদের বহিষ্কার করা হলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসংগে বলেন,

'তুমি কি দেখোনি, মোনাফেকরা তাদের আহলে কেতাব কাফের ভাইদের বলে যে, তোমাদের যদি বের করে দেয়া হয় তবে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের ব্যাপারে আর কারো হুকুম মানবো না, আর যদি তোমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয় তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। অথচ আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। আহলে কেতাব গোষ্ঠীকে যদি বের করে দেয়া হয়, তবে মোনাফেকরা তাদের সাথে মদীনা থেকে বেরিয়ে যাবে না। আহলে কেতাব গোষ্ঠীকে যদি যুদ্ধ করতে হয় তবে তাদেরকে মোনাফেকরা সাহায্যও করবে না। আর যদি সাহায্য করে তাহলেও আহলে কেতাব গোষ্ঠী পরাভব মেনে নিয়ে পালিয়ে যাবে। এরপর তারা আর কোনো সাহায্য পাবে না। তাদের মনে আল্লাহর চেয়েও তোমাদের ভয় অধিক প্রবল। কেননা তারা একটা নির্বোধ জাতি।'

এরপর ইহুদীরা দুর্গের ভেতরে আশ্রয় নিলো। ফলে রসূল (স.) তাদের খেজুর বাগান কেটে ফেলতে ও জ্বালিয়ে দিতে মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন। তা দেখে আহলে কেতাব গোষ্ঠী বললো, হে মোহাম্মদ, আপনি তো অরাজকতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করতেন এবং অরাজকতা সৃষ্টিকারীর নিন্দা করতেন। এখন এই যে খেজুর বাগান কেটে ফেলা হচ্ছে ও জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে, এটা কেমন ব্যাপার? তাদের এই প্রশ্নের জবাবেই

www.pathagar.com

সূরা হাশরের আয়াত নাযিল হলো, 'তোমরা যদি কোনো গাছ কেটে থাকো অথবা তাকে তার মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়ে থাকো, তবে সেটা আল্লাহর হুকুমেই করেছো, যাতে তিনি পাপিষ্ঠদের লাঞ্ছিত করতে পারেন।'

অবরোধ যখন একটানা ছাব্বিশ দিন পর্যন্ত গড়ালো, তখন ইহুদীরা নিশ্চিত হলো যে, মোনাফেকদের প্রতিশ্রুতি কার্যকরি হবার কোনো আশা নেই। এ সময় আল্লাহ তায়ালাও তাদের মনে আতংকের সৃষ্টি করে দিলেন। তাই তারা রসূল (স.)-এর কাছে প্রার্থনা জানালো যেন তিনি রক্তপাত না করে তাদের বিতাড়িত করেন, যেমন ইতিপূর্বে অপর ইহুদী গোষ্ঠী বনু কায়নুকা'কে করেছেন (এর কারণ ও পটভূমি সূরা আহযাবে বর্ণিত হয়েছে)। তারা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিলো যে, তাদের উট যে পরিমাণ বইতে পারবে কেবল সেই পরিমাণ মালপত্রই তারা নেবে। কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেবে না। রসূল (স.) তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তারা উটের বহনযোগ্য পরিমাণ মালপত্র নিয়ে চলে গেলো। কেউ কেউ দরজার চৌকাঠসহ গোটা ঘর ভেংগে উটের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে গেলো। কেউ নিজের ঘর এমনভাবে বিধ্বস্ত করে গেলো, যাতে মুসলমানরা তা ব্যবহার করতে না পারে। অবরোধ চলাকালে যেসব প্রাচীর আত্মরক্ষার কাজে লাগানো হয়েছিলো, তার কোনো কোনো প্রাচীর মুসলমানরা পরে ভেংগে গুঁড়িয়ে দেয়।

আল্লাহ তায়ালা এ সূরার ২, ৩ ও ৪ নং আয়াতে এ প্রসংগটি আলোচনা করেছেন। মদীনা থেকে বহিষ্কৃত এই বনু নযীর ইহুদী গোত্রের কেউ সিরিয়ায় কেউ বা খায়বরে চলে যায়। খায়বরে গমনকারীদের মধ্যে নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি ছিলো সালাম বিন আবিল হাকীক, কেনানা ইবনুর রবী বিন আবিল হাকীক এবং হুওয়াই বিন আখতাব। পরবর্তীকালে আহযাব যুদ্ধ ও বনু কোরায়যার ঘটনায় মক্কার মোশকেরদের মুসলমানদের ওপর হামলা করতে উস্কে দেয়া (সূরা আহযাব দ্রষ্টব্য) এবং খায়বরে যুদ্ধ বাধানোতে (সূরা আল-ফাতাহ দ্রষ্টব্য) এসব লোকের ভূমিকা ছিলো। বনু নযীরের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের সম্পত্তি হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। মুসলমানদের ঘোড়া বা উট ব্যবহার করে যুদ্ধ করে এগুলো জয় করতে হয়নি। এগুলো রসূল (স.) কেবল মোহাজেরদের মধ্যেই বণ্টন করেন। আনসারদের মধ্যে দু'জন দরিদ্রতম ব্যক্তি সাহল বিন হানিফ ও আবু দুজানা সাম্মাক বিন খারশাকে ছাড়া আর কাউকে এর অংশ দেয়া হয়নি। কারণ মোহাজেররা মক্কায় তাদের যাবতীয় সহায় সম্পদ ত্যাগ করে চলে এসেছিলো শুধু ঈমান রক্ষার তাগিদে, আর আনসাররা তাদের ঘরবাড়ী ও জমিজমায় মোহাজের ভাগ দিয়ে নযীরবিহীন ত্যাগ ও আন্তরিক ভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার পর রসূল (স.) মুসলিম সমাজে স্বাভাবিক পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠায় ত্বরিত পদক্ষেপ নিলেন, যাতে দরিদ্র লোকদের হাতে নিজস্ব সম্পত্তি থাকে এবং যাবতীয় ধন সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে না যায়। আনসারদের মধ্যে কেবল দু'জন দরিদ্র ব্যক্তিকেই তিনি এর ভাগ দিয়েছিলেন। বনু নযীরের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভাটবাটোয়ারা নিয়ে কেউ কেউ বিতর্ক তুলেছিলো। প্রসিদ্ধ মতানুসারে এই লোকটি ছিলো মোনাফেক। এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা এই সূরায় বলেন,

www.pathagar.com

'আল্লাহ তায়ালা যে সম্পত্তি তার রসূলকে দিয়েছেন, তা অর্জন করতে তোমরা উট ও ঘোড়া ছুটাওনি, তবে আল্লাহ তার রসূলকে যার ওপর বিজয়ী করতে চান করতে পারেন, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।' রসূল (স.) আনসারদের বললেন, তোমরা যদি চাও, তোমাদের সম্পত্তি ও ঘরবাড়ীর একাংশ মোহাজেরদের বণ্টন করে দিতে পারো, আর এই গনিমতে তোমরা তাদের সাথে অংশীদার হতে পারো। আর যদি চাও তোমাদের সম্পত্তি ও ঘরবাড়ী পুরোপুরি তোমাদেরই থাক এবং গনিমতের কোনো অংশ তোমাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে না। আনসাররা বললেন, বরং আমরা আমাদের সম্পত্তি ও ঘরবাড়ীর অংশও তাদের দেবো এবং গনিমতেও তাদের অগ্রাধিকার দেবো, তাদের সাথে আমরা শরীক হবো না।

এ হচ্ছে সেই ঘটনা যার প্রেক্ষাপটে এ সূরা নাযিল হয়েছে। সমগ্র সূরাই এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত মুসলমানদের সম্বোধন করে সূরার শেষাংশে কিছু বক্তব্য রাখা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনার পর্যালোচনা করে প্রশিক্ষণ ও চরিত্র গঠনমূলক মন্তব্য করা এবং এ ঘটনাবলীকে তার মৌলিক তত্ত্ব ও নীতিসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কোরআনের যে ঐতিহ্যবাহী রীতি রয়েছে, সূরার শেষভাগের বক্তব্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। সূরার একেবারে শেষাংশে মহান আল্লাহর এমন কিছু গুণাবলীর বিবরণ দেয়া হয়েছে, যার কার্যকর প্রভাব এই সৃষ্টিজগতে সর্বক্ষণ বিদ্যমান। এ গুণাবলীর প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি করার ওপরই সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টি সম্বলিত, বোধগম্য ও বিবেকসম্মত ঈমানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ গুণাবলী হচ্ছে সেই আল্লাহর, যিনি এই কোরআন দ্বারা ঈমানদারদের সম্বোধন করেন ও তার দিকে আহবান করেন। সূরাটার সূচনা ও সমাপ্তি দুটোই ঘটেছে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসের সর্বময় অধিপতি মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর তাসবীহ তথা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার মধ্য দিয়ে। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সূরার প্রথমাংশ ও শেষাংশ তার আলোচিত বিষয়ের সাথে এবং তাকওয়া, একাগ্রতা, আনুগত্য ও মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহর বিশ্ব ব্যবস্থাপনা নিয়ে চিন্তা গবেষণার আহবানের সাথে পরিপূর্ণভাবে সমন্বয়যুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূরা আল মোমতাহেনা

এ সূরাটি কোরআনের সেই সূরাগুলোর অন্যতম, যেগুলো ঈমানী যিন্দেগী, সামাজিক সংগঠন এবং কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে নাগরিক জীবন যাপনের জন্যে মুসলমানদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ঈমানী জীবনের প্রশিক্ষণদানের সুদীর্ঘ শেকলের মধ্য থেকে এ সূরাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কড়ি, অথবা বলা যায়, উম্মতে মুসলিমার সামাজিক জীবন যাপনের জন্যে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে যে ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়েছে, এ সূরাটিতে সেই শিক্ষা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে ওঠেছে এবং বাস্তব একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গোটা মানবজাতিকে সঠিক পথ পেতে সাহায্য করেছে। এই ভাবে আল্ কোরআন সামাজিক জীবন যাপনের জন্যে যে শিক্ষা উপস্থাপন করেছে তার থেকে মানব জাতি কখনও শিক্ষা গ্রহণ করেছে, আবার কখনও এ শিক্ষা থেকে সে দূরে

www.pathagar.com

সরে গেছে, কিন্তু আমরা যারা ইসলামকে একমাত্র সঠিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে বুঝতে পেরেছি, তারা সদা সর্বদা এ আশায় বুক বেঁধে রয়েছি যে, একদিন গোটা পৃথিবীর বুকে অবশ্যই এই জীবন ব্যবস্থা একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কায়েম হবে।

অবশ্যই এক সময়ে এ জীবন ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যার ইংগিত সূরাটির শুরুতে দান করা হয়েছে। এ জন্যে ইসলামের সূচনালগ্নে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দান করা হয়েছে। এই দলীয় সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এবং আল্লাহর জানামতেই এসব ঘটনা ঘটেছে, অর্থাৎ যা কিছু ঘটেছে বা ঘটছে, সব আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটেছে।

পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান চালু করার ব্যাপারে যে সব মানুষ চেষ্টা সাধনা ও কর্মকান্ডে নিয়োজিত থেকেছে, তাতে কখনও দুঃখ কষ্ট এসেছে, আবার কখনও মানুষ জীবনের নিত্য নতুন স্বাদ লাভ করেছে। তাই সত্যের এই প্রদীপ্ত আলো যখন উদ্ভাসিত করে দেবে গোটা ধরণীকে, তখন ঈমানের নতুন এই চেতনার কারণে অন্য সব কিছু থেকে মানুষ পৃথক হয়ে যাবে এবং ঈমানদারদের দলভুক্ত থাকার জন্যে চমকপ্রদ যে কোনো ব্যক্তি বা জিনিসের সাথে সম্পৃক্ততা পরিত্যাগ করবে। সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী এই ঈমানী চিন্তাধারা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই প্রয়োজন ছিলো সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণই মানুষের মনমগয ও প্রকৃতিকে তৎকালীন বিরাজমান সকল প্রকার ভুল ভ্রান্তি ও সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত জাহেলিয়াতের চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করেছিলো; বিশেষ করে আরব উপদ্বীপের সকল পাপপূর্ণ চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলো। ঈমানের এই মহীয়ান চিন্তার বিকাশ যাদের মধ্যে ঘটে, তারা জীবনের বাস্তবতা থেকে কিছুতেই দূরে থাকতে পারে না এবং বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর ঘটনা তারা এড়িয়েও চলতে চায় না; বরং তারা দিনের পর দিন এবং একবারের পর আর একবার নানা প্রকার দুর্ঘটনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এবং তাদের কোনো একটি বিষয় ও একটি সৃষ্টির দিকে বার বার ফিরে যেতে হয়, নানা প্রকার প্রভাবপূর্ণ জিনিসের অধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালাই তো সকল ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি ভালো করেই জানেন সব জিনিসের প্রভাব এক রকম হয় না এবং সৃষ্টির প্রথম থেকেই একইভাবে সব কিছু থেকে মানুষ প্রভাব গ্রহণ করে না, একইভাবে সব কিছুতে সাড়াও দেয় না এবং এক নযরে সব কিছু তারা দেখতে পায় না। সে একথা জানে এবং স্বীকারও করে যে, অতীতের অনেক রীতিনীতি, মানুষের স্বভাব প্রকৃতির ঝোঁকপ্রবণতা, মানবীয় দুর্বলতা, বাস্তবে সমাজের লোকদের সাথে মেলামেশা, আপনজন ও সংগী-সাথীদের মতের গুরুত্বদান ও তাদের অভ্যাসের প্রভাব– এসব কিছুই মানুষের মধ্যে এমন কঠিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যে, একের পর এক সঠিক প্রশিক্ষণ অনুযায়ী কাজও বাধাগ্রস্ত হয়ে যায়। এই জন্যেই এ সকল বাধা বিপত্তির মোকাবেলার কথা বার বার স্মরণ করানোর প্রয়োজন

www.pathagar.com

হয়, প্রয়োজন হয় নিবিড় ও আকর্ষণীয় সম্পর্ক স্থাপন করার। এর ফলেই আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী অপ্রীতিকর ঘটনাসমূহ ঘটতে থাকে। এই কারণে উপর্যুপরি পরামর্শ দেয়া হয়, আর তারই আলোকে সে সতর্ক হতে থাকে এবং এই পথ প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বার বার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। রসূলুল্লাহ (স.) প্রকৃতপক্ষে বরাবরই জাগ্রত থাকতেন এবং আল্লাহর কাছ থেকে যে স্পষ্ট পথনির্দেশনা (এলহাম) পেতেন তারই আলোকে আগত সমস্ত সমস্যার সমাধান দান করতেন, আর তাঁর প্রিয় সাহাবাদের চূড়ান্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে গড়ে তোলার জন্যে কাজে লাগাতেন। রসূলুল্লাহ (স.)-এর যামানায় ওহী এবং এলহাম পরস্পর সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে এবং একটি অপরটিকে বলিষ্ঠ করেছে। এরই ফলে তাঁর হাতে এই মুসলিম জামায়াত আল্লাহর ইচ্ছাতেই তাঁর পছন্দনীয় দল হিসেবে গড়ে ওঠতে সক্ষম হয়েছিলো।

আলোচ্য সূরাটি এ দীর্ঘ প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ধারার মধ্যে একটি বিশেষ ধারা। সূরাটির বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে আনীত অন্যান্য বিষয়ের সাথে রয়েছে; মুসলমানদের একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি একান্তভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। এই বিশ্বাসের দৃঢ়তার ভিত্তিতেই মুসলমানরা পরস্পর নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ এমন এক রশির বাঁধন যা কখনও ছিন্ন হয় না। এ বন্ধনের কারণে সকল প্রকারের গোত্রীয় বা বংশীয় হিংসা বিদ্বেষ বিদূরিত হয়। এই মহান ঈমানী সম্পর্কের ফলে বংশীয় ও শ্রেণীগত আভিজাত্যবোধ, বিদ্বেষ এবং ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদী মনোভাব দূরীভূত হয়েছিলো এবং তাদের সবার মধ্যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর পতাকাতলে সমবেত হয়ে একটি দলে আবদ্ধ হয়ে থাকাই প্রাধান্য পেয়েছিলো।

ইসলাম যে জগত গড়তে চায় তা হচ্ছে সম্পূর্ণ এক আল্লাহমুখী জগত, মানুষের প্রতি মমত্ববোধের জগত। আল্লাহমুখীতার অর্থ হচ্ছে, মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির পথে ও তাঁর নির্দেশ পালনার্থে নিয়োজিত হবে। তার চিন্তা চেতনা ও কাজ হবে আল্লাহকেন্দ্রিক। আর মানবকেন্দ্রিক বলতে বুঝায় মুসলমানের সকল কাজ ও ব্যবহার হবে গোটা মানব জাতির শান্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে নিয়োজিত। সকল বিশ্বাসের মূল লক্ষ্য হবে এই মানব কল্যাণ। বর্ণ, ভাষা, এলাকা, দেশ ও রাষ্ট্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মুক্তি এবং কল্যাণ সাধনই হবে মুসলমানের চেষ্টা ও সকল সাধনার কেন্দ্রবিন্দু। এই উদ্দেশ্যেই মানুষে মানুষে পার্থক্য নির্ণীত হবে এবং তাদের কাছে ঈমান ব্যতীত অন্য কোনো সম্পর্কই প্রাধান্য পাবে না। এই আল্লাহমুখী মহান জগতই হবে আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান লোকদের জন্যে আরামদায়ক বাসস্থান, যেখানে আল্লাহর রহমতের বারিধারা অবিরত বর্ষিত হবে।

এই শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে গিয়ে আমাদের বহু পর্যায় ও দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়। তৎকালীন আরবের পরিবেশে যেমন এসব পর্যায় ও কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়েছিলো, তেমনি আজও বিশ্বের সবখানে অনেক পর্যায় ও কন্টকাকীর্ণ পথ পার হতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম জটিল পথ হচ্ছে নিজ বাড়ীর লোকের প্রতি দুর্বলতা,

www.pathagar.com

নিজ গোত্রের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ, নিজ জাতির প্রতি দুর্বলতা, নিজ শ্রেণী (নারী বা পুরুষ)-এর প্রতি দুর্বলতা এবং নিজ এলাকা ও এলাকাবাসীদের প্রতি দুর্বলতা এবং কোনো বিশেষ এলাকার জন্যে দুর্বলতা। এমনি করে মানসিক ঝোঁকপ্রবণতা এবং অন্তরের চাহিদা, লোভ লালসা, সংকীর্ণতা, ধনসম্পদ ও বিভিন্ন বিলাসদ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ, প্রাধান্য লাভের খাহেশ এবং অনেক সময় কৃচ্ছ্র সাধনের প্রবণতা পোষণ করা– এই ধরনের নানাবিধ অবস্থা ও পর্যায় মানুষকে অতিক্রম করতে হয়।

পৃথিবীর বুকে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ইসলামী দলের মধ্যে বিরাজমান উপরোক্ত সর্বপ্রকার অবস্থা কার্যত সামাল দিয়েই পূর্ণাংগ ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা হয়েছে। আলোচ্য সূরাতে সামাজিক এসব সমস্যার মধ্যে একটি বিশেষ সমস্যার সমাধান এসেছে।

যে সকল মোহাজের মুসলমান তাদের ঈমান আকীদা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের দেশ ও সহায় সম্পদ পরিত্যাগ করে মদীনার পথে পাড়ি জমিয়েছিলেন, তাদের অনেকেরই অন্তর প্রাণ পরিত্যক্ত মাতৃ-ভূমিতে আবদ্ধ বিবি-বাচ্চা ও আত্মীয়স্বজনের জন্যে উদ্বেলিত ছিলো, আর মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা ও অপমান সহ্য করা সত্তেও তারা আশা করতেন যে, তাঁদের ও মক্কাবাসীদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও ভালবাসা স্থাপনের কোনো দুয়ার যদি খুলে যেতো, পরিসমাপ্ত হতো যদি এই ঝগড়া বিবাদ ও নিষ্ঠুরতার, যার কারণে তাদের ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ-বিগ্রহের দাবানল জ্বলে ওঠেছিলো এবং তাদের সকল আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই লোকদেরকে সকল দিক দিয়ে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন তাদের এ সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করতে, যার কারণে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশ, এ ব্যবস্থার প্রতি অবিচল আস্থা এবং এর কল্যাণকর দিকগুলো তিনি পুরোপুরিভাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে নিহিত দুর্বলতাগুলো ভালো করেই জানেন। জানেন জাহেলী যামানায় গড়ে ওঠা তাদের নানা প্রকার সংকীর্ণতা সম্পর্কেও। বিশেষ করে আরবদের মধ্যে বংশীয় ও গোত্রীয় আভিজাত্যবোধ অত্যন্ত তীব্রভাবে বিরাজ করতো। ঘরে ঘরে ছিলো এসব সংকীর্ণ মনোবৃত্তি। তাই আল্লাহ পাক ধীরে ধীরে এক এক করে সেই সকল মানসিক ব্যাধি দূর করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এ সূরার মধ্যে যে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে আয়াত নাযিল হয়েছে, সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, প্রকৃতপক্ষেই সে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো, কিন্তু সরাসরি ওই ঘটনা সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলেও উক্ত আয়াতের বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী, শুধুমাত্র সে ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তায়ালা স্থায়ীভাবে একটি শিক্ষা দান করেছেন, যা মানুষের জন্যে চিরদিনের তরে এক দিকনির্দেশনা হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

উক্ত ঘটনা সম্পর্কে যা জানা যায় তা হচ্ছে এই, হাতেব ইবনে আবী বালতায়া (রা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারী ব্যক্তিদের অন্যতম (মোহাজের) এবং বদর যুদ্ধে যোগদানকারী সাহাবীদের মধ্যেও একজন ছিলেন। মক্কা শরীফে তাঁর সন্তনাদি ও সহায় সম্পদ ছিলো। অথচ তিনি কোরায়শ গোত্র উদ্ভূত ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন হযরত ওসমানের মিত্র ও তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ একজন বিদেশী মানুষ। এ সময় মক্কাবাসীরা হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভংগ করায় রসূল (স.) মক্কা অভিযানের মনস্থ করলেন এবং মুসলমানদের যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে নির্দেশ দিলেন ও বললেন, 'ওদের থেকে খবরটি গোপন রেখো' (এই এ জন্যে, যেন প্রস্তুতি সম্পর্কে কোরায়শরা জানতে না পারে)। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতির কথা মুসলমানদের মধ্য থেকে যাদের জানালেন, তাদের মধ্যে হাতেব ইবন আবী বালতায় ছিলেন অন্যতম। অতপর হাতেব মক্কা নগরী থেকে আগত মোযায়না গোত্রোদ্ভূত এক মহিলার হাতে রসূল (স.)-এর মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনা সম্বলিত একটি চিঠি মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে করে মক্কাবাসীদের প্রতি তাঁর এহসান প্রদর্শনের একটি প্রমাণ থাকে। এ মহিলাটি নাচ-গান করে তার জীবিকা নির্বাহ করতো এবং এই উদ্দেশ্যেই সে মদীনায় এসেছিলো। রসূল (স) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন যেন তাঁর মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনার কথা গোপন থাকে। আল্লাহ তায়ালা এ দোয়া কবুল করেছিলেন এবং চেয়েছিলেন যেন মক্কা বিজিত হয়, তাই তিনি রসূল (স.)-কে এ খবর পাচারের ঘটনা জানিয়ে দিলেন। ফলে রসূল (স.) সে মহিলাটিকে ধরার জন্যে সংগে সংগে লোক পাঠালেন এবং তার থেকে পত্র উদ্ধারও করা হলো।

বোখারী শরীফে কেতাবুল মাগাযীতে (যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায়) এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিমও তাঁর কেতাব সহীহ মুসলিম শরীফে হোসায়ন ইবনে আবদুর রহমানের বরাত দিয়ে আলী (রা.) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) আমাকে, আবূ মারসাদ এবং যোবায়ের ইবনুল আওয়ামকে (একটি চিঠি উদ্ধারের জন্যে) পাঠালেন। আমরা সবাই ঘোড়-সওয়ার ছিলাম। আমাদের তিনি বলে দিলেন, 'তোমরা সে মহিলাটিকে ধরার জন্যে 'রওদাতুল খাক' নামক স্থানে যাবে। সেখানে তোমরা মোশরেক এই মহিলাকে পাবে। তার কাছে মোশরেকদের হাতেব ইবনে আবী বালতায়ার পক্ষ থেকে লিখিত একটি চিঠি পাবে।' আলী (রা.) বলেন, আমরা উক্ত মহিলাকে তার উটের ওপর সওয়ার অবস্থায় সেই স্থানে পেলাম, যেখানে পাবো বলে রসূল (স.) বলেছিলেন। আমরা বললাম, চিঠিটি কই? সে বললো, আমার কাছে কোনো চিঠি নেই। এরপর আমরা উটটিকে বসিয়ে দিয়ে চিঠিটি খোঁজ করলাম, কিন্তু চিঠি পেলাম না। তখন আমরা বললাম, এটা নিশ্চিত, রসূল (স.) মিথ্যা বলেননি, অবশ্যই তোমার চিঠি বের করে দিতে হবে, নচেত আমরা তোমাকে উলংগ করে চিঠি অনুসন্ধান করবো। আমাদের এই দৃঢ়তা দেখে সে নতি স্বীকার করলো এবং

www.pathagar.com

কাপড় দিয়ে বাঁধা তার চুলের বেণীর মধ্য থেকে চিঠিটি বের করে দিলো। আমরা চিঠিখানা নিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে পৌঁছে দিলাম। এ অবস্থা দেখে ওমর (রা.) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, এ ব্যক্তি (হাতেব) আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনদের সাথে গাদ্দারী করেছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান মেরে দেই।' তখন নবী (স.) সে ব্যক্তি (হাতেব)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করলো?' হাতেব বললেন, আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাসী ব্যতীত অন্য কিছু অবশ্যই নই। ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি চেয়েছিলাম উক্ত (কোরায়শ) জাতির প্রতি আমার কিছু এহ্সান থাকুক, যার ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা মক্কায় অবস্থিত আমার পরিবার ও ধন সম্পদ রক্ষা করবেন। আপনার অন্য সাহাবাদের সবারই মক্কাতে আত্মীয়স্বজন আছে, যারা (মক্কা বিজয়কালে) তাদের পরিবার ও ধনসম্পদ রক্ষা করতে পারবে। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হা, সে সত্য কথাই বলেছে, তাকে ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু বলো না।' তখন ওমর (রা.) বললেন (না, ইয়া রসূলাল্লাহ), সে অবশ্যই আল্লাহ, রসূল ও মোমেনদের সাথে খেয়ানত (বিশ্বাস ভংগ) করেছে। আমাকে ছাড়ুন, তাকে আমি কতল করে দেই। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'সে কি বদরী সাহাবী নয়?' আরও বললেন, সম্ভবত আল্লাহ বদরী সাহাবীদের (তাদের মর্যাদা সম্পর্কে) জানাতে গিয়ে বলেছেন, 'যা খুশী তাই করো, অবশ্যই তোমাদের জন্যে জান্নাত ওয়াজেব হয়ে গেছে, অথবা (এভাবে বলা হয়েছে), অবশ্যই আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি। বদরী সাহাবীদের এ মর্যাদার কথা শুনে হযরত ওমর (রা.)-এর চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো এবং তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। বোখারী শরীফে কেতাবুল মাগাযীতে আর একটি কথা বেশী এসেছে, এরপর আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটি নাযিল করলেন, 'হে মোমেনরা, আমার দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে গিয়ে তাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করো না।' আর এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, যাদের (ওরা স্ত্রীলোকটির সন্ধানে) পাঠানো হয়েছিলো, তারা ছিলেন আলী, যোবায়র ও মেকদাদ।

এই ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে একটু থামুন এবং দেখুন, এ ঘটনা থেকে আল্লাহ তায়ালা কি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, যা এ কেতাব 'ফী যিলালিল কোরআনে' পাওয়া সম্ভব নয়। এ শিক্ষা একমাত্র কোরআনে বর্ণিত অভূতপূর্ব প্রশিক্ষণ ধারা, এর মধ্যে বর্ণিত ঘটনাবলী, ব্যাখ্যা এবং রসূলূল্লাহ (স.) থেকে প্রাপ্ত ধরপাকড়ের কাজ এই নিয়ম থেকে গ্রহণ করতে পারি, যেহেতু তিনিই আমাদের সবার একমাত্র নেতা, মহাপরিচালক ও মুরব্বী।

এ প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে মানুষ প্রথম যে অবস্থা দেখতে পায় তা হচ্ছে 'হাতেব'-এর আচরণ। তিনি ছিলেন একজন মোহাজের মুসলমান এবং সেই গুটিকয়েক ব্যক্তির একজন যাদের নিকট রসূলুল্লাহ (স.) মক্কাভিযানের বিষয় প্রকাশ করেছিলেন।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় মানুষের যে সকল অদ্ভুত মানসিক অবস্থার প্রকাশ ঘটে, যে দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং তার মধ্যে যে পূর্ণত্ব ও শক্তির স্ফুরণ দেখা দিতে পারে তা সবই এখানে ফুটে ওঠেছে। এ কথা অবশ্যই সত্য, এমন সব দুর্বলতার মুহূর্তে ক্ষতিকর যে কোনো পদক্ষেপ বা কোনো ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই বাঁচাতে পারেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই এসব কঠিন অবস্থায় সাহায্য করেন।

এরপর রসূল (স.)-এর মহত্ত্বের সামনে মানুষ থমকে দাঁড়ায়। সে দেখতে পায়, রসূলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞেস না করে, আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না দিয়ে ব্যস্ত হয়ে হঠাৎ কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। বলছেন, কোন জিনিস তোমাকে এহেন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করলো! রসূলুল্লাহ (স.)-এর হৃদয়ে তাঁর সাহাবীর হৃদয়াবেগের প্রতি কী মধুর দরদ, কী চমৎকার সহানুভূতি। এ দরদ ও সহানুভূতি দ্বারা তিনি তাঁর সংগীকে, তার অন্তরে লুকায়িত সত্য ফুটিয়ে তোলার সুযোগ করে দিচ্ছেন এবং তার কথা সত্য বলে গ্রহণ করছেন। আরও লক্ষণীয়, অন্যদের শক্ত কথা বলা থেকে থামাতে গিয়ে রসূল (স.) বলছেন, 'হাঁ, সে সত্য কথাই বলেছে, তাকে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু বলো না।' এই ভুলের কারণে তিনি (হাতেব) অনুতাপের যে আগুনে দগ্ধীভূত হচ্ছিলেন তা রসূল (স.) সঠিকভাবে বুঝতে পেরেই তো সেই কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে এই কথাগুলো বললেন, আর এ জন্যে নিজে তো কোনো তিরস্কার করলেনই না, অন্য কাউকেও তিরস্কার করতে দিলেন না। অপরদিকে; হযরত ওমর (আ.)-এর সে কঠিন কথাতে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো ক্রোধের প্রকাশ ঘটেনি; বরং সে রাগ ছিলো তাঁর দৃঢ় ঈমান ও অকাট্য যুক্তিপূর্ণ কাজের প্রতি নিষ্ঠার বহিপ্রকাশ। 'অবশ্যই এই আচরণ দ্বারা সে আল্লাহ, রসূল ও মুসলমানদের সাথে বে-ঈমানী করেছে, অতএব আমাকে অনুমতি দিন তাকে আমি কতল করে দেবো।' একথা বলার কারণ, ওমর (রা.)-এর নযরে হাতেবের এই পদস্খলন প্রকটভাবে ধরা পড়াতেই তাঁর অনুভূতি টনটন করে ওঠেছে এবং তাঁর বলিষ্ঠ ঈমানে তীব্রভাবে সাড়া জেগেছে। অপরদিকে রসূল (স.) অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে সকল দিক বিচার বিবেচনা করে অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন এবং মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সঠিক মূল্যায়ন করে দরদ সহানুভূতির সাথে চিন্তা করেছেন এবং কী প্রেরণাদায়ক কথা বলেছেন, যার ফলে প্রকৃত সত্য কথা বেরিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে। এই ছিলো সেই মহান ও মুরব্বী নেতার ভূমিকা, যিনি সমস্যার গভীরে তাকিয়ে সকল সত্য বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এরপর যখন মানুষ 'হাতেব'-এর কথাগুলো সামনে রাখে, তখন বুঝতে পারে, এক দুর্বল মুহূর্তে তার দ্বারা এ ভুল সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ পাকের প্রতি তার নিষ্ঠা এবং তার নির্দেশ পালনের ব্যাপারে তার একাগ্রতার মধ্যে কোনো ত্রুটি বা কমতি নেই, আর এই নিষ্ঠাই প্রকাশ পেয়েছে এ কথায় যখন তিনি বলেছেন, 'আমি শুধু মাত্র চেয়েছিলাম সে (কোরায়শ) জাতির প্রতি আমার এহ্সান দেখাতে, যার ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা আমার পরিবার ও ধন-সম্পদ হেফাযত করবেন।' তাঁর কথায় এ কথা

www.pathagar.com

অত্যন্ত স্পষ্ট ছিলো যে, সহায় সম্পদ ও পরিবার হেফাযত করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এই এহ্সানই নিজে কোনো হেফাযতকারী নয়, এর ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা হেফাযত করবেন। তাঁর পরবর্তী কথায় এ বিশ্বাসের প্রতিফলন জোরদারভাবে ঘটেছে যখন তিনি বলেছেন, 'আপনার সাহাবীদের যারাই সেখানে আছে তাদের সবারই আত্মীয়স্বজন সেখানে রয়েছে, যাদের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা তাদের ও তাদের সম্পদ রক্ষা করবেন।' একথায়, তাঁর ধ্যান ধারণায় আল্লাহর চেতনা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে তিনিই যে পরিবারের একমাত্র রক্ষাকারী, আত্মীয়স্বজন রক্ষাকারী নয়, বরং তারা হচ্ছে ওসীলা, তার অন্তরের এ বিশ্বাস পরিষ্কার বুঝা যায়।

আর সম্ভবত এই কারণেই রসূল (স.)-এর তীব্র অনুভূতি একথা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলো যে, তিনি (হাতেব) কোনো মিথ্যা বা বানাওটি কথা বলেননি, এটিই হচ্ছে রসূল (স.)-এর এই বলার কারণ, 'সে সত্য বলেছে, তাকে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু বলো না।'

কোনো ঘটনার মধ্যে আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালাই চূড়ান্তভাবে কাজ করে– তাকদীরের এ বিধান কেউ লংঘন করতে পারে না। হাতেব ইবনে আবী বালতায়া তাঁর নিজ সংকটের কারণেই মক্কা আক্রমণের খবর পূর্বাহ্নে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো না এ খবর মক্কাবাসীর কাছে পৌছে যাক যার জন্যে তিনিই এ পাচারের সংবাদ মুসলমানদের স্বার্থে রসূল (স.)-কে জানানোর ব্যবস্থা করলেন। এটাই তাকদীর, যা সরাসরি আল্লাহর ইচ্ছাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই দেখা যায়, আল্লাহ তায়ালা এ খবর পাচার শুধু বন্ধই করলেন না; বরং এ সম্পর্কে কানাকানি জানাজানিও বন্ধ করে দিলেন। এভাবে এ ঘটনা থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, কাউকে কোনো তথ্য গোপন রাখার দায়িত্ব দিলে সে যদি খেয়ানতও করে, তবু তার প্রতি একমাত্র ধারণার ভিত্তিতে কোনো কঠিন পদক্ষেপ নেয়া উচিত হবে না। বিশেষ করে মুসলমানদের নেতৃবৃন্দের জন্যে এ বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্ব বহন করে। নেতৃবৃন্দ যেন তার ভাইদের ক্রটি বিচ্যুতির ব্যাপারে সতর্ক থাকে। এ ঘটনাটি মোতাওয়াতের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত (অর্থাৎ, এতো অধিক সংখ্যক লোক এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে যে, সবাই একযোগে এতো মানুষের ভুল কথা প্রচার অসম্ভব। এ বিষয়টির ওপর কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, তাও বোখারী শরীফের একটি রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়। এ রেওয়ায়াতের সত্যতাকে আমরা দূরে নিক্ষেপ করতে পারি না; বরং আমরা তো বলেছি, কোরআনের আয়াতের ভাষা সন্দেহ দূর করার ব্যাপারে সব থেকে বেশী সহায়ক এবং হাতেবের যে ঘটনাটি সম্পর্কে মোতাওয়াতের বর্ণনাধারা এসেছে তা সে ঘটনার সত্যতা সেভাবে প্রমাণ করে যেভাবে কোরআনের আয়াত প্রমাণ করে।

এ ঘটনাটি পারিবারিক জীবনের জটিলতা এবং পরিবারের নিকটস্থ লোকদের জন্যে মানুষের দুর্বলতা যে কত বেশী এবং সে ক্ষেত্রে তাদের প্রতি কতটা রেয়ায়াত করা যেতে পারে তাও তুলে ধরা হয়েছে, যাতে করে বিশ্ব মুসলিমের জীবনকে সংকট সমস্যা থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

হাদীসটি এসব পরিবারের কর্তাদের এক নতুন চিত্র তুলে ধরেছে, নতুনভাবে তাদের মূল্যায়ন করেছে, নতুনভাবে তাদের পরিমাপ করেছে। গোটা সৃষ্টির জীবন ও মানবতা সম্পর্কে নতুন এক চিন্তাধারা পেশ করেছে । পেশ করেছে পৃথিবীতে মোমেনরা কি দায়িত্ব পালন করবে সে সম্পর্কে এবং মানব জাতির মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ।

আর এ যেন আল্লাহরই সাহায্যে তৈরী সৃষ্টি মল্লিকার মধ্যে গ্রথিত সর্বপ্রকার পত্রপল্লবের এক বিপুল সমারোহ, যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে তাদের মৌলিক সত্য সম্পর্কে জানাতে এবং তার সৃষ্টি ও জীবন লক্ষ্য সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করতে চেয়েছেন। এ ঘটনার মাধ্যমে তিনি তাদের দুশমনদের শত্রুতার ধরন ও নানা প্রকার চক্রান্তের প্রকৃতি তাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন, আর স্পষ্টভাবে তাদের বলে দিতে চেয়েছেন, তারা তো তাঁরই মানুষ, তাঁরই দল এবং তাদের দ্বারা তিনি বিশেষ একটি কাজ নিতে চান এবং তাদের দ্বারা জীবনের একটি মহান মূল্যবোধ রচনা করতে চান। এভাবেই বিশ্ব-মানবতার দরবারে মুসলিম জাতি এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে, এক অতুলনীয় জীবনের রূপরেখা পেশ করেছে এবং অতি সুন্দর এক জীবনধারার আলোকেই তারা বিশ্বের দরবারে আপন পরিচিতি তুলে ধরেছে, আর এভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে তারা সফলকাম হয়েছে। অতএব সকল মুসলমানকে নিজেদের আদর্শ ও নবী (স.)-এর শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান হতে হবে, নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ক্ষতিকর সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছাড়া চিন্তা চেতনা ও ব্যবহারের দিক দিয়ে অন্য সকল সম্বন্ধ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে।

এ উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণ সূরাটি নাযিল হয়েছে, এমনকি সূরার একেবারে শেষের দিকে বর্ণিত শরীয়ত ও সংগঠন সম্পর্কিত আয়াতগুলো মোমেন মোহাজের মহিলাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজেদের রসূল (স.)-এর মাধ্যমে আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দিয়েছিলো এবং এ কারণে তাদের ও তাদের কাফের স্বামীদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিলো। বিচ্ছেদ ঘটেছিলো মোমেন স্বামী ও তাদের কাফের স্ত্রীদের মাঝেও। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ের সবটুকু এ একই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির পরিসমাপ্তিতে আল্লাহর দুশমন, আল্লাহর নবীর দুশমন ও আল্লাহর কাছ থেকে আগত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিরোধীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং নতুন করে যে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে যা আল্লাহর আক্রোশ ডেকে আনতে পারে। তা এ সব ব্যক্তি মোশরেক, ইহুদী, নাসারা যেই হোক না কেন। এ সম্পর্ক ছিন্ন করা দ্বারা একথা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য যে, কোনো মোমেন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান আকীদার সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে না।

www.pathagar.com

সূরা আস সাফ

আলোচ্য এ সূরাটিতে দুটি মৌলিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, যা এর বর্ণনাধারার মধ্যে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠেছে, এ মৌলিক বিষয় দুটি বুঝানোর জন্যে বারবার ইশারা-ইংগিতের পন্থাও অবলম্বন করা হয়েছে।

আলোচনার প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানের মনের মধ্যে একথা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেয়া যে, মানুষের জন্যে যে জীবনব্যবস্থা প্রেরণ করা হয়েছে তা হচ্ছে তার শেষ অবস্থা সামনে রেখে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান কায়েম করা। মানবেতিহাসে ইতিপূর্বে মানুষের পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রেক্ষিতে এই জীবন বিধানই বার বার এসেছে। এসেছে বহু রসূলের জীবনে এবং তাদের অনুসরণে বহু মানব গোষ্ঠীর মধ্যে এ জীবন ব্যবস্থা চালু করার অভিজ্ঞতা মানুষ লাভ করেছে, যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে শেষ নবীর জীবনে এসে। তাঁকে তিনি সমাপ্তকারী রসূল বানাতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে তিনি মানব নির্মিত সকল জীবন ব্যবস্থার ওপর তাঁর প্রদত্ত এই জীবন ব্যবস্থাকে বিজয়ী করতে চেয়েছিলেন।

এই প্রসংগে মূসা (আ.)-এর রেসালাতের কথা উল্লেখিত হয়েছে যাতে একথা স্থিরভাবে জানিয়ে দেয়া যায় যে, যে জাতির কাছে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা তাঁকে মারাত্মক কষ্ট দিয়েছিলো এবং এর ফলে তারা গোমরাহ হয়েছিলো। অতপর তারা আর পৃথিবীর বুকে এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। এরশাদ হচ্ছে, 'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন মূসা (আ.) তার জাতিকে ডেকে বললো, হে আমার জাতি, কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছো, অথচ তোমরা তো জানো, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল হয়ে এসেছি। এরপর যখন তারা (সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে) বাঁকা পথ ধরল, তখন আল্লাহ তায়ালাও তাদের অন্তরগুলোকে বাঁকা করে দিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা এমন কোনো অপরাধী জাতিকে হেদায়াত করেন না।

এরপর আল্লাহর যমীনে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে মূসা (আ.)-এর জাতির নেতৃত্বের অবসান হয়ে গেলো। তারপর তারা আর কখনও আল্লাহ্‌র অনুগত হতে পারেনি। তারা বাঁকা পথ অবলম্বন করেছিলো। বিধায় আল্লাহ তায়ালাও তাদের বাঁকা পথে চালিয়ে দিয়েছিলেন। ইচ্ছাকৃতভাবে তারা ভুল পথ বেছে নিয়েছিল। এজন্যে আল্লাহ তায়ালাও তাদের জন্যে ভুল পথে চলা সহজ করে দিয়েছিলেন। আর আল্লাহ তায়ালা অপরাধী জাতিকে হেদায়াত করেন না।

এরপর ঈসা (আ.)-এর রেসালতের কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যেন একথা জানানো যায়, তিনি মূসা (আ.)-এর সাহায্যের জন্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি তাঁর সামনে যে তাওরাত কেতাব বর্তমান ছিল তার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে এবং সর্বশেষ রসূল (স.)-এর পূর্বাভাস ও সুসংবাদ দান করার জন্যেও প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী আহলে কেতাব এবং পরবর্তী আহলে কেতাব ব্যক্তিগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্যেও প্রেরিত হয়েছিলেন। এরশাদ হচ্ছে,

www.pathagar.com

'স্মরণ কারো সে সময়ের কথা, যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা বললো, হে বনী ইসরাঈল জাতি, অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমি ...... সুসংবাদদানকারী সেই (অনাগত) রসূলের, যিনি আমার পরে আসবেন, যাঁর নাম হবে আহমাদ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মূসা (আ.)-এর পর আল্লাহর কাছ থেকে তিনি দ্বীন ইসলামের যে আমানত পেয়েছিলেন তাই তিনি পরবর্তী সেই রসূলের কাছে হস্তান্তর করতে এসেছিলেন যার সুসংবাদ তিনি দিচ্ছিলেন। আর আল্লাহর জ্ঞানভান্ডারে একথা মওজুদ ছিলো এবং স্থির করা ছিল যে, তাঁর দ্বীনকে শেষ বারের মতো দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করা হবে এবং শেষ রসূলের হাতে আল্লাহ্‌র যমীনে এই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে, যদিও মোশরেকরা এটা পছন্দ করে না।

এ সূরার মধ্যে আলোচিত প্রথম স্পষ্ট লক্ষ্যের ওপর স্থাপিত হয়েছে দ্বিতীয় লক্ষ্য। অতএব মুসলমানদের চেতনার মধ্যে একথা দৃঢ়তার সাথে স্থাপন করা হচ্ছে এবং তাদের ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যে আকীদা বিশ্বাস তারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে তারই ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠবে তাদের জীবনব্যবস্থা, সেই জীবন ব্যবস্থাকে পৃথিবীর বুকে চালু করাই তাদের আসল দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রয়োজন চূড়ান্ত সংগ্রামের এবং মানব নির্মিত সকল জীবন ব্যবস্থার ওপর ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে বিজয়ী করার। এই চূড়ান্ত প্রচেষ্টাই আল্লাহর কাম্য। তিনি চান মুসলমানদের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য না থাকুক। তিনি চান না এই ওয়াদা পালনে তারা কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করুক। তিনি চান তারা ঈমান আনার দাবী করে যে ওয়াদায় আবদ্ধ হয়েছে এই জেহাদের মাধ্যমেই তা পূরণ করুক।

তিনি কিছুতেই পছন্দ করেন না যে, মোমেনরা জেহাদ করার আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং তারপর বাস্তব জেহাদ যখন হাযির হবে, তখন তারা পেছন দিকে ফিরে দাঁড়াবে, যেমনটি অতীতে ঘটেছিলো মুসলমানদের একটি দলের পক্ষ থেকে। আর এভাবেই সূরার শুরুতে সৃষ্টির সব কিছু যে আল্লাহর প্রশংসায় রত একথা ঘোষণার পর নাযিল হচ্ছে, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, কেন বলছো এমন সব কথা যা তোমরা করো না? আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু সেই কথা বলা যা তোমরা করো না। নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা তাদের পছন্দ করেন যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে যেন তারা এক শীশাঢালা প্রাচীর।'

এরপর সূরাটির মধ্যভাগে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে সব থেকে লাভজনক ব্যবসার দিকে আল্লাহ তায়ালা তাদের ডাকছেন। বলছেন, 'হে ঈমানদাররা, আমি কি তোমাদের বলবো এমন একটি ব্যবসার কথা যা তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবে? ......।'

তারপর মোমেনদের প্রতি শেষ আহবান রেখে সূরাটি শেষ করা হচ্ছে। যেন তারা সেইভাবে আল্লাহর সাহায্যকারী দলে পরিণত হয়ে যায়, যেমন ঈসা (আ.)-এর একদল সাহায্যকারী ছিলো, আল্লাহর দিকে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করত। বনী

www.pathagar.com

ইসরাঈল জাতির বিরোধিতা ও চরম শত্রুতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই দলটি তাঁকে সাহায্য করত। এরশাদ হচ্ছে, 'হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন করে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরকে তিনি বলেছিলেন ....ফলে তারা চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হলো।'

এ সূরার মধ্যে শেষের এ দুটি লাইন অত্যন্ত স্পষ্ট। এখানে আল্লাহর প্রায় সব কথাই এসে গেছে। শুধু শেষ রসূল (স.)-কে অস্বীকারকারীদের কঠোর সমালোচনার কথাটিই বাকি রয়ে গেছে। এই হচ্ছে সূরাটির কাহিনী ও বক্তব্যের লক্ষ্য এবং হঠকারী কাফেরদের সমালোচনার কথা এই মৌলিক আয়াত দুটির মধ্যে পরোক্ষভাবে অবশ্যই এসে গেছে, তা একটু খেয়াল করলে বুঝা যায়। রসূলুল্লাহ (স.)-এর সুসংবাদ দিতে গিয়ে ঈসা (আ.)-এর উক্তি আল্লাহর বাণীতে কি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে। 'তারপর যখন তাদের কাছে স্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে সে এসে গেলো, তখন তারা বলে উঠলো, এটা তো স্পষ্ট জাদু.......এটা পছন্দ করে না।

এখানে একজন মুসলিম ব্যক্তির অন্তরে একথা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাই তার জন্যে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা, যা শেষ রসূলের আমলে সমাপ্ত হয়েছে এবং সমগ্র পৃথিবীর বুকে পরিচিত হয়েছে। গোটা মানবজাতির কাছে এ ব্যবস্থা পৌঁছে দেয়া তাঁর দায়িত্ব। তিনি জানেন, তাঁকে অবশ্যই আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে চালূ করার জন্যে মাল ও জানের কোরবানী নিয়ে চূড়ান্ত সংগ্রামে নামতে হবে। যেহেতু এটাই আল্লাহর পছন্দ। এভাবে এ চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং তাঁর ধারণায় আর কোনো অস্পষ্টতা থাকার অবকাশ নেই, বা একাজ করতে গিয়ে তাঁর জীবনে এমন কোনো ভয় ভীতি নেই যাতে তাঁর স্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে যাবে, অথবা তিনি দুর্বিষহ দুঃখভারে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করার ব্যাপারে তার মাঝে কোন জড়তা নেই। আল্লাহ পাকের দেয়া জ্ঞান ও তাঁর নির্ধারিত পরিণাম বিলম্বে হলেও যে আসবেই, এ বিষয়ে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই।

এই স্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে মুসলমানদের তাদের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে আহবান জানানো হচ্ছে, তার মননশীলতার প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের চিন্তা করতে বলা হচ্ছে। সুতরাং এমন কথা একজন মুসলমান বলবে না যা সে করে না, প্রকাশ্যে গোপনে, একাকিত্বে, সর্বসমক্ষে সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সে কথা বলবে, কথা বলবে মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে। তার কথা ও কাজের মধ্যে থাকবে স্বচ্ছতা, সে তার ভাইদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে হবে আবেগময়, এইভাবে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠবে তা হবে শীশাঢালা প্রাচীরের মতোই মযবুত।

সূরা আল জুমুয়া

মদীনায় অবতীর্ণ এ সূরাটি সূরা 'সফ'-এর পরেই অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা 'সফ'-এর মধ্যে যে-বিষয়ের ওপরে আলোচনা এসেছে এ সূরার মধ্যে আলোচনার বিষয়ও প্রায় সেই একই প্রকার, তবে ভিন্ন এক পদ্ধতিতে সে বিষয়টিকে এ সূরার মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই এর প্রভাবও নতুন এবং আর একভাবে মানুষের মনে দাগ কাটে।

www.pathagar.com

এ সূরা মদীনার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মনে ঈমানের আকীদা-বিশ্বাস অত্যন্ত গভীরভাবে প্রোথিত করতে চেয়েছে। রসূল (স.)-এর যমানায় বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত মুসলমানরা ঈমানের সম্পদ হাসিল করায় যে অভংগুর একতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলো, তা একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানীতেই সম্ভব হয়েছিলো। নিরক্ষর আরববাসীদের মধ্যে পাঠানো হয়েছে শেষ রসূলকে, এটা আরবদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যই এক বিরাট এহসান, যার জন্যে আরববাসীদের এ আমানতের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান ও মনোযোগী হওয়া দরকার এবং বিশেষভাবে আল্লাহর শোকরগোযারী করা দরকার। একই ভাবে যুগে যুগে দেশে দেশে যে জনগোষ্ঠী রসূল (স.)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং ঈমানের আমানত বহন করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে তাদের ওপর কিছু দায়িত্বও বর্তায়। আল্লাহর নেয়ামতের শোকরগোযারী স্বরূপ তাদের আল্লাহ রসূলের বিধানমতো জীবন যাপন করতে হবে এবং অপরের কাছেও এই আমানত পৌঁছে দিতে হবে। এ দায়িত্ব কোনো সময়েই শেষ হয়ে যাবে না; বরং হেদায়াতের যে বীজ রসূল (স.) বপন করে গিয়েছেন তার বৃক্ষকে লালন পালন করতে হবে এবং বাড়াতে হবে। চার হাজার বছর ধরে এই দায়িত্ব বনী ইসরাঈল জাতির হাতে ছিলো, কিন্তু এর হক আদায় না করার কারণে তাদের থেকে এ মহান দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে উম্মতে মোহাম্মদীকে দেয়া হলো। তাওরাত ছিলো মূসা (আ.)-এর কাছে প্রেরিত আল্লাহরই কেতাব, বনী ইসরাঈল জাতি গাধার মতো এই কেতাবের বোঝা বহন করেছে বটে, কিন্তু এর থেকে কোনো ফায়দা নিতে পারেনি। গাধা তো বোঝা বহন করে খাদ্যস্বরূপ কিছু মজুরি পায়, কিন্তু বনী ইসরাঈলরা সে মজুরিও পায়নি এবং বোঝা বহন করার সময় তাদের কেউ সাহায্যও করেনি।

মুসলমানদের অন্তরের মধ্যে এই মূল সত্যটিই আলোচ্য সূরাটি বদ্ধমূল করে দিতে চায়। বিশেষ করে মদীনাবাসী তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাদের দ্বারাই ইসলামী জীবনব্যবস্থা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এভাবে তাদের পরে যারা এসেছেন– তাবেঈ, তাব্য়ে তাবেঈ, পর্যায়ক্রমে সবার ওপরেই পর্যায়ক্রমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব এসেছে।

এখন আমরা দেখতে পাই ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানদের এমন কিছু বাস্তব অবস্থা এই সূরার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে, যা ওই কঠিন সময়ে ব্যক্তি চরিত্র গড়ে তোলার ব্যাপারে দীর্ঘ দিন ধরে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কাজ করেছে এবং ধীরে ধীরে মানুষকে লোভ লালসা ও পার্থিব ফায়দা হাসিলের আকাংখা, পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার মনোবৃত্তি এবং সুনাম অর্জন করার বাসনা থেকে মুক্ত করেছে। বিশেষ করে মুক্ত করেছে ধন দৌলতসহ এমন সব আসক্তি থেকে যা মানুষকে প্রদত্ত আমানতের মহান দায়িত্ব পালন থেকে গাফেল করে দেয়, দূরে সরিয়ে দেয় খেলাফতের দায়িত্ব পালন থেকে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্যে সূরাটি ইশারা করেছে বিশেষ একটি ঘটনার দিকে।

www.pathagar.com

ঘটনাটি হচ্ছে, এক জুময়ার নামাযে মসজিদে রসূলুল্লাহ (স.) খোতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক বাণিজ্য কাফেলা ব্যবসা-দ্রব্য নিয়ে দেশে ফিরলো এবং শহরে এসে হাযির হলো। তাদের আগমন সংবাদ জানার সাথে সাথে যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর খোতবা শুনছিলো, সেই শ্রোতাদের অনেকে হঠাৎ করে সেই কাফেলার দিকে ছুটে গেলো। কাফেলার আগমন সংবাদ ঘোষণাকারী বাদ্যধ্বনি তাদের আবেগমুগ্ধ করে ফেললো। অবশ্য এভাবেই আরববাসীরা (ইসলাম-পূর্ব) জাহেলী যুগে বাণিজ্য ফেরতা কাফেলাকে অভিনন্দন জানাতো। কাফেলার মধ্য থেকে দফ নামক বাদ্যযন্ত্র (তবলা) সহ উট-হাঁকানো গান ও সম্মিলিত কলরব ভেসে আসছিলো! এতদ্ শ্রবণে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে রসূলুল্লাহকে দন্ডায়মান অবস্থায় পরিত্যাগ করে চলে আসে। এদের মধ্যে বারো জন ব্যক্তি ছিলেন ব্যতিক্রম। এরা ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত সাহাবা, ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব, যারা সর্বাবস্থায় রসূলুল্লাহ (স.)-কে ঘিরে থাকতেন। সুতরাং তারা স্থান ত্যাগ না করে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন। বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, এদের মধ্যে আবু বকর ও ওমর (রা.)-ও ছিলেন। যদিও সংখ্যার দিক দিয়ে এরা একেবারে নগণ্য ছিলেন না, কিন্তু কোরআনুল করীমে আসা সতর্কবাণী থেকে জানা যায়, উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক উঠে চলে গিয়েছিলো। এ ঘটনাটি বিশেষভাবে পীড়াদায়ক ছিলো এজন্যে যে, যে প্রথম ইসলামী দলটিকে এতো কষ্ট করে ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিলো, তার এমন দশা হলো! ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, ইসলামের ইতিহাসে এটা একটা বিশেষ ঘটনা এবং গোটা মানব জীবনের ইতিহাসেও এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এ ঘটনা থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, যে কোনো সময়ে এবং যে কোনো কঠিন অবস্থাতে আমাদের সবর করতেই হবে। আসলে যে মুসলিম জামায়াত ইসলামের এই মহামূল্যবান আকীদার প্রচার প্রসারের দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছে, তাকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন অবিচল দৃঢ়তার। এই সবর দ্বারাই পরবর্তী কালের মুসলমানরা ইসলামকে বাস্তব জগতে সেভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে, যেভাবে প্রথম যুগের মুসলমানরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আলোচ্য সূরাটিতে ইহুদীদের সাথে 'মোবাহালা' করার দৃশ্যও দেখা যায়, অর্থাৎ কারা সত্য পথে আছে তার জন্যে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে উভয় পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করা, হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যে ভুল পথে আছে তার প্রতি তোমার লা'নত বর্ষণ করো এবং সে ধ্বংস হয়ে যাক। ইহুদীদের সাথে সে প্রতিযোগিতার কথাও এ সূরার মধ্যে ফুটে উঠেছে, তা ছিলো উভয় পক্ষ থেকে মিথ্যাপন্থীদের জন্যে মৃত্যু কামনা করা, আর ইহুদীরা অন্যান্য যে কোনো জাতির তুলনায় নিজেদের আল্লাহর বন্ধু ও অধিক প্রিয়পাত্র বলে দাবী করতো, আর বলতো যে, অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে রসূলের আগমন ঘটবে না- সেই দাবী প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই এই মোবাহালা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবে আল কোরআনও চূড়ান্ত ভাবে দাবী করেছে যে, ওদের মোবাহালার জন্যে ডাকলে এই

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতায় ওরা কিছুতেই সাড়া দেবে না, যেহেতু তাদের চেতনার মধ্যে গভীরভাবে একথা রয়েছে যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাপন্থী এবং তাদের দাবী মিথ্যা। এর পর আল কোরআন মৃত্যুর তাৎপর্য জানাতে গিয়ে বলছে, এমন ভয়ানক বিপদ যার থেকে বাঁচার জন্যে ওরা সব সময়েই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে চায়; কিন্তু সে মৃত্যু অবশ্যই ওদের সাথে সাক্ষাত করবে তা ওরা যেখানেই থাকুক না কেন। অবশেষে তাদের অনুপস্থিত ও উপস্থিত সব কিছুর জাননেওয়ালা যে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর কাছে হাযির করা হবে। আর তখন তিনি তাদের সেই সকল বিষয়ে অবগত করবেন, যা অতীতে তারা করতে থেকেছে। এ কথাগুলো শুধু ইহুদীদের জন্যেই নয় বরং সবার জন্যে, কেননা এ কথাগুলো খাস করে ইহুদীদের নাম নিয়ে বলা হয়নি। কাজেই মোমেনদের ওপরেও কথাগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য। যেহেতু ঈমান আকীদার আমানত বহন করার প্রশ্নেই এ কথাগুলো এসেছে, এজন্যে যারাই এ আমানতের হক আদায় না করবে, তাদের ওপরেই কথাগুলো প্রযোজ্য হবে।

এই হচ্ছে সূরার মুখ্য আলোচ্য বিষয়। ইতিপূর্বে সূরা 'সফ'-এ যে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে, তা এখানে আলোচিত বিষয়ের খুবই কাছাকাছি। তবে প্রত্যেক সূরার বর্ণনাভংগি পৃথক এবং প্রতিটি সূরা ভিন্ন ভিন্নভাবে হৃদয়কে আকর্ষণ করে। যদিও উদ্দেশ্য তাদের এক অভিন্ন।

সূরা মোনাফেকুন

এই সূরাটির নাম আল মোনাফেকূন। এই নাম দ্বারাই এর আলোচ্য বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে মোনাফেকদের আলোচনা এবং তাদের স্বভাব চরিত্র ও চক্রান্তের বিবরণ শুধু যে এই সূরাতেই এসেছে তা নয়; বরং বলতে গেলে মদীনায় নাযিল হওয়া কোনো সূরাতেই মোনাফেকদের প্রসঙ্গ বাদ যায়নি। তা প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক। কিন্তু এই সূরা মোনাফেকদের এবং তাদের কথিত কিছু কথাবার্তা ও তাদের দ্বারা সংঘটিত কিছু ঘটনার আলোচনায় সীমাবদ্ধ।

তাছাড়া মোনাফেকদের চরিত্র, মিথ্যাচার, জালিয়াতি, ষড়যন্ত্র, তাদের অন্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সঞ্চিত আক্রোশ, চক্রান্ত, নীচাশয়তা, কাপুরুষতা এবং চোখ ও মনের অন্ধত্ব সম্পর্কেও এই সূরায় তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া এ সূরায় অন্য কোনো প্রসংগ আলোচিত হয়নি বললেই চলে। কেবল শেষের দিকে মোমেনদের অতি সংক্ষেপে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেন মোনাফেকদের সামান্যতম দোষেও দুষ্ট না হয়। এই সাথে কয়েকটি জিনিসকে মোনাফেকদের ন্যূনতম চারিত্রিক দোষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহর জন্যে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদিত না হওয়া, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকার কারণে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য প্রদর্শন করতে থাকা, যতোক্ষণ না মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসে– যেদিন কোনো দানশীলতাই কাজে আসবে না।

www.pathagar.com

মোনাফেকী নামক রোগটা মুসলমানদের মধ্যে ঢুকতে শুরু করে মদীনায় ইসলামের আগমনের সাথে সাথেই। রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের সময় পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে এবং বলতে গেলে কোনো সময়েই তা পুরোপুরি নির্মূল হয়নি। অবশ্য সময়ে সময়ে তার বৈশিষ্ট্য, নিদর্শনাবলী ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় ইসলামের যে ঐতিহাসিক যুগটা অতিবাহিত হয়েছে, তার বিভিন্ন ঘটনাবলীতে এই রোগটার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। মুসলমানদের চেষ্টা-সাধনা, সময় ও শক্তির এক বিরাট অংশ এই রোগের কবলে পড়ে নষ্ট হয়েছে। কোরআন ও হাদীসে এ রোগ সম্পর্কে এতোবার আলোচনা করা হয়েছে যে, তা দ্বারা বুঝা যায়, এ রোগটি কতো সাংঘাতিক এবং তৎকালীন ইসলামী আন্দোলনের ওপর এর প্রভাব কতো বেশী ছিলো।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইযযত দারুযা লিখিত 'সীরাতুর রসূল, সুয়ারুম মুকতাবাসাতুম মিনাল কোরআনিল কারীম' (কোরআনে রসূল জীবনের কয়েকটি চিত্র) নামক গ্রন্থে মোনাফেকী সম্পর্কে একটি চমৎকার অধ্যায় রয়েছে। নিম্নে সেই অধ্যায় থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি–

'মদীনায় এই ব্যাধিটি ছড়িয়ে পড়ার কারণ সুবিদিত। রসূল (স.) ও প্রথম যুগের মুসলমানরা মক্কায় থাকাকালে এমন শক্তি সামর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন না যে, তাদের ভয়ে বা তাদের কাছ থেকে সুবিধা লাভের আশায় কেউ প্রকাশ্যে তাদের চাটুকারিতায় লিপ্ত হবে, আর গোপনে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাবে ও ধোকাবাজি করবে, যেমনটি ছিলো মোনাফেকদের সাধারণ স্বভাব। মক্কাবাসীরা ও বিশেষত তাদের নেতারা রসূল (স.)-এর বিরোধিতা প্রকাশ্যেই করতো, মুসলমানদের মধ্যে যাকে যতোটা পারতো কঠোর নির্যাতন করতো এবং কোনো রকম রাখঢাক না করেই ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরোধ করতো। শক্তিসামর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তি যা কিছু ছিলো মক্কাবাসী কাফেরদেরই ছিলো। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা নিজেদের প্রাণ ও ঈমান বাঁচানোর জন্যে প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়। কেউবা কাফেরদের নৃশংসতা ও বল প্রয়োগের কারণে, কেউবা প্রলোভন ও সন্ত্রাসের দরুন ইসলাম পরিত্যাগে বাধ্য হয়েছে, কেউবা পদস্খলিত হয়েছে, কেউবা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ উচ্চারণ করতে ও মোশরেকদের সাথে কপটতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি কেউ কেউ ইসলামকে অবিচলভাবে আঁকড়ে ধরার ফলে নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেছে।

কিন্তু মদীনার পরিস্থিতি ছিলো একেবারেই ভিন্ন রকমের। রসূল (স.) মদীনায় হিজরত করার আগেই আওস এবং খাযরাজ গোত্রদ্বয় থেকে বেশ কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী ও জোরালো সমর্থক লোক পেতে সক্ষম হয়েছিলেন। মদীনায় নিজের অবস্থান সুসংহত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এবং প্রায় প্রতিটি পরিবারে ইসলাম প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি হিজরত করেননি। এরূপ পরিবেশে ইসলাম গ্রহণ করেনি এমন লোকদের পক্ষে এটা মোটেই সহজ ছিলো না যে, তারা রসূল (স.),

www.pathagar.com

মদীনার আদি অধিবাসী মুসলমান (আনসার) ও হিজরত করে আসা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিরোধিতা ও শত্রুতামূলক অবস্থান গ্রহণ করবে, চাই তাদের ইসলাম গ্রহণ না করার কারণ অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাই হোক অথবা ইচ্ছাকৃত হঠকারিতা, গোয়ার্তুমি, প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষই হোক। সম্ভাব্য এই হঠকারিতা ও বিদ্বেষের কারণ এই যে, রসূল (স.)-এর আগমনে তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হওয়া যে অবধারিত তা তারা আঁচ করতে পেরেছিলো। প্রকাশ্য শত্রুতা করতে না পারার আরো একটা কারণ এই যে, ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে মদীনাবাসীর এক ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্কও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। কেননা, আওস ও খাযরাজের বেশীর ভাগ মানুষ মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো এবং তাঁকে সাহায্য করা ও সংরক্ষণ করার অংগীকারে আবদ্ধ ছিলো। শুধু তাই নয়, তাদের অধিকাংশ ইসলামের প্রতি এত আন্তরিক ও একনিষ্ঠ ছিলো যে, রসূল (স.)-কে তারা শুধু আল্লাহর রসূলই মনে করতো না, বরং নিজেদের সর্বোচ্চ নেতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শকও মনে করতো এবং তাঁর আনুগত্য অনুসরণ অপরিহার্য বলে বিবেচনা করতো। তাই যারা তখনো শেরকের প্রতি অধিকতর ঝোঁক ও অনুরাগ পোষণ করতো, অহংকার ও হিংসার ন্যায় মানসিক ব্যাধি তাদের মনের ওপর প্রবলতর প্রভাব বিস্তার করে রাখতো এবং এই ব্যাধি তাদের রসূল (স.), তাঁর আন্দোলন ও তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্ররোচিত করতো, তাদের পক্ষে তাদের উক্ত ঝোঁক ও বিরোধিতার মনোভাব খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা সম্ভব ছিলো না। ইসলামের প্রতি আনুগত্য লোক দেখানোভাবে হলেও জাহির না করে তাদের উপায় ছিলো না। ইসলামের মৌলিক এবাদাতসমূহ পালন এবং তাদেরই স্বগোত্রীয় মুসলমানদের প্রতি সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিলো না। আর তাদের ধোকা, শঠতা ও ষড়যন্ত্রগুলো চরম জালিয়াতির মাধ্যমে ভিন্ন মোড়কে পেশ করতে তারা বাধ্য ছিলো। কদাচিত তারা কোনো প্রকাশ্য মোনাফেকী ও ভন্ডামিপূর্ণ আচরণ এবং ধোকা ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করতো বটে, তবে সেটা করতো শুধুমাত্র কতিপয় সংকটজনক অবস্থাতেই– যা রসূল (স.) ও মুসলমানদের ওপর সময় সময় আপতিত হতো। আর এসব সংকটজনক পরিস্থিতিকে তারা তাদের আচরণের অজুহাত হিসাবে দাঁড় করাতো। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তারা তাদের কুফরী বা মোনাফেকীর কথা স্বীকার করতো না। তথাপি তাদের কুফরী, মোনাফেকী ও চক্রান্ত রসূল (স.) ও তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের কাছে গোপন থাকতো না। আর এই সংকটজনক অবস্থা তাদের প্রকাশ্য ইসলাম বিরোধী ভূমিকা ও আচরণ, তাদের কুফরী ও মোনাফেকী আরো অপমানজনক এবং নিন্দনীয়ভাবে প্রকাশ করে দিতো। কোরআনের আয়াতও তাদের নিন্দা ভর্ৎসনা সহকারে বারংবার নাযিল হতো এবং রসূল (স.) ও মুসলমানদের তাদের সম্পর্কে সাবধান করে দিতো।

মোনাফেকদের আচরণ ও চক্রান্তের প্রভাব যে খুবই সুদূরপ্রসারী ছিলো, সে কথা কোরআনের মদীনায় নাযিল হওয়া অংশ থেকে বুঝা যায়। এ অংশটি এমন একটি দুরন্ত সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরে, যা রসূল (স.) ও মক্কার নেতাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সংঘাত

www.pathagar.com

স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য মক্কার দুই পক্ষের ভূমিকা ও তার ফলাফল মদীনায় দুই পক্ষের ভূমিকা ও ফলাফল থেকে ভিন্নতর ছিলো। কেননা, মদীনায় রসূল (স.)-এর কেন্দ্র ক্রমেই শক্তিশালী, তাঁর ক্ষমতা ক্রমেই সংহত এবং ইসলাম ক্রমেই প্রসার ও বিস্তার লাভ করতে থাকে। এখানে তিনি ছিলেন ক্ষমতাসীন ও পরাক্রান্ত শাসক, আর মোনাফেকদের না ছিলো কোনো সুসংগঠিত দল, না ছিলো কোনো খ্যাতিমান বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। উপরন্তু রসূল (স.)-এর পর্যায়ক্রমিক শক্তি বৃদ্ধি, ইসলামের বিকাশ ও বিস্তার এবং তার শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির প্রসারের সাথে সাথে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো তাদের দুর্বলতা, কমে যাচ্ছিলো তাদের জনশক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তি।

মোনাফেকদের ভূমিকা, বিশেষত সেই প্রাথমিক যুগের পটভূমিতে কতো মারাত্মক ও ক্ষতিকর ছিলো, তা বুঝার জন্যে এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, (১) মোনফেকদের যা কিছু শক্তি ও প্রতিপত্তি ছিলো, তার প্রধান উৎস ছিলো তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক তাদের গোত্রসমূহের জনগণের মনে তখনো অত্যন্ত শক্তভাবে বিরাজ করছিলো। (২) তারা তখনো বিশ্বাসঘাতক হিসাবে পুরোপুরিভাবে চিহ্নিত ও কলংকিত হয়নি। (৩) মদীনার গোত্রসমূহের সাধারণ জনতার মনে ইসলাম তখনো যথেষ্ট শক্তি নিয়ে বদ্ধমূল হয়নি। (৪) রসূল (স.) চারদিক থেকে ইসলামের ঘোরতর শত্রু মোশরেকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। (৫) বিশেষত মক্কাবাসী তখনো তাঁর কট্টরতম শত্রু ছিলো। আরব দেশের কেন্দ্রভূমিতে তাদের অবস্থান ছিলো। প্রতি মুহূর্তে তারা তাঁর ক্ষতি সাধনে তৎপর ছিলো। (৬) মদীনায় ও তার আশেপাশে ইহুদীরা শুরু থেকেই তাঁকে অস্বীকার এবং নিজেদের জন্যে অশুভ এবং অকল্যাণকর মনে করে আসছিলো। এক পর্যায়ে তারা প্রকাশ্যভাবেই তাঁর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে আরম্ভ করে। (৭) এই পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে ও মোনাফেকদের মধ্যে ইসলামের বিরোধিতা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানোর ব্যাপারে একাত্মতা, চেষ্টার ঐক্য এবং স্বাভাবিক মৈত্রী গড়ে ওঠে। এক কথায় বলা চলে, ইহুদীদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা, সমর্থন ও শক্তি অর্জন করা ছাড়া মোনাফেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এতোটা শক্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারতো না, এতোটা মারাত্মক নির্যাতনকারী বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারকের ভূমিকা পালন করতে পারতো না, যতোটা কার্যত করতে পেরেছিলো। আর রসূল (স.)-কে আল্লাহ তায়ালা পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও প্রতাপ দান করে তাদের ওপর বিজয়ী করা এবং তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার পূর্ব পর্যন্ত তাদের শক্তি কিছুমাত্র স্তিমিত হয়নি, তাদের দিক থেকে ভয়ভীতি মোটেই হ্রাস পায়নি।' (মুহাম্মাদ ইযযত দারুযার উক্ত গ্রন্থের ১৭৬ থেকে ২১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

সূরা আত তাগাবুন

এই সূরাটি বিশেষত এর প্রথমাংশ মক্কী সূরার বিষয়বস্তুর সাথে গভীর সাদৃশ্যপূর্ণ, কেবলমাত্র শেষের কয়েকটি বাক্যে মদীনার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা প্রতিফলিত হয়।

'হে মোমেন ব্যক্তিরা' বলে সম্বোধন করার পূর্ব পর্যন্ত সূরার প্রথম ১৩টি আয়াতে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের বিবরণদান ও ইসলামী আদর্শকে অন্তরে বদ্ধমূল করার

www.pathagar.com

কাজটি অবিকল মোশরেক কাফেরদের লক্ষ্য করে নাযিল করা মক্কী সূরাগুলোর বর্ণনাভংগি অনুসারেই করা হয়েছে। এতে প্রাকৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী এবং অতীতের অবিশ্বাসীদের পরিণামও বর্ণনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কেয়ামতের দৃশ্যাবলীও তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া যে অকাট্য সত্য, তা প্রমাণিত হয়। এ সব বর্ণনাভংগি প্রমাণ করে যে, এ অংশটির লক্ষ্য হচ্ছে অবিশ্বাসী কাফেররা।

সূরার শেষাংশে সম্বোধন করা হয়েছে মোমেনদেরকে। কেননা, এ অংশের বাকরীতি মদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর মতোই। এতে আল্লাহর পথে ধন সম্পদ ব্যয় করতে এবং সম্পদ ও সন্তান সন্ততির মাধ্যমে বান্দাদের যে পরীক্ষা করা হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক হতে বলা হয়েছে, মদীনায় যে ধরনের জীবন পদ্ধতি গড়ে ওঠেছিলো, তার স্বাভাবিক দাবী অনুসারে মদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলোতে বারংবার এ জাতীয় সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। অনুরূপভাবে এতে মুসলমানদের ওপর আপতিত বিপদ আপদ ও দুঃখকষ্টে তাদের প্রবোধ দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর বা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করার আদেশ দেয়া হয়েছে। মাদানী সূরায় বিশেষত জেহাদের আদেশদান ও জেহাদ থেকে উদ্ভূত ত্যাগ তিতিক্ষা প্রসংগে এ সব বিষয় বার বার আলোচিত হয়ে থাকে।

কিছু কিছু রেওয়ায়াতে এ সূরাটিকে মক্কী বলা হয়েছে। তবে অন্যান্য রেওয়ায়াতে একে মাদানী বলা হয়েছে এবং এই মতটিই অগ্রগণ্য। সূরাটির পারিপার্শ্বিক ও প্রথমাংশের বর্ণনাভংগি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমিও একে প্রথম প্রথম মক্কী সূরা মনে করতাম। কিন্তু পরে চূড়ান্ত বিবেচনায় একে মাদানী বলেই গ্রহণ করেছি। সূরার প্রথম ভাগে কাফেরদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা মাদানী সূরায় থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। হিজরতের পরেও মক্কার অথবা মদীনার পার্শ্ববর্তী কাফেরদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখা সম্ভব। তাছাড়া কোরআনের মাদানী অংশে যদি কখনো কখনো ইসলামী আকীদা বিশ্বাস নিয়ে নতুন করে আলোচনা করা হয়, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আর তা করতে গিয়ে কোরআনের সর্বাধিক প্রচলিত রীতি, অর্থাৎ মক্কী সূরায় অনুসৃত রীতি অনুসরণ করাই যে স্বাভাবিক, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সূরা আত তালাক্ব

এটি সূরা তালাক। এ সূরায় আল্লাহ তালাকের বিধিসমূহ বর্ণনা করেছেন। সূরা বাকারায় তালাকের কিছু বিধি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে যে সব বিধি বাদ পড়েছে, তা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে। তালাক পরবর্তী অবস্থা সংক্রান্ত কিছু পারিবারিক বিষয়ও এতে আলোচিত হয়েছে। যে তালাক আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী কার্যকরি হয়, সেই তালাকের উপযুক্ত সময় কোন্‌টি, তাও এতে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দতের সময়ে তালাক দাও।'

www.pathagar.com

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর নিজ বাড়ীতে তথা তাকে তালাকদানকারী স্বামীর বাড়ীতেই থাকতে হবে। এটা তার অধিকারও এবং কর্তব্যও। সে ইদ্দতের ভেতরে সেখান থেকে বের হবে না, আর প্রামাণ্যভাবে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া ছাড়া তাকে সেখান থেকে বের করাও যাবে না।

ইদ্দত পেরিয়ে যাওয়ার পর তার সে বাড়ী থেকে বের হওয়ার অধিকার থাকবে, যাতে সে নিজের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কেননা, ইদ্দতের মধ্যে তার স্বামী স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তাকে দেয়া তালাক প্রত্যাহারও করেনি, তাকে স্ত্রী হিসাবে পুনর্বহালও করেনি। এই তালাক প্রত্যাহার ও স্ত্রী হিসাবে পুনর্বহালের উদ্দেশ্য যদি তার ক্ষতি করা, তাকে কষ্ট দেয়া এবং তার পুনর্বিবাহের পথ রোধ করা হয়, তা হলে সেটা অবশ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। বলা হয়েছে, 'যখন তাদের ইদ্দত পূর্ণ হবে তখন তাদের হয় স্বাভাবিকভাবে পুনর্বহাল করো, নতুবা ভালোভাবে আলাদা করে দাও।' তবে পুনর্বহাল করাই হোক আর বিচ্ছিন্ন করাই হোক– 'দুজন সাক্ষীর সামনে তা করতে হবে।'

সূরা বাকারায় ঋতুবতী স্ত্রীর ইদ্দতের মেয়াদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই মেয়াদ হচ্ছে তিন ঋতু অথবা তিনটি ঋতুমুক্ত সময়। এ ব্যাপারে ফেকাহবিদদের মতভেদ রয়েছে। আর এখানে এই মেয়াদ বর্ণনা করা হয়েছে যাদের ঋতুর চির অবসান হয়ে গেছে এবং যেসব অপ্রাপ্তবয়স্কা কিশোরীর জন্যে, এখনো যাদের আদৌ রজস্রাব শুরুই হয়নি। বলা হয়েছে, 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা আর ঋতুবতী হবার আশা করে না, তাদের ব্যাপারে তোমরা সন্দিহান হলে তাদের ইদ্দত তিন মাস, আর যারা এখনো ঋতুবতী হয়নি, তাদেরও ইদ্দত তিন মাস।'

আর গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত বর্ণনা করা হয়েছে 'সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।'

অতপর তালাকপ্রাপ্তার বাসস্থান ও সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার ভরণ পোষণ সংক্রান্ত বিধি সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'যে বাসস্থানে তোমরা নিজেরা বসবাস করে আসছো এবং যা তোমাদের কাছে সহজলভ্য, সেই বাসস্থানেই তাদের থাকতে দাও।'

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভূমিষ্ঠ সন্তানের দুধ খাওয়া সংক্রান্ত বিধি– 'তারা যদি তোমাদের জন্যে তোমাদের সন্তানদের দুধ খাওয়ায়, তাহলে তাদের পারিশ্রমিক দাও .....।'

অতপর ভরণ পোষণ ও পারিশ্রমিক সংক্রান্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে– 'যার যেমন সাধ্য আছে তার তেমন ভরণ পোষণ দেয়া উচিত ...।' এভাবে সূরার আয়াতগুলো তালাক ও তৎসংক্রান্ত প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধান দিয়েছে এবং তালাকের পরিণতিতে বিধ্বস্ত পরিবারটির পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বিধি ঘোষণা করেছে।

সূরাটি অধ্যয়ন করে পাঠক বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হয়ে পারে না। কেননা, এতে তালাকজনিত পরিস্থিতি ও তার ফলাফল সংক্রান্ত বহু সংখ্যক বিধি তুলে ধরার

www.pathagar.com

পাশাপাশি সতর্কবাণী ও আশ্বাসবাণী, প্রতিটি বিধির সাথে সাথে মন্তব্য, এই বিষয়টির সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর শক্তি ও পরাক্রমের সংযোগ, আল্লাহর আদেশ লংঘনকারীদের ব্যাপারে এবং আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের ব্যাপারে আল্লাহর শাশ্বত নীতি, বারংবার সদাচার, উদারতা, পারস্পরিক সন্তোষ ও সম্মতি, অপরের জন্যে ত্যাগ স্বীকার, কল্যাণকর কাজের আকাংখা পোষণ করার পুন পুন নির্দেশ প্রদান এবং সৃষ্টি করা ও জীবিকা বিতরণ করা আর অভাব ও প্রাচুর্যের ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনার বিস্ময়কর সমাবেশ ঘটেছে।

তালাক সংক্রান্ত আলোচনা প্রসংগে এত বিপুল সংখ্যক মহাজাগাতিক তত্ত্বের উল্লেখ দেখে মানুষ মাত্রেই অভিভূত না হয়ে পারে না। এখানে ব্যক্তিগতভাবে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করা হলেও এটা আসলে সকল মুসলমানের জন্যে সাধারণ নির্দেশ। রসূল (স.)-কে ব্যক্তিগতভাবে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য হলো বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি করা। প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধির এই বিশদ বিবরণ, এই বিধিসমূহ মেনে চলার জন্যে জোর তাগিদদান, এ বিধির বাস্তবায়নে আল্লাহকে ভয় করা সম্পর্কে এতো দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে যে, এ দ্বারা মনে হয় এটাই পরিপূর্ণ ইসলাম। বস্তুত এ বিষয়টি নিয়েই কোরআন বিস্তারিত আলোচনা করে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের কাজটি তদারক করে থাকে। এতে আল্লাহভীরু লোকদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, একজন মোমেনের পক্ষে যতোটা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হওয়া সম্ভব, ততোটাই উচ্চ মর্যাদায় তাকে উন্নীত করা হবে। পক্ষান্তরে যারা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত এবং যারা স্ত্রীদের ক্ষতি সাধনে তৎপর, তাদের কঠোরতম শাস্তির হুমকি প্রদান করা হয়েছে। সদাচার, উদারতা ও নম্র আচরণকারীদের জন্যে উত্তম পুরস্কার ও কল্যাণময় প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পড়ার সময় পাঠকের সামনে উল্লিখিত বক্তব্যগুলো পরিস্ফুট হবে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো।' .... 'এ হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা লংঘন করে, সে নিজের ওপর যুলুম করে।' ...... 'তুমি জানো না হয়তো পরবর্তীকালে আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছু সংঘটিত করবেন।' ..... 'দু'জন সৎ সাক্ষী রাখো এবং আল্লাহর জন্যে সাক্ষ্য স্থাপন করো।' ...... ' এ হচ্ছে তাদের জন্যে উপদেশ, যারা আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতে বিশ্বাস করে।' ......'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে একটা সমাধান তৈরী করে দেন এবং সে কল্পনাও করতে পারে না এমন উপায়ে তাকে জীবিকা দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ তায়ালাই তার জন্যে যথেষ্ট। ....'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে তার কাজ সহজ করে দেন।' ..... 'এ হচ্ছে তোমাদের কাছে নাযিল করা আল্লাহর বিধান। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ মাফ করে দেন এবং তাকে উত্তম প্রতিদান দেন।' ....'আল্লাহ তায়ালা কঠিন অবস্থার পর সহজ অবস্থার উদ্ভব করবেন।'

www.pathagar.com

এরপর তার সামনে নিম্নোক্ত হুমকিও আসে– 'অতীতে বহু জনপদের অধিবাসীরা তাদের প্রতিপালকের ও তাঁর রসূলদের আদেশ অমান্য করেছে। ফলে আমি তাদের ...... নিকৃষ্টতম শাস্তি দিয়েছি। ফলত তারা তাদের কর্মফল ভোগ করেছে এবং তাদের শেষ ফল ছিলো দুর্গতি। আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

এরপরই সর্তবাণী উচ্চারিত হয়েছে উল্লিখিত ভয়াবহ পরিণতি থেকে। রসূল ও তাঁর সাথে কেতাবরূপী আলোকবর্তিকা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা যে নেয়ামত দান করেছেন তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বিরাট পুরস্কারের আশ্বাসও দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'অতএব হে ঈমানদার বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে স্মরণিকা নাযিল করেছেন আর রসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াতগুলো স্পষ্ট করে পড়ে শোনান, যাতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে আসতে পারেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন– যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরদিন বসবাস করবে। আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে চমৎকার জীবিকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'

এরপর পাঠক সর্বশেষ যে উক্তিটি পাঠ করে তা হচ্ছে, মহাজাগতিক প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত গুরুগম্ভীর ঘোষণা, 'আল্লাহ হচ্ছেন তিনি, যিনি সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন, আর পৃথিবী থেকেও অনুরূপ সাতটি। এ সবের মাঝেই আল্লাহর বিধান নাযিল হয়। যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে শক্তিমান এবং আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান।'

এ সব কিছুই তালাকের বিধানের উপসংহার স্বরূপ। এভাবে আমরা এই ধাঁচের একটি পূর্ণাংগ সূরা দেখতে পাই, যা পারিবারিক জীবনের এই বিশেষ অবস্থা, তা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমন্বয় ও সমাধান এবং জাগতিক ও মানসিক ক্ষেত্রে ঈমানের তত্ত্বগুলোর সাথে তার সংযোগ সাধনের ওপর কেন্দ্রীভূত। এটা ধ্বংসাত্মক অবস্থা, গঠনমূলক অবস্থা নয়। একটি পরিবারের ধ্বংস বা গঠন প্রক্রিয়া একটি রাষ্ট্রের ধ্বংস বা গঠন প্রক্রিয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

এর একাধিক তাৎপর্য রয়েছে।

এর সর্বপ্রথম তাৎপর্য হলো ইসলামী বিধানে পরিবারের গুরুত্ব সংক্রান্ত।

পারিবারিক বিধান ইসলামের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবার হচ্ছে মানুষের আশ্রয়স্থল ও মাথা গোঁজার ঠাঁই। এর আওতায়ই মানুষ স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি, পরিচ্ছন্নতা, পরস্পরকে আগলে রাখা ও পরস্পরের দুর্বলতা ঢেকে রাখার প্রশিক্ষণ পায়। এই পরিবেশেই মানুষের শৈশবের সূচনা ও যৌবনের উদ্ভব হয়। এখান থেকেই সঞ্চারিত হয় পারস্পরিক একাত্মতার বন্ধন।

এ কারণেই কোরআনের বিভিন্ন স্থানে পারিবারিক সম্পর্ককে এমন স্বচ্ছভাবে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে যে, তা থেকে সহানুভূতি ও আত্মীয়তার বন্ধন স্পষ্ট হয়ে যায়।

www.pathagar.com

যেমন সূরা 'আররুমে' আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো, আর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে দয়া ও মমতার সৃষ্টি করেছেন।' সূরা 'আল বাকারায়' বলা হয়েছে, 'তারা তোমাদের জন্যে পোশাক স্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্যে পোশাক স্বরূপ।' এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, পরিবার হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সংযোগ সেতু, স্থিতি ও বসবাসের সংযোগ সেতু, দয়া ও সহানুভূতির সংযোগ সেতু এবং দুর্বলতা আগলে রাখা ও সদাচারের সংযোগ সেতু। এ আয়াত দুটির ভাষা থেকেই স্নেহ-মমতার ভাব ফুটে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে সেই সম্পর্ক ও সম্বন্ধের পূর্ণাংগ চিত্রই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা ইসলাম পরিবারের ন্যায় দয়ামায়ার বন্ধনে আবদ্ধ অটুট মানবীয় সংগঠনটির ওপর ফরয করে দিয়েছে। একই সাথে এই মানবীয় সংগঠনটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে মনুষ্য জীবনের সম্প্রসারণ। ইসলাম এই সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বানায় এবং এর দাবী ও চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সূরা বাকারার নিম্নোক্ত উক্তিতে এই ভাবধারা সুস্পষ্ট। যথা, 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত।' সংখ্যাধিক্য ও উর্বরতার বিষয়টি এ উক্তিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ইসলাম এই পরিবারকে সার্বিক প্রযত্ন ও তত্ত্বাবধানে লালন এবং সংরক্ষণ করে, আর ইসলামের সার্বিক প্রকৃতি অনুসারে এ ক্ষেত্রে সে শুধু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকে না, বরং আইনগত সংস্থাসমূহ আইনগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা দিয়েও তাকে সংহত করে।

কোরআন ও সুন্নাহতে পরিবারের প্রতিটি অবস্থা সংক্রান্ত আইনগত বিধিসমূহে, সংশ্লিষ্ট নীতিগত নির্দেশাবলীতে, এতদসংক্রান্ত মন্তব্যসমূহে এবং এ বিষয়টি সরাসরি আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করার মধ্যে যে জিনিসটি পরিলক্ষিত হয় এবং যে জিনিসটি পূর্ণাংগভাবে উপলব্ধি করা যায়, তা হলো, ইসলামী বিধি ব্যবস্থায় পরিবার অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ও আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এ বিষয়টি এই সূরাতে যেমন বিদ্যমান, তেমনি অনান্য সূরাতেও বিদ্যমান। সূরা নেসায় আল্লাহর ব্যাপারে ও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ব্যাপারে একই সাথে সতর্ক থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে। সূরা নেসার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মানব জাতি, তোমাদের সেই প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একই মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, একই মানুষ থেকে তার জোড়ও সৃষ্টি করেছেন ,এবং তা থেকে বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। যে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তোমরা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকো, রক্ত সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়দের ব্যাপারে তাঁকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।' অনুরূপভাবে সূরা বনী ইসরাঈলে ও অন্যান্য সূরায় একই সাথে আল্লাহর এবাদাত ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ দেয়া হয়েছে। সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে, 'তোমার প্রতিপালক স্থির করেছেন যে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো এবাদাত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।' সূরা লোকমানেও

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার নির্দেশ একই সাথে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আমার শোকর করো এবং তোমার পিতামাতারও।'

পরিবারকে এই সর্বোচ্চ গুরুত্বদান প্রকৃতপক্ষে পরিবারের ভিত্তিতে গোটা মানব জাতিকে গড়ে তোলার খোদায়ী পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, মানব জাতির প্রথম ভিত্তিমূল হবে আদম (আ.) ও তদীয় স্ত্রীর পরিবার এবং সেই পরিবার থেকে বহু সংখ্যক মানুষের সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তায়ালা মাত্র কয়েকজন মানুষ থেকে এক সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু এই সৃষ্টির জীবনে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকবে এটাই ছিলো আল্লাহর প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। পরিবারকে তিনি এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন তার সামগ্রিক জীবনধারা পরিবারের প্রতিটি সদস্যের স্বভাব প্রকৃতি, সহজাত যোগ্যতা প্রতিভা এবং তার ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলীকে বিকশিত করে এবং তার জীবনে পরিবারের গভীরতম প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অতপর এই একই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে পৃথিবীতে প্রেরিত আল্লাহর সর্বশেষ বিধান ইসলামী বিধানের প্রতি। এই বিধান মানবজাতির প্রথম সৃষ্টির সাথে সমন্বিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছুই সৃষ্টি হয়, তার সাথে মানব সৃষ্টির একই রকম সংযোগ ও সমন্বয় রয়েছে।

আলোচ্য সূরায় এবং কোরআনের সর্বত্র দাম্পত্য ও পারিবারিক সম্পর্ককে এত গুরুত্ব দেয়ার দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, ইসলামী বিধান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে সর্বোচ্চ পবিত্রতার মর্যাদা দিয়েছে। সে পবিত্রতা স্বয়ং আল্লাহর সাথে সংযোগের মহিমায় ভাস্বর। ইসলামী বিধান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে শুধু যে সর্বোচ্চ পবিত্রতায় মন্ডিত করতে চায় তা নয়, বরং তাকে আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও চেতনাগত পরিচ্ছন্নতাদানের জন্যে পরিবারকে উপলক্ষ হিসাবে গ্রহণ করতে চায়। পৌত্তলিকরা পরিবার সম্পর্কে ঠিক এর বিপরীত মনোভাব পোষণ করতো। বিকৃত ধর্মের অনুসারীরাও আল্লাহর সৃষ্ট স্বভাবধর্মের পরিপন্থী মনোভাব পোষণ করতো।

'ইসলাম মানুষের প্রকৃতির দাবীকে প্রতিহত বা প্রত্যাখ্যান করে না এবং তা খারাপ বা অপবিত্রও মনে করে না। সে শুধু একে শৃংখলাবদ্ধ ও পরিশীলিত করে এবং পাশবিক স্তর থেকে উন্নীত করে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়, যেখানে তা বহু সংখ্যক মনস্তাত্বিক ও সামাজিক সদাচারের উৎসে পরিণত হয় এবং যৌন সম্পর্ককে এতটা উন্নত মানবিক চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে, যে দৈহিক মিলনকে তা মানসিক, আন্তরিক ও আত্মিক মিলনে, এক কথায় দুইটি মানুষের মিলনে রূপান্তরিত করে। এ দুটি মানুষের জীবন, আশা আকাংখা, দুঃখবেদনা ও ভবিষ্যত ভাগ্য হয় সম্পূর্ণ অভিন্ন এবং ভাবী বংশধরের মধ্যেও সেই একই ভাবধারা প্রতিফলিত হয়।' (তাফসীর ফী যিলাল কোরআন, ১৮শ পারার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

ইসলাম বিয়েকে চরিত্রের পবিত্রতা, সততা ও উৎকর্ষ নিশ্চিত করার পন্থা ও মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করে। ব্যক্তি বিশেষের জন্যে যখন অর্থাভাব বিয়ে করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তখন গোটা মুসলিম সমাজকে আহ্বান জানায় তার সদস্য পুরুষ

www.pathagar.com

ও মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে । সূরা নূরে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের অবিবাহিত স্বাধীন পুরুষ ও মেয়েদের এবং বিবাহযোগ্য দাসদাসীদের বিয়ে দাও। তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদের সম্পদশালী বানিয়ে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা তো সব কিছু জানেন ও সব কিছু শোনেন। আর যারা বিয়ে করার আর্থিক সংগতি রাখে না, তারা যেন আল্লাহর অনুগ্রহে অভাব থেকে উদ্ধার না পাওয়া পর্যন্ত চরিত্রের হেফাযত করে।' ইসলামী পরিভাষায় বিয়ের আর এক নাম এহসান– যার শাব্দিক অর্থ হলো সংরক্ষণ। মোমেনরা মনে করে যে, বিয়ে ছাড়া জীবন যাপন করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না– চাই তা যত ক্ষুদ্র সময়ের জন্যেই হোক না কেন। রসূল (স.)-এর কন্যা ফাতেমার (রা.) এন্তেকালের অব্যবহিত পর হযরত আলী (রা.) যখন বিয়ে করার জন্যে তাড়াহুড়া করেন, তখন এই বলে তার ব্যাখ্যা দেন, 'আমার আশংকা হয় যে, আমাকে বিপত্নীক অবস্থায় আল্লাহর সাথে দেখা করতে হবে।' এ থেকে বুঝা যায়, বিয়ে একজন মোমেনের কাছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সিঁড়িরূপে গণ্য একটি এবাদাত বিশেষ।' আর এ কারণে দাম্পত্য সম্পর্কও তার বিবেকের দৃষ্টিতে আল্লাহর এবাদাতের ন্যায় পবিত্র।

সূরা তালাক ও অনুরূপ অন্যান্য সূরার বক্তব্যের তৃতীয় তাৎপর্য এই যে, এ দ্বারা ইসলামী বিধানের বাস্তবতা এবং মানুষ ও পার্থিব জীবনের প্রতি তার স্বভাবসুলভ আচরণ প্রমাণিত হয়। সেই সাথে এও প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মানবতাকে সহজাত যোগ্যতার উপর ভর করেই অত্যন্ত সম্মানজনক স্তরে পৌছিয়ে দিতে চায়। এ জন্যে বিবেকনির্ভর এই বিষয়টি সম্পর্কে সে শুধু আইন জারি করেই ক্ষান্ত হয় না। শুধু উপদেশ দেয়াকেও যথেষ্ট মনে করে না; বরং মানব সত্ত্বার ও জীবনের বাস্তবতার মোকাবেলায় সে এই দুটিকেই কাজে লাগায়।

দাম্পত্য সম্পর্কের মূল কথা হলো স্থিতি ও স্থায়িত্ব। ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্কের স্থিতি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে পারে এমন সব ক'টি উপকরণ সরবরাহ করে, আর এ উদ্দেশ্যেই সে বিয়ে ও দাম্পত্য সম্পর্ককে এবাদাতের মর্যাদা দেয়। যে নর নারী দারিদ্রের কারণে বিয়ে করতে পারে না, তাদের সে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সাহায্য করে। দাম্পত্য প্রেম প্রণয় যাতে স্থায়ী হয় এবং পথেঘাটে ও বাজারে রূপের প্রদর্শনী করার দিকে মন যাতে আকৃষ্ট না হয়, সে জন্যে বিপথগামিতা ও উচ্ছৃংখল আচরণ প্রতিরোধকারী বিধিনিষেধ (পর্দার বিধান) আরোপ করে। একই উদ্দেশ্যে সে ব্যভিচার ও ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের বিরুদ্ধে দন্ডবিধি জারি করে। কোনো গৃহে বহিরাগতের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ ও গৃহের অভ্যন্তরেও পরিবারের সদস্যদের একে অপরের শয়নকক্ষে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে গৃহকে নিরাপদ, পবিত্র ও কলুষমুক্ত করে।

সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ককে সুশৃংখল বানায় এবং গৃহ ব্যবস্থাপনা দম্পতির যে সদস্য অধিকতর যোগ্য ব্যবস্থাপক তার নিয়ন্ত্রণে সোপর্দ করে, যাতে তা অরাজকতা, উচ্ছৃংখলতা ও বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে রক্ষা পায়। আবেগ

www.pathagar.com

উদ্দীপক উপদেশ প্রদান ও আল্লাহভীতির চেতনা সৃষ্টি ছাড়াও আরো যতো রকম নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব, তা প্রদান করে ইসলাম পরিবারকে সর্বপ্রকার দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে।

কিন্তু মানব জীবনের বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, সকল রকমের নিশ্চয়তা ও উপদেশাবলী সত্তেও কখনো কখনো এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকে, যা দাম্পত্য সম্পর্কের ধ্বংস ও বিনাশ অনিবার্য করে তোলে। এ ধরনের পরিস্থিতি বাস্তবানুগভাবে মোকাবেলা না করে উপায় থাকে না। এ ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হয় এবং তা অস্বীকার করে কোনো লাভ হয় না। কেননা, দাম্পত্য জীবন যাপন তখন একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা বৃথা ও ভিত্তিহীন হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলাম কখনো পবিত্র দাম্পত্য সম্পর্ককে নিয়ে এতো ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে না যে, প্রথম সুযোগেই এবং দাম্পত্য কলহের প্রথম ধাক্কাতেই তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। সে বরঞ্চ এ সম্পর্ককে মযবুত করে এবং সর্বাত্মক চেষ্টার পর নিরাশ হওয়া ছাড়া তাকে ধ্বংস হতে দেয় না।

ইসলাম পুরুষকে আহবান জানায়, 'স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো। তাদের যদি তোমাদের অপছন্দ হয়, তবে হয়তো এমন কোনো কোনো জিনিস তোমরা অপছন্দ করছো, যাতে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্যে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন।' এভাবে ইসলাম চরম অপ্রীতিকর অবস্থায়ও ধৈর্য সহনশীলতার পথে পুরুষদের পরিচালিত করে এবং অপছন্দনীয় নারীর মধ্যেও কল্যাণের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রাখে। বস্তুত অপছন্দনীয় স্ত্রীদের মধ্যেও যে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের জন্যে কোনো কল্যাণ রাখেননি, সে কথা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না। আর তা যখন কেউ বলতে পারে না, তখন কল্যাণকে হারানো কিভাবে সমীচীন হতে পারে? অপছন্দের মনোভাব পরিবর্তন করা, তার কুফল প্রতিরোধ করা এবং ভালোবাসা ও অনুরাগ পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে এর চেয়ে অলংকার সমৃদ্ধ ভাষা আর হতে পারে না। যা হোক, পরিস্থিতির যদি এতোদূর অবনতি ঘটে যে, পছন্দ অপছন্দের স্তর পেরিয়ে বিদ্রোহ ও ঘৃণার পর্যায়ে উপনীত হয়, তাহলেও ইসলাম প্রথম চোটেই তালাকের দিকে ধাবিত হয় না। সে বরঞ্চ তৃতীয় পক্ষের শুভাকাংখীদের মাধ্যমে আপোষ মীমাংসার একটা সুযোগ রাখা অপরিহার্য মনে করে। সূরা নেসায় বলা হয়েছে, 'তাদের মধ্যে তোমরা যদি অ-বনিবনার আশংকা করো, তাহলে স্বামী এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন করে সালিস পাঠাও। তারা দুজনে যদি সংশোধন কামনা করে, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের মধ্যে বনিবনা সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা তো সর্ববিষয়ে জ্ঞানী ও অবগত।' ....আর কোনো স্ত্রীলোক যদি নিজের স্বামীর পক্ষ থেকে উপেক্ষার আশংকা করে, তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করিয়ে নিলেও মন্দ হয় না। আপোষই সর্বোত্তম।'

কিন্তু এই মধ্যস্থতার সুযোগ যদি না পাওয়া যায়, তাহলে ব্যাপারটি গুরুতর হতে বাধ্য। সে ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। কেননা,

www.pathagar.com

জোর-জবরদস্তিতে ব্যর্থতা আরো প্রকট আকার ধারণ করবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের কাছে অপছন্দনীয় হওয়া সত্তেও বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটানো বিজ্ঞতার পরিচায়ক। মনে রাখতে হবে যে, তালাক আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত হালাল বস্তু।

অতপর যদি স্বামী তালাক দেয়ার সিদ্ধান্তই নেয়, তাহলেও যখন ইচ্ছা তখন তালাক দেয়া যায় না। ইসলামী রীতি এই যে, তালাক দিতে হবে এমন অবস্থায়, যখন স্ত্রী ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করেছে, কিন্তু পবিত্রতার এই মেয়াদে এখনো স্বামীর সাথে সহবাস সংঘটিত হয়নি। এই মেয়াদটিতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয় যে, ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়ে যাবে। এমনকি উভয়ের মন পাল্টেও যেতে পারে এবং আল্লাহ তায়ালা উভয় বিবাদীকে আপোষ রফায় উদ্বুদ্ধ করে দিতেও পারেন। ফলে, তালাক হয়তো আর সংঘটিতই হবে না।

আর যদি তালাক সংঘটিত হয়েও যায়, তবে এর পরই আসে ইদ্দতের মেয়াদ। ইদ্দত হচ্ছে ঋতুবতী ও সন্তান ধারণে সক্ষম মহিলার জন্যে তিনটি পবিত্রাবস্থা, আর এখনো রজস্রাব হয়নি এমন অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের জন্যে এবং আর কখনো সন্তান হবে না এমন মহিলার জন্যে তিন মাস। আর গর্ভবতীদের জন্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত। এই ইদ্দকালে যদি ভালোবাসার আবেগ পুনরুত্থিত হয়, তবে তালাকের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করারও অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহালের ইচ্ছা জাগ্রত হতে পারে।

কিন্তু এতো সব ব্যবস্থা সত্তেও বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া অনিবার্য হয়ে দেখা দিতে পারে, যার মোকাবেলায় ইসলামকে বাস্তবানুগ কর্মপন্থা অবলম্বন করা জরুরী হয়ে পড়তে পারে এবং সে জন্যে তাকে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে হতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতির জন্যেই তালাকের বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়েছে, যা এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম জীবন সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত বাস্তবানুগ। সেই সাথে সে মানুষকে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যেতে উচ্চতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষলাভে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে।

এই সূরার সামগ্রিক বক্তব্য– যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উদ্বুদ্ধকরণ, সতর্কীকরণ, খুঁটিনাটি বিধি ও মন্তব্য ইত্যাদি। এ সবের চতুর্থ তাৎপর্য এই যে, এগুলো মুসলমানদের সমাজে উদ্ভূত সেসব পরিস্থিতির মোকাবেলা করে, যা ছিলো জাহেলিয়াতের গ্লানিময় উত্তরাধিকার। নারীরা যে দুর্দশা ও বিকৃতির শিকার ছিলো, তার প্রতিকারের জন্যে এতো সব খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত বিধি দেয়া হয়েছিলো, যার ফলে নারীদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার, দাম্পত্য জীবনে কোনো অরাজকতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও নরনারীর সম্পর্কের ব্যাপারে আর কোনো পশ্চাদমুখী ধ্যানধারণার অবকাশ থাকেনি। (তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন, ৪র্থ ও ২১শ পারা দ্রষ্টব্য)।

এ পরিস্থিতি শুধু আরব উপদ্বীপেই বিরাজ করতো না। তৎকালীন গোটা বিশ্বেরই অবস্থা ছিলো এরূপ। পৃথিবীর সকল অঞ্চলে তখন নারীর অবস্থা ছিলো ক্রীতদাসীর

www.pathagar.com

মতো বা তার চেয়েও খারাপ। উপরন্তু নরনারীর যৌন সম্পর্ককে একটা নোংরামি হিসাবে দেখা হতো এবং নারীকে দেখা হতো এই নোংরামির প্ররোচনাদানকারী শয়তানরূপে।

বিশ্বব্যাপী এই শোচনীয় মানবেতর অবস্থা থেকে নারীকে ও দাম্পত্য সম্পর্ককে মুক্ত করে ইসলাম সেই অত্যুচ্চ মানে উন্নীত করেছিলো, যার বর্ণনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। নারীকে সে এমন সম্মান মর্যাদা, নিরাপত্তা ও অধিকার দান করেছিলো, যা তার কপালে ইতিপূর্বে আর কখনো জোটেনি। এখন নারী শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে কেউ মাটিতে জ্যান্ত পুঁতে ফেলে না, কেউ তার দিক থেকে অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নেয় না। এখন তাকে কেউ তার বিনা অনুমতিতে বিয়ে করতে চায় না, চাই সে কুমারী কিংবা অকুমারী যা-ই হোক না কেন। এখন গৃহবধূ হলে সে আইনসংগত অধিকারের চেয়েও অনেক বেশী অধিকার ও মর্যাদাসম্পন্ন। আর তালাকপ্রাপ্তা হলেও তার অনেক অধিকার, যার বিবরণ এই সূরায়, সূরা বাকারায় এবং অন্যান্য সূরায় রয়েছে।

ইসলাম নারীর অধিকার নিশ্চিত করার জন্যে এতো সব আইন রচনা এজন্যে করেনি যে, আরব দেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নারীরা তাদের মানবেতর অবস্থা উপলব্ধি করে বিক্ষুব্ধ ছিলো অথবা নারীদের এই পরিস্থিতি দেখে পুরুষরা অসন্তুষ্ট ছিলো, কিংবা নারী অধিকার সংরক্ষণের জন্যে কোনো আন্তআরব বা আন্তর্জাতিক নারী সংস্থা সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো। কিংবা নারীরা কোনো পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলো, বা নারীদের পরিস্থিতি উন্নয়নে কোনো আন্দোলন শুরু হয়েছিলো। এটা ছিলো পৃথিবীবাসীর জন্যে আল্লাহর দেয়া অযাচিত বিধান ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ন্যায়বিচার। এটা ছিলো আল্লাহর এই ইচ্ছার প্রতিফলন যে, মানুষের জীবন বিরাজমান মানবেতর অবস্থা থেকে উন্নীত হোক, দাম্পত্য সম্পর্ক জাহেলী যুগের নোংরামি থেকে পবিত্র হোক, একই মানবসত্ত্বা থেকে উদ্ভূত দম্পতি মানবসুলভ মর্যাদা ও অধিকার অর্জন করুক।

কারণ এ হচ্ছে আল্লাহর মহান ও মহিমান্বিত দ্বীন। এ দ্বীনকে কেবল সে ব্যক্তিই অগ্রাহ্য করতে পারে, যার বিবেক বিকৃত ও বিনষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে মানব রচিত বিধান কেবল সে ব্যক্তিই গ্রহণ করতে পারে, যে দুনিয়ার সত্য আপন কু-প্রবৃত্তির গোলামী করে।

এই প্রাসংগিক আলোচনা যা ইসলামী সমাজ গঠনের বিষয় থেকে অনেক বেশী দূরে অবস্থান করে না— এখানেই শেষ হচ্ছে। অতপর সূরায় আলোচিত বিধিসমূহ নিয়ে আমরা একে একে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। সূরায় আলোচিত বিধিসমূহ আমাদের আলোচিত সংক্ষিপ্তসার থেকে ভিন্ন। এগুলো জীবন্ত, চলন্ত, উদ্দীপনাময় ও প্রেরণাময় বিষয়। এ সব বিধান ফেকাহর গ্রন্থাবলীতে অধ্যয়ন করা ও কোরআনে অধ্যয়ন করার মূল পার্থক্য এখানেই নিহিত।

সূরা আত তাহরীম

আল্লাহ তায়ালা যখন ইসলামকে সমগ্র মানব জাতির সর্বশেষ ও বিজয়ী জীবন ব্যবস্থা হিসাবে চালু করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন একে তিনি পূর্ণাংগ ও সর্বব্যাপী জীবন ব্যবস্থায় পরিণত করলেন, তাকে মানুষের যাবতীয় শক্তি, ক্ষমতা, যোগ্যতা ও প্রতিভার পরিপূরক বানালেন এবং সেই সাথে পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফার জন্যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

ও সর্বাধিক সম্মানিত সৃষ্টির জন্যে যে ধরনের, যে পর্যায়ের ও যে মানের যোগ্যতা এবং প্রতিভা আবশ্যক, সেই ধরনের যোগ্যতা ও প্রতিভা মানুষকে দান করলেন।

শুধু তাই নয়, ইসলামকে তিনি স্বাভাবিকভাবে জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা দান করলেন, তাকে একই সাথে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও উচ্চতা দান করলেন। কোনো গঠনমূলক শক্তিকে তিনি নিষ্ক্রিয় করেননি এবং কোনো কার্যকর যোগ্যতাকে তিনি দমন করেননি। তিনি বরঞ্চ সকল শক্তি ও ক্ষমতাকে সক্রিয় করেছেন এবং সকল সুপ্ত যোগ্যতা ও প্রতিভাকে জাগ্রত করেছেন। সেই সাথে সামনে এগিয়ে যাওয়া ও উর্ধ্বে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতার মাঝে সমন্বয় সাধন ও ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। আর এ কাজ এমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন, যাতে পার্থিব জীবনে অবস্থান করেই আত্মা আখেরাতের সুখ সম্ভোগের যোগ্যতা অর্জন করে এবং নশ্বর পৃথিবীতে বসেই পারলৌকিক জগতের অবিনশ্বর জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর নাযিল করা জীবন ব্যবস্থাকে এরূপ বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত করার ফয়সালা করলেন, তখন তিনি নিজের রসূল হিসাবেও এমন একজন মানুষকে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিলেন যিনি এই জীবন ব্যবস্থার যাবতীয় গুণ বৈশিষ্টের অধিকারী ও মূর্ত প্রতীক। যাঁর মধ্যে সকল মানবীয় ক্ষমতা ও প্রতিভা পূর্ণতা লাভ করেছে, যাঁর শারীরিক গঠন সুদৃঢ় ও নিখুঁত, যাঁর চেতনা সদা জাগ্রত, যাঁর অনুর্ভূতি নির্ভুল এবং যিনি সকল অনুভবযোগ্য জিনিসকে সুষ্ঠুভাবে ও পূর্ণাংগভাবে অনুভব করেন। একই সাথে যিনি প্রগাঢ় দয়া, সহানুভূতি, স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসার অধিকারী, যিনি অত্যন্ত জীবন্ত ও সরস মেযাজের অধিকারী, তীব্র সংবেদনশীল, সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন, উদার ও দৃঢ়চেতা, যিনি আপন প্রবৃত্তির গোলামী করার পরিবর্তে প্রবৃত্তির ওপর প্রভুত্ব করেন, তাকে বশে রাখেন। সর্বোপরি যিনি এমন একজন নবী, যাঁর অন্তরাত্মা মহাজাগতিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, যাঁর হৃদয় মেরাজের শক্তিতে শক্তিমান, আকাশ থেকে যাঁকে সম্বোধন করা হয়, যিনি মহান আল্লাহর জ্যোতি দেখতে পান এবং বাহ্যিক আকৃতিসমূহের আড়াল থেকে যাঁর স্বভাব বিশ্ব চরাচরের অন্যান্য বস্তুর স্বভাবের সাথে একাকার হয়ে যায়, ফলে পাথরও তাঁকে সালাম করে, খেজুরের মৃত ডালও তাঁর কাছে কাঁদে এবং তাঁর পায়ের তলে পড়ে ওহুদ পর্বতও কাঁপে। অতপর তাঁর সত্ত্বায় এই সকল শক্তি ভারসাম্যপূর্ণভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে তার সত্ত্বা ঠিক সেই আদর্শের ন্যায় ভাবসাম্যপূর্ণ হয়ে যায়, যে আদর্শ তাঁর জন্যে মনোনীত করা হয়েছে।

অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই রসূলের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে তাঁর উম্মত এবং সমগ্র মানব জাতির জন্যে একটা উন্মুক্ত গ্রন্থে পরিণত করেছেন। এই উন্মুক্ত গ্রন্থে উক্ত আদর্শের আকৃতি ও তার বাস্তব প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। তাই রসূলের জীবনে তিনি কোনো গুপ্ত রহস্য লুকায়িত রাখেননি; বরং তার বিভিন্ন দিক

www.pathagar.com

তিনি কোরআনে তুলে ধরেন। সাধারণ মানুষের জীবনে যেসব জিনিস সচরাচর পরস্পর থেকে লুকিয়ে রাখা হয়, তাও প্রকাশ করে দেন। এমনকি মানবীয় দুর্বলতার সেই দিকগুলোও আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করে দেন, যা নিয়ে অন্য মানুষ ঘাঁটাঘাঁটি করার কোনোই প্রয়োজন বোধ করে না। তথাপি আল্লাহর রসূলের জীবনের এসব দিক জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার ইচ্ছাটাই যেন পরিলক্ষিত হয় কোরআনের বিভিন্ন সূরায়।

আসলে রসূলের ব্যক্তিত্বে কোনো গোপনীয় জিনিসই নেই। তাঁর গোটা জীবন, গোটা সত্ত্বা, গোটা ব্যক্তিত্বই তো ইসলামের দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্যে। সুতরাং তাঁর জীবনের একটা দিক তিনি কেনই বা লুকিয়ে রাখবেন, আর কেনই বা তা লুকিয়ে থাকবে? রসূলের জীবন হচ্ছে ইসলামী আকীদা ও আদর্শ বাস্তবায়নের নিকটতম দৃশ্যমান ক্ষেত্র। তিনি পৃথিবীতে এসেছেনই এজন্যে যে, নিজের সত্ত্বায় ও জীবনে এই আদর্শ প্রয়োগ করে দেখিয়ে দেবেন, যেমন তিনি নিজের কথা ও নির্দেশাবলীর মাধ্যমে তা প্রচার করে থাকেন। এটাই ছিলো রসূলের আগমন ও আবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

রসূল (স.)-এর সাহাবীদের আল্লাহ তায়ালা এজন্যে উত্তম পুরস্কার দান করেন যে, তাঁরা রসূলের জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি ঘটনাবলী শুধু সংরক্ষণই করেননি; বরং অনাগতকালের মানব জাতির কাছেও তা পৌছিয়ে দিয়েছেন ও হস্তান্তর করেছেন। ফলে রসূল (স.)-এর দৈনন্দিন জীবনের ছোট-বড় কোনো ঘটনাই লিপিবদ্ধ হওয়া ও হস্তান্তরিত হওয়া থেকে বাদ পড়েনি। রসূল (স.)-এর জীবন বা রসূলের জীবনে ইসলামী আদর্শের সকল খুঁটিনাটির বাস্তবায়ন এভাবে লিপিবদ্ধ করা আল্লাহর গৃহীত সিদ্ধান্তেরই একটা অংশ ছিলো। তাই বলা যায়, কোরআনে ও হাদীসে রসূলের জীবনের যতোটুকু লিপিবদ্ধ হয়েছে তা সার্বিকভাবে সমগ্র মানব জাতির জন্যে এক অনন্য ও চিরস্থায়ী সম্পদ। এ সম্পদ কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে।

আলোচ্য সূরার শুরুতে রসূল (স.)-এর ঘরোয়া জীবনের একটি অংশ তাঁর মহান সহধর্মিণীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের সাথে স্বয়ং রসূল (স.)-এর পারস্পরিক সম্পর্কের কিছু উত্তেজনাপূর্ণ দিক এবং রসূলের ও মুসলিম জাতির জীবনে এসব উত্তেজনার প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। অধিকন্তু রসূল (স.)-এর ঘরোয়া জীবনে ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর আলোকে মুলসলিম জাতিকে প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশাবলীতেও তার যে প্রতিফলন ঘটেছে, তাও এই সূরায় আলোচিত হয়েছে।

এই সূরায় যে ঘটনাবলীর প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে, তার সঠিক সময়কাল নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে এ সংক্রান্ত রেওয়ায়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে অন্তত এটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এসব ঘটনা ঘটেছে যয়নব বিনতে জাহশের সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ে হওয়ার পর।

এই প্রসংগে রসূল (স.)-এর স্ত্রীদের ঘটনাবলী ও তাঁর ঘরোয়া জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে তা এই সূরায় বর্ণিত উক্ত ঘটনাবলী সংক্রান্ত উক্তিসমূহ উপলব্ধি

www.pathagar.com

করতে সহায়ক হবে। এই সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরার ব্যাপারে আমি ইমাম ইবনে হাযমের গ্রন্থ 'জাওয়ামেউস্ সীরাহ' ও ইবনে হেশাম প্রণীত সীরাত সংক্রান্ত গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছি। তবে উদ্ধৃতির মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যও করেছি।

রসূল (স.)-এর প্রথমা স্ত্রী হচ্ছেন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলেদ (রাঃ)। তাঁর সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ে হয় রসূলের বয়স যখন ২৫ (মতান্তরে ২৩ বছর)। খাদীজার বয়স তখন ৪০ বছর বা তারও বেশী। তিনি হিজরতের তিন বছর আগে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জীবদ্দশায় রসূল (স.) আর কাউকে বিয়ে করেননি। মৃত্যুকালে খাদীজার বয়স ৫০ ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

খাদীজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর রসূল (স.) সওদা বিনতে যামআকে বিয়ে করেন। তিনি তেমন রূপবতীও ছিলেন না, বয়সেও যুবতী ছিলেন না। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী ও সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম সাকরাত বিন আমরের স্ত্রী ছিলেন এবং স্বামীর ইন্তেকালের পর বিধবা অবস্থায় তাঁর সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ে হয়।

এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কন্যা আয়েশাকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্কা। তাই হিজরতের পরে ছাড়া তাঁর সাথে রসূল (স.) দাম্পত্য জীবন শুরু করেননি। রসূলের স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র কুমারী এবং অন্য সকল স্ত্রী অপেক্ষা তাঁকেই তিনি বেশী ভালোবাসতেন। বর্ণিত আছে যে, বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিলো ৯ বছর এবং রসূল (স.)-এর সাথে তিনি দাম্পত্য জীবন কাটান ৯ বছর ৫ মাস। এরপর রসূল (স.) ইন্তেকাল করেন।

এরপর রসূল (স.) বিয়ে করেন হযরত ওমরের কন্যা হাফসাকে। তিনি কুমারী ছিলেন না। হযরত ওমর প্রথমে তাকে আবু বকর ও পরে ওসমানের সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা উভয়ে অসম্মতি জানান। এ সময় রসূল (স.) ওমরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর মেয়ের জন্যে তিনি আবু বকর ও ওসমানের চেয়েও উত্তম বর জুটিয়ে দেবেন। অতপর তিনি নিজেই তাকে বিয়ে করেন।

এরপর তিনি বিয়ে করেন যয়নব বিনতে খোযায়মাকে। তার প্রথম স্বামী হারেস বিন আবদুল মোত্তালেবের পুত্র ওবায়দা বদর যুদ্ধে নিহত হয়। তিনি রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় মারা যান। কারো কারো মতে, রসূল (স.)-এর পূর্বে তাঁর স্বামী ছিলেন আবদুল্লাহ বিন জাহশ আল আসাদ– যিনি ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। সম্ভবত এটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য।

ওহুদ যুদ্ধে আহত ও পরে সে কারণে শাহাদাত বরণকারী আবু সালামার বিধবা স্ত্রী উম্মে সালামাকেও রসূল (স.) বিয়ে করেন। তিনি আবু সালামার পরিত্যক্ত সন্তানদেরও নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

আপন ফুফাতো বোন পরমা সুন্দরী যয়নব বিনতে জাহশকেও রসূল (স.) বিয়ে করেন। ইতিপূর্বে তিনি তাকে নিজের মুক্ত গোলাম ও পালক পুত্র যায়দ বিন হারেসার

www.pathagar.com

সাথে বিয়ে দেন। কিন্তু তাদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় যায়দ তাকে তালাক দেন। ২২তম পারায় সূরা আহযাবে আমি তার ঘটনা বর্ণনা করেছি। এই মহিলা রসূল (স.)-এর নিকটাত্মীয় ও পরমা সুন্দরী ছিলেন বিধায় হযরত আয়েশা তাঁকে নিজের কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন।

অতপর তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ সালের মাঝামাঝির দিকে বনুল মোস্তালেক যুদ্ধের পর পরাজিত ইহুদী গোত্র বনুল মোস্তালেকের সরদার হারেসের কন্যা জুয়ায়রিয়াকে বিয়ে করেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুসারে হযরত আয়েশা বলেন, রসূল (স.) যখন বনুল মোস্তালেকের যুদ্ধবন্দীদের সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করেন, তখন জুয়ায়রিয়া সাবেত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাস অথবা তার এক চাচাতো ভাইয়ের ভাগে পড়েন। জুয়ায়রিয়া তার মনিবের কাছ থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে নিজের মুক্তির পক্ষে সম্মতি আদায় করেন। রূপে গুণে অসাধারণ এই মহিলাকে যেই দেখতো, সেই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে যেতো। তিনি নিজের মুক্তির জন্যে মুক্তিপণ সংগ্রহে সাহায্য চাইতে রসূল (স.)-এর কাছে আসেন। হযরত আয়েশা বলেন, এই মহিলাকে আমার ঘরের দরজার ওপর দাঁড়ানো দেখামাত্রই আমি তাকে অবাঞ্ছিত মনে করেছিলাম। ভেবেছিলাম, তার মধ্যে যে চিত্তাকর্ষক রূপ-গুণ আমি দেখছি, রসূল (স.)-ও তা দেখবেন। যা হোক, মহিলা রসূল (স.)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আমি গোত্রপতি হারেস বিন আবী সেরারের কন্যা। আমি কী বিপদে আছি তা আপনার অজানা নয়। আমি তো সাবেত বিন কায়সের ভাগে পড়েছিলাম। কিন্তু তাকে আমি মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দিতে সম্মত করেছি। এই মুক্তিপণ সংগ্রহে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। রসূল (স.) বললেন, এর চেয়ে উত্তম কোনো প্রস্তাবে তুমি কি আগ্রহী? তিনি বললেন, সেটি কী? রসূল (স.) বললেন, আমি তোমার মুক্তিপণ দিয়ে দেবো এবং তোমাকে বিয়ে করবো। জুয়ায়রিয়া বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আমি রাযি। রসূল (স.) বললেন, মুক্তিপণ আমি দিয়ে দিয়েছি।

এরপর হোদায়বিয়ার সন্ধির পর রসূল (স.) আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবাকে বিয়ে করেন। তিনি মুসলমান হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। সেখানে তার স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে যায় ও তাকে ত্যাগ করে। রসূল (স.) তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে তাঁকে মোহরানা দিয়ে দেন। অতপর তিনি সেখান থেকে মদীনায় চলে আসেন।

খায়বর বিজয়ের পর তিনি বিয়ে করেন বনু নযীরের সরদার হুওয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সুফিয়াকে। তিনি ছিলেন কেনানা ইবনে আবিল হাকীকের স্ত্রী। এই ব্যক্তিও বিশিষ্ট ইহুদী নেতা ছিলো। এই মহিলার সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ের পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে ইসহাক বলেন, সুফিয়া ও অপর এক যুদ্ধবন্দিনীকে রসূল (স.)-এর কাছে আনা হয়। তারা উভয়ে যখন নিহত একদল লাশের কাছে যাচ্ছিলো তখন সফিয়ার সহযাত্রী মহিলাটি মাথায় ধুলো ছিটিয়ে মুখ চাপড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদা শুরু

www.pathagar.com

করলো। তা দেখে রসূল (স.) বললেন, 'তোমরা এই শয়তান মহিলাটিকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। আর সফিয়াকে তার পেছনে রাখতে বললেন এবং তার গায়ের ওপর নিজের চাদর রাখলেন। তা দেখে সাহাবীরা বুঝতে পারলেন, রসূল (স.) সফিয়াকে নিজের জন্যে পছন্দ করেছেন। উক্ত ইহুদী মেয়েটিকে দেখে রসূল (স.) বেলালকে বললেন, হে বেলাল! এই দুই মহিলার সাথে তুমি যখন তাদের গোত্রের নিহত লোকদের লাশের স্তূপ দেখছিলে, তখন কি তোমার ভেতর থেকে দয়ামায়া ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো?

এরপর তিনি বিয়ে করেন মায়মুনা বিনতুল হারেসকে। তিনি খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের খালা। রসূল (স.)-এর পূর্বে তার স্বামী ছিলো আবু রুহম বিন আবদুল উয্যা। এই মহিলাই রসূল (স.)-এর সর্বশেষ স্ত্রী।

এভাবে দেখা যায় যে, প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ের পেছনে একটা সুনির্দিষ্ট ঘটনা ও কারণ ছিলো। যয়নব বিনতে জাহশ ও জুয়ায়রিয়া বিনতুল হারেস ব্যতীত অন্য স্ত্রীরা বয়সে যুবতীও ছিলেন না কিংবা তেমন আকর্ষণীয় রূপবতীও ছিলেন না। হযরত আয়েশা (রা.) রসূল (স.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছাড়া যে দু'জন স্ত্রী যুবতী ও রূপবতী ছিলেন (যয়নব ও জুয়ায়রিয়া), তাদের নিজেদের পেছনে অন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ সক্রিয় ছিলো। অবশ্য তাদের দু'জনের মধ্যে যে চিত্তাকর্ষক উপাদানটি ছিলো তা আমি অস্বীকার করছি না। এ ধরনের মানবীয় উপাদানগুলো রসূল (স.)-এর জীবনে যে থাকতে পারে সে কথা অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। এ সব উপাদান কোনো দূষণীয় জিনিস নয় যে, রসূল (স.)-এর জীবনে তার উপস্থিতির কথা অস্বীকার করে রসূলের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হবে, আর রসূলের দুশমনদের জন্যে তার উপস্থিতির অভিযোগ তোলা আনন্দদায়ক হবে। রসূল (স.)-কে তো মানুষ হিসাবেই মনোনীত করা হয়েছে। তবে উচ্চতর ও মহত্তর মানুষ হিসাবে। বস্তুত তিনি আসলেই উচ্চতর ও মহত্তর মানুষ ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে যাবতীয় মানবীয় ভাবাবেগ মাত্রাভেদে বিদ্যমান ছিলো।

নিজ গৃহে নিজ স্ত্রীদের সাথে তিনি রসূল ও মানুষ হিসাবেই জীবন যাপন করেছেন। এভাবেই তিনি সৃজিত হয়েছেন এবং তাঁকে অকুণ্ঠভাবে একথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, 'আমার প্রতিপালক মহা পবিত্র। আমি একজন মানুষ ও রসূল ছাড়া তো আর কিছু নই।'

স্ত্রীদের কাছ থেকে তিনি আনন্দ উপভোগ করতেন এবং তাদেরও আনন্দ দিতেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসূল (স.) যখন তাঁর স্ত্রীদের কাছে একান্তে মিলিত হতেন, তখন তিনি হতেন সবচেয়ে কোমল, বিনয় ও উদার মানুষ, তিনি থাকতেন সদা হাসিমুখ। তবে তিনি যে তাদের আনন্দ দিতেন এবং আনন্দ পেতেন, সেটা ছিলো নেহায়েতই তাঁর হৃদয় থেকে উদ্ভূত, তাঁর সুন্দর স্বভাব ও সদাচারজনিত এবং তাঁর উদার সদয় ও মহৎ আচরণই ছিলো তার উৎস। তাঁদের বৈষয়িক জীবনে কিন্তু ভোগবিলাসের চিহ্নমাত্র ছিলো না; বরং তা ছিলো অনেকাংশে নিছক মৌলিক প্রয়োজন

www.pathagar.com

পূরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমনকি যখন বিজয়ের পর বিজয় অর্জিত হতে থাকে এবং মুসলমানরা 'গনীমত' (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) এবং 'ফায়' (বিনা যুদ্ধে বিজিত অঞ্চলে অধিকৃত সহায় সম্পদ) দ্বারা বিপুলভাবে সমৃদ্ধশালী হয়, তখনো এরূপ অবস্থা অব্যাহত ছিলো। ইতিপূর্বে সূরা আহযাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলের স্ত্রীরা তাঁর কাছে সংসারের ব্যয়নির্বাহে আরো একটু প্রশস্ততা ও সচ্ছলতার আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু এই আবেদনের ফলে তারা এক অভাবনীয় সংকটে পড়েছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের দুটো জিনিসের মধ্য থেকে যে কোনো একটি গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। একদিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল ও আখেরাতের সুখ, অপরদিকে পার্থিব ভোগের উপকরণ ও রসূলের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হওয়া, কিন্তু রসূলের সহধর্মিণীরা আল্লাহ তায়ালা, রসূল ও আখেরাতকেই গ্রহণ করে নেন।

তবে রসূল (স.)-এর পরিবারের সেই নবুয়ত-প্রভাবিত পরিবেশে জীবন যাপনের উদ্দেশ্য এটা ছিলো না যে, তাঁর অথবা তাঁর স্ত্রীদের মন থেকে যাবতীয় মানবীয় আবেগ-অনুভূতির বিলোপ সাধন করতে হবে। বস্তুত এরূপ পরিস্থিতিতে কোনো পরিবারের স্ত্রীদের মধ্যে যে ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব থাকা স্বাভাবিক, তা তাঁদের মধ্যেও ছিলো। ইতিপূর্বে হযরত আয়েশার এ বর্ণনা আমি উদ্ধৃত করেছি যে, জুয়ায়রিয়াকে দেখে তাঁর রূপগুণে রসূলুল্লাহ (স.) মুগ্ধ হয়ে যেতে পারেন এই আশংকায় আয়েশা দেখামাত্রই তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কার্যতও তার আশংকা সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। অনুরূপভাবে, আয়েশা সফিয়ার সাথে সম্পৃক্ত তার একটি ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বললাম, 'সফিয়ার যা অবস্থা!' 'অর্থাৎ তার বেঁটে আকৃতি সম্পর্কে টিপ্পনী কেটেছিলাম। রসূল (স.) বললেন, তুমি এমন একটা কথা বলেছো, 'যা সমুদ্রের বিশাল পানিরাশিতে মিশিয়ে দিলেও তা দূষিত হয়ে যাবে।' হযরত আয়েশা আরো বর্ণনা করেছেন, সূরা আহযাবের এ আয়াত যখন নাযিল হল, যাতে রসূলের স্ত্রীদের দুটি জিনিসের একটি গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে, তখন তিনি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে গ্রহণ করে নিলেন এবং রসূল (স.)-কে অনুরোধ করলেন যেন তিনি যা গ্রহণ করেছেন তার কথা অন্যান্য স্ত্রীকে না জানান। এই অনুরোধের উদ্দেশ্য কি তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। রসূল (স.) বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা আমাকে ধিক্কারদাতা হিসাবে পাঠাননি। আমাকে পাঠিয়েছেন সহজভাবে যাবতীয় শিক্ষা দেয়ার জন্যে। কোনো স্ত্রী যদি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কোন্‌টি গ্রহণ করেছো, তাহলে আমি তাকে এই খবরটি জানিয়ে দেবো।'

নিজের সম্পর্কে বর্ণিত হযরত আয়েশার এই বর্ণনাগুলো তাঁর অন্তর্নিহিত সত্যনিষ্ঠা ও ইসলামী শিক্ষার প্রেরণা থেকে উদ্ভূত। এগুলো অন্যান্য মহিলাদের জন্যেও দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং এরূপ আদর্শ পারিবারিক জীবনেও যে মানবিক পরিবেশ অনিবার্যভাবে বিরাজ করে তা ফুটিয়ে তোলে। এ বর্ণনাগুলো থেকে আরো জানা যায় যে, রসূল (স.)

www.pathagar.com

তাঁর উম্মতকে যেমন ইসলামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে রেসালাতের দায়িত্ব পালন করতেন, তিনি তাঁর পরিবারেও তদ্রূপ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে রেসালাতের দায়িত্ব পালন করতেন।

যে ঘটনা উপলক্ষে সূরা তাহরীমের প্রথমাংশ নাযিল হয়েছে, তা রসূল (স.) ও তাঁর স্ত্রীদের জীবনে সংঘটিত বহু সংখ্যক ঘটনার অন্যতম। এ ঘটনা সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে, আমি সূরার তাফসীরে যথাস্থানে তা উল্লেখ করবো।

এই ঘটনা উপলক্ষে এবং এতে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীদ্বয়কে যে তাওবার আহবান জানানো হয়েছে, সে উপলক্ষে এ সূরায় সাধারণভাবে তাওবা এবং পরিবার পরিজনকে ইসলামী প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দোযখ থেকে বাঁচানোর আহবান জানানো হয়েছে। অনুরূপভাবে দোযখে কাফেররা কিরূপ দুর্দশায় নিপতিত হবে, তারও একটি দৃশ্য এ সূরায় দেখানো হয়েছে। আর সূরার উপসংহার টানা হয়েছে হযরত নূহ ও হযরত লূতের স্ত্রীদ্বয়কে মুসলিম পরিবারের ভেতর কাফেরের দৃষ্টান্ত এবং ফেরাউনের স্ত্রীকে কাফের পরিবারে মোমেনের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে। অনুরূপভাবে সর্বশেষে উল্লেখ করা হয়েছে ইমরানের স্ত্রী মরিয়মের প্রসংগ– যিনি নিজের পবিত্রতা বজায় রেখেছিলেন, আল্লাহর আত্মা থেকে ফুৎকার লাভ করেছিলেন, আল্লাহর বাণী ও তাঁর গ্রন্থকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং যিনি আল্লাহর অনুগত ছিলেন।

প্রথম পাঁচটি আয়াত যথা 'হে নবী, কেন তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্যে নিজের ওপর হারাম করে নাও যা আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্যে হালাল করেছেন............' এর নাযিল হওয়ার কারণ প্রসংগে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে হযরত আয়েশা থেকে ইমাম বোখারী যে হাদীস বর্ণনা করেন তা নিম্নরূপ,

হযরত আয়শা বলেন, রসূল (স.) যয়নব বিনতে জাহশের গৃহে মধু পান করতেন এবং তার কাছে রাত্র যাপন করতেন। এ কারণে আমি ও হাফ্সা স্থির করলাম যে, আমাদের দু'জনের কারো কাছে যখনই রসূল (স.) আসবেন, অমনি তাঁকে বলা হবে, আপনি কি 'মাগাফীর' খেয়েছেন। আমি তো আপনার কাছ থেকে মাগাফীরের ঘ্রাণ পাচ্ছি (মাগাফীর সুস্বাদু অথচ দুর্গন্ধযুক্ত এক ধরনের খাদ্যদ্রব্য)। পরে রসূল (স.) তাদের একজনের কাছে এলে সেই স্ত্রী তাঁকে উক্তরূপ কথা বললেন। রসূল (স.) জবাব দিলেন, 'কই, না তো! মাগাফীর নয়, আমি যয়নব বিনতে জাহশের কাছে মধু খেতাম। তবে আর খাবো না। আমি শপথ করেছি, তুমি আর কাউকে এ কথা জানিও না।' এভাবে রসূল (স.) একটা হালাল জিনিসকে নিজের ওপর হারাম করে নিলেন।

মনে হয় রসূল (স.) যে স্ত্রীকে এ কথা বলেছিলেন, তিনি তাঁর সহযোগী অপর সতীনের কাছে কথাটা ফাঁস করে দিয়েছিলেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে বিষয়টা জানিয়ে দিলেন। অতপর রসূল (স.) তাঁর সেই স্ত্রীর কাছে ফিরে গেলেন এবং তিনি তার সতীনের কাছে যা যা বলেছেন, তা খানিকটা উল্লেখ করলেন। নিজের স্বভাবগত ভদ্রতার খাতিরে তিনি সব কথার উল্লেখ করলেন না। কেবল দুই সতীনের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরলেন, যাতে সে স্ত্রী বুঝতে পারেন যে, রসূলুল্লাহ সব

www.pathagar.com

কিছু জেনে ফেলেছেন। রসূল (স.)-এর মুখে তাদের দুই সতীনের গোপন সংলাপের বিষয়বস্তু শুনে স্ত্রী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে কে অবহিত করলো?' সম্ভবত তিনি ভেবেছেন অপর সতীনই তাঁকে অবহিত করেছেন। কিন্তু রসূল (স.) তাকে জবাব দিলেন, 'মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা আমাকে অবহিত করেছেন।' অর্থাৎ আমি সেই উৎস থেকে এ তথ্য জেনেছি, যে উৎস সব কিছুই জানেন। এ দ্বারা রসূল (স.) এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, যে স্ত্রীর সাথে রসূল (স.) কথা বলেছেন, শুধু সেই স্ত্রী নয়, বরং রসূল নিজেও তাদের গোপন সলাপরামর্শ ও পরবর্তী সংলাপের কথা পুরোপুরি জানেন।

এই ঘটনা ও এর মাধমে যে গোপন সলাপরামর্শের তথ্য উদঘাটিত হলো, তার ফল দাঁড়ালো এই যে, রসূল (স.) রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে কসম খেয়ে বললেন যে, এক মাসের মধ্যে কোনো স্ত্রীর কাছেও ঘেঁষবেন না। এই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রসূল (স.) তাঁর স্ত্রীদের সকলকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরপর এই পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। রসূল (স.)-এর ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং রসূল (স.) স্বীয় স্ত্রীদের কাছে ফিরে যান। তবে এ সম্পর্কে আরো বিশদ বিবরণ রয়েছে, যা বর্ণনা করার পূর্বে আমি এ সংক্রান্ত অপর হাদীসটির উল্লেখ করতে চাই।

হযরত আনাস (রা.) থেকে নাসাঈ বর্ণনা করেন, রসূল (স.)-এর একজন দাসী ছিলো, যার সাথে তিনি মাঝে মাঝে রাত্র যাপন করতেন। হযরত আয়েশা ও হাফ্সা তার বিরুদ্ধে রসূল (স.)-কে এতো ক্ষেপিয়ে তোলেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি উক্ত দাসীকে নিজের ওপর হারাম করে নেন। এ কারণেই নাযিল হয়, 'হে নবী, তুমি নিজের স্ত্রীদের খুশী করার জন্যে হালালকে হারাম করছো কেন?'

ইবনে জারীর ও ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রসূল (স.) হাফ্সার গৃহে স্বীয় পুত্র ইবরাহীমের মাতা মারিয়ার সাথে রাত্রি যাপন করেন। এতে হাফ্সা এতো রেগে যান যে, মারিয়াকে অপমান করতে উদ্যত হন। তখন রসূল (স.) হাফসাকে প্রতিশ্রুতি দেন ও শপথ করেন যে, তিনি মারিয়াকে পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু এ বিষয়টি কারো কাছে প্রকাশ না করার জন্যে হাফসাকে আদেশ দেন। কিন্তু হাফসা বিষয়টি আয়েশার কাছে ফাঁস করে দেন। এ বিষয়টি আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

উল্লিখিত হাদীস দুটি বর্ণিত উভয় ঘটনাই সত্য হয়ে থাকতে পারে। তবে সম্ভবত শেষোক্ত ঘটনাটাই আলোচ্য আয়াত কয়টির ভাষার সাথে অধিকতর সংগতিশীল। রসূল (স.)-এর এতো বেশী রেগে যাওয়া যে, তার পরিণামে স্ত্রীদের সকলকে একযোগে তালাক দিতে উদ্যত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত গড়াতে পারে, এর সাথে এই শেষোক্ত ঘটনাই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। নাযুকতা ও স্পর্শকাতরতার বিচারে এই ঘটনাই এতোটা গুরুতর রূপ ধারণ করার কথা। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনা অধিকতর নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত। বাস্তবে এটা সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয় এবং রসূল (স.)-এর পরিবারে বিদ্যমান জীবন মানের আলোকে এই ঘটনা এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করা বিচিত্র কিছু নয়। প্রকৃত ব্যাপার কী ছিলো, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

www.pathagar.com

এরপর আলোচনায় আসা যাক 'ঈলা' অর্থাৎ স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে রসূলের শপথ গ্রহণ প্রসংগে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আহমাদ যে হাদীস বর্ণনা করেন, তাতেই এ ঘটনার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ হাদীসে ইসলামী সমাজের একটি দিকের চিত্রও ফুটে ওঠে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.)-এর যে দুই স্ত্রী সম্পর্কে সূরা তাহরীমের এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো যে, 'তোমাদের উভয়ের অন্তর আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে তোমরা যদি তাওবা করো, তবে তো ভালোই হয়', সেই দুজন স্ত্রী কে কে, এ কথা আমি হযরত ওমরের কাছে জিজ্ঞেস করার জন্যে অনেক দিন যাবত ব্যাকুল ছিলাম এবং সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। অবশেষে একবার হযরত ওমর (রা.) হজ্জে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে হজ্জ আদায় করতে গেলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মোমেনীন, রসূল (স.)-এর সেই দু'জন স্ত্রী কে কে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেছেন যে, 'তোমাদের উভয়ের আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে তোমরা যদি তাওবা করো, তবে তো ভালোই হয়?' হযরত ওমর (রা.) বলেন, 'কী আশ্চর্য! হে ইবনে আব্বাস, (যুহরীর মতে, হযরত ওমর তাঁর এই প্রশ্ন অপছন্দ করেছিলেন, তবে তার কাছে কোনো তথ্য গোপন করেননি।) তারা হচ্ছে আয়েশা ও হাফসা।' এরপর হযরত ওমর পুরো ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, আমরা কোরায়শ বংশীয়রা নারীদের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতাম, কিন্তু আমরা যখন মদীনায় গেলাম, তখন সেখানে এমন এক সমাজ দেখলাম, যে সমাজে নারীর কর্তৃত্ব চলতো। আমাদের মহিলারাও তাদের কাছ থেকে স্বামীদের ওপর কর্তৃত্ব চালানো শিখতে লাগলো। আওয়ালীতে উমাইয়া ইবনে যায়দের পল্লীতে আমার বাড়ী ছিলো। একদিন আমি আমার স্ত্রীর ওপর রেগে গেলাম। সে আমার সাথে তর্ক করতে লাগলো। আমি তার এরূপ তর্ক করায় খুবই বিরক্তি প্রকাশ করলাম। সে বললো, তর্ক করায় তুমি বিরক্ত হচ্ছো কেন? রসূল (স)-এর স্ত্রীরাও তাঁর সাথে তর্ক করে থাকে এবং তাদের কেউ কেউ তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সাথে কথা বলে না। অতপর আমি হাফসার কাছে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে তর্ক করো এবং তোমাদের কেউ কি তাঁর সাথে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কথা বন্ধ করে থাকে? সে বললো, হাঁ। আমি বললাম, এরূপ যে করে সে ধ্বংস হবেই। তোমাদের কেউ কি ভাবেও না যে, আল্লাহর রসূল যার ওপর রাগান্বিত হন, তার ওপর আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রাগান্বিত হতে পারেন এবং সে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে? খবরদার, রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে তর্ক করবে না, তাঁর কাছে কিছুই চাইবে না, আমার ধন-সম্পদ যা কিছু আছে তা থেকে তোমার যা মনে চায় চেয়ে নিয়ো। তোমার সতিন যদি তোমার চেয়ে বেশী সুন্দরী এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে বেশী প্রিয় হয়ে থাকে, (হযরত আয়েশার দিকে ইংগিত করে) তবে সে জন্যে মনোক্ষুণ্ন হয়ো না।

www.pathagar.com

আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী ছিলো। সেই প্রতিবেশী ও আমি পালাক্রমে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে যেতাম। একদিন সে যেতো, একদিন আমি যেতাম এবং যেদিন যে ওহী নাযিল হতো, পালাক্রমে তার খবর সে আমাকে জানাতো আর আমি তাকে জানাতাম। আমরা বলাবলি করতাম, যে, গাসসান গোত্র আমাদের ওপর হামলা করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। একদিন আমার উক্ত প্রতিবেশী রাতের বেলা এসে আমার দরজায় করাঘাত করলো এবং ডাকলো। আমি তার সামনে বেরিয়ে এলাম। সে বললো, সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে! আমি বললাম কি হয়েছে? গাসসানীরা এসে গেলো নাকি? সে বললো, না, তা নয়। তবে তার চেয়েও ভয়ংকর ও সাংঘাতিক ব্যাপার। রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। আমি সংগে সংগে বললাম, হাফসার সর্বনাশ হয়ে গেলো। এ ঘটনা ঘটবে, তা আমি জানতাম। পরদিন ফজরের নামাযের অব্যবহিত পর আমি হাফসার কাছে গেলাম। দেখলাম সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রসূল (স.) কি তোমাদের তালাক দিয়েছেন? সে বললো, জানি না। তিনি এই তো এই পানকক্ষে আমাদের সংগ বর্জন করে অবস্থান করছেন। সংগে সংগে আমি এক কৃষ্ণকায় তরুণের কাছে এলাম। তাকে বললাম, ওমরের জন্যে অনুমতি চাও (অর্থাৎ রসূলের কাছ থেকে সাক্ষাতের অনুমতি এনে দাও)। তরুণ ভেতরে প্রবেশ করলো। অতপর বেরিয়ে এসে বললো, আপনার কথা রসূলের কাছে বলেছি। কিন্তু তিনি কিছুই বলেননি। আমি তখন মসজিদে নববীর মেম্বরের কাছে গেলাম। দেখলাম, সেখানে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে বসে আছে। তাদের কেউ কেউ কাঁদছে। আমি সেখানে কিছুক্ষণ বসলাম, কিন্তু আমার ভেতরকার আবেগ উত্তেজনা আমাকে অস্থির করে তুললো। আমি তাই পুনরায় সে তরুণটির কাছে এলাম এবং আবারো বললাম, ওমরের জন্যে অনুমতি এনে দাও। এবারও সে ভেতরে গিয়ে ফিরে এসে জানালো, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাক্ষাতের অনুমতি দানের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আমি আবারও মেম্বরের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে কাটালাম। অতপর আবেগ উত্তেজনার বশে আবারো সে তরুণের কাছে গেলাম এবং অনুমতি চাইতে অনুরোধ করলাম। এবারও সে আগের মতো জানালো, রসূলুল্লাহ (স.) নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আমি অগত্যা ফিরে যেতে উদ্যত হলাম। আমি রওনা হতেই পেছনে থেকে উক্ত তরুণ ডাক দিলো। সে বললো, আপনাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। ভেতরে যান। আমি ভেতরে গেলাম এবং রসূলুল্লাহ (স.)-কে সালাম করলাম। দেখলাম তিনি একটি বালুভর্তি বিছানায় শুয়ে আছেন এবং সে জন্যে তাঁর শরীরে দাগ হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আপনি স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? তিনি মাথা তুলে আমাকে বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার! ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কোরায়শ বংশীয়রা নারীদের ওপর পুরুষদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতাম, কিন্তু মদীনায় এসে দেখলাম, এখানকার পুরুষদের ওপর তাদের স্ত্রীদের কর্তৃত্ব বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

এখানকার মহিলাদের দেখাদেখি আমাদের মহিলারাও কর্তৃত্ব ফলানো শিখেছে। একদিন আমার স্ত্রীর ওপর আমি রাগ করেছিলাম। সে আমার সাথে তর্ক জুড়ে দিলো। আমি তার তর্ক করায় বিরক্তি প্রকাশ করলাম। সে বললো, আমার তর্ক করায় তুমি বিরক্ত হচ্ছো কেন! আল্লাহর কসম, রসূলের স্ত্রীরাও তাঁর সাথে তর্ক করে। এমনকি তাদের কেউ কেউ তাঁর সাথে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কথা বন্ধ রাখে। এ কথা শুনে আমি বললাম, যে মহিলা এমন কাজ করে তার সর্বনাশ হবে। তোমরা কি ভাবো না যে, আল্লাহর রসূলের ক্রোধের কারণে তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা ক্রুদ্ধ হতে পারেন এবং এতে তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে? এ কথার পর রসূলুল্লাহ (স.) মুচকি হাসলেন । আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাফসার কাছে গিয়েছিলাম, তাকে বলেছি যে, তোমার কোনো সতিন যদি তোমার চেয়ে বেশী সুন্দরী হয় এবং রসূলের কাছে তোমার চেয়ে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না। রসূলুল্লাহ (স.) আবারও মুচকি হাসলেন। আমি বললাম, আমি কি আশ্বস্ত হতে পারি ইয়া রাসূলাল্লাহ?' তিনি বললেন, হাঁ। তখন আমি বসলাম। আমি ঘরের ভেতরে চতুর্দিকে তাকালাম। সেখানে রসূল (স.)-এর গাম্ভীর্যপূর্ণ অবস্থান ছাড়া আর কোনো দর্শনীয় বস্তু আমার চোখে পড়লো না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে সচ্ছলতা দান করেন। আল্লাহ তায়ালা তো পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যকেও সচ্ছলতা দান করেছেন। অথচ তারা আল্লাহর এবাদাত করে না। এ সময় রসূলুল্লাহ (স.) ওঠে বসলেন এবং বললেন, হে খাত্তাবের ছেলে, তুমি কি সন্দেহের মধ্যে আছো? তারা তো এমন জাতি, যাদের দুনিয়ার জীবনেই সকল সুখ শান্তি নগদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্যে ক্ষমা চান। ....রসূল (স.) স্বীয় স্ত্রীদের ওপর এতো বেশী রুষ্ট হয়েছিলেন যে, এক মাসের মধ্যে তাদের কাছে যাবেন না বলে কসম খেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তিরস্কার করেন (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ীও যুহরীর সূত্রে একই ভাষায় এই হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

সীরাত গ্রন্থসমূহে এ ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া গেছে, তাই এখানে বর্ণনা করা হলো।

সূরা আল বাইয়্যেনাহ

অধিকাংশ রেওয়ায়াত অনুসারে এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে একে মক্কী বলা হয়েছে। রেওয়ায়াতের দিক দিয়ে এবং বক্তব্য উপস্থাপনার ভংগির দিক দিয়ে সূরাটির মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা যদিও বেশী, তথাপি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়া যায় না। সূরায় যাকাত ও আহলে কেতাবের উল্লেখকে এ ক্ষেত্রে প্রতিকূল সাক্ষ্য হিসাবে ধরা যায় না। কেননা,

www.pathagar.com

অকাট্যভাবে মক্কায় অবতীর্ণ এমন সূরাতেও আহলে কেতাবের উল্লেখ আছে। মক্কায় আহলে কেতাবের কিছু লোক বাসও করতো। তাদের কেউবা ঈমান এনেছে, কেউ আনেনি। নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদল যে রসূল (স.)-এর সাথে মক্কাতেই সাক্ষাত করতে এসেছিলো এবং ঈমান এনেছিলো, সেটা তো সুবিদিত। কতিপয় মক্কী সূরায় যাকাতেরও উল্লেখ দেখা যায়।

মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি সমর্থন করে এমন রেওয়ায়াত তো রয়েছেই। তদুপরি এ সূরায় এমন কিছু ঐতিহাসিক ও ঈমান বিষয়ক সত্য প্রতিবেদনের ভংগিতে তুলে ধরা হয়েছে, যা এর মাদানী হওয়াকেই অগ্রগণ্য বলে সাব্যস্ত করে।

উক্ত সত্যসমূহের মধ্যে পয়লা সত্যটি এই যে, আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মধ্য থেকে যারা গোমরাহী ও মতদ্বৈধতার শেষ সীমায় পৌছে গিয়েছিলো, তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য রসূল (স.)-কে পাঠানো অপরিহার্য ছিলো। প্রথম তিনটি আয়াত 'আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মধ্যে যারা কাফের ছিলো, তারা কুফরী ছাড়তে রাযী ছিলো না যতক্ষণ তাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ না আসে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল, যিনি পবিত্র গ্রন্থ পড়ে শোনাবেন। যাতে শাশ্বত ও সঠিক বিধানসমূহ লেখা থাকবে-এর এটাই বক্তব্য।

দ্বিতীয় সত্য এই যে, আহলে কেতাব তাদের ধর্মের ব্যাপারে যে দ্বিমত পোষণ করেছে সেটা তাদের অজ্ঞতার জন্যও নয় এবং এই ধর্মে কোনো অস্পষ্টতা থাকার জন্যও নয়। বরঞ্চ তাদের কাছে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আসার পরেই তা করেছে। চতুর্থ আয়াতে, 'পূর্বে যাদেরকে কেতাব দেয়া হয়েছিলো, তাদের কাছে সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ আসার পরই তারা বিভেদগ্রস্ত হয়েছিলো'-একথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

তৃতীয় সত্য এই যে, দ্বীন বা ধর্ম মূলগতভাবে এক ও অভিন্ন। তার মূলনীতি ও বিধিগুলো এত সরল ও সহজ বৈশিষ্টের অধিকারী যে, তা কখনো মানুষকে বিভেদ ও কোন্দলের শিক্ষা বা প্ররোচনা দেয় না। সূরার চতুর্থ আয়াতের বক্তব্য এটাই।

চতুর্থ সত্য এই যে, অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আসার পরও যারা ইসলামকে অস্বীকার করে, তারা হলো নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। আর যারা ঈমান আনে, তারা উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। এ জন্য উভয় গোষ্ঠীর কর্মফলেও আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

'আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে, তারা জাহান্নামের আগুনে চিরদিন থাকবে। তারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তারা হচ্ছে উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রতিদান হলো চিরস্থায়ী বেহেশ্ত।'

এ চারটি সত্যসহ ইসলামী আকীদা ও শেষ নবীর ভূমিকাকে অনুধাবন করার ব্যাপারে সূরাটি অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রাখে

www.pathagar.com

সূরা আয যেলযাল

এ সূরাটি অনেকের মতে মদীনায় অবতীর্ণ, আবার অনেকের মতে মক্কায় অবতীর্ণ। আমার মতে সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষের বর্ণনাই অগ্রগণ্য। সূরার আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনাভংগিও শেষোক্ত মতেরই সমর্থক।

সূরাটি শিথিল ও উদাসীন লোকদের মনে প্রচন্ড আলোড়ন তোলে। এর বক্তব্য বিষয়, দৃশ্যপট ও ছন্দময় শব্দ সব কিছু মিলেই এই আলোড়ন সৃষ্টি করে। সূরাটি একটি বিকট চিৎকার স্বরূপ, যা পৃথিবীকে ও পৃথিবীবাসীকে প্রকম্পিত করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি বাক্যের মধ্য দিয়ে যতক্ষণ না তাদের সামনে হিসাব-নিকাশ, ওযন ও কর্মফলের পূর্ণ দৃশ্য তুলে ধরা না হয়, ততক্ষণ তাদের সম্বিত ফিরতে চায় না। শুধু এই সূরার নয়, গোটা আমপারারই বর্ণনাভংগি এ রকম। তবে এ সূরায় এই বর্ণনাভংগিটি অত্যন্ত জোরদারভাবে উপস্থিত।

সূরা আন নাসর

সূরা কাওসারের অনুরূপ এটিও কোরআনুল কারীমের একটি ছোটো সূরা। মাত্র ৩টি আয়াতসম্পন্ন এ সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে, আল্লাহর সাহায্য, বিজয় ও দলে দলে লোকদের ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আগাম সুসংবাদ নাযিল করেছেন। মূলত এটি আল্লাহর মদদ, বিজয় ও ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সুসংবাদবাহী সূরা। এ সূরায় সাহায্য ও বিজয়প্রাপ্তির লগ্নে রসূলল্লাহ (স.)-কে আল্লাহর শোক্‌রিয়া প্রকাশ আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর প্রবিত্রতা বর্ণনা ও মাগফেরাত কামনায় মনোনিবেশ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বিজয়োল্লাসে আনন্দে মাতোয়ারা না হয়ে মহান আল্লাহর শোকরিয়া, হামদ, তাসবীহ ও মাগফেরাত কামনার মাধ্যমে বিনয়, নম্রতা, দীনতা, হীনতা প্রকাশের মহান মানবীয় গুণাবলীর প্রতি হুযুরে পাক (স.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এমনিভাবে এ ছোট্ট সূরাটিতে বিজয়লগ্নে ইসলামী জীবন-চেতনার অনুসারী আল্লাহর দ্বীনের প্রত্যয়শীল জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে হাবীবে পাক (স.) প্রদর্শিত এমন সব উজ্জ্বল গুণাবলী অর্জনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানব সভ্যতার কোনো স্তরেই বিজয়ের সুসংবাদ প্রাপ্ত ও বিজয়ের আনন্দে উল্লাসিত জনতার মধ্যে আশা করা যেতে পারে না। এ সূরায় এমন সব মহান উজ্জ্বল উন্নত মানবীয় গুনাবলী যথা সম্মান, মর্যাদা, বিনয়, নিষ্ঠা, একাগ্রচিত্ততা, আত্ম-সংযম, আত্ম-নিয়ন্ত্রন, উদারতা, বিজয় উল্লাসে মদমত্ত না হওয়া এবং হামদ তাসবীহ, মাগফেরাত ও তাওবায় লিপ্ত হওয়ার মতো এত উন্নত পর্যায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্টমন্ডিত হওয়ার আদেশ প্রদান করা হয়েছে, যা একমাত্র ইসলামী জীবনদর্শনের স্বাভাবিক পদ্ধতি, প্রবৃত্তি, মননশীলতা ও দর্শনের সাথেই সামঞ্জস্যশীল। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করা

www.pathagar.com

ছাড়া কখনও মানুষ নৈতিক উৎকর্ষের এত শীর্ষ স্থানে আরোহণ করতে পারে না– পারে না মর্যাদা, সম্মান ও মহত্ত্বের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হতে।

এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে আমি এখানে ইমাম আহমদ সংকলিত হাদীস গ্রন্থের রেওয়ায়াতের উদ্ধৃতি পেশ করছি। তিনি রেওয়ায়াত করেন যে, আমাদের কাছে মোহাম্মদ ইবনে আদী বর্ণনা করেছেন, তিনি দাউদ থেকে, দাউদ শাবী থেকে, শাবী মাসরুক থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। মাসরুক বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর জীবনের শেষ সময়ে বেশী করে এ দোয়া পাঠ করতেন।

'সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহী আসতাগফিরুল্লাহে ওয়া আতুবু ইলাইহে' অর্থাৎ আল্লাহ পাক পবিত্র, তাঁর জন্যে সব প্রশংসা, আমি আমার গুনাহর জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছেই আমি তাওবা করছি– তিনি এ কথাও বলেছেন, আমার প্রভু আমাকে এ সংবাদ দিয়েছেন, এ লক্ষণগুলো দেখলে আমি যেন আল্লাহর তাসবীহ, তাহমীদ, মাগফেরাত ও তাওবায় রত হই। অর্থাৎ উপরোল্লেখিত দোয়া বেশী বেশী করে পাঠ করি।

'আর যখন তুমি দেখতে পাবে যমীনে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী হয়েছে, তখনি তুমি এ বিশ্বাসে উপনীত হবে যে, আল্লাহর সান্নিধ্যে তোমার ফিরে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও আল্লাহর সাহায্য, বিজয় ও দলে দলে লোক ইসলামের পতাকাতলে দাখিল হওয়ার এ মর্মই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইসলাম তার পরিপূর্ণ আদর্শ নিয়ে বিজয়ী হওয়ার তাৎপর্যই হলো যে, সর্বশেষ রসূলের এ ধরার বুক থেকে অন্তর্ধানের সময় ও আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে বর্ণিত ফাত্হ্ (বিজয়) বলতে মক্কা বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে। এটি একজনের একটি উক্তি। আরবের যেসব ক্বাবীলাসমূহ, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মক্কা-বিজয়ের অপেক্ষায় ছিলো, তারা বলতো, 'যদি সে তার জাতির ওপর বিজয়ী হয় তাহলে বুঝবো অবশ্যই সে নবী। তারপর যখন আল্লাহ তায়ালা মক্কা বিজয় দান করলেন তখন তারা দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে লাগলো। এরপর দু'বছর যেতে না যেতেই গোটা আরব উপদ্বীপ ঈমানের শরবত আকণ্ঠ পান করলো এবং সমগ্র আরবের কবীলাগুলো ইসলামের সমুজ্জ্বল বাতির বাইরে আর কেউ রইলো না এ বাতির প্রদীপ্ত আভায় সমুজ্জ্বল হয়ে গেলো তাদের জীবন। আলহামদু লিল্লাহ্ আল্লাহ তায়ালারই যাবতীয় প্রশংসাও কৃতিত্ব এবং তাঁর এহ্সানে আমরা ধন্য।

আমর্ ইবনে সালামার্ বরাত দিয়ে ইমাম বোখারী তাঁর কেতাব সহীহ বোখারীতে রেওয়ায়াত করেছেন, মক্কা বিজিত হলে প্রত্যেকটি ক্বাবীলা ও গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ

www.pathagar.com

করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো। আর ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মক্কা-বিজয়ের প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান কুবীলাগুলোও বলতে লাগলো, 'এবারে তার জাতিকে বুঝতে দাও (অর্থাৎ, বুঝুক তার জাতি এবার) যে অবশ্যই তিনি নবী।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য রেওয়ায়াতটি সূরা নাসর-এর সাথে সম্পূর্ণ সাম স্যশীল। এতে এরশাদ হয়েছে– 'যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এসে যাবে..... শেষ পর্যন্ত।' সুতরাং, সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়েই এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ইংগিত পাওয়া যায় যা অবশ্যই পরবর্তীতে সংঘটিত হবে। এ বিষয়ে নবী (স.) তখনই এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যখন তিনি এই সুসংবাদ ও এই ইংগিত পেয়ে গেলেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.)–এর আর একটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, যাতে আমরা সহজেই দেখতে পাই দুটি রেওয়ায়াতের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্তমান। ইমাম বোখারী বলেন, একটি হাদীস মূসা ইবনে ইসমাঈল আমাদেরকে শুনিয়েছেন, তাঁদের বলেছেন আবূ উয়ানাহ্, তিনি পেয়েছেন আবূ বাশার থেকে। এই আবূ বাশার সাঈদ ইবনে জোবায়ের থেকে পেয়েছেন। আর তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন, ওমর (রা.) কিছু সংখ্যক বদ্‌রী বুযুর্গ (মুরুব্বী শ্রেণীর) ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে আমার কাছে আসতেন। এতে কারো কারো মনে একটু বেখাপ্পা (খারাপ) লাগলো। একজন বলেই ফেললেন, আমাদেরও তো এ বয়সী ছেলেরা আছে, এ ছেলেটা কেন আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে?' তখন ওমর (রা.) বললেন, হাঁ আছে, তবে এ বাচ্চাটা একটু ব্যতিক্রম। তোমাদেরকে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এই বাচ্চাটাকে সেই একই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যা জানো এই বাচ্চাটাও তাই জানে। (সুতরাং এটা সাধারণ বাচ্চা নয়)। পরবর্তী আর এক দিন তিনি এ মুরব্বীদেরকে ডাকলেন এবং সেখানে আমাকেও রাখলেন। তখন আমি বুঝলাম, আসলে তিনি তাদেরকে সেদিন কিছু দেখাতে চাচ্ছিলেন। তাই বললেন, আল্লাহ পাকের বাণী 'ইযা জাআ নাসরুল্লাহে ওয়াল ফাত্‌হু' সম্পর্কে আপনারা কী বুঝেন বলুন দেখি। তাঁদের মধ্যে কেউ বললেন, যখন আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও বিজয় আসবে তখন আ-মাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রশংসা করতে এবং তাঁর কাছে এস্তেগফার করতে আদেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ কিছু না বলে চুপ থাকলেন। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে আব্বাসের বেটা, তুমিও কি ওদের মতো একই কথা বলতে চাও? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে বলো তুমি কী বলতে চাও। বললাম, এ সূরাটি রসূল (স.) এর মৃত্যুর কথা ভবিষ্যদ্বাণী করছে। (অর্থাৎ তিনি অবিলম্বে ইন্তেকাল করবেন এ ঘোষনা দিচ্ছে)। সূরাটি দ্বারা তাঁকে এ কথাটি জানানো হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন, 'যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন বুঝবে সেটাই তোমার মৃত্যুর সংকেত। অতএব 'তোমার রবের প্রশংসা ও কৃতিত্বের কথা

www.pathagar.com

ঘোষণা করে তাঁর তাসবীহ্ (পবিত্রতার ঘোষণা) জপতে থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থী হও, নিশ্চয়ই তিনি তাওবা গ্রহণকারী।' তখন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, 'তুমি যা বলেছো এর থেকে বেশী কিছু জানিনা।' (বোখারী একটি ব্যক্তি-সূত্র থেকে হাদীসটি পেয়েছেন)। যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই সংকেত পেয়ে গেলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, যে দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিলো তা পূর্ণ হয়ে গেছে, আর তিনি শীঘ্র তাঁর রবের সাথে মিলিত হবেন। এটাই ছিলো ইবনে আব্বাসের বোধগম্য অর্থ। অর্থাৎ রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের ভবিষ্যদ্বাণী সূরাটির মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে জানিয়েছেন।

অবশ্য হাফেয বায়হাকী তাঁর সংকলিত বায়হাকীতে সূরা 'নাসরের' শানে নযুল প্রসংগে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সূরা নাসর অবতীর্ণের পর রসুলুল্লাহ্ (স.) তাঁর নয়ন পুতুলী ফাতেমা (রা.)-কে তাঁর কাছে ডেকে এনে বললেন, শোনো মা ফাতেমা, আমি জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়েছি। এ কথা শুনে হযরত ফাতেমা (রা.) প্রথমে, কাঁদলেন এবং পরক্ষণেই হাসলেন। তার প্রথম কান্না এবং পরক্ষণেই হাসার কারণ ব্যাখ্যা করে হযরত ফাতেমা (রা.) বলেছেন, আব্বা যখন আ-মাকে এ সংবাদ দিলেন যে, তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, তখন আমি কেঁদেছি, পরক্ষণেই তিনি বললেন, তুমি ধৈর্য্য ধারণ করো, (সংযত হও)। আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার মৃত্যুর পর আমার সাথে মিলিত হবে, তখনই আমি হেসেছি।

উক্ত হাদীস থেকে আমরা এ সূরার শানে নযুল ও অবতীর্ণকালীন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে স্থিরভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি যে, যখন সূরা নাসর নাযিল হলো তখন বুঝা গেলো যে, মক্কা বিজয় আসন্ন, দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে। আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে কায়েম হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা কোরআন নাযিল করেছেন, রসূল (স.) প্রেরণ করেছেন ও দ্বীনরূপী নেয়ামত উপহার দিয়েছেন, তা সফল হয়েছে। আল্লাহর সাহায্যে বিজয় সূচীত হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় হাবীব যখন বুঝতে পারলেন যে বিজয়ের নিদর্শন সুস্পষ্ট দেখা দিয়েছে তখন তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, তাঁর অন্তর্ধানের সময় নিকটতর হয়ে এসেছে। এ দুটো হাদীসের মূল বক্তব্য ও মর্ম প্রায় কাছাকাছি। তবু বিভিন্ন হাদীস ও আল কোরআনের ভাষ্য অনুসারে সূরা নাসর-এর শানে নুযুল প্রসংগে হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীস অপর এক ঘটনা প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে এবং উম্মে সালমা (রা.) বর্ণিত হাদীসেও এ মতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং অপরাপর হাদীসে একই মতের উল্লেখ রয়েছে।

উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) মক্কা বিজয়ের পর হযরত ফাতেমা (রা.)-কে ডেকে কানে কানে কি কথা যেন বললেন, ফাতেমা (রা.) কাঁদলেন। আবার রসূলুল্লাহ (স.) ফাতেমার কানে কি কথা বললেন, এবার ফাতেমা (রা.) হাসলেন। রসূলুল্লাহ (স.) ইন্তেকালের পরে হযরত উম্মে সালমা (রা.) ফাতেমা (রা.)কে হাসা ও কান্নার কারণ জিজ্ঞাস করলে

www.pathagar.com

উত্তরে ফাতেমা (রা.) বললেন, তিনি প্রথম আমার কানে কানে বলেছিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এ পৃথিবী থেকে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাবেন। তখন আমি কেঁদেছি। এর পরেই তিনি আমার কানে কানে বললেন তুমি বেহেশতের সকল রমণীকুলের নেত্রী (একমাত্র ইমরান দুহিতা মরিয়ম ছাড়া)। (তিরমিযী)।

উল্লেখিত বর্ণনার সাথে কোরআনুল করীমের আয়াতের সাথে মিল রয়েছে। এবং সহীহ্ মুসলিম শরীফে সংকলিত ইমাম আহমদ (র.) বর্ণিত হাদীসের সাথেও হুবহু মিল রয়েছে। কারণ যে নিদর্শন দেখার পর রসূলে পাক (স.) হামদ, তাসবীহ্, এস্তেগফার ও তাওবায় লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং শেষ জীবনে যে আলামত প্রকাশ পাওয়ার পর রসূলুল্লাহ (স.) 'সুবহানাল্লাহে ওয়া বেহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম' দোয়া বেশী করে অযীফা করতেন, সে আলামত বা নিদর্শন আর কিছুই নয়; তা হচ্ছে 'ইযা জাআ..... তাওয়াবা।' যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের নিদর্শন প্রকাশ হয়েছে তখন তিনি এও উপলব্ধি করলেন যে, আল্লাহর সান্নিধ্যে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। অতঃপর তিনি ফাতেমা (রা.)-এর কানে কানে একথা বললেন, যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।

এ ক্ষুদ্র সূরাটির মোদ্দা কথা হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর দৃষ্টি সাহায্য, বিজয় ও দলে দলে লোক ইসলামে দীক্ষিত হতে দেখলেই এ সত্য উপলব্ধি করা যে, যে মহান পয়গাম ও দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে প্রেরণ করেছেন তা সমাপ্তি পর্যায়ে এসে গেছে। তাঁকে দায়িত্ব সম্পাদনের পর বিরহের অনলে জ্বলে-পুড়ে অব্যক্ত ব্যথা বেদনায় জর্জরিত হওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। পরম প্রিয়জনের সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তনের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। তাই এ সময় সে মহান প্রভুর হামদ, তাসবীহ মাগফেরাত ও তাওবার মাধ্যমে অতিবাহিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ সূরা অবতীর্ণ করেন।

- ০ -

www.pathagar.com